শারদীয়া **শুকতারা** ১৪০৫

শারদীয়া **শুকতারা** ১৪০৫

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার

আর লিভারের সুরক্ষায়

লিভোসিন

আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক

"সর্বাধিক রোগের কারণ -
পেটের গণ্ডগোল ও অসুস্থ লিভার এবং নানা কারণে মানসিক চাপজনিত রাতে ঘুম না হওয়া।"
কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে, ক্ষুধা ও হজম শক্তি বাড়াতে, অম্লরোগ, গ্যাস ও ক্লান্তি তাড়াতে, পেট পরিস্কার রাখতে ও লিভারের যত্ন নিতে নিয়মিত লিভোসিন সেবন করুন।

আপনাকে সুস্থ জীবন ফিরে পেতে সাহায্য করে।

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার
এর কার্যকারিতা ১৯৭০ সাল থেকে স্বীকৃত

A Jupiter PRODUCT

Mfd. by : JUPITER PHARMACEUTICALS LTD.
Mktd. by : JupiterAllen (India) Limited
ArnikaPlus Apt. 35, A. P. C. Road, Calcutta - 700 009
Phone : 351 0044, Fax : + 91 33 358 6610, 351 1076
E - mail : allen@giascl01.vsnl.net.in

Jupiter Allen Allen's Emars
Dr. Sarkar Group of Compa
Serving for a better fut

স্বাস্থ্য আর সতেজতা লিভোসিনের শেষকথা

এক বাড়ী স্মৃতি, আর একজন নির্জন মানুষের
কাছে শরৎ মানে অনেকটা রোদ্দুর ।

জামানী থেকে দাদা তো আর প্রতিবার আসতে পারে না । তাই, আমিই আসি । তারপর কটা দিন, ফিরে পাওয়া আর ফিরিয়ে দেওয়ার ... ।

নতুন শাড়ীটা মায়ের হাতে তুলে দিতে গিয়ে প্রতিবারই মনে হয়, এ যেন সেই প্রথমবার । তিন মাস ধরে একটু একটু করে জমানো প্রথম চাকরীর টাকায়, ঘুরে দেখে বেছে কেনা ... মায়ের জন্য প্রথম উপহার ।

ঝাপসা চোখে উপচে পড়া হাসিতে আজও দেখি মায়ের অনাবিল আনন্দ । মনে হয়, এই উৎসবে, এর চেয়ে দামী আর কোন সাজ হতে পারে তার ... ?

প্রথম জগৎ, প্রথম বন্ধু, আর প্রথম ভালোবাসা ... আমার মা র ।

শালিমার
নারকোল তেল
মায়ের স্নেহের মত খাঁটি

TSPL/SCW/98-PN-B

চুল নিয়ে কিছু কথা

চুল পড়ে যাচ্ছে?

প্রত্যেকটা চুলের একটা নিজস্ব আয়ু আছে। চুল যেমন জন্মায়, বাড়ে, তারপর একদিন পড়েও যায়। আবার তার জায়গায় নুতন চুল জায়গা নেয় - এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু অসময়ে চুল যখন বেশী মাত্রায় পড়তে আরম্ভ করে এবং সেই অনুপাতে নতুন চুল জন্মায় না তখনই হয় সমস্যা র শুরু।

বিভিন্ন কারনে এই সমস্যা হতে পারে, যেমন পেটের গণ্ডগোল, অসুস্থ লিভার, রক্তাল্পতা বা শরীরের মৌলিক উপাদানগুলির ঘাটতি বা তারতম্য।

আপনিই বলুন এর প্রতিকার কি বাজার চলতি কোন কস্‌মেটিক্ শ্যাম্পু বা হেয়ার অয়েল দ্বারা সম্ভব?

চুল নিয়ে সমস্যার সমাধানে আপনার তাই প্রয়োজন সঠিক খাবার ওষুধ ট্রায়োফার ট্যাবলেট, যা চুলের সমস্যার মূল কারণগুলি দূর করে, কারণ এতে আছে শরীরের প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানগুলি, Dr. Schuessler- এর Bio Chemic Salts - FivePhos যেমন - পটাসিয়াম, সোডিয়াম, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও হোমিও ওষুধ "ট্রায়ো" - লাইকো, কার্বো, চায়না (সিঙ্কোনা) যা পেটের গণ্ডগোলে মহা-উপকারী হিসাবে পরীক্ষিত এবং প্রমানিত।

এর সঙ্গে চুলের গোড়ায় মালিশের জন্য আপনার প্রয়োজন সঠিক ওষুধ আর্ণিকাপ্লাস - তেলবিহীন হোমিও হেয়ার ভাইট্যালাইজার যাতে আছে সুনির্বাচিত হোমিও ওষুধ, যা চুলের গোড়াকে করে মজবুত ও প্রাণবন্ত।

Pharmacological Actions of Individual Ingredient in TRIOFER

LYCOPODIUM CLAV.
Effective in "great falling out of hair, premature baldness & gray hair."
– Dr. William Boericke, M.D.

CARBO VEG
Indicated in "Falling out of hair from a general weakend condition"
– Dr. William Boericke,M.D.

CINCHONA OFF.
"One of the remedies of Alopecia, falling out of the hair. hair sweats much and falls out."
– Dr. Samuel Lilienthal, M. D.

FERRUM
"Mentioned as one of the remedies of hair falling."
– Dr. J. T. Kent

FIVE PHOS
"Essential tissue remedies to resolve the vital force of the body."
– Dr. Schuessler

Homoeo Medicine
No Side Effect

আর্নিকাপ্লাস ও ট্রায়োফার
ট্রিপল অ্যাকশ্‌ন হেয়ার ভাইট্যালাইজার
ডঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার

Allen Ad/APT/Ben/Puja/'98

A Allen PRODUCT

Mfd. by : **ALLEN LABORATORIES LIMITED**
Mktd. by : **JupiterAllen (India) Limited**
ArnikaPlus Apt. 35, A. P. C. Road, Calcutta - 700 009

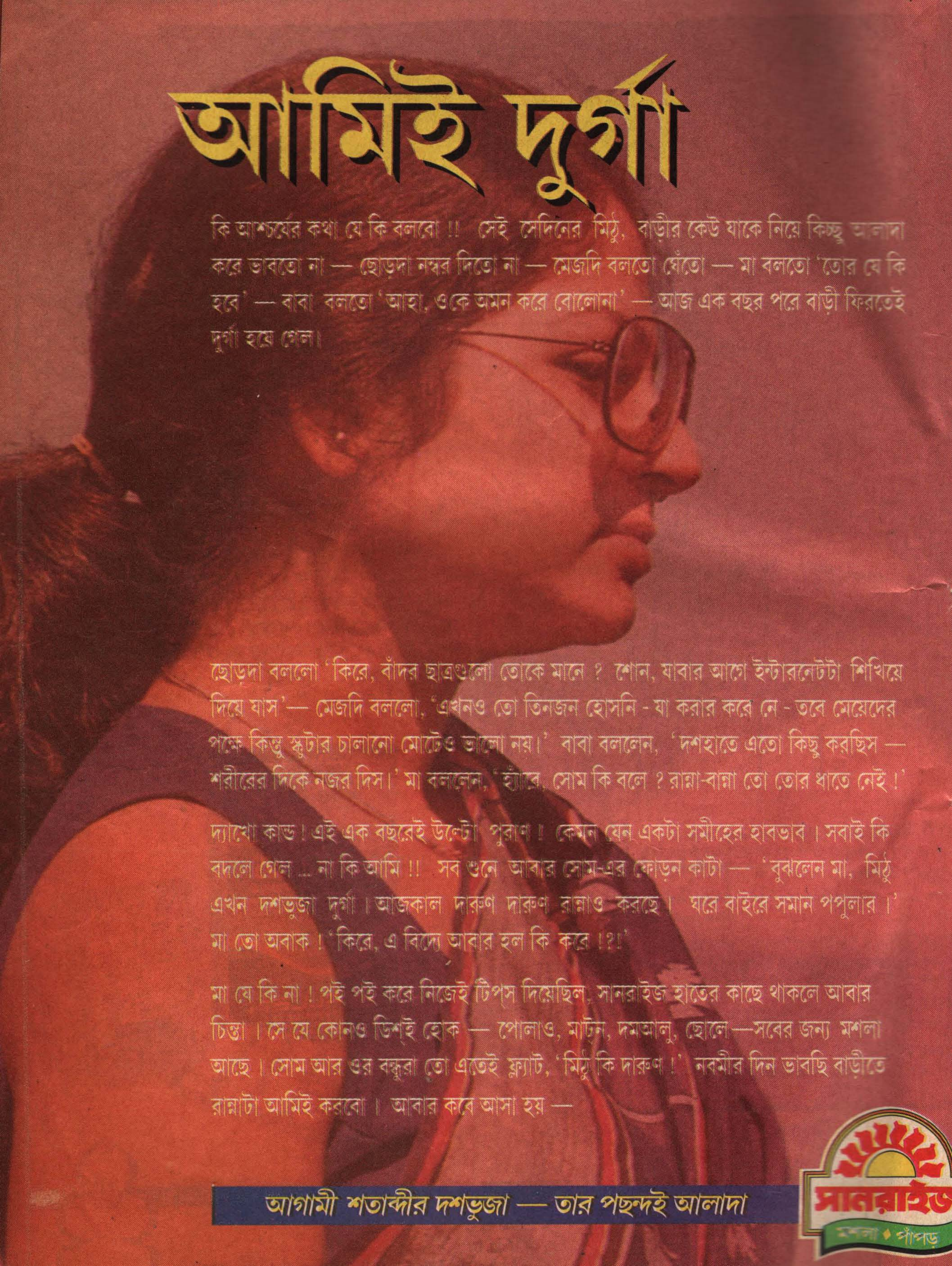
আমিই দুর্গা
কি আশ্চর্যের কথা যে কি বলবো !! সেই সেদিনের মিঠু, বাড়ীর কেউ যাকে নিয়ে কিচ্ছু আলাদা করে ভাবতো না — ছোড়দা নম্বর দিতো না — মেজদি বলতো ঘেঁতো — মা বলতো 'তোর যে কি হবে' — বাবা বলতো 'আহা, ওকে অমন করে বোলোনা' — আজ এক বছর পরে বাড়ী ফিরতেই দুর্গা হয়ে গেল।
ছোড়দা বললো 'কিরে, বাঁদর ছাত্রগুলো তোকে মানে ? শোন, যাবার আগে ইন্টারনেটটা শিখিয়ে দিয়ে যাস'— মেজদি বললো, 'এখনও তো তিনজন হোসনি - যা করার করে নে - তবে মেয়েদের পক্ষে কিন্তু স্কুটার চালানো মোটেও ভালো নয়।' বাবা বললেন, 'দশহাতে এতো কিছু করছিস — শরীরের দিকে নজর দিস।' মা বললেন, 'হ্যাঁরে, সোম কি বলে ? রান্না-বান্না তো তোর ধাতে নেই !'
দ্যাখো কান্ড ! এই এক বছরেই উল্টো পুরাণ ! কেমন যেন একটা সমীহের হাবভাব। সবাই কি বদলে গেল ... না কি আমি !! সব শুনে আবার সোম-এর ফোড়ন কাটা — 'বুঝলেন মা, মিঠু এখন দশভুজা দুর্গা। আজকাল দারুণ দারুণ রান্নাও করছে। ঘরে বাইরে সমান পপুলার।' মা তো অবাক ! 'কিরে, এ বিদ্যে আবার হল কি করে !?!'
মা যে কি না ! পই পই করে নিজেই টিপ্‌স দিয়েছিল, সানরাইজ হাতের কাছে থাকলে আবার চিন্তা। সে যে কোনও ডিশ্‌ই হোক — পোলাও, মাটন, দমআলু, ছোলে—সবের জন্য মশলা আছে। সোম আর ওর বন্ধুরা তো এতেই ফ্ল্যাট, 'মিঠু কি দারুণ !' নবমীর দিন ভাবছি বাড়ীতে রান্নাটা আমিই করবো। আবার কবে আসা হয় —
আগামী শতাব্দীর দশভুজা — তার পছন্দই আলাদা
সানরাইজ
মশলা • পাঁপড়

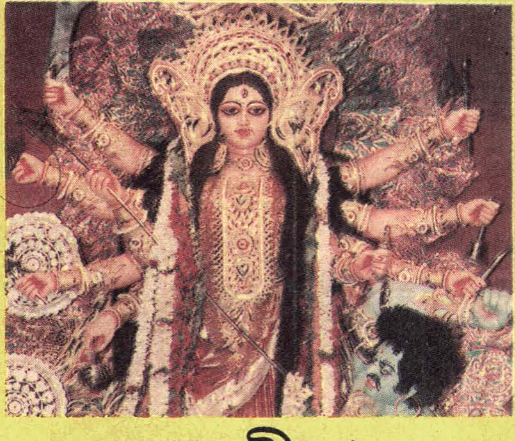

শারদীয়া

শুকতারা

আশ্বিন ১৪০৫ ☐ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

সূচীপত্র

বিশেষ আকর্ষণ—অপ্রকাশিত কবিতা ☐

কাজী নজরুল ইসলাম—আবিরাবির্মত্রধি ৭

অপ্রকাশিত গল্প ☐

আশাপূর্ণা দেবী—হাটে হাঁড়ি ৮

সম্পূর্ণ উপন্যাস ☐

চিত্তরঞ্জন মাইতি—চন্দন-দস্যু ২৪৫

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—গুপ্তধন রহস্য ২২

মানবেন্দ্র পাল—জীবন্ত কংকাল ২০৬

পরেশ ভট্টাচার্য—মহিষাসুর বন্দী ৮৪

দীপঙ্কর বিশ্বাস—মেজদাদার সাইকেল কাণ্ড ১৬৮

সঞ্জীব সিংহ—মঙ্গলে ভয়ঙ্কব অভিযান ১২০

সামাজিক গল্প ☐

বুদ্ধদেব গুহ—ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে এবং ঋজুদা ১২

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—বিপিনবাবুর চশমা ৪৬

নারায়ণ সান্যাল—কড়ুরয় আর খুকু-মা ১৬

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়—অঞ্জলি ৩১৩

নিমাই ভট্টাচার্য—আমার দোস্ত ৫৬

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ—দাড়িবাবাদের কবলে ৭১

তারাপদ রায়—ঘণ্টা ৭৬

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়—খুকুর কুকুর ২৭৬

অগ্নিমিত্র—ক্ষতিপূরণ ৮১

কার্তিক ঘোষ—ভুলো আর বুতাইমাসি ১০৬

সেনকো জুয়েলারী হাউস
১৭০/২, বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন : ২৪১-৭১০৪/৯৫৮৫

দি সেনকো জুয়েলারী প্যালেস
১৯৯ বি, বি, গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন : ২৪১-৬১০১/১৯৫৮

সেনকো জুয়েলারী প্যালেস
১১৮, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
লেকমার্কেট, ফোন : ৪৬৬-৬১২৪

ন্যাশন্যাল এণ্ড ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্স : 91-33-225-5358
ই-মেল : ITBPC @ GEMS.VSNL.NET.IN
টেলেক্স : 81-21-4545 VSN IN.
BENTEX ঘড়ির অনুমোদিত ডিলার

নিউ সেনকো জুয়েলারী হাউস
১৯৫/১, রাসবিহারী এভিনিউ (বিজন সেতুর কাছে)
কলিকাতা-১৯, ফোন : ৪৪০-৪৬৯৫

Banker's Credit Card-এর ব্যবস্থা আছে

Eve's

নটরাজন—চিন্ময়ী ১০০
রমেন দাস—ফুলদি ৩০৭
ভূতের গল্প □
হিমানীশ গোস্বামী—ব্রহ্মদৈত্যদাদার গল্প ২৮৪
অনীশ দেব—জলের মতো কঠিন ২৩৭
হীরেন চট্টোপাধ্যায়—ফারাওয়ের অভিশাপ ১৪০
মঞ্জিল সেন—দানপত্র ১৫৮
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রেতাত্মার কবলে ৩০৪
গৌরী দে—রক্তচোষা ১৬৫
গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প □
প্রফুল্ল রায়—দুই বন্ধুর কীর্তি ৪৯
পার্থ চট্টোপাধ্যায়—আমার প্রথম মক্কেল ২৯৫
অদ্রীশ বর্ধন—বিগ্রহ প্রহেলিকা ২৯০
সুভাষ ধর—ফুন্টসোলিং-এর মূর্তিচোর ১৯২
সঙ্কর্ষণ রায়—নীলার আংটি ২৮১
ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—অপারেশন এক্স ১৪৮
কল্পবিজ্ঞানের গল্প □
নিরঞ্জন সিংহ—অভিনব ব্যবসা ১১৩
রেবন্ত গোস্বামী—লালটু ১৮৭
হাসির গল্প □
সুচিত্রা ভট্টাচার্য—ব্যায়ামবীরের ব্যবসা ৩১৬
শক্তিপদ রাজগুরু—বরযাত্রী হোঁৎকা ১০৮
শিকার ও জঙ্গলের গল্প □
পরেশ দত্ত—বেপরোয়া চিতা ২০২
সুকুমার ভট্টাচার্য—গজপতি ৩০৯
রূপকথা ও পৌরাণিক গল্প □
নবনীতা দেব সেন—আলো আর আঁধার ২০
শৈলেন ঘোষ—গল্পের নাম ফিক ৬০
নন্দলাল ভট্টাচার্য—গণেশ দাদার আরেক কীর্তি ২৭৩
অ্যাডভেঞ্চারের গল্প □
রাহুল মজুমদার—একা একজন আর এভারেস্ট ২৮৮
আবিষ্কারের গল্প □
শৈলেন দত্ত—বৃটেনকে বাঁচিয়েছিল একটি আবিষ্কার ১৬২
দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের গল্প ১৯৯
ডাঃ অরুণ কুমার দত্ত—নীলদরিয়ার দানব ৮০
সন্দীপ সেন—হঠাৎ যখন আবিষ্কার ১১৭
মহাজীবনের গল্প □
প্রণবেশ চক্রবর্তী—স্বামীজীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঘা যতীন ৬৮
নাটক □
জ্যোতিভূষণ চাকী—নাট্যে কথামৃত ৩২১
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়—ছাগল ভাগোল-বা ৬৪

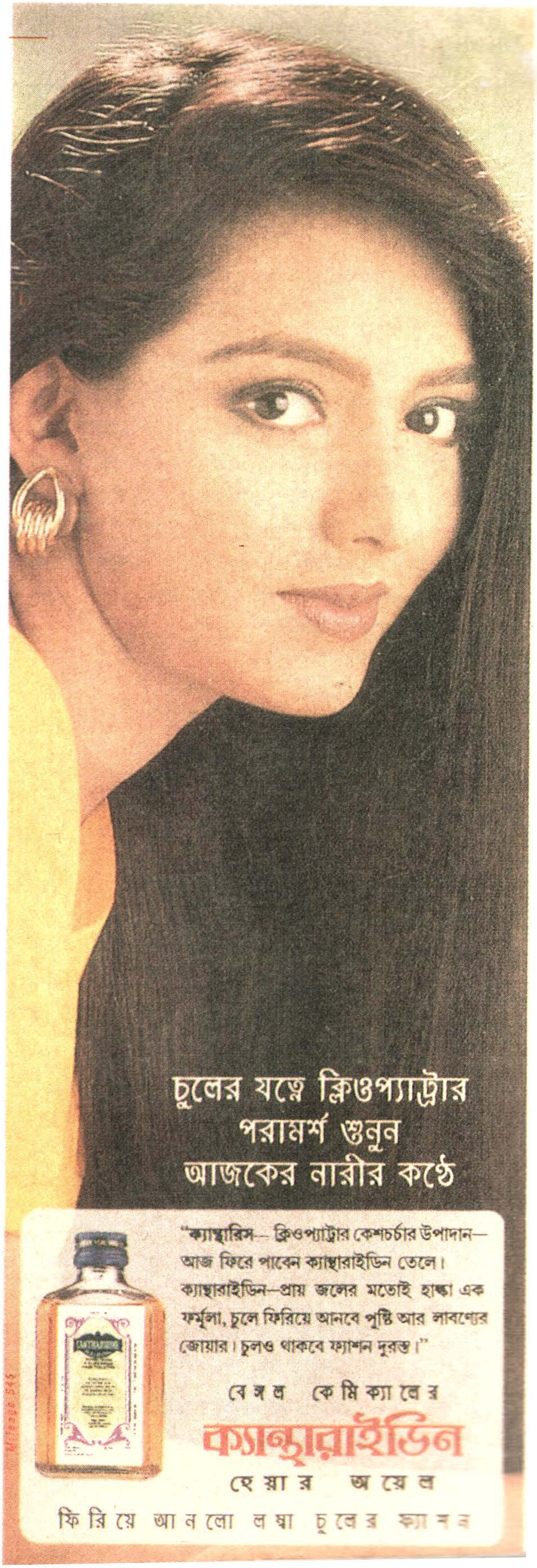

সিনেমার গল্প □
ফেলুদাকে নিয়ে আরো ছবি করব : সন্দীপ রায় ২২৬
বিজ্ঞান বিচিত্রা □
অমিয় কুমার হাটি—রোগ জয়ের অভিযান ২৪৩
বিস্ময় বিচিত্রা □
বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—তুষারচিতার রাজ্যে কয়েকটি বছর ২৩০
কবিতা ও ছড়া □
অন্নদাশঙ্কর রায়—বাঘের গন্ধ পাঁউ ১৯
সুভাষ মুখোপাধ্যায়—ঘরানা ১৯
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—মামাবাড়ি ৪৮
কৃষ্ণ ধর—রবিবাবুর কথা ৫৫
গৌরাঙ্গ ভৌমিক—বুঝাইয়ের অঙ্ককষা ৩০৬
আশিস সান্যাল—স্বপ্ন শেষে ৩০৬
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার—ভালো বাসা ১০৭
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়—ম্যাডাম শিখছে হিন্দি ১০৫
পঙ্কজ সাহা—হেলাফেলা খেলা খেলা ৭৫
রেবতী ভূষণ ঘোষ—সভ্যায়ন ২২২
সুনির্মল বসু—আগমনী ৭৫
রূপক চট্টরাজ—লিমেরিক ২৮৭
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়—ডাকছে আমায় ২৮৯
অশোক সী—গোসার গোঁ ৫৫
মুস্তাফা নাশাদ—গেঁড়ি-গুগলি-শামুক খাই ৩১৫
সরল দে—হাতির খোঁজে ৩১৫
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়—জোনাকি ১১৬
নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়—ঘুড়ির লড়াই ১১৯
পবিত্র সরকার—মিষ্টি লাগে ২৩৫
সুখেন্দু মজুমদার—আটকাবে কে ২০৫
শৈলেন্দ্র হালদার—তিন ছড়া ১১৬
শৈবাল চক্রবর্তী—ভুতুড়ে ১৬১
তমাল চট্টোপাধ্যায়—সার কথা ২৮৩
হান্নান আহসান—খাই খাই ২৯৪
সুধীন্দ্র সরকার—ভূতের ব্যাভার ১১৯
মনীষা মিত্র—জ্যান্ত মাছের বড়া ৩০৬
সলিল মিত্র—আঁকন নদী বাঁকন নদী ৩০০
মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী—রূপকথারই গল্প ৫৯
বসন্ত ভট্টাচার্য—হ্যাপি বার্থ ডে ২২২
আনসার উল হক—ছবি ১৬৭
দিলীপ রায়—শরৎ ডাকে ২৭৫
শিবায়ন ঘোষ—পুজোর চিঠি ২৭৫
অভিক বসু—মেসোর বাড়ি ২৮৩
সঞ্জীব কুমার দে—নাচানাচি ২৯৪
শ্যামলকান্তি দাশ—ভৌতিক ২৮৭
ধূর্জটি চন্দ—ঠাকুরদা ২০৫
ইন্দ্রজিৎ গুহ—দামাল ৩০০
তপন সেন—আমতা চলো ২৮৯
অমর দাশ—গরম! গরম! ১৬৭
কালিদাস ভট্টাচার্য—তিনটি রাজা ৫৫
চিত্ত পাল—ভোরের ছবি ৫৯
রবিদাস সাহারায়—ভূত ধরার আইন ৩২০
নারায়ণ চন্দ্র দাস—রক্ষে করুন দাদা ৪৮
ম্যাজিক □
জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) —ম্যাজিকের আসর ৩০১
বিভাগীয় লেখা □
দাদুমণির চিঠি ২২৩
তোমাদের পাতা ২২৪
মজার পাতা ২৩৬
কমিকস্ □
নারায়ণ দেবনাথ—হাঁদা-ভোঁদা ৪২
নারায়ণ দেবনাথ—বাহাদুর বেড়াল (চার রং) ২২৯
সুফি—শঠে শাঠ্যং! ৩২৩
সময়ের গোলকধাঁধায় ২৭০
লাট্টুর মাছধরা (রঙিন) ২
খেলা □
প্রসূন ব্যানার্জী—সৌরভের ফুটবল খেলা ৩২৫
রাজু মুখার্জী—শচীন সবসময়ই ম্যাচ উইনার ৩২৪
গৌতম সরকার—ফুটবল : ব্রাজিলের মতো ভারতেও জনপ্রিয় ৩২৬
তপন দাম—রোনাল্ডোকে টেক্কা দিয়েছেন জিদান ৩২৭
তুষার শীল—চটজলদি ব্যায়াম ৩২৮
আজব খবর □
বরুণ মজুমদার ৭৯
প্রচ্ছদ : রত্না চৌধুরী

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO No. 456(17) T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য—হাতে নিলে ১১০ টাকা; ডাকে : বুকপোস্টে ১২৭ টাকা; রেজিস্ট্রি ডাকে ১৮৫ টাকা।

Annual Subscription ; Bangladesh Regd. Post Rs. 300.00 ; By Air Mail Rs. 515.00 ; UK and USA—By Sea Mail Rs. 405.00 ; By Air Mail Rs. 645.00 ; R.N.I. Registration No. 2621/57

মূল্য : ৪৬ টাকা মাত্র

আগস্ট মাসে প্রকাশিত নতুন ডায়মণ্ড কমিকস

ভারতবর্ষে সর্বাধিক বিক্রীত কমিকস
ডায়মণ্ড কমিকস

ডায়মণ্ড কমিকসের নিবেদন

মনোরঞ্জনে ভরপুর এক সম্পূর্ণ পত্রিকা

কমিক ওয়ার্ল্ড

যার পাতায়-পাতায় ভরপুর মজা আর মনোরঞ্জন! বিশ্বের প্রায় প্রতিটি কমিকস চরিত্র **ফ্যান্টম, ম্যানড্রেক, ব্যাটম্যান, ফ্ল্যাশ গর্ডন, মডেস্টি ব্লেইজ, টম আর জেরী, আর্চি, গারফীল্ড** এবং আরও অনেক চরিত্র এবং তাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের নিজস্ব ভারতীয় চরিত্র **চাচা চৌধুরী, বিল্লু, পিঙ্কী** ইত্যাদি-ইত্যাদি এবং অমর চিত্র কথা-র অন্তর্গত গণেশ, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি! এ ছাড়াও রয়েছে জ্ঞানবর্ধক পাতা, বিশ্বের মজার-মজার খবর, গাড়ী, খেলাধূলো, ফিল্ম, বিজ্ঞান, অদ্ভূত রেকর্ডস, পত্র-মিতালী এবং বেশ কিছু প্রতিযোগীতা এবং ধাঁধা!

120 রঙ্গীন পাতা **20/-**

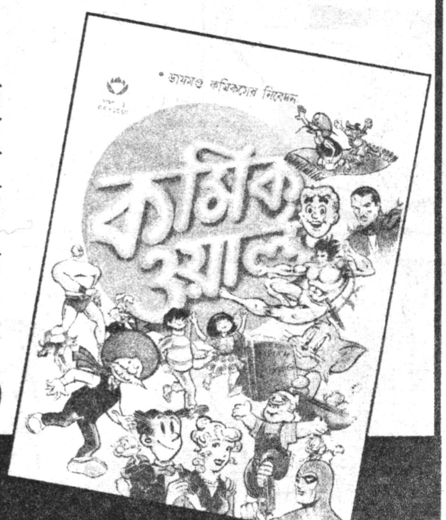

ডায়মণ্ড কমিকস (প্রাঃ) লিমিটেড
এ-11, সেক্টর 58, নয়ডা-201301 (উ.প্র.)

লাট্টুর মাছ ধরা

শহর থেকে দূরে একটি আবাসিক স্কুলে লাট্টু পড়ে। সবসময় ওর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি। তবে হ্যাঁ, পড়াশোনায় ও ভালো। আর মাছ ধরায় ওর জুড়ি নেই। সুযোগ পেলেই নদী কিংবা পুকুর ধারে গিয়ে বসে পড়ে। ওদের হস্টেলের সুপারেনটেনডেন্ট ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করেন না।

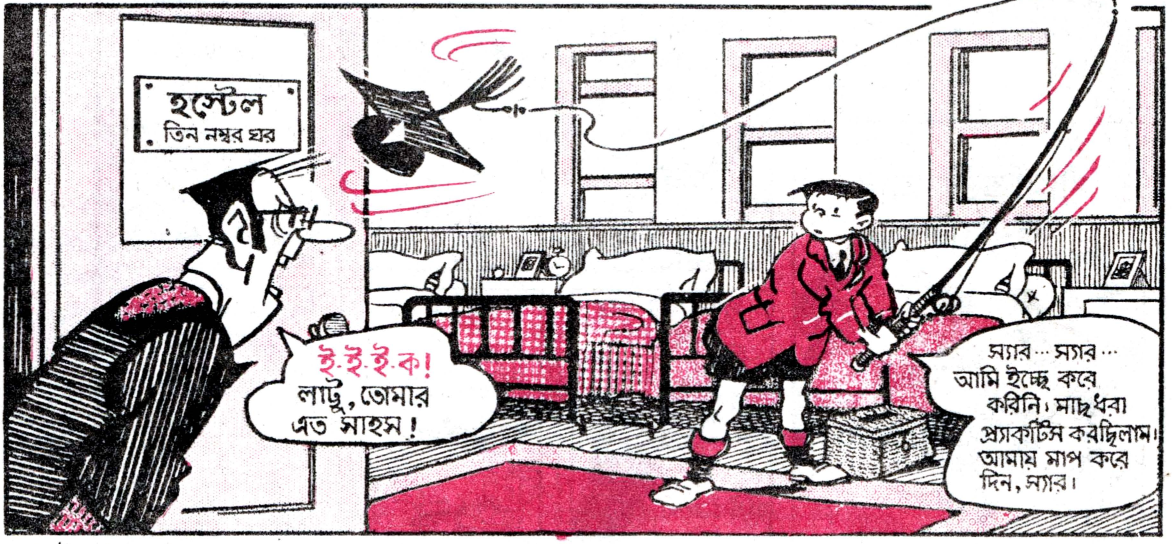

হস্টেল-সুপারের ঘরে……

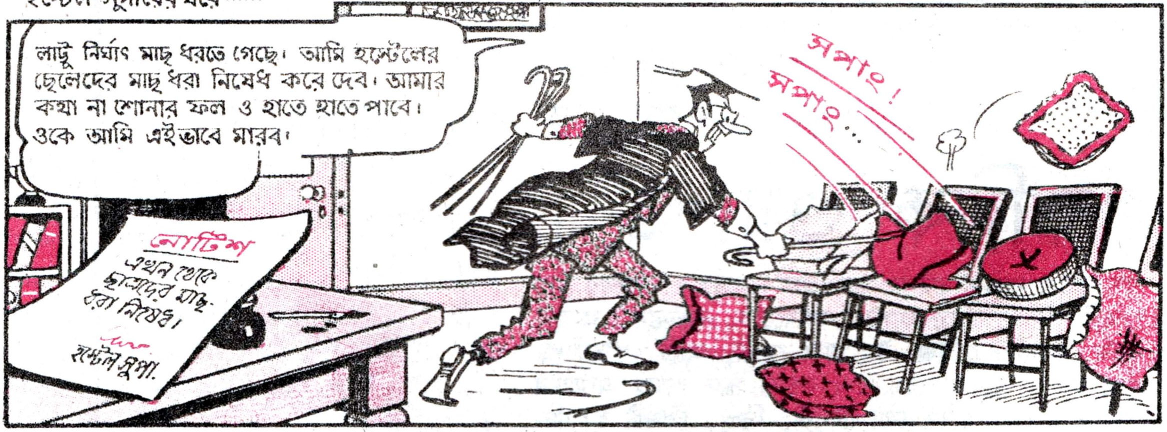

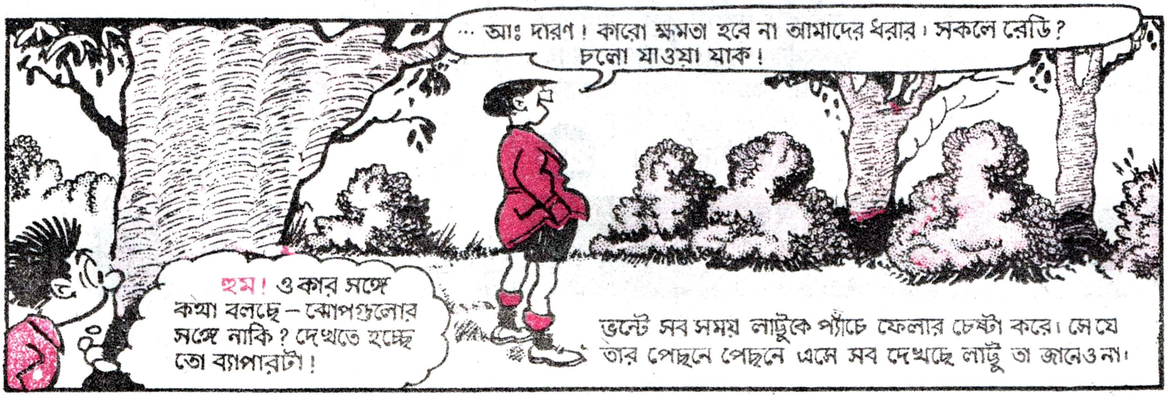

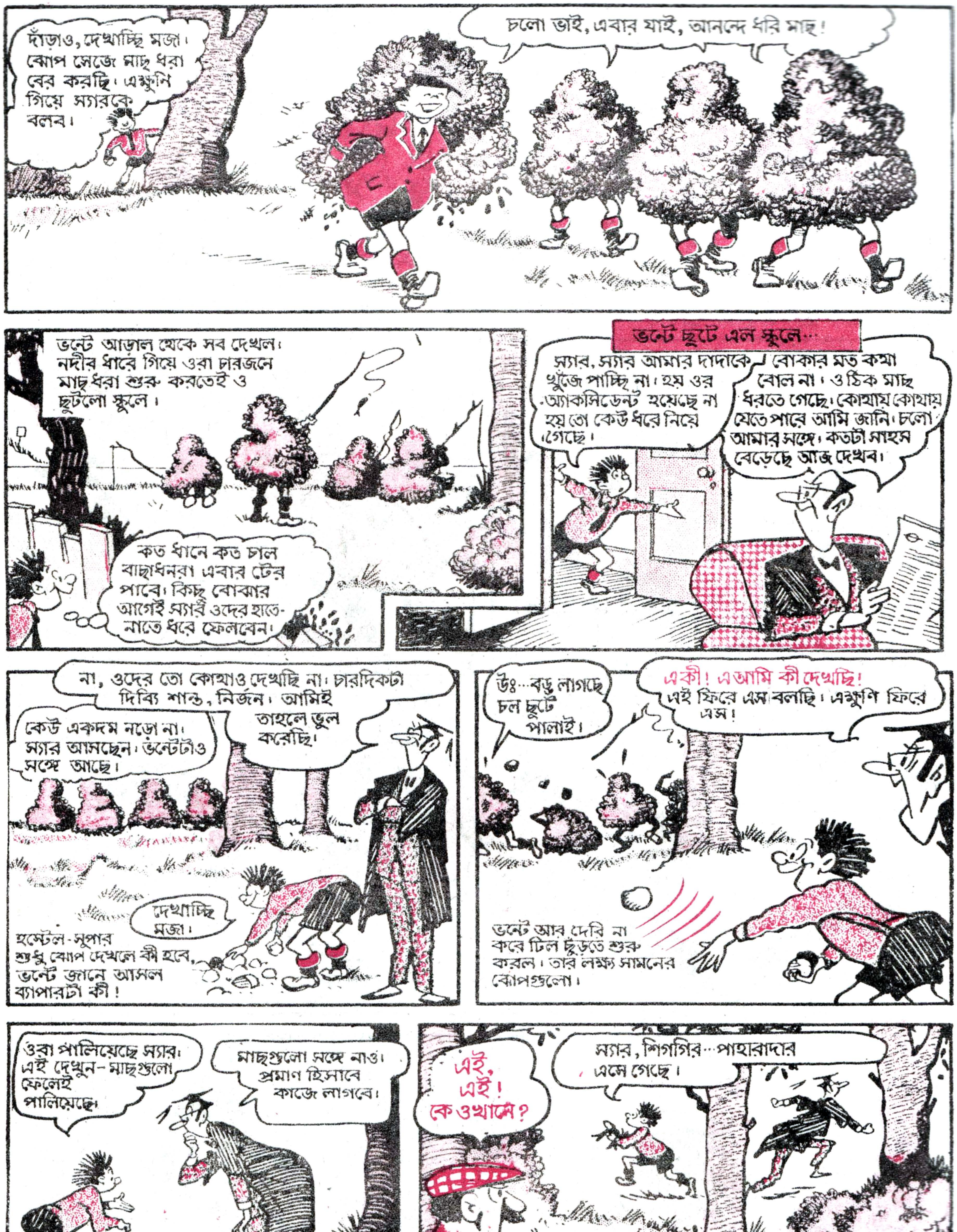

দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। ঝোপ সেজে মাছ ধরা বের করছি। এক্ষুনি গিয়ে স্যারকে বলব।
চলো ভাই, এবার যাই, আনন্দে ধরি মাছ!
ভন্টে আড়াল থেকে সব দেখল। নদীর ধারে গিয়ে ওরা চারজনে মাছ ধরা শুরু করতেই ও ছুটলো স্কুলে।
কত ধানে কত চাল বাছাধনরা এবার টের পাবে। কিন্তু বোঝার আগেই স্যার ওদের হাতে-নাতে ধরে ফেলবেন।
ভন্টে ছুটে এল স্কুলে...
স্যার, স্যার আমার দাদাকে খুঁজে পাচ্ছি না। হয় ওর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে না হয় তো কেউ ধরে নিয়ে গেছে।
বোকার মত কথা বোল না। ও ঠিক মাছ ধরতে গেছে। কোথায় কোথায় যেতে পারে আমি জানি। চলো আমার সঙ্গে। কতটা সাহস বেড়েছে আজ দেখব।
না, ওদের তো কোথাও দেখছি না। চারদিকটা দিব্যি শান্ত, নির্জন। আমিই তাহলে ভুল করেছি।
কেউ একদম নড়ো না। স্যার আসছেন। ভন্টেটাও সঙ্গে আছে।
দেখাচ্ছি মজা।
হস্টেল-সুপার শুধু ঝোপ দেখলে কী হবে, ভন্টে জানে আসল ব্যাপারটা কী!
উঃ...বড্ড লাগছে চল ছুটে পালাই।
একী! এ আমি কী দেখছি! এই ফিরে এস বলছি। এক্ষুণি ফিরে এস!
ভন্টে আর দেরি না করে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করল। তার লক্ষ্য সামনের ঝোপগুলো।
ওরা পালিয়েছে স্যার। এই দেখুন—মাছগুলো ফেলেই পালিয়েছে।
মাছগুলো সঙ্গে নাও। প্রমাণ হিসাবে কাজে লাগবে।
ভন্টে জানে, প্রমাণ-টমাণ নয়—মাছগুলো দিয়ে ওর পেটপুজো হবে।
এই, এই! কে ওখানে?
স্যার, শিগগির...পাহারাদার এসে গেছে।
ভন্টের হাতে মাছ। কিন্তু পাহারাদার ঠিক করল একটা ছোট ছেলেকে না ধরে গোদাটাকে পাকড়াবে।

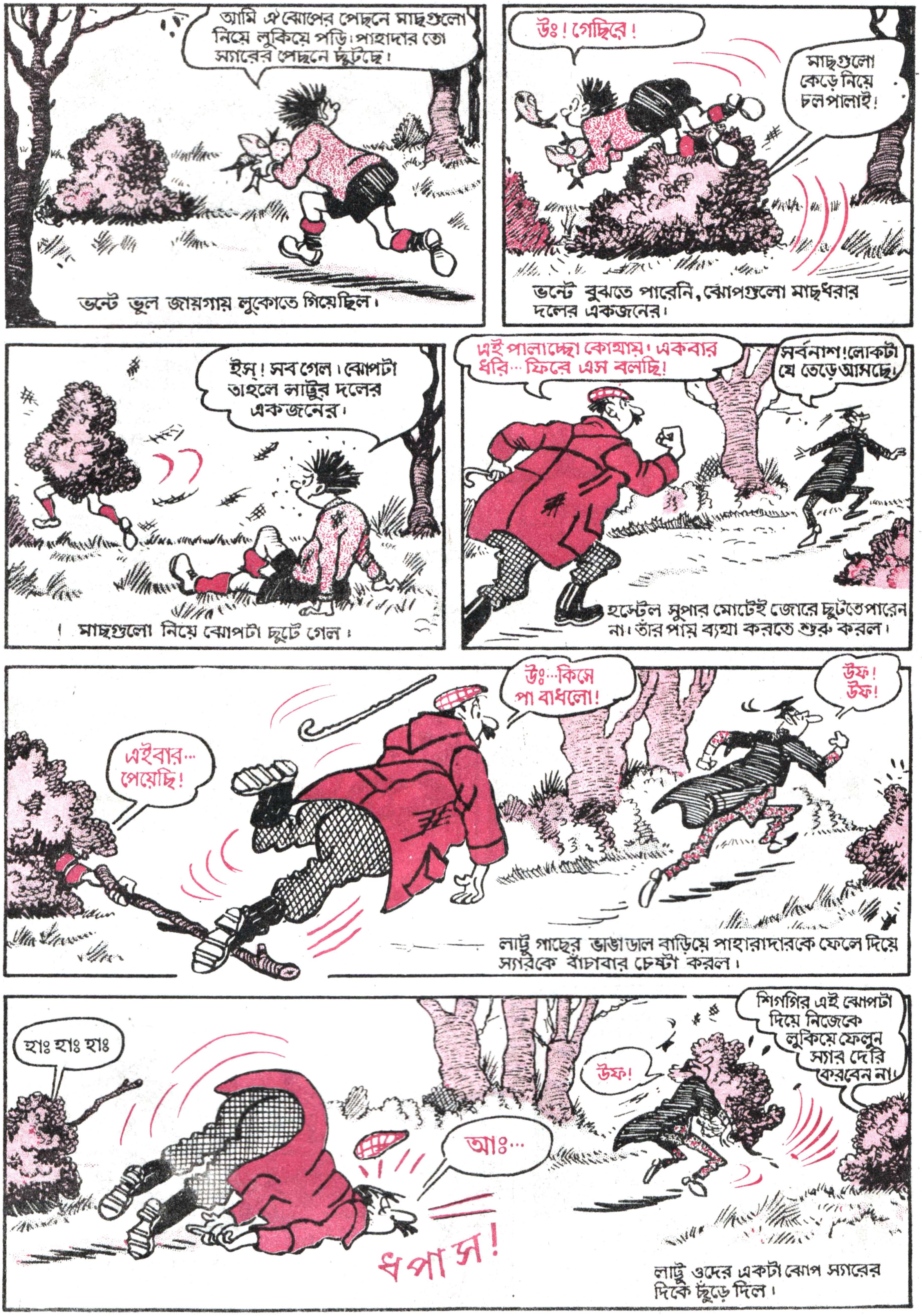
আমি ঐ ঝোপের পেছনে মাছগুলো নিয়ে লুকিয়ে পড়ি। পাহাদার তো স্যারের পেছনে ছুটছে।
ভন্টে ভুল জায়গায় লুকোতে গিয়েছিল।
উঃ! গেছিরে!
মাছগুলো কেড়ে নিয়ে চলপালাই!
ভন্টে বুঝতে পারেনি, ঝোপগুলো মাছধরার দলের একজনের।
ইস্! সব গেল। ঝোপটা তাহলে লাট্টুর দলের একজনের।
মাছগুলো নিয়ে ঝোপটা ছুটে গেল।
এই পালাচ্ছো কোথায়। একবার ধরি... ফিরে এস বলছি!
সর্বনাশ! লোকটা যে তেড়ে আসছে।
হস্টেল সুপার মোটেই জোরে ছুটতে পারেন না। তাঁর পায়ে ব্যথা করতে শুরু করল।
এইবার... পেয়েছি!
উঃ...কিসে পা বাধলো!
উফ! উফ!
লাট্টু গাছের ভাঙাডাল বাড়িয়ে পাহারাদারকে ফেলে দিয়ে স্যারকে বাঁচাবার চেষ্টা করল।
হাঃ হাঃ হাঃ
আঃ...
ধপাস!
উফ!
শিগগির এই ঝোপটা দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলুন স্যার দেরি করবেন না।
লাট্টু ওদের একটা ঝোপ স্যারের দিকে ছুঁড়ে দিল।

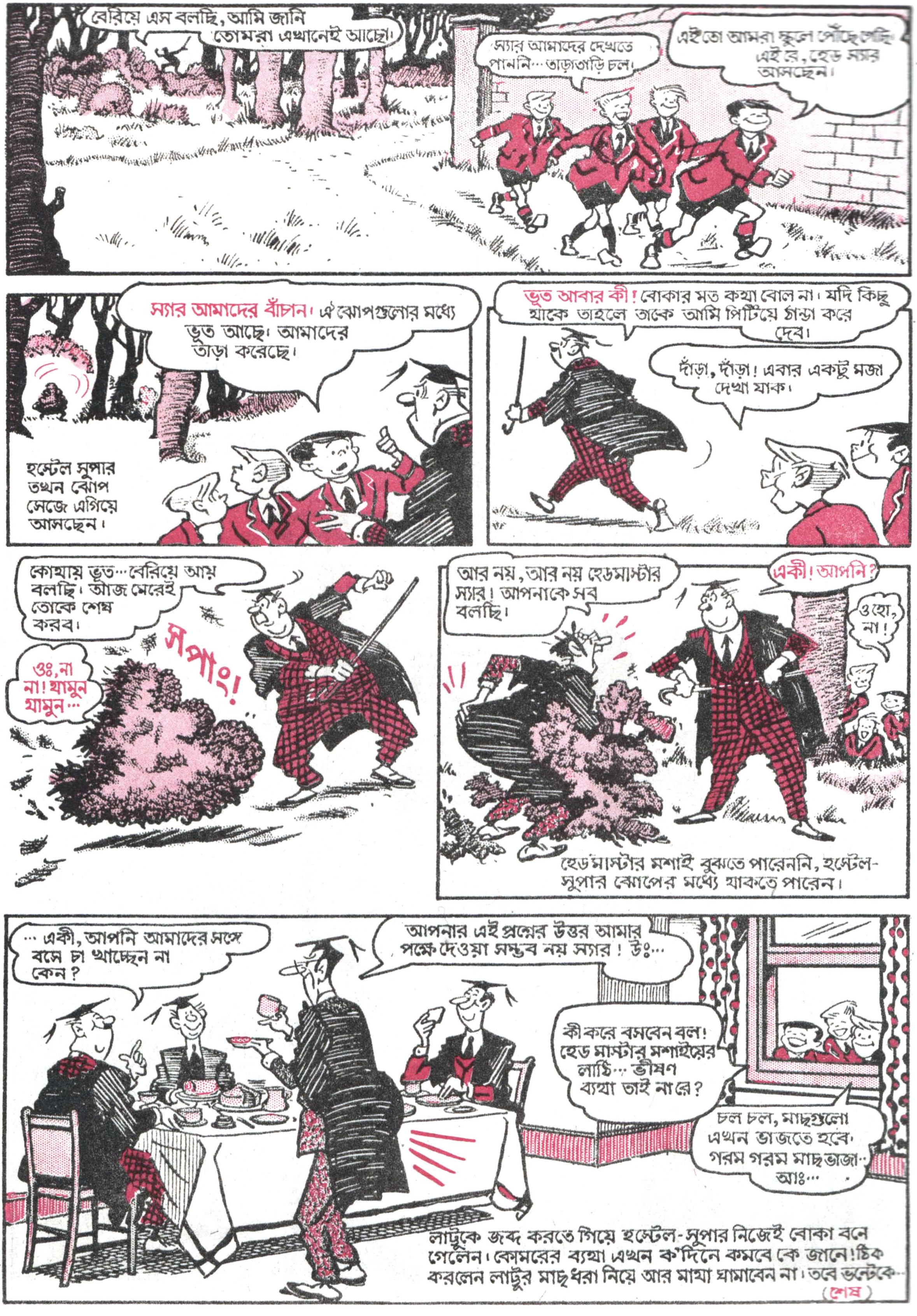
বেরিয়ে এস বলছি, আমি জানি তোমরা এখানেই আছো।
এই তো আমরা স্কুলে পৌঁছে গেছি। এই রে, হেড স্যার আসছেন।
স্যার আমাদের দেখতে পাননি… তাড়াতাড়ি চল।
স্যার আমাদের বাঁচান। ঐ ঝোপগুলোর মধ্যে ভূত আছে। আমাদের তাড়া করেছে।
হস্টেল সুপার তখন ঝোপ সেজে এগিয়ে আসছেন।
ভূত আবার কী! বোকার মত কথা বোল না। যদি কিছু থাকে তাহলে তাকে আমি পিটিয়ে ঠান্ডা করে দেব।
দাঁড়া, দাঁড়া! এবার একটু মজা দেখা যাক।
কোথায় ভূত… বেরিয়ে আয় বলছি। আজ মেরেই তোকে শেষ করব।
সপাং!
ওঃ, না না! থামুন থামুন…
আর নয়, আর নয় হেডমাস্টার স্যার। আপনাকে সব বলছি।
একী! আপনি?
ওহো, না!
হেডমাস্টার মশাই বুঝতে পারেননি, হস্টেল-সুপার ঝোপের মধ্যে থাকতে পারেন।
… একী, আপনি আমাদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছেন না কেন?
আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় স্যার! উঃ…
কী করে বসবেন বল! হেড মাস্টার মশাইয়ের লাঠি… ভীষণ ব্যথা তাই না রে?
চল চল, মাছগুলো এখন ভাজতে হবে। গরম গরম মাছভাজা… আঃ…
লাট্টুকে জব্দ করতে গিয়ে হস্টেল-সুপার নিজেই বোকা বনে গেলেন। কোমরের ব্যথা এখন ক'দিনে কমবে কে জানে! ঠিক করলেন লাট্টুর মাছ ধরা নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। তবে ভন্টেকে…
(শেষ)

জ্ঞানের আলোয় আপনার আনন্দোৎসব দীপ্ত হয়ে উঠুক

জ্ঞান-লাভ ও শিক্ষা- অর্জন — এই দু'টিকে পাথেয় করেই জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, খ্যাতি-সমৃদ্ধি ও মান-সম্মান সহজলব্ধ হয়।

তাই, উচ্চশিক্ষার দুয়ার সকলের জন্য খুলে দিতে স্টেট ব্যাঙ্ক নিয়ে এসেছে "জ্ঞানজ্যোতি প্রকল্প"। প্রয়োজনে ৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষা-ঋণ পেতে পারেন এই প্রকল্পের সহায়তায়। আর, এই ঋণ পরিশোধ করা যায় সহজ কিস্তিতে।

জ্ঞান-জ্যোতি স্কীম

শারদ শুভেচ্ছায়

স্টেট ব্যাঙ্ক

Indo Aryan/98

শুকতারা
৫১ বর্ষ ● শারদীয়া সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪০৫ / সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

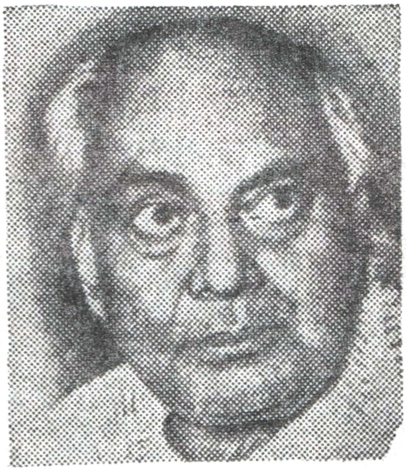

"আবির্ভাব"

হউক আবির্ভূত তোমাদের সাধনায়—
যুগ-যুগ সম্ভব জনগণ যাঁরে চায়।
যত 'দুষ্টু কৌরভ' সুর' ও কংস
সুন্দর সৃষ্টিরে—করিতেছে ধ্বংস
আনন্দ-নন্দন লোক নিরানন্দে
কাঁদি কাঁদে মুরারিয়ে ডাকে আর বন্দে
তোমাদের উদগ্র তপস্যা-বলে আজ
গোলোকের নারায়ণে টেনে আন ধরা-মাঝ।
আবির্ভাবের বাণী শুনুক এ ত্রিভুবন
জাগিয়া উঠুক পুনঃ নিপীড়িত জনগণ।

নজরুল ইসলাম

সৌজন্যঃ রমেন দাস

অপ্রকাশিত গল্প

হাটে হাঁড়ি

আশাপূর্ণা দেবী

গাড়িতে উঠেই সুটকেস আর মিষ্টির হাঁড়িটি বাঙ্কের ওপর তুলে দিয়ে, সবাইকে ঠেলেঠুলে কৌশলে বেশ একটু জায়গা বার করে নিয়ে শুয়ে পড়লেন নিবারণবাবু।

রেলগাড়িতে উঠে শুয়ে পড়ার মতো আরাম আর কি আছে? সেই আরামের আহ্লাদে চোখটি বুজে এসেছিল, হঠাৎ চমক ভাঙল একটা স্টেশনে গাড়িটা এসে থামতে।

নিবারণ তাকিয়ে দেখলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁউ-মাউ করে উঠলেন, 'মিষ্টির হাঁড়িটা! মিষ্টির হাঁড়িটা কই? ছানার জিলিপির হাঁড়িটা আমার!'

কোথায় হাঁড়ি!

নেই!

গলায় ফর্সা ন্যাকড়া বাঁধা চিকন সুন্দর যে হাঁড়িটি এতক্ষণ বাঙ্কের উপর সুটকেসের পাশে বিরাজ করছিল, সেই হাঁড়িটি 'হাওয়া' হয়ে গেছে! বোঝো!

নিবারণ তো চোখে অন্ধকার দেখলেন। মেয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন জিয়াগঞ্জে, সেখানের ছানার জিলিপি বিখ্যাত, ফেরার সময় মেয়ে বাবার সঙ্গে এক হাঁড়ি ছানার জিলিপি দিয়েছে মা-ভাইবোনেদের নাম করে। বিশেষ করে বলে দিয়েছে, 'মা যেন একটু বেশি করে খান বলে দিও বাবা, মা এখানকার ছানার জিলিপি ভালবাসেন।'

বেশি করে খাবার জন্যে বেশি করেই দিয়েছে মেয়ে, ইয়া বড় একটা

হাঁড়ি। সেই হাঁড়ি ভ্যানিশ!

এতেও আর আর্তনাদ করে উঠবেন না নিবারণ, 'আমার হাঁড়ি? মিষ্টির হাঁড়িটা' বলে?

নিবারণের আর্তনাদে গাড়িসুদ্ধু সকলেই চকিত হয়ে ওঠে। এবং একজন ভদ্রলোক বলে ওঠেন, 'সে কি! হাঁড়িটা আপনার নাকি? ওই ভদ্দরলোক যে নামিয়ে নিয়ে গেলেন! ওই যে ওই সাদা পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক!'

'ভদ্রলোক!'

নিবারণ লাফিয়ে ওঠেন, 'পরের জিনিস নামিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তবু আপনাদের তাকে ভদ্রলোক বলতে ইচ্ছে করছে? ছোটলোক। একের নম্বরের ছোটলোক। ইস্টুপিড গাধা বাঁদর বদ!'

একপায়ে একপাটি জুতো আর এক পা খালি, আলগা কাছা গুঁজতে গুঁজতে ঝাঁপিয়ে নেমে পড়েন নিবারণ, গাড়ির এঁরা হাঁ হাঁ করে ওঠেন, 'করছেন কী মশাই, করছেন কী? ট্রেন যে ছেড়ে দিল—'

আর ট্রেন!

নিবারণ তো কোনো বারণ না শুনতেই নেমে পড়েছেন, আর ততক্ষণে গাড়ি বীরবিক্রমে ছুটতে শুরু করেছে।

চুলোয় যাক গাড়ি!

নিবারণ ভাবেন সাদা পাঞ্জাবি পরা সেই ছোটলোকটাকে ধরতেই হবে! পাঁচসেরি ছানার জিলিপি সমেত হাঁড়িটা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারবে না!

হাঁড়ি...সাদা পাঞ্জাবি...সাদা পাঞ্জাবি...হাঁড়ি...হাঁড়ি হাঁড়ি...।

হ্যাঁ হাঁড়িটাকে লক্ষ্যগোচরে আনতে চেষ্টা করেন নিবারণ, কারণ হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল পৃথিবীতে শতকরা আশিজন লোকই সাদা পাঞ্জাবি পরে। এই প্ল্যাটফরমটায় নেমেই নজরে পড়ল। সাদা পাঞ্জাবির স্রোত বয়ে চলেছে যেন।...

অতএব হাঁড়ি...হাঁড়ি...আরে! ওই তো, ওই তো হাঁড়ি, সেই এতখানি পেটমোটা চিকন চকচকে, মুখে ফর্সা ন্যাকড়া বাঁধা...পাঁচজনকে ঠেলে মাটিতে ফেলে দিয়ে, জন আষ্টেককে ধাক্কা মেরে, আর জনা বারোর পা মাড়িয়ে দিয়ে ছুটে এগিয়ে গেলেন নিবারণবাবু, চেপে ধরলেন সেই ছোটলোকের হাতটা। হাঁড়িধরা চুরি-কলঙ্কিত হাতটা।

'বলি পালাচ্ছ কোথায় হে? পালাচ্ছ কোথায়? পরের হাঁড়িটি নামিয়ে নিয়ে দিব্যি ভিড়ে মিশে—'

হাঁড়িধারী প্রথমটা হকচকিয়ে যাবার ভান করে। তারপর রুখে উঠে বলে, 'তার মানে?'

'মানে? এর পরও মানে জানতে চাইছেন? তবে শুনুন দয়াময়। মানেটা অতি প্রাঞ্জল, বুঝলেন? একেবারে জলের মতো সোজা।... আমার এই হাঁড়িটি আপনি ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে বেমালুম হাওয়া হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে—এই হচ্ছে মানে।'

হাঁড়িটা ধরে এক হ্যাঁচকা টান মারেন নিবারণ!

আর বেশ একটা সরগরম কলরব ওঠে সেখানে। উঠবেই তো। হাঁড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ির এমন একটি মজাদার দৃশ্য দেখলে লোক জমে উঠবে না? তারা হাসবে না? হাততালি দেবে না? 'সাবাস দাদা, মারো টান!' বলবে না?

কিন্তু হাঁড়িধারী কাঁচা ছেলে নয়, সেও শক্ত হাতে হাঁড়ি সামলে চোখ গরম করে চেঁচাতে থাকে, 'হাঁড়ি কাড়ছেন মানে? মগের মুলুক নাকি? জানেন অকারণ এসে অপমান করবার জন্যে আমি আপনাকে পুলিশে দিতে পারি?'

'পুলিশ! তুমি দেখাচ্ছ আমাকে পুলিশ? জানো আমার ভাইপোর খুড়শ্বশুর পুলিশ সুপার! এই হাঁড়ি চুরির জন্যে পাঁচটি বছর জেল খাটাতে পারি তোমায়!'

'থামুন থামুন, অনেক জেল দেখেছি, আমায় আর জেল দেখাতে আসবেন না। ছাড়ুন বলছি!'

'ছাড়বো? আমার হকের ধন অমনি তোর কথায় ছেড়ে দেব?'

রাগের চোটে 'তুমি' ছেড়ে তুই ধরেন নিবারণবাবু।

অতএব সেও মহাজনের পথ অনুসরণ করে।

সেও চেঁচাতে থাকে, 'ছাড় বলছি বুড়ো! বেশি ওস্তাদি করলে যে কটা দাঁত আছে দেব সেরে!'

এদিকে লোকের পর লোক জমছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন!...তার সঙ্গে হাসির হুল্লোড়!

'ব্যাপার কি মশাই? হয়েছেটা কি? কার হাঁড়ি কে খেতে চাইছে?'

এরা দু'জন নির্বিকার।

এদের দেখলে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে এরা দু'জন ছাড়া আর কেউ আছে, তা ওরা দেখেনি কোনোদিন!

'দাঁত ভাঙবি? তুই আমার দাঁত ভাঙবি? আমার হাঁড়ি নিয়ে সটকাচ্ছিস্! আবার এত বড় কথা!'

'দেখ বুড়ো ভাল হবে না বলছি! কলকাতায় মাছ খেতে না পেয়ে পেয়ে বাড়িসুদ্ধু সবাই বিধবা হয়ে বসে আছি বলে শালীর বাড়ি বেড়াতে এসে হাঁড়ি ভরে মাগুর মাছ বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আর তুই—'

'মাগুর মাছ? মাগুর মাছ নিয়ে

দমাস করে আছাড় মারে হাঁড়িটাকে।

যাচ্ছিস তুই! ভূতের কাছে মামদো-বাজি? আমার হাঁড়ি আমি চিনি না?'

'ইস রে! ত্রিভুবনে ওই একটাই হাঁড়ি গড়া হয়েছিল কেমন? ছাড় বলছি।'

হাঁড়ি নিয়ে কাড়াকাড়িতে হাত জোড়া, তাই হাতাহাতি হয় না। শুধু বাকযুদ্ধই চলতে থাকে। এবং এতক্ষণে নিবারণবাবু যেন অবহিত হন, পৃথিবীতে আরো লোক আছে। ঘর্মাক্ত মুখে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'শুনুন মশাইরা, মেয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। মেয়ে আদর করে তার মায়ের জন্যে এক হাঁড়ি ছানার জিলিপি দিল, বাঙ্কে তুলে রেখে একটু চোখ বুজেছি, আর ইনি সেটি হাতিয়ে—'

'ছানার জিলিপি? হা হা হা!'

লোকটা তবু লড়ে চলে, 'খুলবো নাকি হাঁড়ির মুখ?'

'খোল না, খোল! দেখি কত সাহস!'

সকলেই বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ খুলুন না। খুলে দেখুন। একজন বলছেন মাছ, একজন বলছেন মিষ্টি। দেখা যাক কে যুধিষ্ঠির!'

সবাই তেড়ে আসে হাঁড়ি খুলতে!

এইবার দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখটাই হাঁড়ি হয়ে ওঠে, 'থামুন মশাই! আমরা ঝগড়া করছি। আপনাদের কী দরকার? হাঁড়ির মুখটি খুলুন আপনারা, আর আমার মাছগুলি লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ুক, কেমন? জলজ্যান্ত বড় বড় মাগুর। বেরিয়ে পড়লে ধরা যাবে আর? কত কষ্টে বলে—'

'মাগুর মাছ! মাগুর মাছ দেখাতে এসেছিস তুই আমায়?' নিবারণ বলেন, 'বুড়ো বলে বড্ড ইয়ে দেখাতে এসেছিস? এই বুড়ো তোকে কিলিয়ে মাগুর মাছ বানিয়ে দিতে পারে তা জানিস? মাগুর মাছ! আমার ছানার জিলিপি তোর হাতে পড়ে মাগুর মাছ হয়ে গেল! দে বলছি—' বলে আর এক হ্যাঁচকা টান দেন নিবারণ!

'ভাঙবি নাকি হাঁড়ি? যত ইচ্ছে টানছিস যে?'

'টানবোই তো! তোর কান টানিনি এই ঢের! খোল হাঁড়ি বলছি। মশাইরা বুঝতে পারছেন?'

সমবেত ব্যক্তিরা বুঝতেই পারে কে পাপী।

ওর যখন হাঁড়ির মুখ খুলতে এত আপত্তি, ওরই গলদ। একসঙ্গে হৈহৈ করে বলে ওঠে কয়েকজন, 'ভেঙেই ফেলুন না দাদু, হাটে হাঁড়ি ভাঙা হয়ে যাক! দেখে চক্ষু সার্থক করি।'

'বটে!' হাঁড়িধারী বাঘের মতো গর্জন আর সাপের মতো নিশ্বাস ছাড়ে। হাটে হাঁড়ি? হাটে হাঁড়ি ভাঙা দেখতে চান আপনারা? তবে এই ভাঙছি!'

বলেই হঠাৎ পরিত্রাহী টানে নিবারণের হাত থেকে হাঁড়িধরা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে লোকটা দু'হাতে উঁচু করে তুলে দমাস করে আছাড় মারে হাঁড়িটাকে!

আর?

আর কি? হাটে হাঁড়ি ভাঙে! এক হাঁড়ি আঁশটে জল ছড়িয়ে পড়ে লোকেদের গায়ে। গোটা কুড়ি মাগুর মাছ এর পায়ের ওপর দিয়ে, ওর গায়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে যে দিকে পারে ছুটে পালায়।

অনেকেই ছুটোছুটি করে তাদের ধরবে বলে। তা তাদের অবিশ্যি একটাকেও ধরা যায় না। ধরা যায় শুধু নিবারণবাবুকে!

না মারা পড়েননি নিবারণ!

পৃথিবীতে এখনো দু'-চারজন দয়ালু লোক আছে বলেই বেঁচে গেলেন। তারাই মার খাওয়া থেকে রক্ষা করলো নিবারণকে। জনতার হাত থেকে আগলে স্টেশন মাস্টারের ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল পরবর্তী ট্রেনের অপেক্ষায়।

আর স্টেশন মাস্টারই বললেন কথাটা।

'আপনি যেমন বলছেন, তেমনি একটা হাঁড়ি নিয়ে সাদা পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক তো বেরিয়ে গেলেন তখন। গিয়ে সাইকেল রিকশায় চাপলেন।'

সাদা পাঞ্জাবি!

সাদা।

এতক্ষণে মনে পড়লো নিবারণের, যার সঙ্গে হাঁড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে এই নাকালটা হলেন এই পর্যন্ত, তার গায়ে নীল রঙের হাওয়াই শার্ট ছিল। হাঁড়ি চোখে পড়তেই বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে নিবারণ—

কিন্তু মনে পড়া কি শেষ হলো?

আরও কিছু কি মনে পড়তে বাকি ছিল না?

ছিল।

সেটা মনে পড়লো আবার ট্রেনে চড়ার সময়। মনে পড়ে বুকটা খালি হয়ে গেল। খাঁ খাঁ করা খালি।

সুটকেস!

সুটকেসটা সেই আগের ট্রেনে চড়ে চলে গেছে। সেই সঙ্গে এক পাটি জুতোও।

খালি পায়ে বাড়ি ঢুকতে হলো। রাস্তা থেকে নতুন জুতো কিনে নিয়ে পরে যাবেন, সে বাসনা আর হলো না। ভেবেছিলেন, 'সিঁড়ির নিচে রেখে এসেছি' বলে গিন্নীর চোখ এড়াবেন, কিন্তু হলো না। নিবারণ গিন্নী বড় সোজা গিন্নী নন। তিনি দেখেই চোখ গোল করে বললেন, 'জুতো?'

অতএব নিবারণকে বানাতে হলো, 'পায়ে কাঁটা ফুটেছিল।'

'ওমা! কাঁটা আবার কোথায় পেলে? কাঁটাবনে বেড়াচ্ছিলে নাকি? তা কাদাসুদ্ধু জুতোটাই সুটকেসে ভরেছ বুঝি? ওমা কোথায় সুটকেস?'

নিবারণ কি বলবেন, 'সুটকেস হারিয়ে এলাম!'

উঁহু, এখন নিবারণ কেবল গল্প বানাবেন। তাই সোজা বলে দেন, 'রেখে এসেছি।'

'রেখে এসেছ?'

'হুঁ, কে অত বোঝা বয়? অনু যখন আসবে আনবে।'

নিবারণ গিন্নী তো অবাক। 'সুটকেসটা এত বোঝা হলো? তা অনু কিছু দিল না সঙ্গে? মিষ্টি-ফিষ্টি?'

নিবারণ রেগে লাল হবার ভান করলেন। বললেন, 'দিলে আর নিয়ে আসতাম না? ফেলে দিয়ে আসতাম?'

'না তাই বলছি—ওখানের ছানার জিলিপি এত ভালবাসি আমি অনু জানে—'

নিবারণ গম্ভীরভাবে বলেন, 'নিজের সংসার হয়ে গেলে মেয়েদের অত মনে থাকে না মা কবে কি ভালবাসতো!'

'কবে কি গো? ও যখনই আসে তখনই তো—কে? কে দরজায় কড়া নাড়ছে? ঝি এল বুঝি?'

নিবারণ গিন্নী উঠে যান। আর একমিনিট পরেই হাঁক পাড়েন, 'শুনছো, এদিকে এসো একবার!'

নিবারণ যান!

নিবারণ গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।

দরজার সামনে আগের রেলের এক ভদ্রলোক! তাঁর হাতে নিবারণের সুটকেস!

ভদ্রলোক নিবারণকে দেখেই হৈ হৈ করে ওঠেন, 'কী মশাই, পেয়েছেন ছানার জিলিপির হাঁড়ি?...সুটকেস ফেলেই তো হাঁড়িচোরের পিছনে ছুটলেন! যাক ধরেছেন চোর?'

নিবারণ চুপ!

নিবারণ গিন্নীই ভদ্রলোকের সামনে মান রাখেন, গম্ভীরভাবে বলেন, 'না, পেলেন আর কোথায়?'

'পেলেন না? কষ্টই সার? ও একবার যখন হাতের বাইরে চলে গেছে! তা আপনার এই সুটকেসটিও যেত, আমিই বুদ্ধি করে নিজের কাছে রাখলাম। দেখেছিলাম আপনার নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে গায়ে। তাই ভাবলাম পৌঁছেই দেব। বাড়ি ফিরে স্নান সেরে একটু চা খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি। আপনি বুঝি পরের ট্রেনটায় এলেন?...নিন! ধরুন!'

নিবারণ কলের পুতুলের মতো এগিয়ে যান, সুটকেসটা নেন। আস্তে বলেন, 'ধন্যবাদ!'

ভদ্রলোক চলে যান।

আর যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিবারণ গিন্নী বলে ওঠেন, 'ধন্যবাদ! কোটি কোটি ধন্যবাদ তোমাকে!'

তাঁর চোখ দিয়ে যা আগুন ঝরে, তাতে সেকাল হলে নিবারণ ভস্ম হয়ে যেতেন। একাল বলেই বেঁচে গেলেন।

কিন্তু বাঁচলেন কি?

ছবিঃ বিজন কর্মকার

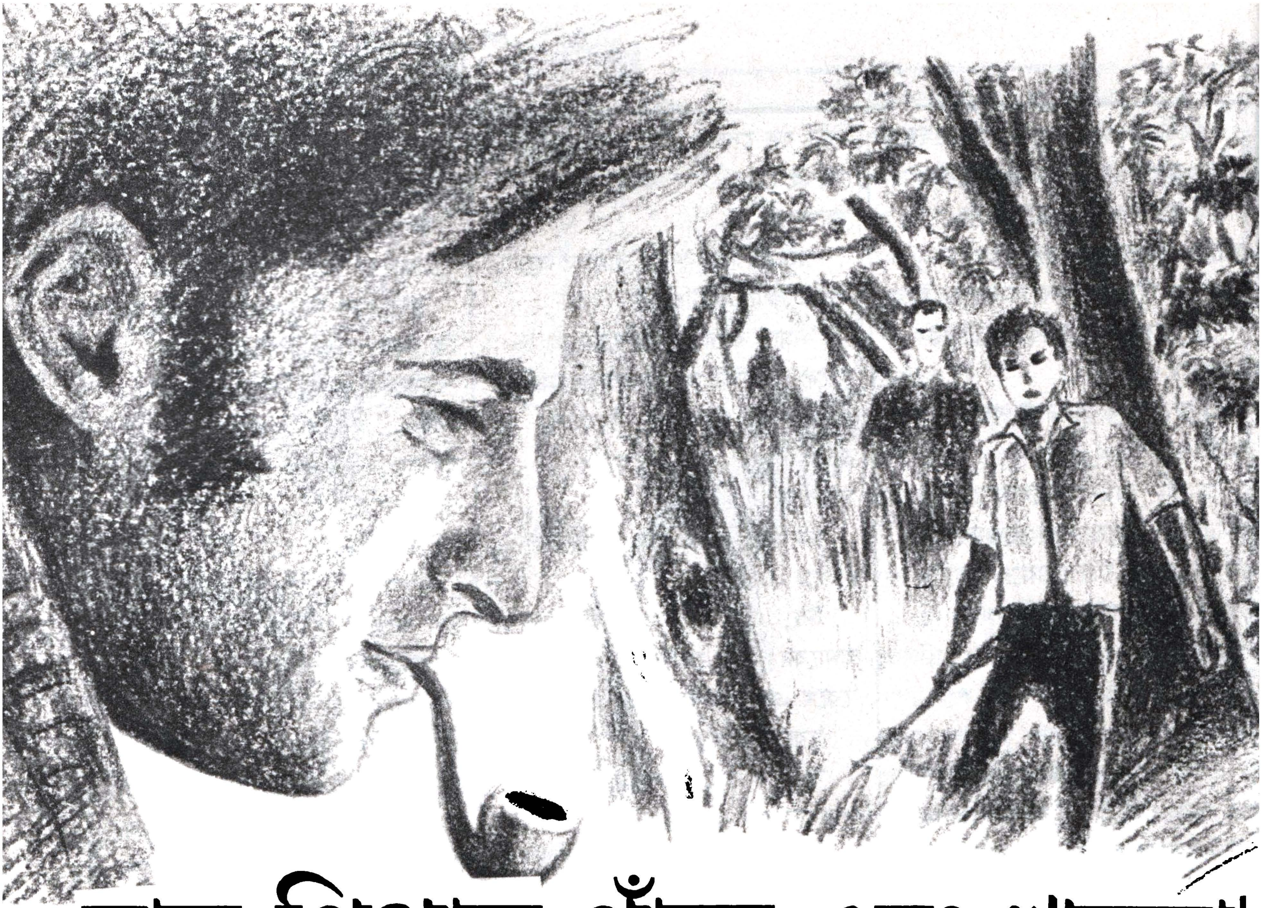

ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে এবং ঋজুদা

বুদ্ধদেব গুহ

ঋজুদার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে আমাদের সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। ভারত মহাসাগরের স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে জলদস্যুদের পুঁতে রাখা গুপ্তধনের মালিকানা নিয়ে যে খুনের পর খুন হয়েছিল তারই কিনারা করে আমরা ফিরে আসার পরই এই জমায়েত। আমাদের সাকসেস সেলিব্রেট করার জন্যে। তিতির যদিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারেনি স্যেশেলস দ্বীপপুঞ্জে কারণ সে তখন দিল্লীতে ছিল; ও এসেছিল সেই সন্ধ্যাতে ঋজুদার বাড়িতে বিশেষ অতিথি হিসেবে।

আজ রাতের মেনুতে গদাধরদার করণীয় কিছুই নেই। হাজারীবাগের আজ্জু মহম্মদ তার বাবুর্চিসমেত হাজির। আজ মোগলাই খানা। মাটন বিরিয়ানি, মধ্যে বটি কাবাবের গোল গোল বটিকা। গুলহার কাবাব, চিকেন চাঁব, পাঁঠার তেলের চৌরী, লাব্বা, পায়া আর কবুরার চচ্চড়ি। মাটন রেজালা, সিনা ভাজা। এক এক পদ খাবার শেষ হতে না হতে হামদর্দ দাবাইয়াঁ কোম্পানির এক এক বটি পাচনল। সমস্ত গুরুপাক খাদ্য নিমেষে হজম করানোর জন্যে।

বিরিয়ানির হাণ্ডি বসেছে রান্নাঘরে। উমদা বিরিয়ানি রান্না করাটাই শুধু আর্ট নয়, সেই বিরিয়ানি হাঁড়ি থেকে পরতে পরতে বের করাও, যাকে বলে "হাণ্ডি নিকালনা" একটা বিশেষ আর্ট।

গদাধরদার ওসব অ-হিঁদু রান্নাবান্নাতে ঘোর আপত্তি। সে রান্নাঘরের বাইরের দিকে বারান্দাতে হাওড়া স্টেশনের কুলিরা ট্রেন না - থাকলে যেমন করে কোমর, আর মাটি থেকে তোলা দু'পায়ে গামছা কষে-বেঁধে বসে আরাম করে—যেমন করে বসাকে শ্রীমান ভটকাই নাম দিয়েছেন "পোর্টার আসন"—(যোগাসনের তালিকায় তার নবতম অবদান) তেমন আসনে বসে প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে দু'ঠ্যাং দোলাচ্ছে আর গুন- গুন করে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সুরে গাইছে এবং তারই মাঝে মাঝে গুণ্ডি পানের লাল তরলিমা পাশের পিকদান-এ পিচকিরির রঙের মতনই ছুঁড়ছে।

আমরা সবাই ঋজুদাকে ঘিরে বসে গল্প করছি। তিতির আফসোস করছে স্যেশেলস-এর সুন্দর দ্বীপপুঞ্জে আমাদের সফল অ্যাডভেঞ্চার এবং রহস্য উদঘাটনের সঙ্গী হতে পারেনি বলে।

ভটকাই যেন তিতিরের জ্যাঠামশাই, এমনি করে বলল, শুধু কেতাবী বিদ্যেই সব নয় জীবনে, বুঝেছো তিতির দেবী, স্কোয়ার হতে হয়, স্কোয়ার। এ স্কোয়ার পেগ ইন এ রাউন্ড হোল।

আমরা সকলেই ভটকাই-এর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলাম।

ভটকাই বোকার মতন বলল, কী হলো? তারপর তার দু'কান লাল হয়ে গেল। সে বলল, ভুল বললাম?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। কোনো স্কোয়ার খোঁটা কি গোল গর্তে পোঁতা যায়? আর স্কোয়ার হওয়ার সঙ্গে স্কোয়ার পেগ-এরই বা সম্পর্ক কি?

ভটকাই বলল, সরী সরী ভুল হয়ে গেছে।

ওর ক্ষমা চাওয়ার কায়দাতে আমরা আবারও হেসে উঠলাম।

তিতির বলল, তাছাড়া ভটকাই, ইংরেজীতে 'এ' বললে যাঁরা ইংরেজ, অথবা যাঁরা ইংরেজী জানেন, তাঁরা বুঝতেই পারবেন না। 'এ' হচ্ছে বাঙালী ইংরেজী। A'র উচ্চারণ সবসময়েই "আ"। এটা মনে রাখবে।

ভটকাই নিজের অপ্রতিভতা কাটিয়ে উঠে বলল, ও ঋজুদা! মোগলাই খানা খাওয়ার নেমন্তন্ন করে এনে স্পোকেন ইংরেজীর ক্লাসে ঢুকিয়ে দেবে জানলে আমি আসতামই না।

আমি বললাম, শেখার আবার স্থল-অকুস্থল কি রে! যার শেখার ইচ্ছে আছে সে চিতাতে উঠতে উঠতেও শেখে।

ঋজুদা আজ্জু মহম্মদকে জিগ্যেস করল, তোমাদের সীমারীয়ার সেই ডাকাত—রবিনহুড পিপ্পাল পাণ্ডে কেমন আছে? জেল থেকে ছাড়া কি পেয়েছে?

জী হাঁ। তিন সাল হো গয়ে।

কত বছর জেল খাটল যেন?

পঁদরো সাল।

আমাকে খুন করার কথা কিছু বলেছে না কি? জেলে যাবার আগে তো শাসিয়েছিল।

তা শাসিয়েছিল। কিন্তু ফিরে এসে সে তোমার চেলা হয়ে গেছে।

ডাকাত হলো আমার চেলা! সেটা কি গুরুর পক্ষে খুব আহ্লাদের কথা?

ঋজুদা বলল।

ভটকাই ফুট কাটল: গুরুর অন্য চেলাদের পক্ষেও আহ্লাদের নয়।

বললাম, কেন?

বাঃ রে! আমরা সকলেই যে তাহলে দাগী-আসামী বলে গণ্য হব সকলের চোখেই।

ভটকাই ব্যাখ্যা করে বলল।

ঋজুদা বলল, তা কেন? একবার অপরাধ করেছে বলে বা কিছু সময় ধরে লাগাতার অপরাধ করেছে বলেই কি সেই মানুষ চিরদিনই অপরাধী বলে গণ্য হবে? পরিবর্তন তো সব মানুষের মধ্যেই আসতে পারে। সব মানুষই তো বদলায়। বদলানোটা ভালর দিকে হলেই তো ভাল। তাছাড়া, পিপ্পাল পাঁড়ে মানুষ খুন করে থাকতে পারে অনেক, কিন্তু যাদের সে খুন করেছে তাদের তো কোনোমতেই ভাল মানুষ বলে গণ্য করা যায় না। যে - সমাজে খারাপ মানুষদেরই জয়জয়কার, আইন যেখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আমল থেকে আজ অবধিও এমনই এক তামাশা হয়ে আছে যে, শুধুমাত্র বড়লোকদের পক্ষেই তা দেখা সম্ভব, সেই দেখে যদি কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে বাধ্যই হয় অন্যের উপরে ঘটে-যাওয়া অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্যে, নিজের লাভ বা লোভের জন্যে নয়, সেই মানুষকে আমি তো খারাপ বলতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ পড়িসনি? তিনি বলেননি কি? "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে"। যে মানুষ বা মানুষেরা অন্যায় নির্বিবাদে সহ্য করে তারা সকলেই অন্যায়কারীর সমানই দোষী।

তিতির এতক্ষণে মুখ খুলল, বলল, ঋজুকাকা এই পিপ্পাল পাঁড়ে লোকটি কে? এর কথা তো আগে শুনিনি।

এসব অনেকদিন আগের ঘটনা। যখন আমি আর আমার জঙ্গলের বন্ধু গোপাল নিয়মিত হাজারীবাগে যেতাম, তোরা হয়তো তখন জন্মাসইনি, সেই সময়কার ঘটনা।

ইসস। আমাদের সঙ্গে দেখা হলে কী ভালই না হতো।

তিতির বলল।

আজ্জু মহম্মদ, হাজারীবাগের মহম্মদ নাজিমের বড় ছেলে, বলল, ক্যা বোল রহি হ্যা বেটি। জানসে বাঁচ গয়ী তুম যো পিপ্পল পাঁড়েসে নেহি ভেটিন। ইকদফে হামকো মিলাথা পুরানা চাতরাকি রাস্তেমে। ইয়া আল্লা! চার পায়েরসে সাইকিল চালাকর বহুত মুসকিলসে জান বাঁচাকর পিচ রোডমে আকর পৌঁছা। অভিভি ইয়াদ আনেসে জী ঘাবড়াতা হ্যায়।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কখনও ঋজুকাকা?

তিতির শুধোলো।

নেহি ভেটনেসে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েকো পাকড়া কৈইসে ঋজুবাবুনে!

তাহলে আমাদের বলো না ঋজুকাকু ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হওয়ার কথা।

এমন করে বলছ তিতির যেন ঋজুদার সঙ্গে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের বিয়েই হয়েছে। যেন শুভদৃষ্টি!

ভটকাই-এর ইয়ার্কিতে আমরা সকলে তো হেসে উঠলামই, আজ্জু মহম্মদও হেসে উঠল জোরে। তার মুখে জর্দাপান ছিল। সুগন্ধি পানের রস ছিটকে গিয়ে লাগল ভটকাই-এর কপালে। আমরা ওর হেনস্থা দেখে আরেকবার হেসে উঠলাম।

আজ্জু মহম্মদ লজ্জা পেয়ে বলল, আমি একটু বাওয়ার্চিখানাতে যাচ্ছি। আজমল বাবুর্চিকে বলেছিলাম আগে ফিরনীটা বানিয়ে রাখবে, দেখি, গিয়ে কী করল।

তিনি হিন্না আতরের গন্ধ ঘরে রেখে চলে গেলেন রান্নাঘরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা চেপে ধরলাম ঋজুদাকে।

পাইপটা ধরিয়ে ঋজুদা বলল, কী যে বলব! এতে বাহাদুরীর কি আছে জানি না।

আহা! বলোই না।

আমরা সমস্বরে বললাম।

ঋজুদা মিনিট দু'তিন ফিল-করা পাইপটাতে টান লাগিয়ে বলল, তখন তো আমরা ছাত্র। হাজারীবাগের বরহি রোডে গোপালদের ছবির মতন বাড়িতে আছি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝির কথা। হাজারীবাগ শহর থেকে যে লালমাটির পথটা চলে গেছিল গোরস্থান, বনাদাগ, গোন্দা বাঁধ, টুটিলাওয়া, সীমারীয়া হয়ে বাঘড়া মোড়, সেই পথে তখন ঝুঁগুকে-ঝুঁগু ময়ূর দেখা যেত। তিতির-বটেরের তো দেখাদেখি ছিল না। তাছাড়া ভাল্লুকেরও আড্ডা ছিল সে

অঞ্চলে। কেন? তা বলতে পারব না।

ময়ূর না ন্যাশানাল বার্ড! মারা তো বারণ।

ন্যাশনাল বার্ড ডিক্লেয়ার্ড হয়েছিল ষাটের দশকের গোড়াতে অথবা পঞ্চাশের দশকের শেষে। তখন মারাটা বে-আইনী ছিল না। ঐ পথটা ছিল করোগেটেড টিনের মতো। প্রতি দু'ইঞ্চি বাদে বাদে ঢেউ উঠেছিল পথে। সাইকেলে বা গাড়িতে সে পথে যাওয়া বিস্তর অসুবিধার ছিল। তাই আমরা আগের দিন বিকেলের বাসে বন্দুক-কাঁধে করে চড়ে পড়ে টুটিলাওয়াতে নেমে পড়ে গোপালের বন্ধু ইজাহারুল হক-এর ডেরাতে গিয়ে পৌঁছলাম। ইজাহারুল নিজেও খুব শৌখিন মানুষ ছিল এবং ভাল শিকারীও। থাকত অবশ্য হাজারীবাগে কিন্তু টুটিলাওয়াতে অনেক জমিজমা ছিল। জোতদার যাকে বলে। বাস থেকে নামতে নামতে সন্ধ্যে। নাজিম সাহেব খিচুড়ির ইন্তেজাম করে ফেললেন। ফারস্ট-ক্লাস খিচুড়ি, সঙ্গে ইজাহারের খিদমদগারের যোগাড় করা খাঁটি ঘি, বেগুনের ভাত্তা, কাঁচা লঙ্কার আর পেঁয়াজের কুচি দেওয়া, আলুরও ভাত্তা। উপাদেয়। এই সব আজমল-ফাজমল নাজিম সাহেবের ধারে-কাছে আসত না বাওয়ার্চি হিসেবে আজ নাজিম সাহেব বেঁচে থাকলে।

ভটকাই নাকটা উপরে তুলে ল্যাব্রাডার গান-ডগ-এর মতন গন্ধ শুঁকলো বার তিনেক। তারপর স্বগতোক্তি করল, আমাদের আজমল মিঞাতেই চলবে ঋজুদা। বিরিয়ানির যা খুশবু ছেড়েছে না! আহা। এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল।

আমরা সকলেই হেসে উঠলাম ওর কথা শুনে।

তিতির বলল, ভটকাই বড় ইন্টারাপ্ট করে। বলো তো ঋজুদা।

হ্যাঁ। পরদিন অন্ধকার থাকতে থাকতে আমরা আমাদের বন্দুক আর গুলির বেল্ট নিয়ে, মাথায় টুপি চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম তিনজনে তিনদিকে। কথা হলো যে সকাল আটটাতে যেখানে টুটিলাওয়া থেকে চাতরাতে যাওয়ার পুরনো পথটা বেরিয়ে গেছে, সেই মোড়ে এসে জমায়েৎ হব। সেখানে নিজামুদ্দিনও উপস্থিত থাকবে তার দলবল নিয়ে। শিকার করা পশু ও পাখি, যদি পাওয়া যায়, কুড়িয়ে নিয়ে আসবে বনে গিয়ে।

নাজিম সাহেব বললেন আমাকে চাতরার পুরনো পথে যেতে কারণ সেদিকে ভাল্লুক বাবাজীর সঙ্গে মোলাকাৎ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একজোড়া অতিকায় ভাল্লুক নাকি সেই পথে মৌরসী-পাট্টা গেড়ে আছে। তবে বহতই খতরনাগ তারা। যদিও সে পথ এখন পরিত্যক্ত কিন্তু যদি কেউ কখনও যায় কোনো কাজে, ছোটখাটো ঠিকাদার, ফরেস্ট-গার্ড, জঙ্গলের কূপ-কাটনেওয়ালা তবে তাদের কারো নাক, কারো কান, কারো চোখ খুবলে নেয়। কখনও কখনও বিনা নোটিসে "রে রে" করে তেড়ে এসে কুস্তিও লড়ে। যতই 'খেলব না' 'খেলব না' করে কেউ চেঁচাক আদৌ শোনে না। যার সঙ্গে কুস্তি লড়ে তাদের সর্বাঙ্গ ফালা ফালা হয়ে যায়। প্রাণ থাকে না।

নাজিম সাহেব বললেন, সামহালকে যাইয়ে গা।

আরে তখন আমার যা বয়স আর যা শরীর তাতে স্বয়ং যম কুস্তি লড়তে এলেও তাকে কাবু করে দেবার হিম্মত রাখি। ভয় ব্যাপারটা শিশুকাল থেকেই আমার চরিত্রানুগ নয়। তাই বললাম, বে-ফিক্কর রহিয়ে।

নাজিম সাহেব তখন বললেন, আপকি বত্রিশ ইঞ্চি ব্যারেলকা গ্রীনার বন্দুক হ্যায় ঔর আপকি নিশানা ভি বঢ়িয়া—ভাল কি লিয়ে কুছভি ফিক্কর নেহি মগর ইস রাস্তাহি কি আসপাস ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ে আভভি ছিপা হুয়া হ্যায়।

সে আবার কে? পিপ্পাল পাঁড়ে?

ইয়া আল্লা! দশদিন হলো হাজারীবাগে এসেছেন অথচ ডাকু পিপ্পাল পাঁড়ের নাম শোনেননি?

না তো!

আমি আকাশ থেকে পড়ে বললাম।

অজীব বাত।

তারপরই বললেন, যোভ্‌ভি হো। সামহালকে রহিয়ে গা। বহতই খতরনাগ হ্যায় উ ডাকু। পুলিশ কুছ নেহি কর পায়া হ্যায়। বহতই আদমীকো জানসে মার ডালা।

নাজিম মিঞার মুখে সে কথা শোনার পর আমার ভাল্লুক শিকারের শখ টিমে হয়ে গিয়ে পিপ্পাল পাঁড়ে শিকারের সাধটা চেগে উঠল।

তারপর?

তিতির বলল।

তখনও অন্ধকার ছিল। বেশ ঠাণ্ডা। তখন হাজারীবাগ জেলার ঠাণ্ডা যে কেমন ছিল তা আজ তোরা বুঝবি না। আজ থেকে কত বছর যে আগের কথা। বন-জঙ্গল ছিল নিবিড়। ভারতে তখন গিনিপিগ-এর মতন মানুষের বংশবৃদ্ধি হয়নি।

ভটকাই বলল, তোমরা তখন কত বড়?

আমরা তো তখন স্কুলের ছাত্র। ক্লাস এইটে না নাইনে পড়ি। ঠিক মনে নেই।

কী দুঃসাহস!

তিতির স্বগতোক্তি করল।

ভটকাই বলল, কী ওয়ান্ডারফুল বাবা-মা পেয়েছিলে ভাবো একবার। দুধের ছেলেদের একে ভাল্লুক তায় ডাকাতের মুখে ছেড়ে দিয়েও তাঁরা নির্বিকার। আমাদের আর কী হবে! রবীন্দ্রনাথ সেই বলেছিলেন না? রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি—সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী।

উল্টো বললি।

আমি বললাম।

ঐ হলো। সোজা করে নে তাহলেই তো হলো, না কি!

তারপর? বলো ঋজুদা।

এই ভটকাই, শাট-আপ।

তিতির ধমক দিল।

ইয়েস। বলল ভটকাই, শাটিং-আপ।

আলো ফুটছে আস্তে আস্তে পুবের আকাশে। তবে তখনও কুয়াশা আছে ভারী হয়ে। দিনের পাখিরা জাগছে একে একে। থ্র্যাশার, ব্যবলার, কপারস্মিথ, টিয়া, টুই, মুনিয়া, মিনিভেট।

বনমোরগের ডাকে চারদিক তো সরগরমই। তিতিরের টিটর টিটর, ময়ূরের কেঁয়া-কেঁয়া, কালি তিতিরের টুঙ টুঙ। তারও আগে জেগেছে, বনমোরগেরও আগে, র‍্যাকেট টেইলড

ড্রঙ্গোরা—কাঁচের বাসন ভাঙার মতন স্বর নিয়ে। সারারাত বন-পাহারা সেরে রেড-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ টিটিটি-হুট-টিটিটি-হুট-হুট-হুট করে ডাকতে ডাকতে চলে যাচ্ছে পানুয়ানা টাঁড়ের দিকে।

যদিও খুব শীত, তবু কিছুটা চলতেই শরীর গরম হয়ে উঠল। আমার গায়ে একটি ছাই-রঙা ফ্ল্যানেলের জার্কিন। আস্তে আস্তে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দু'দিকে নজর রাখতে রাখতে চলেছি কারণ এই সময়েই মাংসাশী প্রাণীরা, যেমন বাঘ, চিতা রাতের টহল সেরে নিজের নিজের ডেরায় ফেরে।

এমন সময় আমার থেকে বেশ কিছুটা সামনে মানুষের গলার স্বর পেলাম। তবে দেখা যাচ্ছিল না কিছুই। একে আধো-অন্ধকার তায় পথটা কিছুটা সামনে গিয়েই বাঁক নিয়েছে বাঁদিকে। এখন বসন্তও নয়, গ্রীষ্মও নয় যে, মেয়ে ও শিশুরা মহুয়া কুড়োতে আসবে জঙ্গলে। এই সময়ে, আধো-অন্ধকারে কারোই জঙ্গলের গভীরের এই পরিত্যক্ত, দিনমানেই নির্জন পথে আসার কথা নয়, আমাদের মতন শিকারী অথবা ডাকাত-টাকাত ছাড়া। তাই কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে পথের বাঁ পাশের একটা ঝাঁকড়া আমলকী গাছের পেছনে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম, যারা কথা বলছে তাদের গলার স্বর ক্রমশই চড়ছে। তারপরই একটা আর্তচিৎকার শুনলাম এবং পরক্ষণেই ধ্বপ ধ্বপ করে মানুষের দৌড়ে আসার আওয়াজ এদিকে। আমি বন্দুকে তাড়াতাড়ি ডানদিকের ব্যারেল-এ একটি বল ও বাঁদিকের ব্যারেলে একটা এল. জি. পুরে নিয়ে গাছটার আড়াল নিয়ে স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে পড়লাম বন্দুক রেডি-পজিশানে রেখে। পাঁচ সেকেন্ডও কাটেনি এমন সময়ে একটি তীব্র আর্তচিৎকার কানে এল এবং একটি অট্টহাসি। মনে হলো কেউ কাউকে জোরে লাথি মারল বা ধাক্কা দিল আর মুখে বলল, যা, যা, কামিনা, তুরন্ত ভাগ তোরা জান লেকর। আজ স্রিফ তোহর কানই কাট লিয়া, ফিন কভ্ভি বদতমিজী কিয়াতো জানহি লে লুঙ্গা।

দুটি লোক ধুতি-পরা, গায়ে সাদা-কালো দেহাতি কম্বল জড়ানো, পায়ে নাল-লাগানো নাগরা-জুতো, মাথাতে বাঁদুরে টুপি, তোরা যাকে ইংরেজীতে বলিস 'ব্যালাক্লাভা' তাই পরে মরি-কি-পড়ি করে দৌড়ে আসছে। তার মধ্যে একজন মাথার টুপিটা খুলে ফেলেছে আর যেখানে তার কান থাকার কথা সেখানে একটি ভয়াবহ সাংঘাতিক রক্তাক্ত ক্ষত। পেছনের জন নাকে হাত দিয়ে দৌড়ে আসছে আর ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে তার নাক থেকে।

ততক্ষণে পথের সেই বাঁকে এসে একটি ছিপছিপে যুবক, তার গায়ে দেহাতী হাতে-বোনা গরম কাপড়ের হাঁটু-অবধি ঝুলের পাঞ্জাবি আর ধুতি, পায়ে নাগড়া জুতো, দু'হাত দু'কোমরে রেখে হো হো করে হাসছে ফুলে ফুলে আর বলছে, আজ স্রিফ তু দোনোকো কান ঔর নাকহি কাটকে ছোড় দিয়া। যা, মহল্লামে যাকর ঘর-ঘরমে দিখা ঔর বোল যো ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েনে আজ নাক ঔর কানকি সবজি বানাকে মুঁংগকি ডাল কি সাথ খায়েগা দোপেহরমে। যোভি হামে পাক্কাড়নেকি লিয়ে আয়েগা উসলোগোঁকি হাল অ্যাইসিই হোগা।

লোকদুটোর জামাকাপড় দামী। তারা পেছনে না তাকিয়ে প্রাণভয়ে দৌড়ে এসে আমি যেখানে আড়াল নিয়ে ছিলাম তারই সামনে এসে দাঁড়াতে তাদের হেনস্থার রকমটা পুরোপুরি জানা গেল।

ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। এ অন্যর রক্তাক্ত মূর্তির দিকে চেয়ে তাকিয়ে আঁৎকে উঠছে আর হিক্কা তোলার মতন শব্দ করছে। আয়না তো নেই যে নিজের ছিরি নিজে দেখবে! দেখলে অবশ্য ঐখানেই অজ্ঞান হয়ে চিৎপটাং হতো।

একজন বলল, আমার বন্দুকটাও কেড়ে নিল।

নাক-কাটা, নাকি সুরে খোনার মতন বলল, চালানা নেই আতা তো বন্দুক পাক্কড়কে আয়াথা কিঁউ?

ঔর তুমহারা ক্যা চাকু চালানা আতা? উওভি তো লে লিয়া।

হুঁ। বলে কেঁদে উঠল খোনা। বলল, হামারা আমরিকান চাকুয়া। আমরিকান। হুঁ।

লোক দুটো চলে গেলে আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে ডাকু যেদিক থেকে এসে বাঁকে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে অট্টহাসি হাসছিল সেই দিকে বন্দুক রেডি-পজিশানে ধরে এগিয়ে চললাম পথের একেবারে বাঁদিক ঘেঁষে।

বলেই, ঋজুদা নামিয়ে রাখা পাইপটা তুলে নিয়ে পাইপটা ধরাল।

তুমি কি সেইদিনই ধরলে ডাকু পিপ্পাল পাঁড়েকে?

ভটকাই প্রশ্ন করল।

ঋজুদা মাথা নাড়িয়ে জানাল, না।

তবে? কবে ধরলে?

বেশ কিছুদিনের চেষ্টার পরে।

বল, বল ঋজুদা।

তিতির বলল।

ঋজুদা বলল, পুরোটাই যদি আজই শুনে ফেলিস তাহলে বিরিয়ানির হাণ্ডি যে কাঁদবে। এদিকে রান্না তো হয়ে গেছে। ঐ দ্যাখ পেছনে চেয়ে ভগ্নদূত দাঁড়িয়ে।

আমরা একই সঙ্গে পেছনে চেয়ে দেখি গদাধরদা এসে ব্যাজার মুখে দাঁড়িয়েছে। আমরা মুখ ফেরাতেই বলল, সেই মিঞায় শুদোতিচে যে হাড়ি নিকলাবে কিনা?

আমরা সকলে সমস্বরে হেসে উঠলাম।

ঋজুদা আমাদের দিকে নীরব ভর্ৎসনার চোখে চেয়ে গদাধরদাকে বলল, গদাধরদা, কথাটা "হাড্ডি নিকলানো" নয়, "হাণ্ডি নিকলানো"।

বিরক্ত গদাধরদা বলল, ওই হল্লো।

গল্পটা এখুনি এখুনি না শুনলে তো রেশ কেটে যাবে ঋজুদা।

আর এখুনি এখুনি না খেলে যে বিরিয়ানিটাই মাঠে মারা যাবে।

ভেতর থেকে আজ্জু মহম্মদ বেরিয়ে এসে বলল, বিলকুল ঠিক।

ঋজুদা বলল, হবে, পরে হবে। এখন ছোট্ট করে শুনলে তো। পরে পুরোটা শোনাব।

ছবিঃ অমিত চক্রবর্তী

কড়ুরয় আর খুকু-মা

নারায়ণ সান্যাল

[যুক্তাক্ষর-বর্জিত গল্প। বাচ্চাকে নিজে-নিজে পড়তে দিন]

কড়ুরয় একটা ভালুক। না, ভুল হলো। ভালুক নয়, ভালুকছানা। আসলে কড়ুরয় একটা পুতুল। নরম তুলতুলে। গায়ে সবুজ-রঙের নিকারবোকার।

'নিকারবোকার' চেন তো? শোন, বুঝিয়ে বলি—

তোমরা আজকাল এ পোশাক পর না। আমরা ছেলেবেলায় পরেছি। কেমন জান? নিচের দিকে ইজের। আর জামাটা ইজেরের সাথে বোতাম দিয়ে সাঁটা। বোতামের ফিতে কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরে আসে। তাকেই বলে: নিকারবোকার।

কড়ুরয় একটা বড় দোকানে থাকে। খুব বড় দোকান। সাততলা বাড়ি। তার এক-এক তলায় এক-এক রকমের জিনিস। একতলাটা পুতুল-পাড়া। পুতুল, পুতুল আর পুতুল। কত রকমের পুতুল। বাঘ, ভালুক, সিংহ, খরগোশ, জিরাফ, জোকার। দম-দেওয়া রেলগাড়ি। চাবি-দেওয়া মটোরগাড়ি। কত রঙের বল। কাঠের ঘোড়া। তার পিঠে চড়াও যায়। দোল খাওয়া যায়।

দোতলাটা হলো বিছানা-পাড়া। খাট, পালং, মাথার বালিশ, পাশবালিশ। মশারি-গদি-লেপ-তোষক।

তিনতলাটা হলো পোশাক-পাড়া। জামা-জুতো-মোজা-ধুতি-শাড়ি।

তারও উপরের তলায় কী আছে? আমি জানি না, বাপু।

তবে একটা কথা জানি: যে কোনো তলা থেকে উপর-তলায় যেতে হলে সিঁড়ি ভাঙতে হবে না। কারণ দোকানে একটা এস্‌কালেটার আছে।

'এস্‌কালেটার' চেন তো? শোন, বুঝিয়ে বলি:

এস্‌কালেটার হলো একজাতের আজব সিঁড়ি। সেখানে পা চলে না। পা দাঁড়িয়ে থাকে। চলে সিঁড়ির ধাপ। একের পর একটা সিঁড়ির ধাপ উপরপানে চলছে। চলছে, চলছে আর চলছে। একদিক দিয়ে উপরে উঠছে, আর পাশের দিক দিয়ে নিচে নামছে। তুমি উপরে যেতে চাও? টুপ করে চড়ে বস সিঁড়ির একটা ধাপে। বাস্‌। ধাপটাই তোমাকে উপরে নিয়ে যাবে। তোমাকে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হবে না।

তুমি নিচে যেতে চাও? টুপ করে চড়ে বস পাশের দিকের একটা ধাপে। বাস্‌। ধাপটাই তোমাকে নিচে নিয়ে যাবে। তোমাকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হবে না।

একেই বলে এস্‌কালেটার।

তুমি কি কলকাতার কাছে-পিঠে থাক, দাদাভাই? নাকি, দিদিভাই? তাহলে এক কাজ কর। কাউকে পাকড়াও কর। বাবা-মা, কাকা-কাকি, মামা-মামী, মাসি-মেসো—যাকে পার। বায়না ধর: কলকাতা যাব! চলে এস কলকাতায়। এখানে আছে পাতাল-রেল। তাও চড়া হবে আবার ফোকটে এস্‌কালেটারও চড়া হবে।

যাক সে-কথা। কড়ুরয়ের কথা বলি:

কড়ুরয় থাকে একটা তাকে। তার বাঁ-দিকে একটা ডল-পুতুল। আর তার ডান-দিকে সাদা খরগোশ। ডল-পুতুলের বাঁ-দিকে জিরাফ। আর খরগোশের ও-পাশে জোকার। ওরা পাঁচজন একই তাকে থাকে। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। উপরের তাকে থাকে আরও দুজন। ভুলোকুকুম আর সিংহমামা।

সেদিন রবিবার। খুকুর ইস্‌কুলে ছুটি। অথচ দোকান খোলা। খুকুকে নিয়ে মা দোকানে এসেছেন। খুকুমণির মাথায় দু'বেণী। গায়ে লাল-রঙের জামা।

কড়ুরয় জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকে। সে ভাবছিল, খুকুদিদি কি আমাকে কিনবে? তাহলে ভা-রি মজা হয়। এখানে কেউ তাকে কোলে নেয় না। আদর করে না। তাকে নিয়ে খেলে না।

ওমা, ওমা! ও কী! কড়ুরয় যা ভেবেছে তাই। খুকুদিদি হঠাৎ এগিয়ে এল। তার মার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'মা-মণি! দেখ! কী চমৎকার একটা ভালুকছানা। আমি ওকে পুষব।'

মা বললেন, 'না, খুকু। আজ নয়। তাছাড়া দেখ: ওর জামায় একটা বোতাম নেই।'

কড়ুরয় কোনো কথা বলে না। সে তো কথা বলতেই পারে না। সে শুধু জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকে। দেখে—খুকুমণি আর তার মা দোকান

নকল থেকে
সাবধান হওয়ার
জন্য শিশি ও
প্যাকের গায়ে
আমার ছবি ও
সইসহ আসল
তালমিছরি কিনুন।
বিনীত
দুলাল চন্দ্র ভড়ের
তালমিছরি
ছবি ও সই
দেখে
আসল
দুলাল চন্দ্র ভড়ের
তালমিছরি কিনুন
সর্দ্দি, কাশি, গলা ব্যথা
গলা খুস খুস ইত্যাদি
রোগের উপশম হয়
INVENTOR
প্রস্তুত কারক
শ্রী দুলাল চন্দ্র ভড়
২৮ বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোনঃ ২৩৮ ৮২৮৪, ২৩৮ ৮১৯৩
ব্যবসায়িক যোগাযোগঃ
৫ নং মনোহর দাস স্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা-৭
STANDARD

ছেড়ে চলে গেল। খুকু কিন্তু বারে বারে পিছন ফিরে কড়ুরয়কে দেখছিল।

কড়ুরয়ের হঠাৎ খেয়াল হলো। নিচু হয়ে দেখতে গেল। পারল না। তারপর বুকে হাত বুলিয়ে বুঝে নিল। তাই তো! খুকুদিদির মা তো ঠিক কথাই বলেছেন। তার নিকারবোকারে একটা বোতাম নেই।

বোতামটা কোথায় গেল? কবে খুলে পড়ে গেল? কড়ুরয় তা টেরই পায়নি। যাহোক, ওকে খুঁজে দেখতে হবে।

সেদিন গভীর রাতে।

কেনাবেচা সব শেষ হয়েছে। যারা কিনতে এসেছিল, তারা সবাই বাড়ি ফিরে গেছে। যারা বেচতে এসেছিল, তারাও সবাই বাড়ি ফিরে গেছে। দোকানের সামনে সদর দরজায় তালা পড়েছে। সব সুন্‌সান্। শুধু জেগে আছে পাহারাদার। চোর ধরবে বলে।

কড়ুরয় ইতিউতি তাকিয়ে দেখল। নাঃ! কেউ জেগে নেই। সব পুতুল ঘুমিয়ে কাদা। পা-টিপে-টিপে কড়ুরয় নিচে নেমে আসে।

মেঝেতে ইতিউতি খুঁজতে থাকে। কোথায় গেল বোতামটা?

দোকানঘরটা আলো-আঁধারি। কেউ কোথাও নেই। সব ভোঁ-ভাঁ। শুধু কিসের যেন একটা ঘড়্‌ঘড়্ আওয়াজ। ওটা সেই এস্কালেটারের। সেটা রাতেও চলে। যাতে পাহারাদাররা উপরে বা নিচে যেতে পারে। কড়ুরয় সেসব কথা জানে না। সে ওই এস্কালেটারটাকে চেনেই না। ভেবেছে ওটা বুঝি একটা সিঁড়ি। যেই তাতে পা রেখেছে, অমনি—ওমা! এ কী হলো? দুলে উঠল পায়ের নিচে মেজেটা। পড়তে পড়তে কড়ুরয় নিজেকে সামলে নেয়।

আরে, আরে! সিঁড়ির ধাপটা এ কী পাগলামী শুরু করল? কড়ুরয়কে নিয়ে কোথায় চলেছে ধাপটা?

আসলে কী হয়েছে, বুঝেছ তো? না জেনেশুনে কড়ুরয় উঠে পড়েছে এস্কালেটারের একটা ধাপে। বাস্! দেখ্-না-দেখ্ সে উপরপানে উঠতে শুরু করেছে। একতলা থেকে দোতলায়। তবে কড়ুরয় খুব সাহসী। আর খুব চালাক। ভয় পায়নি একটুও। ও ঠিক বুঝে নিয়েছে। ধাপটা ওকে নিয়ে দোতলায় চলেছে। দোতলাটা কড়ুরয় কখনো দেখেনি। ভাবল: ভালই হলো। দেখা যাক, দোতলায় ওর হারানো বোতামটা পাওয়া যায় কি না।

সিঁড়ির ধাপটা দোতলার কাছাকাছি আসতেই কড়ুরয় এক লাফ মারে! বাস্! আর ভয় নেই! সিঁড়ির ধাপটা এখন যেখানে খুশি যাক। কড়ুরয় নেমে পড়েছে।

কিন্তু এ কী? এটা কি কোনও রাজার বাড়ি? কারা থাকে এখানে? বিরাট-বিরাট খাট-পালং। তাতে বালিশ-বিছানা-চাদর। কারা শোয় গো এখানে? ওই বিছানায়? রাজারানী? রাজকুমারী? তাহলে এত রাতেও তারা শোয়নি কেন?

সামনেই একটা টেবিল। তার পাশে চেয়ার। হঠাৎ দেখতে পেল সামনে বিরাট একটা গদিয়ালা বিছানা। হাঁচড়-পাঁচড় করে কড়ুরয় তাতে উঠে পড়ে।

আরে, আরে! ঐ তো! তার কাঁধের বোতামটা! ওই গদির গায়ে লট্‌কানো। কড়ুরয় দুই হাতে বোতামটা বাগিয়ে ধরে। তারপর মারে হঁ-য়া এক টান! তবু বোতামটা খুলে আসে না।

এবার সে সুর করে টান্‌তে থাকে—

মারে জোয়ান হেঁই—ও!
আউর ভি থোড়া হেঁই—ও!
ফাটে বয়লার হেঁই—ও!

টং করে বোতামটা ছিঁড়ে বেরিয়ে এল।

আর তখনই কড়ুরয়: চিৎপটাং!

ওর পিছনেই ছিল একটা বিজলি-বাতির শেড! সেটাকে নিয়েই উলটে পড়েছে কড়ুরয়—'দড়াম' করে!

দারুণ আওয়াজ হয়েছে তাতে!

ভয়ে কড়ুরয় দু'হাতে তার দু'কান ঢেকেছে।

পাহারাদার ছিল তিনতলায়। সে হেঁকে ওঠে—'কে রে?'

কড়ুরয় সাড়া দেয় না। চুপটি করে লুকিয়ে বসে থাকে।

পাহারাদার টিপ্‌বাতির আলো ফেলে নেমে আসে। এস্কালেটারে চেপে। তিনতলা থেকে দোতলায়। সেখানে এসে দেখে সব ভোঁ-ভাঁ! চোর কোথাও নেই। তাহলে এই শেড বাতিটা উল্‌টে পড়ল কেমন করে? ভাবতে থাকে পাহারাদার। আওয়াজটা সেও শুনেছে। পাহারাদার টিপবাতি ফেলে দেখতে পায়: তোষকের পিছনে একজোড়া পুঁচকে কান।

—'এই! তুই কে রে?' হাঁকাড় পেড়ে এগিয়ে আসে সে।

পাহারাদার ওকে চিন্‌তে পারে। বলে, 'এই তুই কড়ুরয় না? এখানে কী করছিস্? বাঁদর কোথাকার!'

কড়ুরয় বলতে গেল, 'তুমি কি কানা? বাঁদর কেন হব? আমি তো ভালুকছানা।'

কিন্তু বেচারির সাহস হলো না। তাছাড়া ও তো কথা বলতেই পারে না। কড়ুরয়কে বগলদাবা করে পাহারাদার নেমে এল। দোতলা থেকে একতলায়। পুতুল-পাড়ায় তখনো সবাই ঘুমিয়ে আছে। এত আওয়াজেও কারও ঘুম ভাঙেনি। সবাই জড়াজড়ি করে পড়ে আছে।

একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল কড়ুরয়।

পরদিন সকালে ওর ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। তার আগেই দোকান খোলা হয়েছে। কেনা-বেচা চলছে।

হঠাৎ—আরে, আরে: এ কী? ও কে?

সেই খুকুদিদিই। ওর মাথাতে এখন দু'বেণী নেই। পনিটেল!

মেয়েটি ওর কাছে এসে বলল, 'আমার নাম খুকু। তুমি আমার সাথী হবে?'

কড়ুরয় তো অবাক। সে বলতে গেল, কিন্তু আমি যে পুরানো পুতুল। আমার যে জামার বোতাম নেই?

বলতে পারল না। ও যে পুতুল!

খুকু বললে, 'আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। কালকেই তোমাকে নিয়ে যেতাম। কিন্তু তখন আমার কাছে পয়সা ছিল না। আজ আমার জমানো পয়সা নিয়ে এসেছি। যাবে তুমি আমাদের বাড়ি?'

কড়ুরয়ের মনের ভিতর তখন আকুলি-বিকুলি করছে। সে বলতে চায়:

যাব! যাব! যাব!—কিন্তু বেচারি যে কথা বলতে পারে না।

খুকুমণি জানতে চায়, 'তোমার নামটা কী গো?'

কড়ুরয় বলতে চায়। পারে না। তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

যে দিদিমণি পুতুলপাড়ায় কেনা-বেচা দেখেন তিনি এবার এগিয়ে এলেন। বললেন, 'ওর নাম কড়ুরয়। তুমি কি ওকে কিনবে?'

—'হ্যাঁ! এই নিন!'—দামটা দিদিমণির হাতে দিলেই খুকুমণি কড়ুরয়কে কোলে তুলে নিল। দিল এক ছুট!

একছুটে একেবারে নিজেদের বাড়িতে।

ওরা থাকে দোতলায়। খুকু কড়ুরয়কে নিয়ে তিন-তিন সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে উঠতে থাকে। মাকে ডেকে বলে, 'এই দেখ মা, কে এসেছে!'

খুকুমণি এসে থামে তার নিজের ঘরে। কড়ুরয় তো একেবারে অবাক! কী চমৎকার করে সাজানো ঘরটা। দেয়ালে হরেকরকম ছবি। জানলায় রঙিন পরদা। পাশাপাশি দুটো খাট। একটা ছোট বিছানা। সেটা খুকুমণির। একটা একেবারে পুঁচকে। সেটা কড়ুরয়ের!

খুকুমণি তখনি কাজে বসে গেল। সূঁচ-সুতোর বাক্সটা বার করল। তারপর একটা সাদা মতো কী যেন নিয়ে এল।

কড়ুরয় তো একেবারে অবাক!

ওই তো তার সেই হারানো বোতামটা!

কী করে হলো? এ কি ভানুমতীর খেল? বোতামটা হারালো দোকানে, আর খুঁজে পাওয়া গেল খুকুমণির সেলাই বাক্সে?

পাঁচ-মিনিটে খুকুমণি ওর জামায় বোতামটা আটকে দিল।

খুকুমণি বলে, 'আজ থেকে তুই আমার ঘরে থাকবি! বুঝলি বাঁদর?'

এবার আর কড়ুরয় বলতে গেল না যে, সে বাঁদর নয়, ভালুকছানা। কারণ কড়ুরয় যে দারুণ চালাক। দারুণ বুঝমান। ও ঠিক বুঝে নিয়েছে এখানে 'বাঁদর' একটা আদরের ডাক। তাই মনে মনে বললে, 'তাই থাকব! তুমি যে আমার মা-মণি!'

ছবিঃ অমিত চক্রবর্তী

বাঘের গন্ধ পাঁউ

অন্নদাশঙ্কর রায়

বলল আমায় গাড়োয়ান,
খোকাবাবু সাবধান
খকখকিয়ে কাশবে না
ফিকফিকিয়ে হাসবে না
মুখটি বুজে থাকবে পড়ে
পথের এই মাঝখান।

দুইধারেই জঙ্গল
রাতটা ঘোর অন্ধকার
হঠাৎ আমার নাকে এল
বোটকা এক গন্ধ কার
শিউরে উঠি দাঁতকপাটি
বাঘ নয় তো কে আবার।

ভয় পেয়ো না, খোকাবাবু।
চলছে গাড়ি পাঁচখানা
পাঁচ লণ্ঠন জ্বলছে তেজে
তাই দেবে না কেউ হানা
তোমার মামার ধরন আমার
বহুৎ দিনের বেশ জানা।

বাঘমামা গো, পায়ে পড়ি
শিবঠাকুরের দোহাই
আমরা তোমার ভাগ্নে গো,
দাও আমাদের রেহাই
কালকে যেন বেঁচে থাকি
আজ নিবেদন ইহাই।

মাইলটাক রাস্তা
বাঘের এলাকায়
সেইটুকু পার হতেই
গন্ধ চলে যায়।
খোকাবাবু, হাসো, কাশো,
বলো যা মন চায়।

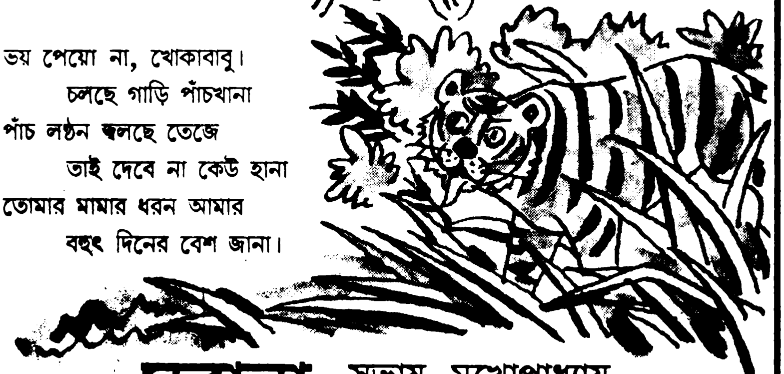

ঘরানা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কুঠুরি কামরা বৈঠকখানা।
সেলাম, সাহেব—
তৈরি খানা॥

খিড়কি সদর উঠোন অন্দর।
ছেড়ে যাচ্ছে জাহাজ বন্দর।

দলিজ দাওয়া সিংদরোজা।
কলেজে পড়ান দিদির বড়ো

ভাঁড়ারঘর হেঁসেল বাথরুম।
দুপুরে ভরপেট হলেই
ভাতঘুম॥

ঘোরানো-সিঁড়ি চোরকুঠুরি তয়খানা।
দুধে লেবুর রস টিপলেই হয় ছানা॥

রোয়াক চাতাল দরদালান।
রোজ দু'বেলা চাই ঠাকুমার
জর্দাপান॥

ছাদ কার্নিশ গাড়িবারাণ্ডা।
দেখতে যেন ভিজে বেড়াল,
আসলে ও-ই দলের পাণ্ডা॥

থাম গম্বুজ চিলেকোঠা।
টিকি দেখিনি,
বলি, এতদিন ছিলে কোথা?

ছবি : সুফি

আলো আর আঁধার

নবনীতা দেব সেন

এক বুড়ো কাঠুরিয়ার দুটি নাতনী ছিল। তাদের মুখগুলো যেমন সুন্দর, তাদের মনগুলোও তেমনি সুন্দর। একটি চঞ্চল, একটি শান্ত। চঞ্চলটির নাম দিবা, আর শান্তটির নাম রাত্তি। কাঠুরিয়া বুড়ো হয়েছে, আর কাঠ কাটতে পারে না তেমন, কষ্ট হয়। দিবা-রাত্তি যায় বনে কাঠ কুড়োতে। খুব পরিশ্রমী মেয়ে তারা। কাঠ কুড়িয়ে, বাণ্ডিল বেঁধে, মাথায় করে. হাটে নিয়ে যায়। সেই কাঠ বিক্রি করে চাল-ডাল-কাপড়-গামছা, সব কিছু কিনে আনে।

একদিন তাদের হাট থেকে ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল। ভীষণ ক্লান্ত দুই বোন বনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। সেটা পূর্ণিমা রাত্রি, তাই ভয় করলো না। একটু পরেই বন আলোয় আলো হয়ে যাবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুই বোনেই স্বপ্ন দেখলো আকাশ থেকে একটা তারা নেমে এসেছে তাদের পাশে, আর সেই তারা থেকে রাজপুত্তুরের মতো সুন্দর এক নক্ষত্রপুত্র বেরিয়ে এসে তাদের ডাকাডাকি করছে—"ওঠো ওঠো!" দুই বোন একই সঙ্গে জেগে উঠলো। দেখলো, তাই তো? সত্যি সত্যি পরম রূপবান একটি ছেলে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ডাকছে। ছেলেটি বললো—"এখানে কেন, তোমরা ঘরের ভেতরে ঘুমোবে চল।" বলে সেই তারার ওপরে বসিয়ে দুই বোনকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে চললো।

তারাটা যেন একটা ছ'কোণ বারান্দা। দিবা-রাত্তি তাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে নিচে অরণ্য প্রান্তর নদী পাহাড় সব চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। ছেলেটি ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বলল, সে চাঁদের বুড়ির ছোট ছেলে। চাঁদের বুড়ির বড় ছেলে গেছে ম্যাজিক আগুন নিয়ে আসতে। গভীর এক আগ্নেয়গিরির গুহায় সেই আগুন আছে। সেখানে যাওয়া খুব শক্ত। কিন্তু চাঁদের বুড়ির বড় ছেলে সব শক্ত শক্ত কাজ করে ফেলতে ওস্তাদ।

আকাশে পৌঁছে ওরা দ্যাখে চাঁদের বুড়ি বসে চরকা কাটছেন। মেয়েদের দেখে বললেন—"আহা বাছারা, খালি পেটে ঘুমিয়ে পড়েছে! ওদের কত খিদে পেয়েছে!" বলে ছোট্ট একটা বাটিতে করে দশটা চালে ভাত বসিয়ে দিলেন। সেই দেখে দিবা বললে—"ওমা! ওতে করে কারই বা পেট ভরবে?" রাত্তি বললে—"চুপ চুপ এ কি আমাদের দেশ? এ চাঁদের দেশ। এখানে কী না হয়!"

সত্যি সত্যি সেই দশটা চালে এত ভাত হলো যে ঘি দিয়ে মেখে খেয়ে দুই বোনে ফুরোতে পারলে না। চাঁদের বুড়ি মিষ্টি হেসে বললেন—"কী গো? পেট ভরেছে তো? এই বাটিটা আর এই দশটা চাল তোমরা নিয়ে যাও। তোমাদের কোনোদিন পেটে খিদে নিয়ে শুতে যেতে হবে না।"

তারপরে দিবা আর রাত্তিকে তিনি চমৎকার মেঘের বিছানা পেতে শুতে দিলেন, আর চরকার গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

তখনো পুরোপুরি সকাল হয়নি, আকাশের আঁধার একটু হালকা হয়েছে কেবল, আবার তাদের ডেকে তুলে দিলেন চাঁদের বুড়ি। চরকা থেকে একটা সুতো নিয়ে বললেন—"এই সুতোটা শক্ত করে ধরে থাকো দুজনে, আমি তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।"

দিবা আবার বলে ফেললে—"ওমা! সুতো তো ছিঁড়ে যাবে! আমাদের দুজনের ভার সইবে কেমন করে? যা সরু সুতো!" কিন্তু রাত্তি মনে করিয়ে দিলে—"দেখলি না, দশটা চালে কত ভাত হয় এখানে? এই সুতো হয়তো নাইলনের দড়ির মতন শক্ত!"

তারপর সেই সুতো বেয়ে দুজনে তো নিচে নেমে এল। এসে দেখে, বাঃ! একেবারে নিজেদের কুটিরের দোরগোড়ায়

পৌঁছে গেছে। বুড়ো কাঠুরিয়ার এদিকে ভীষণ ভাবনা হয়েছে, সে বাইরে এসে বসে আছে, নাতনীরা কখন ফিরবে। এখন দুদিক থেকে দুজনে জড়িয়ে ধরে তাকে বললে, "দ্যাখো দাদু, আমরা কী এনেছি!"

চাঁদের বুড়ির কল্যাণে তাদের আর কোনোদিন ভাতের অভাব হয় না। কিন্তু তেল-সাবান তো চাই? কাপড়-গামছা তো চাই? বোনেরা তাই কাঠ কুড়োতে যায়। কাঠ কুড়িয়ে বাণ্ডিল বেঁধে হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে যখন যা দরকার কিনে আনে। আরেকদিন অমনি বাজার করে ফিরতে তাদের ভয়ানক দেরি হয়ে গেল। সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত—তারার আলোয় পথ চলছে, কিন্তু বনের ভেতরে তাতে পথ দেখা যায় না। বড় বড় গাছের ছায়া, বড্ড অন্ধকার। কী করে? দুই বোন আবার গুটিশুটি বনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুজনে স্বপ্ন দেখছে একজন কালোকোলো ষণ্ডা গুণ্ডা মতন লোক এসে ওদের ডাকছে—"ওঠো, ওঠো!" ভয়ের চোটে তো ঘুম ভেঙে দুই বোনে লাফিয়ে উঠেছে। দ্যাখে সত্যি সত্যি একজন কালোকোলো ষণ্ডা গুণ্ডা লোক! সে বলল—"আহা, তোমরা এইখানে ঘুমুচ্ছো কেন, এখানে কত বিপদ-আপদ, চলো ঘরের মধ্যে ঘুমোবে চলো।"

বলতে না বলতেই সেখানে ঝুপ করে গাছ থেকে পড়লো এক বিষাক্ত সাপ। দিবা-রাতি কিছু ভাববার আগেই লোকটা সাপের গায়ে আলতো একটা টোকা মারলো। আর সাপ তক্ষুণি পুড়ে ছাই। অবাক কাণ্ড! দেখে বোনেদের গায়ে কাঁটা দিল।

লোকটি ওদের অভয় দিয়ে বলল—"অবাক হবার কিছু নেই। আমার কাছে ম্যাজিক আগুন আছে কিনা? তাই আমার এত শক্তি।"

দিবা-রাতি কোরাসে বলে উঠেছে—"আপনি বুঝি চাঁদের বুড়ির বড় ছেলেটি?"

এবার সেই লোকের অবাক হবার পালা।—"তোমরা কী করে আমাকে চিনলে?"

—"আপনার ছোটভাই বলেছিল কিনা, আপনি ম্যাজিক আগুন আনতে গেছেন।"

—"তোমরা তাহলে আমার ছোটভাইকেও চেনো?"

—"চিনিই তো। আপনিও কি আমাদের তারায় চড়িয়ে আপনাদের বাড়িতে নিয়ে যাবেন?"

হো হো করে হেসে উঠে লোকটা বললো—"তারা-টারা নয়, আমি এসেছি অন্ধকারের পিঠে চড়ে।"

অন্ধকার ঠিক একটা তেজী কালো পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতন—তার পিঠে দুই বোনকে বসিয়ে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেল সে। গিয়ে পৌঁছুলো অন্য একটা বাড়িতে। চাঁদের উলটো পিঠে। পৃথিবীতে যখন অমাবস্যার অন্ধকার হয়, তখন আসলে চাঁদের বুড়ি যান তাঁর বড়ছেলের বাড়িতে চরকা কাটতে।

আঁধার বললো—"মাগো, দ্যাখো কাদের নিয়ে এসেছি। এদের বিছানা পেতে দাও।"

চাঁদের বুড়ি দিবা-রাতিকে দেখে খুব খুশি। কিছু দিন আগে ছোট ছেলে আলো গিয়েও তো এই মেয়ে দুটিকেই নিয়ে এসেছিলো।

চাঁদের বুড়ি বললেন—"এসো মা, বোসো মা, তোমাদের জন্যে ভাত চড়াই মা।"

কিন্তু মেয়েরা আজ বললে—"আমরা খাব না, আমাদের বনের ফল খেয়েই খিদে মিটে গেছে, আমাদের বড্ড ঘুম পেয়েছে।"

তখন চাঁদের বুড়ি একটা সুন্দর কাঠের সিঁদুরকৌটো নিয়ে এসে, মেয়েদের হাতে দিয়ে বললেন—"তোমরা এর মধ্যে ঘুমোও।"

অবাক হয়ে দুই বোন বলে উঠলো, "ও মা এর ভেতরে ঢুকবো কেমন করে আমরা?"

চাঁদের বুড়ি ফিক্ করে ফোকলা গালে হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট্ট কৌটো একটা মস্ত ঘর হয়ে গেল, তাতে নরম, সুগন্ধী, ফর্সা ধবধবে বিছানা পাতা। দিবা-রাতির ক্লান্ত শরীর। তারা শুলো, আর ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভেঙে উঠে দ্যাখে কখন যেন ঘুমের মধ্যেই কোন ম্যাজিকে ফিরে এসেছে ওদের নিজেদের কুটিরে। কিন্তু কুটির আর সেই ভাঙা কুটিরটি নেই। নতুন খড়, নতুন মাটি, পাকা মেঝে, কী চমৎকার একটা কুটির, তাতে তক্তপোশে নতুন বিছানা পাতা, সেই বিছানায় দাদুর পাশে তারা ঘুমিয়ে আছে। কেমন করে এমনটি হলো?

তাই তো? তাই তো?

কিছু বোঝবার আগেই কুটিরের দরজায় এসে দাঁড়ালো দুটি ছেলে। একজনের রং পূর্ণিমার আলোর মতন, আর একজনের রং ঠিক অমাবস্যার অন্ধকারের মতন। কিন্তু দুজনেই ভারি সুন্দর। আর তাদের মুখের হাসিদুটো খুব মিষ্টি, খুব চেনা চেনা।

কাঠুরিয়াদাদু বললেন—"এসো বাছারা, বোসো বাছারা, একটু জল খাও, একটু বাতাসা খাও। তারপরে বলো দেখিনি তোমরা কে? কোত্থেকে এসেছো?"

দিবা জল আনলো, রাতি বাতাসা আনলো। জলবাতাসা খেয়ে, একটু জিরিয়ে নিয়ে তারা বললে—"দাদু, আমরা চাঁদের বুড়ির দুটি ছেলে, আলো আর আঁধার। আমাদের আপনি চেনেন। আপনার দুটি ভালোমানুষ নাতনীকে আমরা বিয়ে করতে চাইছি। আপনি কি অনুমতি দেবেন?"

কাঠুরিয়া বললে—"দাঁড়াও বাছারা, তাদের আগে মতামতটা জেনে নিই, তবে তো অনুমতি?"

নাতনীদের মুখ আহ্লাদে ঝলমল করছে দেখে কাঠুরিয়া হেসে বললে—"নাঃ, আর জিজ্ঞেস করতে হবে না, মতটা জানতেই পেরে গেছি!"

হৈ হৈ করে দু'বোনের বিয়ে হয়ে গেল। তারার দল বরযাত্রী এসেছিল। কাঠুরিয়া তো খুব খুশি। সে এখন আকাশে গিয়ে চাঁদের বুড়ির সঙ্গে আড্ডা মারে আর তারাদের সঙ্গে লুডো খেলে। আর তার দুই নাতনী দিবা আর রাতি মনের সুখে আলো আর আঁধারের সঙ্গে ঘরকন্না করে। আর চাঁদের বুড়ি? চরকা কাটেন, আর গান করেন। গান করেন, আর চরকা কাটেন।

ছবিঃ দিলীপ দাস

গুপ্তধন রহস্য

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

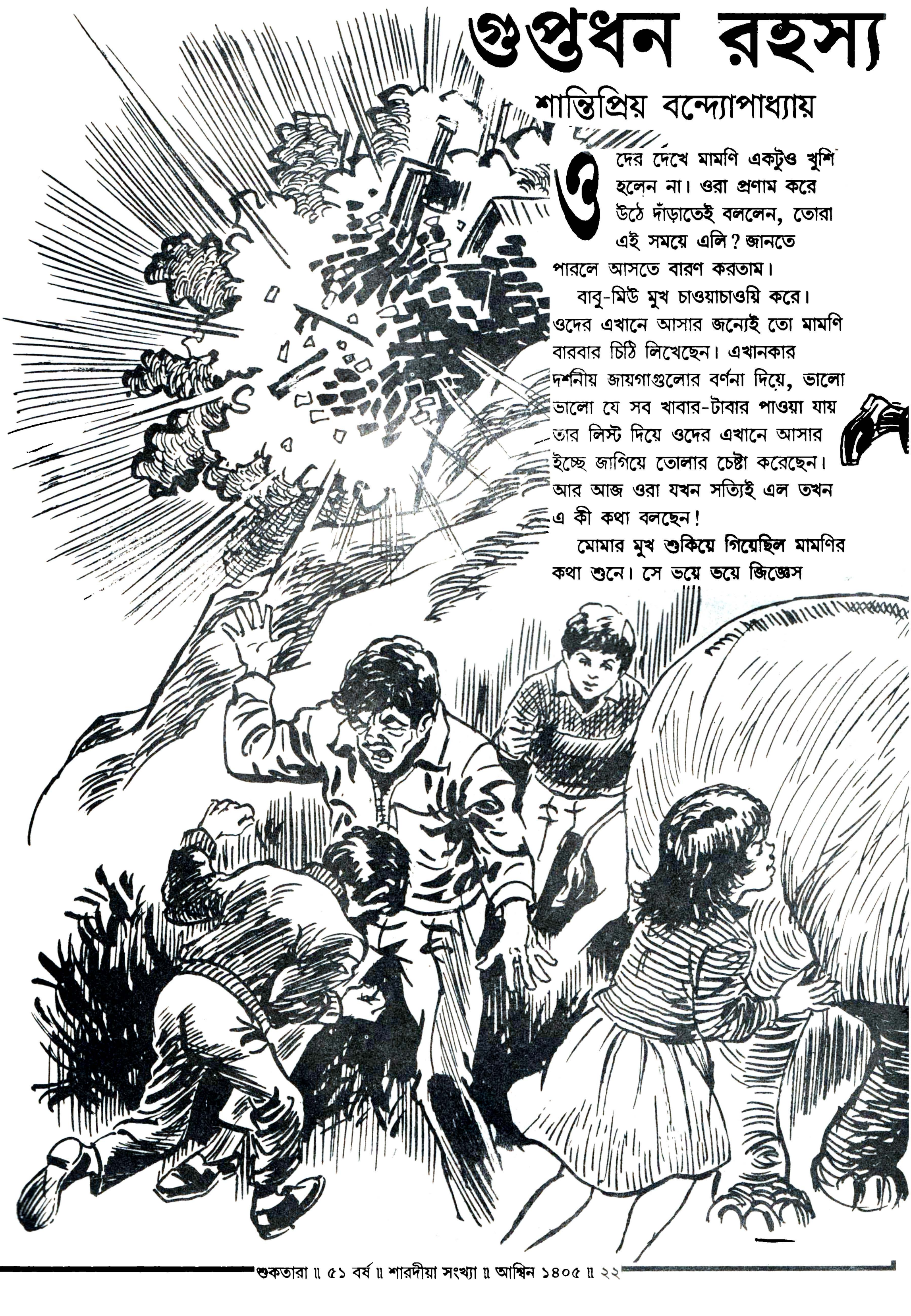

ওদের দেখে মামণি একটুও খুশি হলেন না। ওরা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বললেন, তোরা এই সময়ে এলি? জানতে পারলে আসতে বারণ করতাম।

বাবু-মিউ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ওদের এখানে আসার জন্যেই তো মামণি বারবার চিঠি লিখেছেন। এখানকার দর্শনীয় জায়গাগুলোর বর্ণনা দিয়ে, ভালো ভালো যে সব খাবার-টাবার পাওয়া যায় তার লিস্ট দিয়ে ওদের এখানে আসার ইচ্ছে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আর আজ ওরা যখন সত্যিই এল তখন এ কী কথা বলছেন!

মোমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল মামণির কথা শুনে। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস

করল, কেন কি হয়েছে?

হয়নি এখনো, হবে। সেইজন্যেই তো ভয় পাচ্ছি তোদের দেখে। তোরা যেখানেই যাস, একটা না একটা ঝামেলা পাকাস। তাই তো ভেবে পাচ্ছি না এখন কী করি!

কী আবার করবে! আমাদের খিদে পেয়েছে। খেতে দাও দেখি আগে। মিউ বলল।

যা জামাকাপড় ছেড়ে মুখটুখ ধুয়ে আয়। চিন্তিত মুখে মামণি রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

বাবু এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। বলল, কি ব্যাপার বল তো? মামণিকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে।

নির্ঘাৎ কিছু একটা ঘটেছে। মিউ বলল।

খোঁজ নিতে হচ্ছে। তার আগে চল, আমরা রেডি হয়ে নিই। মামণি এক্ষুণি খেতে ডাকবেন।

বাবু, মিউ, বুয়া, মোমা আর রাজা আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছেছে। কিকিও এসেছে। জায়গাটা ভারী সুন্দর। অবশ্য ডুয়ার্সের সব জায়গাই ওদের ভালো লাগে। এখানে চারপাশে পাহাড়। দূরের পাহাড়গুলোর মাথায় এখন রুপোর টোপর। সকাল আর শেষ বিকেলে ঐ টোপর আবার সোনালী হয়ে যায়। একটু হেঁটে গেলেই জঙ্গল। তেমন গভীর নয়। তবে গাছগুলো বেশ গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আছে প্রচুর পাখি।

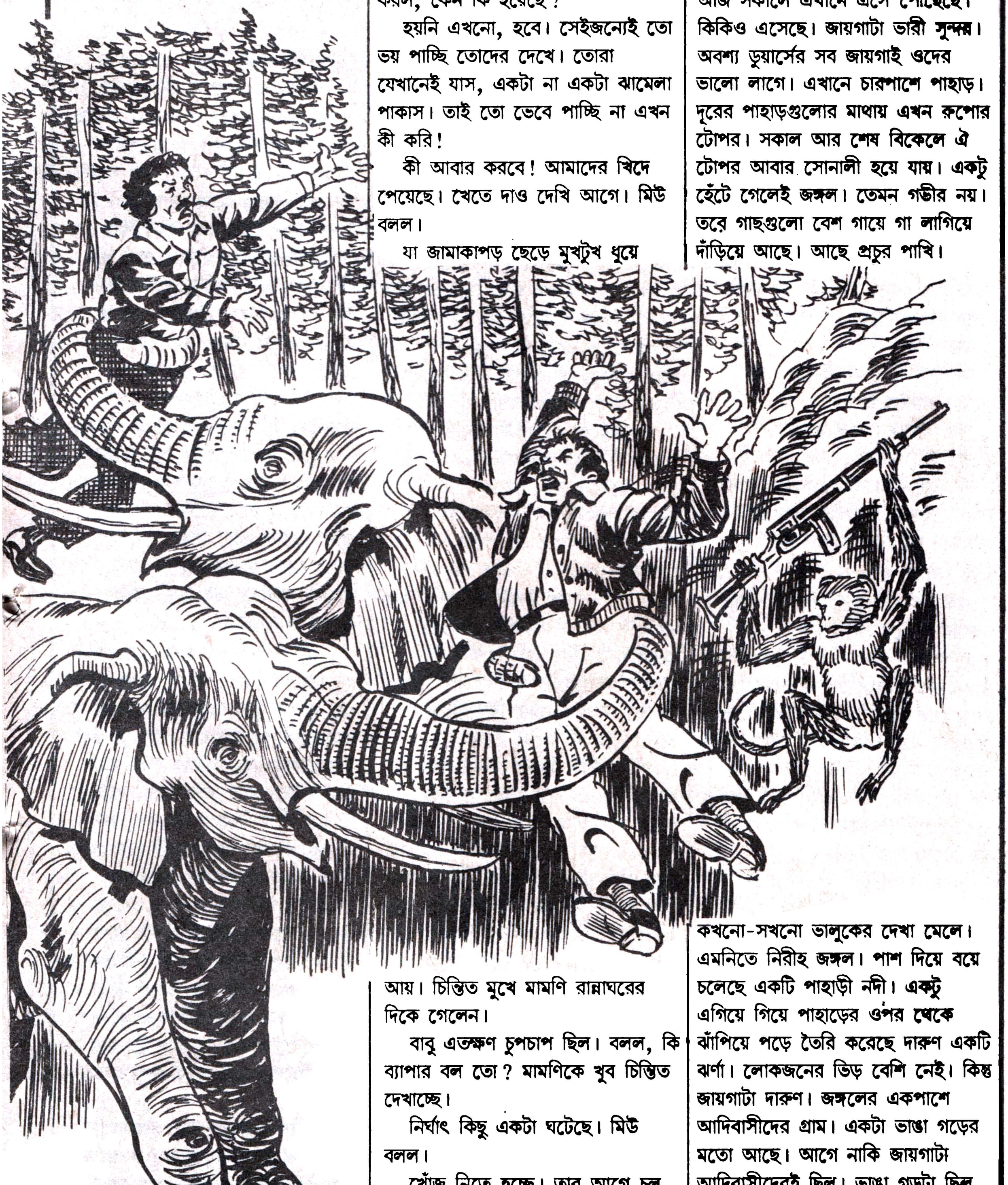

কখনো-সখনো ভালুকের দেখা মেলে। এমনিতে নিরীহ জঙ্গল। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি পাহাড়ী নদী। একটু এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৈরি করেছে দারুণ একটি ঝর্ণা। লোকজনের ভিড় বেশি নেই। কিন্তু জায়গাটা দারুণ। জঙ্গলের একপাশে আদিবাসীদের গ্রাম। একটা ভাঙা গড়ের মতো আছে। আগে নাকি জায়গাটা আদিবাসীদেরই ছিল। ভাঙা গড়টা ছিল ওদের রাজবাড়ি। সে সব কতদিন আগের কথা কেউ জানে না। গাঁয়ের মোড়লের সব মনে আছে। সে সেই গল্পই সকলকে

শোনায়। গড় নিয়েও নাকি একটা রহস্য আছে।

গড়ের পাশেই ফাঁকা জায়গা। গোলাকার। গোটা দুয়েক ইডেন গার্ডেন ঢুকে যাবে ওর মধ্যে। আদিবাসীদের পরবের দিনে জায়গাটা ভরে যায়। নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া সব হয় ওখানে। ঐ জায়গাটা ওদের প্রাণ। একবার সর্দারের ছেলে জায়গাটা ওদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। কথাটা মনে হতেই বাবু বলল, খেয়ে নিয়েই আমি মংলুর খোঁজে যাবো।

কেন?

ব্যাপারটা কী! মামণি কেন ভয় পাচ্ছেন জানতে হবে না?

ঠিক বলেছো, মংলু হয়তো সব জানে। আমি যাবো তোমার সঙ্গে?

না, তুই বাড়িতেই থাক। একসঙ্গে সকলে বেরুলে মামণিকে আর দেখতে হবে না! তুই কিন্তু কাউকে বলবি না, আমি কোথায় যাচ্ছি।

ওরা মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পাল্টে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসল।

গরম গরম ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা আর ছানার পায়েস দেখেই ওদের খিদে বেড়ে গেল। মামণি এসে দাঁড়িয়েছিলেন টেবিলের পাশে। বললেন, তোরা একদম ওস্তাদি করবি না। খেয়ে উঠে সকলে গায় সোয়েটার দিবি। এখন কেউ বেরুবি না। বিকেলে বেড়াতে বেরুনোর সময় রাম সিংকে সঙ্গে নিবি।

আচ্ছা! মামণির কথায় সম্মতি জানিয়ে মিউ বাবুর দিকে তাকাল। বাবু জিজ্ঞেস করল, রাম সিংকে সঙ্গে নিতে হবে কেন?

বললাম না-এখানকার অবস্থা ভালো না।

কেন কী হয়েছে...

এখনো হয়নি। হবে!

কি হবে?

তাই যদি জানতাম তাহলে কী আর অত চিন্তা করি!

মামণি চুপ করে গেলেন।

মিউ আর বাবু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বাবু ইশারায় মিউকে চুপ করে থাকতে বলল।

মামণি গেলেন রান্নাঘরে, দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। শ্রীধরকে ডাকলেন। বললেন, একবার বাজারে ঘুরে আয়। বাড়িতে মাছ-মাংস কিচ্ছু নেই, বাচ্চাগুলো খাবে কী!

শ্রীধর বাজারে যাবার মিনিট দশেক পরে বাবু বেরিয়ে পড়ল সকলের চোখ এড়িয়ে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গড়ের দিকে গেলে মংলুদের বাড়ি চটপট পৌঁছনো যায়। বাবু তা গেল না। ও বাঁদিক দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগল। সকাল গড়িয়ে গেছে। লোকজন বিশেষ চোখে পড়ল না বাবুর। কিন্তু জঙ্গল পেরিয়ে নদীর পাশ দিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল বাবু।

জঙ্গলের গা ঘেঁষে নদীর ধারে সার সার ক'টা তাঁবু। দেখলেই বোঝা যায়, বেদে-টেদেদের নয়। শহুরে মানুষের তাঁবু ওগুলো। একটা তাঁবু থেকে ধোঁয়া উঠছে। বোধহয় রান্নাবান্না হচ্ছে। লোকজন কোথায়? কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। ওপাশে একটা বড় ভ্যান আর একটা অ্যামবাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। ওদের গাড়ি। কিন্তু এরা কারা? কী মতলবে এসেছে কে জানে! মামণি যে বলছেন, ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে চলেছে, তা কী এদের জন্যেই!

বাবু চাইছিল না ঐ লোকগুলোর চোখে পড়তে। ওরা ভালো না মন্দ আগে জানতে হবে। বাবু এক পা এক পা করে পিছিয়ে এল। তারপর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগল। হঠাৎ একটা চাপা গলার স্বর শুনে বাবু চট করে দুটো চিরগাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। দুটো চিরগাছ যেন গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে। তার গোড়ায় বেশ বড় একটা ঝোপ।

বাবু কান খাড়া করে ছিল। ও স্পষ্ট শুনল, বস, মূর্তিটা তো ঝাউগাছের গোড়ায় লুকিয়ে রেখেছি। কেউ তুলে নেবে না তো?

একটা লোক হেসে উঠল। বাবু বুঝল সেই বস। বসের গলাটা বেশ ভরাট। সে বলল, ওখানে ক'টা মূর্তি আছে?

দুটো!

ঐ দুটোর দাম জানিস? অন্তত দশ লাখ টাকা।

দশ লাখ?

বিদেশী খদ্দের পেলে আরো বেশি দাম পাবো। কত পুরনো মূর্তি জানিস?

বাবু চমকে উঠল। এখানকার মন্দিরে নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্তি আছে। যেমন পুরনো, তেমনি দামী। সেটা চুরি করেনি তো এরা! বাবুর কাছে ব্যাপারটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু একটা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। শুধু মূর্তি চুরি হলে মামণি বিচলিত হবেন ঠিকই কিন্তু ভয় পাবেন না। মন্দির আর ঐ নারায়ণের মূর্তি ওঁদের কত পুরুষের তা বোধহয় মামণি নিজেও জানেন না। মামণি যে কখনো এই জায়গা ছেড়ে নড়েন না তার একটা কারণ ঐ মন্দির। নিত্যপুজো হয় সেখানে। সেই নারায়ণ মূর্তি চুরি হয়েছে? বাবু বুঝল, ব্যাপারটা মামণি ওদের জানতে দিতে চান না। ওদের চেনেন তো! নির্ঘাৎ মূর্তি উদ্ধার করতে লেগে পড়বে। লোকগুলো নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর। তাই মামণি ওদের জড়াতে চান না।

একটু পরে লোকগুলো চলে গেল। বাবু দেখে নিয়েছে, কোন গাছের গোড়ায় ওরা মূর্তিটা পুঁতে রেখেছে। জায়গাটা ওরা বারবার এসে দেখে যায়। বাবু মুখ বের করে দেখল। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ও উঠে এসে দ্রুত আরো খানিকটা পিছিয়ে নদীর দিকে চলে গেল। জল অনেক নিচুতে। বাবু পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নদীর দিকে নেমে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল। বাবুর হিসেব আছে, এইভাবে মিনিট দশেক হাঁটলেই সে মংলুদের গ্রামে পৌঁছে যাবে। কখনো পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে, কখনো পাথরের পাশ দিয়ে ও এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে ও ঘাড় উঁচু করে দেখে নিচ্ছে, কেউ ওকে লক্ষ্য করছে কিনা।

ও যত এগোচ্ছে নদীর জলের টান ততোই বাড়ছে। বাবু বুঝল, ও ঝর্ণার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আর সামনে এগোনো যাবে না। এবার ও ওপরে উঠবে। এই জায়গাটা মংলুদের গ্রামের পেছন দিক। ঝর্ণার শব্দ এখন স্পষ্ট।

ও যত এগোবে আওয়াজ ততই বাড়বে। নদীটা এইবার আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। চওড়া হয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীটা। বর্ষাকালে এর যা সুন্দর রূপ! গর্জনও তেমনি। কাছে যেতে ভয় করে। বাবু এবার ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল।

একটা পাথরে পা দিয়ে পা আর হাতের চাপে শরীরটাকে ওপরে তুলে আনল বাবু। হাতের ধুলো-বালি ঝেড়ে সামনে তাকাতেই বাবু থ।

পাঁচ-ছ'জন আদিবাসী তার দিকে তীর-ধনুক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে।

॥ দুই ॥

বাবু অবাক হয়ে ওদের মুখের দিকে তাকাল। একটা মুখও চেনা মনে হয় না। ওরাও ওকে চিনতে পারেনি। বাবু বলল, কি ব্যাপার, আমার দিকে তীর তাক করেছো কেন?

তুমি কে—এইভাবে কোথা থেকে এলে? কোথায় যাচ্ছো?

মোড়লের বাড়ি। মংলুর কাছে।

লোকগুলো একটু থতমত খেয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। একজন বলল, ফালতু কথার দরকার নেই। মোড়লের বাড়ি যাবে বলছে। চল সেখানেই নিয়ে যাই। একটু এদিক-ওদিক করলেই...

হ্যাঁ, তীরে বিষ আছে!

কথা বলবে না। চলো।

ওরা বাবুকে ঘিরে ধরে নিয়ে যেতে লাগল। বাবু শুধু অপ্রস্তুতই হয়নি, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারল। আদিবাসীদের গ্রামের কাছাকাছি এসে গেছে ওরা। পেছন দিক বলে বিশেষ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ বাবুর মনে হলো, মংলুর মতো কেউ একজন যাচ্ছে। ও আর দেরি করল না। দু'হাত মুখের কাছে এনে চিৎকার করে উঠল, মংলু...এই মংলু...

ছেলেটা থমকে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকাল। বাবু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর পাহারাদাররাও তখন দাঁড়িয়ে। মংলু ক'পা এগিয়ে এসে চেনার চেষ্টা করল, কে ওকে ডাকে। বাবু চেঁচিয়ে বলল, আমি...বাবু...

বাবু! মংলু ছুটে এল ওর দিক।

লোকগুলোর মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে বাবু জড়িয়ে ধরল মংলুকে। দু'জনেরই মুখে হাসি। মংলু বলল, তোরা কবে এলি? সক্কলে এসেছিস?

হ্যাঁ! আজ সকালেই এলাম।

লোকগুলো অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। মংলু ওদের বলল, একে চিনে রাখো। এ বাবু। ওরা পাঁচজন আছে। তিনটে মেয়ে দুটো ছেলে। ঐ মন্দির, এই জমি-জায়গা সব ওদের।

লোকগুলোর একজন বলল, তাহলে বড়মা!

বড়মা ওদের দাদি। তোমরা যাও। চোখ-কান খোলা রেখো!

কি হয়েছে রে মংলু?

সর্বনাশ হয়েছে। তোদের মন্দিরের ঠাকুর চুরি হয়েছে।

বাবু অবাক হলো না। ব্যাপারটা ও আগেই আঁচ করেছিল। ও বুঝতে পারল, মূর্তিচোররা শুধু এখানে আছেই না, আরো সাংঘাতিক কিছু করার তালে আছে। ততক্ষণে লোকগুলো নদী আর ঝর্ণার দিকে চলে গেছে। বাবু আর মংলু এগিয়ে চলল। তারপর একটা গাছের ছায়ায় বসল দু'জনে। বাবু বলল, আমরা আসায় মামণি এবার খুশি হলেন না!

হবেন কী করে! এখানে যে কোনো মুহূর্তে সাংঘাতিক মারামারি হতে পারে।

কেন?

সে অনেক কথা।

ব্যাপারটা কী খুলে বল না!

শোন, এখানে বেশিক্ষণ বসা যাবে না। তোকে বাড়ির দিকে এগিয়ে দিয়ে আসি। যেতে যেতে সংক্ষেপে বলছি।

আমি কিন্তু পালিয়ে এসেছি। মামণি বেরুতে বারণ করেছিলেন।

ঠিকই করেছিলেন। এখানে কিছু লোক এসেছে। জঙ্গলের পাশে তাঁবু খাটিয়ে আছে ওরা। যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি শয়তান লোকগুলো।

কি চায় ওরা?

ওরা আসার পরই মন্দির থেকে মূর্তি চুরি হয়েছে। আমাদের সন্দেহ ওরাই চোর। তার চেয়ে বড় ব্যাপার হলো, মেলার মাঠ ওরা দখল করতে চায়। ওখানে নাকি ওরা হোটেল বানাবে!

এ কী মগের মুল্লুক! জায়গাটা তো একসময় আমাদের থাকলেও এখন তোদের মেলার প্রাঙ্গণ। কতশ' বছর ধরে ওখানে তোদের পুজোআচ্চা হচ্ছে, মেলা বসছে, গান-বাজনা, খেলাধুলা কত কী হচ্ছে। ওরা জায়গাটা নিয়ে নেবে? নিতে গেলে তো মামণির কাছে যেতে হবে।

তাই তো গিয়েছিল। মামণি সাফ আমাদের নাম করে বলে দিয়েছেন, এটা ওদের পবিত্র মেলার জায়গা। কয়েকশ' বছর ধরে মেলা হচ্ছে। এ জমি এখন ওদের। বিক্রি-টিক্রি করা যাবে না। এ কথা শোনার পর ওরা এসেছিল আমার বাবার কাছে। টাকা দিতে চেয়েছিল। বাবা ওদের ভাগিয়ে দিয়েছে। ওরা শাসিয়ে গেছে, মেরেধরে যেভাবেই হোক ঐ জমি ওরা ছিনিয়ে নেবেই। তার জন্যে লাশ ফেলে দিতে, গ্রাম উড়িয়ে দিতে ওরা ইতস্তত করবে না।

কী, এত বড় কথা!

হ্যাঁ! সেইজন্যেই তো বাবা চারদিকে পাহারা বসিয়েছে। লোকগুলো জঙ্গলের পাশে তাঁবু খাটিয়ে আছে। ওদের দিকে সবসময় নজর রাখা হচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা চলছে। আশেপাশের গ্রাম থেকেও সকলে এসে গেছে। আমাদের পবিত্র মেলা-প্রাঙ্গণ আমরা জীবন থাকতে কাউকে দখল করতে দেব না।

তার মানে এখানে এখন খুব টেনশান।

তার মধ্যে তোরা এসে হাজির।

ভালোই হয়েছে।

ভালো হয়েছে কিনা জানি না, মামণির চিন্তা তোরা বাড়িয়ে দিলি।

দেখি কোনোভাবে তোদের সাহায্য করা যায় কিনা।

বাবুদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। মংলু বলল, তুই সোজা চলে যা। মামণি যা বলেছেন শুনিস। একা একা বেরুবি না।

বিকেলে দেখা হবে।

মংলু হাত নাড়ল। বাবু গেট খুলে টুক করে ঢুকে পড়ল। রাম সিং বোধহয় কোনো কারণে নিজের ঘরে গেছে। বাবু বাড়ির মধ্যে ঢুকল না। বাগানে ঘুরতে লাগল। পুরো বাগানটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে

ঘেরা। কোনো মানুষের পক্ষে ডিঙিয়ে আসা চট করে সম্ভব নয়। বাবু ঘুরছে গাছের তলা দিয়ে, ওর মন কিন্তু জঙ্গলে পড়ে আছে। মংলু যা বর্ণনা দিল তাতে ও ঐ লোকগুলোর চোখ এড়িয়ে আসতে পেরেছে ভেবে খুশি হলো। ধরা পড়লে আর দেখতে হতো না। হয়তো ওকে সামনে রেখে মামণিকে ব্ল্যাকমেল করত। মূর্তির ব্যাপারটা চেপে যেতে হবে। মিউকে অবশ্য বলবে।

বাবুকে বাগানে ঘুরতে দেখে মিউ নেমে এল। রাজা, মোমা আর বুয়া ক্যারম খেলছে। মিউ এসে জিজ্ঞেস করল, কিছু আঁচ পেলে?

সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার রে মিউ।

মিউ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাবুর দিকে তাকায়।

মন্দির থেকে নারায়ণের মূর্তি চুরি হয়েছে। লক্ষ্মীর মূর্তিটাও চোররা নিয়ে গেছে। মূর্তি দুটো জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এটা আমি ছাড়া কেউ জানে না।

তুমি জানলে কি করে?

আমি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরে মংলুদের বাড়ি যাচ্ছিলাম। মূর্তিচোররা যেখানে মূর্তি দুটো রেখেছে, রোজকার মতো সেখানটা দেখতে এসেছিল। ওদের গলা শুনে আমি তখন ঝোপের আড়ালে। সব শুনেছি, সব দেখেছি।

পুলিশে খবর দিলেই তো হয়।

লাভ হবে না। কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক ব্যাপার হলো উৎসবের মাঠ ওরা দখল করে নিয়ে সেখানে হোটেল বানাতে চায়। মংলুরা জীবন দেবে, জমি দেবে না। ওরা চারদিক পাহারা দিচ্ছে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ওদের সম্প্রদায়ের অনেক লোক এসে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে সাংঘাতিক মারামারি-কাটাকাটি শুরু হতে পারে।

ঠিক এই সময়ই আমরা এলাম। এতক্ষণে বুঝলাম, মামণি কেন আমাদের দেখে ঘাবড়ে গেছেন।

তা তো হলো, কিন্তু কী করা যায় বল তো! এসে যখন পড়েছি তখন কিছু একটা করতেই হবে। চুপ করে বসে থাকব না নিশ্চয়ই।

ঠিকই তো। কিন্তু কী করবো বলো তো! তোমার মাথায় কোনো বুদ্ধি আসছে না?

আজ বিকেলে মংলুর সঙ্গে আগে কথা বলি, তারপর ঠিক করবো।

দোতলায় ওদের জন্যে একটা ঘর খুলে দেওয়া হয়েছে। মস্তবড় হলঘর। তিনদিক বেশ খোলামেলা। দূরে ঝর্ণাটাকে দেখা যায়। জঙ্গলের গাছগুলো যেন মাথা উঁচু করে সূর্যের দিকে হাত বাড়িয়েছে। সূর্য এখন ঠিক মাথার ওপরে। এবার পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়বে।

বিকেলবেলায় ওরা বেড়াতে বেরুল। সঙ্গে রাম সিং। ওরা জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। রাম সিং হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, উধার নেহি, উধার নেহি। গড় কি তরফ চলো।

কিঁউ? উস তরফ যানা মানা হ্যায় কেয়া?

মানা নেহি, লেকিন জঙ্গল কি পাস কুছ আদমি আয়া হ্যায়। বহুৎ খতরনাক...

দেখাও না জেরা।

নেহি। গড় কি তরফ চলো।

ওরা আর তর্ক করে না, গড়ের দিকে এগিয়ে চলে। কিকি গম্ভীর মুখে বুয়ার কাঁধে বসে আছে। অন্যসময় বিকেলের দিকে পথে বেশ কিছু মানুষজন দেখা যায়। এখন একদম ফাঁকা। চাপা টেনশান যে আছে তাও বোঝা যায়। ওরা গল্প করতে করতে এগোয়। বাবু আর মিউ ছাড়া এখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে কারো কোনো ধারণা নেই। দূর থেকে গড়টা ততোক্ষণে অনেক কাছে চলে এসেছে। গড়ের কাছাকাছি মংলু ওদের জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু সে কথা কাউকে জানতে দিল না। ওদের দেখে এগিয়ে এসে বলল, এ কী রে, তোরা কবে এলি?

রাজা উত্তর দিল, আজ সকালে। চল ঝর্ণার দিকে যাই।

মংলু কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাবু চোখের ইশারায় ওকে চুপ করিয়ে দিল। মংলু কথা না বলে ওদের সঙ্গী হলো। মোমা জিজ্ঞেস করল, এখানে কী হবে রে, মামণি জোর করে রাম সিংকে আমাদের সঙ্গে দিলেন।

হ্যাঁ, সন্ধ্যের আগে ফিরেও যেতে বলেছেন।

ওরা গড়ের পাশ দিয়ে চলে এল মংলুদের পবিত্র উৎসব প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণ বললে ভুল হবে, আসলে সেটি একটি বিরাট মাঠ। বাবু অবাক হয়ে ভাবছিল, এখানে হোটেল করার আইডিয়া কার মাথা থেকে এল কে জানে! তা হোটেল হলে চলবে ভালোই। শিলিগুড়ির এত কাছে এমন একটা সুন্দর জায়গা— বেশির ভাগ লোক তা জানেও না। দূরে তুষারশুভ্র পর্বতশৃঙ্গ, ঝর্ণা, জঙ্গল কী নেই। অল্প সময়ের মধ্যে এ জায়গার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। কিন্তু মংলুরা এখানে কিছুতেই হোটেল বানাতে দেবে না। তা ছাড়া জায়গাটা তো ওদের। মংলুরা পুরুষানুক্রমে এখানে ওদের বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করে ঠিকই কিন্তু তাতে তো আর মালিকানা সত্ত্বর পরিবর্তন হয় না। একমাত্র মামণি ছাড়া এ জায়গা বিক্রি করার অধিকার কারো নেই। তাহলে ওরা কি গায়ের জোরে জায়গাটা দখল করে হোটেল করবে?

বাবুকে একা দেখে মংলু এগিয়ে এল। মংলু দার্জিলিঙয়ে স্কুলে পড়ে। পড়াশোনায় বেশ ভালো। ছুটিতে বাড়ি আসে। বাবুদের সঙ্গে ওর ভাব সেই ছোটবেলা থেকে। মংলু জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছিস রে?

মনে হচ্ছে, লোকগুলো আরও বড় কোনো তালে আছে। হোটেল-টোটেলের গল্প বলে তোদের মনোযোগ অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখছে।

সে কী রে! এ কথা বলছিস কেন?

মন্দির থেকে মূর্তি দুটো ওরা আসার আগে না পরে চুরি হয়েছে?

ওরা আসার পরে।

ওরাও তো চুরি করতে পারে?

তা পারে!

যারা হোটেল বানিয়ে ব্যবসা করতে চায় তারা হঠাৎ মূর্তি চুরি করে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে কেন বল!

তা ঠিক! আমরা তো এইভাবে ভাবিনি।

এ সব কিন্তু আমার ধারণা মাত্র।

ভুলও হতে পারে। তবে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে বিশেষ কোনো কারণে ওরা তোদের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে।

সেই কারণটা কি?

সেইটাই তো খুঁজে বের করতে হবে।

তোর কি মনে হয় এদের সঙ্গে মূর্তি চুরির সম্পর্ক আছে? মংলু একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে।

আমার তো তাই মনে হয়।

আজ সকালে যা দেখেছে সে কথা একদম চেপে গেল বাবু। তবে ও নিশ্চিত, ব্যাপারটা রীতিমতো গোলমেলে। ওর কিরকম মনে হচ্ছে, হোটেল বানানোর ব্যাপারটা ভাঁওতা। ওরা নির্ঘাৎ অন্য কোনো তালে আছে। বাবুকে রীতিমতো চিন্তিত দেখায়।

॥ তিন ॥

পরদিন সকালে মংলু যখন এল তখন ওদের ক্যারম খেলা খুব জমে উঠেছে। একদিকে মিউ আর বুয়া অন্যদিকে রাজা আর মোমা। বাবু বসে বসে একটা গল্পের বই পড়ছিল। বাবু যখন কিছু পড়ে বা লেখে তখন ওর কোনো হুঁশ থাকে না। বইটা পড়তে পড়তে হঠাৎ বাবু 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে মংলু এসে ঘরে ঢুকল। মংলুর অবারিত দ্বার। বাবুর কথাটা ওর কানে গিয়েছিল। তার খেই ধরে জিজ্ঞেস করল, কী আবার আবিষ্কার করলি রে বাবু?

ক্যারম খেলা থামিয়ে ওরা চারজনও তখন বাবুর দিকে তাকিয়ে। ওদের প্রশ্নটা মংলু করে দিয়েছে। সকলের মুখের ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাবু বলল, ক'দিন ধরে একটা অংকর সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ আজ বইটা পড়তে পড়তে সমাধানটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কেউ আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। শুধু মিউ-এর মুখে খেলে গেল চাপা হাসি। ও বুঝতে পেরেছে, বাবুদাদার ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে ওঠার পেছনে নির্ঘাৎ বিশেষ কোনো রহস্যের সূত্র লুকিয়ে আছে। বাবুদাদা এখনই তা সকলকে জানতে দিতে চায় না। মংলু কিছু আঁচ করলেও চেপে গেল। ওরা ক্যারম খেলতে লাগল। মংলু গিয়ে বাবুর পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। ও কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু ইতস্তত করছিল।

তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কিছু বলতে চাইছিস?

মংলু চাপা গলায় বলল, সাঙ্ঘাতিক একটা ব্যাপার ঘটেছে।

বাবু সোজা হয়ে বসে। বলে, কি হয়েছে রে?

পাশের গাঁয়ের মন্দির থেকে মূর্তি চুরি হয়েছে।

ওটাও কি আমাদের এখানকার মতো অষ্টধাতুর মূর্তি?

তা জানি না, শুনছি নাকি খুব দামী মূর্তিটা।

বাবুকে একটু চিন্তান্বিত দেখায়। তাহলে ও যা ভাবছিল তা কি ঠিক নয়! না কি এটাও একটা চাল! লোকে মূর্তি চুরি নিয়ে যখন গবেষণা করবে সেই ফাঁকে ওরা ওদের কাজ সারবে! অবশ্য ও যা ভাবছে তা নাও হতে পারে। বাবু ইশারায় মিউকে ডাকল। খেলা ফেলে মিউ উঠে আসতেই বাবু বলল, আমি মংলুর সঙ্গে একটু বেরুচ্ছি। মামণি যেন জানতে না পারেন!

রাম সিং তো দেখতে পাবে!

পাবে না। আমরা এদিক থেকে বেরুবো। মামণি খোঁজ করলে বলবি বাগানে আছি। তারপর মংলুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই এসেছিস মামণি জানেন না তো?

না।

তাহলে চল!

কোথায়?

আগে চলই না।

ওরা এপাশ দিয়ে এসে বাগানের পেছনের দরজাটা খুলে বাইরে এল। বাবু সাবধানে দরজাটা পেছন থেকে টেনে দিল। কারো চোখে পড়বে না। কেউ দেখলে ভাববে, বন্ধই আছে। দুজনে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। বাবু বলল, এখন একবার গড়ের ভেতর ঢুকবো।

গড়ের ভেতর? কেন রে?

আমার মন বলছে, মূর্তি চুরি একটা বাহানা। গড়ের গুপ্তধনের কথা তো জানিস। ওরা সেই খোঁজে এসেছে।

ও তো গুজব।

নাও হতে পারে। আজ বইটা পড়তে গিয়ে আমার চোখ খুলে গেছে। ওখানেও ওপরে ওপরে চুরি করে লোকের মনোযোগ অন্য জায়গায় সরিয়ে দিয়ে গুপ্তধন খুঁজে বের করেছিল একদল ভয়ঙ্কর লোক। মানুষ খুন করতে তাদের হাত কাঁপতো না।

এদেরও তো কাঁপে না।

কেন কাউকে খুন করেছে নাকি?

হ্যাঁ! দু'তিন জনকে। প্রত্যেকের বডি জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া গেছে। ওরা সকলেই কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। আমরা ঐ জঙ্গলে শিকার করি না। ওরা কিন্তু করছে।

কথা বলতে বলতে ওরা গড়ের সামনে পৌঁছে গিয়েছিল। গড় বলতে পুরনো বিধ্বস্ত দুর্গর মতো একটা বাড়ি। রাজবাড়ি ছিল এককালে। সকালের রোদ বেশ চড়া। তবে খুব একটা কষ্ট হয় না। এখানকার হাওয়ায় হিমের পরশ সবসময়। শুধু মে-জুন মাসের দুপুরে পাহাড়গুলো তেতে উঠলেই মুশকিল।

গড়ে ঢোকার সব থেকে ভালো জায়গাটা ওরা জানে। তাই পেছন দিকে চলে গেল। কারো চোখে পড়বে না। দিব্যি মধ্যে ঢোকা যায়। চারপাশে ইঁট, পাথর আর মাটি দিয়ে গাঁথা পাঁচিলটা ভেঙে ভেঙে গেছে। মধ্যিখানে রাজবাড়ি। বাড়িটা কীভাবে কে জানে মাটির তলায় বসে গেছে। ওরা শুনেছে বাড়িটা তিনতলা ছিল। মাটির ওপর শুধু একটা তলার ভগ্নস্তূপ হলেও দু'একটা ঘর এখনো ঠিক আছে। সত্যিই যদি বাড়িটা তিনতলা হয় তাহলে মাটির ওপরের অংশটা সব থেকে ওপরের অর্থাৎ তিনতলা।

বাবুরা এর আগে বহুবার এখানে এসেছে। লুকোচুরি খেলেছে। একটা জায়গায় সিঁড়ি আছে। সেখান থেকে নিচে নামা যায়। কেউ নামে না। ভয় পায়। কী আছে কে জানে! বাবু আর মংলু গড়ের মধ্যে ঢুকে এদিক-ওদিক

লোকটাকে বেঁধে ফেলল গাছের সঙ্গে।

ঘুরে ঘুরে দেখছিল। বাবুর সন্দেহ ঠিক হলে কিছু চিহ্ন ওরা খুঁজে পাবেই। ধুলোর আস্তরণের ওপর পায়ের ছাপ নিশ্চয়ই পড়বে। দিনের আলোয় বাবু আর মংলু তাই খুঁজতে থাকে। ওরা আগে যায় নিচে নামার সিঁড়ির দিকে। নিচে কেউ নামছে কিনা আগে জানার দরকার। না, সেদিকে কোনো পায়ের ছাপ নেই। ওরা ও পাশটায় যায়। দু'তিনটে ঘর এখনো সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা দু'জনে গিয়ে সেখানে দাঁড়াল।

হঠাৎ মংলু ইশারায় বাবুকে ডাকল। বাবু দেখল, ধুলোর ওপর পায়ের ছাপ পড়েছিল। কিন্তু ফুলঝাড়ুর মতো নরম কিছু দিয়ে সেটা মুছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। তার দাগ পড়েছে। এমনিতে অবশ্য দেখা যায় না। মংলুদের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। চট করে কোনো কিছু ওদের চোখ এড়িয়ে যায় না। ও দেখেই ব্যাপারটা বুঝেছে। বাবু ইশারায় ওকে চুপ করে থাকতে বলে অন্যদিকে এগিয়ে গেল। মংলু এল ওর পেছনে। ওরা গড় থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরার পর বাবু বলল, কিছু বুঝলি?

হ্যাঁ, কেউ এসেছিল।

শুধু আসেইনি। আসার চিহ্ন মুছে দিতে চায়। তার মানে বুঝতে পারছিস, ওরা কত বড় ধুরন্ধর!

হুঁ। মংলু মাথা নাড়ল। বলল, তুই যা সন্দেহ করছিস তবে কি তাই ঠিক! কে জানে!

সিওর নই। তবে ঐ রকমই কিছু হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

তোর মাথায় এই ধারণাটা এলো কি করে?

সকালে একটা থ্রিলার পড়ছিলাম। সেখানে এইরকম একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু ওদের ওপর নজর রাখবো কি করে তাই ভাবছি।

সে ব্যবস্থা আমি করব। কাল তো দেখেছিস চারদিকে আমরা কী রকম পাহারা বসিয়েছি। আজ থেকে গড়ের দিকটায়ও পাহারা চলবে।

না, না—তাহলে সব বানচাল হয়ে যাবে। আমাদের সন্দেহের কথা ওরা যেন টের না পায়। পাহারা দেখলেই কিছু আঁচ করবে।

তাহলে?

তাই তো ভাবছি। একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু কী করব বুঝতে পারছি না।

ওরা পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে আগল লাগিয়ে দিয়ে বাগানে বেড়াতে লাগল। মিউ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, তোমরা ওপরে এস। মামণি মংলুর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।

মংলুকে দেখে মামণি বললেন, কখন এলি?

এই একটু আগে। বাগানে ছিলাম।

একটু বেশি বেশি আসিস। দেখছিস তো কী বাজে সময়ে ওরা এসে হাজির হয়েছে। ওদের বেরুতে দিতে পারছি না। তা ছাড়া ওরা যে কী জিনিস তা তো জানিস। কোথা থেকে কী করে বসবে। ভয়টা তো সেইজন্যেই।

আপনার কোনো চিন্তা নেই মামণি। চারদিকে আমাদের পাহারা আছে।

মংলুর কথা শুনে মামণিকে একটু নিশ্চিন্ত মনে হলো। তবু উনি খুঁতখুঁত করেন। ওদের বেরুতে দিতে চান না। কোথা দিয়ে যে কী ঘটবে কে জানে!

মংলুর সঙ্গে সবাই নিচে বাগানে নেমে এল। বাগানে এসে রাজা জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার বল তো মংলু, এখানে আসার পর থেকেই দেখছি মামণি কিরকম অস্থির হয়ে আছেন! আমাদের বাইরে বেরুতে দিচ্ছেন না। কী নাকি এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে! কী হয়েছে

য়ে এখানে ?

মন্দির থেকে মূর্তি চুরি হয়েছে । তার চেয়েও বড় ব্যাপার মেলার মাঠ দখল করে কয়েকজন লোক হোটেল বানাতে চায়। প্রাণ থাকতে আমরা তা হতে দেব না।

কী সাংঘাতিক ব্যাপার! মারামারি হবে নাকি? মোমা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

হতে পারে। কেন তুই লড়তে পারবি নে? বাবু জিজ্ঞেস করে।

রক্ষে করো বাবা। আমায় দিয়ে ও সব হবে না। তার চেয়ে চলো আমরা ফিরে যাই।

তোকে এইজন্যেই সকলে ভীতু বলে।

বাবু, মিউ আর মংলু একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসেছিল। একটা ঝাউগাছ ওদের মাথার ওপর যেন ছাতা ধরে আছে। ছায়ায় বসে থাকলে একটা শিরশিরে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। বাবু বলল, মংলু আজ রাত্তিরে একবার জঙ্গলে যাবি ?

জঙ্গলে কেন? মংলু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

এসে পড়েছি যখন কিছু একটা করতেই হবে। হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারব না।

কি করতে চাস!

সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। একটা দিক থেকে এগোতে হবে। তাই আজ রাত্তিরের অভিযান।

আরও খানিকক্ষণ গল্প-টল্প করে মংলু চলে গেল। বেলা গড়িয়ে গেছে। ওরা চান করে খেয়ে-টেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল। বিকেলে রাম সিংকে সঙ্গে নিয়ে ওরা জঙ্গলের দিকে বেড়াতে গেল। হঠাৎ দেশওয়ালী একজনকে দেখে রাম সিং খুশি মনে ওদের কাছ থেকে সরে গিয়ে কথা বলতে শুরু করল। বাবু বেশ জোরে জোরে কথা বলছে যাতে অনেক দূর থেকেই ওর গলা শোনা যায়। ওরা আস্তে আস্তে হাঁটছিল।

হঠাৎ জঙ্গলের একটা গাছের পেছন থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে রাজার কাঁধটা চেপে ধরল। রাজার চিৎকার বাবুর কানে গিয়েছিল। সে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। মিউও এলোপাথাড়ি ঘুঁষি মারতে লাগল। লোকটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না। কিকিও ঠুকরোতে শুরু করল। ওদের কাছে হঠাৎ দরকারের জন্যে সব কিছু থাকে। দড়ি বের করে ওরা লোকটাকে বেঁধে ফেলল একটা গাছের সঙ্গে। মুখে একটা বড় রুমাল গুঁজে দিল। চেঁচিয়ে লোকটা কাউকে ডাকতে পারবে না। থাক লোকটা ঐভাবে। এত সাহস ওদের গায় হাত দেওয়া!

রাজা ভেবেছে, লোকটা একটা সাধারণ ছিনতাইবাজ। আসলে কিন্তু তা নয়। বাবু, মিউ ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝেছে। কিছুটা বুঝেছে মংলুও। মোমা আরো ভয় পেল। মামণি যে কেন ওদের বেরুতে দিচ্ছেন না তা ওরা হাড়ে হাড়ে টের পেল। এত ঘটনা যে ঘটে গেল রাম সিং কিন্তু তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। ভাগ্যিস জানে না। ওর চোখের সামনে ঘটলে মামণির কাছে গিয়ে সাতকাহন করে বলত। মামণি তখন নির্ঘাৎ ওদের ঘরে বন্ধ করে রাখতেন না হয় কলকাতায় ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। গোটা ছুটিটাই তখন মাটি হয়ে যেত। রাস্তা থেকে দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে। তা ছাড়া ওরা ওকে জঙ্গলের দিকে মুখ করে বেঁধেছে। ওর কোনো সঙ্গীর চোখে যতক্ষণ না পড়ছে লোকটা ততক্ষণ বাঁধা থাকবে। ওরা জায়গাটা ছেড়ে একটু এগিয়ে যায়। বাবু বলে, বাড়ি গিয়ে কেউ কিছু বলিস না যেন। মামণি শুনলে আর দেখতে হবে না।

ওপাশ দিয়ে ঘুরে ওরা গড়ে চলে এল। এবার ওরা সামনে দিয়েই গড়ে ঢুকল। রাম সিং আপত্তি করেছিল। ওরা শুনল না দেখে তাকেও আসতে হয়েছে। গড়ের মধ্যে ঢোকার পর থেকে ও গজগজ করছে। ওখানে নাকি বড় বড় সাপ আছে। না ঢোকাই ভালো। কে শোনে রাম সিংয়ের কথা! ওরা চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। বাবু রাম সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, অত ভয় লাগলে তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমরা একটু পরেই যাচ্ছি। ভয় নেই, মামণিকে কিচ্ছু বলব না।

বাবুর কথায় রাম সিং যেন হাতে স্বর্গ পেল। বলল, জলদি আনা।

হ্যাঁ জি! বাবু মাথা নাড়ল।

রাম সিং বাইরে চলে গেল। মংলু বলল, চল টানেলটা একবার দেখি!

এখানে আবার টানেল আছে নাকি? বাবু অবাক হয়ে বলে।

হ্যাঁ। বেশ বড়।

ওরা সিঁড়ির দিকে না গিয়ে অন্যদিকে চলে যায়। সেদিকটা বেশ ভাঙা ভাঙা। বাবু বলল, যা অবস্থা দেখছি এককালে থাকলেও এখন আর সেই টানেলের কোনো অস্তিত্ব আছে বলে তো মনে হয় না।

নারে আছে। চল এক্ষুণি দেখতে পাবি। মংলু ওদের নিয়ে একটা ভাঙা ঘরে ঢুকল। মাথার ওপর ছাদের খানিকটা অবশিষ্ট আছে। বাকিটা ভেঙে পড়েছে। ওরা ঝুল, ময়লা সরিয়ে মংলুর পেছনে পেছনে যেতে লাগল। এক ভাঙা দরজা ঠেলে মংলু আর একটা ঘরে ঢুকল। সেই ঘরে ঢুকেই ওরা বিস্ময়ে হতবাক। ধুলোয় ভরা মেঝের ওপর কয়েকটা পায়ের ছাপ।

বাবু নিচু হয়ে বসে জুতোর ছাপগুলো দেখছিল। বলল, তিনটে লোক এসেছিল। ঐ দ্যাখ তিন জোড়া জুতোর ছাপ সামনের দিকে এগিয়ে গেছে।

অন্যদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে মংলু পায়ের ছাপ ধরে এগিয়ে গেল। পেছনে বাবু। বাবুর সন্দেহ দৃঢ় হয়। ওর মন বলে, সে যা ভেবেছে ঠিক তাই। লোকগুলো গড়ের গুপ্তধনের খোঁজে এসেছে। কিন্তু ওরা গুপ্তধনের কথা জানল কী করে? জানার তো কথা নয়। ওরাও কাউকে কিছু বলেনি।

তাহলে ?

বাবু লক্ষ্য করল জুতোর ছাপগুলো পাশের ঘরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। তারপর ফিরে গেছে। মংলুও তা বুঝতে পেরেছে। বলল, বাঁচা গেল, ওরা আর এগোতে পারেনি।

তুই কি করে জানলি এখানে কোথাও গুপ্তধন আছে? তোরও তো জানার কথা নয়।

নয়ই তো!

তাহলে ?

চাপা গলায় মংলু বলল, আমাদের বাড়িতে একটা ম্যাপের মতো জিনিস

আছে। তাতে অনেকগুলো নিশানা। আমি বুঝতে পারিনি। আন্দাজ করেছিলাম ওটা গড়ের ম্যাপ, আর জায়গাটাও এইখানে।

ম্যাপটা একবার আনতে পারিস?

কি করে আনবো বল, ওটা আছে আমাদের পুজোর স্থানে। বাবা-মার বিশ্বাস ওর মধ্যে নাকি কী সব পবিত্র আত্মা-টাত্মার ব্যাপার আছে। আমি একদিন দেখেই বুঝেছি, আত্মা-টাত্মা সব বাজে কথা, আসলে ওটা একটা ম্যাপ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওটা এই গড়েরই ম্যাপ আর ওর মধ্যেই আছে গুপ্তধনের নিশানা।

চল তোদের বাড়ি যাই। তোর বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ম্যাপটা একবার দেখবো।

বাবা তো এখন বাড়ি নেই। তুই বরং কাল বিকেলে আয়। বাবা কাল বিকেল থেকে বাড়িতেই থাকবে।

সেই ভালো। চল এবার ফেরা যাক।

মিউ যে কিকিকে বাইরে পাহারা দিতে বসিয়ে রেখে এসেছিল তা কেউ জানে না। হঠাৎ কিকি উড়ে এসে মিউ-এর কাঁধে বসে বলল, বাইরে তিনজন লোক এসেছে।

কিকির খবর মিথ্যে হবে না। আমাদের সাবধান হতে হবে।

আমাদের লুকিয়ে পড়ার দরকার।

কিন্তু লুকিয়ে পড়া হলো না, তার আগেই তিন জন লোক এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। এতগুলো ছেলেমেয়েকে দেখে ওদের সর্দার যেমন অবাক তেমনি বিরক্ত। বলল, এগুলো আবার কোথা থেকে এসে জুটল?

এই তোরা কোথা থেকে এসেছিস রে?

কলকাতা। এখানে আমাদের ভীষণ ভালোবাসে সকলে। আমরা গড় দেখতে এসেছি।

তা গড়টা সত্যিই দারুণ। এখানে কি করছিস?

ঘুরে দেখতে দেখতে এখানে এসে পড়েছিলাম।

অন্য একজন বলল, সর্দার, মোড়লের ছেলে।

কোথায়?

ঐ তো ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে। টেনে আনবো?

না, না, ভুলেও অমন কাজ করো না। এমনিতে ওরা সব সময় আমাদের ওপর নজর রাখছে। তার ওপর ছেলেটা নিখোঁজ হলে আর দেখতে হবে না।

সর্দারের চাপা গলা ওরা শুনতে পেল না। ওদের একজন বাবুদের কাছে এগিয়ে এসে কড়া গলায় বলল, এই ভাঙা গড় দেখার কী আছে অ্যাঁ! যা কেটে পড় এখান থেকে।

লোকটার কাঁধে একটা এ কে ৪৭।

বাবুরা গড় থেকে বেরিয়ে এল।

মংলুর দিকে ফিরে বাবু বলল, তুই বাড়ি চলে যা। কাল বিকেলে তোদের বাড়ি গিয়ে ম্যাপটা দেখবো।

আচ্ছা!

বাবুরা বাড়ির পথ ধরল। রাম সিং চলল ওদের পিছনে পিছনে। মংলু চলে গেল নিজেদের বাড়ির দিকে।

।। চার ।।

গভীর রাত, সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। মিউ জেগে আছে। ও জানে, একটু পরেই বাবুদাদা বেরুবে। ওকে সতর্ক থাকতে হবে। সকালের মধ্যে না ফিরলে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যবস্থাটা যে কী হবে মিউ তা জানে না। তবে বাবুদাদার এই রাত্তিরে জঙ্গলে যাবার কথা মিউ কাউকে বলেনি। রাজাদাদাকেও না।

বাবু একটা কালো প্যান্ট পরেছে। গায় ব্রাউন রংয়ের জ্যাকেট। তার রংটাও কালচে হয়ে গেছে। পকেটে টর্চ, দড়ি, ছুরি সবই আছে। মিউ পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে ইশারায় চুপ করে থাকতে বলে বাবু বেরিয়ে পড়ল। মিউ জানে বাবুদাদা কিভাবে আর কোথায় যাবে। বাবুদাদা বরাবরই এইরকম। বড্ড ঝুঁকি নেয়। সেবার তো সমুদ্রের ধারে ঝুঁকি নিতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল। বাবুদাদাকে খুঁজতে গিয়ে ওরাও পড়েছিল শত্রুর হাতে। পুরনো কথা না ভাবাই ভালো। মিউ জানলা দিয়ে দেখল, বাবুদাদা বাড়িয়ে পেছন দিকে চলে গেল। খিড়কির দরজা খুলে বেরুবে। ফিরে আসবেও ওখান দিয়ে। সকালেও ওখান দিয়ে বেরিয়েছিল। কেউ বুঝতে পারেনি। এবারও পারবে বলে মনে হয় না।

বাবু বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। চারদিকে ঘন অন্ধকার। পাহারাদাররা যে কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছে কে জানে। বাবু সাবধান হয়। বড় রাস্তার দিকে না গিয়ে ও গাছ-গাছালির পাশ দিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল। আস্তে আস্তে অন্ধকারে ওর চোখ সয়ে আসে। দূরে উঁচু উঁচু কালো মতো কিছু দেখে বাবু বুঝল যে ও প্রায় জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু বাতাস এসে গাছের গায় দোলা লাগানোর ঝিরঝিরে একটা শব্দ কানে আসে। জঙ্গলের কাছাকাছি একটা-দুটো করে জোনাকি জ্বলে। জোনাকি নাকি রাতের পথিককে আলো দেখায়। ঐ আলোয় অবশ্য পরিষ্কার করে কিছু দেখা যায় না। কিন্তু মনে জোর পাওয়া যায়। মনে হয় আমি একা নই, ওরাও আমার সঙ্গে জেগে আছে।

বাবু ততক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ও দ্রুত এগিয়ে যায়। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার যেন আরো ঘন হয়ে আছে। বাবুর পকেটে টর্চ আছে। কিন্তু জ্বালার উপায় নেই। জ্বাললেই শত্রুর চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশ কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। তাঁবু কোথায় লাগানো হয়েছে ও জানে। সেইদিকেই এগিয়ে গেল বাবু। জঙ্গল শেষ হয়ে গেছে। গাছগুলো এখানে অনেক দূরে দূরে। বাবু একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ায়। সামনে সার সার তাঁবু। বাবু দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ইস্পাত কঠিন তার শরীর এখন উত্তেজনায় টানটান।

বাবু গুনে দেখল, গোটা আষ্টেক তাঁবু আছে। তবে রসদ খুব একটা বেশি নেই বলেই বাবুর মনে হলো। অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। পায় পায় বাবু এগিয়ে যায় তাঁবুগুলোর দিকে। বাবু মংলুর কাছে শুনেছে, ঐ তাঁবুগুলোর মধ্যে একটিতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। কিন্তু সেটি কোনটি? সেইটাই ওকে খুঁজে বের করতে হবে। বাবু আর এগোতে পারলে চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না। যারা তাঁবু পাহারা দিচ্ছে তারা যাতে কিছু

দেখতে না পায় তার জন্যে বাবু অত্যন্ত সতর্ক। মংলুর কাছে শুনেছে, একদম শেষের তাঁবুটা ওদের অস্ত্রাগার। ওদের গোলাবারুদের স্টক কতটা বাবু সেইটাই জানতে চায়।

বাবু বেশি এগোতে সাহস পাচ্ছে না। অন্ধকারের মধ্যে কেউ কি এখানে-ওখানে পাহারায় নেই? সবাই কি ঘুমোচ্ছে! বিশ্বাস করতে মন চায় না। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবু গুনল মোট চারটে তাঁবু। কত লোক হতে পারে? তাঁবুর কাছে যাবে বলে পা বাড়াতে গিয়ে বাবু থমকে দাঁড়াল। দুটো লোক একটা তাঁবু থেকে বেরুল। চোখ সয়ে গেছে বলে ও দেখতে পেল। বাবু যেখানে দাঁড়িয়ে সেই দিকেই আসছে।

আতঙ্কিত বাবু দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখতে পাবে না তো! অন্ধকার বলেই ভরসা। লোক দুটো কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। একজন বলল, আর ক'দিন এখানে থাকতে হবে বল তো, আর ভালো লাগছে না।

বস যে জিনিসটা খুঁজছে সেটা এখনো পায়নি।

কি খুঁজছে রে?

বলেনি, তবে আন্দাজ করতে পারছি গুপ্তধন!

গুপ্তধন! ঐ গড়ে?

হ্যাঁ।

লোক দুটো বাবুর প্রায় গা ঘেঁষে চলে গেল। অন্ধকার রাত, কালো প্যান্ট আর জ্যাকেট বলে ওদের চোখে পড়েনি। কিন্তু মোক্ষম কথাটা বাবু শুনে নিয়েছে। দুটো লোকের মধ্যে একজন বলল, যা করার রবিবারেই করবে বস। দরকার হলে ডিনামাইট চার্জ করে গড়ের খানিকটা অংশ উড়িয়ে দেবে বস।

গ্রামের লোকেরা কি তাহলে আমাদের ছেড়ে দেবে?

ওদের কিছু করার থাকবে না। মোড়ল সহ আট-দশটা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। বোমা মারা হবে।

অনেক লোক মরবে যে!

মরুক। আমাদের কী!

একটা লোক দাঁড়িয়ে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল বলে বাবু এতগুলো কথা শুনতে পেল। বাবু বুঝল, ওরা এখন মূর্তি যেখানে পুঁতে রাখা হয়েছে সেখানে গেল। ওরা চোখের আড়ালে চলে যেতেই বাবু হামাগুড়ি দিয়ে শেষ তাঁবুটার দিকে এগিয়ে গেল। খুব একটা বেশি দূরে নয়। তাই সময় লাগল না বেশি। তাঁবুর চারপাশটা সামান্য খোঁড়া। বাবু জানে কেন খোঁড়া হয়েছে। ও স্কুলে এন সি সি করে। ক্যাম্পে গেলে ওরাও তাঁবুর চারপাশটা খুঁড়ে নেয়। বৃষ্টির বা অন্য কোনোভাবে জল এলে তাঁবুর মধ্যে তাহলে ঢুকবে না।

বাবু হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর সামনের দিকটায় এল। তাঁবুর পর্দা ফেলা। মধ্যে থেকে চাপা নাক ডাকার শব্দ আসছে। বাবু আস্তে করে পর্দাটা তুলল। যা ভেবেছে ঠিক। একটা লোক ঘুমোচ্ছে। তার চারপাশে গোলাবারুদের বাক্স। রুড়কিতে (সুড়ঙ্গ রহস্য দ্রষ্টব্য) দেখেছিল বলে ওর বুঝতে অসুবিধে হলো না। এখানে যা গোলাবারুদ আছে তা এই গ্রামটা উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বাবুর যা দেখার ছিল তা সে দেখে নিয়েছে। ভাবেনি এত সহজে কাজ হাসিল করতে পারবে। যে কোনো মুহূর্তে লোক দুটো ফিরে আসতে পারে। তার আগেই এখান থেকে সরে পড়ার দরকার। আসল খবরটা তো পেয়ে গেছে। রবিবার হচ্ছে এদের 'ডি ডে'। যা করার তার আগেই করতে হবে।

বাবু হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলে ফিরে গেল। যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয়। ধরা পড়লে আর দেখতে হবে না। কোথায় যে এদের পাহারা কী ভাবে আছে কে জানে! বাবু পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। শব্দ একটা হচ্ছেই। সেইজন্যে বাবুর এই সাবধানতা। হঠাৎ বাবুর মনে পড়ল, বিকেলে বেঁধে রেখে যাওয়া লোকটার কথা। বাবু জঙ্গলের বাইরে এসে সেইদিকে এগিয়ে গেল। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বাবু থ! লোকটা তো নেই! তাহলে ওর সঙ্গীরা এসে ওকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। এরপরও লোকগুলো আরো বেশি সতর্ক হয়ে গেল না কেন সেইটাই বাবুর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

মিউ জেগেই ছিল। বাবু ফিরে আসতেই ও গিয়ে পাশে দাঁড়াল। বলল, কিছু খবর যোগাড় করতে পেরেছো?

হ্যাঁ! আমাদের যা করার শনিবারের মধ্যে করে ফেলতে হবে। রবিবার ফাইনাল হয়ে গেল যে রে!

বাবুর কথার মানে বুঝতে পারল না মিউ। বলল, যা বলার ঠিক করে বলো দেখি।

বাবু বলল, হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় নেই। আমাদের যা করার তা শনিবারের মধ্যেই করে ফেলতে হবে। কারণ ওরা এ গ্রামের ক্ষতি করতে চাইছে। আর তা করবে রবিবারে। বাবুকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখায়।

বাবু আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। রাজা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মিউ পাশের ঘরে শুতে গিয়ে দেখল মোমা আর বুয়া ঘুমোচ্ছে। কিকি চোখ পিটপিট করে ওকে দেখছে। এই ঘুমিয়ে পড় বলে মিউ শুয়ে পড়ল।

পরদিন দুপুরবেলায় বাবু রাজাকে সঙ্গে নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মিউ, মোমা আর বুয়া তখন মামণির শোবার ঘরে, ওঁর সঙ্গে গল্প করছে। ওরা জানে, বাবুদাদা আর রাজা এক্ষুণি বেরুবে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ওরা ফিরে আসবে। পাছে খোঁজ করেন কিংবা জেনে ফেলেন তাই ওরা মামণির ঘরে গিয়ে গল্প করছে।

বাবু আর রাজা জোর পায় মোড়লের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পথে কাউকে পাহারা দিতে দেখল না ওরা। মংলু বাড়ির বাইরে ওদের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দেখে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। বাবু জিজ্ঞেস করল, নকশাটা বের করেছিস?

হ্যাঁ।

বের করে দেখি।

মংলু উঠে গিয়ে একটা বইয়ের মধ্যে থেকে একটা পুরনো জীর্ণ কাগজ এনে বাবুর হাতে দিল। বাবু নকশাটা মেলে ধরে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। রাজাও দেখছে। বাবু বলল, গড় যখন বিধ্বস্ত

হয়নি তখনকার চেহারা।

ও সব দেখে কী হবে, তুই আসল জিনিসটা দেখার চেষ্টা কর।

কথা বললেও বাবুর চোখ কিন্তু ম্যাপটার ওপরেই ছিল। ম্যাপ বা নকশাটার এক কোণে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু লেখা। তার মর্ম উদ্ধার করার উপায় নেই। রাজাও ঝুঁকে পড়ে দেখছিল। সে বলল, দেখে তো মনে হচ্ছে, এখন মাটির তলায় আছে দুটো তলা।

ঠিক বলেছিস! আমরা মোটামুটি ঠিক জায়গাতেই গেছি। কিন্তু ওটা তিনতলা। আমাদের একতলায় নামতে হবে।

কিভাবে নামবি?

কেন সিঁড়ি তো আছে। আজ বিকেলেই চেষ্টা করব।

কিন্তু গুপ্তধনটা কোথায় আছে বুঝতে পেরেছিস কি?

ঠিক না পারলেও মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি। আজ বিকেলে গিয়ে জায়গাটা আগে ভালো করে দেখি তারপর যা করার করা যাবে।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বাবু মংলুকে জিজ্ঞেস করল, তোর বাবা বাড়িতে আছেন?

কেন তোর কি দরকার?

দরকার আছে। অত্যন্ত জরুরি দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁর সঙ্গে আমায় কথা বলতে হবে।

মংলু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, দাঁড়া বাবা বাড়িতে আছে কিনা দেখে আসি।

তাই যা! তাড়াতাড়ি কর।

মংলু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ঘুরে এসে বলল, না রে, বাবা একটু আগে বেরিয়ে গেছে।

মুশকিল হলো দেখছি!

কেন ব্যাপারটা কি? আমায় বলবি না?

বলবো তো নিশ্চয়ই। তবে এক্ষুণি নয়। চল, আমাদের সঙ্গে যাবি তো?

হ্যাঁ চল। মংলু মাকে বলে ওদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ওরা তাড়াতাড়ি পা চালায়। মামণি ঘুম থেকে ওঠার আগেই ওদের বাড়ি পৌঁছুতে হবে। দুপুরের চড়া রোদ এখন অনেক নরম। উত্তর দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসছে। গা শিরশির করে। এখানে এখন সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝম করে ঠাণ্ডাটা বেড়ে যায়। তবে দুপুরটা এখন আর আগের মতো ছোট নয়। সেইটাই সুবিধে।

মংলুকে সঙ্গে নিয়ে বাবু আর রাজা খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। মিউরা তখনো মামণির ঘরে। কিকি বাগানে ছিল। উড়ে এসে বাবুর কাঁধে বসল।

বিকেলবেলায় ওরা সকলে মিলে আবার গড়ে গেল। বাবুর পকেটে নকশাটা আছে। রাজা, মোমা আর বুয়াকে ওপরে রেখে বাবু, মিউ আর মংলু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল। একতলা পর্যন্ত নামা যাবে কিনা ওরা জানে না। কিন্তু সিঁড়ির ধুলোয় পায়ের ছাপ দেখে ওদের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ওদের আগেও কেউ নিচে নেমেছে। মংলু কিছু বলতে যাচ্ছিল। বাবু ইশারায় চুপ করিয়ে দিল। ওরা যত নিচে নামছে অন্ধকার তত বাড়ছে। বাবু পকেট থেকে টর্চটা বের করে জ্বালল। ওরা ততোক্ষণে দোতলায় পৌঁছে গেছে। ঘরগুলোর কোনোটা ভাঙা, কোনোটা ঠিক আছে। আরো খানিকটা নামার পর সিঁড়িটা ভেঙে গেছে। জায়গাটা স্তূপের মতো।

বাবু টর্চ জ্বেলে নিচেটা দেখে বলল, তোরা এখানে দাঁড়া। আমি লাফিয়ে নামছি।

সাবধান বাবুদাদা, নিচে সাপ-টাপ থাকতে পারে। মিউ-এর কথা শেষ হলো না, বাবু ঝুপ করে নেমে পড়ল। বাবুর চোখের সামনে নকশাটা ভাসছে। ও বাঁদিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখল জায়গাটা একদম বিধ্বস্ত। যাবার উপায় নেই। টর্চ নেবালে চারদিকটা ঘন অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। দম নিতে একটু কষ্ট হয়। চারদিকে কী রকম যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। কতকাল যে এখানে মানুষের পা পড়েনি কে জানে!

সত্যিই কী তাই! বাবুর সন্দেহ হয়, ও একা নয় আশেপাশে আরো কেউ আছে। কথাটা মনে হতেই বাবু সতর্ক হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সাবধান করে। টর্চ নিবিয়ে বাবু চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর টর্চটা জ্বালায়। আলোটা সামনে পড়তেই বাবু ভয়ে কেঁপে ওঠে। বিশাল একটা সাপ ওর হাত চার-পাঁচ দূরে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাবু এক লাফে ক'পা পিছিয়ে আসে। সাপের দিকে আলোটা ফেলতেই ও ভীষণভাবে চমকে ওঠে। একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে প্রায় সাপটার কাছাকাছি। বাবুর বুঝতে অসুবিধে হলো না, সাপের কামড়ে লোকটার মৃত্যু হয়েছে। ওর রাইফেলটা ছিটকে পড়েছে একটু দূরে। রাইফেলের কাছ থেকে সাপটা বেশ খানিকটা দূরে। বাবু এক পা, এক পা করে সরে গিয়ে রাইফেলটা তুলে নিল। সাপটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ফণাটা একটু একটু করে দুলছে। সরু জিভটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে। সাপটার মাথার ওপর খড়মের চিহ্ন। বাবু বুঝল, পদ্মগোখরো। একেই বোধহয় বাস্তসাপ বলে। বাবু আর দেরি করল না। ও আস্তে আস্তে ভাঙা সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এল। একপাশে ভাঙাচোরা ক'টা ধাপ রয়েছে। তাই দিয়ে উঠে এসে বাবু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, মংলু, আমায় টান।

মংলু এক টানে বাবুকে ওপরে তুলে আনল। বাবু বলল, এপাশটায় সরে আয়, তোদের একটা জিনিস দেখাচ্ছি।

ওরা বাঁদিকে সরে গিয়ে দাঁড়াতেই বাবু টর্চের আলো নিচে ফেলল। সাপটা তখনো ফণা তুলে উঁচু হয়ে আছে। লোকটাও পড়ে আছে প্রায় তার সামনে। ওপর থেকে সেইরকমই মনে হচ্ছে। মিউ-এর মুখ থেকে আচম্বিতে বেরিয়ে এল, উঃ কী ভয়ঙ্কর! লোকটা মরে গেছে?

নিশ্চয়ই। এই দ্যাখ ওর রাইফেল।

ওরা কি এর পরেও গুপ্তধনের খোঁজে নিচে নামবে?

আমার মনে হয় নামবে। সাপটাকে গুলি করে মারা মোটেই কঠিন নয়।

মংলু দু'হাত তুলে নমস্কার করছিল। বলল, অসম্ভব। ঐ বাস্তসাপকে গুলি করে মারা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়।

আমার মনে হচ্ছে, ও গুপ্তধনের পাহারাদার! ওর ক্ষতি যে করতে যাবে তার রেহাই নেই।

ওরা আর দেরি করল না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। মিউ জিজ্ঞেস করল, বাবুদাদা তোমার কী মনে হয়—গুপ্তধন কি ওখানেই কোথাও আছে?

তা কী করে বলব! তবে নকশা অনুযায়ী কাছাকাছি কোথাও পোঁতা আছে।

নকশা মানে?

বাবু মংলুদের বাড়ি গিয়ে নকশাটা দেখার ও নিয়ে আসার সব কথা বলল।

ওরা ততক্ষণে ওপরে চলে এসেছে। বাবু বলল, এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়। ঐ লোকটার খোঁজে কেউ আসতে পারে। তার আগে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। বিশেষ করে এইটার জন্যে। বাবু এ কে ৪৭টা তুলে সকলকে দেখাল।

বাইরে রাম সিং দাঁড়িয়েছিল। বলল, এসে গেছ, চলো ঘর ওয়াপাস!

দাঁড়াও না একটু ঘুরি। নদীর ধারে চলো।

ওরা নদীর ধারের দিকে চলল। পথে মোড়লের বাড়ি পড়বে। বাবু রাইফেলটা মংলুর হাতে চালান করে দিয়েছে। মংলু বুঝেছে, ওটা নিয়ে গিয়ে ওদের বাড়িতে রেখে আসতে হবে। বাড়ির কাছে আসতেই এক্ষুণি আসছি বলে মংলু বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। ওরা নদীর দিকে এগুতে লাগল। একটু পরেই মংলু ছুটে এসে বলল, বাবা এসে গেছে। এখন কথা বলবি?

হ্যাঁ চল।

আমরাও যাই?

বাবু মংলুর দিকে তাকাল। সকলের যাওয়া মানে রাম সিংও যাবে। রাম সিংয়ের সামনে কোনো কথা বাবু বলতে চায় না। তাই বলল, মংলু, এখন চল নদীর ধারে যাই। ঝর্ণার দিকটায় কতদিন যাইনি!

ওরা ঝর্ণার দিকে এগিয়ে যায়। বিকেল গড়িয়ে এসেছে। জায়গাটা আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে উঠছে। বেশি গাছ এখানে নেই। যে ক'টা আছে তারা মাথা উঁচু করে আকাশটাকে ছুঁতে চাইছে। দূরে দিন অবসানের দুঃখে ম্রিয়মাণ যেন পশ্চিমাকাশ। লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের মাথায় মাথায়। পাহাড়ের নিচের দিকে অন্ধকার ঘাপটি মেরে বসে আছে। সূর্য ডুব দিলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। চারদিক তখন ছেয়ে যাবে ঘন অন্ধকারে।

তীর-ধনুক হাতে নিয়ে চার-পাঁচজন আদিবাসী এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। মংলুকে দেখে ওরা হাসল। রাম সিং এতক্ষণ কিছু বলেনি, এবার বলে উঠল, চল এবার ফিরে যাই। সাঁজ হয়ে গেছে। আর দেরি করলে মামণি বকবেন।

বাবু বলল, সেই ভালো। ঝর্ণার ধারে না হয় কাল আসা যাবে।

মংলুর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে পাহারাদাররা ফিরে গেল। ওরাও বাড়ির পথ ধরল। বাবু বলল, একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না!

কী! মংলু উৎসুক চোখে তাকায়।

তোদের পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে লোকগুলো গড়ে যাচ্ছে কি করে?

যেমন করে আমরা গেলাম। ওদের বলে দেওয়া আছে আগ বাড়িয়ে কেউ ঝামেলা পাকাবে না।

আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হচ্ছে।

কী?

গড়ে যাবার নিশ্চয়ই অন্য কোনো পথ আছে।

না তা নেই। তবে ওরা গড়ের মধ্যে কোথাও আস্তানা গাড়তে পারে।

আমরা তো দেখতে পেলাম না।

আমরা সবদিকটা ঘুরে দেখিনি। তবে ভালোই হয়েছে। লোকগুলো সুবিধের নয়। বড় ভয়ঙ্কর।

মংলু, তোর বাবাকে নিয়ে কাল সকালে একবার আসতে পারিস? খুব দরকার। দেরি হলেই বিপদ।

বিপদ? ঠিক আছে বাবাকে বলবো।

তুই তাহলে এখান থেকে ফিরে যা। দেখছিস তো চারদিক কিরকম ফাঁকা।

মংলু হাসল, তার জন্যে কোনো চিন্তা নেই।

মংলু ফিরে গেল। ওরাও সন্ধ্যের মুখে বাড়ি পৌঁছে গেল। ওদের দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে মামণি রান্নাঘরে গেলেন রাত্তিরে কী রান্না হবে বলে দিতে।

বাবু সকলকে ডেকে কাল রাত্তিরে যা দেখেছে আর শুনেছে সব বলল। মোমা আঁতকে উঠে বলল, তুমি একা ঐ রাত্তিরে বাইরে গিয়েছিলে? যদি কিছু হতো!

হয়নি তো!

রাজা বলল, এমন একটা কিছু করা যায় না যাতে ওদের অস্ত্রাগার উড়িয়ে দেওয়া যায়?

আমিও সেই কথাই ভাবছি। কিন্তু কি করে? কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না কী করব।

মিউ বলল, কোন তাঁবুতে ওদের অস্ত্র, বারুদ-টারুদ আছে তুমি জানো তো?

তা জানি।

তবে আর অসুবিধে কী! খুব সহজেই ওদের অস্ত্রাগার উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

কি করে?

তীর ছুঁড়ে!

মানে?

বুঝলে না, ওদের তীরের ফলায় ন্যাকড়া জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দিতে হবে। তারপর সেই জ্বলন্ত তীর ক'টা ওদের ঐ তাঁবুতে ছুঁড়লেই...ব্যস...

ওদের এ কে ৪৭গুলো চুপ করে থাকবে মনে করছিস! কতগুলো লাশ পড়বে তাহলে? যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে!

এ ছাড়া আর উপায় কী!

ঠিক আছে, কাল মংলু আর ওর বাবাকে কথাটা বলে দেখি।

মংলুর বাবা খুনোখুনি চান না।

সে তো আমরাও চাই না।

পরদিন সকালে মংলু ওর বাবাকে নিয়ে এল। বাবুর কাছে সব শুনে মোড়ল লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, মিউদিদি ঠিক বুদ্ধি দিয়েছে। জ্বলন্ত তীর ছুঁড়ে ওদের শেষ করব।

চুপ চুপ! মামণি শুনতে পেলে আর দেখতে হবে না।

মোড়লকে আস্তে কথা বলতে বলে বাবু বলল, মূর্তিগুলো উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা করার দরকার।

ওদিকে যে যেতেই দিচ্ছে না। একজনকে গুলি করে মেরেছে। তাই বলে আমরা চুপ করে থাকব না। মন্দিরের মূর্তি আমরা উদ্ধার করবই।

কিন্তু কী করে, ওরা অতো সহজে হাল ছেড়ে দেবে না! আচ্ছা ওরা কতজন আছে বলতে পারেন?

বেশি নয় ছ'সাত জন!

একজন তো মরেছে।

মানে!

গড়ে গুপ্তধনের খোঁজে গিয়েছিল, সাপের কামড়ে মরেছে।

কি করে জানলে?

আমি দেখে এসেছি। তার রাইফেলটা নিয়ে এসেছি। মংলু সেটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে রেখেছে।

আমাদের বাড়িতে! মংলু, তুই তো কিছু বলিসনি!

বলার চান্স পেলাম কোথায়!

কিন্তু এখন কী করা যায় সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। অথচ তোমার কথা মতো যা করার শনিবারের মধ্যেই করতে হবে। তা না হলে রবিবারে ওরা আমাদের গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেবে।

মংলুর বাবা চুপ করলেন। তাঁকে রীতিমতো চিন্তিত দেখাচ্ছে। বাবুর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নিশ্চিত ওরা হোটেল করতে চায় না? হোটেল করার নামে আমাদের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দিয়ে ওরা মন্দিরের মূর্তি আর গড়ের ধনভাণ্ডার পাচার করার তালে আছে?

আমার তো তাই মনে হয়। গড়ের ধনভাণ্ডার বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

বাবুর কথা শেষ হলো না মংলুর বাবা বলে উঠলেন, গড়ের ধনভাণ্ডার কোথায় আছে আমি জানি!

জানেন? তাহলে উদ্ধার করেন না কেন? ঐ টাকায় তো এই গ্রামের চেহারাটাই বদলে দেওয়া যায়!

তা যায়। কিন্তু আমরা ঐ ধনভাণ্ডারে হাত দেব না। তা ছাড়া সর্পদেবী সেই ধনভাণ্ডার রক্ষা করছেন। আমাদের বংশের কেউ ছাড়া অন্য কেউ ওখানে হাত দিতে গেলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

আপনি কি করে জানলেন?

পুরুষানুক্রমে আমরা রক্ষা করে চলেছি একটা নকশা। ধনভাণ্ডার কোথায় রাখা আছে তাতে তা স্পষ্ট করে লেখা আছে।

বাবু আর মংলু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বাবু বলল, আজ বিকেলে আমরা বরং ওদের তাঁবুর দিকে যাই।

বাবুর কথা শেষ হলো না মংলুর বাবা বলে উঠলেন, না, না, বড্ড ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে।

বাবু হাসল। বলল, খারাপ দিকটা আগে তুলে ধরছেন কেন?

সেইটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

মংলুর বাবার কথা শেষ হবার আগেই মামণিকে আসতে দেখা গেল। মংলুর বাবাকে বলা ছিল। উনি চুপ করে গেলেন। মামণি আসতেই উনি উঠে গিয়ে প্রণাম করলেন। মামণি বললেন, কী ব্যাপার বলো তো মোড়ল, তুমি এই সাতসকালে?

বড় চিন্তায় আছি মা, তাই ছেলেটাকে আপনার হাতে দিয়ে যাচ্ছি।

মংলু হাঁ হাঁ করে উঠে বলল, কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি তোমার সঙ্গে ফিরে যাব!

মামণি হেসে মংলুর দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন, তোর বন্ধুরা রয়েছে, ক'দিন এখানে থাক না।

বাবু ইশারায় মিউকে কিছু বলল। মিউ বলল, থাক না মংলু, খুব মজা হবে।

মংলুর উভয় সংকট। এদের সঙ্গে থাকলে খুব মজা হবে। ওদিকে আবার গ্রামের এইরকম বিপদ। ও কী করে এখানে হাত গুটিয়ে বসে থাকে! গ্রামে যদি ঝামেলা হয় তাহলে ওদের বাড়িটাই তো সবার আগে পুড়িয়ে দেবে। মংলুর মনের অবস্থা বুঝে বাবু বলল, অতো ভাবছিস কেন, আমরা তো আছি!

বাবু কী বলতে চাইছে তা বুঝতে মংলুর কোনো অসুবিধে হলো না। ওর মুখে হাসি ফুটল। ওর বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে আমি তাহলে এখানেই থেকে যাচ্ছি। মাকে বলে দিও।

।। পাঁচ ।।

সেদিন বিকেলে ওরা আবার জঙ্গলের দিকে গেল। আকাশে তখন দিনের শেষ সূর্যের আলো মেখে মেঘের দল খেলে বেড়াচ্ছে। গাছগুলো হাওয়ায় মাথা নাড়ছে। পায়ের তলায় শুকনো পাতার সরসর ধ্বনি। আগে এই জঙ্গল পাখির কলকাকলিতে মুখর থাকতো। ওরা লক্ষ্য করেছে, পাখির সংখ্যা এখন নগণ্য। যারা আছে তারাও ডাকছে না। যেন প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে তাদের দিন কাটছে। আগে শুকনো ডালপালা কুড়োতে দেহাতি মেয়েরা আসতো। এখন তারাও আর আসে না। গোটা জঙ্গল জুড়ে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব।

বাবু কোনোদিকে তাকায় না, সোজা এগিয়ে যায়। মূর্তিগুলো যেদিকে মাটির তলায় পোঁতা আছে সেদিকে নয়, তাঁবুর দিকে। বাবু মিউ-এর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আর মংলু তাঁবুর দিকে যাচ্ছি। তোরা এখানে থাক। দরকার হলে আমাদের সাহায্যে ছুটে আসবি। আমরা যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারবি লালবাজারে ফোন করে শঙ্করকাকুকে সব জানিয়ে দিবি। মামণিকে কোথাও গেছি-টেছি বলে বুঝিয়ে দিবি। পারবি তো?

হ্যাঁ, পারবো। ওরা যদি তোমাদের অ্যাটাক করে তাহলে কিন্তু আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবো না। ঝাঁপিয়ে পড়বো। মিউ বলল।

তা পড়িস, তবে কিকিকে লড়িয়ে দিবি তাহলে দেখবি তোদের কাজ কতটা সোজা হয়ে যায়।

আচ্ছা।

বাবু আর মংলু তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। ওরা গাছের আড়াল থেকে দেখছে। ওদের বুকে হাতুড়ি পিটছে। যদি কেউ এখন তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে! লোকগুলো বড় সাংঘাতিক। মানুষ মারতে ওদের হাত কাঁপে না। হঠাৎ ওদের দম বন্ধ হয়ে আসে। ওরা দেখতে পেল, তাঁবু থেকে একটা লোক বেরিয়েই বাবু আর মংলুকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। জায়গাটা বেশি দূরে নয় তাই ওদের চিনতে অসুবিধে হলো না লোকটাকে। এই লোকটাকেই সেদিন ওরা জঙ্গলে গাছে বেঁধে রেখে গিয়েছিল। সেই ঝাল

আজ না বাবু-মংলুর ওপর ঝাড়ে।

বাবু-মংলুও থমকে দাঁড়িয়েছে। ওরা বুঝতে পারছে না কী করা উচিত। বাবু আর মংলু নদীর দিকে চলতে শুরু করল। লোকটা ওদের চিনতে পেরেছে। সে এক লাফে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। বাবু আগেই দেখে নিয়েছে লোকটার হাতে কোনো হাতিয়ার নেই। কিন্তু তাঁবুতে আর ক'জন আছে কে জানে!

লোকটা চেঁচিয়ে বলে উঠল, এই তোরা এখানে কী করছিস?

বাবু গম্ভীর মুখে বলল, নদীর ধারে বেড়াতে যাচ্ছি।

সেদিনের কথা আমি ভুলিনি। আজ তোদের দু'জনকে এমন শিক্ষা দেব না...

কথা শেষ না করেই লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। বাবু চকিতে সরে গেল। মংলুকেও টেনে নিল এক হাত দিয়ে। লোকটা টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যেতেই বাবু ফুটবলে কিক করার মতো পা চালাল। লোকটা সরে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তেড়ে আসতেই ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের জিদান যেভাবে গোল করেছিলেন সেই কায়দায় তার পেটে ঢুঁ মারল। কঁক করে শব্দ বেরিয়ে এল লোকটার মুখ থেকে। কিন্তু তাকে খুব একটা আহত বলে মনে হলো না। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আবার। একদিকে একজন পেশাদার দুষ্কৃতী অন্যদিকে দুটো বাচ্চা ছেলে। লোকটা বেশি কিছু করার আগেই মিউ উড়িয়ে দিল কিকিকে। কিকি তীরবেগে উড়ে এসে লোকটার মুখের ওপর পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়ে দিল। একটা পাখি এসে আক্রমণ করবে লোকটা ভাবতে পারেনি। সে কিছু বোঝার আগেই কিকি ওর চোখে নখ বসিয়ে দিল। একটা চোখ দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। লোকটা এক হাতে চোখ চেপে ধরে অন্য হাতে বাবুর ঘুঁষির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

মিউরাও ততোক্ষণে ছুটে এসেছে। ওরা বুঝতে পেরেছে, ধারেকাছে ওর কোনো সঙ্গী নেই। ফলে লোকটাকে কাবু করে ফেলতে বেশি সময় লাগল না। ওদের কাছে সব সময় দড়ি থাকে, তা দিয়ে লোকটাকে ভালো করে বেঁধে একটা রুমাল ওর মুখে গুঁজে দিল।

রাজা জিজ্ঞেস করল, এবার এটাকে নিয়ে কী করবি?

বাবু বলল, তাই তো ভাবছি। কোথাও বন্দী করে রাখতে পারলে ভালো হয়। আমাদের বাড়ি তো আর নিয়ে যাওয়া যাবে না।

মংলু বলল, আমাদের বাড়ি নিয়ে যাই। গোয়ালঘরে ফেলে রাখব। পেছন দিক দিয়ে গেলে কেউ দেখতে পাবে না।

হাত পেছনে করে বাঁধা। মুখে একটা আস্ত রুমাল গোঁজা। কেবল একটা গোঁ গোঁ শব্দ, তার বেশি ওর মুখ থেকে কিছু বেরুচ্ছে না। ওরা লোকটাকে দাঁড় করিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলল।

বাবু বলল, দুটো শয়তান কমল। একটা সাপের কামড়ে মরেছে, আর একটা বন্দী। বাকিগুলোকে নিয়ে কী করা যায় সেইটা আগে ভেবে দেখতে হবে।

তার আগে একে তো মংলুদের বাড়িতে বন্ধ করা যাক!

ওদের দেখে তীর-ধনুক হাতে চারজন পাহারাদার হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল। মংলু সঙ্গে আছে। তা ছাড়া বাবু-মিউদেরও ওরা চিনে গেছে। ইশারায় জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি?

মংলু বলল, একটাকে ধরেছি। বাকিগুলোরও ব্যবস্থা এক এক করে করব। লোক চারটে ওদের পাশে পাশে চলল। বাবু খুশি, রাইফেল-টাইফেল ছাড়া আর কিছুকে এখন আর ভয় নেই। ওরা একটু পরেই মংলুদের গোয়ালঘরে ঢুকল। এককোণে বিচালির গাদা। তার পেছনে লোকটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পা দুটো বেঁধে দিল শক্ত করে। যাতে বেশি নড়াচড়া করতে না পারে সেই জন্যে গোয়ালের ধারে পোঁতা গরু-মহিষ বাঁধার খোঁটার সঙ্গে বেঁধে দিল। ওরা তারপর বেরিয়ে এল গোয়ালঘর থেকে।

মংলু পাহারাদারদের বলল, লোকটার ওপর নজর রাখতে হবে কিন্তু।

তার জন্যে চিন্তা নেই। আমরা একজন-দুজন এখানে পাহারা দেব। কিন্তু ওর জল খাওয়া বা রুটি-টুটি খাওয়ার কী হবে?

তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বাবু রাজার দিকে ফিরে বলল, তুই মোমা আর বুয়াকে নিয়ে রাম সিংয়ের কাছে চলে যা। আমাদের দেরি দেখে বেচারা বোধহয় খুব ভাবছে।

তোরা কি করবি?

আমরা মোড়লের সঙ্গে কথা বলে সোজা বাড়ি চলে যাব।

রাজা ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। মংলু, বাবু আর মিউ পেছন দিক দিয়ে ঘুরে বাড়ির সামনে এল। তারপর ঢুকল মোড়লের বাড়িতে। কিকি কিন্তু বুয়ার সঙ্গে গেল না। ও মিউয়ের কাঁধে বসে রইল।

মংলুর বাবা বাড়িতেই ছিলেন। ওদের দেখে তো অবাক। মংলু বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ। চলো, ঐ কোণের ঘরে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মোড়ল বললেন, ব্যাপার কী বলো তো!

বাবু বলল, শুনুন, ঐ লোকগুলোর একটা সাপের কামড়ে মরেছে। আপনাকে তো সব কথা আজ সকালেই বলেছি। আর একটাকে আমরা ধরে এনে আপনাদের গোয়ালঘরে বেঁধে রেখেছি।

সর্বনাশ! ওরা এবার ক্ষেপে যাবে! এবার না কিছু করে বসে।

কিচ্ছু করবে না। ওরা ভাবতেও পারবে না যে আমরা ওদের একজনকে ধরে এনে বন্দী করে রাখতে পারি। আপনাকে এবার দুটো কাজ করতে হবে।

এক মামণিকে দিয়ে বলাবেন যে তিনি ওদের হোটেলের জন্যে জমি বিক্রি করতে রাজী আছেন।

অসম্ভব। মামণি রাজী হবেন না।

সে আমরাও জানি। পুরো ব্যাপারটা মিথ্যে। মামণিকে আপনি সেটা বলে রাজী করিয়ে ওদের বসকে মামণির কাছে নিয়ে যাবেন। মামণির সঙ্গে কথা বলার পর আপনি ওদের বসকে বলবেন, আর তো কখনো মেলা হবে না। তাই আপনারা শেষবারের মতো মেলা করে নিতে চান। ছোট আকারে হবে। একদিনের নোটিশে মেলা বসবে তো?

কিকি উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার মুখের ওপর।

তা বসবে। সবই তো তৈরি আছে।

জীব-জন্তু থাকবে নিশ্চয়ই।

থাকবে। হাতি, বাঁদর, ভালুক প্রত্যেকবারই আসে। এবারও আসবে।

শুনুন ঐ মেলায় লোকগুলোকে নেমন্তন্ন করবেন। খুব করে খানাপিনার ব্যবস্থা করবেন। বাজী পোড়াবেন। অন্যদিকে আমরা ওদের যত গোলাবারুদ আছে সব নদীতে ফেলে দেব। তারপর মেলায় গিয়ে লোকগুলোকে সবাই মিলে কব্জা করব।

ওদের কাছে হাতিয়ার থাকবে।

সেগুলোর ব্যবস্থা আমরা করব। যে কারণে মূর্তি চুরির খবর পুলিশে জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি সেই কারণে এখানকার পুলিশের কোনো সাহায্য আমরা নেব না। কলকাতা থেকে সব ব্যবস্থা করে শঙ্করকাকু এখানে আসবেন ঠিক সময়ে। ওরা মূর্তি চুরি করেছে, উগ্রপন্থীদের হাতে হাতিয়ার তুলে দেবার বন্দোবস্ত করছে, তার সঙ্গে গড়ের পবিত্র গুপ্তধন উদ্ধারের চেষ্টা করছে।

তা ওরা পারবে না। ওখানে মা মনসা পাহারায় আছেন।

বাবু কিছু বলল না। মা মনসাকে ও দেখেছে। রাইফেলের এক গুলিতেই যে মা মনসা শেষ হয়ে যাবেন সে কথা ওদের চেয়ে আর বেশি কে জানে!

কবে এসব ব্যাপার ঘটবে?

শনিবারে। সকাল থেকেই যেন মেলা বসে।

সে ব্যবস্থা আমি করব। ওদের সর্দারকে নিয়ে কাল মামণির সঙ্গে দেখা করব।

তার আগে সকালে গিয়ে মামণিকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে আসবেন। সাবধান আমাদের নাম কিন্তু ভুলেও করবেন না। তাহলে ঝামেলা হয়ে যাবে। বুঝলেন তো!

হ্যাঁ! মংলুর বাবা মাথা নাড়েন।

আমরা তাহলে এখন যাই? আর হ্যাঁ, লোকটার খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু করতে হবে।

সে আমি করব। তোমরা এখন যাও। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আমি এখনই আশেপাশের গ্রামে শনিবার সকাল থেকে মেলা বসার খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ওরা মোড়লের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এল। পাহাড় আর জঙ্গলের কালচে ছায়া থাবা বসিয়েছে গ্রামের ওপর। ওরা মাঠের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। বাড়ি অবশ্য বেশি দূরে নয়। মামণি আজকাল বড্ড ব্যস্ত হচ্ছেন। ওরা বেরুলেই ছটফট করছেন। ওরা বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল, রাজারা গেট খুলে ঢুকছে। রাম সিং বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ওদের না নিয়ে বাড়ি ঢুকলে সে যে বকুনি খাবে!

সেদিন রাত্তিরে কলকাতায় ফোন করে শঙ্করকাকুকে ওরা সব জানিয়ে দিল। শঙ্করকাকু জানালেন, যা করার উনি করবেন। নিজেও আসবেন। শঙ্করকাকুর সঙ্গে কথা বলার পর ওরা বসল আলোচনা করতে। বাবু বলল, ওরা ছ'সাত জন ছিল। তার মধ্যে একজন মরে গেছে আর একজন আমাদের হাতে বন্দী। তার মানে ওরা এখন পাঁচজন। মেলায় ওরা পাঁচজন একসঙ্গে নিশ্চয়ই আসবে না। অন্তত একজন তাঁবু পাহারা দেবে!

আর মূর্তিগুলো?

সে কথা তো বিশেষ কেউ জানে না। সেইজন্যে সেখানে পাহারা নাও দিতে পারে। দিলে তাকেও আমরা কব্জা করে ফেলব।

মিউ বলল, কাল সকালে মামণির সঙ্গে কথা বলতে এলে ওদের সর্দারকে তো আমরা কাবু করে ফেলতে পারি।

তা পারি, কিন্তু করব না।

কেন?

তাহলে বাড়িটা ওদের টারগেট হয়ে যাবে। সর্দারকে মুক্ত করার জন্যে ওরা বাড়ি আক্রমণ করবেই। বুঝতেই পারছিস, তাহলে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে। তা ছাড়া সর্দার নিশ্চয়ই নিরস্ত্র হয়ে আসবে না।

তা ঠিক। তাহলে কি করবি?

মেলায় ওরা আসবেই। তখন তাঁবুর পাহারাদারকে আমরা কব্জা করে ফেলব। তারপর একসঙ্গে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব অন্যদের ওপর। দরকার হলে আমরা হাতি, বাঁদর আর ভালুকের সাহায্য নেব। মিউ পারবি না ওদের লড়াইয়ে নামাতে?

খুব পারব। এসব ব্যাপারে ওদের যে কত উৎসাহ তার প্রমাণ তো আজ বিকেলে কিকি দিয়েই এসেছে।

তুই তাহলে ঐ দায়িত্বটা নিবি!

তা নেব।

মনে রাখতে হবে, ওদের কাছে হাতিয়ার থাকবে।

চিন্তা নেই। যদি রাইফেল থাকে তাহলে বাঁদরদের দিয়ে আমি সেগুলো সরিয়ে ফেলব।

তাহলে তো কথাই নেই! কিকি কি করবে?

নিজের নাম শুনে নড়েচড়ে বসে ঝুঁটি দুলিয়ে কিকি বলল, মিউ পড়তে বসো, মামণিকে বলে দেব কিন্তু!

আবার পাকামি করছিস? মিউ চোখ পাকায়।

মংলু বলল, ওরা গড়ের মধ্যে কি করছে বল তো! সাপটাকে মেরে গুপ্তধন খুঁজতে পারতো। তা কিন্তু করছে না। গুপ্তধন যে ওখানে আছে তা তো ওরা বুঝে গেছে।

বাবু বলে, আমার মনে হয় ওরা অপেক্ষা করছে কোনো কারণে। শঙ্করকাকুর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, পুলিশ অনেকদিন ধরে ওদের ধরার চেষ্টা করছে। সে যাই হোক, বাক্স বাক্স এ কে ৪৭ আর গোলাবারুদ পাচার করার পর ওরা গুপ্তধন উদ্ধার করে, মূর্তিগুলো নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ার প্ল্যান করেছে। আগেই বলেছি না, ঐ সব হোটেল-টোটেল বানানোর কথা সকলের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখার জন্যে।

হোটেল তো ওরা করতেও পারে! মংলু জিজ্ঞেস করল।

বাবু বলল, না! ওদের চেহারা দেখে কী মনে হয় ওরা হোটেল বানিয়ে ব্যবসা করার লোক! ওদের চেহারাই বলে দিচ্ছে, ওরা অ্যান্টিসোশাল। ওসব ব্যবসা-ট্যাবসা ওরা বোঝে না।

তুমি কি কনফিডেন্ট বাবুদাদা?

নিশ্চয়ই। সেদিন আগাথা ক্রিস্টির একটা বই পড়তে পড়তে এখানকার ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ওদের আলোচনা আর এগোল না। খাওয়ার ডাক পড়ল। কিকির খাওয়া সন্ধ্যেবেলায় হয়ে গেছে। বুয়া উঠে ওকে আলমারির মাথায় বসিয়ে দিল। তারপর সকলে গিয়ে বসল খাওয়ার ঘরের ডাইনিং টেবিলের সামনে চেয়ারগুলো টেনে নিয়ে। খাবার দেখে ওরা লাফিয়ে উঠল। মামণি হাসছিলেন। মিউ বলল, দেখি দেখি কী কী আছে!

মামণি বললেন, সুইট কর্ন চিকেন সুপ, ফ্রায়েড রাইস, চিকেন চাউমিন, মানচুরিয়ান চিকেন। সবশেষে আবার একবাটি করে কাস্টার্ড।

॥ ছয় ॥

পরদিন সকালবেলায় এসে মোড়ল মামণিকে কিছু বলেই চলে গেলেন। ওরা তখন বাগানে ছিল। মংলুও ছিল। মোড়ল বেরিয়ে যাচ্ছেন দেখে বাবু এগিয়ে এল। মোড়ল চাপা গলায় বললেন, এক ঘণ্টা বাদেই ওদের সর্দারকে নিয়ে আসছি। আজ দুপুর থেকেই মেলায় সব আসতে শুরু করে দেবে।

বাবু ওদের কাছে এসে বলল, আজ দুপুরেই মেলা ধরতে গেলে শুরু হয়ে যাবে।

মিউ বলল, আমি বিকেলে যেতে চাই। জন্তু-জানোয়ার কী আসে দেখতে হবে। তেমন বুঝলে আজই কাজ শুরু করে দেব।

সেই ভালো। আগে তো ওদের সর্দার আসুক। রাজা বলল।

আসবে, আসবে। আমরা কিন্তু বাগানেই থাকবো। এমন ভাব করব যেন আমাদের কোনো কৌতূহলই নেই।

বাবুর কথা শেষ হলো না মিউ বলে উঠল, সর্দার তো আমাদের চিনতে পারবে।

তাতে কী! চিনুক না। সর্দার তো আর জানে না ওদের লোককে আমরা পাকড়াও করেছি। তবে হ্যাঁ, সন্দেহ করতে পারে ওদের একটা লোককে আমরা বেঁধে রেখেছিলাম।

আধ ঘণ্টাও কাটেনি সর্দারকে নিয়ে মোড়ল ঢুকলেন। বাগানে অতগুলো ছেলেমেয়েকে দেখে সর্দার থমকে দাঁড়িয়েছিল। তার কপালে চিন্তার রেখা। ওর একটা লোককে জঙ্গলে একদল ছেলেমেয়ে বেঁধে রেখে গিয়েছিল। এরা নয় তো! মোড়ল বললেন, ওরা কলকাতায় থাকে, ছুটিতে এসেছে। আসছে সপ্তাহে চলে যাবে। চলুন, চলুন, মামণি অপেক্ষা করছেন।

হ্যাঁ, চলুন! সর্দার মোড়লের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

মোড়ল চলে যাবার কিছু পরে সকলকে নিয়ে বাবু বাড়িতে ফিরে এল। ওদের দেখে মামণি এগিয়ে এলেন, এই তোরা কোথায় ছিলি রে?

আমরা তো বাগানে খেলছিলাম। মিউ উত্তর দিল।

শোন একটা ভালো খবর আছে। কাল থেকেই মেলা শুরু হয়ে যাচ্ছে। তোরা তো এখানকার ঐ মেলা কোনোদিন দেখিসনি। মন্দিরে পুজো ঠিকভাবে হবে না, সেই জন্যে মন খারাপ লাগছে।

মামণির কষ্ট হচ্ছে দেখে ওরা একসঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, না, আমরা কোনোদিন মেলা দেখিনি। মেলায় জন্তু-জানোয়ার আসে?

আসেই তো! হাতি, বাঁদর, ভালুকও আসে। আজ দুপুরের মধ্যেই এসে যাবে।

বিকেলে তাহলে দেখতে যাব। মিউ বায়না ধরে।

তা যাস। রাম সিংকে সঙ্গে নিয়ে।

এখন পর্যন্ত সব কিছু পরিকল্পনামাফিক চলছে। সর্দারের অলক্ষ্যে মোড়ল ওদের ইশারায় জানিয়ে গেছেন—সব ঠিক আছে। মামণির কাছে মেলার খবর শুনে ওরা নিশ্চিন্ত হলো।

বিকেলে ওরা মেলা প্রাঙ্গণে গেল। মেলা প্রায় বসে গেছে। নাগরদোলা লাগানো হচ্ছে। দোকান বসেছে কয়েকটা। মিউ এগিয়ে গেল হাতির দিকে। দু'তিনটে হাতি রয়েছে। মিউ ওদের একদম কাছে গিয়ে কী সব বলল।

হাতি তিনটে স্থির হয়ে শুনে মিউ-এর দিকে শুঁড় বাড়িয়ে দিল। তারপর শুঁড় তুলে ডেকে উঠল। মিউ হাতি তিনটের মাথায়-গায় হাত বুলিয়ে ওদের কাছে চলে এসে বলল, ওরা রাজী। এক্ষুণি লড়তে যেতে চাইছিল। আমি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আটকেছি। বাঁদরগুলো কোথায়? আসবে তো?

মংলু বলল, নিশ্চয়ই আসবে। এখানে বাঁদরের খেলা খুব জনপ্রিয়।

ওরা মেলার চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল। মধ্যিখানে গোলাকার খানিকটা বড় জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানে পুজো হবে। চারপাশে সকলে গোল হয়ে বসবে। বিশেষ অতিথিদের জন্যে অবশ্য চেয়ার পাতা হবে। সর্দারও সম্ভবত এখানেই বসবে। মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে ঘুরে দেখার সময় বাবু বলল, এখন থেকেই ওদের ওপর নজর রাখার দরকার। কে রাখবে? আমরা রাখতে পারলেই ভালো হতো। সে উপায় তো নেই। মংলু বল না, কী করে লোকগুলোর ওপর নজর রাখা যায়। ওদের প্রতিমুহূর্তের রিপোর্ট যে আমাদের দরকার।

প্রতিমুহূর্তের রিপোর্ট না হলেও মাঝে মাঝে যাতে পাস তার ব্যবস্থা করা যাবে।

কী করে ওদের ওপর নজর রাখবে? মিউ জিজ্ঞেস করল।

আমাদের পাহারাদারেরা পাহাড় আর জঙ্গলের মানুষ। ওদের পক্ষে ব্যাপারটা খুব যে একটা কষ্টকর হবে বলে মনে হয় না।

রাত্তিরে শঙ্করকাকুর ফোন এল। মামণির সঙ্গে কথা বললেন। মামণি ফোন নামিয়ে ওদের কাছে এসে বললেন, শঙ্কর ফোন করেছিল। কী একটা কাজে শিলিগুড়ি এসেছিল। কাল সকালে দেখা করতে আসবে। তোরা এসেছিস শুনে খুব খুশি হলো।

বাবু বলল, শঙ্করকাকু আসছেন? খুব ভালো হয়েছে। শঙ্করকাকুকে কাল মেলা দেখাবো। তা কখন আসবেন?

বলল তো দুপুর হয়ে যাবে। কী জানি ওদের কথা তো! পুলিশের চাকরি। কখন কোথায় ফেঁসে যাবে কে জানে!

মন্দিরের ঠাকুর চুরির কথাটা শঙ্কর-কাকুকে বললে হয় না?

ঠিক বলেছিস! ও আসুক। এখানকার পুলিশ তো কিছু করবে না। শঙ্করকে দেখে যদি নড়ে বসে। রাত্তির হয়ে গেছে, তোরা এবার খেয়ে নে।

কাল সকালেই কিন্তু আমরা মেলায় যাবো। মিউ বলল।

তা যাস। এখন ক'দিন আর কোনো ভয় নেই।

কিসের ভয় মামণি? বাবু চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল।

ও কিছু নয়। তোদের মাথা ঘামাতে হবে না।

ওরা চুপ করে গেল। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল। শুধু বাবু আর মিউ ঠিক করে নিল, কাল সকালে উঠে প্রথমে কোন কাজটা করবে। মোমার মুখ ক'দিন ধরেই শুকিয়ে আছে। আজ ভয়ে ভয়ে বলল, ওসব না করলেই নয় বাবুদাদা?

তুই যে কেন এত ভয় পাস! এতদিন আমাদের সঙ্গে আছিস কিন্তু ভয় কাটল না। দেখবি কাল কত মজা হবে।

কী মজা! লড়াই হবে। গুলিগোলা চলবে। ওরা কি এমনি-এমনি ছেড়ে দেবে ভেবেছো! মোমাকে চিন্তিত দেখায়।

মিউ বলে, কাল শুধু আমরাই নই, হাতি, বাঁদর, ভালুক, কিকি সকলেই লড়বে। তা ছাড়া শুনলিই তো শঙ্করকাকুও এসে গেছেন। তা তোর যদি ভয় লাগে তাহলে কাল বাড়ি থাকিস।

বুয়া, রাজা আর মোমা ঘুমিয়ে পড়লে বাবু চাপা গলায় মিউকে বলল, সকালবেলায় মেলায় গিয়ে তুই বাঁদরগুলোকে ম্যানেজ করবি। আমার মনে হচ্ছে, ওরা কোনো ঝুঁকি নেবে না। মূর্তিগুলো যেখানে লুকিয়ে রেখেছে সেখানেও লোক রাখবে।

তাঁবু পাহারারও ব্যবস্থা রাখবে নিশ্চয়ই।

থাকবেই তো। সেই জন্যেই তো হাতি, বাঁদর, ভালুক যদি আসে তার দরকার। আসল অ্যাকশানটা ওদের দিয়েই করাতে হবে খুব সতর্কভাবে। দেখতে হবে যাতে গুলিগোলা না চলে, রক্তপাত না হয়। বুঝতেই পারছিস, মেলায় কত লোক থাকবে।

কিকির কি রোল থাকবে?

কিকি সঙ্গে থাকবে। দরকার হলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ও মুখে-চোখে আঘাত করলে আর দেখতে হবে না। বাবু হাসল।

এখন শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে মেলায় যাই, বাঁদরের দল না এলে আবার অন্য চিন্তা করতে হবে।

পরদিন সকালে ওরা দুধটুধ খেয়েই বেরিয়ে পড়ল। মামণি আজ নিশ্চিন্ত মনে ওদের ছেড়ে দিলেন। রাম সিংও সঙ্গে গেল না। তাতে ওদের সুবিধেই হলো। ওরা সোজা মেলা প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলো। মেলার উদ্বোধন সেই দুপুরবেলায়। তার তোড়জোড় চলছে। এক রাত্তিরের মধ্যে কত কী হয়ে গেছে। ছোট ছোট স্টল। কোনোটা খাবারদাবারের, কোনোটা চুড়ি-টুড়ির, কোনোটা জামা-কাপড়ের, কোনোটা পুতুলের, আরো নানারকম সামগ্রীর। মেলার উদ্বোধন প্রতিবারের মতো এবারও পুরোহিত মশাই করবেন। প্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যিখানে পুজোর ব্যবস্থা। তার চারপাশে সকলে গোল হয়ে বসবে। পরে নাকি যাত্রা-টাত্রাও হবে।

মিউ দেখল মংলু দূর থেকে হাত নেড়ে ওদের ডাকছে। ও সকলকে নিয়ে এগিয়ে গেল। একপাশে পাঁচ-ছটা বাঁদর বাঁধা ছিল। পাশে বসে মুড়ি-টুড়ি খাচ্ছিল তাদের মালিকরা। পাঁচ-ছটা ছেলেমেয়েকে আসতে দেখে ওরা অবাক হয়ে তাকাল। ওদের সঙ্গে মংলুকে দেখে আর কিছু বলল না। মিউ সোজা বাঁদরগুলোর কাছে এগিয়ে মুখ দিয়ে অদ্ভুত কিছু শব্দ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদর ক'টা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করল। একটা বাঁদর কিচ কিচ করে কিছু বলতেই মিউ বসে পড়ল। তারপরই দেখা গেল অন্য বাঁদরগুলো এগিয়ে এসে মিউ-এর চারপাশে গোল হয়ে বসে পড়ল। মিউ-এর সঙ্গে ওদের যেন গভীর আলোচনা চলছে।

ব্যাপার দেখে বাঁদরের মালিক দু'জন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে। কী হচ্ছে

ওরা কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। এমন ঘটনা কখনো ওদের জীবনে ঘটেনি। ওরা অবাক হয়ে মংলুর দিকে তাকাল। মংলু বলল, ও জন্তু-জানোয়ারদের ভাষা বোঝে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে।

লোক দুটো মংলুর কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। আবার চোখের সামনে যা দেখছে তাতে অবিশ্বাসও করতে পারছে না। ওরা হঠাৎ দেখল, বাঁদরগুলো লাফিয়ে উঠে নাচতে শুরু করেছে। মিউ প্রত্যেকটার কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল। ওরা মিউ-এর হাত ধরে টানাটানি করছে। ওদিকে একটা হাতি মিউকে দেখতে পেয়ে ডাকতে শুরু করেছে। মিউ বাঁদরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে হাতির দিকে এগিয়ে যেতেই লোক দুটো আঁতকে উঠল, আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওদের দিয়ে খেলা দেখিয়ে আমরা সংসার চালাই।

বাবু বলল, কিচ্ছু হবে না। তোমাদের জিনিস তোমাদেরই থাকবে। ওরা শুধু আমাদের কিছু কাজ করে দেবে। দেখছো না ওদের কিরকম উৎসাহ!

তা তো দেখছি। সেইজন্যেই তো ভয় পাচ্ছি দাদাবাবু।

মংলু বলল, ভয়ের কিছু নেই। আচ্ছা বলো তো ভালুক এসেছে খেলা দেখাতে?

হ্যাঁ এসেছে। সকালে জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেছে।

কেন?

তা তো জানি না। জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছি। একটা লোক উত্তর দিল। তার চোখ কিন্তু মিউ-এর দিকে। সব কটা হাতি দুলছে আর মাথা নাড়ছে। বাঁদরদের সঙ্গে ওদের দিব্যি ভাব হয়ে গেছে। ওরা পিঠে উঠে বসেছে। কিকির সহ্য হলো না। ও উড়ে গিয়ে মিউ-এর কাঁধে বসল। বুয়ার কাঁধে ছিল বলে লোক দুটো এতক্ষণ খেয়াল করেনি। একজন বলল, ওটা কী পাখি দাদাবাবু?

কাকাতুয়া। তোমার-আমার মতো কথা বলে কিন্তু।

সে কী!

একটু পরেই দেখতে পাবে।

ততোক্ষণে কিকির সঙ্গে বাঁদর-হাতিদের ভাব হয়ে গেছে। মিউ-এর কাঁধ ছেড়ে কিকি ততোক্ষণে একটা বাঁদরের কাঁধে গিয়ে বসেছে।

ঐ যে ভালুককে নিয়ে আসছে। দড়ি ধরে বাঁধা ভালুকটাকে নিয়ে আসছে তার মালিক। মিউ হাতি আর বাঁদরদের কী বলল কে জানে, ওরা একসঙ্গে হৈচৈ করে উঠল। ভালুকটা চমকে উঠে ওদের দিকে তাকিয়ে সেদিকে ছুটতে শুরু করল। লোকটা দড়ি ধরে রাখতে পারে না। তাকেও টানতে টানতে নিয়ে গেল। বাঁদরের মালিক দুটো চেঁচিয়ে বলল, দড়ি ছেড়ে দিয়ে তুমি এদিকে এসো।

আমার ভালুক!

কিছু হবে না। দেখছো না আমাদের বাঁদরগুলোর অবস্থা।

লোকটা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে দড়িটা ছেড়ে দিয়ে গুটি গুটি ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

জানি নে। ঐ দিদিমণি ওদের ভাষা বোঝে, বলতেও পারে। আমাদের বাঁদর, হাতি আর তোমার ভালুক নাকি ওদের কিছু কাজ করে দেবে।

সে আবার কী!

বলছি তো আর কিছু জানি না।

এমন কাণ্ড জীবনে দেখিনি। ঐ সাদা পাখিটাকে দেখেছো? ও নাকি মানুষের মতো কথা বলতে পারে।

ও কী! পাখিটা যে আমার রামুর কাঁধের ওপর গিয়ে বসল!

তবে আর বলছি কী! জানি না ওরা কী কাজ করবে। খেলা দেখানো ছাড়া আর কিছু তো ওরা জানে না।

একটু পরেই মিউ ফিরে এল। বাঁদর আর ভালুক এল ওর সঙ্গে সঙ্গে। কিকি বসে আছে ভালুক রামুর কাঁধে। মিউ বলল, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। চলো, ব্রেকফাস্ট সেরে আসি।

বাবু মংলুর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, তুই সব খবর কখন পাবি?

বাড়ি চলো, এতক্ষণে বোধহয় কেউ এসে গেছে।

বাড়ির বাইরে মংলুর লোক দাঁড়িয়েছিল। মংলু তার সঙ্গে কথা বলছে দেখে ওরা গেট দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ওরা মুখ-হাত ধুয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে বসল। লুচি, আলুর দম আর মিষ্টি। মামণি সামনে না থাকায় বাবু বলল, বেশি করে খেয়ে নে, এর পর কখন খেতে পাবো কে জানে।

সবাই লুচি চেয়ে নিচ্ছে। মোমাটা খেতেই পারছে না, মিউ বলল, খা না। অত ভয় পাচ্ছিস কেন? তাহলে তুই বাড়ি থাক।

তাতেও রাজী নয় মোমা। সঙ্গে যাবে। আবার ভয়ও পাবে। এই সময় এসব অঞ্চলে বৃষ্টি হয় না। তবু কেন কে জানে আজ সকাল থেকে আকাশে হাল্কা মেঘের আনাগোনা। অনেক দূরে পাহাড়ের মাথায় কিন্তু রোদ ঝলমল করছে। সেদিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসছে। বাবু বলল, মেলার পক্ষে আইডিয়াল পরিবেশ। রোদের মধ্যে পুজো-টুজো হলে সকলের কষ্ট হতো।

তা ঠিক। রাজা মিউ-এর দিকে তাকিয়ে বলল, তোর চেলাদের কি ইনস্ট্রাকশান দিয়ে এলি রে?

ভালুক যাবে মূর্তি যেখানে রাখা আছে সেখানে। সে ওখানে যদি কেউ পাহারা দেয় তাকে কব্জা করে ওখানেই বসিয়ে রাখবে। তিনটে বাঁদর মেলার পুজোর ধারে-কাছে থাকবে। ওরা সর্দারদের সঙ্গে রাইফেল থাকলে তা সরিয়ে ফেলবে। একটা হাতি আর দুটো বাঁদর যাবে গড়ের কাছে।

কেন, কেন—গড়ের কাছে কেন?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পুজোর সময় এখানে খুব হল্লা হয়, বাজনা বাজে, বাজি পোড়ে—সেই সুযোগটা নিয়ে ওরা গড়ের গুপ্তধনের ওখানে ডিনামাইট চার্জ করবে।

সে কী! বাবুর কথায় রাজা বিস্ময় প্রকাশ করে।

হ্যাঁ! তবে আমার ধারণা। নাও হতে পারে। তবে ঐ জায়গাটা গার্ড দেওয়ার দরকার।

মিউ বলল, আমার মনে হচ্ছে সর্দারের পকেটে পিস্তল থাকতে পারে! ও হাতি বা বাঁদরের দিকে গুলি চালাবে না তো?

হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা আছে। তুই একটা কাজ করবি?

কি?

হাতিকে দিয়ে সর্দারকে পাকড়াতে হবে। শুঁড়ে জড়িয়ে ধরবে। সেই ফাঁকে আমি তার পকেট থেকে পিস্তলটা টেনে নেবো।

অন্য যারা থাকবে—তাদের জন্যে কী ব্যবস্থা?

কিকি, হাতি, বাঁদর আর আমাদের সঙ্গে মংলুর বাবাও থাকবেন। হামলা চালাব। তোকে ওখানে থাকতেই হবে। সর্দারকে চিনিয়ে দিবি তো তুই।

বাবু মিউ-এর দিকে তাকাল। মিউ বলল, ঠিক আছে। তবে ঐ সময় দেখবি আমাদের সব প্ল্যান ওলোটপালোট হয়ে গেছে।

সে তো হতেই পারে। চল বেরিয়ে পড়ি।

ওরা মামণিকে বলে বেরিয়ে এল। জঙ্গল বা গড়ের দিকে গেল না। মেলা প্রাঙ্গণেই ঘুরঘুর করতে লাগল। ওরা অত্যন্ত সতর্ক। মংলু ওদের সঙ্গে নেই। সম্ভবত বাড়ি গেছে। বেলা বাড়ছে। তাল দিয়ে ভিড় বাড়ছে মেলা প্রাঙ্গণে। পুজোর গোছগাছ প্রায় সারা। অতিথিদের জন্যে একপাশে বসার আসন। অন্যদিকে বাজনদাররা বসবে। স্টলগুলোয় কেনাকাটা শুরু হয়ে গেছে। মিউ-এর কাঁধে কিকিকে দেখে সকলের চোখে বিস্ময়। কিন্তু দু'একজন ছাড়া জিজ্ঞেস করার ভরসা কেউ পায়নি।

একটু পরেই পুরুতমশাই এলেন। বাজনা বাজছিল অনেক আগে থেকে। মোড়ল এলেন সর্দার আর একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে। লোকটার হাতে এ কে ৪৭। তার দৃষ্টি অত্যন্ত সতর্ক। ওরা দু'এক পা করে পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মংলুর জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। একমাত্র বাবু জানে মংলু কোথায় আর কী করছে। তবে সে যে এখনই এসে যাবে তাও বাবু জানে।

পুজো শুরু হবার আগেই মংলু এসে গেল। মংলু চাপা গলায় বাবুকে বলল, তোমার ধারণাই ঠিক। জঙ্গলে একজন পাহারা দিচ্ছে, তাঁবুর ওখানে দুজন, গড়ে একজন আর সর্দারের সঙ্গে একজন।

তার মানে আমাদের হিসেবের চেয়ে একজন বেশি। তা হোক মিউ তোর কাজ শুরু করে দে। জঙ্গলে লোকটাকে কব্জা করার জন্যে ভালুক আর একটা বাঁদর পাঠা। এখানে একটা হাতি আর বাঁদর নিয়ে আসবি। গড়ে বাকিগুলো। চল ওদিকে যাওয়া যাক।

পুজোর এখানে হাতি এলে ঝামেলা হবে না? মিউ-এর জিজ্ঞাসা।

না। মংলু বলল। আমাদের এখানে হাতির পুজোও হয়। দেখবে হাতি আসার পথ থাকবে। পুজো শেষ হলেই হাতির পায় তেল-হলুদ, ফুল দেওয়া হয়।

তাহলে তো কোনো ঝামেলাই নেই। পুজো কতক্ষণ চলে?

মংলু বলল, প্রায় ঘণ্টাখানেক। পুজো কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আমাদের কাজ এখনই শুরু করতে হবে।

মিউ চটপট হাতি, বাঁদর আর ভালুকের কাছে চলে গেল। ওরা জানত কী করতে হবে। তৈরি হয়েই ছিল। ভালুক আর একটা বাঁদর চলে গেল জঙ্গলে। যাদের গড়ে যাবার তারাও চলে গেল। ওরা ক'জন চলল তাঁবুর দিকে।

তাঁবুর বাইরে দুটো লোক রাইফেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। ওদের হাতি আর বাঁদর নিয়ে আসতে দেখে প্রথমটায় থমকে গিয়েছিল। তারপর বোধহয় ভাবল, এসব মেলার ব্যাপার। হাতি নিয়ে ওরা বোধহয় নদীতে যাচ্ছে। চান করাবে। কিন্তু শুধু বাচ্চা ক'টা সঙ্গে কেন? বড়রা কোথায়?

ততোক্ষণে বাবুরা কাছাকাছি এসে গেছে। একজন জিজ্ঞেস করল, পল্টন নিয়ে কোথায় যাচ্ছো?

তোমাদের কাছে!

মানে?

এখনই বুঝবে। হঠাৎ দুটো বাঁদর দুজনের ওপর লাফিয়ে পড়ল। বাবু আর রাজা সঙ্গে সঙ্গে ঘুঁষিতে ঘুঁষিতে অস্থির করে তুলল ওদের। ওরা চেষ্টা করছে রাইফেল তোলার, পারছে না। হঠাৎ দুটো হাতি শুঁড় বাড়িয়ে ওদের হাত থেকে রাইফেল দুটো টেনে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বাঁদর দুটো সরে গিয়েছিল। সেই সুযোগে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবু আর রাজার ওপর। বেদম মারামারি চলছে। রাজা আর বাবু ঠিক পেরে উঠছে না দেখে মিউ কিছু বলতেই হাতি দুটো এগিয়ে গিয়ে লোক দুটোকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

মিউ দড়ি বের করে দিল। রাজা লোক দুটোর পা শক্ত করে বেঁধে দেবার পর হাতি ওদের মাটিতে নামিয়ে দিল। ওরা চট করে ওদের পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দিল। তারপর মিউ-এর নির্দেশে হাতি দুটো লোক দুটোকে শুঁড়ে তুলে জঙ্গলের দিকে গেল।

সেখানে আর এক দৃশ্য। রাইফেল হাতে নিয়ে বাঁদরটা দাঁড়িয়ে আছে। আর ভালুকের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা থরথর করে কাঁপছে। ওরা দেরি করল না, লোকটাকে বেঁধে ফেলল। ভালুক আর একটা হাতিকে ওদের পাহারায় রেখে ওরা চলল মেলার দিকে। ততোক্ষণে পুজো আধঘণ্টা গড়িয়ে গেছে। ওরা বাঁদর দুটোকে পাঠিয়ে দিল আগে। কিন্তু ভিড় ঠেলে ওরা যেতে পারল না। তাই হাতির পেছনে পেছনে চলল। মিউ আগেই সর্দারকে দেখিয়ে দিয়ে কী করতে হবে বলে দিয়েছে।

হাতি যাচ্ছে দেখে সকলে নমস্কার করতে লাগল। সকলেই জানে এবার হাতির পুজো হবে। কিন্তু পুজোর জায়গায় না গিয়ে হাতিটা অতিথিদের দিকে ঘুরে গিয়েই অপ্রস্তুত সর্দারকে শুঁড়ে জড়িয়ে শূন্যে তুলে ধরল। সর্দারের সঙ্গী এ কে ৪৭ তুলেছিল গুলি চালাবে বলে। কিন্তু ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়ানোর আগেই দুটো বাঁদর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। দুই থাপ্পড়ে রাইফেল ছিটকে পড়ল। বুয়া তাড়াতাড়ি সে দুটো কুড়িয়ে নিল। ততোক্ষণে বাবু আর রাজা ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্য লোকটার ওপর। মিউ ওদিকে সর্দারের পকেট থেকে পিস্তল বের করে নিয়েছে। মোড়লও লাফিয়ে উঠে হাত লাগিয়েছেন। ফলে বেশিক্ষণ লাগল না, সর্দার আর অন্য লোকটাকে ওরা বেঁধে ফেলল।

মোড়লের কথামতো ওদের মেলা

প্রাঙ্গণেই ফেলে রাখা হলো। তীর-ধনুক নিয়ে যারা পাহারা দিচ্ছিল তাদের ক'জন এসে ঘিরে দাঁড়াল ওদের। এবার ওরা চলল গড়ের দিকে। রাজা বলল, মংলুটা কোথায় গেল? ওকে দেখতে পাচ্ছি না তো!

আছে কোথাও। এখন আগে গিয়ে গড়ের লোকটাকে ধরি।

গড়ের কাছে হাতি আর বাঁদরগুলো দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু মংলু নেই। বাবু বলল, ও গড়ের মধ্যে নেই তো?

দাঁড়াও কিকিকে পাঠাই। কিকি যা, মংলুদাদা ওখানে কোথাও আছে কিনা দেখে আয়।

মিউ-এর কথা শেষ হতে না হতেই কিকি উড়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে কিকি যা বলল, তা শুনে তো ওদের মাথায় হাত। মংলুকে গড়ের মধ্যে কেউ বেঁধে রেখেছে।

লোকটা কোথায়? মিউ ওকে জিজ্ঞেস কর।

মিউ বলল, কিকি তাকে দেখেনি! আমি বরং দুটো বাঁদরের সঙ্গে কিকিকে পাঠিয়ে দিই। ওরা গিয়ে মংলুর বাঁধন খুলে দিক।

মিউ কিছু বলতেই একটা বাঁদর কিকিকে কাঁধে নিয়ে লাফিয়ে উঠে গেল পাঁচিলের ওপর। তারপর ঢুকে গেল গড়ের মধ্যে। বাবু বলল, চল আমরাও ঢুকি। একটা লোককে কব্জা করতে অসুবিধে হবে না। তবে দেখতে হবে ও যেন রাইফেল চালাতে না পারে।

ওরা গড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সিঁড়ির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কিকি আর বাঁদর দুটো বসে আছে। একটা ঘরের সামনে মংলুর দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। মিউ কিছু বলার আগেই কিকি উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার মুখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বাবু আর রাজা পেছন দিক থেকে ছুটে গিয়ে ল্যাং মেরে ফেলে দিল তাকে। লোকটার হাত থেকে রাইফেল ছিটকে পড়েছিল। মিউ ছুটে গিয়ে সেটা তুলে নিল। লোকটাও হার মানার পাত্র নয়, সে লড়তে লাগল। বাবু আর রাজা দুমদাম করে ঘুঁষি মারছে। হঠাৎ কিকি গিয়ে লোকটার মুখের ওপর নখ দিয়ে আঁচড়ে দিল। আমার চোখ বলে দু'হাত দিয়ে লোকটা মুখ ঢাকতেই মংলু পেছন থেকে এক রদ্দা মারল। ওঁক করে শব্দ করে লোকটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল। ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে গোটা মুখ দিয়ে। লোকটা টলছিল।

হঠাৎ বাবুর চোখ পড়ল ডিনামাইট চার্জারের দিকে। লোকটা টলতে টলতে সেই দিকেই যাচ্ছে। বাবু বলল, কুইক ওপরে ওঠ। শীগগির... শীগগির...

ওরা ওপরে উঠে বাইরে বেরুতে পেরেছে কী পারেনি প্রচণ্ড শব্দে গোটা গ্রাম কেঁপে উঠল। ধুলোয় ঢেকে গেছে চারদিক। কিছু দেখা যাচ্ছে না। শব্দের রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি। ওরা বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। গড়ের মধ্যে থেকে ধস নামার শব্দ আসছে। বাবু বলল, হয়ে গেল। গুপ্তধন রহস্যর সমাধান আর বোধহয় কোনোদিনই করা যাবে না।

কেন কেন?

আর একটু পরে গড়ের মধ্যে গেলে দেখা যাবে, জায়গাটা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেখানে কোথায় যে গুপ্তধন হারিয়ে গেল কে জানে! মংলুদের নকশা আর কোনো কাজে লাগবে না।

হঠাৎ জিপের শব্দে ওরা চমকে তাকাল। শঙ্করকাকু জিপ থেকে নামছেন। পেছনে একগাড়ি পুলিশ।

মিউ বলল, হিন্দী সিনেমার মতো হয়ে গেল যে ব্যাপারটা।

তার মানে!

হিন্দী সিনেমায় অলওয়েজ অ্যাকশান শেষ হয়ে যাবার পর পুলিশ আসে।

পাকামি করিস না। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো, ওটা কী!

ডিনামাইট। গড়ের গুপ্তধন উদ্ধারের তালে ছিল ওরা। বাড়তি লাভ হতো আর কী! শেষ লোকটাকে আমরা ধরতে পারলাম না। তার জীবন্ত সমাধি হয়ে গেছে।

শঙ্করকাকু হাতি, বাঁদরদের দেখিয়ে মিউকে জিজ্ঞেস করলেন, এরাই কি তোর পল্টন...?

হ্যাঁ! আজকের অ্যাকশান ওরাই চালিয়েছে। জঙ্গলে চলো, মূর্তি উদ্ধার করবে। সেখানে দেখবে তিনজন অ্যান্টিসোশালকে ভালুকদাদা পাহারা দিচ্ছে, বাঁদরভাইকে সঙ্গে নিয়ে।

গোটা গ্রাম ভেঙে পড়েছে গড়ের কাছে। তখনো অনেকে ছুটে আসছে। অতবড় বিস্ফোরণ হলো। তার শব্দ বহু দূর থেকে শোনা গেছে।

মেলা প্রাঙ্গণে এসে দেখা গেল হাতি আর তীর-ধনুকধারীরা সেখান থেকে নড়েনি। তারা পাহারা দিচ্ছে। শঙ্করকাকুর নির্দেশে হাতকড়ি লাগিয়ে সর্দার আর অন্য লোকটাকে গাড়িতে তোলা হলো। তারপর সকলে চলল জঙ্গলে।

সেখানে দুটো লোক বাঁধা পড়ে আছে। তারা জুলজুল করে তাকিয়ে আছে ভালুকের দিকে। পুলিশ গিয়ে বাঁধন না খুলেই লোক দুটোকে হাতকড়ি পরিয়ে চ্যাংদোলা করে বনের বাইরে গাড়িতে তোলার জন্যে নিয়ে গেল। অন্য পুলিশরা বাবুর দেখানো জায়গা খুঁড়তে লাগল। বেশি গভীর করে খুঁড়তে হলো না। উঠে এল হারিয়ে যাওয়া মূর্তিগুলো।

বাবু শঙ্করকাকুকে বলল, তাঁবুভরা গোলাবারুদ আর এ কে ৪৭ রাইফেল আছে। ওগুলোর ব্যবস্থা করে ফেলো।

সে তোদের ভাবতে হবে না। যা করার আমি করবো। কিন্তু এই অসাধ্য সাধন তোরা কী করে করলি বল তো? এই গ্যাংটাকে আমরা অনেকদিন ধরে ধরার চেষ্টা করছিলাম।

ওরা হেসে উঠল। মিউ বলল, আর যাই করো মামণিকে যেন কিছু বোল না।

শঙ্করকাকু হেসে উঠলেন। হাসতে লাগল ওরাও। মেঘ কেটে গিয়ে সোনালী রোদ উঠেছে আবার।

বাবু বলল, একটাই দুঃখ রয়ে গেল!

কি? মিউ জিজ্ঞেস করল।

গুপ্তধন রহস্যের সমাধানটা করা হলো না।

দুঃখ কী! পরে হবে। বাবুর পিঠ চাপড়ে দিলেন শঙ্করকাকু।

ছবিঃ দিলীপ দাস

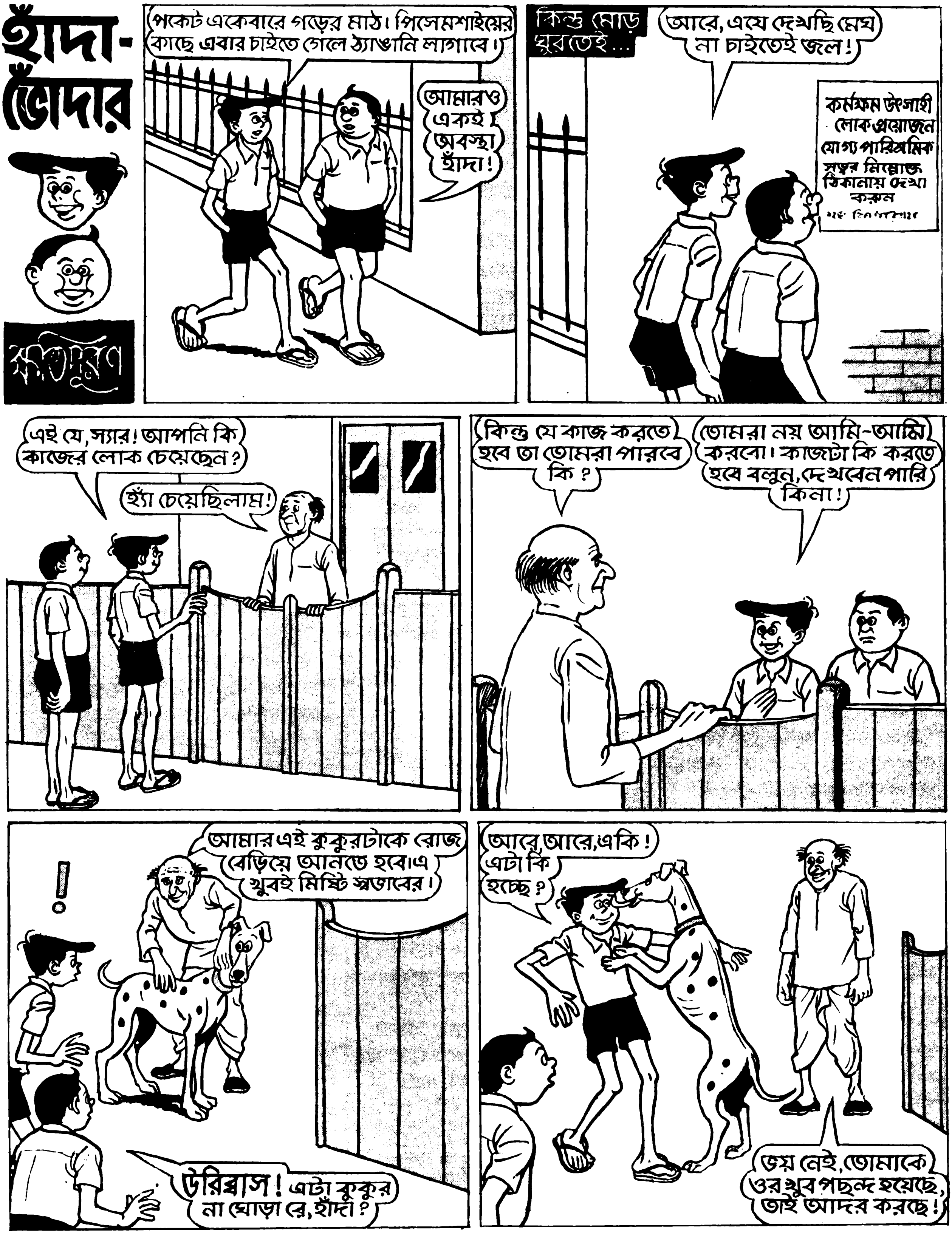
হাঁদা-ভোঁদার
পকেট একেবারে গড়ের মাঠ। পিসেমশাইয়ের কাছে এবার চাইতে গেলে ঠ্যাঙানি লাগাবে।
আমারও একই অবস্থা হাঁদা!
কিন্তু মোড় ঘুরতেই...
আরে, এযে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল!
কর্মক্ষম উৎসাহী লোক প্রয়োজন যোগ্য পারিশ্রমিক সত্বর নিম্নোক্ত ঠিকানায় দেখা করুন
এই যে, স্যার! আপনি কি কাজের লোক চেয়েছেন?
হ্যাঁ চেয়েছিলাম!
কিন্তু যে কাজ করতে হবে তা তোমরা পারবে কি?
তোমরা নয় আমি-আমি করবো। কাজটা কি করতে হবে বলুন, দেখবেন পারি কিনা!
আমার এই কুকুরটাকে রোজ বেড়িয়ে আনতে হবে। এ খুবই মিষ্টি স্বভাবের।
!
টরিব্বাস! এটা কুকুর না ঘোড়া রে, হাঁদা?
আরে, আরে, একি! এটা কি হচ্ছে?
ভয় নেই, তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে, তাই আদর করছে!

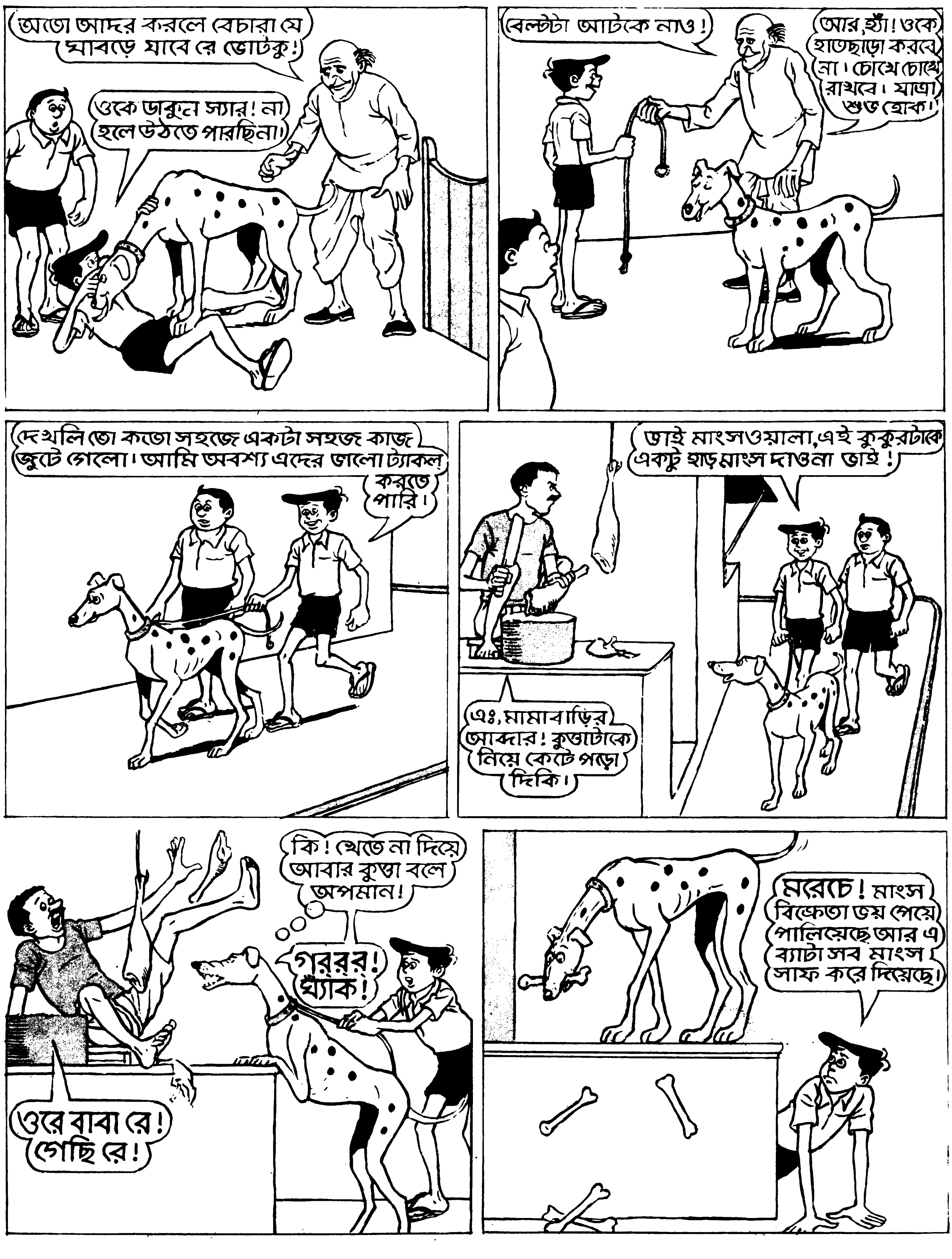
অতো আদর করলে বেচারা যে ঘাবড়ে যাবে রে ভোটকু!
ওকে ডাকুন স্যার! না হলে উঠতে পারছিনা।
বেল্টটা আটকে নাও!
আর, হ্যাঁ! ওকে হাতছাড়া করবে না। চোখে চোখে রাখবে। যাত্রা শুভ হোক।
দেখলি তো কতো সহজে একটা সহজ কাজ জুটে গেলো। আমি অবশ্য এদের ভালো ট্যাকল করতে পারি।
ভাই মাংসওয়ালা, এই কুকুরটাকে একটু হাড় মাংস দাওনা ভাই!
এঃ, মামাবাড়ির আব্দার! কুত্তাটাকে নিয়ে কেটে পড়ো দিকি।
কি! খেতে না দিয়ে আবার কুত্তা বলে অপমান!
গররর! ঘ্যাক!
ওরে বাবা রে! গেছি রে!
মরেচে! মাংস বিক্রেতা ভয় পেয়ে পালিয়েছে আর এ ব্যাটা সব মাংস সাফ করে দিয়েছে।

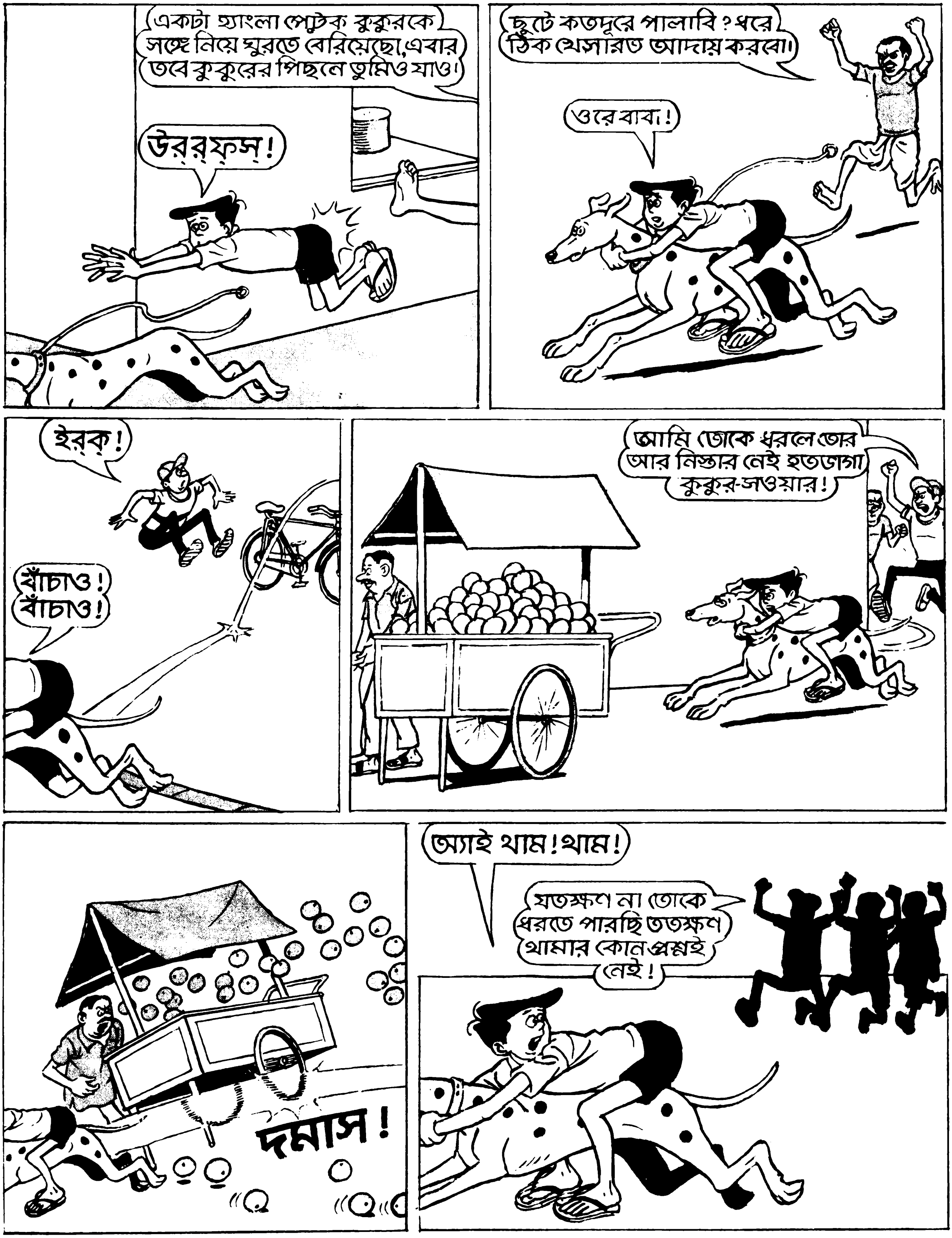

একটা হ্যাংলা পেটুক কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছো, এবার তবে কুকুরের পিছনে তুমিও যাও।
উররফস্!
ছুটে কতদূরে পালাবি? ধরে ঠিক খেসারত আদায় করবো।
ওরে বাবা!
ইরক্!
বাঁচাও! বাঁচাও!
আমি তোকে ধরলে তোর আর নিস্তার নেই হতভাগা কুকুর-সওয়ার!
দমাস!
অ্যাই থাম! থাম!
যতক্ষণ না তোকে ধরতে পারছি ততক্ষণ থামার কোন প্রশ্নই নেই!

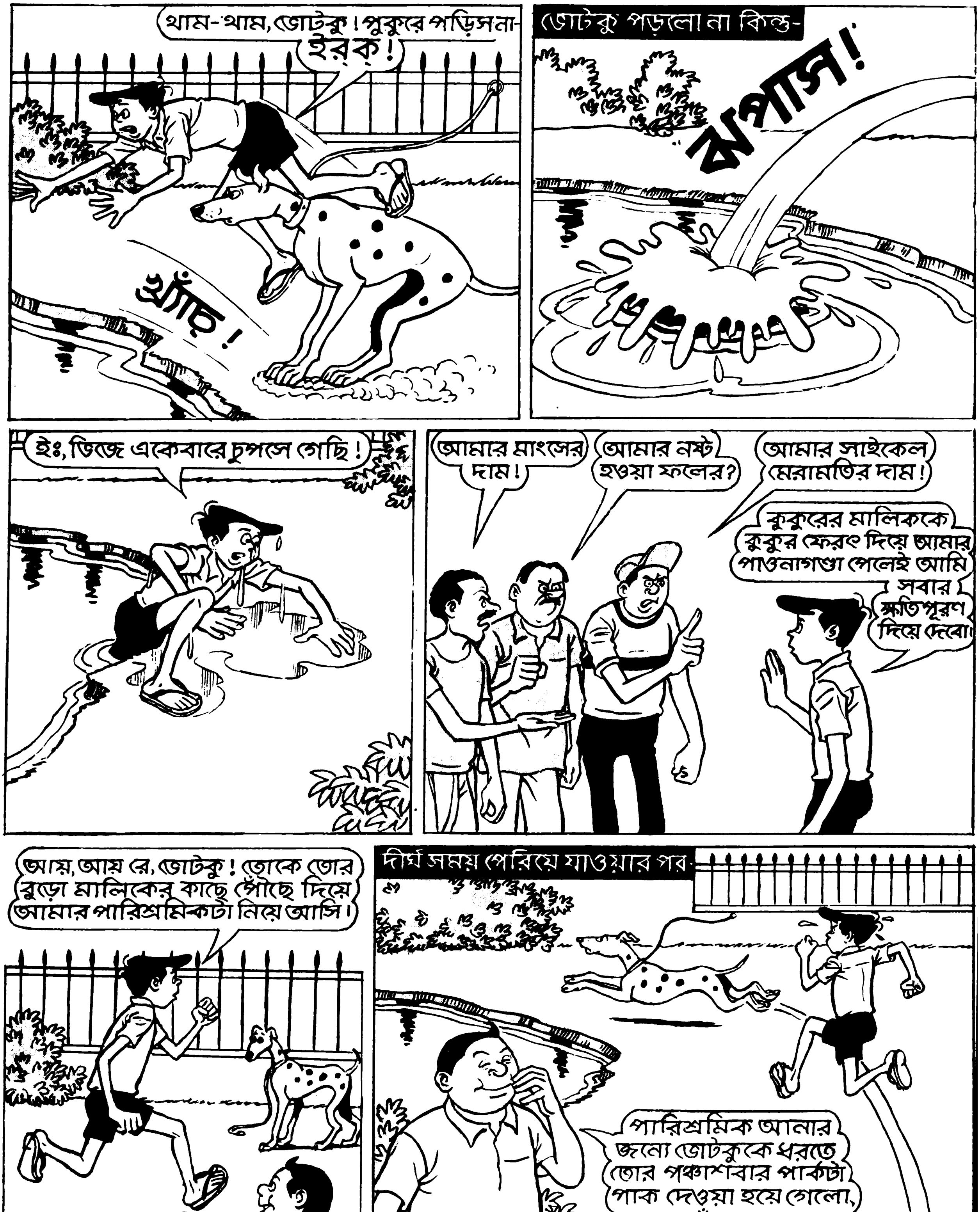
থাম-থাম, ভোটকু! পুকুরে পড়িসনা-
ইরক্!
খ্যাঁচ!
ভোটকু পড়লো না কিন্তু-
ঝপাস!
ইঃ, ভিজে একেবারে চুপসে গেছি!
আমার মাংসের দাম!
আমার নষ্ট হওয়া ফলের?
আমার সাইকেল মেরামতির দাম!
কুকুরের মালিককে কুকুর ফেরৎ দিয়ে আমার পাওনাগণ্ডা পেলেই আমি সবার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবো।
আয়, আয় রে, ভোটকু! তোকে তোর বুড়ো মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমার পারিশ্রমিকটা নিয়ে আসি।
দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর-
পারিশ্রমিক আনার জন্যে ভোটকুকে ধরতে তোর পঞ্চাশবার পার্কটা পাক দেওয়া হয়ে গেলো, হাঁদা!

বিপিনবাবুর চশমা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পলাশপুর রেল স্টেশানে রাত্তির দুটো দশ মিনিটে একটা ট্রেন থামে। অত রাতের ট্রেন বলেই তাতে পলাশপুর থেকে কোনো যাত্রী ওঠে না। কোনো কোনো দিন ট্রেনটা দু'তিন ঘণ্টা লেট করে, আসতে আসতে ভোর হয়ে যায়। কে সারারাত স্টেশানে বসে থাকতে চায়?

হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজনে রতনকে কলকাতায় যেতেই হবে। তাই সে ঐ ট্রেনের টিকিট কিনেছে। বেশি রাত হয়ে গেলে সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায় না, তাই সে রাত বারোটার মধ্যে স্টেশানে চলে এলো। ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে আর কেউ নেই, বেশ হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যায়, ইচ্ছে করলে বইও পড়া যায়।

এই সময় স্টেশানটাকে ঘুমন্ত মনে হয়। কুলি কিংবা পান-বিড়িওয়ালারাও ঘুমোয়। রতন একখানা বই খুলে পড়ছে। এই সময় দরজা ঠেলে একজন মাঝবয়েসী লোক ঢুকলো। পা-জামা আর পাঞ্জাবি পরা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মাথায় অল্প টাক।

লোকটিকে একটু যেন চেনা চেনা মনে হলো, কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারলো না রতন। সে আবার বই পড়তে লাগলো।

একটু পরে লোকটি গলা খাঁকারি দিয়ে রতনের কাছে এসে বসে পড়ে বললো, আমি কি আপনার কাছে একটু বসতে পারি?

রতন একটা চামড়ার ব্যাগ এনেছে, সেটা তার পায়ের কাছে রইল। ব্যাগটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বললো, হ্যাঁ, বসুন না!

তবুও মনে মনে সে একটু অবাক হলো। এত বড় ঘর, অনেকগুলি চেয়ার থাকতেও লোকটি তার কাছে এসে বসতে চায় কেন?

লোকটি বললো, রাত্তির বেলা একা একা থাকতে আমার ভরে দিতে, এমনকি ফাঁসিও দিতে পারে।

যেন রতনের মনের কথাটা বুঝতে পেরেই বিপিন চৌধুরী বললেন, জজের চাকরি বড় বিপদের চাকরি। সেইজন্য আমি তাড়াতাড়ি রিটায়ার করেছি। কিন্তু তবু বিপদ আমাকে ছাড়ছে না।

রতন কৌতূহলী হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বিপিন চৌধুরী বললো, এ চাকরিতে মানুষকে কত রকম শাস্তি দিতে হয়। অনেক সময় নির্দোষ লোকও শাস্তি পায়, চৌধুরী। আমি তো নিজে কখনো ব্যাঙ্কে যাই না। দরকার হলে বাড়ির কাজের লোক যায়। আমি আগে মেমারি কোর্টের জজ ছিলাম।

এই লোকটি একজন জজসাহেব শুনে রতনের খানিকটা সম্ভ্রম হলো। জজদের কত ক্ষমতা। ইচ্ছে করলেই মানুষকে জেলে ভরে দিতে, এমনকি ফাঁসিও দিতে পারে।

যেন রতনের মনের কথাটা বুঝতে পেরেই বিপিন চৌধুরী বললেন, জজের চাকরি বড় বিপদের চাকরি। সেইজন্য আমি তাড়াতাড়ি রিটায়ার করেছি। কিন্তু তবু বিপদ আমাকে ছাড়ছে না।

রতন কৌতূহলী হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বিপিন চৌধুরী বললো, এ চাকরিতে মানুষকে কত রকম শাস্তি দিতে হয়। অনেক সময় নির্দোষ লোকও শাস্তি পায়, তা অস্বীকার করছি না। উকিলরা এমনভাবে মামলা সাজায় যে

মাথা গুলিয়ে যায়। একবার কী হয়েছিল জানো?

বিপিনবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললো, খাবে?

রতন দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো, আমি খাই না।

সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধও তার খারাপ লাগে। কিন্তু এখন গল্প শোনার লোভে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রইলো।

বিপিনবাবু বললো, একবার নকুল বিশ্বাস নামে একজন লোকের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। লোকটির খুব শক্তপোক্ত চেহারা। লম্বা। চোখ দুটো দেখলেই ভয় করে। ওর নামে খুনের মামলা। রাগের মাথায় এক বন্ধুকে খুন করে ফেলেছে। তাও খুব বীভৎসভাবে। একটা পাথর দিয়ে ঠুকে মাথাটা একেবারে ছাতু করে দিয়েছে।

লোকটি অবশ্য অস্বীকার করেছে নিজের দোষ। বারবার বলেছে যে পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। মেরেছে অন্য এক বন্ধু, ওর নামে দোষ চাপিয়েছে। এমন কথা তো অনেকেই বলে। সাত জন লোক সাক্ষী দিল নকুলের বিরুদ্ধে। ওর বাড়িতে একটা রক্তমাখা জামাও পাওয়া গেছে। নকুলকে ফাঁসির হুকুম দিতেই হলো। তখন নকুল রাগের চোটে কাঠগড়া ধরে ঝাঁকাতে লাগলো। আমার দিকে হিংস্রভাবে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললো, জজসাহেব, তুমি আমাকে বিনা দোষে ফাঁসিতে পাঠাচ্ছো? তোমায় আমি ছাড়বো না। একদিন না একদিন আমি ঠিক এসে তোমায় গলা টিপে মারবো। আমার হাতেই তুমি মরবে!

রতন জিজ্ঞেস করলো, লোকটির কি সত্যি ফাঁসি হয়েছিল? অনেক ফাঁসির আসামী তো ছাড়াও পেয়ে যায়।

বিপিনবাবু বললো, নকুল ছাড়া পায়নি। আপিল করেছিল, সুবিধে হয়নি। এক বছর বাদে নকুলের ফাঁসি হয়ে গেল। কেউ তার ডেডবডি নিতে আসেনি, তাই জেলের লোকরাই পুড়িয়ে ফেলে। নকুল কিন্তু আমার পিছু ছাড়েনি। আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অন্য জায়গায় চলে এসেছি, তাও—

রতন বললো, তার মানে? সে মরে গেছে, তবু কী করে?

বিপিনবাবু বললো, তার আত্মা অন্য মানুষের রূপ ধরে আসে। দু'বার আমার গলা টিপে ধরেছে।

রতন এবার হেসে উঠে বললো, ভূতের গল্প? আপনি বুঝি ভূতে বিশ্বাস করেন?

বিপিনবাবু বিমর্ষভাবে বললো, আগে করতাম না। এখন তো বিশ্বাস না করে উপায় নেই। তিনবার সে আমায় আক্রমণ করেছে। অন্য লোকজন এসে পড়ায় বেঁচে গেছি। রাত্তিরে আমি একা একা কোথাও যাই না। নেহাৎ আমার মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে—

রতন বললো, এখানে ভূত আসবে না। আপনার চিন্তার কিছু নেই।

বিপিনবাবু হাত দিয়ে পাশে কী যেন খুঁজতে লাগলো। আপনমনে বললো, চশমাটা কোথায় গেল? চশমাটা কোথায় রাখলাম?

রতন বললো, ঐ তো পাশের চেয়ারে রেখেছেন।

বিপিনবাবু এবার চশমাটা পেয়ে চোখে লাগিয়ে বললো, চশমা ছাড়া কিচ্ছু দেখতে পাই না। একবার নকুল এসে গলা টিপে ধরার পর চোখ দুটো বেশি খারাপ হয়ে গেছে।

এই সময় আর একজন লোক ঢুকলো। রোগা-পাতলা চেহারা। সঙ্গে কোনো মালপত্র নেই। বসলো গিয়ে একটু দূরের চেয়ারে।

বিপিনবাবু ফিসফিস করে বললো, সাবধান! এ হতে পারে।

রতন জিজ্ঞেস করলো, আপনার সেই নকুলের বয়েস কত ছিল?

বিপিনবাবু বললো, বেয়াল্লিশ।

রতন বললো, এর তো অনেক কম বয়েস। তিরিশের বেশি না।

বিপিনবাবু বললো, তাতে কী! নকুলের আত্মা ওর শরীরে ঢুকে পড়তে পারে।

রতন অবিশ্বাসের হাসি দিয়ে নতুন লোকটির দিকে আড়চোখে তাকালো। নিতান্তই নিরীহ চেহারা। তবে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী বলে মনে হয় না।

লোকটি ওদের উদ্দেশে বললো, ট্রেন বোধহয় লেট হবে। আপনারা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

রতনের অবশ্য ঘুমোবার একটুও ইচ্ছে নেই। সে আবার বই খুললো।

নতুন লোকটি একটু পরে বাথরুমে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। সেদিকে কয়েক পা গিয়ে ঝপ করে পড়ে গেল মাটিতে। মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলো।

মৃগী রুগীদের এরকম হয়। রতন লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হলো? কী হলো আপনার?

উত্তর না দিয়ে সে তখনো একরকম শব্দই করে যেতে লাগলো।

রতন বললো, মুখে-চোখে জল দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির যেন জ্ঞান ফিরে এলো। কটমট করছে চোখ দুটো। বিপিন চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললো, তুই সেই জজসাহেবটা না? আজ তোকে শেষ করবোই আমি। নকুল বিশ্বাস কথার খেলাপ করে না।

রতন কিছু বোঝার আগেই সে লাফিয়ে উঠে বিপিন চৌধুরীর গলা টিপে ধরলো।

বিপিন চৌধুরী আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলো, বাঁচাও! ও ভাই বাঁচাও আমাকে। এ মেরে ফেলবে!

রতনের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে খানিকটা সময় লাগলো। সত্যি সত্যি এরকম হয়! এই নিরীহ চেহারার লোকটার শরীরে নকুল বিশ্বাস নামে একজন খুনীর আত্মা ভর করেছে?

রতন পেছন দিক থেকে লোকটাকে টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করলো।

অমনি লোকটি বিপিন চৌধুরীকে ছেড়ে দিয়ে উল্টো দিকে ফিরে আচমকা এক ধাক্কা মারলো রতনকে।

তাল সামলাতে না পেরে রতন পড়ে গেল মাটিতে। সেই লোকটি রতনের বুকে চড়ে গলা টিপে ধরলো।

বিপিন চৌধুরী এই ফাঁকে দৌড়ে পালালো ঘর থেকে।

বুকের ভেতরটা আঁকুপাকু করছে রতনের। এবার সে দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। ভূতের সঙ্গে কী করে লড়াই করবে? সে কাতর গলায় বললো, আমায় কেন মারছো? আমি তো কোনো দোষ করিনি।

লোকটি অমনি হাত আলগা করে বললো, তাই তো! তোমায় কেন মারবো? সে ব্যাটা পালালো কোথায়?

লোকটি রতনকে ছেড়ে দিয়ে তীরের মতন ছুটে গেল বিপিন চৌধুরীকে ধরতে।

মুক্তি পেয়ে রতন হাঁপাতে লাগলো। বাপরে বাপ, খুব জোর বাঁচা গেছে! এ কী সব ভুতুড়ে কাণ্ড!

দারুণ তেষ্টা পেয়ে গেছে। চামড়ার ব্যাগটায় জলের বোতল আছে। সেই ব্যাগটার দিকে হাত বাড়াতেই আবার সে চমকে উঠলো। ব্যাগটা নেই সেখানে। ঘরের মধ্যে কোথাও নেই। তারপর প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, মানিব্যাগও নেই।

তার মানে সবটাই সাজানো, সবটাই অভিনয়। ভূত-টুত কিছু নয়। বিপিন চৌধুরী নামের লোকটা কালো ব্যাগটা তুলে নিয়ে পালিয়েছে। আর ধস্তাধস্তির সময় অন্য লোকটা পকেট থেকে তুলে নিয়েছে মানিব্যাগ।

মানিব্যাগে বেশি টাকা ছিল না। কালো ব্যাগটায় ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। শিগগিরই তার দাদার মেয়ের বিয়ে। বাবা সেইজন্য টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলিয়ে রতনের হাত দিয়ে পাঠাচ্ছিলেন। বিপিন চৌধুরী ব্যাঙ্কে ঘোরাঘুরি করে দেখে কে কত টাকা তোলে। রতন যে আজ এই ট্রেনে কলকাতায় যাবে, তাও কোনো রকমে জেনেছে।

এখন কী হবে? এখন তো আর ওদের ধরা অসম্ভব। নিশ্চয়ই মিলিয়ে গেছে বাইরের অন্ধকারে। পুলিশকে একটা খবর দিতে হবে। তাতেও কি লাভ আছে কিছু?

রতনের মনটা খুব ভেঙে গেল।

হঠাৎ নজরে পড়লো, মাটিতে বিপিন চৌধুরীর চশমাটা পড়ে আছে। যদি সেটা পুলিশের কোনো কাজে লাগে, সেই ভেবে তুলে নিল চশমাটা। তারপর দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

ট্রেন আসার আর দেরি নেই। তাই স্টেশান জেগে উঠেছে। রতন দেখলো, এক জায়গায় একটা ছোটখাটো ভিড়। লোকেরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে যেন কিছু একটা রয়েছে।

সে দৌড়ে গেল সেদিকে। আবার চমকে উঠলো।

মাটিতে পড়ে আছে বিপিন চৌধুরী নামের সেই লোকটি। পাশেই তার চামড়ার কালো ব্যাগটা। একজন বললো, এই লোকটি ব্যাগ হাতে নিয়ে ছুটে যাচ্ছিলো, একটা পাথরে পা লেগে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মাথায় চোট লেগেছে খুব। দু'জন লোক তার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছে।

রতন বুঝলো, চশমার ব্যাপারে লোকটা সত্যি কথাই বলেছিল। চোখে ভালো দেখতে পায় না, তাই হোঁচট খেয়েছে।

একটু পরেই লোকটির জ্ঞান ফিরে এলো, চোখ মেলে তাকালো।

ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে গিয়ে রতন চশমাটা দোলাতে দোলাতে বললো, এই যে নকল জজসাহেব, তোমার সত্যিকারের নামটা কী বলো তো?

লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বললো, আমার নাম নকুল বিশ্বাস। আমাকে আর যাই শাস্তি দাও, ফাঁসি দিও না!

ছবি: বিজন কর্মকার

মামাবাড়ি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ঝরছে না জল আকাশ থেকে,
মেঘ করেছে আড়ি,
সকাল থেকেই সুজ্জিঠাকুর
চোখ রাঙাচ্ছে ভারী।
দুপুরটা তো তপ্ত কড়াই,
বাইরে কে আর যায়,
পিচ গলেছে শহর জুড়ে
সমস্ত রাস্তায়।
বাবা বলেন, 'কোথায় যাবে,
সাগর না পর্বত?'
মা হেসে কন, 'তার চেয়ে খাও
আমপোড়া শর্বত।'

গ্রীষ্মকালের এই ছুটিতে
বাপের বাড়ির টানে
মায়ের ইচ্ছে এবার তিনি
যাবেন বর্ধমানে।
সেইখানে ভাই আম পেকেছে,
জাম পেকেছে, আর
সাঁতার কেটে করতে পারো
পুকুর পারাপার।
আমারও তাই বর্ধমানেই
যাবার ইচ্ছে ভারী,
মায়ের বাপের বাড়িটাই যে
আমার মামাবাড়ি।

রক্ষে করুন দাদা

নারায়ণ চন্দ্র দাস

চার চারটে কুকুর দাদার
যেন বাঘের বাচ্চা,
খুব সাবধান! কেউ যেও না
বলছি সবই সাচ্চা।

দু'টি এসে দু'পা চাটে
একটি চাটে হাত,
লাফিয়ে উঠে একটি কাছে
গর্জে দেখায় দাঁত।

দাদার ঘরে ঢুকে সেদিন
গা করে ছমছম,
লেজটি নেড়ে এলো তেড়ে
বিকট চারটে যম!

চেঁচিয়ে হঠাৎ বলি ভয়ে
রক্ষে করুন দাদা,
সত্যি বলছি আসবো না আর
চাইতে পূজার চাঁদা।

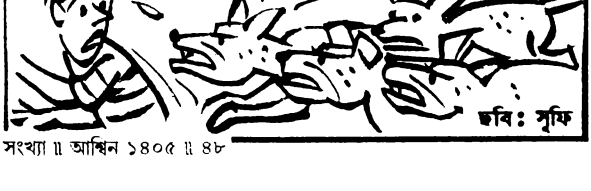

ছবি: সূফি

দুই বন্ধুর কীর্তি

প্রফুল্ল রায়

যদিও সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। বম্বে, যার নতুন নাম মুম্বাই, দেশের পশ্চিম প্রান্তে বলে এখানে সূর্যোদয় হয় অনেক দেরিতে। এই মুহূর্তে চারদিকে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে ঠিকই, আকাশের গায়ে আবছা আবছা আলোর ছোপও ধরেছে কিন্তু পঞ্চাশ ফুট দূরের কোনও কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না।

ছেলেবেলা থেকে সঞ্জুর খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস। পাঁচটা বাজলে সে আর শুয়ে থাকতে পারে না। হোটেলে তাদের ডবল-বেড রুমে অন্য একটা খাটে বাবা তখনও ঘুমোচ্ছেন। সে মেঝের কার্পেটের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে একটা বাইনোকুলার নিয়ে ঘরের লাগোয়া ব্যালকনিতে চলে এসেছিল। ক'দিন ধরে ভোরের একটা দৃশ্য তাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। এই নিয়ে তার নতুন বন্ধু রাজুর সঙ্গে মানে যার ভাল নাম রজত মেনন, অনেক কথাও হয়েছে। সঞ্জু একবার ডান পাশের একটা রুমের ব্যালকনির দিকে তাকাল। অন্য দিন এই সময় রাজুও ওখানে এসে দাঁড়ায়। আজ তাকে দেখা গেল না। নিশ্চয়ই ওর ঘুম এখনও ভাঙেনি।

সঞ্জুদের হোটেলের সামনে দিয়ে ঝকঝকে রাস্তা চলে গেছে। তার ওধারে লাইন দিয়ে উঁচু উঁচু নারকেল গাছ। তারপর সোনালি বালির জুহু বীচ, সারা পৃথিবী যার নাম জানে। বীচের গা থেকে আরব সাগর ধুধু দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই অন্যদিনের মতো বীচে কিছু লোকজন চোখে পড়ছে। তবে কেমন যেন ঝাপসা মতো। সবাই এসেছে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য। কেউ জগিং করছে, কেউ দৌড়চ্ছে, কেউ বালির ওপর শুয়ে বা বসে যোগাসন প্র্যাকটিস করছে। বয়স যাদের বেশি, তারা ধীরে ধীরে হাঁটাহাঁটি করছে।

বীচের দিকে লক্ষ্য ছিল না সঞ্জুর। কোনাকুনি রাস্তার ওপারে যে বিরাট দশতলা বাড়িটা—সেইদিকে সে তাকিয়ে আছে। রাস্তায় মানুষজন নেই। মুম্বাই শহরের ঘুম এত ভোরে কখনও ভাঙে না। অবশ্য স্বাস্থ্য নিয়ে যারা ভাবে কিংবা যাদের জরুরি কাজ থাকে তারা ছাড়া এসময় কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠে না।

বিরাট বাড়িটার একতলা জুড়ে একটা ব্যাঙ্ক এবং ছোটখাট দু'চারটে অফিস। ওপরের তলাগুলোতে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের নানা জাতের মানুষ থাকে।

ক'দিন ধরে ভোরবেলার অস্পষ্ট আলোয় ক'টা লোককে দেখতে পাচ্ছিল সঞ্জু। নিজেদের মধ্যে কী পরামর্শ করে তারা ব্যাঙ্কটার তিন দিক ঘুরে ঘুরে দেখে চলে যাচ্ছিল। মিনিট পনের-কুড়ির বেশি তারা কোনও দিনই থাকেনি। একটা লম্বা জিপে করে ওরা আসত; আবার ওই গাড়িটাতেই চলে যেত।

আজ কিন্তু লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। এত দেরি করে তারা কখনও আসে না। সঞ্জু এবং রাজু, দু'জনেরই ধারণা হয়েছিল, লোকগুলোর মাথায় খারাপ কোনও মতলব আছে। ওরা যদি আর না আসে, ধরে নিতে হবে, তারা যা ভেবেছে সেটা পুরোপুরি ভুল।

সঞ্জুর বয়স চোদ্দ। এ বছর সে ক্লাস নাইনে উঠেছে। ডিটেকটিভ বইয়ের সে পোকা। তার স্বপ্ন শার্লক হোমস বা হারকুল পয়রোর মতো দারুণ দারুণ কাণ্ডকারখানার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে রহস্যের সমাধান করা। মা-বাবা বলেন, আগে বড় হও, পড়াশোনা শেষ হোক, তারপর ওসব ভাবা যাবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! রহস্যের গন্ধ পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ নিয়ে মা-বাবাকে মাঝে মাঝে কম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না। বড় বড় ডিটেকটিভদের মতো সঞ্জু বাইনোকুলার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, অপরাধীদের খোঁজে উঁচু উঁচু বাড়িতে ওঠার জন্য হুক-লাগানো মজবুত দড়ি—পয়সা জমিয়ে জমিয়ে এমন অনেক কিছু কিনে ফেলেছে।

মা, বাবা, এক দিদি আর সঞ্জু—সব মিলিয়ে ওরা চারজন। বাবা অরিন্দম বসু একটা বিরাট কোম্পানির মস্ত অফিসার। হঠাৎ তাঁকে কলকাতা থেকে মুম্বাইতে বদলি করা হয়েছে। বাড়ির সবাইকে নিয়ে দিন দশেক আগে তিনি এখানে চলে এসেছেন। তাঁদের জন্য কোম্পানি পালি হিলে একটা ফ্ল্যাট দেবে। আপাতত সেটা রং করে, ফার্নিচার দিয়ে সাজানো হচ্ছে। যতদিন কাজটা শেষ না হয় সঞ্জুরা হোটেলে থাকবে।

সঞ্জুর বাবা যে কোম্পানিতে কাজ করেন, রাজুর বাবা রাধাকৃষ্ণ মেনন সেই একই কোম্পানির বড় অফিসার। উনি ছিলেন তিরুবন্তপুরমের অফিসে। সেখান থেকে অরিন্দম বসুর মতো তাঁকেও মুম্বাইতে ট্রান্সফার করে আনা হয়েছে। তিনিও সঙ্গে করে বাড়ির সবাইকে নিয়ে এসেছেন। একই হোটেলে তাঁদেরও রাখা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ মেননরা সব মিলিয়ে তিন জন। তিনি, তাঁর স্ত্রী জানকী মেনন এবং তাঁদের একমাত্র ছেলে রাজু। পালি হিলে সঞ্জুরা যে ফ্ল্যাটটায় গিয়ে উঠবে, তার পাশের ফ্ল্যাটটা দেওয়া হবে রাজুদের। সেটাও এখন ঝেড়েপুঁছে ফিটফাট করা হচ্ছে।

রাজু সঞ্জুরই বয়সী। সেও এ বছর ক্লাস নাইনে উঠেছে। মুম্বাই আসার পর দু'জনকে একই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। সঞ্জুর দিদি লেডি ব্রাবোর্নে বি.এ. ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এনে তারও এখানকার কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

ক'দিনই বা সঞ্জুরা মুম্বাইয়ে এসেছে! কিন্তু এর মধ্যেই রাজুর সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেছে। সারাদিন গল্প। হোটেলে আর কতক্ষণ থাকে! সামনের জুহু বীচে তো যায়ই। মুম্বাইতে বেড়াবার কি মোটে একটা জায়গা! আরও দূরে দূরে তারা চলে যায়। এয়ার-ইন্ডিয়া পার্ক, এসেল ওয়ার্ল্ড থেকে শুরু করে মেরিন ড্রাইভ, মালাবার হিলসের হ্যাঙ্গিং গার্ডেন, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া পর্যন্ত দেখে এসেছে। কাউকে না জানিয়েই গেছে। জানাতে গেলে মা-বাবারা একেবারেই রাজী হতেন না।

সঞ্জুর মতো রাজুও ডিটেকটিভ গল্প পড়তে ভীষণ ভালবাসে কিন্তু সত্যিকারের ডিটেকটিভ হবার কথা কখনও ভেবে দেখেনি। সঞ্জু যখন বলল, সে কলকাতায় দু'চারটে রহস্যের জট ছাড়িয়েছে এবং মুম্বাইতে এসে আরও একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে তখন রাজুর চোখ উৎসাহে চকচক করে উঠেছিল। মুম্বাইয়ের রহস্যটা কী, রাজু জানতে চাইলে ভোরবেলায় সেই লোকগুলোর কথা বলেছিল সঞ্জু। রাজু প্রায় লাফিয়ে উঠে বলেছে, সে-ও পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে এসে সন্দেহ-জনক লোকগুলোকে লক্ষ্য করবে। তাকে বাদ দিয়ে সঞ্জু যেন কিছু না করে। সঞ্জু একজন সহকারী পেয়ে খুশি হয়েছিল।...

যে দশতলা বাড়িটার তলায় ব্যাঙ্ক সেদিকে তাকিয়েই ছিল সঞ্জু। সে বেশ দমেই গেছে। একটা রহস্য হাতের মুঠোয় চলে আসতে আসতে হঠাৎ যেন ফসকে গেল।

লোকগুলো যখন আসবেই না তখন আর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। তার চেয়ে বরং রাজুকে ডেকে নিয়ে এক পাক বীচে ঘুরে আসা যাক। সে ঘরের দিকে পা বাড়াতে যাবে, হঠাৎ ডানদিক থেকে রাজুর চাপা গলা ভেসে এল, 'ওই দেখ, সেই জিপটা আসছে—'

কখন ঘুম ভাঙার পর রাজু পাশের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে, জানতে পারেনি সঞ্জু। একটু চমকে উঠে সে লক্ষ্য করল, সত্যিই চেনা জিপটা ডানদিকের একটা বাঁক ঘুরে এধারে আসছে। বলল, 'এখন আর কোনও কথা বলো না। চুপচাপ দেখে যাও ওরা কী করে। আমরা যে ওদের ওপর নজর রাখছি, একদম যাতে টের না পায়।'

রোজই এই কথাগুলো বলে সাবধান করে দেয় সঞ্জু। রাজু মাথা নেড়ে জানাল— আচ্ছা।

অন্যদিনের মতো লোকগুলো আজও ব্যাঙ্ক থেকে খানিকটা দূরে জিপ থামিয়ে নেমে পড়ল। আগে পাঁচজনের বেশি কখনও আসেনি। আজ দেখা গেল—সাতজন। সংখ্যাটা বেড়ে গেছে।

লোকগুলো নেমে ব্যাঙ্কের সামনে ভাগে ভাগে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে মনে মনে অদৃশ্য লাইন টেনে ওদের জুড়ে দিলে একটা রেক্টেঙ্গল বা আয়তক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সেটা বোধহয় পছন্দ হলো না। আবার অন্যভাবে দাঁড়াল। এবার লাইন টানলে ত্রিভুজের আকার নেবে। কিন্তু সেটাও বোধহয় ভাল লাগল না। নিজেদের মধ্যে কী আলোচনার পর শেষপর্যন্ত পাঁচটা কোণ তৈরি করে দাঁড়ায়। তিন জায়গায় একজন করে, বাকি দু'জায়গায় দু'জন দু'জন। এবার কল্পিত লাইন টানলে পেন্টাগন বা পঞ্চভুজ হবে। খুব সম্ভব এই নকশাটাই লোকগুলোর মনে ধরল। তারা আর দাঁড়াল না। পায়ে পায়ে জিপটার দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে অন্ধকার প্রায় কেটে গিয়ে আরও একটু আলো ফুটেছে। রাস্তায় দু'একটা অটো, ট্যাক্সি বেরিয়ে পড়েছে। বীচ ছাড়াও এধারে-ওধারে কিছু মানুষজন দেখা যাচ্ছে।

সেই লোকগুলো যখন জিপে উঠতে যাবে, রাজু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে সেই লোকটা না?' তার গলায় প্রবল উত্তেজনা।

রাজু যে লোকটার কথা বলল তাকে আগেও দেখেছে সঞ্জুরা। বার তিনেক জুহু বীচে। তা ছাড়া তাদের হোটেলের গায়ে যে পান-সিগারেট আর কোল্ড ড্রিংকসের দোকানটা আছে সেখানেও বেশ কয়েকবার। লোকটাকে মনে করে রাখার কারণ, যখনই পাশের দোকানটায় সে আসে, পর পর পাঁচ-ছ'বোতল কোল্ড ড্রিংকস খায়, তারপর দুটো সিগারেট ধরিয়ে অদ্ভুত কায়দায় আঙুলের ফাঁকে রেখে টানতে থাকে। একসঙ্গে এত কোল্ড ড্রিংক আর দুটো সিগারেট খেতে আগে আর কাউকে দেখেনি সঞ্জুরা। মনে রাখার আরও একটা কারণ, তার নাকের পাশে একটা বড়, কালো, বেঢপ সাইজের জড়ুল রয়েছে।

যারা রোজ ভোরে ব্যাঙ্কটার সামনে এসে পরামর্শ করে কী সব দেখে যায় তাদের দলে এই লোকটাকে আগে দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না সঞ্জু। দেখলেও চিনতে পারেনি। কেননা অন্য দিন ওরা যখন আসে তখন বেশ অন্ধকার থাকে।

আজ লোকটাকে দেখে রাজুর মতো সঞ্জুরও ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছিল। সে কিন্তু রাজুর মতো চেঁচাল না, নিচু গলায় বলল, 'এখন কোনও কথা নয়।'

রাজু আর কিছু বলল না।

লোকগুলো যেদিক থেকে এসেছিল, জিপে উঠে সেদিকে চলে গেল।

জিপটা রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হবার পর

রাজু জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবে ?'
সঞ্জু বলল, 'ভাবতে হবে। ব্রেকফাস্ট করে তুমি আর আমি বীচে যাব। হোটেলে বসে হবে না। কেউ শুনে ফেলবে। ফাঁকা জায়গায় ব্যাপারটা নিয়ে ভাল করে ডিসকাস করা দরকার।'
'ঠিক আছে।'

সকালের খাবার খেয়ে সাড়ে আটটায় দু'জনে জুহু বীচে চলে এল। এই সময়টা এখানে ভিড় কম থাকে। যারা স্বাস্থ্যের জন্য সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বীচে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই ফিরে গেছে। বিশাল সমুদ্রতীর এখন প্রায় ফাঁকাই।
সঞ্জু আর রাজু জলের ধার ঘেঁষে বালির ওপর বসে পড়ল।
বর্ষাকাল বাদ দিলে আরব সাগর বছরের বাকি সময়টা বেশ শান্ত থাকে। এখন ছোট ছোট ঢেউ সকালের সোনালি আলো গায়ে মেখে বীচটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তবে সমুদ্রের দিক থেকে খুব জোরালো হাওয়া বইছে।
রাজু বলল, 'আমার কী মনে হয় জানো ?'
সঞ্জু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল ; মুখ না ফিরিয়ে সে বলল, 'কী ?'
'ওরা ওই বড় বিল্ডিংটার কাছে কিছু একটা করতে চায়।'
'কী করতে ?'
'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'
খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সঞ্জু বলল, 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'
রাজু জিজ্ঞেস করল, 'কিসের আইডিয়া ?'
'ওই জড়ুলওলা লোকটাকে খুঁজে বার করে যদি ওর ওপর নজর রাখি, বুঝতে পারব ওদের দলটা কী মতলব আঁটছে।'
'কিন্তু তাকে আমরা পাচ্ছি কোথায় ?'
সঞ্জু বলল, 'আমার মনে হয়, লোকটা এদিকেই কোথাও থাকে।'
রাজু বলল, 'এটা মনে হলো কেন ?'
'তিন দিন আগে বিকেলবেলায় লোকটা আমাদের হোটেলের পাশের সেই পান-সিগারেটের দোকানে কোল্ড ড্রিংক খাচ্ছিল। আমরা তখন বেড়াতে বেরুচ্ছিলাম।' বলে সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'ওর পরনে কী ছিল মনে পড়ছে ?'
অনেকক্ষণ চিন্তা করে রাজু জানাল, মনে নেই। কারণ সে ভাল করে লক্ষ্য করেনি।
সঞ্জু বলল, 'একটা সিল্কের লুঙ্গি আর গেঞ্জি। কাছাকাছি না থাকলে ওরকম পোশাকে কেউ বাইরে বেরোয় না।'
রাজু বলল, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু—'
'কী ?'
'এখানে এত হোটেল আর এত হাই-রাইজ বিল্ডিং ; এ সবের ভেতর থেকে খুঁজে বার করবে কী করে ?'
'আরে বাবা, সারাক্ষণ কি আর লোকটা ঘরে বসে থাকবে ? আমরা এখন অন্য কোনও দিকে বেড়াতে যাব না। বীচে আর এখানকার রাস্তায় ঘুরে বেড়াব। হোটেলগুলোতে গিয়ে ওর ডেসক্রিপশান দিয়ে খোঁজ করব। মনে হয় ওকে ঠিক পেয়ে যাব।'
'ধর, পেয়ে গেলে। তখন কী করবে ?'
'সেটা এখনও ভাবিনি। আগে তো লোকটাকে পাই। তারপর দেখা যাবে।'
আলোচনা শেষ করে সঞ্জুরা কিছুক্ষণ বীচে ঘোরাঘুরি করল কিন্তু লোকটাকে দেখা গেল না। বীচ থেকে রাস্তায় যখন ওরা উঠে এল তখন মুম্বাই শহরের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে অজস্র মানুষ। অগুনতি গাড়ি স্রোতের মতো ছুটে চলেছে। এর ভেতর থেকে বিশেষ একটা লোককে খুঁজে বার করা অসম্ভব ব্যাপার। তবু সঞ্জুরা চারদিকে নজর রাখতে লাগল।
দুপুরে হোটেলে এসে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফের বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। এবার ওরা হানা দিল হোটেলগুলোতে। সন্ধ্যে পর্যন্ত একটার পর একটা হোটেলে গিয়ে রিসেপশানে লোকটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইল, এরকম কেউ আছে কিনা। সব জায়গাতেই ওদের বলা হলো—নেই। রোজই হোটেলে নানা ধরনের লোক আসছে। তাদের সবার চেহারা রিসেপশানের লোকেদের পক্ষে মনে করে রাখা সম্ভব নয়। তবে কারও মুখে একটা বিশ্রী জড়ুল থাকলে নিশ্চয়ই ওদের চোখে পড়ত।

এরপর দুটো দিন সকাল থেকে রাত আটটা-ন'টা পর্যন্ত বীচ থেকে শুরু করে সামনের রাস্তা এবং সারি সারি দোকান-গুলোতে গিয়ে দেখতে লাগল সঞ্জুরা। কিন্তু না, লোকটা একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এমন কি, ভোরের দিকে যে দলটা সেই ব্যাঙ্কটার সামনে এসে কী পরামর্শ করে, তারাও এই দু'দিন আসছে না।
রাজু হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'নাঃ, ওদের আর পাওয়া যাবে না।'
সঞ্জু বলল, 'আর দু'একদিন দেখা যাক। তারপর এ নিয়ে আর ভাবব না।'
আশ্চর্য, সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় লোকটাকে আবার দেখা গেল। সেই পান-সিগারেটের দোকানে কোল্ড ড্রিংক খেতে এসেছে।
সঞ্জুরা বীচের দিক থেকে হোটেলে ফিরে আসছিল, দূর থেকে লোকটাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। রাজু কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে সঞ্জু বলে, 'এখন একটা কথাও নয়। একদম চুপ।'
লোকটা অন্যদিনের মতো পাঁচ বোতল কোল্ড ড্রিংক খেয়ে, জোড়া সিগারেট ধরিয়ে জুত করে টানতে টানতে ডান পাশের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলল।
সঞ্জু চাপা গলায় বলল, 'ওকে ফলো করতে হবে। এসো আমার সঙ্গে।'
রাজু বলল, 'আমার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছে।'
সঞ্জু বলল, 'অত ভয় থাকলে আসতে হবে না। হোটেলে ফিরে যাও।'
'আরে না না, তোমাকে একা যেতে দেব না। যা হবার হবে। আমি তোমার সঙ্গে আছি।'
দু'জনে লোকটাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে পেছন পেছন চলল। তাদের মাঝখানে পঞ্চাশ ফুটের মতো দূরত্ব।
মিনিট চারেক হাঁটার পর একটা মাঝারি হোটেলের পাশ দিয়ে অন্য একটা

রাস্তায় ঢুকে পড়ল লোকটা। রাস্তাটা বড় নয়; সেটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে পাশাপাশি একই রকম দেখতে দুটো চব্বিশতলা বাড়ি। বাঁ দিকেরটার নাম 'আকাশগঙ্গা', ডান দিকেরটা 'পাতালগঙ্গা'।

সঞ্জুরা লক্ষ্য করল, লোকটা 'আকাশগঙ্গা'য় ঢুকেছে। ওরা জোরে পা চালিয়ে দিল। কিন্তু লোকটার কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই সে একটা লিফটে ঢুকে পড়ল।

পাশে আরও দুটো লিফট রয়েছে। দুটোই ওপর থেকে নিচে নামছে। রাজু বলল, 'যেটা আগে নামবে সেটায় উঠে লোকটাকে খুঁজতে হবে।'

সঞ্জু বলল, 'এই বিরাট হাই-রাইজে কোথায় হাতড়ে বেড়াবে! আগে জানতে হবে লোকটা ঠিক কোন ফ্লোরে গেল।'

রাজু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী করে জানবে?'

'এদিকে এসো—'

লোকটা যে লিফটটায় ঢুকেছিল, রাজুকে সঙ্গে করে সঞ্জু তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লিফটের মাথায় লাল ইনডিকেটরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ওটা ভাল করে দেখ।'

এক, দুই, তিন—এইভাবে সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। কিন্তু পনের নম্বরের লাল আলোটা কয়েক সেকেন্ডের মতো জ্বলে রইল। তারপর সেটা নিভে ষোল-সতের পেরিয়ে আঠার নম্বরটা জ্বলে উঠল। এবং জ্বলতেই লাগল। মিনিট তিনেক পর আলোটা নিভে সতেরো, ষোল—এইভাবে সংখ্যা কমতে লাগল।

সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বুঝতে পারলে?'

রাজু বলল, 'না।'

'লিফটটা ওপরে উঠে পনের আর আঠার, মানে ফিফটিনথ আর এইটিনথ ফ্লোরে থেমেছিল। তারপর এখন নেমে আসছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

সঞ্জু বলতে লাগল, 'ওই লোকটা যখন ওপরে উঠছিল তখন সে একা ছিল না। লিফটে আরও কেউ কেউ থাকতে পারে যাদের আমরা দেখতে পাইনি। লিফটটা দু' জায়গায় যে থেমেছিল সেটা অবশ্য জানতে পেরেছি। লোকটা হয় ফিফটিনথ, নইলে এইটিনথ ফ্লোরে নেমে গেছে। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল?'

রাজু বলল, 'ঢুকেছে। এখন কী করতে চাও?'

'দেখ কী করি—'

লিফটটা নিচে এসে থামতেই দু'জন বেঢপ চেহারার মোটা মহিলা বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে রাজুকে নিয়ে সঞ্জু ভেতরে ঢুকে পনের নম্বর বাটনটা টিপে দিল। লিফটটা অটোমেটিক। আপনা থেকে দরজা বন্ধ হয়ে সেটা ওপরে উঠতে লাগল।

ফিফটিনথ ফ্লোরে এসে লিফটটা থামলে বাইরে বেরিয়ে সঞ্জুরা দেখল এখানে সবসুদ্ধু চারটে ফ্ল্যাট। প্রতিটি ফ্ল্যাটের সামনের দরজার গায়ে পেতলের ফ্ল্যাট-নাম্বার লাগানো রয়েছে।

প্রতিটি ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে কলিং বেল টিপল সঞ্জু। কেউ দরজা খুললেই জিজ্ঞেস করল, এখানে অমিতাভ সেন নামে কেউ থাকে কিনা। সবাই জানাল, ওই নামের কাউকে তারা চেনে না।

সঞ্জু রাজুকে বলল, 'না, এখানে নয়। চল, এইটিনথ ফ্লোরে যাওয়া যাক।'

লিফটটায় চড়ে কখন অন্য কেউ নিচে নেমে গিয়েছিল, ওরা টের পায়নি। ওটার আশায় থাকলে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে। মোটে তিনটে তো ফ্লোর। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সঞ্জুরা ওপরে উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সিঁড়ি ভাঙার পর রাজু হঠাৎ বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, এভাবে খোঁজ পাওয়া যাবে না।'

সঞ্জু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল বাজালে সেই লোকটাই যে দরজা খুলে দেবে, সেটা নাও হতে পারে। হয়তো সে ভেতরের কোনও ঘরে বসে আছে; অন্য লোক দরজা খুলল।'

একটু চিন্তা করে সঞ্জু বলল, 'রাইট। তা হলেও চেষ্টা তো করতে হবে।'

রাজু এবার কিছু বলল না।

সঞ্জু বলল, 'এইটিনথ ফ্লোরটা দেখি। তখনও যদি না পাওয়া যায়, অন্যরকম প্ল্যান করতে হবে।'

'অন্যরকম বলতে?'

'লোকটা এ বাড়িতে যে আছে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। তাকে কখনও না কখনও বাইরে বেরুতে হবেই। যতক্ষণ না বেরুচ্ছে, আমরা গেটের কাছে ওয়েট করব।'

এইটিনথ ফ্লোরে, মানে বাংলার উনিশ তলায় এসে দেখা গেল এখানেও চারটে ফ্ল্যাট। সব ফ্লোরেই বোধহয় একই রকম ব্যবস্থা।

প্রথম দুটো ফ্ল্যাটে কোনও হদিস পাওয়া গেল না। কিন্তু তিন নম্বর ফ্ল্যাটের বেল বাজাতেই দরজা খুলে যে সামনে দাঁড়াল তার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল সঞ্জুর। পা দুটো ভীষণ কাঁপছে। আজ ক'দিন ধরে এই লোকটাকেই পাগলের মতো তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় লাগল সঞ্জুর। লোকটা একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

অন্য ফ্ল্যাটগুলোতে সঞ্জু যা বলেছিল, এখানেও তাই বলল।

লোকটা একটু ভেবে বলল, 'অমিতাভ সেন কত নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন?'

'সেটা বলতে পারব না। তবে এই 'আকাশগঙ্গা'তেই থাকেন।'

'এই বাড়িতে সবসুদ্ধ বিরানব্বইটা ফ্ল্যাট। কে কোন ফ্ল্যাটে থাকে বলা মুশকিল।'

যেন লোকটার পরামর্শ চাইছে, এমন একটা ভাব করে সঞ্জু জিজ্ঞেস করল, 'কী করা যায় বলুন তো আঙ্কল?'

লোকটাকে যতটা ভীতিকর ভাবা গিয়েছিল, সামনাসামনি দেখে তেমনটা মনে হলো না। সে বলল, 'এক কাজ কর, গ্রাউন্ড ফ্লোরে বিল্ডিংয়ের কেয়ার-টেকারের অফিস আছে। সেখানে যাও; ওরা বলতে পারবে।'

কথা বলতে বলতে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করছিল সঞ্জু। একটা সাজানো-গোছানো বিরাট ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল চোখে

পড়ল। কিন্তু অন্য কাউকে দেখা গেল না। লোকটা একাই কি এখানে থাকে? না, আরও লোকজন আছে? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সঞ্জু বলল, 'থ্যাঙ্ক য়ু আঙ্কল।'

লোকটা কিছু বলল না, অল্প হেসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কিছুক্ষণ পর লিফটে করে নামতে নামতে রাজু জিজ্ঞেস করল, 'অমিতাভ সেন বলে সত্যি সত্যিই কেউ আছে নাকি?'

সঞ্জু বলল, 'জানি না।'

'ওটা তা হলে তোমার বানানো?'

'একজাক্টলি।'

'অ্যাকটিংটা এমন করেছ যে লোকটা ধরতেই পারেনি।'

রাজুর কথা যেন শুনতে পায়নি, এমনভাবে সঞ্জু বলল, 'লোকটা যে ফ্ল্যাটে থাকে তার নাম্বারটা দেখেছিলে?'

রাজু বলল, 'হ্যাঁ। এইটিন বাই থ্রি।'

'গুড। ওটা ভুলো না।'

'লোকটাকে দেখে কিন্তু খারাপ মনে হলো না।'

'মুখ দেখে কি কার মাথায় কী ঘুরছে সবসময় বোঝা যায়!'

রাজু আস্তে মাথা নাড়ল। বলল, 'ঠিক।'

সঞ্জু বলল, 'এখন আমাদের কাজ হলো, সারাক্ষণ লোকটাকে চোখে চোখে রাখা।'

কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, তাই পরদিন সকালে এলিফ্যান্টা কেভ দেখতে যেতে হলো সঞ্জুদের। বাবা এবং রাধাকৃষ্ণ আঙ্কল, মানে রাজুর বাবা ওঁদের অফিস থেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজু এবং সঞ্জুর যাবার ইচ্ছা ছিল না। মুম্বাইতে যখন থাকা হবে তখন পরে একবার কেন দশবার যাওয়া যাবে। এলিফ্যান্টা কেভ পালিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু ওই লোকটার ওপর নজর না রাখলে দারুণ একটা রহস্য হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

বাবা বা আঙ্কলকে বলা গেল না, কী কারণে তাদের এলিফ্যান্টায় যাওয়া উচিত নয়। নিরুপায় হয়ে অন্য সবার সঙ্গে গাড়িতে উঠতে হলো সঞ্জুদের।

জুহু থেকে গাড়িতে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া। সেখান থেকে মোটর বোটে আরব সাগরের ওপর দিয়ে এলিফ্যান্টা কেভে পৌঁছুতে ঘণ্টাখানেক লাগে। আদিগন্ত সমুদ্র, দূরে মুম্বাই হারবারে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি সুবিশাল জাহাজ—এই সব দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগছিল।

এলিফ্যান্টায় পৌঁছে পাহাড়-কাটা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে গুহার ভেতর বহুকালের পুরনো সব শিবমূর্তি দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যায় সঞ্জুরা। শত শত বছর আগে আমাদের দেশ শিল্পে-ভাস্কর্যে কিরকম উন্নতি করেছিল, এগুলো তারই প্রমাণ।

সবই দেখছিল সঞ্জুরা, কিন্তু সেই লোকটাকে কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। ওদের দু'জনের মাথায় তার চিন্তাটা ঘুরে ঘুরে হানা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে লোকটা সম্পর্কে ওরা এমন চাপা গলায় কথা বলছে যাতে মা-বাবা আঙ্কল-আন্টিরা শুনতে না পান।

এলিফ্যান্টা দেখে ওরা যখন গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াতে ফিরে এল, তিনটে বেজে গেছে। সবার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল। ঠিক হলো, কাছাকাছি কোনও একটা ভাল রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেওয়া হবে। সঞ্জুদের গাড়িটা রয়েছে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার ওধারে বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল হোটেলের সামনে কার পার্কিংয়ের জায়গায়। খাওয়া হলে গাড়িতে করে তারা জুহুতে ফিরে যাবে।

মুম্বাইতে দুপুরে এবং সন্ধ্যেয় বেশ ক'টা খবরের কাগজ বেরোয়। একটা কাগজওলা চিৎকার করে বলছিল, 'ব্যাঙ্ক ডাকাইতি। দশ আদমী মার্ডার হো গিয়া—তাজা খবর—'

লোকটার সামনে একটা নিচু টুলের ওপর প্রচুর কাগজ থাক দিয়ে সাজানো। তাকে ঘিরে রীতিমতো ভিড় জমেছে। সবাই কাগজ কিনছে আর উত্তেজিতভাবে কী যেন বলছে।

ক'দিনের মধ্যে সঞ্জুর বাবার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ আঙ্কলের দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ওঁরা গিয়ে একটা কাগজ কিনে আনলেন। প্রথম পাতাতেই বড় বড় হরফে ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার বাংলা মানে করলে এরকম দাঁড়ায়। জুহুর একটা ব্যাঙ্কে আজ বেলা এগারোটার সময় বিরাট ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা সবাই মুখোশ পরে এসেছিল, হাতে ছিল লাইট মেশিনগান। ওরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে দশজনকে খুন করে। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্কের ক'জন কর্মী। যারা টাকা তুলতে এসেছিল তাদের মধ্যেও দু'জন মারা যায়। আহত হয়েছে পনের-ষোল জন। ডাকাতদের একজনকেও ধরা যায়নি। একটা জিপে করে তারা এসেছিল। নগদ তিরিশ লাখ টাকা আর ব্যাঙ্কের লকার ভেঙে প্রচুর গয়না লুট করে সেই জিপেই উধাও হয়ে যায়। খবরের সঙ্গে যে ব্যাঙ্কে ঘটনাটি ঘটেছে সেটার এবং মৃত লোকগুলির ছবিও ছাপা হয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর, দুঃসাহসিক ব্যাঙ্ক ডাকাতি এর আগে নাকি মুম্বাইতে আর কখনও হয়নি।

রাধাকৃষ্ণ আঙ্কল বললেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

সঞ্জুর বাবা কাগজের ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'আরে, ব্যাঙ্কটা তো আমাদের হোটেলের কাছে সেই দশতলা বাড়িটায়!'

উত্তেজনায় সঞ্জুর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। রাজুর কানে মুখ ঠেকিয়ে সে বলল, 'আমরা আজ এলিফ্যান্টা এলাম আর আজই ব্যাপারটা ঘটে গেল! এখন ওই জড়ুলওলা লোকটাকে পেলে হয়।'

রাজু কিছু বলল না। সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর জুহুতে ফিরতে ফিরতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। গাড়ি থেকে নেমে সঞ্জু আর রাজু হোটেলের ভেতর গেল না, বাবা আর মায়েদের বুঝতে না দিয়ে ব্যাঙ্কটার কাছে চলে এল। চারদিকে প্রচুর পুলিশ রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে। এখনও রাস্তার নানা জায়গায় রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। এধারে-ওধারে মানুষের জটলা।

ঘটনাটা ঘটেছে বেলা এগারোটায় কিন্তু এখনও সবার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ।

রাজু জিজ্ঞেস করল, 'সেই লোকটার কি খোঁজ করবে?'

সঞ্জু বলল, 'না। আমাদের আবার দেখলে সন্দেহ করবে।'

'তা হলে কী করতে চাও?'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সঞ্জু বলল, 'চল পুলিশ স্টেশনে যাই।'

রাজু চমকে উঠল, 'পুলিশ স্টেশনে! কেন?'

'আমরা ওই লোকগুলোর ব্যাপারে যা করেছি তার বেশি আর কিছু করা যাবে না। এখন যা করার পুলিশকেই করতে হবে। আমরা শুধু ক্লু দিয়ে ওদের সাহায্য করব। তা ছাড়া—'

'কী?'

'আমরা এরপর কিছু করতে গেলে বাবা-মা আঙ্কল-আন্টি টের পেয়ে যাবেন। তখন ডিটেকটিভ হবার মজাটা টের পাইয়ে ছাড়বেন।'

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে ওরা থানায় পৌঁছে গেল। সেখানে ওই ব্যাঙ্ক ডাকাতি এবং দশ দশটা খুন নিয়ে কিছু একটা চলছে। আবহাওয়া ভীষণ থমথমে। তার মধ্যে কনস্টেবলরা এধারে-ওধারে ছোটাছুটি করছে।

গেটের মুখে সঞ্জুদের আটকে একজন আর্মড গার্ড বলল, 'অন্দর যানা মানা হ্যায়।'

সঞ্জু হিন্দীতে বুঝিয়ে দিল, অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে তাদের দেখা করতে হবে। বিশেষ দরকার।

আর্মড গার্ড জানাল, এখন ভেতরে মিটিং চলছে। দরকার থাকলে সঞ্জুরা যেন পরে আসে।

সঞ্জুরা নাছোড়বান্দা। তারা ভেতরে যাবেই, আর্মড গার্ড কিছুতেই যেতে দেবে না। চেঁচামেচি শুনে একটি মধ্যবয়সী, পুলিশের ইউনিফর্ম পরা, গম্ভীর চেহারার অফিসার বেরিয়ে এলেন। বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে? এত হৈচৈ কিসের?'

সঞ্জু লক্ষ্য করল, বুকে মেটালের লম্বা ব্যাজে লেখা: ইন্সপেক্টর চাপেকার। তিনি মারাঠি। আর্মড গার্ড মুখ খোলার আগেই সঞ্জু বলল, 'স্যার, আমরা অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, তিনিই অফিসার-ইন-চার্জ। ভীষণ ব্যস্ত আছেন, কথা বলার সময় নেই।

সঞ্জু বলল, 'যে কারণে আপনারা ব্যস্ত সেই ব্যাপারেই আমাদের কিছু বলার আছে।'

ধমক দিতে গিয়ে থমকে গেলেন ইন্সপেক্টর চাপেকার। দু'টি অল্প বয়সের ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন, 'আমরা কী ব্যাপারে ব্যস্ত তা জানো?'

'হ্যাঁ। ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর—'

সঞ্জুকে থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে—'

সঞ্জু বলল, 'আমাদের যা বলার, শুধু আপনাকেই বলব।'

একটু ভেবে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, 'ঠিক আছে।' সঞ্জুদের সঙ্গে করে একটা ফাঁকা ঘরে নিয়ে এলেন। তাদের বসিয়ে বললেন, 'বল—'

তারা ক'দিন আগে মুম্বাইতে এসেছে, জুহুর হোটেলে আছে, তাদের নাম সঞ্জয় বসু এবং রজত মেনন, ইত্যাদি জানিয়ে সেই লোকটা এবং তার সঙ্গীদের সম্বন্ধে যাবতীয় খবর দিয়ে সঞ্জু বলল, 'লোকটা কোথায় থাকে তাও আমরা জানি।'

শুনতে শুনতে মেরুদণ্ড টান টান হয়ে গিয়েছিল ইন্সপেক্টরের। চোখ দুটো চকচক করছে। বললেন, 'কোথায়?'

'জুহুর 'আকাশগঙ্গা' বিল্ডিংয়ে। ফ্ল্যাট এইটিন বাই থ্রি।' বলে কীভাবে ঠিকানাটা যোগাড় করেছে তাও জানিয়ে দিল সঞ্জু।

মুখোমুখি বসে ছিলেন ইন্সপেক্টর চাপেকার। সঞ্জু আর রাজুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'ভেরি গুড ওয়ার্ক ইয়াং শার্লক হোমস। একসেলেন্ট অবজারভেশন। তোমাদের এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের খুব সাহায্য করবে।'

সঞ্জু বলল, 'স্যার, একটা রিকোয়েস্ট আছে—'

'বল—বল—'

'আমরা যে ওই লোকগুলোর ওপর নজর রেখে, ফলো করে এই সব খবর যোগাড় করেছি, আমাদের মা-বাবারা জানতে পারলে একেবারে কেটে ফেলবেন। মানে এ সব—'

'বুঝেছি, বুঝেছি। কোনও মা-বাবাই চান না তাঁদের ছেলেরা খুনী-ডাকাতদের পেছনে ঘুরে বেড়াক। তোমাদের কথা মনে থাকবে।'

সপ্তাহ দুই কেটে গেল।

সঞ্জু আর রাজুদের পালি হিলের ফ্ল্যাট রেডি হয়ে গেছে। ওরা যেদিন হোটেল থেকে সেখানে চলে যাবে, তার আগের দিন সকালে খবরের কাগজে দেখা গেল, ব্যাঙ্ক ডাকাতরা সবাই মুম্বাই থেকে নব্বই মাইল দূরে পুনে শহরে ধরা পড়েছে এবং তাদের লুট-করা টাকা আর গয়নার বেশির ভাগটাই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সেদিনই সন্ধ্যের পর ইন্সপেক্টর চাপেকার সঞ্জুদের হোটেলে এসে হাজির। অফিস থেকে তার কিছুক্ষণ আগেই অরিন্দম আর রাধাকৃষ্ণ চলে এসেছেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার দুই ফ্যামিলির সবাইকে নিয়ে বেশ আসর জমিয়ে বসলেন। কফি খেতে খেতে বললেন, 'হঠাৎ পুলিশের লোক কেন হানা দিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনাদের কৌতূহল হচ্ছে।'

রাধাকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ, মানে—'

সঞ্জু আর রাজু মাথা হেঁট করে বসে ছিল। সব ব্যাপারটা এবার জানাজানি হয়ে যাবে, ভাবতেই তাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

ইন্সপেক্টর চাপেকার সঞ্জুদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'আমার এই দুই ইয়াং ফ্রেন্ড আর তাদের মা-বাবাকে কনগ্র্যাচুলেট করতে এসেছি। ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পারছেন না?'

রাধাকৃষ্ণ, অরিন্দম, জানকী, সঞ্জুর মা মণিমালা, তার দিদি রিনি—সকলেই মাথা নেড়ে জানালেন, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

ইন্সপেক্টর চাপেকার এবার বললেন, 'আজকের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন,

জুহুর ব্যাঙ্কে যারা ডাকাতি করেছে তারা দলবলসুদ্ধ ধরা পড়েছে। এই দুই ক্ষুদে শার্লক হোমসের সাহায্য না পেলে কিছুতেই ওদের অ্যারেস্ট করা সম্ভব হতো না।’ তারপর কীভাবে সঞ্জুরা ডাকাতদের সম্পর্কে খবর যোগাড় করে তাঁকে গোপনে জানিয়ে এসেছে, তা তো বললেনই। আরও বললেন, ওদের দেওয়া সূত্র ধরে ‘আকাশগঙ্গা’য় তাঁরা ফাঁদ পেতেছিলেন। সেখানে ডাকাতদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। তবে ওদের ওই ফ্ল্যাটটা দেখাশোনা করার জন্য একটা লোক ছিল। তাকে থানায় ধরে এনে বেদম পেটাতেই ডাকাতদের পুনের ঠিকানা পাওয়া যায়।

রাধাকৃষ্ণ এবং অরিন্দম ছেলেদের ওপর রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, তাঁদের থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, ‘ওদের বকবেন না। যে কাজ ওরা করেছে সে জন্যে আপনাদের গর্ববোধ করা উচিত।’

অরিন্দম বললেন, ‘ডাকাতগুলো টের পেলে কী হতো বলুন তো? কত বড় রিস্ক! সঞ্জু কলকাতাতেও এমন অনেক কাণ্ড করেছে—’

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, ‘ভেবে দেখুন ওরা না সাহায্য করলে ডাকাতেরা ভবিষ্যতে আরও কত ক্ষতি করত!’

অরিন্দম চুপ করে রইলেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার বলতে লাগলেন, ‘আমার ইয়াং ফ্রেন্ডদের মোটামুটি কথা দিয়েছিলাম, আপনাদের জানাবো না। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি এত বড় একটা ব্যাপার লুকিয়ে রাখা অন্যায়। এবার একটা সুখবর দিচ্ছি।’

সবাই উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

ইন্সপেক্টর চাপেকার বললেন, ‘মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট সঞ্জয় আর রজতকে বড় অনুষ্ঠান করে খুব বড় একটা পুরস্কার দেবে। যে ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে, তারাও বিরাট কিছু দেবার কথা ভাবছে। খুব শীগগিরই আপনাদের কাছে এসে ওরা তা জানিয়ে যাবে। আজ তাহলে চলি—’

ইন্সপেক্টর চাপেকার উঠে দাঁড়ালেন।

রবিবাবুর কথা

কৃষ্ণ ধর

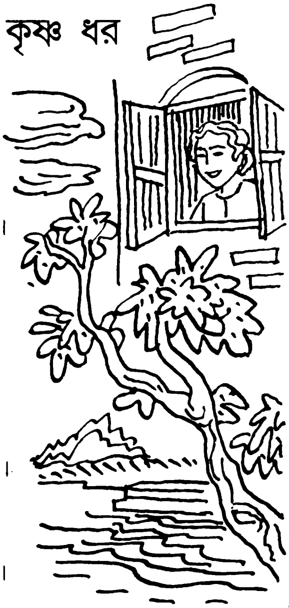

রবি ছিলেন ছোটবাবু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির
ছেলেবেলা থেকেই ছিল স্কুলের সঙ্গে তাঁর যে আড়ি।
জানলা দিয়ে দেখত আকাশ, দেখত পুকুর, বটগাছটি
মনের ভিতর খেলত যে সুর, ফুটত যত ফুল দোপাটি।

কেমন ছিল কলকাতাটা রবিবাবুর ছোটবেলায়
কেমন করে কাটত যে দিন ছবি আঁকায় পদ্য লেখায়।
জানতে হলে পড়তে হবে পদ্য লেখার তাঁর খাতাটা
কবির চোখে দেখতে পাব অন্যরকম কলকাতাটা।
ডনকুস্তি? তাও ছিল, গানের সুরে গলা সাধা
সদর স্ট্রিটে ভোরবেলাতে ভাঙল ঘুম আর সকল বাধা।

রবিবাবু কেমন বাবু? সবাই বলে মস্ত কবি
তিনি বলেন, সবার আমি, নইতো কোনো নতুন নবী।

গোসার গোঁ

অশোক সী

গোসার বুঝি ফোঁসফোঁসানি
গোসার ফোঁসাফুঁসি,
তা বটে হ্যাঁ, রাগ-বিরাগে
করবে যেমন খুশি!

চেঁচিয়ে তুমি সারাপাড়া
মাথায় করতে পারো,
সকাল-দুপুর নয় সারারাত
চেঁচাও আরো আরো...!

থামতে তোমায় বলবে সে কার
এমন বুকের পাটা,
পড়বে যে তার মাথায় তখন
একশো চাঁটি-চাঁটা!

তাই ভয়ে তো কাঁটা হয়ে
দিচ্ছি উল্টো হাঁটা,
ছ'মাস তোমার বয়েস হলেও
গোসার গোঁ-য়ে জ্যাঠা!

তিনটি রাজা

কালিদাস ভট্টাচার্য

তিনটি রাজা বসলো বনে পুতুল খেলা করতে,
পুতুল তো নেই তাই তো তারা লাগলো পুতুল গড়তে।
কিন্তু পুতুল হয় না গড়া চেষ্টা কতই করলো,
বারে বারেই গড়তে পুতুল হুতুম পেঁচা গড়লো।
অবশেষে একটি রাজা নিজেই পুতুল সাজলো,
তার পায়ে সোনার ঘুঙুর ঝুমুর ঝুমুর বাজলো।
আর দু'রাজা দিলো তাকে ফুলের মালা কুড়িটি
পারলো না কেউ তুলতে কোলে মস্ত যে তার ভুঁড়িটি।
এত বড় ভুঁড়ির ভেতর ঘর বেঁধে কেউ থাকে কি?
থাকলে পরে যখন তখন মনের সুখে ডাকে কি?
এই না ভেবে দুইটি রাজা ভুঁড়িতে কান রাখলো,
ঠিক তখনি বনের ভেতর বাঘটা হঠাৎ ডাকলো।
বাঘের ডাকে তিনটি রাজাই চমকে হঠাৎ উঠলো,
বাঁচাও বাঁচাও বলে তারা যে যার দেশে ছুটলো॥

আমার দোস্ত

নিমাই ভট্টাচার্য

সে অনেক দিন আগেকার কথা কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারি না আমার সেই প্রিয় বন্ধু—'দোস্ত'কে।

তখন আমি বেশ ছোট। শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যত দিন যায় তত বেশি ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধ। ইয়োরোপের নানা দেশে দেশে গুলি-গোলা-বোমাবর্ষণ তখন নিত্যকার ঘটনা। যুদ্ধ এগিয়ে আসে ইয়োরোপ ছাড়িয়ে আফ্রিকার দিকে। তখনও ভারতবর্ষের মানুষ ভাবতে পারেনি যুদ্ধের জন্য তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে।

'পার্ল হারবার' বন্দর জাপানীরা অকস্মাৎ ধ্বংস করার পরই যুদ্ধ শুরু হয় এশিয়া মহাদেশে। বিদ্যুতগতিতে জাপানীরা এগিয়ে আসে। ইংরেজদের কবল থেকে ছিনিয়ে নেয় দেশের পর দেশ। সিঙ্গাপুর, মালয় চলে গেল জাপানীদের অধীনে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র ওড়ালেন ভারতের তেরাঙ্গা ঝাণ্ডা।

সবার মনেই এক প্রশ্ন ঃ ব্রহ্মদেশের পর কী জাপানীরা ভারত আক্রমণ করবে?

এরই মধ্যে একদিন দিনে-দুপুরে জাপানী বোমারু বিমান কলকাতায় দু'একটা বোমা ফেলে গেল। ক্ষয়-ক্ষতি তেমন কিছু হলো না কিন্তু ভয়ে আঁতকে উঠল ইংরেজ আর ভারতের মানুষ। কলকাতার মানুষ তো ভেবেই নিল, জাপানীরা এলো বলে। আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। পালাও, পালাও, কলকাতা ছেড়ে পালাও। ঘরবাড়ি ছেড়ে বাসন-কোসন আসবাবপত্র বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ মানুষ কলকাতা ছেড়ে আশ্রয় নিল দূরের গ্রামে-গঞ্জে আর জেলা শহরে। বাবা আমাদের নিয়ে এলেন কলকাতা থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরের যশোরে।

আমরা যশোরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ওখানে গড়ে উঠল অগ্রবর্তী মার্কিন বিমান বাহিনীর প্রধান বিমানবন্দর ও কর্মক্ষেত্র। সারাদিন আকাশে বিমানের আনাগোনা। পথেঘাটে বেরুলেই দেখা যায় আমেরিকান, ইংরেজ, অস্ট্রেলিয়ার বৈমানিক, কলাকুশলী ও সৈনিকদের। ওরা এসেছে ব্রহ্মদেশ, মালয় ও সিঙ্গাপুর থেকে জাপানীদের হঠিয়ে দিতে। ওরা সবাই জানে জাপানীদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অনেকেরই প্রাণ দিতে হবে। তাইতো আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা ভুলে থাকার জন্য ওরা সবাই নানারকম শখ আর আনন্দে মেতে থাকে। আমরা স্কুল যাতায়াতের পথে দেখি কেউ প্রাণের আনন্দে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে, কেউ কেউ কুকুর-বিড়াল-বেজি-বাঁদর কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কখনও ওরা দল বেঁধে হেসে-খেলে নেচে-গেয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা মজাও পাই, অবাকও হই।

সেদিন সকালে পড়াশুনা শেষ করার পর স্নান করতে যাব বলে পাশের ছাদে তেল মাখছি। হঠাৎ একটা বাঁদর এসে হাজির। তাকিয়ে দেখি, বেশ কায়দা করে 'চুল' কাটা। বেশ বুঝলাম, কোনো না কোনো সৈন্য মজা করে ওর মাথার লোম এভাবে ছেঁটে দিয়েছে। যাই হোক আমি চট করে ঘর থেকে একটা কলা এনে ওকে খেতে দিই। ও মহানন্দে কলা খেতে খেতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। দু'পাঁচ মিনিট পর আমি আরো একটা কলা এনে ওকে খেতে দিয়ে স্নান করতে যাই।

স্নান করে দেখি, বাঁদরটা আমাদের বারান্দার রেলিং-এর উপর বসে আছে। দু'এক মিনিট ওকে দেখার পর আমি এক মুঠ মুড়ি-মুড়কি বারান্দায় ছড়িয়ে দিই। ও অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে নিচে নেমে এসে এক-একটা মুড়ি-মুড়কি মুখে দেয়।

আমি খেয়েদেয়ে ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে স্কুলে যাবার সময়ও দেখি, ও চুপ করে বসে আছে।

পরের দিন সকালে আবার ঐ বাঁদরটা এসে হাজির। আমি যথারীতি ওকে কলা ও আরো কিছু খেতে দিই। ও খেয়েদেয়ে মহানন্দে লাফাতে লাফাতে চলে যায়।

বাঁদরটা আবার পরের দিন সকালে হাজির। তারপরের দিনও। অন্যান্য দিনের মতো আমিও ওকে কিছু খেতে দিই।

এইভাবে আরো দু'চারদিন কাটার পর আমি হাতে কলা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ও দু'এক মিনিট আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ এক লাফ দিয়ে আমার কাঁধে এসে বসে। এক হাত দিয়ে আমার হাত টেনে ধরে কলাটা তুলে নেয় ও খেতে শুরু করে। আমি অবাক হয়ে গেলেও খুব খুশি হই।

এইভাবেই শুরু হলো আমার 'দোস্ত'-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব।

দোস্ত সকালে আসে, বিকেলে আসে। খায়দায় ঘুরে বেড়ায়।

চলে যায়। কখনও কখনও ও আমার পড়ার টেবিলের পাশেই বসে থাকে আর আমাকে দেখে। তবে বাবাকে দেখলেই ও পালিয়ে যায়। এইভাবে আরো দু'এক সপ্তাহ কেটে গেল।

তারপর একদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি, দোস্ত আমার পাশেই বসে আছে। আমি ওকে কাছে টেনে নিই, আদর করি। দোস্ত আপত্তি করে না। শুধু দু'চোখ ভরে আমাকে দেখে। ও আর আমাকে ছেড়ে বিশেষ কোথাও যায় না। শুধু পড়াশুনা করার সময় না, আমি স্নান করতে গেলে ও বাথরুমের বাইরে বসে থাকে, খাবার সময় সামনে বসে থাকে। ওকে ছোট্ট একটা প্লেটে ভাত দিলে ও খেতে খেতে আমাকে দেখে। আমি স্কুলে যাবার সময় ও আমার কাঁধে চড়ে স্কুল পর্যন্ত যায় কিন্তু অন্য ছেলেরা হৈচৈ করতেই ও লাফাতে লাফাতে উধাও হয়ে যায়। ছুটির পর বাড়ি ফিরতেই দোস্ত এক লাফ দিয়ে আমার কাঁধে চড়ে।

বাড়িতে শুধু বাবা আর আমি থাকি। বাবা খুব ভোরে উঠে স্নান-পূজাআচ্চা সেরে ভাত সেদ্ধ করে কলেজে চলে যান। দুপুরের দিকে একবার খেতে আসেন। তারপর আবার কলেজে যান। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে ঘুরে যায়। প্রথম দিকে দোস্তকে আমার পড়ার টেবিলের কাছে বা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে দেখলেই রাগ করতেন। বলতেন, এই বাঁদরটার জন্যই তোর লেখাপড়া চুলোয় যাবে।

—না, বাবা, ও আমাকে একটুও বিরক্ত করে না। ও চুপচাপ বসে থাকে।

—ওকে নিয়ে এত নাচানাচি করলে পড়াশুনার ক্ষতি হবে না, তাই কখনো হয়? দেখিস তোর হাফ ইয়ারলির রেজাল্ট কি রকম খারাপ হয়।

না, হাফ ইয়ারলির রেজাল্ট খারাপ হলো না; বরং আগের চাইতে আরো ভাল হলো।

বাবাকে বললাম, দেখলে তো, দোস্ত-এর জন্য পড়াশুনোর কোনো ক্ষতি হয়নি।

বাবা মুখে কিছু বললেন না। শুধু একটু হাসলেন।

এরই মধ্যে এক নতুন উৎপাত শুরু হলো। আশেপাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা যখন তখন এসে হাজির আমার ঘরের সামনে। দোস্তকে ডাকাডাকি করে, এটা-ওটা খেতে দেয় বা কখনও কখনও হৈচৈ করে। শুধু দোস্ত না, আমি আর বাবাও অত্যন্ত বিরক্ত হই। ওদের বকাবকি করি। বাবা মাঝে মাঝেই গজগজ করেন, এই বাঁদরটার জন্য তো আচ্ছা ঝামেলা শুরু হলো!

এখন দোস্ত আর আমাদের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না। বাবা সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বসলে ও চুপ করে বাবাকে দেখে। বাবা রান্নাঘরে গেলে দোস্তও যায়। ও চুপ করে দেখে বাবাকে চাল বেছে, ধুয়ে, হাঁড়ি উনুনে বসাতে। তারপর বাবা ভাত না নামানো পর্যন্ত দোস্ত ওখান থেকে নড়ে না। সেদিন কি কারণে যেন বাবা উনুনে ভাত বসিয়ে ঘরে এসে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। হঠাৎ দোস্ত এসে চিঁ চিঁ আওয়াজ করে বাবার পা ধরে টানাটানি শুরু করতেই বাবা ওকে বকুনি দেন। বাবার বকুনি খেয়ে দোস্ত রান্নাঘরের দিকে ছুটে গিয়েই ফিরে এসে আবার বাবার পা ধরে টানাটানি করতেই বাবার খেয়াল হয়, বোধহয় ভাত পুড়ে গেল!

বাবা দৌড়ে রান্নাঘরে যান। না, ভাত পুড়ে যায়নি।

বাবা ঘরে ফিরে এসে হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, তোর এই বাঁদরটার তো দারুণ বুদ্ধি! ও আমার পা ধরে টানাটানি না করলে ঠিক ভাত পুড়ে যেত।

আমি একটু হেসে বলি, হনুমান আর বাঁদররা তো মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়।

—হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

এই ঘটনার পর দোস্ত বাবারও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। এখন বাবাও মাঝে মাঝে ওকে খেতে দেন, একটু-আধটু মাথায় হাত দিয়ে আদর করেন। আমি মহাখুশি।

দেখতে দেখতে দোস্ত আমাদেরই একজন হয়ে যায়। আমি খবরের কাগজ গোল করে পাকিয়ে ওর হাতে দিয়ে পাশের ঘর দেখিয়ে বলি, দোস্ত, যাও, বাবাকে দিয়ে এসো।

ও এক লাফে বাবার সামনে হাজির হয়ে খবরের কাগজটা রেখে দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবা একটু হেসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই দোস্ত খুশি মনে আমার কাছে ফিরে আসে।

পিওন চিঠিপত্র বারান্দায় ফেলে দিয়ে চলে গেলেই ও বাবাকে পৌঁছে দেয়। গয়লা দুধ দিতে এলে দুধের পাত্র টানাটানি করে আমাকে বা বাবাকে জানিয়ে দেয়, দুধ দিতে এসেছে। দোস্ত আরো কত কি করে!

তখন বর্ষা শুরু হয়েছে। আমি স্কুলে গেছি। বাবা দুপুরবেলা বাড়িতে এসে বেরিয়ে যেতে না যেতেই শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। বারান্দায় মেলে দেওয়া কাপড়চোপড় ভিজে যাচ্ছে বলে বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়িতে এসেই দোস্ত-এর কাণ্ড দেখে বাবা অবাক। ও আমার জামা-প্যান্ট ঘরে রেখে দেবার পর বাবার ধুতি টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বাবা স্তম্ভিত হয়ে যান।

রাত্রে বাবা আমাকে বলেন, তোর বাঁদরটার কাণ্ডকারখানা দেখে সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আগে শুনতাম, অনেক জীবজন্তুদেরও মানুষের মতো বুদ্ধি আছে কিন্তু বিশ্বাস হতো না। এখন তোর বাঁদরটাকে দেখে আর তা অবিশ্বাস করতে পারি না।

আমি কোনো কথা বলি না; শুধু একটু হাসি।

বাবা আবার বলেন, ভালবাসলে জীবজন্তরাও যে কত আপন হয়, তা তোর বাঁদরটাকে দেখেই বুঝতে পারছি।

'দোস্ত' আমাদের দু'জনকে যেমন পছন্দ করতো, ঠিক সেইরকমই অপছন্দ করতো অন্যান্য লোকজনকে। আশেপাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা বিরক্ত করতো বলে ও অপরিচিতদের দেখলেই ঘরের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে পড়তো অথবা লাফ দিয়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে ঘুরে বেড়াতো।

আমার মা তো ছিলেন না। তাই বাবাকেই ভাত রাঁধতে হতো। কিছু ভাত আলু সিদ্ধ দিয়ে আর কিছু ভাত দুধ দিয়ে খেতাম দু'জনে। রাত্রে দু'জনেই দুধ-চিঁড়ে খেতাম বলে ঘরে দুধ থাকতো।

বেশ ভাল করে ঢাকা দিয়ে রাখলেও পিছন দিকের একটা বাড়ির বিড়াল এসে সব উল্টেপাল্টে ফেলে দুধ খেয়ে যেতো মাঝে মাঝেই। দোস্ত আসার পর আর সে বিড়াল সে অপকর্ম করতে সাহস করেনি।

এইভাবেই দিন যায়, কেটে যায় মাসের পর মাস, ঘুরে যায় বছর।

সেদিন দুপুরে বাবা বাড়িতে খেতে এসেই দেখেন, ঘরের মধ্যে অসংখ্য ইট-পাটকেল পড়ে আছে। বাবা ভেবেই পান না ঘরের মধ্যে এসব ইট-পাটকেল এলো কোথা থেকে। এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে বাবার নজর পড়ল দোস্ত ঘরের এক কোণে একটা বড় ট্রাঙ্কের পিছনে লুকিয়ে আছে। বাবাকে দেখেও সে বেরিয়ে এলো না।

ঠিক সেই সময় নিচের তলার বীণাদি এসে বাবাকে বললেন, চৌধুরীবাড়ির ছেলেরা আপনাদের বাঁদরটাকে অনেকক্ষণ ধরে ঢিল-ঢিল ছুঁড়ে মারছিল। কতকগুলো ওর গায়েও লাগে। তাই শেষ পর্যন্ত বাঁদরটা রেগে গিয়ে ওদের একটা ছেলেকে কামড়ে-হিঁচড়ে দিয়েছে।

বীণাদি একটু থেমে বলেন, বাঁদরটার কোনো দোষ নেই; তবে ছেলেটারও বেশ রক্ত পড়েছে। চৌধুরীবাবু নিশ্চয়ই আপনাকে কিছু বলবেন।

হ্যাঁ, সন্ধ্যের পরই চৌধুরীবাবু এলেন। ছেলের ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত দেখিয়ে বললেন, দেখুন, দেখুন, আপনাদের বাঁদর কি কাণ্ড করেছে। এটা তো ভদ্দরলোকদের থাকার জায়গা; জন্তু-জানোয়ার রাখার জায়গা তো না।

চৌধুরীবাবুকে আসতে দেখেই নিচের তলার সবাই এসে গেছেন। আশেপাশের আরো কয়েকজন তামাশা দেখতে এসেছেন।

চৌধুরীবাবু না থেমেই বলে যান, আপনাদের বাঁদর যদি আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় যায়, তাহলেই আমি ওকে গুলি করে মারব।

বাবা কিছু বলার আগেই বীণাদি আমাদের দেখিয়ে চৌধুরীবাবুকে বলেন, যখন ঘটনা ঘটে, তখন এঁরা কেউ বাড়িতে ছিলেন না কিন্তু আমরা দেখেছি, আপনার দু'ছেলেই মজা করার জন্য বাঁদরটাকে ইট-পাটকেল মারছিল। আমি অনেকবার আপনার ছেলেদের বারণ করেছি কিন্তু ওরা আমার কথা কানেই তুলল না। শেষ পর্যন্ত বাঁদরটা রেগে গিয়ে...

চৌধুরীবাবু রেগে বললেন, ইট-পাটকেল মারা নিশ্চয়ই ঠিক হয়নি কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা হয়েছে, তা কী খুব ভাল হয়েছে?

উনি আমাদের ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললেন, তবে এবার আমার ছেলেদের কিছু হলে, আমি কি করি, তা দেখে নেবেন।

বীণাদি বললেন, কন্ট্রাক্টরী করে কিছু টাকা হয়েছে বলে চৌধুরীবাবু যে নিজেকে কি মনে করেন, তা ভেবে পাই না।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, বীণা, তুমি ঠিকই বলেছ। ভদ্রলোকের বড্ড মেজাজ।

এই ঘটনার পাঁচ-সাতদিন পর বাবা আমাকে বললেন, তুই তোর বাঁদরটাকে অন্য কাউকে দিয়ে দে।

আমি বাবার কথা শুনে অবাক। বললাম, কাকে দিয়ে দেব? তাছাড়া ও কী আমাদের ছেড়ে যাবে? অন্য কোথাও দিয়ে এলেও ও ঠিক ফিরে আসবে।

—সবই বুঝি কিন্তু এইসব অশান্তিও তো ভাল লাগে না।

দোস্তকে বাবাও খুব ভালবাসেন। তাকে এখান থেকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া যে তাঁরও ভাল লাগবে না, তা আমি বুঝি কিন্তু ভবিষ্যতে বড় ধরনের কিছু যে ঘটবে না, তারও তো ঠিক নেই।

দোস্তকে আমি যেখানে-সেখানে রাখতে পারব না বলেই সহপাঠী বারীনের কথা মনে পড়ল।

আমার মতো বারীনও শৈশবে মাকে হারিয়েছে। বাবা ডাক্তার। কয়েক বছর আগে ওর বড়দার বিয়ে হয়েছে। মাস ছয়েক আগে বড়দা-বড় বৌদির একটা ছেলে হয়েছে। বৌদি সারাদিন সংসারের কাজে ব্যস্ত। বাচ্চাটাকে খেয়াল রাখে হনুমান বীর বাহাদুর।

এই বীর বাহাদুর অনেক বছর ধরে বারীনদের বাড়িতে আছে। এবং এই পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে। আমরা বরাবর দেখেছি, বারীনদের বাড়ির দরজা সব সময় খোলা থাকে। ওরা চার ভাই আর বাবা যখন ইচ্ছে আসছেন, যাচ্ছেন। বাড়ি পাহারা দেয় বীর বাহাদুর। শুধু তাই না। বীর বাহাদুর ওদের কথাবার্তাও বেশ বুঝতে পারতো। ওকে দেখে আমাদের খুব মজা হতো।

পরবর্তী সময় দেখতাম, বড় বৌদি ভিতর দিকে উঠোনে বিছানা করে ছেলেকে শুইয়ে দেবার পর ফিডিং বোতলে দুধ ভরে ছেলের মুখে দিয়ে বীর বাহাদুরকে বলতেন, এই বোতলটা ধরো।

বীর বাহাদুর নিঃশব্দে এগিয়ে এসে বোতল ধরে বসে থাকে। বোতলের দুধ শেষ হয়ে গেলেই ও বোতলটা রান্নাঘরে বড় বৌদির সামনে রেখে আবার বাচ্চার পাশে ফিরে আসে। একটা মাছি বা পোকামাকড়কেও বাচ্চাটার ধারে-কাছে আসতে দেয় না। কোনো কারণে বাচ্চাটা কেঁদে উঠলেই বীর বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে গিয়ে বড় বৌদির আঁচল ধরে টানতে থাকে। বড় বৌদি হাসতে হাসতে বলেন, যাচ্ছি, যাচ্ছি।

সন্ধ্যে হতে না হতেই বীর বাহাদুর চলে যেত বারীনের বাবার ঘরে; অন্য কোনো ঘরে ও রাত কাটাতো না।

শেষ পর্যন্ত অনেক ভাবনা-চিন্তা করে ঠিক করলাম, দোস্তকে বারীনদের বাড়িতেই রাখব। দোস্ত-এর ব্যাপারে সব কথা শুনে বারীনের বাবা আমাকে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে আমাদের এখানেই রেখে যাও। তোমার দোস্ত এলে আমার বীর বাহাদুরও একজন সঙ্গী পাবে।

উনি একটু থেমে বলেন, আমার বাড়ি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। আশেপাশের লোকজন এসে যে ওদের বিরক্ত করবে, তার সম্ভাবনা নেই। আমার বাড়ির ভিতরের আম আর লিচু গাছে লাফালাফি করে ওরা দু'জনে বেশ ভালই থাকবে।

হ্যাঁ, দোস্তকে ওদের বাড়িই পৌঁছে দিলাম।

দু'চারদিনের মধ্যেই দোস্ত-এর সঙ্গে বীর বাহাদুর বেশ ভাব জমিয়ে নিলো। দু'জনে একসঙ্গে খায়-দায়-খেলাধূলা করে। আমি রোজ বিকেলে দোস্তকে দেখতে যাই। আমাকে দেখলেই ও এক লাফে আমার কাঁধে এসে বসে। আমি ওকে একটু আদর করি। ওকে আর বীর বাহাদুরকে কিছু খেতেও দিই।

আমি চলে আসার সময় দোস্ত একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমারও ভাল লাগে না কিন্তু আসতেই হয়।

বাবা অন্যদিন সময় পান না কিন্তু বিশেষ জরুরি কাজে ব্যস্ত না থাকলে প্রত্যেক রবিবার দোস্তকে দেখতে যান।

দোস্তকে দেখে এসেই বাবা আমাকে বলতেন, তোর বাঁদরটার প্রতি এমনই মায়া পড়ে গেছে যে ওকে ছেড়ে আসতে সত্যি বড় কষ্ট হয়।

এইভাবেই দিনগুলো কাটছিল।

দেখতে দেখতে পূজা এলো, গেল; শীতের পর আবার গরম পড়ল। আমাদের গরমের ছুটি শেষ হতে না হতেই শুরু হলো ঝড়-বৃষ্টি।

বারীনদের বাড়ির আমগাছ থেকে টুকটাক আম পড়ে। সেই আম নিয়ে বীর বাহাদুর আর দোস্তের কি আনন্দ! কি লাফালাফি! বড় বৌদি হাসতে হাসতে আমাদের বলেন, আম নিয়ে এরা দু'জনে যেন ফুটবল খেলা শুরু করে দেয়! কি মজাই লাগে ওদের কাণ্ড দেখে।

তারপর?

বেশ মনে আছে সেদিন ছিল রবিবার। দু'দিন মুষলধারে বৃষ্টি হবার পর সেদিন সকালেই প্রথম রোদ্দুর বেরুল। হাত-মুখ ধুয়ে কি যেন একটু খেয়ে আমি পড়তে বসেছি। বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন। হঠাৎ বারীনকে সঙ্গে নিয়ে ওর বাবা এসে হাজির। ওদের দেখে আমরা দু'জনেই অবাক।

বাবা বারীনের বাবার হাত ধরে বলেন, আসুন, দাদা, আসুন। বসুন।

উনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বাবাকে বলেন, না, ভাই, বসব না। একটা দুঃখের খবর জানাতে এসেছি।

বাবা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলেন, দাদা, কী হয়েছে?

—আপনাদের দোস্ত কেউটে সাপের কামড়ে...

আমি আর বাবা প্রায় একসঙ্গেই চিৎকার করে উঠি, সেকি?

—হ্যাঁ, ভাই, আমি বাথরুম থেকে বেরুতেই দেখি, সাপটা পালাচ্ছে, বীর বাহাদুর লাফালাফি করছে আর দোস্ত বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।

জ্যাঠামশাই এক নিশ্বাসেই বলেন, আমি পর পর দুটো ইনজেকশন দিলাম কিন্তু বোধহয় তার আগেই শেষ হয়ে গেছে।

আমার আর বাবার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোয় না।

একটু থেমে জ্যাঠামশাই বলেন, মনে হয় বর্ষার জল গর্তে ঢুকে যাওয়ায় সাপটা বেরিয়ে এসে আমাদের বাগানে চলে এসেছিল। বোধহয় দোস্তের লেজের বাড়ি-টাড়ি খেয়েই সাপটা ওকে কামড়ে দেয়।

আমি আর সহ্য করতে পারি না। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠি।

মা যখন মারা যান, তখন আমি খুবই ছোট। কিছুই বুঝতে পারিনি। দোস্তের মৃত্যুতে আমি প্রথম প্রিয়জন বিয়োগের ব্যথায় চোখের জল ফেললাম।

কেমন লাগল আমার দোস্তের কাহিনী?

(সত্য কাহিনী) **ছবি: দিলীপ দাস**

রূপকথারই গল্প

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

আগডোম—বাগডোম—ঘোড়াডোম কই
কোথায় যেন হারিয়ে গেল পাই না খুঁজে থৈ।

কোথায় গেল রাজারানী সাতমহলা বাড়ি
রূপকথার সে গল্প নিয়ে হাজার দোকানদারি।

সুয়োরানী-দুয়োরানী নীলকুমার আর দুধকুমার
দত্যিদানব ঠেঙিয়ে ফেরা পক্ষীরাজের ধুন্দুমার।

অজগরের ফোঁসফোঁসানি শুনতে আজও পাই যে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীদের স্বপ্নে দেখি তাই যে!

সোঁ-বন্‌বন্‌ তলোয়ারের একটি খোঁচায় কাৎ
জগৎজুড়ে আছে যত রাক্ষসদের জাত।

সন্ধ্যে হলেই বাদলা রাতে চমকে উঠি আজও
ঠাকুমায়ের গল্পগাথায় মেদুর হতো সাঁঝ-ও!!

ভোরের ছবি

চিত্ত পাল

ভোর না হতেই বকের সারি চলল ভেসে চলল ভেসে
গ্রাম ছাড়িয়ে ক্ষেত মাড়িয়ে সবুজপারের নদীর শেষে।
বক চলেছে মেঘ চলেছে আপন বেগে চলছে বায়ু
এমন গ্রামে থাকলে পরে কার হবে না সতেজ আয়ু!

কত দেশের কত রকম পাখির কূজন ভাসছে ভোরে
আকাশ বাতাস প্রকৃতির রূপ হঠাৎ হঠাৎ যাচ্ছে সরে
গাছের পাতাও খেলতে জানে মেলতে জানে তাদের ডানা
ভোর না হতে দাওয়ায় বসে না থাকলে কি যেত জানা!

ভোরের পরশ ভোরের হরষ ভোরের মেঘের ভেসে যাওয়া
এমন ভোরের সাক্ষী হলেই বলতে হবেই যায় না পাওয়া।

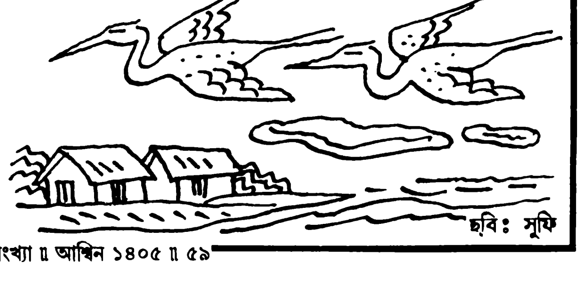

ছবি: সুফি

গল্পের নাম ফিক

শৈলেন ঘোষ

রাজা কাক্কাবোক্কার রাজসভায় একঘর লোকের সামনে ঘটে গেল সেই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা। বলতে গায়ে কাঁটা দেয়।

কী ঘটল? ব্যাপার কী?

আর ব্যাপার কী! ব্যাপার ভীষণ রকমের গুরুতর। রাজা কাক্কাবোক্কা এইমাত্র একঘর লোকের সামনে একটি ডিগবাজি খেলেন।

বলেন কী মশাই!

তবে আর বলছি কী! রাজা না হয়ে ঝড়তি-পড়তি অন্য কারও যদি ডিগবাজি খাওয়ার ইচ্ছে মাথায় চাগাড় দিত, তবে অন্য কথা। তাতে আমাদের কিছু বলার থাকত না। কিন্তু রাজসভায় একঘর লোকের সামনে রাজার ডিগবাজি খাওয়া মানে, সারা রাজ্যে টিটি পড়ে যাওয়া। এখন সেই হ্যাপা কে সামলায় বলো তো! কে বলতে পারে, কোন দেশের কোন রাজা কবে কোথায় ডিগবাজি খেয়েছে! তেমন কোনও সংবাদ কোনও বিদ্বান ব্যক্তির জানা আছে কিনা হলপ করে বলা শক্ত। তবে পৃথিবীর ইতিহাসে রাজা কাক্কাবোক্কাই যদি এই কৃতিত্বের প্রথম দাবিদার হন, তবে মানতেই হবে, এটা একটা মস্ত গৌরবের ব্যাপার।

তা বটে। এই বয়সে ওই রকম একজন ওজনদার রাজার ডিগবাজি খাওয়া কি লাড্ডু খাওয়ার মতো সোজা যে, হাত পাতলুম আর গালে ফেললুম। হ্যাঁ, একটা বাচ্চা ছেলে হলে অন্য কথা। সে তো চোপর দিন ডিগবাজিই খাচ্ছে। কিন্তু রাজার ডিগবাজি সে কি ফেলনা?

আরে মশাই, এ আবার কী?

কেন, আবার কী হলো?

রাজা কাক্কাবোক্কা ডিগবাজি খেয়েই হাসতে শুরু করে দিলেন যে, হো-হো-হো। এও তো এক আশ্চর্য ঘটনা! রাজার মুখে এমন দিলখুশ হাসি কবে মানুষে শেষ দেখেছে, তার সঠিক খবর পেতে হলে, মন্ত্রীমশাই-এর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই। কিন্তু দুঃখের কথা নই, আজ এমন একটা জম-জমাট ঘটনার সাক্ষী হয়েও থাকতে পারলেন না তিনি। মন্ত্রীমশাই কেন যে এখনও রাজসভায় এসে পৌঁছননি সেও এক ভাবনার কথা!

কিন্তু এ কী! রাজা সেই যে হাসতে শুরু করেছেন, আর যে থামেন না। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে হাত-পা ঝেড়ে অমন করে হাসতে দেখলে কারও যদি মনে হয় লোকটা পাগল হয়ে গেছে, তবে তাকে দোষ দিতে পারো না। রাজা বলে কথা। তাঁর কি অমন হুট বলতেই লাগাম ছেড়ে হাসা সাজে? না, মানায়? এখন তাঁর এই হাসি দেখে কেউ যদি ফিক করে হেসে ফেলে, তবে তাকে মোটেই অসভ্য বলা যাবে না। অবিশ্যি রাজার সামনে হাসাহাসি করাটা যে ভয়ংকর অসভ্যতার শামিল, সে আর কে না জানে। সুতরাং রাজা হাসবেন যেমন খুশি। আর সেই হাসি দেখে কারও যদি হাসি পায়, সর্বনাশ, একদম হাসতে পারবে না। মুখ টিপে বসে থাকো! হেসেছ কী গেছ! উঠে পালিয়ে বাইরে গিয়ে যে একটু হেসে আসবে, তারও জো নেই। উঠতে দিচ্ছে কে তোমায়?

ওমা! হাসতে-হাসতে রাজা কাক্কাবোক্কা হঠাৎ থামলেন কেন? তিনি চোখ পাকালেন। মুখ বেঁকালেন। আচমকা হুংকার ছেড়ে ধমকে উঠলেন, "আমি হাসছি আর তোমরা সবাই গোমড়া মুখে বসে আছ? রাজার আনন্দ হলে প্রজাদেরও যে আনন্দ হয়, এ কথাটা কি শিখিয়ে দিতে হবে?"

আর দেখতে হয়, রাজার ধমক খেয়ে একঘর লোক আনন্দে হা-হা-হা করে হেসে উঠল।

কিন্তু রাজা কাক্কাবোক্কা আবার রেগেমেগে চিৎকার করে উঠলেন, "তোমরা তো আচ্ছা! আমি এখন তোমাদের ধমকাচ্ছি আর তোমরা হাসছ? আমার ধমকানি খেয়ে কোথায় তোমরা ভয়

পাবে, না, হ্যা-হ্যা করে দাঁত বার করে হাসছ?”

কোথায় হাসি, আর কোথায় কী! সঙ্গে-সঙ্গে গোটা রাজসভা ভয়ে থরহরি কম্পমান। ফ্যালফ্যাল করে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে রাজার ধমক খেতে লাগল। ধমকাতে-ধমকাতে তিনি বলে উঠলেন, “এখন আমি হাসলে সবাই হাসবে। আমি কাঁদ—না, না, আমি কাঁদতে যাব কোন দুঃখে! আমি গান ধরলে সবাই গান ধরবে। আর আমি ডিগবা—” এইটুকু বলেই রাজা কাক্কাবোক্কা নিজের কোমরটা একটু টিপে মুখটা খিঁচিয়ে উঠলেন। বোঝা গেল, ডিগবাজি খেয়ে রাজার কোমরটি জখম হয়েছে। সুতরাং তিনি এখন নিজের কোমর নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিজেই নিজের কোমর টিপতে লাগলেন। অমনি সভার মধ্যিখান থেকে কে একজন চাপা গলায় বলে উঠল, “টেপ, টেপ, নিজের-নিজের কোমর টেপ। রাজামশাই-এর হুকুম, তিনি যা করবেন সবাইকে তাই করতে হবে।”

কথাটা মুখ থেকে পড়তে-না-পড়তেই সভাসুদ্ধু মানুষ রাজার মতো নিজের-নিজের কোমর টিপতে লাগল। সে কী মজাদার দৃশ্য। এ-দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখা যায় না। দেখা গেলও না। কেননা, সেই দৃশ্য দেখে রাজা কাক্কাবোক্কার নিজেরই এমন হাসি পেয়ে গেল যে, তিনি কোমর ছেড়ে নিজেই হো-হো করে হেসে কুটিপাটি হলেন। আর, তিনি যেই হেসেছেন, একঘর লোকও অমনই হাসতে-হাসতে হো-হো শুরু করে দিল।

তা ধরো অত লোক যদি একসঙ্গে হো-হো করে হেসে রাজসভা কাঁপায়, তবে কালা ছাড়া কার না কানে তালা লাগে! সুতরাং এমন একটা হাসির অট্টরোল মন্ত্রীমশাই-এর কানে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি রাজসভায় ছুটে এসেছেন। এসেই দাবড়ি দিয়ে কড়কে উঠলেন, “চোপরাও! থামাও হাসি। এটা রাজসভা। আস্তাবল নয়।” তিনি এমনই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, সভার মধ্যে যে স্বয়ং রাজা আছেন, হাসির পাণ্ডা যে রাজা নিজে, সেটি তিনি একেবারেই নজর করেননি। কিন্তু অত বড় রাজসভা মন্ত্রীমশায়ের এক ধমকেই ঠাণ্ডা। এমনকী রাজা কাক্কাবোক্কা নিজেও মন্ত্রীমশায়ের মূর্তি দেখে এমন ঘাবড়ে গেলেন যে, তিনিও স্পিকটি নট। কী জানি, ঘাবড়ে গেলেন বলেই বোধহয় তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এবং রাজা কাক্কাবোক্কার দীর্ঘশ্বাস পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সারা রাজসভাতেই দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আর ঠিক তখনই মন্ত্রীমশায়ের চোখ পড়ে গেল রাজা কাক্কাবোক্কার দিকে। পড়তেই, তিনি ভয়ে এতখানি জিব বার করে ফেললেন। সেখান থেকে ঝটপট কেটে পড়ার জন্যে পা বাড়াতেই, রাজা কাক্কাবোক্কা খপাত করে মন্ত্রীমশাইকে ধরে ফেললেন। তারপর ধমকে উঠলেন, “আমাকে ঘোড়া বলে পালানো হচ্ছে?”

মন্ত্রীমশায়ের শিরদাঁড়ার ভেতর কে যেন একচাঁই বরফ চেপে ধরে ঠাণ্ডায় অস্থির করে তুলল। তিনি যে এমন আচমকা রাজার হাতে ধরা পড়বেন, এটা আদপেই ভাবতে পারেননি। কে জানত, রাজা কাক্কাবোক্কা নিজেই একঘর লোকের সঙ্গে হো-হো করে হাসছেন! ভাবা যায়! কে, কবে এমন একটা চোখধাঁধানো ঘটনা দেখেছে! আরে মশাই, যে লোক অষ্টপ্রহর টকি মাছের মতো মুখ ভেঙিয়ে লঙ্কাকাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন, তাঁর মুখে হাসি দেখা মানে, বাদামগাছে কদম ফুলের শোভা দেখা।

হঠাৎ রাজা কাক্কাবোক্কা মন্ত্রীকে ঠেস দিয়ে কড়কে উঠলেন, “আর যে মুখে কথা নেই? নিজে ভেড়া কি না, তাই আমাকে ঘোড়া বলা হচ্ছে!”

মন্ত্রীমশাই খানিকটা অবাক চোখে রাজার দিকে তাকিয়ে খুবই নরম গলায় বললেন, “কই, আমি তো আপনাকে ঘোড়া বলিনি মহারাজ।”

রাজা কাক্কাবোক্কা আবার ধমকে উঠলেন, “আপনি তো আচ্ছা ধূর্ত লোক মশাই! এই বললেন ঘোড়া, আবার এই বলছেন বলিনি!”

এবার মন্ত্রীমশাই খুবই কাকুতি-মিনতি করে বললেন, “আপনাকে ঘোড়া বলা দূরে থাক, আজ্ঞে, আমি ঘোড়ার ‘ঘো’ পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করিনি।”

রাজা কাক্কাবোক্কা এবার ভয়ানক রেগে বলে উঠলেন, “ঘোড়ার ‘ঘো’ উচ্চারণ করেননি তো কী হয়েছে! আরে মশাই, আস্তাবলে ঘোড়ার ‘ঘো’ থাকে না তো কি ভেড়ার ‘ভে’ থাকে?” বলতে-না-বলতেই হঠাৎ দেখা গেল, কাক্কাবোক্কার রাগ-রাগ মুখখানা কেমন হাসি-হাসি হয়ে ‘ফিক’ করে শব্দ করে উঠল। উঠেই মিলিয়ে গেল।

মন্ত্রীমশাই থতমত খেয়ে গেলেন। হঠাৎ রাজা ‘ফিক’ করে উঠলেন কেন? মন্ত্রীমশাই দোনোমনোভাবে রাজার মুখের দিকে তাকালেন।

রাজা কাক্কাবোক্কা মন্ত্রীমশায়ের হাতটা আরও একটু বাগিয়ে ধরে রাজসভার লোকজনদের হুকুম করলেন, “আজকের রাজসভায় আর কোনও কাজ হবে না। আপনারা আজ আসতে পারেন।” বলেই আবার রাজা ‘ফিক’ করে উঠলেন। হ্যাঁ, এবার মন্ত্রীমশাই স্পষ্ট দেখে ফেলেছেন। একটুকরো হাসি রাজার মুখ থেকে টসকে পড়ল। তিনি দেখলেন। দেখতে-দেখতে হাঁদা হয়ে গেলেন।

“অমন হাঁ করে কী দেখছেন?” রাজা কাক্কাবোক্কা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন। জিজ্ঞেস করার সঙ্গে-সঙ্গে মন্ত্রীমশায়ের পেঁচিয়ে ধরা হাতটি ছেড়ে দিলেন।

মন্ত্রী খুব নরম গলায় উত্তর দিলেন, “রোজ যা দেখি না।”

“রোজ যা দেখি না মানে?” রাজা অবাক হলেন।

মন্ত্রী বললেন, “আজ্ঞে, খোলসা করে বলব?”

রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন, “আমি কি আপনাকে খোলসা না করে বলতে বলেছি?”

“আজ্ঞে তাহলে রোজ যা দেখি তা-ই আগে বলি।” মন্ত্রী উত্তর দিলেন।

“রোজ কী দেখেন?”

মন্ত্রী বলতে শুরু করলেন, “আজ্ঞে, আপনাকে দেখি। ওই আপনার মাথা দেখি। আপনার চোখ দেখি। চোখের পাশে নাক দেখি। নাকের নিচে গোঁফ দেখি। গোঁফের ফাঁকে নাকের গর্ত। গর্তের নিচে আবার গোঁফ। আবার গর্ত...আবার গোঁফ...আবার গর্ত...”

রাজা কাক্কাবোক্কা চোখ পাকালেন।

মন্ত্রীমশাই থমকে থামলেন।

কাক্কাবোক্কা ঠেস দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বেশ তো হচ্ছিল, থামলেন কেন?"

মন্ত্রীমশাই উত্তর দিলেন, "আর বলা যায় না বলে।"

রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ হলো, "আপনি কি আমার সঙ্গে রগড় করছেন?"

"ছিঃ, এ কী বলছেন আপনি! আমি কি আপনার সঙ্গে রগড় করতে পারি!" মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন মন্ত্রীমশাই।

রাজা কাক্কাবোক্কা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "একে রগড় বলে না তো কী বলে? গোঁফের ফাঁকে নাকের গর্ত, নাকের গর্তের নিচে আবার গোঁফ, আবার গর্ত...আবার গোঁফ...আমাকে বোকা ঠাউরেছেন? আমার গোঁফের নিচে আপনি আর কিছু দেখছেন না?"

মন্ত্রীমশাই ভয়ে-ভয়ে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ দেখি! কিন্তু যা দেখছি তা রোজ দেখি না!"

রাজা গলা চড়ালেন, "আপনি রোজ আমার গোঁফের নিচে ঠোঁট দেখেন না? মুখের হাঁ দেখেন না? হাঁ-এর পাশে দুটো কান দেখেন না? কানের গর্ত দেখেন না?"

মন্ত্রীমশাই আলতো গলায় সায় দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখি। কিন্তু আজ যা দেখেছি, তা রোজ দেখি না।"

রাজা হতভম্বের মতো হাত তুলে নিজের গোঁফে তা দিতে লাগলেন।

মন্ত্রীমশাই-এর ভীষণ হাসি পেয়ে গেল। হাসি পাওয়া এক জিনিস, আর হেসে ফেলা আর-এক জিনিস। এমন একটা তর্ক-বিতর্কের মাঝখানে হেসে ফেললে মন্ত্রীমশায়ের রক্ষে থাকবে না। তাই তিনি হাসিটা প্রাণপণে সামলে বলে উঠলেন, "আজ্ঞে গোঁফে তা দিচ্ছেন কেন? আমি আপনার গোঁফের ওপরে কিছু দেখার কথা বলছি না। গোঁফের নিচে দেখার কথা বলছি।"

রাজা কাক্কাবোক্কা ঝট করে নিজের গোঁফের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "গোঁফের নিচে আপনি কী দেখছেন?"

"ফিক!" মন্ত্রীমশাই উত্তর দিলেন।

রাজা কাক্কাবোক্কা অবাক হলেন, "ফিক? সে জিনিসটা কী?"

"সে-জিনিসটা এমন, রোজ যে-জিনিসটা আপনার গোঁফের নিচে দেখা যায় না।" মন্ত্রীমশাই উত্তর দিলেন।

রাজা কাক্কাবোক্কা নেহাতই হাঁদার মতো মন্ত্রীমশায়ের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "'ফিক' জিনিসটা কি সবারই গোঁফের নিচে দেখা যায়?"

মন্ত্রী বললেন, "আজ্ঞে সময় হলেই দেখা যায়।"

রাজা কাক্কাবোক্কা বললেন, "আপনারও দেখা যায়?"

"আজ্ঞে যায়।"

"তবে দেখছি না কেন?"

"আজ্ঞে দেখবেন কী করে? আমার 'ফিক' হাওয়া হয়ে গেছে।"

রাজা অবাক হলেন, "হাওয়া হয়ে গেছে?"

মন্ত্রী উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কেন?"

"ভয়ে।"

"কার ভয়ে?"

"আজ্ঞে, আপনার ভয়ে।"

"আমার ভয়ে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। অবিশ্যি আপনি সাহস দিলে আমার 'ফিক'কে ধরে আনতে বেশি সময় লাগবে না।" মন্ত্রীমশাই উত্তর দিলেন।

রাজা কাক্কাবোক্কা বললেন, "ঠিক আছে আমি সাহস দিলে যদি তাকে ধরে আনতে পারেন, তবে, আমি সাহস দিচ্ছি, এক্ষুণি তাকে ধরে আনুন।"

মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "আজ্ঞে গাঁক গাঁক করে চেঁচামেচি করবেন না তো?"

রাজা চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, "আপনার মশাই বুদ্ধিশুদ্ধি কবে হবে? আমি কি গরু, না ষাঁড়? আমি রাজা। আমি চেঁচালে তাকে বলে গর্জন। ঠিক আছে, আমি চুপটি করে দেখব। ধরে আনুন আপনার 'ফিক'কে।"

রাজা কাক্কাবোক্কা সাহস দিতেই মন্ত্রীমশাই উঠেছেন ফিক করে হেসে।

"হাসছেন যে?" রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মন্ত্রীমশাই উত্তর দিলেন, "হাসিই তো! আপনার গোঁফের নিচে, ঠোঁটের ফাঁকে হাসি যেমন ফিক-ফিক করে হেসে উঠছিল, আমিও তেমনই—"

"তার মানে আপনি আমাকে ভেংচি কাটলেন?" এই বুঝি রাজা রেগে টং হলেন!

মন্ত্রীমশাইও ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন।

না, রাজা কাক্কাবোক্কা রাগলেন না। বললেন, "অন্যদিন হলে আমি আপনাকে দেখে নিতুম। ভেংচি কাটা বার করে দিতুম। এমন একখানি লাফ মেরে ঘাড়ে পড়তুম—" বলেই তিনি সত্যি-সত্যিই লাফিয়ে উঠলেন। মন্ত্রীমশায়ের ঘাড়ে অবিশ্যি পড়লেন না। কিন্তু মন্ত্রীমশাই রাজার লাফ দেখে এমন ভয় পেয়ে গেলেন যে তিনি আঁতকে উঠে হাঁক পাড়লেন, "কী করছেন? কী করছেন?"

রাজা বললেন, "তবে?" বলেই তিনি এবার ফিক-ফিক করে নয়, হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মন্ত্রীমশাই কেমন ভ্যাবাচাকা হাম্বার মতো রাজা কাক্কাবোক্কার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রাজা হাসতে-হাসতেই মন্ত্রীমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝছেন?"

মন্ত্রী বললেন, "আজ্ঞে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আপনি আমার কেমন মন্ত্রী?"

"আজ্ঞে যেমন রাজা, তেমন মন্ত্রী।" বলে একটু থেমে মন্ত্রীমশাই রাজা কাক্কাবোক্কাকে বললেন, "আজ্ঞে যদি সাহস দেন, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

"করুন। আজ আপনি যা খুশি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।" রাজা হাসতে-হাসতে উত্তর দিলেন।

মন্ত্রী আমতা-আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ্ঞে, আজ আপনার এত আহ্লাদের কারণ?"

রাজা কাক্কাবোক্কা হাসতে-হাসতেই মন্ত্রীকে ইশারায় কাছে

ডাকলেন। নিজের মুখখানি মন্ত্রীর কানের কাছে এনে ফিসফিস করে বললেন, "কথাটা খুবই গোপন। কাউকে বলবেন না তো?"

"আপনি এ কী বলছেন? রাজার গোপন কথা মন্ত্রী কখনও কাউকে বলে!"

"তবে শুনুন, আজ একটা খুবই আনন্দের কথা শোনা গেল। মহারানী নিজের মুখে আজ আমায় বলেছেন, আমার গায়ের রং মহারানীর চেয়েও ফর্সা।" বলেই রাজা কাক্কাবোক্কা হো-হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন।

রাজার সঙ্গে মন্ত্রীও হেসে উঠলেন, হো-হো-হো!

রাজা আর মন্ত্রীর এমন দোকলা-হাসি বার বার দেখা যায় না। সুতরাং তাঁরা হাসুন। আমরা দেখি। রানীর চেয়ে রাজার গায়ের রং ফর্সা, একথা স্বয়ং রানীই যদি রাজাকে বলেন, তবে কোন রাজার হাসি উপচে পড়ে না শুনি? আর সেই হাসি শুনে, কোন রাজার কোন মন্ত্রী না-হেসে থাকতে পারেন?

হাসতে-হাসতে রাজা কাক্কাবোক্কা মন্ত্রীকে বললেন, "এখন এ কথাটা চাউর না-করাই ভাল, কী বলেন?"

মন্ত্রীমশাইও হাসতে-হাসতে বললেন, "না, না, একদম না, একদম না। এই যে অনেকে বলে, আমার গায়ের রং আপনার চেয়েও উজ্জ্বল, তা সে-কথা কি আমি পাঁচকান করেছি? পাগল!"

ব্যস! একনিমেষে সব গুবলেট। মুহূর্তের মধ্যে রাজা কাক্কাবোক্কার হাসি-মুখ চুপসে আমচুর হয়ে গেল। কোথায় হাসি! রেগে তিনি ফোঁস-ফোঁস করতে লাগলেন! তিনি বুঝি এখনই একটা কিছু কাণ্ড করে বসেন! সেই মূর্তি দেখে মন্ত্রীমশায়ের ধাত ছেড়ে যাওয়ার গোত্তর। আর মন্ত্রীমশায়কেও বলি, আপনি তো মশাই রাজাকে নিয়ে এতদিন ঘর করছেন। কোন কথাটা বললে রাজা চটবেন, আর কোন কথাটা বললে রাজা আহ্লাদে আটখানা হবেন, এ কথাটা এখনও পর্যন্ত আন্দাজ করতে পারেন না? কোন মন্ত্রী রাজাকে বলেন, "আপনার চেয়ে আমার গায়ের রং উজ্জ্বল?" ছিঃ! কথাটি বলে তিনি তো বুঝতেই পেরেছেন আর দেরি নেই, কোপ পড়ল বলে! সুতরাং যে পালায়, সে-ই বাঁচে, এই সোজা কথাটা মাথায় রেখে তিনি বললেন, "আমি তাহলে আসি মহারাজ?" বলেই তিনি পা বাড়ালেন।

রাজা কাক্কাবোক্কা খপাত করে ধরে ফেললেন মন্ত্রীকে। কড়কে উঠলেন, "আসি মানে?"

মন্ত্রীমশাই চুপ করে থাকলে ল্যাঠা চুকে যেত, তা নয় তিনি বলে ফেললেন, "আসি মানে এখন যাচ্ছি, পরে আসছি।"

রাজা কাক্কাবোক্কা তেমনই ধমক দিয়ে বললেন, "যাওয়া-আসাটা কি আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে? যেতে হয় চিরদিনের মতো যান। কিন্তু যাবার আগে প্রমাণ করে যান, আপনার গায়ের রং আমার চেয়ে উজ্জ্বল।"

আরে বাবা বলুন না, ভুল করে বলেছি!

না, মন্ত্রীমশাই তা বলবেন না। তিনি বললেন, "এতে প্রমাণ দেওয়ার কিছু নেই তো মহারাজ। সবাই বলে। নিশ্চয়ই আপনিও জানেন।"

রাজা কাক্কাবোক্কা ভীষণ জোরে ধাঁতিয়ে উঠলেন, "কেরমে কেরমে আপনার সাহস বেড়ে যাচ্ছে! আপনি আমাকে মিথ্যুক বলছেন?"

মন্ত্রী যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "যাঃ বাবা! আপনাকে আবার মিথ্যুক বললুম কখন?"

"এইমাত্তর বলেছেন, আপনার গায়ের রং আমার চেয়ে উজ্জ্বল, এটা সবাই বলে, আমিও জানি। বলতে চান, আমি জেনেও না-জানার ভান করছি। আমি মিথ্যুক!" বলে রাজা গজরাতে লাগলেন।

মন্ত্রীমশাই ভয়ে-ময়ে কুঁকড়ে বলে উঠলেন, "ছিঃ, একথা আমি বলতে পারি আপনাকে? আপনি শুধুমুধু আমার গায়ে পড়ে ঝগড়া করছেন মহারাজ।"

আচ্ছা, মন্ত্রীমশায়েরও কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল! কোন কথার কী মানে, তিনিও কি ভুলে বসলেন! রাজাকে কোন দেশের মন্ত্রী বলেন, গায়ে পড়ে ঝগড়া করছেন!

কিন্তু রাজা কাক্কাবোক্কা সত্যিই যে এবার মন্ত্রীর গায়ের ওপর তেড়েমেড়ে জাপটে পড়বেন, একথা ঘুণাক্ষরেও বোঝা যায়নি। তিনি বেদম রেগেছেন। এই বুঝি তুলোধোনা করে ছাড়েন মন্ত্রীকে! শুরু হয়ে গেল টানামানি। এক্ষুণি কোস্তাকুস্তি লাগল বলে! এই বুঝি রাজা কাক্কাবোক্কা মন্ত্রীকে পটকে ফেলেন মাটিতে। মন্ত্রীমশাইও কম যান না। তিনিও জানেন কেমন করে হ্যাঁচকা মেরে রাজাকে কাবু করতে হয়। তিনি মারলেন হ্যাঁচকা। মেরেই ছুট। রাজাও ছোটেন। মস্ত সেই রাজসভার ঘরে শুরু হয়ে গেল চোর-পুলিশ খেলা। ইনি ধরতে যান তো উনি পালান। উনি ধরতে যান তো তিনি পালান।

শেষে ফাঁক পেয়ে সত্যি-সত্যি মন্ত্রী পালালেন। দে লম্বা।

কাক্কাবোক্কাও ছাড়বার পাত্র নাকি! তিনিও দিলেন তাড়া।

মন্ত্রী ছোটেন, রাজাও ছোটেন। রাজবাড়ির অগুনতি লোক তা-ই দেখে একেবারে থ।

রাজবাড়ির দরদালান দিয়ে ছুটতে-ছুটতে সিঁড়ি টপকে ওপরতলায় পৌঁছে গেলেন মন্ত্রী। পেছনে রাজা। মন্ত্রীও হাঁপান, রাজাও হাঁপান। হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে অলিন্দ পেরিয়ে মন্ত্রীমশাই ঢুকে পড়েন নিজের ঘরে। হুড়োহুড়ির শব্দ শুনে মহারানী ছুটে এসেছেন। রাজা কাক্কাবোক্কা পড়বি তো পড় একেবারে তাঁর মুখের সামনে। রাজা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাঁপাচ্ছেন তিনি।

"কী ব্যাপার?" অবাক হলেন মহারানী, "ছুটছেন কেন?"

এমন করে রানীর সামনে যে তিনি অপ্রস্তুতে পড়ে যাবেন, একথা একেবারেই ভাবতে পারেননি। তাই তিনি কী উত্তরে দেবেন ভেবে না পেয়ে বলে ফেললেন, "আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।"

মন্ত্রীমশাইও কম যান না, তিনি নিজের ঘরের দরজা ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "খিদে আমারও পেয়েছে।"

ফিক করে হেসে ফেললেন রানী। মনে-মনে ভাবলেন, ওঃ, এদের খুনসুটি আর থামবে না কোনওদিন! ভাবতে-ভাবতে তিনি খাবারের তোড়জোড় করতে চললেন। অবিশ্যি সেদিনের ভোজটা কেমন জমেছিল সেটা আমরা জানতে পারিনি।

ছবিঃ দিলীপ দাস

ছাগল ভাগোল-বা...

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার শহরতলীর একধারে ডাঁই হয়ে আছে ময়লার টিপি। ছোট-বড় বুনো গাছের ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে কিছু বড় বড় গাছের গুঁড়ি চোখে পড়ে। তিনটি রোগা-রোগা বেকার গোছের অল্পবয়সী ছেলে খানিকটা দূরের দিকে তাকিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। সেদিক থেকে নামাবলী গায়ে, পিঠে পুঁটুলি ঝুলিয়ে, কাঁধে আড়াআড়ি ভাবে ফেলা একটি পুরুষ্টু পাঁঠা সমেত এক মাঝবয়সী ব্রাহ্মণ পুরুত হনহনিয়ে এগিয়ে আসছেন। তাঁর বাঁ হাত ধরে আছে একটি আট-ন'বছরের ছেলে। বেকার ছেলেরা একটু সরে দাঁড়িয়ে দেখে।

ব্রাহ্মণ—ওরে গণ্শা! চল্ চল্—পা চালিয়ে চল্। বাড়ি গিয়েই পাঁঠাটাকে বলি দেবার ব্যবস্থা করবো। নির্মল দাসের নজর আছে রে! হোক্ না ব্ল্যাকের ব্যবসা—পাঁঠাটা দিয়েছে ভাল। আহা, কতদিন এমনটি খাইনি। কিছু কি খাবার জো আছে রে—গরীবের এক ভগবান ছাড়া কে আছে বল্?

গণ্শা—পাঁঠা দিল তো দাসবাবু—ভগবান দিয়েছে ভাবছো কেন বাবা?

ব্রাহ্মণ—ছি বাবা, ভগবান বলতে হয়। নয়তো ব্রাহ্মণ থাকা যায় না। ছি, ছি, ছি! বামুনের ছেলে হয়ে ভগবানে—যাকে বলে গে—দেবদ্বিজে বিশ্বাস হারাতে নেই বাবা! আয় একটু জিরিয়ে নিই।

(পাঁঠাটা নামাতেই সে ব্যা ব্যা করে ডেকে ওঠে।

বেকার ছেলে তিনটি একধারে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করে নেয়। একজন এগিয়ে আসে। অন্যটা গাছের আড়ালে দাঁড়ায়।)

পান্না—আরে, আরে বামুন ঠাকুর যে—প্রণাম হই!

ব্রাহ্মণ—চিনলাম না। এই, উঠে পড়্ গণ্শা। আমাদের খুব তাড়া—একদম সবুর করতে পারবো না।

(তড়িঘড়ি উঠে পড়েন। এগোতে আরম্ভ করেন।)

পান্না—পরিচয় দিলেই চিনতে পারবেন। আমাদের ঐ কলোনীতে যখন মেয়েদের গায় আর জড়োয়ার গয়না রইল না, তখন আমার নাম মা দিলেন পান্না। দেখাদেখি মেজোমাসির ছেলের নাম হলো চুনি আর মামার ধনুর্ধর পুত্রের নাম রাখা হলো হীরে। তারা সব আশেপাশেই আছে।

ব্রাহ্মণ—থাক বাবা, তারা বেঁচে থাক! আমরা যাই। পথ ছাড়—বেলা একদম গড়িয়ে এলো।

পান্না—তা যান না। নিজের বাড়ি যাবেন, তাতে কে বাধা দেবে? তবে ঠাকুরমশাই, একটা ব্যাপারে বড় অবাক করে দিলেন। একেবারে তাজ্জব—চিন্তা করা যায় না।

ব্রাহ্মণ—অ্যাঁ! কি, কি, কি চিন্তা করা যাচ্ছে না?

পান্না—ঐ যে আপনার কাঁধে—

ব্রাহ্মণ—কাঁধে তো পাঁঠা। মায়ের পেসাদ। উচ্ছুগ্গু করা। বলি দিয়ে বিতরণ হবে। ঐ যে গো—ঐ নির্মল দাস—তার মানত ছিল ইলেক্শানে জিতলে আমায় আস্ত একটা জ্যান্ত পাঁঠা দেবে।

পান্না—পাঁঠা! বলেন কী?

ব্রাহ্মণ—পাঁঠা, পাঁঠা হবে না তো কী হবে? পাঁঠা পাঁঠা বলে অত প্রশ্নের কী আছে?

পান্না—নির্মল দাস পাঁঠা দেবে বলে নির্ঘাৎ আপনাকে ঐ কুকুরটা দিয়েছে। ব্ল্যাক মার্কেটের দালালরা ওরকমই করে। ঠগ্!

ব্রাহ্মণ—অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ— ?

পান্না— ছি ছি ছি! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাঁধে নেড়ি কুকুর? দেখলেও পাপ।

ব্রাহ্মণ—সে কি, সে কি! এসব কথার মানে কি?

গণ্‌শা—(বাবাকে একপাশে টেনে এনে) বাবা শোনো—একদম মিথ্যে—(কানে কানে বলে)

ব্রাহ্মণ—বলছিস? হুঁ, তাই বলি, আমার অমন নধর পাঁঠা, বলে কিনা নেড়ি কুকুর! (নমস্কার করেন) এমন জ্যান্ত পাঁঠা আমার গুষ্টিতে বহুকাল কেউ খায়নি।—হুঁ, বলে কিনা কুকুর! (নমস্কার করেন) বুঝলি গণ্‌শা, সেই কেষ্টনগরের মহারাজা একবার আমার বাপের ঠাকুরদার আমলে দিয়েছিল বটে এমনি পাঁঠা। এসব পাঁঠা আজকাল ক্বচিৎ জন্মায়। সে রামও নেই, আর সে পাঁঠাও নেই। চল্ রে গণ্‌শা, পা চালিয়ে চল্।

পান্না—আশ্চর্য তো! আমি স্বচক্ষে দেখছি কুকুর—

গণ্‌শা—মিথ্যে কথা বলছে বাবা! চলো।

ব্রাহ্মণ—চল্ চল্, পা চালিয়ে চল্। পথঘাট ঠগ্-জোচ্চরে ভরে আছে রে। নয়তো আমার এমন পাঁঠাকে বলে কুকুর? ভগবান, তোমার চাঁদ-সুয্যি এখনও উঠছে?

(গণ্‌শা বাবার হাত ধরে ছুটে বেরিয়ে যায়। পান্না হতাশ ভাবে দাঁড়িয়ে দেখে। গাছের ওধার থেকে হীরে আর চুনি বেরিয়ে আসে।)

চুনি—কি রে! পাখি হাওয়া?

পান্না—দূর্ দূর্! ঐ বামুনটাই আসলে পাঁঠা ছেলেটা বেজায় সেয়ানা—বাপ্‌কে আগলে বেড়াচ্ছে। আমাদেরও চিনেছে ভাল।

হীরে—ব্রাদার! ঐ পাঁঠা ছাড়া আমার চলবে না। বাঙালীর শরীরে প্রোটিন কম পড়লেই তাকে যেন-তেন-প্রকারেণ পাঁঠা খেতেই হবে। আজই গোধূলি লগ্নে ওকে মায়ের পায়ে সঁপে দেব।

চুনি—চল্ চল্ ওদিক দিয়ে রাস্তাটা কাভার করি।

পান্না—আমি কাটছি। ছেলেটার ব্রেনটা একেবারে আধুনিক কম্পিউটার। দেখছে—ব্যস, বুঝে নিচ্ছে।

হীরে—বাঙালীর শরীরে প্রোটিন কম হলেই তার মাথা কম্পিউটার হয়ে যায়।

(পান্না একধার দিয়ে চলে যায়। অন্যদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে গাছের আড়ালে দাঁড়ায় হীরে আর চুনি। উল্টো দিক থেকে ব্রাহ্মণ আর গণ্‌শা ঢুকলেন। হীরে আর চুনি সরে দাঁড়ায়।)

ব্রাহ্মণ—উঃ, আর তো পারিনে। একটু বসি আয়। কেউ কোথাও নেই যখন, তখন ক্ষেতি কি?

(কাঁধ থেকে পাঁঠা নামালেন। পাঁঠা যথারীতি ব্যা ব্যা করে উঠল। ব্যাজার মুখে বসে পড়ল গণ্‌শা।)

গণ্‌শা—খিদে! খিদে পায় না?

ব্রাহ্মণ—পায় বাবা, খুব পায়। আমারও কী কম খিদে পেয়েছে! আর কতটুকুই বা পথ! তবে হ্যাঁ, ওজন আছে পাঁঠাটার। বুড়ো বয়েসে আর পারিনে রে!

(চুনি একটা ললিপপের কাগজ ছাড়াতে ছাড়াতে ঢুকলো। যেন ওদের দেখেইনি এমনভাবে।)

চুনি—আপনারা? দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। এখানে কোন পাড়ায় যাবেন? কাদের বাড়ি?

(ললিপপটা কাগজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গণ্‌শার দিকে তাকায়। কাগজটা তার পায়ের কাছে ফেলে দেয়।)

ব্রাহ্মণ—না বাবা। এখুনি চলে যাব। নবগ্রামে আমাদের বাস। একটু দম্ নিয়েই চলে যাব।

চুনি—এই যে—(গণ্‌শাকে) তুমি বরং এটা খাও। দেখে মনে হচ্ছে খাওয়া-দাওয়া হয়নি, মনটন খারাপ।

গণ্‌শা—(ধাঁ করে ললিপপটা প্রায় কেড়ে নিয়ে) মন খারাপ বললে কেন বল তো? (কড়মড় শব্দ করে খানিকটা ভেঙে খায়)

চুনি—না, না! আসলে বাছুরটাকে দেখে মনে হচ্ছে মারা গেছে।

ব্রাহ্মণ—কী বললে? বাছুর? বলছ কী হে? বাছুর পাব কোথায়? চাকরি করি পার্টটাইম। মুদির দোকানে খাতা লেখার কাজ। পুরুতগিরিটাও চালিয়ে রেখেছি—নয়তো সংসার চলে আজকাল? তা একালে পুরুতগিরি করে আর কতটুকু হয়? দেবদ্বিজে বিশ্বেস আছে—ভক্তি আছে মানুষের? এই তো ধর না কেন—ঐ নির্মল দাসের কথা। ব্যাংকের টাকা তো পুরো অন্য একজন খেয়ে নিত, যদি না আমি ঠিক মন্তরটি ঠিক সময়ে আওড়ে না দিতাম।

চুনি—নির্মল দাসকে তো জেতালেন—কিন্তু—কেমন লাগছে ললিপপ? (গণ্‌শাকে)

গণ্‌শা—ভাল। হঠাৎ দিলে যে বড়?

চুনি—তুমি খিদেতে ছটফট্ করছিলে। তারওপর বাছুরটাও দেখলাম মারা গেছে—!

গণ্‌শা—বাছুর মানে? বাছুর কই? বাবা—

চুনি—ঐ তো তোমার বাবার কোলে—

ব্রাহ্মণ—ওরে গণ্‌শা উঠে পড়। লজেন্সটা ফেলে দে। বলছে বাছুর—আবার মরা বাছুর বলছে।

গণ্‌শা—ছাগলকে কেউ বাছুর বলে? কেন বলছো?

ব্রাহ্মণ—চল্ চল্!

চুনি—বেশ বড়সড় বাছুর। বাঁচলে দুধ দিত। কখন মারা গেল?

গণ্‌শা—(কড়মড়িয়ে ললিপপ শেষ করে) বাবা!

ব্রাহ্মণ—হ্যাঁরে গণ্‌শা, দেখ তো ভাল করে—এটা জীয়ন্ত না মৃত? ভুল করে গরু দিয়ে থাকে যদি! কী বলছিস?

গণ্‌শা—(বাবার কানে কানে) বাবা, এ লোকটাও আগের লোকটার দলের। চল পা চালিয়ে চলে যাই।

ব্রাহ্মণ—এই মিথ্যুক কোথাকার! খবরদার মরা বাছুর বলবে না। পথ ছেড়ে দাঁড়াও তো! এমন শাপ দেব না—! পৈতে ছুঁয়ে সব বলব কিন্তু—!

চুনি—তা বলুন। কিন্তু ওটা যে মরা বাছুর তা আপনার ঐ কালোবাজারী নির্মল দাসও জানে—জেনেশুনে রুগ্ন বাছুর পারবনি বলে ঠেকিয়ে দিয়েছে। এখন যান্, ওর চামড়া

দিয়ে ডুগডুগি বাজান গে।

ব্রাহ্মণ—সে কি অন্যায় কথা! ইলেকশান হতে না হতে পাঁঠাকে বাছুর বানাচ্ছ? এবার মানুষকে বাঁদর বানাবে রে—যত ধোঁকাবাজি! চল্ রে গণ্শা! গরীব বাঙালী—দিন আনি দিন খাই।

গণ্শা—চল! ছুটে চল।

(ওরা ছুটে বেরিয়ে যায়। চুনি জিভে আক্ষেপের আওয়াজ তুলে শিস দেয়। হীরে আর পান্না উপস্থিত হয়।)

হীরে—কি গো চুনিবাবু—তুমিও ভো-কাট্টা!

চুনি—(হাততালি দিয়ে নেচে নেচে)—

"চোপ্ বাঙালী কুছ্ কাঙালী
নদেয় আমার বাড়ি
বড়বাজারের পেয়াদাগুলো
গুলে খেতে পারি।"

পান্না—তোদের বলেছিলাম না—ছেলেটা লার্জ-সাইজ-বিচ্ছু। মাথার ঘিলু ক্লিক্ ক্লিক্ করে কাজ করে।

হীরে—ওটাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে বাবার চোখের আড়ালে আনতে হবে। নয়তো ঐ জ্যান্ত কম্পিউটারটি আমাদেরই ঘোল খাওয়াবে।

চুনি—তাজ্জব! পরের জেনারেশান কী ভয়ানক সেয়ানা হয়ে যাবে ভাব! আমার কত কষ্টের নগদ পয়সায় কেনা ললিপপটা গব্‌গবিয়ে খেয়ে, বাবাকে পাঁঠা সমেত উধাও করে দিল।—এমন নধর পাঁঠা! কপালে বিশ্বাস এসে যাচ্ছে। ওরে পান্না!

পান্না—ওরে চুনি! নামই বাঙালীর ঐশ্বর্য! চলে আয় হীরে—এবার তোর পালা। কালোবাজারের তুক করা পাঁঠা—স্মাগল্ করে না নিতে পারলে হবে না।

(তিনজনে এক কোণে গুজগুজ করে কথা বলে। তারপর ছড়িয়ে পড়ে হাসতে থাকে।)

চুনি—এ একেবারে অব্যর্থ!

পান্না—না পেয়ে উপায় নেই। পাবই!

"পাবই আমি পাব।
লক্ষ্মীরে হারাবো যদি
অলক্ষ্মীরে পাব!"

হীরে—চুপ চুপ! এই দিকে আসছে। শোন চুনি। তোর ভাইটাকে ডাংগুলি দিয়ে এখুনি পাঠিয়ে দে। ছেলেটা যেভাবে সারাক্ষণ ওর বাপের বিবেক হয়ে রয়েছে তাতে ওকেই 'এনিমি নাম্বার ওয়ান' বলে ধরে নিতে হবে।

চুনি—হীরে, তোর হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ। ভাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পিকু, ওরে পিকু!

পান্না—শেষদানে জিতিয়ে দিও মা—বাঙালীকে নিরামিষাশী করে দিও না মা—মা কালী!

হীরে—সব 'আউট অফ্ সাইট' হও। কথা কম, অ্যাক্‌শান বেশি!

(পাঁঠা কাঁধে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্রাহ্মণ গণ্শার হাতখানি ধরে ঢুকলেন। পা টেনে টেনে হাঁটছেন।)

ব্রাহ্মণ—একটু থামতে হবে বাপধন। দম্ একদম নিকলে গেছে।

গণ্শা—ওটাকে গলায় দড়ি বেঁধে হাঁটিয়ে নিলেই তো হয়। উঃ, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।

ব্রাহ্মণ—জল তো ঘটিতে যা ছিল সব শেষ। পাঁঠাটাকে একটু দেবার ইচ্ছে ছিল। হাজার হোক ভগবানের জীব! তা বলে ওকে হাঁটিয়ে নিতে পারবো না বাবা! ফট্ করে দড়ি ছিঁড়ে পালালে? তাছাড়া চারিদিকে কত শত্তুর দেখছিস্ তো! একটা পাঁঠা অথচ তার ওপর হাজার লোকের নজর! বাঙালী জাতটা একেবারে জাহান্নামে গেছে—সারাক্ষণ খাই খাই!

হীরে—আরে চিনতেই পারিনি। আশ্চর্য! জ্যাঠামশাই না?

(পায় হাত দিয়ে প্রণাম করে)

ব্রাহ্মণ—কে বাবা তুমি—চিনতে পারলাম না তো?

হীরে—(মাটিতে বসে পড়ে) চিনতে পারলেন না? হরিমোহন চক্রবর্তীকে মনে নেই? আমার বাবা।

ব্রাহ্মণ—ও তাই বলি মুখখানি কেন চেনা চেনা লাগছে।

হীরে—লোকে বলে বাবার মতো মুখ পেয়েছি। আপনার ছেলেটি বড় সুন্দর তো। আপনার মুখ কেটে বসানো।

ব্রাহ্মণ—হেঁ হেঁ হেঁ! লোকেও তাই বলে বটে! গণেশ আমার ষষ্ঠ পুত্র। মেয়ে অবিশ্যি দু'টি।

হীরে—বাঃ! আপনি একেবারে শিবঠাকুরের মতো। তা জ্যাঠামশাই! চলুন আমাদের ওখানে দু'টি ডালভাত খেয়ে নেবেন।

ব্রাহ্মণ—না বাবা, আজ দাঁড়াবার উপায় নেই। বড় তাড়া। তা তোমাদের ফ্যামিলির সব ভালো তো?

হীরে—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে বাবা গত হয়েছেন।

ব্রাহ্মণ—অ্যাঁ! সেকি! বড় দুঃখু পেলাম—এমন মানুষ!

হীরে—মা-ও চলে গেছেন। আপনার মনে আছে তো—আমাদের সেই বিশাল সম্পত্তি?

ব্রাহ্মণ—আছে বৈকি বাবা।

হীরে—কিছুই নেই। কেবল আমার নামটা রয়ে গেছে—হীরে! নিজের নাম শুনলে এখন হাসি পায়।

ব্রাহ্মণ—আ-হা-হা-হা!

হীরে—থাকার মধ্যে আমি আছি আর একটি গাধা আছে।

ব্রাহ্মণ—গাধা? গাধা এলো কী করে?

হীরে—হ্যাঁ গাধা—

গণ্শা—বাবা, গাধা বলছে কিন্তু—

(লাফাতে লাফাতে ডাংগুলি হাতে পিকু ঢুকলো।)

হীরে—কি রে পিকু—কী চাই?

পিকু—হীরেদাদা, ডাংগুলি খেলবে?

হীরে—দূর্ দূর্! এই বয়েসে ডাংগুলি? ঐ খোকাকে বরং নিয়ে যা।

ব্রাহ্মণ—না, না, বাবা—ওসব ও খেলতে জানে না। তাছাড়া তাড়া আছে। বরং জল নিয়ে আয় এক ঘটি—খেয়ে বাঁচি!

(পিকু ছুটে গিয়ে একটা ঘটি করে জল নিয়ে এসে ঢেলে দিল ব্রাহ্মণের ঘটিতে। অঞ্জলিভরে জল খাওয়াল ছাগলটাকে।

গণ্শা এবং ব্রাহ্মণ ঘটি থেকে আলগোছা জল খেলেন।)

পিকু—এবার একটু খেলি? এই তো সামনেই খেলব—ঐ যে, ঐ মাঠে।

গণ্শা—একটু খেলি না বাবা!

ব্রাহ্মণ—আচ্ছা যাও কিন্তু নজরের বাইরে নয়।

গণ্শা—আচ্ছা।

পিকু—এই নে মোয়া।

(গণেশ মোয়া খেতে খেতে পিকুর সঙ্গে বেরিয়ে যায়।)

ব্রাহ্মণ—তোমার তাহলে আর কেউ নেই বাবা? ভ্রাতা, ভগিনী—

হীরে—না, তাহলে আর বলছি কি? শেষটায় তো ছিলাম আমি আর ঐ গাধা।

ব্রাহ্মণ—গাধা?

হীরে—বাবা যে শেষটায় লন্ড্রির ব্যবসা ধরেন।

ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে রজকের ব্যবসা নিলেন?

হীরে—হ্যাঁ। জ্যোতিষীর কথা না মেনে বাবা গাধা পুষলেন। জ্যোতিষী বলেছিলেন, বামুনের ছেলে গাধা পুষলে তার সর্বনাশ হয়। কিন্তু বাবা শুনলেন না। তাই বলছিলাম কি, জ্যাঠামশাই আপনিও—

ব্রাহ্মণ—আমিও কি? কি?

হীরে—আপনার কোলের ওপর ঐ গাধার বাচ্চাটাকে দেখে তখন থেকে ভাবছি—

ব্রাহ্মণ—গাধা হবে কেন বাবা? ওটা তো পাঁঠা। দেখো না, দেখো না—কী নধর পাঁঠা! পাব্বনি পেয়েছি নির্মল দাসের কাছে।

হীরে—পাঁঠা? নির্মল দাস আপনাকে পাঁঠা দিচ্ছি বলেছে? আপনি কালোবাজারীদের কথা বিশ্বাস করেন? আপনার ধর্মভয় নেই? গাধার বাচ্চাকে আপনি পাঁঠা বলে বয়ে বেড়াচ্ছেন? গাধার মাংস তেতো তা জানেন কী?

(পাঁঠাটা 'ব্যা' 'ব্যা' করে ডেকে উঠতেই ভীষণ উঁচু গলায় হীরে গাধার চিহাঁ চিহাঁ ডাক ডাকতে লাগল।)

ব্রাহ্মণ—একি সর্বনাশ! গ-ণ্-শা-রে—

হীরে—হিঁ-হাঁ-হাঁ। হিঁ-হিঁ হাঁ-হাঁ-হাঁ!

ব্রাহ্মণ—এ যে সত্যিই গাধা—আ—আ—

হীরে—আজ্ঞে না। ও এখনও পুরো গাধা হয়নি। গাধার বাচ্চা—নয়তো লাথি মারতো।

ব্রাহ্মণ—হতভাগা গাধার বাচ্চা, তুমি নধর পাঁঠা সেজেছো? আমার মন্দ কপাল! নয়তো হঠাৎ পুরুষ্টু পাঁঠাই বা গাধার বাচ্চা হয়ে যাবে কেন? আমার গিন্নী কত খুশি হতো! বেটা কালোবাজারী নির্মল দাস, পুরুতকেও ঠকালে? তোমার ভাল হবে না শয়তান!

হীরে—আজ্ঞে, ঠকানোই ওদের ব্যবসা। হিঁ হাঁ হিঁ হাঁ!

ব্রাহ্মণ—তুমি বাবা, হঠাৎ হঠাৎ ডেকে উঠছো কেন?

হীরে—ওর থেকেই তো সব ধরা পড়লো। বাবা গাধা পুষে যে ভুল করেছিলেন তার প্রায়শ্চিত্তির করছি আমি। বিশেষ করে গান গাইতে গেলেই—

ব্রাহ্মণ—চলে যা শয়তান গাধা—তোর মুখ দেখাও পাপ!

(দড়ি খুলে দেওয়ামাত্র সবেগে পাঁঠা বেরিয়ে গেল খোলা মাঠের দিকে। সেখান থেকে ঝোপ্‌ঝাড় পেরিয়ে সে নিরুদ্দেশ হলো। সকলে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো।)

হীরে—ঐ গেল গেল গেল—

চুনি—সত্যিকারের পালালো যে—

পান্না—কোন দিকে গেল?

গণ্শা—ঐ-ঐ-ঐ—!

পিকু—ছোট্ ছোট্ ওর পিছু পিছু—

ব্রাহ্মণ—চলে যা! চলে যা! চলে যা গাধা কোথাকার!

(ভীষণ হৈচৈ। ছুটোছুটি হুটোপুটি। হঠাৎ বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে সবাই এক জায়গায় এসে থেমে গেল।)

পান্না—উঃ! একটা পাঁঠার বাচ্চা—কিন্তু কী ফাইটটা দিলে বল্!

চুনি—জীবন বলে কথা! আর সত্যি বলতে কী মুসুর ডাল দিয়ে আলুভাতে ভাত! ভাবা যায়?

হীরে—পাঁঠাটা যেভাবে আমাদের গাধা বানিয়ে রেখে গেল, তাতে কিন্তু আমাদের সকলেরই একটা দিব্যজ্ঞান হলো। আমি তো নিরামিষাশী হয়ে গেলাম চিরদিনের মতো। মা কালীর দিব্যি রইল।

গণ্শা—পাঁঠাটাকে গাধা তো তুমিই বানালে!

ব্রাহ্মণ—ওরকম করে বলে না বাবা! ভগবানের জীব—যেমন রূপে আসে, মেনে নিতে হয়। চল্ চল্ গণ্শা, তোর মা বাটিচচ্চড়ি রেঁধে রেখেছে। পা চালিয়ে চল্। ও কালোবাজারীর জিনিস—মা কী আর মনে-প্রাণে নিতেন! আপদ গেছে।

গণ্শা—কিন্তু বাবা—!

ব্রাহ্মণ—চল্ চল্!

(দূর থেকে একটা ব্যা ব্যা ডাক হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ব্রাহ্মণ আর গণ্শা বেরিয়ে যেতেই পিকু ডাংগুলি খেলতে লাগল।)

পিকু—(ডাংগুলি নাচাতে নাচাতে) হীরেদা, চুনিদা, পান্নাদা—তাল দাও—খেলার সঙ্গে নাচো তো!—"কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ/দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—/সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে/তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ—!"

(পিকু ডাংগুলি খেলে ম্যাজিশিয়ানের ঢঙে। অন্যরা হাততালি দিয়ে গান গায়।)

যবনিকা

* পঞ্চতন্ত্রের গল্পের ছায়া অবলম্বনে

ছবি : দিলীপ দাস

স্বামীজীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঘা যতীন

প্রণবেশ চক্রবর্তী

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজয়, বিস্ময়কর জীবন ও অগ্নিগর্ভ বাণী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামগ্রিকভাবে যেমন বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল, তেমনি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনেও। অহিংস আন্দোলন বা সশস্ত্র আন্দোলন—স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দুই সুকঠিন পথে যাঁরা ছিলেন দুর্জয় যাত্রী, তাঁদের সকলেই কোনো না কোনোও ভাবে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণ-জাগানিয়া, মরণজয়ী মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

আমরা স্বাধীনতা সংগামের ইতিহাসে দেখেছি, বাংলার বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ জন্মঃ ১৮৭৯, জীবনদানঃ ১৯১৫) আলোকদীপ্ত মহাজীবনের সাধনা ও সিদ্ধিতে বিভিন্ন সময়ে ভোলানন্দ গিরি, সত্যানন্দ পুরী প্রমুখ ধর্মনায়কদের প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী ভারতের নবজাগরণ, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ত্যাগ ও সেবাব্রত পালনের ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই অবিনাশী প্রভাবে আলোকিত ও প্রজ্বলিত হয়েছিল বাঘা যতীনের জীবনও।

একজন বিখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন হরিকুমার চক্রবর্তী। তিনি লিখেছেন, স্বামীজীর ভক্ত ছিল না কে?...যতীন মুখার্জির কথাই ধরা যাক। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিপ্লব আন্দোলন যতীনদার সৃষ্টি।...একবার নরেনের সঙ্গে (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—পরে ছদ্মনাম মানবেন্দ্রনাথ রায়) আমার তুমুল তর্ক ও ঝগড়া। আমি স্বামীজীর অদ্বৈত বেদান্তকে গ্রহণ করেছি, মূর্তিপূজা আর ভগবানে বিশ্বাস করি না...নরেনের মূর্তি ও ভগবান, দুয়েই বিশ্বাস। আমি বললাম, স্বামীজীর মত—ভগবান নেই। নরেন্দ্রনাথ (ভট্টাচার্য) বলল, স্বামীজীর মত—ভগবান আছেন। যতীনদা (বাঘা যতীন) স্বামীজীর মত নিয়ে আমাদের ঝগড়ার কথা শুনলেন।

তারপর যতীন্দ্রনাথই হরিকুমার চক্রবর্তী ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে নিয়ে গেলেন ভোলানন্দ গিরির কাছে এই তর্কের মীমাংসা করতে। সেদিন ভোলানন্দ গিরি তর্কের মীমাংসা করে বলে দিলেন, ভগবান আছেন, আবার ভগবান নেই। যার যেমন ভাব। সেখান থেকে ফেরার পথে যতীন্দ্রনাথ বললেন, আরে স্বামীজীর (বিবেকানন্দের) কথা নিয়ে ঝগড়া করতে আছে? তিনি কত বড় ছিলেন, তার ধারণা কে করবে? তাঁর (স্বামীজীর) কথা যদি ভারত শোনে তাহলে ভারতের মহিমার কি সীমা থাকবে?

বাঘা যতীনের মহান জীবন নিয়ে একটি বই লিখেছেন পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার* বিদেশ থেকে ফেরার পরে স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দের (শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য ও স্বামীজীর গুরুভাই) চেষ্টায় স্বামীজীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়—বরানগরে স্বামীজীর এক শিষ্যের বাড়িতে। পৃথ্বীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ অখণ্ডানন্দের ভাষাতেই বলি, যতীন্দ্রনাথের তখন বয়স অল্প, ১৮-১৯ হবে। আমার সঙ্গে খুবই বন্ধুত্ব। নরেন্দ্রনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) তার কথা মাঝে মাঝে বলতাম।...তিনি (স্বামীজী) একদিন যতীনকে দেখতে চাইলেন।...আমি নরেনের (স্বামীজীর) সঙ্গে যতীনের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি।...সে সময় বাংলা সরকার স্বামীজীকে ভালো চোখে দেখত না। আমি যতীনকে নিয়ে এলাম।...স্বামীজী একটা চৌকিতে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। যতীন ঘরে ঢুকতেই স্বামীজী তাকিয়ে রইলেন যতীনের দুই চোখের

দিকে। সেদিন সেই সময় মনে হলো যেন, আগুন আগুনকে গিলে খাচ্ছে। আমাকে (অখণ্ডানন্দকে) স্বামীজী ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন।...প্রায় ঘণ্টাখানেক কী যে তাঁদের কথা হলো—স্বামীজী দরজা খুলে তাকে বাইরে নিয়ে এলেন। যতীনের কাঁধের উপর বাঁ হাতটা রেখে স্বামীজী বললেন, মাঝে মাঝে দেখা করে যেন আত্মীয়তা বজায় রেখ। কথাটা বলেই হেসে ঠাট্টা করলেন, জানই তো মানুষের কুটুম আসতে যেতে। যতীন তারপর প্রায়ই আসত। কিন্তু কি যে তাঁদের কথা হতো, জানতে পারিনি।

এ তো গেল স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের সাক্ষ্য—যা থেকে আমরা জানতে পারলাম বাঘা যতীনের সঙ্গে স্বামীজীর গভীর সম্পর্কের কথা। যতীন্দ্রনাথের জীবনীকার পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ-ব্যাপারে আরও অনেক তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ১৮৯৯ সালে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন কলেজের ছাত্র। সেই সময় তিনি স্বামীজীর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার নেতৃত্বে কলকাতার প্লেগ রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার এক পত্রে লিখেছিলেন, দাদা (যতীন্দ্রনাথ) স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, পি. মিত্র (অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা), সতীশ মুখার্জি, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব)—ইঁহাদের সহিত নিয়মিত সম্পর্ক রাখিতেন।

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীরই আরেক বিদেশিনী শিষ্যা মিস ম্যাকলাউডকে লেখা এক পত্রে বলেছেন, এক তরুণ আমার কাছে এসেছে, যার ধ্যান-জ্ঞান হলো—কি ভাবে নবীন ভারতকে স্বামীজীর নামে সংঘবদ্ধ ও সংগ্রামমুখী করা যায়। স্বামীজীর নামে সে পাগল। সে শক্তিশালী পুরুষ, আত্মনির্ভর এবং ব্রাহ্মণ। এই "ব্রাহ্মণ" যে যতীন্দ্রনাথ—সে বিষয়ে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

১৯১৫ সালের শেষ ভাগ।

দেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রতীক মহাবিপ্লবী বাঘা যতীন আত্মগোপন করে ট্রেনপথে যাত্রা করেছেন ওড়িশার সেই ঐতিহাসিক বালেশ্বরের পথে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর কানে সদাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে স্বামীজীর অমোঘ বাণীঃ পরাধীন জাতির কোনো ধর্ম নেই—একমাত্র ধর্ম হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জন।

বাঘা যতীন যে ট্রেনে যাচ্ছিলেন, সেই একই ট্রেনে জননী সারদামণি যাচ্ছিলেন জয়রামবাটি। সেই সময় কলকাতা থেকে ট্রেনে করে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে গরুর গাড়িতে মা জয়রামবাটি যেতেন।

বাঘা যতীন যাচ্ছিলেন আত্মগোপন করে। কারণ ইংরেজের পুলিশ তখন হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় তাঁর পরিচয় জানাজানি হয়ে গেলে দারুণ বিপদ ঘটতে পারে। তবুও তিনি যখন শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের জননী সারদামণি ওই ট্রেনেই যাচ্ছেন, তখন তিনি একবার মা-র সঙ্গে দেখা করার জন্য ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পা বাড়ালেন।

তাঁর সঙ্গী ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও

'বিবেকানন্দ চরিত' গ্রন্থের লেখক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। বাঘা যতীন সত্যেন্দ্রনাথকে বললেন, মা-কে প্রণাম করে যাব। জীবনের সব থেকে বড় সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন তিনি—তাই মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যেতে চান। মা যখন শুনলেন বাঘা যতীনের কথা, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেন, ওকে এখানেই আসতে বল।

মা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা ছোট কামরায় বসে ছিলেন। বাঘা যতীন সেখানে গিয়ে মা-কে প্রণাম করতেই মা তাঁকে হাত ধরে পাশে বসালেন। মা ঘোমটা দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তিনি সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই ঘোমটা সরিয়ে বাঘা যতীনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। সেখানে তখন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বাইরে চলে এলেন। একটু পরেই যতীন্দ্রনাথ সেই কামরা থেকে নেমে এলেন—তাঁর দু'চোখে তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মাকে জিগ্যেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কথা হলো মা? উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে মা বললেন, দেখলাম আগুন। সেই আগুনই প্রচণ্ড শক্তিতে জ্বলে উঠেছিল বুড়িবালামের তীরে।

১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর।

তখনও রাতের অন্ধকার দূর হয়ে দেখা দেয়নি ঊষালগ্নের রক্তিম ছটা। শেষ রাতের ঘুমে অচেতন ওড়িশার গ্রামগুলি, ঘুমে আচ্ছন্ন বাংলার জনপদ। ঘুমিয়ে আছে বাঘা যতীনের কর্মক্ষেত্র ঝিনাইদা এবং সেই ঝিনাইদাতে ঘুমিয়ে আছেন যতীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী ইন্দুবালা দেবী। আর পরম প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে আছে মুক্তি-সংগ্রামের মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের তিনটি নাবালক শিশুসন্তান—আশালতা, তেজেন্দ্রনাথ এবং বীরেন্দ্রনাথ।

আর তখন ওড়িশার বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর তীরে জেগে আছেন বাংলার দুর্জয় প্রাণের পঞ্চপ্রদীপ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, জ্যোতিষ পাল, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। সেদিন ছিল মেঘলা আকাশ। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। একদিকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবি সাহেবের নেতৃত্বে সশস্ত্র এক বিশাল সেনাবাহিনী, সঙ্গে আছে রাদারফোর্ড সাহেবের নেতৃত্বে সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনী ও অন্যদিকে মাউজার পিস্তল হাতে এই বাংলার পাঁচটি দুর্জয় প্রাণ, যতীন্দ্রনাথ তাঁদের নেতা। বিশাল ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে এই অসম যুদ্ধে তাঁরা গিয়ে আশ্রয় নিলেন একটি টিলায় উইঢিপি-ঘেরা প্রাকৃতিক ট্রেঞ্চে। ওদিকে ইংরেজ বাহিনী এগিয়ে আসছে, এদিকে নেতা যতীন্দ্রনাথের সঙ্কেতের অপেক্ষায় তাঁরই প্রিয় চারজন প্রাণপ্রিয় শিষ্য। সব্যসাচী যতীন্দ্রনাথ—দুই হাতেই নিপুণভাবে গুলি চালাতে পারেন তিনি। অব্যর্থ লক্ষ্য তাঁর। সামনে দেশি সৈন্যদের রেখে ইংরেজ বাহিনী ততক্ষণে অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। টিলা থেকে তাদের দূরত্ব মাত্র আড়াইশো গজ। হঠাৎ টিলার রক প্রকম্পিত করে শোনা গেল পুরুষ ব্যাঘ্রের গর্জনঃ 'ফায়ার'! বাঘা যতীন এবার বাঘের মতোই গর্জে উঠলেন।

এতক্ষণ কিলবি সাহেবের বাহিনী এবং রাদারফোর্ডের বাহিনী বীরদর্পে এগিয়ে আসছিল টিলার দিকে। বাঘা যতীনের বজ্রকণ্ঠ শোনার সঙ্গে সঙ্গে টিলা থেকে ছুটে এল একঝাঁক গুলি। বৃষ্টিতে কাদা কাদা ধানক্ষেতে লুটিয়ে পড়ল ইংরেজ বাহিনীর কয়েকটি প্রাণহীন দেহ।

রাদারফোর্ড এবং কিলবি সাহেবের হতচকিত বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটতে শুরু করল। তারপরই তারা নিজেদের একটু সামলে নিয়ে শুরু করল পাল্টা আক্রমণ। পাঁচজনের লড়াই শুরু হলো পাঁচশো জনের বিরুদ্ধে। দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে যেতে থাকে, কিন্তু সেদিন বুড়িবালাম নদীর তীরে অসম যুদ্ধের যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল, তা বিশ্ব ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। বিশাল দুটি বাহিনীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতিহত ও পর্যুদস্ত করে রেখেছিলেন তাঁরা পাঁচজন। তাঁদের বীরত্ব ও রণনিপুণতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন কিলবি সাহেবও। বাঘা যতীন সম্পর্কে পরে তিনি বলেছিলেনঃ কোনো স্বাধীন দেশের নাগরিক যতীন্দ্রনাথ যদি জন্ম নিতেন, অদ্বিতীয় রণদক্ষতার জন্য, নিপুণ নেতৃত্বের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে। কিলবি সাহেব আজ বেঁচে থাকলে দেখে যেতে পারতেন, পরাধীন দেশের মাটিতে জন্মেও যতীন্দ্রনাথ আজ মৃত্যুঞ্জয়ী। তিনি শুধু চিরস্মরণীয় নন, তিনি হয়ে উঠেছেন প্রাতঃস্মরণীয়।

মুক্তিপাগল ঐ পাঁচজনকে কিলবি এবং রাদারফোর্ড সারাদিনেও কাবু করতে পারেননি। দেখতে দেখতে বিকাল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যা হয় হয়, পশ্চিম আকাশে যখন ছড়িয়ে পড়ল সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি, বুড়িবালামের মাটিতে তখন গড়িয়ে পড়ল পবিত্র রক্তের উষ্ণ ধারা। ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে নিহত হলেন বীর চিত্তপ্রিয়। শেষ বিদায়ের আগে একবার শুধু বাঘা যতীনকে ডাক দিলেন 'দাদা' বলে। তারপর দাদার কোলে মাথা রেখে যাত্রা করলেন অনন্তলোকে। যতীন্দ্রনাথও তখন আহত। তাঁরও তলপেটে গুলি লেগেছে। তবু তিনি অটল; তবু তিনি প্রদীপ্ত, তবুও তিনি দুর্জয়।

এবার ওঁরা চারজন। চলল অনির্বাণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অবিরাম চলল মরণযুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত গুলিতে গুলিতে রক্তাপ্লুত হয়ে গেলেন নীরেন, মনোরঞ্জন এবং জ্যোতিষ। গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় এই ঐতিহাসিক অসম যুদ্ধ শেষ হলো সন্ধ্যার পরেই।

আহত যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া হলো বালেশ্বর সরকারি হাসপাতালে। পরদিন ছুটে এলেন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূরা—চার্লস টেগার্ট, ধূর্ত কিলবি, বার্ড ডেনহ্যাম, রাদারফোর্ড, মেজর ফ্লিথ প্রমুখ। বাংলার দুর্জয় বাঘকে শেষবারের মতো দেখতে এলেন তাঁরা। ১৯১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ।

বীরের এই রক্তস্রোত সেদিন সহস্র প্রাণের গভীরে জাগিয়ে দিয়েছিল প্রাণদানের সুদৃঢ় সঙ্কল্প। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে যতীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয়ী মহাজীবন।

ইংরেজের বিচারে ফাঁসি হয়েছিল নীরেন আর মনোরঞ্জনের। আর অত্যধিক শারীরিক নির্যাতনে প্রাণত্যাগ করেন জ্যোতিষ।

* স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার বিদেশে যান ১৮৯৩ সালের ৩১ মে এবং ফিরে আসেন ১৮৯৭ সালের ২৬ জানুয়ারি। দ্বিতীয়বার যান ১৮৯৯ সালের ২০ জুন এবং ফিরে আসেন ১৯০০ সালের ৯ ডিসেম্বর।

ছবিঃ সৌমিত্র চক্রবর্তী

দাড়িবাবাদের কবলে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

তাঁকে বড়রা বলতেন তোতামিয়াঁ। আমরা ছোটরা বলতুম তোতামামা। কেউ কেউ তাঁকে বলতেন 'জাহাজি তোতা'। কারণ তোতামামা ছিলেন জাহাজের নাবিক।

আমাদের ছোট্ট শহরে হিন্দু ও মুসলিমরা মিলেমিশে বাস করতেন। তোতামামার বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ির পাশেই। তাঁর ভাই ছিলেন দর্জি। তাঁর ডাকনাম ছিল আতামিয়াঁ। দুজনেরই আসল নাম আমার জানা ছিল না। কিন্তু তোতা-আতা দুইভাই ছিলেন একেবারে বিপরীত। যেমন মেজাজ, তেমনি চেহারায়।

তোতামামা ছিলেন লম্বা-চওড়া প্রকাণ্ড মানুষ। তেমনি প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। মাথার চুল কাঁচাপাকা। সামনের দিকে অল্প চুল। কিন্তু পেছনে একেবারে খুঁটিয়ে ছাঁটা। তবে দেখবার মতো জিনিস ছিল তাঁর গোঁফ। সূচলো বাঁকা গোঁফের ডগা। কিন্তু বিশাল সেই গোঁফ। রোজ দাড়ি কামাতেন। তাই বাবা ঠাট্টা করে বলতেন, "কী হে তোতামিয়াঁ! রোজ দাড়ি কামাও কি গোঁফকে দেখনসই করার জন্য?"

তোতামামা ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হেসে বলতেন, "তুমি ঠিকই ধরেছ। তবে কী জানো? আমার জাহাজের ক্যাপ্টেন হুবার্ট সায়েব ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখেন। তাই কোনো নাবিকের দাড়ি রাখা পছন্দ করেন না। দাড়ি রাখবেন শুধু তিনি। ক্যাপ্টেন বলে কথা।"

তোতামামা সারা বছর সমুদ্রে পৃথিবীর এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে জাহাজে কাটিয়ে বাড়ি ফিরতেন মাত্র একবার। কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে আবার কলকাতা ফিরে যেতেন। তারপর আবার জাহাজে পাড়ি দিতেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে। যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন পাড়ার ছোট-বড় সবার জন্য কত জিনিস নিয়ে আসতেন এবং উপহার দিতেন। আমার জন্য আনতেন রঙবেরঙের ছবির বই, কালার পেন্সিল, লজেন্স। আমাদের বাড়ির ভেতরে বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে তাঁর সমুদ্রযাত্রার অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প শোনাতেন। তাই তোতামামা এলেই আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেতুম। বাবা ও মা-ও খুশি হয়ে গল্প শুনতেন।

সেবার পুজোর আগে সন্ধ্যাবেলায় পড়তে বসেছি, এমন সময় বাইরে তোতামামার চেনা সেই ভরাট গলার ডাক শোনা গেল, "পুঁটু! ও পুঁটু!"

অমনি দৌড়ে ছোট্ট উঠোন পেরিয়ে সদর দরজা খুলে দিলুম। তারপরই ভীষণ ভড়কে গেলুম। এ আবার কে? সেই দশাসই চেহারা, পরনে প্যান্ট-শার্ট, কাঁধে ব্যাগ—অথচ মুখে গোঁফ নেই এবং মাথায় চুল নেই। পুরো মাথা জুড়ে চকচকে টাক!

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি দেখে তোতামামা বললেন, "কী রে পুঁটু? চিনতে পারছিস নে? আমি তোর সেই তোতামামা?"

অবাক হয়ে বললুম, "আপনার গোঁফ নেই কেন? মাথায় চুল নেই কেন তোতামামা?"

"ভেতরে চল্। সব বলব।" বলে তোতামামা বাড়ি ঢুকলেন।

বাবা ইতিমধ্যে উঠোনে নেমে

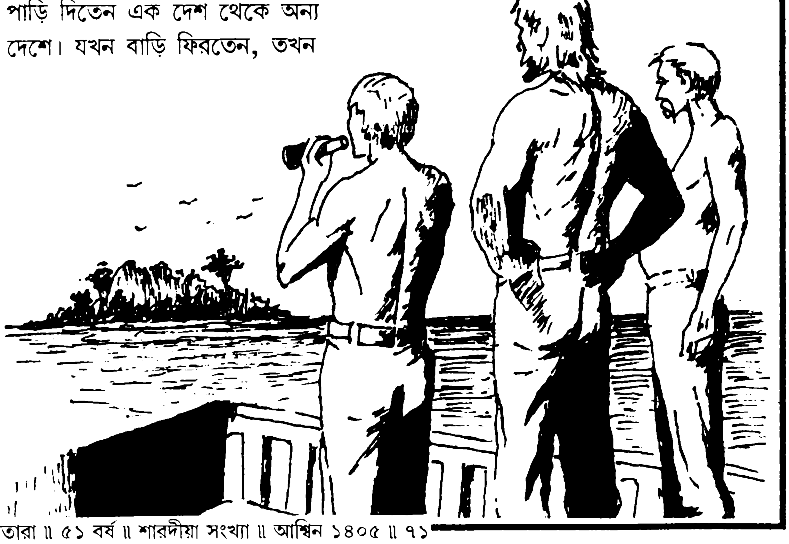

এসেছেন। তিনিও খুব অবাক হয়ে বললেন, "কী অদ্ভুত ব্যাপার! ওহে তোতামিয়াঁ! তোমার গোঁফ কোথায় গেল? মাথা জুড়ে টাক পড়ল কেন? তোমার গালই বা অমন চকচক করছে কেন?"

তোতামামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ মুখে বললেন, "আর বোলো না হে! প্রাণে বেঁচে ফিরতে পেরেছি এই যথেষ্ট।" বলে তিনি হাঁক দিলেন, "কৈ গো বোনটি? শীগগির চা দাও। তোমার হাতের চা না খেলে চাঙ্গা হব না। ট্রেন থেকে নেমেই প্রথমে এ বাড়ি ঢুকেছি।"

মা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মা-ও ভীষণ অবাক। বললেন, "এ কী দাদা! তোমার এমন চেহারা হলো কেন?"

তোতামিয়াঁ বারান্দায় উঠে একটা চেয়ারে বসে বললেন, "আগে চা। তারপর কথা হবে। হ্যাঁ—পুঁটুর কোন ক্লাশ হলো এবার?"

বললুম, "ক্লাশ সিক্স্।"

"বাহ্! এই নে। তোর জন্য কত ইংরেজি গল্পের বই এনেছি দ্যাখ্!" তোতামামা কয়েকটা রঙচঙে লম্বা-চওড়া বই বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। তারপর বাবাকে বললেন, "তোমার জন্য এই সেফটি রেজার, ব্লেড আর দাড়ি কামানোর লোশন এনেছি। আর আমার বোনটির জন্য এনেছি পাপুয়া দ্বীপের আদিবাসীদের তৈরি কতরকমের গয়না। হ্যাঁ—একসেট সাবানও এনেছি।"

মা তখনই চা করতে গেলেন। বাবা পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। আমি থামে হেলান দিয়ে তোতামামার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। ইনি কি সত্যি সেই তোতামামা, নাকি অন্য কেউ? কিছু বলা যায় না। আমাদের পাড়ার শেষে একটা কবরখানা আছে। কেন যেন গা ছমছম করতে লাগল।

বাবা বললেন, "দেখো ভাই তোতা! তোমার সেফটি রেজার, ব্লেড, আর এই লোশন দিয়ে দাড়ি কামিয়ে আমার অবস্থা তোমার মতো হবে না তো?"

তোতামামা একটু হেসে বললেন, "আরে না না! ওগুলো খাঁটি অস্ট্রেলিয়ায় তৈরি। ও সবের সঙ্গে আমার গোঁফ হারানো বা মাথাজুড়ে টাক গজানোর কোনো সম্পর্ক নেই।"

মা শীগগির চা এনে দিয়ে মোড়ায় বসে উপহারগুলো দেখতে থাকলেন। আমি বললুম, "এবার বলুন না তোতামামা, আপনার গোঁফের কী হলো? মাথায় অমন টাক পড়ল কেন?"

তোতামামা আস্তেসুস্থে চা খাওয়ার পর বললেন, "সে এক সাংঘাতিক ঘটনা। বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু যা বলছি, তা কত সত্যি আমি জানি। আমার অবস্থা এমন কেন হলো এবার শোনো।"

তোতামামা বলতে শুরু করলেন তাঁর গোঁফ হারানো আর টাক গজানোর রোমাঞ্চকর কাহিনী।...

"আমাদের জাহাজটা যাত্রিবাহী নয়, মালবাহী ছোট জাহাজ। পৃথিবীর এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে নানা কোম্পানির নানারকম জিনিস পৌঁছে দেয়। জাহাজটার মালিক এক ব্রিটিশ কোম্পানি। জাহাজের নাম 'ভিক্টরি'।

"গত বছর নভেম্বরে কলকাতা থেকে হংকংয়ে মাল পৌঁছে দিয়ে আবার সেখান থেকে মাল বোঝাই করে জাপানের হোক্কাইদো দ্বীপের কাহিরা বন্দরে পৌঁছেছিলুম। কাহিরা থেকে ডিসেম্বরের শেষাশেষি আমাদের জাহাজ রওনা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন বন্দরের দিকে।

"প্রশান্ত মহাসাগরের যে অঞ্চল দিয়ে আমরা ভেসে যাচ্ছিলুম, তাকে পলিনেশিয়া বলা হয়। জাহাজের গতি দক্ষিণে। বাঁ দিকে পাপুয়া এবং নিউজিল্যান্ড, ডানদিকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ। ওখানে প্রশান্ত মহাসাগর আর তত চওড়া নয়। জানুয়ারি মাস। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল শুরু হয়েছে। উত্তর গোলার্ধে যখন শীত, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্ম!

"বেশ যাচ্ছিলুম। হঠাৎ এক রাত্রে শুরু হয়ে গেল তুমুল ঝড়বৃষ্টি। ঝড়ের গতিও দক্ষিণে। কিন্তু সেই ঝড় এমন সাংঘাতিক যে, আমাদের ছোট জাহাজটার অবস্থা হলো শোচনীয়। গতি নিয়ন্ত্রণ করে যে যন্ত্রটা, তার নাম রেডার। আমরা নাবিকরা বলি র‍্যাডার। পাপুয়ার পাশ ঘেঁষে যাওয়া বিপজ্জনক। কারণ সমুদ্রের তলায় ওখানে আছে কয়েকটা ডুবোপাহাড়। কিন্তু ঝড়ের দাপটে র‍্যাডার অকেজো হয়ে গিয়েছিল। ডুবোপাহাড়ের কিনারায় ধাক্কা লেগেই এই দুরবস্থা।

"তারপর আর জাহাজের গতি সামাল দেওয়া গেল না। র‍্যাডার নৌকোর হালের কাজ করে। হাল ভাঙলে নৌকোর কী অবস্থা হয় ভাবো! ক্যাপ্টেন হুবার্ট বেতারে 'এস ও এস' অর্থাৎ বিপদসংকেত পাঠাতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কোনো বন্দর থেকে সাড়া পাচ্ছিলেন না।

"অবশেষে ঝড় যখন থামল, তখন বিপদের ওপর বিপদ, অগভীর সমুদ্রের তলায় জাহাজ গেল আটকে। ইঞ্জিনও গেল বিগড়ে। কারণ জাহাজের প্রপেলার সমুদ্রতলে চড়ার ধাক্কায় বেঁকেচুরে গিয়েছিল। জলের গভীরতা মেপে আমরা প্রমাদ গুনলুম। মাত্র বিশ ফুট গভীরতা সেখানে! ছোট জাহাজ হলেও দুশো টন মাল তো ভর্তি।

"ক্যাপ্টেন হুবার্ট অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ হিসেব করছিলেন কম্পাসযন্ত্রে। তাঁর কেবিন থেকে বেরিয়ে জাহাজের মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার আর নাবিকদের ডেকে তিনি বললেন, 'আমরা বিপন্ন। কারণ আমরা এসে পড়েছি সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কাছে। অক্ষাংশ ১০ ডিগ্রি এবং দ্রাঘিমাংশ ১৬০ ডিগ্রি থেকে সামান্য দূরে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই অগভীর সমুদ্রের পূর্বে এবং খুব কাছাকাছি যে দ্বীপটা আছে, তার নাম ডেভিল'স আইল্যান্ড।'

"অর্থাৎ কিনা শয়তানের দ্বীপ! আমরা চমকে উঠেছিলুম। কারণ নাবিকজীবনে ওই জনহীন দ্বীপ সম্পর্কে অনেক ভুতুড়ে গল্প শুনেছি। ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন হুবার্ট দূরবীনে দেখে নিয়ে আবার বললেন, 'হ্যাঁ। আমাদের বাঁদিকে একমাইল দূরে একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি। ওটাই যে শয়তানের দ্বীপ তাতে আমার বিন্দুমাত্র

সন্দেহ নেই।'

"কিছুক্ষণ পরে দিনের আলো ফুটে উঠল। খালি চোখেই দ্বীপটা দেখতে পেলুম। নাবিকদের মধ্যে বব নামে এক মার্কিন যুবক আর পরেশ রায় নামে একজন বাঙালি যুবক ছিল আমার খুব ঘনিষ্ঠ। পুঁটুর মতোই, কেন জানি না, পরেশ আমাকে বলত তোতামামা। আর বব বলত 'আঙ্কল্ টোটা'। তো ববের কাছে ছিল বাইনোকুলার। সে বাইনোকুলারে দ্বীপটা দেখতে দেখতে বলল, 'শুধু জঙ্গল দেখতে পাচ্ছি আঙ্কল্ টোটা! গাছগুলোর চেহারা ভারি অদ্ভুত। তলায় ফার্নের ঝোপ আছে অবশ্য। আর একটা পাহাড়ও দেখতে পাচ্ছি। পাহাড় থেকে জলপ্রপাত নেমে গেছে মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যি কোনো জনমানব দূরের কথা, কোনো প্রাণী—এমনকি পাখি পর্যন্ত নেই। আশ্চর্য তো!'

"ববের কাছ থেকে বাইনোকুলার নিয়ে আমিও খুঁটিয়ে দেখে বললুম, 'বব ঠিকই বলেছে। ওই রকম আজব গাছ কখনও দেখিনি। গাছগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে কটমট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।' পরেশও আমার কাছে থেকে বাইনোকুলার নিয়ে দ্বীপটা দেখতে থাকল।"

তোতামামা শ্বাস ছেড়ে চুপ করলেন। বাবা বললেন, "তারপর কী হলো বলো!"

তোতামামা একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, "সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, শেষে বেতারযন্ত্রটাও গেল বিগড়ে। এখন আমাদের একমাত্র ভরসা, যদি দূরে কোথাও কোনো জাহাজ বা মাছধরা ট্রলারের দেখা পাওয়া যায়। মাছধরা ট্রলার এই অগভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে আসে শুনেছিলুম।...

"কিন্তু কোথায় কী? সাতদিন সাতরাত্রি কেটে গেল। খাদ্যের ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছিল। রেশন করে একটুকরো পাঁউরুটি আর একটুখানি জল খেয়ে কাটাচ্ছিলুম। অবশ্য নাবিকদের অনেকের কাছে মাছধরা ছিপ ছিল। সমুদ্রের মাছ কোনটা খাওয়া যায়, কোনটা বিষাক্ত বা অখাদ্য আমরা জানি। সেই মাছ পুড়িয়ে খেয়ে পেট ভরাচ্ছিলুম বটে, কিন্তু পানীয় জল? শেষে এমন অবস্থা হলো, জলের অভাবে আমরা কাতর হয়ে পড়লুম।

"তখন আমিই মরিয়া হয়ে ক্যাপ্টেন সায়েবকে বললুম, 'স্যার! শয়তানের দ্বীপে একটা পাহাড়ে জলপ্রপাত বা ঝর্ণা, যা-ই হোক, আমরা দেখতে পেয়েছি। আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি শয়তানের তোয়াক্কা না করে ওই দ্বীপ থেকে পানীয় জল আনতে পারি।'

"ক্যাপ্টেন বললেন, 'তোমার মাথাখারাপ হয়েছে টোটা? ওই দ্বীপে যারা যায়, শুনেছি তারা আর জ্যান্ত ফিরে আসে না।' তাই শুনে বব বলল, 'আঙ্কল্ টোটার সঙ্গে আমিও যেতে রাজী।' পরেশও বলল, 'আমিও যাব। রবারের ভেলায় প্লাস্টিকের পাত্রে প্রচুর জল ভরে আনব।' দুই ভাগ্নের সাহসে আরও সাহসী হয়ে বললুম, 'ক্যাপ্টেন সায়েব! আমাদের যেতে অনুমতি দিন। আমাদের চাই শুধু তিনটে আগ্নেয়াস্ত্র!' ক্যাপ্টেন একটু চিন্তাভাবনা করে বললেন, 'এই অগভীর সমুদ্রে বহু দ্বীপ থেকে আদিবাসীরা মাছ ধরতে এসে আমাদের জাহাজ দেখতে পাবে। তখন তারা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। তাই আমি তোমাদের রাইফেল বা রিভলভার দিতে পারব না। বড়জোর দুটো শটগান আর দুটো করে চারটে কার্তুজ দিতে পারি।' ক্যাপ্টেনের কথায় যুক্তি ছিল।

"তো বব আর আমি শটগান দুটো নিলুম। পরেশ নিল ঝোপজঙ্গল কাটা একটা ভোজালি জাতীয় ছোট্ট ধারালো দা। আমরা তিনজনে রবারের ভেলায় চেপে শয়তানের দ্বীপের বালিভরা বিচে পৌঁছুলুম। তারপর জল ভরার তিনটে পাত্র নিয়ে রবারের ভেলাটা টানতে টানতে ফার্নের জঙ্গলে লুকিয়ে রাখলুম।

"আগেই বলেছি, দ্বীপের গাছপালার চেহারা কেমন যেন জ্যান্ত। এসব গাছ আমি জীবনে দেখিনি। কাছাকাছি গিয়ে মনে হচ্ছিল ফিসফিস শব্দে গাছগুলো যেন আমাদের বিরুদ্ধে কী চক্রান্ত করছে। ফার্নের ঝোপ কেটে যত এগোচ্ছি পাহাড়টার দিকে, তত চমকে উঠে পিছনে তাকাচ্ছি। কেউ বা কারা যেন গোপনে বা অদৃশ্য থেকে আমাদের পিছনে হেঁটে আসছে। বব তো একবার চমকে উঠে শটগান তাক করে গুলি ছুঁড়তে যাচ্ছিল ওকে আটকে না দিলে সত্যি গুলি ছুঁড়ত।

"মিনিট কুড়ি হাঁটার পর দেখলুম, ওটা পাহাড়ি ঝর্ণাই বটে। প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু থেকে জলের ধারা নিচে আছড়ে পড়ে ছোট্ট একটা জলাশয় সৃষ্টি করেছে। বহু দ্বীপে এ ধরনের প্রস্রবণ আছে, তা সুপেয় জলের। ছোট্ট জলাশয়টা অন্তত বিশ ফুট নিচে একটা সংকীর্ণ উপত্যকায় অবস্থিত। তারপর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে। ঝোপ কেটে আমরা নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ এক অদ্ভুত—বেজায় উদ্ভুট্টে দৃশ্য দেখতে পেয়ে তিনজনই গুঁড়ি মেরে বসে পড়লুম।

"ঝর্ণা যেখানে আছড়ে পড়ছে, তার পাশে একটা চওড়া কালো সমতল পাথর। সেই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে চারটে প্রাণী। কী রকম প্রাণী বলি।

"ফুট চারেক উঁচু। তাদের সাদা গোঁফ-দাড়ি বুক ঢেকে পায়ের তলায় পৌঁছেছে। তাদের মাথার সাদা চুলও পিঠ ঢেকে পায়ের পেছনে মাটি ছুঁয়েছে। শুধু মুখের ওপরটা আর দুটো লিকলিকে হাত দেখা যাচ্ছে কাঁধ থেকে। বেজায় কালো রঙ। চোখগুলো যেন জ্বলছে।

"ওরা কতকটা মানুষের মতো। অথচ মানুষ নয়। আমরা হতভম্ব হয়ে বসে আছি। কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। একটু পরে চারটে প্রাণীই ঝুপ ঝুপ করে জলাশয়ে ঝাঁপ দিল। সাঁতার কাটল কিছুক্ষণ। তারপর পাথরটাতে উঠে শরীর নাড়া দিয়ে জল ঝেড়ে ফেলে রোদে বসল। মনে হলো, ওরা দাড়ি আর চুল শুকিয়ে নিচ্ছে।

"পরেশ ফিসফিস করে বলল, 'তোতামামা! মনে হচ্ছে এরাই সেই বালখিল্য মুনি। মহাভারতে এদের কথা পড়েছি। ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন ক্রতু। ক্রতুর পুত্র ছিলেন বালখিল্য মুনিরা। শুধু একটা কথা মিলছে না। বালখিল্য মুনিদের সাইজ ছিল এক আঙুল লম্বা।' পরেশ আমাকে বাংলায় কথাগুলো বলছিল।

তাই বব চটে গিয়ে জানতে চাইল কী বলছে পরেশ? তখন পরেশ তাকে কথাগুলো যথাসাধ্য ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিল। বব গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোমাদের ওই বই যারা লিখেছিল, তারা নিশ্চয় দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড ছিল। তাদের আঙুল কি তোমার মতো আঙুল ছিল?' পরেশ সায় দিল তার কথায়।

"আধঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু বালখিল্যরা নড়ল না। তখন অধৈর্য হয়ে খাপ্পা বব আমি বাধা দেবার আগেই শূন্যে ফায়ার করে দিল। নিচের উপত্যকায় প্রচণ্ড শব্দ হলো। অমনি সেই দাড়িবাবারা—হ্যাঁ, পরে ঠাট্টা করে আমি তাদের দাড়িবাবা নাম দিয়েছিলুম—তারা চমকে গিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। তারপর কিচিরমিচির করে কী বলতে থাকল। ববকে আটকাতে পারলুম না। সে আবার শূন্যে ফায়ার করামাত্র দাড়িবাবা বা বালখিল্যরা পাহাড়ের গায়ে ঝোপজঙ্গলের ভেতর চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"বব, তার পিছনে পরেশ, তার পিছনে আমি তিনটে জলের পাত্র নিয়ে দ্রুত নেমে গেলুম। সেই পাথরটা থেকে ঝর্নার জল ভরতে শুরু করল বব আর পরেশ। আমি শটগান হাতে পাহারায় রইলুম।

"হঠাৎ আমার মাথায় গোঁ চাপল। দুর্মতি আর কাকে বলে?"

তোতামামা আবার জোরে শ্বাস ছেড়ে চুপ করলেন। বললুম, "তোতামামা! তারপর কী হলো?"

তোতামামা তাঁর মাথার চকচকে চামড়ায় হাত বুলিয়ে নিয়ে আবার তাঁর কাহিনী শুরু করলেন।

"হঠাৎ আমার মাথায় গোঁ চাপল। শটগানের গুলির শব্দে যারা ভয় পায়, তারা নিশ্চয় ভিতু। আমার হাতে শটগান আছে। দুটো কার্তুজ আছে। ধারালো দা আছে। তা ছাড়া নাবিকজীবনে কত ভয়াবহ অবস্থায় পড়েছি। তা থেকে গায়ের জোর আর বুদ্ধির জোরে উদ্ধার পেয়েছি। এই চার ফুট দাড়ি-চুলওয়ালা দু'পেয়ে প্রাণীগুলোকে ভয় পাওয়ার মানে হয় না। ওদের অন্তত একটাকে ধরে জাহাজে নিয়ে যেতে পারলে হইচই পড়ে যাবে।

"আমি বব আর পরেশকে কিছু না বলেই খাড়াই বেয়ে সাবধানে উঠতে শুরু করলুম। ওরা আমাকে ডাকাডাকি করছিল। সাড়া দিলুম না। পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি গিয়ে দেখি জঙ্গলের ভিতরে সরু একটা পথ। ওই পথেই বিদকুটে প্রাণীগুলো তাহলে এসেছিল। কয়েক পা এগিয়ে গেছি, আচমকা দু'ধারের গাছ থেকে ঝুপঝুপ করে সেই দাড়িবাবারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন বুঝলুম, ওদের গায়ে কী সাংঘাতিক শক্তি! একজন আমার শটগান কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। বাকি তিনজন আমার পিঠে বসে ফরফর করে আমার জামা ছিঁড়ে ফেলে দাড়ি ঘষতে থাকল। ওহ্! সে কী সুড়সুড়ি! হাসব কি, চ্যাঁচাতে শুরু করলুম। তখন একজন হাত বাড়িয়ে আমার গোঁফসুদ্ধ মুখ চেপে ধরল। গোঁ গোঁ করতে থাকলুম।

"তারপর কী হয়েছিল মনে নেই। নিশ্চয় আতঙ্কে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলুম। কতক্ষণ পরে দেখি, বব আর পরেশ আমার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। জ্ঞান ফিরতেই বললুম, 'ওরা কোথায়?' বব বলল, 'তা জানি না। আমরা তোমাকে খুঁজতে এসে দেখি, এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ তুমি। তোমার জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই।' পরেশ বলল, 'তোমার শটগান কী হলো তোতামামা?' অতিকষ্টে বললুম, 'ওই জঙ্গলে ওরা ছুঁড়ে ফেলেছে।' পরেশ জঙ্গলে খুঁজে শটগানটা কুড়িয়ে আনল। তারপর ওদের সাহায্যে অতিকষ্টে নিচে নেমে এলুম। জলের পাত্র তিনটে ঠিকই ছিল। পরেশ আর বব তিনটে পাত্র ধরাধরি করে নিয়ে চলল। আমি খাপ্পা হয়ে শটগানটা থেকে পাহাড়ের চূড়ার দিকে একটা গুলি ছুঁড়লুম।

"কিন্তু তখনও জানতুম না এরপর কী ঘটবে।

"ভেলায় চেপে জাহাজে ফিরে গেলুম। জাহাজসুদ্ধ লোক ভিড় করে দাড়িবাবা বা বালখিল্যদের গল্প শুনল। কিন্তু তারা বিশ্বাস করল না। শুধু ক্যাপ্টেন হুবার্ট বললেন, 'ওটার নাম ডেভিল'স আইল্যান্ড কেন তা এবার জানা গেল। বব, পরেশ আর টোটো যাদের দেখেছে, তারা সেই শয়তান। যাই হোক, টোটাকে শয়তানরা ছুঁয়েছিল। টোটাকে একটা আলাদা কেবিনে রাখতে হবে। ওর গায়ে শয়তানের ভাইরাস লেগেছে। সাবধান!' কথাগুলো শুনে আমি একটু ভড়কে গেলুম। তবে পুরো একটা কেবিনে একা থাকার সুযোগ পেয়ে একটু খুশিও হয়েছিলুম।

"সেদিনই বিকেলে পাপুয়া দ্বীপের একটা মাছধরা ট্রলার মাছ ধরতে এসেছিল ওই অঞ্চলে। নাবিকদের পতাকা নাড়ানো দেখে তারা আমাদের জাহাজের পাশে এসেছিল। তারপর ক্যাপ্টেনের মুখে সব কথা শুনে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন অফিসারকে ট্রলারে চাপিয়ে নিয়ে গেল।

"মাঝরাতে একটা ছোট জাহাজ এসে প্রায় একমাইল উত্তরে নোঙর করেছিল। সেখান থেকে রবারের ভেলায় পালাক্রমে আমাদের জাহাজের লোকজনকে নিয়ে গেল। বাকি রইলেন শুধু ক্যাপ্টেন হুবার্ট আর আমি। ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমাদের জাহাজের সব মাল খালাস করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্রিসবেন থেকে একটা মালবাহী জাহাজ আসছে। সেটা না আসা পর্যন্ত আমাকে থাকতে হবে। আর টোটা! তোমাকে শয়তানগুলো ছুঁয়েছে। তোমাকে কারও সংস্পর্শে যেতে দেওয়া হবে না। সেই জাহাজে তুমি আমার সঙ্গে যাবে।' কথা শুনে খুব মনমরা হয়ে গেলুম।

"যাই হোক। কেবিনে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম শেষ রাত্রে। হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর চমকে উঠলুম। এ কী! আমার পা পর্যন্ত জঙ্গলের মতো দাড়ি গজিয়েছে কেন? লাফিয়ে উঠে বসলুম। সেই রকম লম্বা চুল আমার মাথা থেকে পায়ের পেছন দিকে লুটিয়ে পড়ল। সর্বনাশ! আমিও যে দাড়িবাবা হয় গেছি! চিৎকার করে ডাকলুম, 'ক্যাপ্টেন সায়েব! ক্যাপ্টেন সায়েব!' ক্যাপ্টেন হুবার্ট এসেই আমাকে দেখে রিভলভার বের

করেছিলেন। বললুম, 'আমি আপনার সেই নাবিক টোটা স্যার! দয়া করে গুলি করে আমাকে মেরে ফেলবেন না।' ক্যাপ্টেন তখন দড়াম করে কেবিনের দরজা এঁটে বাইরে থেকে বললেন, 'তালা আটকে দিচ্ছি! টোটা! তুমি টুঁ শব্দটি করবে না। করলেই গুলি করে মেরে ফেলব। আর শোনো! তোমাকে দেখলে ব্রিসবেনে হইচই শুরু হয়ে যাবে। তাই গোপনে তোমাকে আমার চেনা এক জীববিজ্ঞানী এবং ডাক্তারের ল্যাবে নিয়ে যাব। সাবধান! টুঁ শব্দ নয়।'

"কথা না বাড়িয়ে এবার সংক্ষেপে বলি। বোনটি! তার আগে আর এক কাপ চা চাই।"

মা চা করে আনতে কিচেনে চলে গেলেন। দেখলুম, বাবা মিটিমিটি হাসছেন। তোতামামা বললেন, "বলেছিলুম বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমার মাথা, নাকের নিচেটা আর গালের অবস্থা দেখ।"...

চা খেয়ে তোতামিয়াঁ তাঁর কাহিনী শুরু করলেন।

"ব্রিসবেনে জীববিজ্ঞানী এবং ডাক্তার রবার্ট স্টিলারের ল্যাবে প্রায় একমাস ধরে গোপনে আমার চিকিৎসা চলেছিল। ডাঃ স্টিলার বলেছিলেন, 'সলোমন আইল্যান্ড এলাকায় অনেক অদ্ভুত প্রাণী এখনও থাকতে পারে। তাদের গায়ের লোম থেকে এরকম অদ্ভুত সংক্রামক ব্যাধি হওয়া খুবই সম্ভব। যাই হোক, আমি যে লোশন তৈরি করেছি, তার ফল পাওয়া গেছে। তবে এই নাবিকবেচারার দুর্ভাগ্য, আর ওর চুল গজাবে না। গোঁফ-দাড়িও গজাবে না। এর শরীরে আর লোম পর্যন্ত গজাবে না। কিন্তু সাবধান নাবিক! তোমাকে এখনও তিনমাস আমার লোশন মেখে স্নান করতে হবে প্রতিদিন। এর মধ্যে একদিন লোশন না মাখলে কী ঘটবে তা বলতে পারছি না।' কথা শুনে কোনো প্রশ্ন করতে পারিনি। ডাঃ স্টিলার ক্যাপ্টেন হুবার্টের মতোই রগচটা মানুষ।"

বলে তোতামামা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাবা তাঁর উপহার দেওয়া লোশন দেখিয়ে বললেন, "ওহে তোতামিয়াঁ! এই লোশন তোমার সেই লোশন নয় তো?"

অমনি তোতামিয়াঁ আগের সময়ের মতো ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হেসে বললেন, 'না, না! আমার লোশন কবে ফুরিয়ে গেছে। ওটার গায়ে কী লেখা আছে দেখ না! শেভিং লোশন।"

বললুম, "আচ্ছা তোতামামা! আপনি সেই ডাক্তারকে কেন বলেননি, অন্তত গোঁফ গজানোর কোনো লোশন দিন! তোতামামা! আপনার গোঁফ না থাকলে আপনাকে যে কেউ চিনতে পারবে না।"

তোতামামা বললেন, "চেপে যা পুঁটু! এ শহরে কেউ যেন টের না পায় আমার গোঁফ নেই। তা হলে কেউ আমাকে গ্রাহ্য করবে না। জানিস? আমি ছোটভাইয়ের বাড়ি ঢুকিনি। চুপিচুপি সন্ধ্যাবেলা শুধু তোদের বাড়ি এসেছি। এখনই চুপিচুপি কেটে পড়ব। কলকাতা চলে যাব।"

বাবা বললেন, "তা কেন? তুমি নকল গোঁফ পরে মাথায় পরচুলো চাপিয়ে নেবে।"

তোতামামা হাসলেন। "তা মন্দ বলনি। কলকাতা গিয়ে চিৎপুর থেকে যাত্রা-থিয়েটারের দোকানে গোঁফ-পরচুলো কিনে বরং ফিরে আসব। ইশ! এই সামান্য বুদ্ধিটা মাথায় কেন যে আসেনি! আসলে পুঁটুকে বইগুলো দেবার জন্য আমার তর সইছিল না। হ্যাঁ—আসলে সেই দাড়িবাবারা! শয়তানগুলো আমার বুদ্ধিসুদ্ধি শেষ করে দিয়েছে।"

বলে তোতামিয়াঁ ব্যাগ থেকে টুপি বের করে মাথায় চাপিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে গেলেন।...

একটু পরিশিষ্ট আছে। তোতামামা সত্যি নকল গোঁফ আর পরচুলো পরে ফিরে এসেছিলেন। আমি, বাবা, মা—কেউই রটিয়ে দিইনি ব্যাপারটা। বরং খুশিই হয়েছিলুম। সেই পেল্লায় গোঁফ ছাড়া কি তোতামামা আর তোতামামা থাকেন? সুকুমার রায়ের পদ্যে পড়েছিলুম না? 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা!'...

ছবি: অমিত চক্রবর্তী

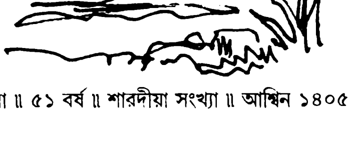

আগমনী

সুনির্মল বসু

বাজারে শঙ্খ বাজারে
মার আগমন হবেরে এখন
ভক্ত হৃদয় মাঝারে।
মায়ের ভক্ত করে না ভড়ং
নিরালা নিভৃতে রহে সে বরং
মায়ের ভক্ত যে অনাসক্ত
আয়রে হাজারে হাজারে
ওরে শোন ধীরে—মনোমন্দিরে
মায়ের আসন সাজারে
বাজারে শঙ্খ বাজারে।

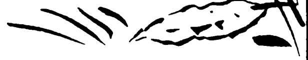

হেলাফেলা খেলা খেলা

পঙ্কজ সাহা

কোন খেলা
হেলাফেলা
কলাবেচা
চলছে তো

কোন খেলা
ছেলেবেলা
রথ দেখা
একা একা

একা সেই একমনে
আকাশকে মাপছে
দিনে রোদ কাঁপছে।

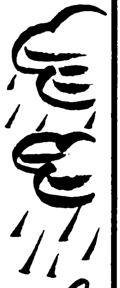

রোদভাঙা চিরুনি
কালো চুলে বিনুনি,
বিষ্টির পথ-রেখা
তবলায় আড়ঠেকা
তারপর ঝুপঝাপ
ঝুপঝুপ রিমঝিম
আলো জ্বলে টিমটিম
রাতভর বৃষ্টি
ধুয়ে গেল সৃষ্টি।

ভোর ভোর বৃষ্টির
রাশ টেনে ধরলো
আকাশকে বললো
আজ নাকি রবিবার
তবে কেন মুখ ভার!

ছবি: সৃফি

ঘণ্টা

তারাপদ রায়

লেখার টেবিলের ওপরে কাচের গেলাস উলটিয়ে ভেঙে দরকারি কাগজপত্র জলে ভিজিয়েছে কে?

কে আবার? নিশ্চয়ই ঘণ্টা আরশোলা তাড়া করে টেবিলের ওপর উঠেছিলো।

শোয়ার ঘরের দরজার নতুন পর্দা ফালা ফালা করে ছিঁড়েছে কে?

কে আবার? নিশ্চয়ই ঘণ্টা পর্দা বেয়ে উঠতে গিয়েছিলো, পায়ের ধারালো নখে দামি পর্দাটা ফালা ফালা করে ফেলেছে।

ময়লা ফেলার প্লাস্টিকের বালতিটা থেকে মাছের আঁশকাঁটার ঠোঙাটা সারা ঘরময় ছড়িয়েছে কে?

কে আবার? নিশ্চয়ই ঘণ্টা।

ঘরের মধ্যে কিংবা সামনাসামনি কেউ না থাকলেই ঘণ্টা যতসব গোলমাল করে। তবে ঘণ্টা মাছ-দুধ চুরি করে না। সে চোর বেড়াল নয়। খিদে লাগলে পায়ে পায়ে ঘুরে অনবরত একঘেঁয়ে মিউ-মিউ করে চলে, তাকে খাবার না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। ঘণ্টার এত রকম দৌরাত্ম্যের একটাই কারণ এই যে সে এ বাড়িতে জন্মেছে, যদিও সে এ বাড়ির বেড়াল নয়।

না হলে এ বাড়ির গিন্নিমার শাসন খুব কড়া। আর দশটা গৃহস্থ বাড়ির মতো এ বাড়িরও বেশ কয়েকটা পোষ্য কুকুর-বেড়াল আছে। কিন্তু তাদের বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ।

কুকুরেরা থাকে দরজার বাইরে সিঁড়ির ওপরে। তাদের খাবার দেওয়া হয় রাস্তায়।

বেড়ালেরা থাকে জানলার বাইরে, চৌকাঠের ওপরে। তাদের খাবার দেওয়া হয় উঠোনে কলতলায়।

এই রীতি বহুকাল চলে আসছে। এ যাবৎ সব কুকুর-বেড়াল গিন্নিমার এই নিয়মকানুন মাথা নত করে পালন করে এসেছে।

শুধু কুকুর-বেড়াল কেন, এ বাড়ির মানুষেরাও গিন্নিমাকে যথাসাধ্য সমঝিয়ে চলে। গিন্নিমা সামনে থাকলে কেউ সোফার ওপরে পা তুলে বসে না, হুস-হুস শব্দ করে চা খায় না, ভাতের থালায় আঁকিবুকি কাটে না। বাইরের জুতো পায়ে শোয়ার ঘর কি রান্নাঘরে ঢোকে না।

এ বাড়ির সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যার ডাকনাম চাঁদনি, যার ভালো নাম চন্দ্রকলা, সে পর্যন্ত গিন্নিমা মানে তার ঠাকুমাকে সমীহ করে।

চাঁদনির বয়েস কিছু কম হয়নি, এই তো সামনের কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সে সাত পেরিয়ে আটে পা দেবে। পূর্ণিমায় জন্মেছে বলে প্রথমে তার নাম পূর্ণিমা রাখাই স্থির হয়। কিন্তু পূর্ণিমা নামটা পুরনো বলে আর তা ছাড়া সামনের বাড়ির ঝগড়াটে গিন্নির নামও পূর্ণিমা বলে তার ঠাকুমা আদরের নাতনির নাম রেখেছেন চন্দ্রকলা এবং সেটাই ডাকনামে দাঁড়িয়েছে চাঁদনি।

একমাত্র নাতনি বলে গিন্নিমার কাছে খুবই সমাদর চাঁদনির। কিন্তু চাঁদনিকেও গিন্নিমার সব রীতিনিয়ম মেনে চলতে হয়।

কয়েক মাস আগে একবার চাঁদনি তার ইস্কুলের এক বন্ধু জয়দীপের বাসা থেকে দুটো খরগোশের ছানা একটা কাগজের বাক্সে করে নিয়ে এসেছিলো। জয়দীপদের বাড়িতে অনেক খরগোশ আর গিনিপিগ। সেগুলো সংখ্যায় দিনে-দিনে এত বেড়ে যাচ্ছে যে জয়দীপরা কেউ চাইলেই খরগোশ-

গিনিপিগের বাচ্চা বিলিয়ে দেয়। পাড়ার মধ্যেই রাস্তার শেষ দিকটার সীমানায় জয়দীপদের বাড়ি। ছুটি-ছাটায় জয়দীপদের বাড়িতে যায় চাঁদনি।

বিশাল বাড়ি জয়দীপদের। জয়দীপদের বাবা-ঠাকুর্দা, কাকা-জ্যাঠা সবাই ডাক্তার; কেউ এখানে, কেউ সেখানে।

তিনতলা বাড়ি। চারতলার ছাদে বড় বড় কাঠের বাক্সে রয়েছে গিনিপিগ, খরগোশ থেকে সাদা ইঁদুর পর্যন্ত। শুধু এই সব ছোটখাট জন্তু নয়, পাখিও আছে, বদরিকা, মুনিয়া জালঘেরা কুঠুরিতে। একপাশে একটা রঙিন কাচঘেরা বুদবুদ তোলা কাচের বাক্সে রয়েছে রং-বেরং মাছ। এ বাড়ির পুরো ছাদটা লম্বা জালের তাঁবুর নিচে, যাতে জল-হাওয়া-রোদ আসে, কিন্তু চিল এসে খরগোশ-গিনিপিগদের বাচ্চা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে না যায়, কাকেরা এসে না ঠোকরায়।

খরগোশের প্রতি চাঁদনির অনুরাগ দেখে একদিন জয়দীপের মা বললেন, 'তুমি দুটো বাচ্চা নিয়ে যাও না।'

শুধু অনুরোধের অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদনি দুটো লাল ঠোঁট, আকাশি চোখ, তুলতুলে সাদা বাচ্চা কোলে নিয়ে বাড়িতে চলে এলো।

তারপর যা হলো তা আর বলবার মতো নয়। চাঁদনির পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয় সে ঘটনা। সেদিন চাঁদনিদের বাড়িতে যাকে বলে একেবারে ধুন্দুমার কাণ্ড ঘটে গেলো।

প্রিয়তমা পৌত্রীর কোলে দুটি খরগোশের বাচ্চা দেখে সেদিন গিন্নিমা খেপে গিয়ে লাফালাফি শুরু করলেন।

চাঁদনি তো আর কুকুর-বেড়াল নয়, চাঁদনি হলো এ বাড়ির নাতনি, একমাত্র নাতনি। 'গৃহের ভিতরে সব প্রকার জীবজন্তুর প্রবেশ নিষেধ,' ঠাকুমার এই অলিখিত নির্দেশ সে মান্য করতে যাবে কেন?

কিন্তু নাতনির কাঁদো কাঁদো মুখ আর ঐ খরগোশ শিশুদের ধবধবে, তুলতুলে মায়াবি চেহারা গিন্নিমাকে কিছুতেই টলাতে পারলো না।

গিন্নিমার একটাই যুক্তি, 'বাড়ি-ঘর নোংরা করবে।'

শাশুড়ির সামনে বিয়ের দশ বছর পরেও চাঁদনির মা তটস্থ হয়ে থাকেন, তাঁর মুখে বাক্যটি সরে না।

চাঁদনির বাবা এমনিতে তড়বড়ে, ফুরফুরে, বাক্যবাগীশ মানুষ, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডায় তিনি কাউকে কথা বলতে দেন না। তিনি পর্যন্ত মাতৃদেবীর চেঁচামেচির সময় নির্বিকার থাকেন।

শুধু গঙ্গা, গঙ্গামণি গিন্নিমার কথায় খুবই ক্ষীণভাবে একটু আপত্তি তুলেছিলো। গঙ্গামণি এ বাড়ির পুরনো কাজের লোক। এ বাড়িতে তারই যা একটু সাহস আছে। প্রয়োজন হলে গিন্নিমার সঙ্গেও সে ঝগড়াঝাঁটি করে।

আজ গঙ্গা চাঁদনির পক্ষ নিয়ে বললো, 'এইটুকু দুটো বাচ্চা, কি আর নোংরা করবে? সে আমি পরিষ্কার করবো।'

গঙ্গার কথা শুনে চটে গেলেন গিন্নিমা। বললেন, 'তুমি খরগোশের বাচ্চার কি বোঝো গঙ্গা? এই দুটো বাচ্চা দু'মাসের মধ্যে বড় হয়ে দুটো বাচ্চা দেবে। তারপর দু'মাস অন্তর সেই বাচ্চাদের বাচ্চা হবে। তারপর বাচ্চাদের বাচ্চাদের বাচ্চা হবে। ছয় মাসে বাড়ি ভরে যাবে খরগোশে। তখন তুমি সামলাতে পারবে?

এর পরে আর কথা চলে না। গঙ্গা চুপ করে গেলো। চাঁদনি খরগোশের বাচ্চা দুটো খুবই দুঃখের সঙ্গে জয়দীপদের বাড়িতে ফেরত দিয়ে এলো। চাঁদনিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে চাঁদনির ঠাকুমা সেদিন বিকেলে তাকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে সবচেয়ে দামি আইসক্রিম কিনে দিলেন। তারপরেও বললেন, 'আর কখনো কোনো জীবজন্তুর ছানা বাসায় বয়ে নিয়ে আসবে না।'

এমন যে গিন্নিমা যাঁকে সবাই ভয় পায়, সমীহ করে চলে, তাঁকে কিন্তু ঘণ্টা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। তার কারণ অবশ্য একটাই, ঘণ্টা এ বাড়িতে জন্মেছে।

সে এক বিচিত্র ব্যাপার। আর পাঁচটা বেড়ালের মতো ঘণ্টার মা গিন্নিমার ভয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে সাহস পেতো না, খুব খিদে লাগলে জানলায় বসে মিউমিউ করতো, তখন মাছের কাঁটাকুটো কিছু থাকলে গঙ্গামণি গিয়ে কলতলায় দিয়ে আসতো, ঘণ্টার মা সেখানে গিয়ে খেতো।

বেড়াল-কুকুরের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ বন্ধ করার ব্যাপারে গিন্নিমা 'দ্যাখ্-মার্' পদ্ধতি চালু করেছেন, পদ্ধতিটি বেশ সরল, কিন্তু খুবই কার্যকরী। বাড়ির মধ্যে দেখলেই কুকুর-বেড়ালকে সঙ্গে সঙ্গে মারো, এই নীতির নামই এ বাড়ির গিন্নিমার 'দ্যাখ্-মার্' পদ্ধতি।

কিন্তু এই 'দ্যাখ্-মার্' পদ্ধতি ঘণ্টার ওপরে প্রযোজ্য নয়। এ বাড়িতে তার জোরই আলাদা।

ঘণ্টাকে জানলা বা দরজার ওপারে থাকতে হয় না, কলতলায় খেতে হয় না। ঘণ্টা বাড়ির মধ্যেই থাকে, বাড়ির মধ্যেই খায়। বাড়ির মধ্যেই ঘুমোয়, যখন যেখানে ইচ্ছে, যে কোনো বিছানায়, সোফায়, আলনার পাশে ময়লা কাপড়ের বাক্সে।

ঘণ্টা দুয়েকদিন গিন্নিমার বিছানাতেও মাথার কাছে বালিশের পাশে ঘুমিয়েছে।

ঘণ্টার এই ঔদ্ধত্য দেখে 'দ্যাখ্-মার্' পদ্ধতির প্রবক্তা এবং পরিচালিকা চাঁদনির ঠাকুমা তথা এ বাড়ির গিন্নিমা প্রথম-প্রথম অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী মহিলা, তিনি মনে মনে ভেবে দেখেছেন, এ বাড়ির আর সবাইয়ের মধ্যে একমাত্র ঘণ্টাই এ বাড়িতে জন্মেছে। এমনকি চাঁদনি পর্যন্ত এ বাড়ির বাইরে নার্সিংহোমে জন্মেছে। বাকিদের তো কথাই নেই, এই বাড়ির থেকে, এই শহরের থেকে অনেক দূরে অন্য সময়ে অন্য জায়গায় তারা জন্মেছে।

ঘণ্টার জন্মানোর ব্যাপারটা কেউই কিছু টের পায়নি। এক ঘোর বর্ষার গভীর রাতে, বোধহয় অন্য কোনো জায়গা না পেয়ে, খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে ঘণ্টার মা বাইরের ঘরের সোফার নিচে ঘণ্টার জন্ম দিয়েছিলো। একটাই বাচ্চা, মোটাকাটা, নাদুসনুদুস।

অবশ্য প্রথম দু'-তিনদিন কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। বাড়িতে লোকজন কেউ না এলে বাইরের ঘরটা ফাঁকাই থাকে।

সময় এবং সুযোগমতো ঘণ্টার মা জানলা গলিয়ে এসে বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে যেতো। পুরনো দিনের নিচু সোফা, তাই বাচ্চা কিংবা তার মাকে কারো নজরে পড়েনি।

গঙ্গামণি ঘর ঝাঁট দেয়। সে হয়তো দেখে থাকতে পারে বাচ্চাটাকে, কিন্তু সে নিজে জীব-জানোয়ারের খুব ভক্ত, সে উচ্চবাচ্য করেনি। তার ভয় হয়েছিলো, চোখ-না-ফোটা দুধের শিশুটাকে গিন্নিমা বাড়ির বাইরে ফেলে না দেন।

কিন্তু গিন্নিমা সত্যি অত নিষ্ঠুর নন। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন, ঘণ্টার মা বাইরের ঘর থেকে গুটি গুটি সোফার পিছন দিয়ে জানলা গলিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টার মায়ের ওই দুঃসাহস দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান।

তখনো গিন্নিমা জানেন না যে সোফার নিচে একটা তুলতুলে চোখ-ফুটবো-ফুটবো বেড়ালছানা রয়েছে।

এর কয়েকদিন পরে গিন্নিমা আবার দেখলেন ঘণ্টার মা জানলা দিয়ে এসে সুড়ুত করে সোফার নিচে চলে গেলো। অবশ্য এর মধ্যে বাড়ির অন্য সবাই, গঙ্গামণি ও চাঁদনি, চাঁদনির মা-বাবা, এমনকি এ বাড়ির বড়কর্তা চাঁদনির ঠাকুরদা পর্যন্ত জেনে গেছেন বাচ্চাটার কথা।

ততদিনে ঘণ্টার দুটো চোখই পুরোপুরি ফুটে গেছে। আতার বিচির মতো কালো চোখের থার্মোমিটারের পারদের মতো দুটো উজ্জ্বল মণি দিয়ে সে জগৎসংসারকে দেখছে, অবশ্য জগৎসংসার মানে চাঁদনিদের বাড়ির এই বাইরের ঘর।

বিপত্তিটা হলো একদিন দুপুরবেলায়।

কোট-প্যান্ট-টাই পরা দুটি ছেলে এসেছিলো দরজা-জানলা পরিষ্কার করার তরল সাবানের স্প্রে নাকি চালকুমড়োর কাবাব বানানোর মশলার প্যাকেট বেচতে। বাসায় কেউ ছিলো না, গঙ্গামণি পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো চাঁদনিকে পাশের পাড়ার ইস্কুল থেকে নিয়ে আসতে।

কলিংবেল শুনে বাইরের ঘরে গিয়ে গিন্নিমা দরজা খুলে ছেলেদুটিকে কোনোভাবে বিদায় করে দরজার ছিটকিনি আটকিয়ে ঘুরতে গিয়ে বোধ করলেন পিঠের পিছনে শাড়ির আঁচলটা অতিরিক্ত ভারী লাগছে।

গিন্নিমা, স্বাভাবিকভাবেই, প্রথমে ভাবলেন হয়তো কোনো চেয়ার-টেবিলের বা ছিটকিনির সঙ্গে আঁচলটা আটকিয়ে গেছে।

কিন্তু ঘটনা তা তো নয়। ততক্ষণে ঘণ্টা আঁচল বেয়ে গিন্নিমার কাঁধের ওপরে উঠে তাঁর গলাটা চুক্‌চুক্ করে চেটে দিয়ে বললো, 'মিউ-মিউ'।

গিন্নিমা জীবনে কোনোদিন খুব বেশি আঁতকিয়ে ওঠেননি, সেদিন একটু চমকিয়ে বেড়ালছানাটাকে ঘাড় থেকে নামাতে চেষ্টা করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে লাগলেন, এ রকম অসম্ভব ঘটনা এই 'দ্যাখ্-মার্' পদ্ধতির বাড়িতে কি করে সম্ভব!

বেড়ালছানাটা তাঁর বাঁ কাঁধে উঠেছিলো, তিনি তাঁর ডান হাতের ঝটকা মেরে তাকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। বেড়ালছানাটা শাড়ির আঁচলটা দু'ফালা করে ছিঁড়ে তাঁর কোমরের কাছে পড়লো।

প্রথমে তো গিন্নিমা বুঝতে পারেননি যে এটা একটা বেড়ালছানা। তিনি রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, ভেবেছিলেন কোনো ছুঁচো-টুঁচো হয়তো হবে, পর্দা বেয়ে উঠে পড়েছিলো। তারপর যখন টের পেলেন, এটা একটা বেড়ালছানা, তখন তো আরো অবাক হয়ে গেলেন।

সেদিন বিকেলে চাঁদনিদের বাসায় সাংঘাতিক ব্যাপার। গিন্নিমা ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করেছেন। গঙ্গামণি, চাঁদনির মা, চাঁদনির বাপ-ঠাকুরদা, বলা চলে চাঁদনি ছাড়া বাড়ির আর সকলে, এমনকি নতুন বেড়ালছানাটা পর্যন্ত ভয়ে সিঁটকিয়ে গেলো।

শুধু চাঁদনি জিজ্ঞাসা করলো, 'ঠাকুমা, সবাই দেখেছে, আর এই বেড়াল-ছানাটাকে তুমি আগে দ্যাখোনি?'

ঠাকুমা এই প্রশ্নে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি ভয়ংকর কিছু একটা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বেড়ালছানাটা কিছু বুঝে কিংবা কিছুই না বুঝে তখন তাঁর পায়ে মাথা ঘষছে, আর ছোট রেডিয়োর মতো গরর-গর-গররগর করছে।

সবাই ভয় পাচ্ছিলো, এইবার বুঝি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হতে চলেছে। কিন্তু ঐটুকু ছোট একটা বাঘের মতো ডোরাকাটা বেড়ালছানা তাঁর পায়ে মাথা ঘষছে দেখে গিন্নিমা কেমন যেন নিবে গেলেন।

সেই থেকে বেড়ালের বাচ্চাটা গিন্নিমার পায়ে পায়ে। এমনকি গিন্নিমা যখন পুজো করতে বসেন তখন পর্যন্ত গিন্নিমার পাশে গিয়ে বসে থাকে।

এদিকে মা-বেড়ালটি পালিয়েছে। শুধু পালায়নি, যাকে বলে নিরুদ্দেশ ঠিক তাই। তাকে এ তল্লাটে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

গিন্নিমার নির্দেশে চাঁদনি আর গঙ্গা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলো, যদি খুঁজে পাওয়া যায় তবে তার কোলে বাচ্চাটাকে তুলে দিয়ে গিন্নিমা নিষ্কৃতি চান।

কিন্তু মা-বেড়ালের দেখা মিললো না। এদিকে গিন্নিমার পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগলো বাঘ-বাঘ ডোরাকাটা বাচ্চা বেড়ালটা।

দ্বিতীয় দিনের মাথায় পুজোর ঘরে গিন্নিমার পাশে গিয়ে বসলো সরল বেড়ালশাবকটি। ঝিম মেরে বসে গিন্নিমার পূজা-প্রকরণ দেখতে দেখতে সহসা গিন্নিমা যখন পুজোর পেতলের ঘণ্টাটা হাত দিয়ে আন্দোলিত করছিলেন, বেড়ালছানাটা লাফিয়ে উঠে গিন্নিমার হাতের ঘণ্টাটা আক্রমণ করলো।

এ বাড়ির গিন্নিমা পুজো-আর্চার ব্যাপারে খুবই সাত্ত্বিক। গরদের শাড়ি পরে ধূপ-চন্দন, দূর্বা-ঘাস, বেলপাতা, তুলসীপাতা, আমের পল্লব এই সব সমেত পুজোর ঘরে তাঁর সকালবেলার দু'ঘণ্টা কাটে। এর মধ্যে শাঁখ বাজান, ঘণ্টা বাজান।

এদিন ঐ ঘণ্টা বাজানোর সময়েই বাধা পড়লো। অবোধ বেড়ালশিশুটি ঘণ্টার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিন্নিমার হাত থেকে ঘণ্টা ছিটকিয়ে পড়ে গেলো।

ঠিক সেই সময়ে গঙ্গামণি বারান্দা

মুছছিলো। সে বারান্দা থেকে এই দৃশ্যটা দেখে থমকিয়ে গিয়েছিলো এই ভেবে যে, আজ কি অনর্থটাই না হবে।

কিন্তু গঙ্গামণি অবাক হয়ে দেখলো যে কিছুই হলো না, গিন্নিমা আলতো করে চাপড় দিয়ে বেড়ালছানাটাকে সরিয়ে দিয়ে ঘণ্টাটা কুড়িয়ে নিলেন, তারপর পুজোর প্রসাদের থেকে একটা সাদা বাতাসা তুলে নিয়ে বেড়ালছানাটার মুখের সামনে তুলে ধরলেন, 'এই ঘণ্টা, নে খা।' সেই থেকে বেড়ালছানাটার নাম হয়ে গেলো ঘণ্টা। আর সেই থেকে প্রবল পরাক্রমে ঘণ্টা এ বাড়িতে রাজত্ব করছে। এ বাড়ির গিন্নিমা যদি মহারানী হন, ঘণ্টা হলো রাজকুমার।

বাইরের কোনো লোক আত্মীয়স্বজন বা পুরনো বন্ধুবান্ধব কেউ চাঁদনিদের বাড়িতে এলে অবাক হয় ঘণ্টাকে দেখেন। কারণ তাঁরা সবাই জানেন এ বাড়ির গিন্নিমার কুকুর-বিড়াল সম্পর্কে 'দ্যাখ্-মার্' পদ্ধতি।

এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করলে ঘণ্টাকে নিয়ে একটু অস্বস্তিতে পড়েন

যা ভাবছো, তা নয়।

তিনি, মুখে বলেন, 'যা ভাবছো, তা নয়। এ বেড়ালটা আমাদের নয়, আমাদের বাড়ির বেড়াল নয় এটা। হঠাৎ এসে গেছে।'

ঘণ্টা সেই সময়ে অবাক হয়ে গিন্নিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব বিস্মিত সেই দৃষ্টি।

গিন্নিমা টের পান, ঘণ্টা মনে মনে বলছে, 'এসব কি কথা! আমি এই বাড়িতে জন্মালাম, এই বাড়িতে আমার চোখ ফুটলো, আমি বড় হলাম। এ বাড়িতে আমি খাইদাই, থাকি। এ বাড়ির ইঁদুর মারি, আরশোলা তাড়াই। এ বাড়ির পুজোর প্রসাদ বিদকুটে সাদা বাতাসা সোনামুখ করে খাই। আমি এ বাড়ির বেড়াল নই! আশ্চর্য!'

গিন্নিমা ঘণ্টার মনের কথা টের পাওয়ায় নিজের কথা একটু ঘুরিয়ে নেন, 'অবলা আমাদের এই বেড়াল ঘণ্টাকে আমরা বেড়াল বলে মনে করি না। আমরা ওকে বাড়ির একজন বলেই ভাবি।'

গিন্নিমা এ কথা বলা মাত্র ঘণ্টা সেই প্রথম দিনের মতো গিন্নিমার পায়ে মাথা ঘষতে ঘষতে রেডিয়োর মতো গরর-গর, গরর-গর করতে থাকে।

ছবি : সুফি

আজব খবর

বরুণ মজুমদার

কুমীরের পেটে

সেই ভয়ংকর ঝড়ের কথা শুনলে অনেকে আঁৎকে উঠবে। ১৭৩৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর খাস কলকাতার ওপর দিয়ে বয়ে যায় এক প্রলয়ংকারী ঝড়। তার দাপটে বহু পাকা বাড়ি ধসে পড়ে। বড় বড় গাছপালা উপড়ে ধরাশায়ী। গঙ্গার বুকে ছোটবড় মিলিয়ে ২৯টা জাহাজ ছিল। ২৮টা জাহাজেরই সলিল সমাধি ঘটে। রক্ষা পায় ডিউক অফ ডর্সেট নামে শুধু একটি মাত্র জাহাজ। তবে তার অবস্থাও হয় শোচনীয়। ঝড়ে গঙ্গার জল প্রায় পনেরো ইঞ্চি বেড়ে উঠেছিল।

ঝড় থামার পরের দিন জাহাজ থেকে মালপত্র উদ্ধারের কাজ চলছিল। জাহাজটির বেশির ভাগ অংশ জলের নিচে ডুবে ছিল। একটা লোককে মাল উদ্ধারের জন্য নিচের ডেকে নামিয়ে দেওয়া হলো। অনেকক্ষণ কেটে গেল, লোকটা আর ওপরে ওঠে না। জাহাজের ক্যাপ্টেন ভাবলেন—কোনো কারণে আটকে পড়েছে। তাই আর একজনকে তার খোঁজে পাঠানো হলো। কিন্তু সে লোকটাও যে ফেরে না! শেষ পর্যন্ত সাহেব ক্যাপ্টেন বেশ কয়েকজনকে আলো নিয়ে ডেকে নামতে বললেন। তারা কিছুটা নেমেই ভয়ে শিউরে উঠলো। দেখলে জাহাজের ডেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রায় বারো ফুট লম্বা একটা বিরাট কুমীর। নিচে নামা তো দূরের কথা, তারা তাড়াহুড়ো করে ওপরে এসে খবরটা ক্যাপ্টেনকে জানালো। ক্যাপ্টেন প্রমাদ গুনলেন। আগের লোক দুটোর পরিণতি সম্পর্কে তাঁর আর কোনো সন্দেহ রইলো না। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক নিয়ে তিনি ছুটে গেলেন। গুলি চালালেন কুমীরের চোখ লক্ষ্য করে। আহত কুমীর রাগে গরগর করতে করতে লেজের প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে জাহাজটা কাঁপিয়ে দিল। তারপর হাঁ করে গিলতে এলো ক্যাপ্টেনকে। আর একটা গুলি চালালেন ক্যাপ্টেন সাহেব কুমীরটার মুখের মধ্যে। কুমীর খতম। এত বিরাট কুমীরকে পাড়ে তোলা সম্ভব নয়, অগত্যা রামদা দিয়ে ক্যাপ্টেন কুমীরের পেট চিরে ফেললেন। আর আশ্চর্য! দেখা গেল ডেকে নামা লোক দুটো কুমীরের পেটে আস্ত রয়েছে। অবশ্য তাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত কুমীরটার আক্রমণে। সত্যি কি বিচিত্র কাণ্ড!

নীলদরিয়ার দানব

ডাঃ অরুণ কুমার দত্ত

আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তাল ঢেউয়ের মাথায় পর্তুগীজ জাহাজটা তখন মোচার খোলার মতো ভাসছে। জাহাজের নাবিকদের দিশেহারা অবস্থা। আতঙ্কিত চোখে চারপাশে তাকিয়ে এক নাবিক ভয়ে ভয়ে বলল, সেই অদৃশ্য নীল দানবটা সমুদ্রের জল থেকে উঠে এসে আমাদের আক্রমণ করছে। তার পাশে দাঁড়ানো নাবিকটি বলল, কি করে বুঝলে? আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। দাঁতে দাঁত চেপে প্রথম জন বলে, আরে দেখতে পাচ্ছ না, আমাদের জাহাজের নাবিকরা কিভাবে এক এক করে মারা পড়ছে!

ভয়ার্ত কণ্ঠে দ্বিতীয় নাবিকটি এবার মন্তব্য করল, ঠিক বলেছ। কোথাও কিছু নেই, মাঝ সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠল। আর তারপর থেকেই একে একে নাবিকরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাদের দাঁত, মুখ থেকে রক্ত ঝরছে হাত-পায়ের চামড়ার নিচে দেখা দিচ্ছে রক্তের চাকা। ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে তারা মারা পড়ছে। এ নিশ্চয় কোনো অদৃশ্য দানবের কারসাজি। প্রথম নাবিকটি ত্রস্তে চাপা গলায় বলল, চুপ...চুপ...ক্যাপ্টেন শুনতে পেলে রাগ করবেন। উনি আবার নীল দানব-টানবে মোটেই বিশ্বাস করেন না।

কয়েকদিন পর। সমুদ্র তখন শান্ত। এমন সময় দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠ গঠন, পাকানো গোঁফ, চাপ দাড়ি জাহাজের ক্যাপ্টেন ভাসকোডাগামা নাবিকদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। সকলকে উৎসাহিত করে সোল্লাসে ঘোষণা করলেন, আর কোনো ভয় নেই। ঝড় থেমে গেছে। সমুদ্রও এখন শান্ত। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণতম বিন্দুতে এসে পৌঁছেছি। এবার আমাদের জাহাজগুলো তীরে ভেড়াও। এই অন্তরীপটার নাম হোক কেপ অফ গুড হোপ। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই। আমরা ঠিক ইন্ডিয়ায় পৌঁছতে পারব।

১৪৯৭ সালে গোটা কয়েক জাহাজ ও ১৬০ জন নাবিক নিয়ে ভাসকোডাগামা দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে, ভারত মহাসাগর হয়ে বর্তমান কেরালা রাজ্যের কালিকটে এসে পৌঁছন। এই দুঃসাহসিক অভিযানে তাঁর দলের ১৬০ জনের মধ্যে ১০০ জন নাবিকই মারা যায়।

সেসময় সমুদ্রপথে দীর্ঘদিন ঘুরলে নাবিকরা এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়ত। তাদের মাড়ি ফুলে গিয়ে রক্ত পড়ত। দাঁতের ভেতর দিয়ে মাড়ি ঝুলে পড়ত। হাত-পায়ের চামড়ার নিচে রক্তস্ফোটক দেখা দিত। নিস্তেজ অবসন্ন নাবিকদের হৃদ্‌পিণ্ড বিকল হয়ে যেত। তারা মারা পড়ত।

এই রোগটার নাম ছিল স্কার্ভি। তখন কিন্তু এই রোগের কথা সভ্য দুনিয়ার জানা ছিল না। আর রোগটা কি বা সেটা কেন হয় তার কারণ জানা না থাকলে, রোগের চিকিৎসা ও তার প্রতিকার করাও সম্ভব নয়। সেজন্যে অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত নাবিকদের মনে ধারণা জন্মেছিল, মাঝ সমুদ্রের কোনো অদৃশ্য দানবের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে।

১৭৫৩ সালে স্কটিশ নৌসার্জেন ডাঃ লিন্ড সর্বপ্রথম এই রোগের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পান। তাঁর লিখিত বিবরণ থেকে জানা গিয়েছিল, মাঝ সমুদ্রে গেলে বা দীর্ঘদিন সমুদ্রবক্ষে থাকলে এই রোগ আত্মপ্রকাশ করে। ডাঃ লিন্ড দেখিয়েছিলেন, নাবিকদের যদি কাঁচা শাকসব্জি ও ফলের রস খাওয়ানো যায়—তাহলে স্কার্ভি রোগ হয় না। তিনি বুঝেছিলেন, এই রসালো ফল ও সবুজ পাতার ভেতরে এমন কোনো বস্তু আছে যা স্কার্ভিরোগ প্রতিহত করে। তবে সে বিশেষ বস্তুটি যে কি তা কিন্তু ডাঃ লিন্ড ধরতে পারেননি। যাই হোক তিনি ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ জানালেন তাদের জাহাজ তটভূমিতে এলেই যেন নাবিকদের বাধ্যতামূলকভাবে কাঁচা শাকসব্জি ও রসালো ফল খাওয়ানো হয়। ডাঃ লিন্ডের নির্দেশ মেনে দেখা গেল বৃটিশ নাবিকদের আর স্কার্ভিরোগ হয় না। ফলে ব্রিটিশ নৌশক্তি সেকালে অজেয় বলে চিহ্নিত হয়েছিল।

১৭৭২ থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় সামুদ্রিক অভিযান চালিয়ে ক্যাপ্টেন কুক্ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড আবিষ্কার করেন। সমুদ্রবক্ষে এতদিন একনাগাড়ে কাটাবার পরেও ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজের নাবিকেরা কেউ স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়নি। তার কারণও সেই একই। রাজাদেশ মেনে ক্যাপ্টেন কুক্ উপকূল দেখলেই তাঁর নাবিকদের শাকসব্জি ও ফলের রস খেতে বাধ্য করতেন।

সেই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মানুষদের মধ্যে ভাব ও ভাষার আদান-প্রদান ছিল না। যেজন্যে একজনের জ্ঞাত তথ্য, অন্যরা জানতে পারত না। কানাডা আবিষ্কার হবার সময় বহু শ্বেতাঙ্গ স্কার্ভিরোগে মারা যায়। অথচ সেখানে সবুজ আনারস পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। ইওরোপীয়ানরা আনারসের ব্যবহার জানত না বলে খেত না। অথচ স্থানীয় আদিম অধিবাসীরা আনারসের রস খেত বলে, তাদের কখনও স্কার্ভি হতো না।

ষোড়শ শতাব্দীর অভিযানের সময় রুশ ও সুইডিশ নাবিকরা টাটকা ফলের রস খেত। তাদের স্কার্ভি হতো না। অথচ এই ফলের রসের ভেতরে যে ভিটামিন 'সি' থাকে তা স্কার্ভিরোগ প্রতিরোধ করে; সেকথা তারা জানত না। মজার কথা, এই রাশিয়ানরাই ১৯৪৩ সালে তাদের গবেষণাগারে প্রমাণ করলেন, ফলের রস ও টাটকা শাকসব্জির ভেতরে ভিটামিন 'সি' বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড থাকে। সেই ভিটামিন স্কার্ভিরোগ প্রতিরোধ করে। এখন পৃথিবীতে স্কার্ভি-রোগ বড় একটা দেখা যায় না।

ক্ষতিপূরণ

অগ্নিমিত্র

দেউলহাটির হরেন ঘোষের বড়ো পুকুরের চার পাড় আজ ভোর থেকে লোকে লোকারণ্য। এ-বছর আজ থেকেই মাছ-ধরার টিকিট প্রথম দেওয়া হলো। গত দশ বছর যাবৎ প্রত্যেক বছরই আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সপ্তাহে একদিন করে টিকিট দেওয়া হয়। পুকুরে যথেষ্ট মাছ থাকে। যারা মাছ ধরতে আসে তাদের অনেকেই ছোটো-বড়ো মিলিয়ে কম করে পাঁচ-ছ'টা মাছ পায়। অনেকে আবার কিছুই পায় না। সব মিলিয়ে হরেন ঘোষের লাভের অঙ্ক বেশ ভালোই থাকে। প্রথম যখন টিকিট দেওয়া চালু হয় তখন টিকিটের দাম ছিল পঁচিশ টাকা। এ-বছরে একশো টাকা। তাতেও সবাইকে দেওয়া যায় না। সবগুলো পাড় মিলিয়ে মোট একশো নব্বুই জনের বসার মতো জায়গা। যাদের আসতে একটু দেরি হয়ে যায় তাদের কপালে টিকিট জোটে না। হরেন ঘোষের বড়ো পুকুরের খুব নামডাক। তাই ওই পুকুরে বসার জন্য মেছুড়ে-মহলে প্রত্যেক বছরই খুব আগ্রহ থাকে। যারা মাছ ধরে, চলতি কথায় তাদের বলে 'মেছুড়ে'।

সবাই জানে, হরেন ঘোষের ওই বড়ো পুকুরে এমন দু'টো বড়ো বড়ো কাতলা মাছ আছে যারা বঁড়শির টোপ খাবেই না। তাদের নাকে মাঝারি ধরনের একটা করে সোনার নথ পরানো আছে। তাদের দু'জনের দুটো নামও আছে—কমল আর কম্‌লি। হরেন ঘোষের একমাত্র মেয়ে নিরুপমার পাঁচ বছর বয়সের সময় একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাছ দু'টোকে পুকুরে ছাড়া হয়েছিল। গ্রামের এক নামজাদা গুণীন সাধুচরণ মাছ দুটোকে মন্ত্র পড়ে 'বাঁধন' দিয়ে দিয়েছিল—ওরা আর যাই খাক, বঁড়শির টোপ কখনোই মুখে নেবে না। সত্যিই যেন তাই। এতদিন ধরে প্রতি বছর টিকিট দেওয়া হচ্ছে কিন্তু কমল-কম্‌লিকে কেউ কখনো ছিপে গাঁথতে পারেনি। হরেন ঘোষও নিশ্চিন্ত, নিরুপমাও খুশি। তার সঙ্গে মাছ দুটোর খুব ভাব। সে পুকুরপাড়ে এসে একটা বিশেষ সুরে 'আয় কমল—আয় কম্‌লি' বলে ডাকলে মাছ দুটো পুকুরের যেখানেই থাক, সেখান থেকেই ঘাটের কাছে চলে আসে। নিরুপমা তাদের এটা-সেটা খেতে দেয়। তাদের সঙ্গে কত কথা বলে।

জলের মাছ কমল আর কম্‌লি কথা বলতে না পারলেও নিরুপমার কথাও যেন বুঝতে পারে, আদরও বুঝতে পারে। নিরুপমার পাঁচ বছর বয়সে মাছ দুটোকে পুকুরে ছাড়া হয়েছিল। এখন তার বয়স সতেরো বছর। এর ভেতর বারোটা বছর কেটে গেছে।

আজ যাঁরা মাছ ধরতে বসেছেন, তাঁদের ভেতর এ-তল্লাটের সেরা মেছুড়েদের অন্যতম জয়কৃষ্ণ মিত্তিরও আছেন। এক ডাকে তাঁকে সবাই চেনে। দেউলহাটি থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরে কাঁটালগাছি গ্রামে তাঁর বাড়ি। মাছ ধরে বেড়ানোই তাঁর সবচেয়ে বড়ো নেশা। তিনি মাছ ধরতে হরিপাল, নালিকুল, ভাণ্ডারহাটি ইত্যাদি জায়গায় বেশির ভাগই বালিখাদে যান, কিন্তু বাড়ির এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও হরেন ঘোষের পুকুরে কোনোদিন বসেননি। এবারে কী মনে করে তিনি এখানে এসেছেন।

সকাল ছ'টা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত সময় বরাদ্দ। তার ভেতর যে যত মাছ ধরতে পারো ধরে নাও। নানারকম চারের গন্ধে পুকুরের আশ-পাশ ম-ম করছে। কিছু কিছু মাছও ধরা পড়েছে। এখন সবে বেলা এগারোটা। এর পর বিকেল ছ'টা পর্যন্ত সময় তো পড়েই আছে। যারা মাছ ধরে তাদের হুঁশই থাকে না, রোদ কত চড়া কিংবা বৃষ্টি হলে কত জোরে হচ্ছে। সবায়েরই চোখ রয়েছে জলের ভেতর আধাআধি ডুবে-থাকা ফাৎনার ওপর। কখন ফাৎনা নড়বে! টুপ্‌ টুপ্‌ করে হঠাৎ ডুবে গেলেই রুই কিংবা মৃগেল। আর টিপ্‌ টিপ্‌ করে একটু নড়েচড়ে হঠাৎ ভেসে গেলেই নির্ঘাৎ কাতলা। অবশ্য কোনো কোনো সময় কাতলাও ফাৎনা ডুবিয়ে দেয়। যারা ওস্তাদ মেছুড়ে তারাই কেবল সেটা বুঝতে পারে।

অনেকেই দু'চারটে রুই, মৃগেল, কালবোস বা ছোটো কাতলা ধরে ফেলেছে। কিন্তু জয়কেষ্ট মিত্তিরের মতো ডাকসাইটে মেছুড়ে চুপচাপ বসে আছেন। একটা মাছও বউনি হয়নি। তাঁর দুজন শাগরেদ গোপাল আর জনার্দন একেবারে মনমরা হয়ে পড়েছে। তাদের বাবুর এত নামডাক আজ বোধহয় গেল!

সাড়ে এগারোটা নাগাদ জয়কেষ্ট হঠাৎ তাঁর ছিপ তুলে টান মারলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কোঁ কোঁ করে হুইলের শব্দ। দেখতে দেখতে নাইলনের সুতো পুকুরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটে চললো। রুই, মৃগেল হলে সুতো পুকুরের একবার এদিক, একবার ওদিক করতো। একমাত্র কাতলাই জলের খুব গভীরে না গিয়ে এইভাবে একমুখো ছুটে যায়। জয়কেষ্ট মিত্তিরের হুইলের ওই শব্দ আর সুতোর ওইরকম গতি দেখে অন্য সবাই নিজের ফাৎনা ছেড়ে তাঁর সুতোর দিকেই তাকিয়ে রইলো। মিত্তিরমশাই যে খুব বড়ো ধরনের কাতলা গেঁথেছেন তাতে সন্দেহ নেই। খবর পেয়ে বুক টিপ্‌ টিপ্‌ করতে করতে ছুটে এলেন হরেন ঘোষ। পুকুর থেকে বাড়ি বেশি দূরে নয়। নিরুপমাও পাগলের মতো ছুটে এলো পুকুরপাড়ে।

জয়কেষ্ট মিত্তির তখন মাছটাকে খেলাচ্ছেন। খেলানো মানে মাছের টান বুঝে দরকারমতো সুতো ছাড়া আর তারপর মাছকে নিস্তেজ করবার জন্য একটু একটু করে হুইলে জড়িয়ে গোটানো। আবার ছাড়া, আবার গোটানো। এমনি করে মাছকে একেবারে নিস্তেজ করে নেওয়ার পর কিনারে এনে হাতলওয়ালা একরকম গোল জাল দিয়ে মাছকে ডাঙায় তোলা হয়। সেই গোল জালটাকে ইংরিজিতে বলে 'ল্যান্ডিং নেট'।

জয়কেষ্ট তাঁর কাজ করে চলেছেন। হরেন ঘোষ ধরা গলায় বললেন, দোহাই মিত্তিরমশাই, এ-মাছ যদি আমার মেয়ের কমল-কম্‌লির কেউ হয় তাহলে দয়া করে ছেড়ে দিন! আপনি একশো টাকার টিকিট কিনেছেন, আমি আপনাকে পাঁচশো টাকা ক্ষতিপূরণ দেবো!

জয়কেষ্টর মন তাঁর ছিপের দিকে। ছিপের ডগা একেবারে ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। মাছ আরো সুতো নিচ্ছে। সেই টানটা সামনে পেছনদিকে না তাকিয়ে জয়কেষ্ট বললেন, টিকিট যখন দিয়েছেন তখন কি শর্ত করে নিয়েছিলেন যে, 'আপনাদের পোষা মাছ ধরা পড়লে তাকে ছেড়ে দিতে হবে?

করুণ স্বরে হরেন ঘোষ বললেন, আজ্ঞে না। কিন্তু আমি তো কথা দিচ্ছি, আপনাকে পাঁচশো টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী আছি!

—দেখুন মশাই, আমি মাছ ধরতে এসেছি, ক্ষতিপূরণ নিতে আসিনি।

হরেন ঘোষের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে নিরুপমা। স্থান-কাল ভুলে সে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো।

জয়কেষ্ট ছিপে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছে কে? আপনার মেয়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর পাঁচ বছর বয়সের সময় কমল-কম্‌লিকে ছাড়া হয়েছিল। আমার এই মেয়ে নিরুর সঙ্গে ওদের খুব ভাব। ওরা কেউ চলে গেলে মা আমার—

বাকিটুকু আর বলতে পারলেন না হরেন ঘোষ। তাঁরও গলার স্বর আর যেন বেরোচ্ছে না। একটু পরে অনেক কষ্টে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি বললেন, ক্ষতিপূরণ বাবদ আমি না হয় এক হাজার টাকা দেবো। আপনি দয়া করে ওকে ছেড়ে দিন!

জয়কেষ্ট ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, থামুন দিকি মশাই! কে চায় আপনার ক্ষতিপূরণ? এখন দয়া করে আমি যা করছি আমাকে করতে দিন!

হরেন ঘোষ ভয়ে ভয়ে থেমে গেলেন। কেবল নিরুপমার কান্না আর থামে না।

অত বড়ো দীঘির মতো বড়ো পুকুরের চারপাশে মেছুড়ে ছাড়াও তাদের সঙ্গী অতগুলো মানুষ একেবারে বোবা। সবাই গোল চোখ করে জয়কেষ্ট মিত্তিরের মাছ খেলানো দেখেছে। কারো ছিপে খুব বড়ো মাছ গেঁথে গেলে পাছে অন্য কারো ছিপের সুতোর সঙ্গে জড়িয়ে মাছ ছুটে যায়, এই কারণে কাছাকাছি যারা ছিপ ফেলে বসে আছে তারা নিজেদের ছিপ গুটিয়ে নেয়। এইটেই মেছুড়েদের দস্তুর। সেইমতো সবাই আগেই নিজের ছিপ গুটিয়ে নিয়েছে।

বেলা প্রায় দুটোর সময় মাছকে পাড়ের কাছে এনে ফেললেন জয়কেষ্ট। ছিপের ডগা বেঁকে প্রায় ভেঙে যাওয়ার মতো কিন্তু ভাঙছে না। জয়কেষ্ট তাঁর শাগরেদ গোপাল আর জনার্দনকে বললেন, ল্যান্ডিং নেটের ভেতর এ-মাছের মাথা ঢুকবে না। ওপাশ থেকে নকুল দাসকে ডেকে দিয়ে

তোরা দু'জন গামছা নিয়ে জলে নেমে যা। খুব সাবধান! মাছের গায়ে যেন চোট না লাগে!

নকুল দাসও নামকরা ওস্তাদ মেছুড়ে। সে আসতেই তার হাতে ছিপ দিয়ে খুব চট্‌পট্ সরঞ্জামের কৌটো থেকে ছোট্ট লোহার কী যেন একটা যন্ত্র বের করলেন জয়কেষ্ট। নিরুপমার উদ্দেশে বললেন, নেমে এসো তো মা! দ্যাখো, এটা তোমার সেই কমল বা কম্‌লির একটা কিনা?

নিরুপমা পাগলের মতো পুকুরের ঢাল বেয়ে নেমে এসে গামছার ভেতর মাছটাকে দেখে আবার ডুকরে কেঁদে উঠলো, এ তো আমার কম্‌লি! ওই নাকে শ্যাওলা-ঢাকা নথ দেখা যাচ্ছে! ওকে ছেড়ে দিন! আপনার পায়ে পড়ি, ওকে ছেড়ে দিন!

কাঁদতে কাঁদতে কথাটুকু বলেই জয়কেষ্ট মিত্তিরের পায়ের কাছে কাদার ভেতর লুটিয়ে পড়লো নিরুপমা। জয়কেষ্টও ততক্ষণে দেখে নিয়েছেন, মাছটার নাকে শ্যাওলা-ঢাকা সোনার নথের একটা জায়গায় চিক্‌চিক্ করছে। জয়কেষ্ট জলের ভেতর নেমে গেলেন। হাতের ছোট্ট যন্ত্র দিয়ে মাছের মুখে আটকে-থাকা বঁড়শিটা কুট্ করে কেটে দিয়ে নকুলের উদ্দেশে বললেন, সুতো টেনে নে! জনার্দন, গোপাল, গামছা ঢিলে দে, ও চলে যাক্।

ছাড়া পেয়েই এক ঝট্‌কায় জল ঘুলিয়ে দিয়ে কম্‌লি গভীর জলে চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে জয়কেষ্ট হরেন ঘোষের উদ্দেশে বললেন, দেখলেন তো ঘোষমশাই, কোনো গুণীনের সাধ্যি নেই যে, জয়কেষ্ট মিত্তিরের চার থেকে মাছকে 'বন্ধন' দিয়ে দূরে রাখতে পারে?

হরেন ঘোষ ম্লানস্বরে বললেন, তাই তো দেখছি।

জয়কেষ্ট বললেন, আর বসবো না, এবারে উঠবো। আমার ক্ষতিপূরণ যা নেবার তা আপনার বাড়িতে বসেই নেবো। মেয়েকে নিয়ে বাড়ি যান। মা, তুমি এবার খুশি তো?

চোখের জল মুছতে মুছতে হেসে নিরুপমা বললে, ভগবান আপনার খুব ভালো করবেন!

জয়কেষ্ট বললেন, এই মাকে আমার চাই

—দেখা যাক্!—বললেন জয়কেষ্ট, শোনো মা, আমার সঙ্গে ফ্লাস্কে চা আছে। তবে সে চা আর খেতে ইচ্ছে করছে না। ভাবছি, তোমাদের বাড়িতে গিয়ে তোমার হাতে এক কাপ চা খেয়ে তারপর তোমার বাবার সঙ্গে ক্ষতিপূরণ নিয়ে বোঝাপড়া করবো।

নিরুপমা খুব খুশিমুখে বললে, বেশ তো চলুন!

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হরেন ঘোষ বাড়ির দিকে রওনা হলেন। জয়কেষ্ট গোপালকে চাপাস্বরে কী যেন বললেন। মাথা নেড়ে সাইকেলে চেপে গোপাল তখুনি রওনা হলো।

বিকেল পড়ে এসেছে।

হরেন ঘোষের দাওয়ায় বসে গল্পগুজব চলছে। জয়কেষ্ট তাঁর মাছ-ধরার বিভিন্ন কাহিনী বলছেন। একটু পরেই ঘর্মাক্ত কলেবরে এসে সাইকেল থেকে নামলো গোপাল। কাগজে মোড়া কী একটা জিনিস জয়কেষ্টর হাতে দিয়ে সে বললে, এ-মাসের দশ, আঠারো, উনতিরিশ আর তিরিশ।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। ও ঘোষমশাই!

—আজ্ঞে বলুন!—শুকনো গলায় বললেন হরেন ঘোষ।

—এইবার যে ক্ষতিপূরণটা দিতে হয়!

—এক হাজার দিলেই হবে তো মিত্তিরমশাই?

—উঁহু, অত কমে হবে না। তার চেয়ে অনেক বেশি!—মুচকি হেসে বললেন জয়কেষ্ট।

ঢোঁক গিলে হরেন ঘোষ বললেন, কত?

জয়কেষ্ট প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, এই মাকে আমার চাই! যে-মেয়ের বুকে জলের মাছের জন্যেও এত দরদ তার হৃদয়টা যে কত বড়ো তা তো আমি ভেবেই পাচ্ছি না! আপনার ভয় নেই, আমার ছোটো ছেলেটা এ-বছর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, তার জন্যেই নিরু-মাকে আমি চাইছি।—কথাটা বলে গোপালের এনে দেওয়া জিনিসটার কাগজের মোড়ক খুলে একটা গয়নার বাক্স বের করলেন জয়কেষ্ট। দরজার পাশে মা, কাকিমা আর বৌদির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল নিরুপমা। তাকে ডেকে বললেন, এসো তো মা, আশীর্বাদটা আজই সেরে যাই। ঘোষমশাই, গোপালের মুখে শুনলেন তো, এ-মাসে মানে এই আষাঢ়ে দশ, আঠারো, উনতিরিশ আর তিরিশ তারিখে বিয়ের লগনসা আছে। আমাদের গাঁয়ের চক্কোত্তিমশায়ের কাছে জেনে এলো গোপাল। আজ পাঁচ তারিখ। দশ কিংবা আঠারোতে বোধহয় অসুবিধে হবে। শেষের তারিখটাতেও যাওয়া উচিত হবে না। তাহলে ওই উনতিরিশ তারিখই ঠিক হলো? ওইদিনেই বিয়ে হবে!

বাড়ির মহিলারা হতবাক্। হরেন ঘোষের চোখে জল। নিরুপমার গলায় একটা হার পরিয়ে দিয়ে জয়কেষ্ট বললেন, চাও তো আমার বাড়ির পুকুরেও নতুন একজোড়া কমল-কম্‌লি পুষতে পারবে মা!

ছবি: সরোজ সরকার

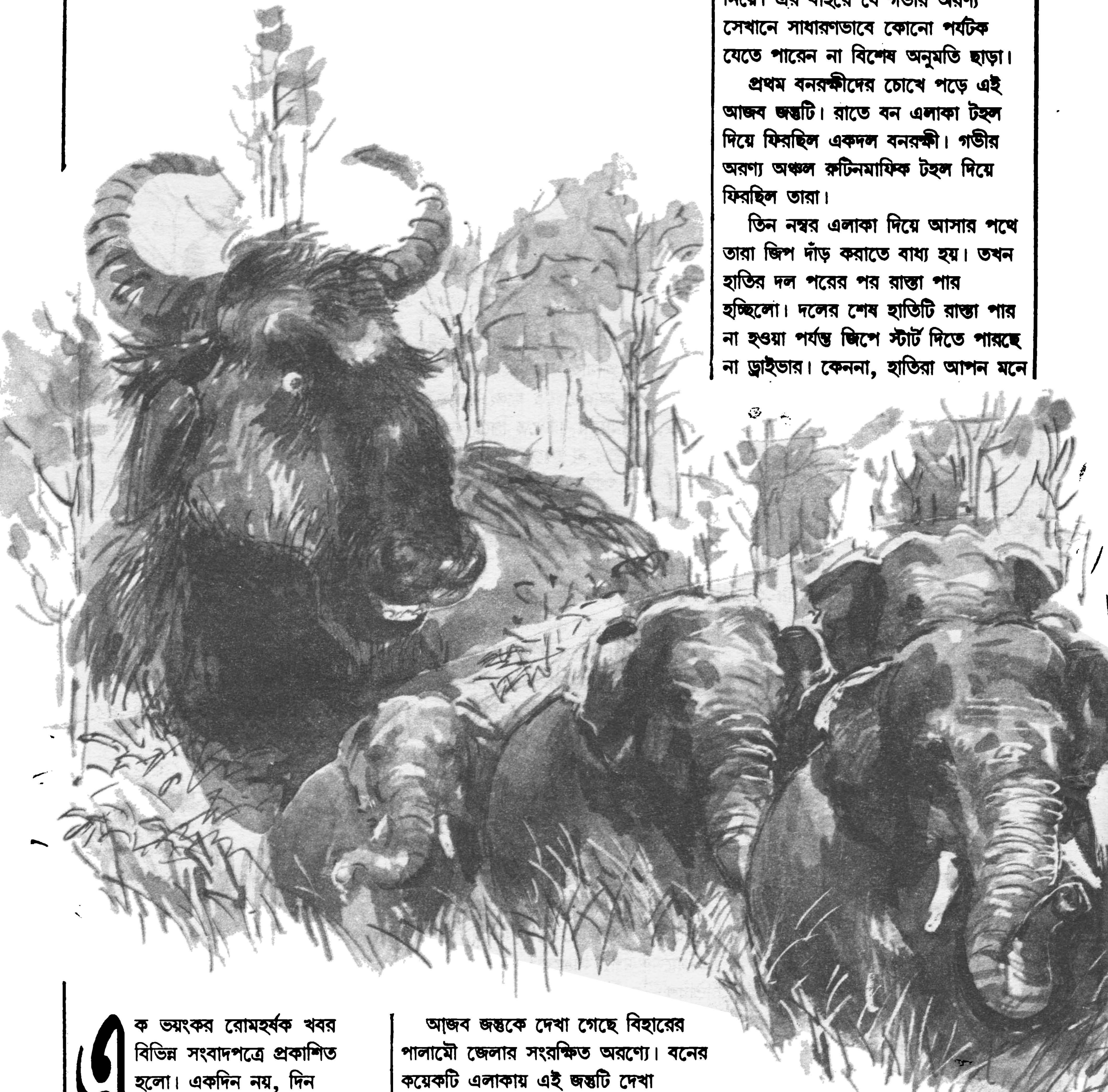

এক ভয়ংকর রোমহর্ষক খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। একদিন নয়, দিন পনেরোর মধ্যে বার পাঁচেক একই ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে।

খবর এক আজব জন্তুকে নিয়ে। যে ধরনের জন্তুর কথা কখনো শোনা যায়নি। কোনো বইপত্তরেও এমন আজব জীবের বর্ণনা পাওয়া যায়নি।

আজব জন্তুকে দেখা গেছে বিহারের পালামৌ জেলার সংরক্ষিত অরণ্যে। বনের কয়েকটি এলাকায় এই জন্তুটি দেখা গেছে। এই আজব জীবটিকে দেখতে নাকি কতকটা বাইসনের মতো।

প্রথম চোখে পড়ে বেতলার সংরক্ষিত বনাঞ্চলের তিন নম্বর এলাকায়। এক থেকে পাঁচ নম্বর, বেতলার সংরক্ষিত বন এলাকার মধ্যে এই অঞ্চলে পর্যটকরা যাওয়া-আসা করেন বনবিভাগের অনুমতি নিয়ে। এর বাইরে যে গভীর অরণ্য সেখানে সাধারণভাবে কোনো পর্যটক যেতে পারেন না বিশেষ অনুমতি ছাড়া।

প্রথম বনরক্ষীদের চোখে পড়ে এই আজব জন্তুটি। রাতে বন এলাকা টহল দিয়ে ফিরছিল একদল বনরক্ষী। গভীর অরণ্য অঞ্চল রুটিনমাফিক টহল দিয়ে ফিরছিল তারা।

তিন নম্বর এলাকা দিয়ে আসার পথে তারা জিপ দাঁড় করাতে বাধ্য হয়। তখন হাতির দল পরের পর রাস্তা পার হচ্ছিলো। দলের শেষ হাতিটি রাস্তা পার না হওয়া পর্যন্ত জিপে স্টার্ট দিতে পারছে না ড্রাইভার। কেননা, হাতিরা আপন মনে

চলেছে। ইঞ্জিনের আওয়াজ তাদের অস্বস্তির কারণ হতে পারে। বনকর্মীরা জানে হাতিরা এমনিতে শান্ত, নিরীহ। কিন্তু অনেক সময়ে সামান্য কারণে ওরা ক্ষেপে যায়।

হাতির দল রাস্তা পার হয়ে যাবার পরই ওরা চাঁদের আলোয় দেখতে পায়, অদূরে ঝোপঝাড় নড়ছে। ঠিক সেই সময় জিপে স্টার্ট দেয় ড্রাইভার। বনরক্ষীদের চোখ ছিল অদূরের ঝোপঝাড়ের দিকে।

হঠাৎ ঝোপের মধ্যে তীব্র চোখ-ধাঁধানো আলো জ্বলে ওঠে। সে আলোয় চোখ ঝলসে যাবার যোগাড়।

যদিও সবাই বনকর্মী এবং হাতে রাইফেল আছে, তবু আচমকা ওই রকম ভয়ংকর আলো জ্বলে উঠতে সবাই কেমন ভয় পেয়ে যায়। হেডলাইট জ্বেলে হর্ন বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইসনের মতো একটি প্রাণী। যার দু-চোখ থেকে থেকে জ্বলে উঠছে, আর গায়ে জ্বলছে-নিবছে জোনাকির মতো অজস্র আলোকবিন্দু।

মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যায় এই আজব জীবটি। তারপরই আর এক দৃশ্য চোখে পড়ে। একপাল নেকড়ে রাস্তা পেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে বনের এক দিক থেকে অন্য দিকে।

বনরক্ষীরা সেদিন আর টহল দেয়নি। ফিরে আসে বেতলা অফিসে। রেঞ্জারবাবুকে এই আজব জীবটির খবর জানায়।

ওই রাতেই আর একটি জিপ আসছিল মদুয়াদাঁড়ের দিক থেকে। সেই জিপে ছিল

মহিষাসুর বন্দী

পরেশ ভট্টাচার্য

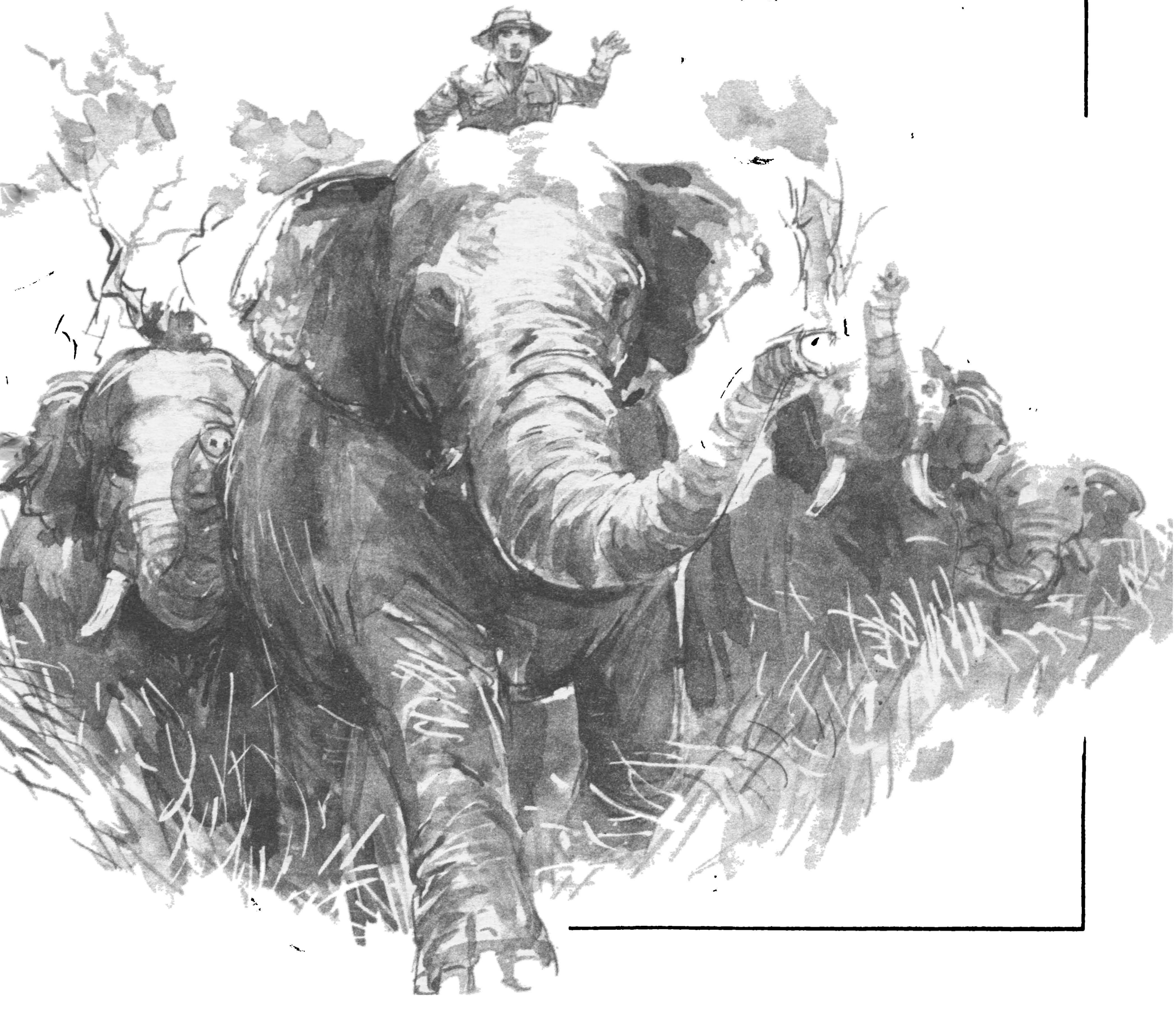

পুলিশের লোকজন। সাতনদীয়ার জলধারা চলে গেছে সড়কের ওপর দিয়ে।

সেইখানেই তারা দেখতে পায় জোনাকি-জ্বলা শরীর নিয়ে কোনো একটা প্রাণী ছুটে যাচ্ছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে।

এই খবর, রীতিমতো জবর খবর হয়ে ওঠে। রাঁচি এবং পাটনা থেকে প্রকাশিত প্রতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বন এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

বেতলার সংরক্ষিত অরণ্যে এর পরেও দেখা গেছে আজব প্রাণীটিকে। এক জায়গায় নয়, বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু এই রহস্যময় জীবটি কি, আজও তা জানা যায়নি। এই রহস্যময় জন্তুটি হিংস্র কি হিংস্র নয়, তা-ও বোঝা যায়নি।

এইখানেই খবর শেষ নয়। আরো খবর বেরুলো, এবং ফলাও করে—বেতলার কাছাকাছি শুকাবাঁধ এলাকায় রহস্যময় এক জন্তুর আক্রমণে দুই বনকর্মী গুরুতর আহত।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে বনবিভাগের টহলদারি জিপ যাচ্ছিলো বনের ভিতরকার পাকা সড়কের ওপর দিয়ে। অরণ্যের গভীর দিয়ে ছিল পথ। আর এ এলাকা রীতিমতো সংরক্ষিত। পর্যটকরা কোনো সময়ে অনুমতি পান না অরণ্যের এই এলাকায় আসার।

জিপে ছিলেন বেতলার রেঞ্জারসাহেব কেদার শর্মা এবং তিনজন সশস্ত্র বনরক্ষী। আর ড্রাইভার তো ছিলই।

বেশ দ্রুতগতিতেই জিপ ছুটছিল। পথের বাঁকে জিপ ঘুরতেই হেডলাইটের আলোয় চোখে পড়ে সড়কের ওপর একটি শিশু নেকড়ে ছটফট করছে।

জিপ দাঁড়ালো নেকড়ের সামনে। শোনা গেল মা-নেকড়ে এবং তার সঙ্গীদের আর্তকান্নার সুর।

কেদার শর্মা নেমে এলেন জিপ থেকে। সান্ত্রীরাও নামলো। চোখের সামনে ছটফট করছে নেকড়েটি।

পরিণত শিশু নেকড়ে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কেঁপে কেঁপে উঠছে আর চার পা ছুঁড়ছে।

কেদার শর্মা খুঁটিয়ে দেখলেন নেকড়েটিকে। কোথাও কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। অথচ দেখে বোঝা যাচ্ছে তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করছে নেকড়েশাবকটি।

এদিকে মা-নেকড়ের আর্তস্বর শোনা যাচ্ছে। কেদার শর্মা ভেবেই পাচ্ছেন না কি করবেন।

ভাবনার এই মুহূর্তে দেখা গেল পাশেই একটা ঝোপ নড়ছে। টর্চ হাতে একজন সান্ত্রীকে নিয়ে কেদার শর্মা এগিয়ে গেলেন। দেখলেন আরো একটি নেকড়ে দারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

নেকড়েটি মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনেই মারা গেল। মরার আগে নেকড়ের শরীরটা দারুণভাবে কেঁপে উঠেছিল।

আর ঠিক এই সময় গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে তীব্র আলোর দৃষ্টি নিয়ে সেই রহস্যময় প্রাণীটি ছুটে এলো। তীব্র সে আলো। তাকানো যায় না আলোর দিকে।

মুহূর্তে সব ওলটপালট করে দিয়ে রহস্যময় জন্তুটি জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সান্ত্রীরা রাইফেল তাক করেও গুলি চালাতে পারলো না। সেই তীব্র চোখ-ধাঁধানো আলোয় দৃষ্টি কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এসেছিল ঘটনার মুহূর্তে।

যাবার সময়ে দুজন বনকর্মীকে দারুণভাবে জখম করে গেছে শুধু নয়, নেকড়ে দুটিকেও নিয়ে গেছে।

ঘটনায় হতচকিত কেদার শর্মা এবং সান্ত্রীরা। ড্রাইভার দুখন মাহাতো তো ভয়ংকর জন্তুটিকে দেখে প্রায় মূর্ছিত হয়ে গিয়েছিল।

আহত দুই সান্ত্রীকে তো ফেলে রেখে আশেপাশে তল্লাশি চালানো যায় না। সুতরাং আহত দুই সান্ত্রীকে নিয়ে কেদার শর্মা চলে এলেন বেতলা হয়ে ডালটনগঞ্জের হাসপাতালে।

এই ঘটনার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর আতঙ্ক আরো চরমে উঠলো। আতঙ্ক শুধু বন এলাকার লাগোয়া গ্রামবাসীদের মনেই নয়, বনবিভাগের সকলের মনেও। আর বনরক্ষীরা, যাদের কাজ বনে টহল দেওয়া, তারা তো রীতিমতো আতঙ্কিত।

এই ঘটনার পর নতুন করে আর তেমন পর্যটক আসছেন না। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও চলে যাচ্ছেন। হোটেল, লজ এবং কটেজগুলি প্রায় ফাঁকা।

পালামৌ জেলার সর্বত্র আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছে।

খবরে যা জানা গেছে, তা তো জানা আছেই। এরপর রয়েছে গুজবের ব্যাপার-স্যাপার।

লোকের মুখে নানা ধরনের গুজব শোনা যাচ্ছে। এমন রটনাও শোনা যাচ্ছে, এই রহস্যময় জন্তুটি কোনো জন্তুটন্তু নয়, রাজরাপ্পার এক তান্ত্রিকের প্রেতরূপ। যে তান্ত্রিক নাকি একশো আটটি নেকড়েশাবক বলি দিয়ে মা ছিন্নমস্তাকে তৃপ্ত করতে চেয়েছিল। প্রায় সফলও হতে চলেছিল সেই তান্ত্রিকের স্বপ্ন। একশো সাতটি নেকড়েশাবক হত্যা করে তাদের রক্ত সে দিয়েছে আরাধ্যা মাকে। আর একটি নেকড়েশাবক হত্যা করা বাকি।

সর্বাঙ্গে বাঘের চামড়া পরে সেই ভয়ংকর রুচির তান্ত্রিক নাকি নেকড়ে-শাবক ধরে হত্যা করতো তার সাধন-গুহায়। রাজরাপ্পার মন্দিরে গিয়ে তো এই ধরনের বে-আইনী কাজ করা যায় না। যা কিছু করতো, সে পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে গোপন গুহায় বসে করতো।

সে তান্ত্রিকের ইচ্ছাপূরণ হয়নি। একশো আটটি নেকড়েশাবক হত্যা করা তার হলো না। শেষ নেকড়েশাবক ধরতে গিয়ে সে নিজেই প্রাণ দিল নেকড়ে দলের মুখে।

তারপর থেকেই তার প্রেতরূপ নাকি ঘুরে বেড়ায় অরণ্যে। এখন সেই প্রেতরূপ ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

জঙ্গল এলাকার লাগোয়া গ্রামের সহজ সরল মানুষের ধারণা, জঙ্গলে যা কিছু ঘটছে, তার পিছনে আছে সেই তান্ত্রিকের প্রেতরূপ।

॥ দুই ॥

চাঁইবাসা বন-বাংলোয় বসে আছেন সূরযপ্রসাদ। এখন চাঁইবাসা বন এলাকার দায়িত্বে আছেন তিনি। আছেন এক নাগাড়ে বেশ কয়েক বছর।

চাঁইবাসা এলাকা পালামৌ-এর মধ্যে না হলেও, পালামৌ বন এলাকার যোগ

রয়েছে চাঁইবাসার সঙ্গে। বলতে গেলে একই অরণ্য অঞ্চল।

আজব জন্তুটি এই এলাকাতেও আতঙ্কের ছায়াপাত ঘটিয়েছে। যদিও চাঁইবাসার কাছে-পিঠে কোথাও এই জন্তুটির আবির্ভাব ঘটেনি।

বনবাংলোর দোতলার বারান্দাটি সুরযপ্রসাদের খুবই প্রিয়। তাঁর অবসর কাটে বারান্দার দক্ষিণ কোণে।

এখন যদিও শীত, তবু কাজ না থাকলে সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা-সাড়ে দশটা পর্যন্ত বারান্দার কোণে বেতের ডেক চেয়ারটিতে বসে থাকেন। বসে বসে উপভোগ করেন অরণ্যের সৌন্দর্য। যদি অন্ধকার রাত হয়, অর্থাৎ আকাশে যদি চাঁদ না থাকে, তা-ও চেয়ে চেয়ে দেখেন অরণ্যের ছায়ারূপ।

বন আর বনচারী পশুপাখিকে যে সুরযপ্রসাদ ভালোবাসেন, এ কথা আর অজানা নেই। তাঁকে নিয়ে বহু লেখা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

বন এলাকার শত্রু যারা, সুরযপ্রসাদের নামেই তারা ভয় পায়। যারা নির্বিচারে বনের পশুপাখি হত্যা করে, তাদের কোনো সময়ে ক্ষমা করেন না সুরযপ্রসাদ। বহু কুখ্যাত অপরাধীকে শায়েস্তা করেছেন তিনি।

বনকে এমনই ভালোবেসেছেন যে, বন ছেড়ে যেতে চান না সুরযপ্রসাদ। পাছে অফিসের ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকতে হয়, তাই চাকরিতে প্রোমোশন অব্দি নেননি। সহকারী ফরেস্ট অফিসার হয়ে চাকরিতে বহাল হয়েছিলেন, এখন ফরেস্ট অফিসার হয়েই আছেন। এর চেয়ে উচ্চ পদে বসতে তিনি চান না। এই বেশ আছেন।

পালামৌ এলাকায় যা কিছু ঘটছে, সুরযপ্রসাদ তার সব খবরই রাখেন। কদিন আগে পাটনা এবং রাঁচি থেকে সাংবাদিকরা এসেছিলেন পালামৌ এলাকার ঘটনা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে। সুরযপ্রসাদ যদিও সাংবাদিকদের চা পানে আপ্যায়িত করেছিলেন, নিজে জিপ চালিয়ে বন এলাকার কিছু ঘুরিয়েও দেখিয়েছিলেন, কিন্তু ঘটনা সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করেননি।

ওকে তোমরা আমার ঘরে নিয়ে এসো।

বলেছিলেন, আমি আছি চাঁইবাসায়, পালামৌ এলাকায় কি ঘটছে আমি কি করে বলবো! আপনারাও যেমন ঘটনার কথা শুনেছেন, তেমনি আমিও।

পরে সাংবাদিকরা বলেছিলেন, আপনি বন এলাকার বহু দুশমনদের শায়েস্তা করেছেন, যদি এই ঘটনার মোকাবিলা করার জন্যে আপনাকে বেতলায় পাঠানো হয়?

সুরযপ্রসাদ হেসে বলেছিলেন, এখনো তো চাঁইবাসাতেই আছি।

সাংবাদিকরা এরপর আর কিছু জানতে চাননি।

বনবাংলোর বারান্দায় চুপচাপ বসে আছেন সুরযপ্রসাদ। তাঁর প্রিয় অ্যালসেশিয়ান টাইগার, আর এক চোখ কানা বানর বাহাদুর বারান্দার বিপরীত কোণে। টাইগার বারান্দার শিকের ফাঁকে মুখ বার করে শুয়ে আছে, আর বাহাদুর বসে আছে বারান্দার রেলিঙের ওপর।

বারান্দার কোণে বেতের ডেকচেয়ারে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে আছেন সুরযপ্রসাদ। দৃষ্টি তাঁর অদূরে টিলা পাহাড়ের দিকে। সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়।

এখনো সূর্য অস্ত যায়নি। তবে যাই যাই করছে। অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে টিলার ওপরের গাছগুলির মাথায়।

ক্লান্ত পাখিদের নীড়ে ফেরার পালা এখনো শেষ হয়নি। আকাশ সাঁতরে নীড়ের ঠিকানায় ফিরছে পাখিরা। সবচেয়ে সুন্দর লাগে সাদা বকগুলোকে দেখতে। ওরা যখন যায়, নিচু আকাশ দিয়ে দল বেঁধে যায়।

সুরযপ্রসাদের দৃষ্টি যদিও বাইরের দৃশ্যপটে, মনে মনে ভাবছেন পালামৌ এলাকার ঘটনাপ্রবাহের কথা। ভাবছেন, এত ঘটনা ঘটছে, অথচ কেন ঘটছে তা এখনো দুর্বোধ্য রয়ে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলেন

সূরযপ্রসাদ। পুরনো আমলের কাঠের সিঁড়ি, যত সাবধানেই ওঠা-নামা যাক, শব্দ হবেই।

অনেকেই বলেছে সিঁড়িটা নতুন করে তৈরি করাতে, কিংবা মেরামত করে নিতে—কিন্তু সূরযপ্রসাদ রাজী হননি। তাঁর কথা হলো, এই তো বেশ ওঠা-নামা চলছে, মিছে সরকারের খরচ বাড়িয়ে লাভ কি।

সিঁড়িতে শব্দ হতেই সূরযপ্রসাদ বুঝলেন, নিশ্চয়ই মকররাম আসছে চা নিয়ে। সন্ধ্যের ঠিক আগেই সে চা নিয়ে আসে।

মকররাম এলো চায়ের পেয়ালা হাতে। সঙ্গে কয়েকটি বিস্কুট। মকররাম আসার সঙ্গে সঙ্গে টাইগার আর বাহাদুর এলো। ওদেরও বিস্কুট চাই।

মকররামকে বন অফিসের সবাই মকরধ্বজ বলে ডাকে। মকররাম তার জন্যে রাগটাগ করে না। অফিসের সবাই তাকে ভালোবাসে।

মকরের বয়স বেশি নয়, বছর ষোলো হবে। এমনিতে শক্তসমর্থ চেহারা, কিন্তু কথা বলতে পারে না। তার জিব কাটা। কেটেছিল তার বাবা। জিব কেটে গ্রামদেবতাকে তুষ্ট করতে চেয়েছিল। কারণ, মকরের আগে তার কোনো ভাইবোন বাঁচেনি। তাই গ্রামদেবতার কাছে তার বাবা মানত করেছিল, এবারে যে সন্তান হবে, তার তিন মাস বয়স হলে জিব কেটে দেবতার পুজো দেবে। দিয়েও ছিল তাই।

এই কুকর্মের জন্যে মকররামের বাবাকে ছ' বছর জেল খাটতে হয়েছিল। মকররামেরও বাঁচার আশা ছিল না। মাস চারেক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল তাকে।

মকররামের বাবা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি আসেনি। কোথায় যায়, তা কেউই জানে না। মকররামের মা-ও হঠাৎ মারা যায়।

শিশু মকররাম তখন কি আর করবে! এক অন্ধ ভিখারির সঙ্গে ভিড়ে যায়। অন্ধের হাত ধরে সে চাঁইবাসা বাস-স্ট্যান্ডের কাছে ভিক্ষে করতো। তারপর সে অন্ধ ভিখারিও মারা যায় লরি চাপা পড়ে।

বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা ধাবায় কাজ পেয়ে যায় মকর। সেখানে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হতো তাকে। কাজে একটু এদিক- ওদিক হলে মালিক তাকে বেধড়ক মারতো। উনুন খোঁচানো গরম শিকের ছ্যাঁকাও তাকে অনেকবার সহ্য করতে হয়েছে।

কত আর সহ্য করবে মকর! শেষটা ধাবা থেকে পালিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতো।

তাকে একরকম রাস্তা থেকেই তুলে এই অফিসে নিয়ে আসেন সূরযপ্রসাদ। বছর তিনেক হলো এখানেই আছে মকর। এখানে সবাই তাকে ভালোবাসে।

কথা না বলতে পারলেও মুখে নানারকম আওয়াজ করে কথা বোঝাতে চেষ্টা করে। দু-একটা কথা অনেক সময় বোঝাও যায়।

কথা না বলতে পারলেও, লেখাপড়া না জানলেও মকররামের বুদ্ধি খুব ধারালো। তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ দেখেই তা বোঝা যায়।

চা দিয়ে চলে গেল মকররাম।

সূর্য অস্ত গেল। এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। আর ক'দিন বাদেই অমাবস্যা। চাঁদ উঠবে শেষ রাতে।

বন-অফিসের সর্বত্র আলো জ্বলে উঠলো। আলো জ্বলে উঠলো সামনে লাল কাঁকর ছড়ানো সড়ক পথে।

বন-অফিস বনের কিছুটা ভিতরে। এখান থেকে দু কিলোমিটার দূরে জাতীয় সড়ক।

সূরযপ্রসাদ এখনো পালামৌ-এর ঘটনার কথাই চিন্তা করছেন। যদিও এটা তাঁর চিন্তা না করলেও চলে।

ঘরে ফোন বেজে উঠলো। উঠে গেলেন সূরযপ্রসাদ। পাটনা থেকে সুকেশ পাশোয়ান ফোন করেছে। তাঁর পুরনো বন্ধু সুকেশ। এখন রাজ্য বন-অধিকর্তার পাটনা অফিসেই আছে।

ফোনে প্রথমেই জানালো সুকেশ, রাজ্য বনবিভাগের ওপর মহল পালামৌ জঙ্গল এলাকার স্বস্তি এবং শান্তি ফিরিয়ে আনার ভার সূরযপ্রসাদের ওপরেই দিতে চেয়েছেন। খবরটা সুকেশ আগাম জানিয়ে রাখলো, নয়তো সরকারিভাবে হয়তো কাল সকালেই চাঁইবাসা অফিসে এ খবর পৌঁছবে।

খবরটা জানিয়ে সুকেশ বললে, বন্ধু, তুমি আমাদের বনবিভাগের গর্ব। আর আমার তো বটেই।

সূরযপ্রসাদ বললেন, আরে বন্ধু, ও সব কথা রাখো। আমি কাজের দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করি এই পর্যন্ত। তারপর কেমন আছো বলো?

সুকেশ বললে, আছি এই পর্যন্ত। আমার আর থাকা-না-থাকা। একদিনের ছুটন্ত ঘোড়া আজ ক্র্যাচনির্ভর হয়ে পড়েছে। আমি কেমন আছি, এটা নাই-বা জানতে চাইলে বন্ধু। আমি ছাড়ছি।

সূরযপ্রসাদের মনটা ব্যথায় কাতর হলো। বছর দশেক আগে এক দুর্ঘটনায় সুকেশের দুটি পা জখম হয়। দুটি পা হাঁটু থেকে কেটে বাদ দিতে হয়। এখন ও কৃত্রিম পায়ে ক্র্যাচে ভর করে চলে। অথচ এই সুকেশই ছিল এক দুঃসাহসী বনকর্মী। দুজনে একযোগে বার কয়েক অভিযান চালিয়েছে।

সুকেশের কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন সূরযপ্রসাদ। হঠাৎ সচকিত হলেন টাইগারের গর্জনে।

সামনের পা দুটি বারান্দার রেলিঙের ওপর দিয়ে চিৎকার করে ডাকছে টাইগার। এমন ভঙ্গি করছে যেন লাফিয়ে নিচে পড়বে।

এবার বাইরে থেকে একটা হৈচৈ কলরবও শুনতে পেলেন সূরযপ্রসাদ। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটনা ঘটেছে। তড়িঘড়ি নেমে এলেন নিচে। তাঁর আগেভাগে ছুটলো টাইগার বন-বাংলোর গেটের দিকে। কয়েক জন সান্ত্রীও চলেছে রাইফেল হাতে।

গেটের বাইরে কয়েকজন বনরক্ষী দাঁড়িয়ে। তাদের মাঝখানে বিকটদর্শন এক মানুষ। যাকে নর-রাক্ষস বললে ভুল হয় না। লোকটি দীর্ঘকায়। মিশমিশে কালো তার গায়ের রঙ। মাথায় এক মাথা সজারুর কাঁটার মতো চুল। চোখ দুটি গোলাকার। এমনই চোখের গড়ন, মনে হবে চোখ দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

নাকটি কতকটা সিংহের নাকের মতো। কপাল প্রায় নেই। চোখের ওপর থেকে সজারুর কাঁটার মতো খাড়াখাড়া চুল গজিয়ে উঠেছে। মুখে একরাশ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আর দু পাটি দাঁত বিশ্রীভাবে বেরিয়ে আছে। দু-পাশের দুটি দাঁত অন্য দাঁতের চেয়ে বড়ো। লোকটির পরনে লাল রঙের লুঙ্গি। গায়ে ভালুকের মতো লোম। সর্বাঙ্গে লাল রঙের কম্বল জড়ানো থাকলেও গলার কাছ থেকে গায়ের লোম দেখা যাচ্ছে। লোকটির হাত-পায়ের নখ রূপকথার বনমানুষের মতো। বিকটদর্শন লোকটিকে বনরক্ষীরা বেঁধে এনেছে।

লোকটি ছটফট করছে মুক্তির জন্যে। এই বিকটদর্শন মানুষটির চোখেও জল ঝরছে। সূরযপ্রসাদের মনে হলো বনরক্ষীরা লোকটাকে মারধোর করেছে।

সূরযপ্রসাদ অবাক হয়ে গেলেন টাইগারের আচরণ দেখে। গর্জন করতে করতে সে বন-বাংলো থেকে ছুটে এসেছে। কিন্তু গেটের কাছে এসে বার কয়েক ডেকে উঠে চুপ করে গেল।

সূরযপ্রসাদ জানেন মানুষ চিনতে তাঁর ভুল হলেও টাইগারের ভুল হয় না। তবে কি এই বীভৎস কুৎসিত চেহারার মানুষটির মধ্যে একটি সুন্দর মনের মানুষ লুকিয়ে আছে! যে মানুষটিকে টাইগার দেখতে পেয়েছে!

গেটের বাইরে এলেন সূরযপ্রসাদ। টাইগারও।

আশ্চর্যভাবে চুপ করে আছে টাইগার। তবে দৃষ্টি তার লোকটির দিকে। বন-রক্ষীদের কাছে বিবরণ শুনলেন সূরযপ্রসাদ।

জঙ্গলে টহল দিতে বেরিয়েছিল বনরক্ষীরা। এবং বনবিভাগের জিপেই। রুটিনমাফিক বনরক্ষীরা যেমন বেরোয় তেমনি বেরিয়ে ছিল। জঙ্গলের যে এলাকা কালোসোনার জঙ্গল বলে চিহ্নিত, সেই এলাকাতেই এই মানুষটিকে দেখতে পায়। মানুষটি পথের ধারে ঝিরঝির ঝর্নার কাছে একটি পাথরখণ্ডের ওপর বসে বকের মাংস চিবিয়ে খাচ্ছিলো। তার দু কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল তাজা রক্ত। বকের পালকগুলো ছড়িয়ে ছিল সামনে।

ঘটনার কথা বলে বনরক্ষী মন্তব্য করলে, ও মানুষ নয় সাহেব, ও হলো নর-রাক্ষস। নয়তো কাঁচা মাংস খায়!

সূরযপ্রসাদ দেখছেন বিকৃতদর্শন মানুষটিকে। দেখছেন আর ভাবছেন, এমন কুৎসিত চেহারা মানুষের হয়! নিশ্চয়ই ও কোনো বাবা-মায়ের সন্তান। হয়তো অদৃষ্টের পরিহাসে ওর এই অবস্থা।

সূরযপ্রসাদের মনের মধ্যে কৌতূহল। জানতে ইচ্ছে করছে ওর জীবনের কথা। কিন্তু এত মানুষের মাঝখানে জানতে না চাওয়াই ভালো। কৌতূহল দমন করে রাখলেন সূরযপ্রসাদ। বনরক্ষীদের বললেন, ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও, ওকে নিয়ে এসো আমার ঘরে।

—সাহেব! বনরক্ষী কৃষ্ণ মাহাতো বললে, কি বলছেন আপনি?

—যা বলছি শোনো। সূরযপ্রসাদ বললেন, ওকে তোমরা আমার ঘরে নিয়ে এসো।

সূরযপ্রসাদের ঘর। ঘরে টাইগার আর বাহাদুরের মাঝে বসে আছে বিকৃতদর্শন লোকটি। যার নাম নরসিংহ ওঝা।

নরসিংহ বলেছে তার জীবনের করুণ

নিজে এগিয়ে গেলেন হাতির দলের কাছাকাছি

নিশ্চয়ই হাতির দল ওই দিকে গেছে।

তার রাক্ষস জীবনের সূচনা এই ভাবেই। তখন প্রায়ই এর-ওর হাঁস, মুরগি, ছাগলছানা চুরি করে খেতে আরম্ভ করলো। ধরাও পড়লো বার কয়েক। মারধোর খেল। শেষটা বাড়ি থেকে তাকে মেরেধরে তাড়িয়ে দিলে। মা সেদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আঁতুড়ঘরে কেন যে তোকে নুন খাইয়ে মারিনি!

বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়ায় নরসিংহ। কিন্তু যেখানে যায়, সেখানেই লোকে তাকে দূরদূর করে তাড়ায়। ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে মারে তার ওপর।

শেষটা মনের দুঃখে চলে যায় বনে। কিন্তু বনে কি সব সময় থাকতে পারে! সারাদিন বনে বনে ঘুরে রাতের অন্ধকারে চলে আসতো বনের লাগোয়া গ্রামে। রাত কাটাতো হাটচালায়, কিংবা পথের ধারে কোনো গাছের নিচে, কিংবা কোনো বন্ধ দোকান-টোকানের বাইরে।

এরপর ভাগ্যের চাকা তার আচমকা ঘুরে যায়। এক সার্কাস দলের লোক তাকে নিয়ে যায়। সার্কাস দলে তার পরিচয় হলো, নরসিংহ অবতার। বিজ্ঞাপনে বলা হতো, নরসিংহ অবতারের রোমহর্ষক খেলা দেখুন। নররূপী রাক্ষস নরসিংহ অবতার আপনার চোখের সামনে, কেমন করে জীবন্ত হাঁস-মুরগি খায় তা স্বচক্ষে দেখুন—ইত্যাদি আরো চটকদার কথা ব্যবহার করা হতো বিজ্ঞাপনে।

বেশ চলছিল দিন। কিন্তু সুখ তার কপালে নেই। সার্কাসে এই ধরনের খেলা দেখানোর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হলো। খবরের কাগজও লিখলো এই ধরনের নারকীয় দৃশ্য সার্কাসে দেখানো উচিত নয়।

সার্কাস থেকে চলে এলো নরসিংহ। কিন্তু কোথায় যাবে! বন এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে করতে একটি আশ্রয় খুঁজে পেল। বনের ভিতর টিলা পাহাড়ের ওপর একটি ভাঙা মন্দির ছিল। সেই মন্দির হলো নরসিংহের আশ্রয়। খেতো বনের ফলমূল, কিংবা পাখিটাখির মাংস। তেষ্টা মেটাতো পাহাড়ী ঝর্নার জলে। কাপড়চোপড় যোগাড় করতো বনের লাগোয়া কোনো গ্রামের শ্মশানে গিয়ে।

কাহিনী।

পালামৌ জেলায় ঔরঙ্গা আর কোয়েল নদী যেখানে মিশেছে, তারই কাছে কেঁচকি নামে গ্রামে বাড়ি। তাদের বাড়ির অবস্থাও খুব খারাপ ছিল না।

সে জন্ম থেকেই এই রকম কুৎসিত-দর্শন। এই চেহারার জন্যে ছোটবেলা থেকে বাড়ির সবাই তাকে দূরছাই করতো। রাক্ষসখোক্কস বলে ঠাট্টা করতো। ছোটবেলায় যেটুকু স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছে, তা তার মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে। তা-ও যেমন আর আর সন্তানেরা পায়, তেমন পায়নি।

বাড়ির বাইরে গেলেই পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওকে রাক্ষসখোক্কস বলে ঢিল ছুঁড়ে মারতো। কিংবা ওই রাক্ষস আসছে বলে ছুটে পালাতো।

ছোটবেলায় যেমন আর আর ছেলেমেয়েরা রাক্ষসখোক্কসের গল্প শুনতো, নরসিংহও তেমন শুনেছে। নিজেই নরসিংহ তার শিশুমনে ভাবতো, সত্যি কি সে রাক্ষস! আরশির সামনে দাঁড়ালে সে নিজেই প্রতিবিম্ব দেখে আঁতকে উঠতো। ভাবতো, সত্যিই তার চেহারা গল্পের রাক্ষসের মতো।

রাক্ষসেরা জীবজন্তু মেরে কাঁচা হাড়-মাস কড়মড় করে চিবিয়ে খায়। এ কথাও সে অনেক বার শুনেছে।

তখন নরসিংহের বয়স সাত-আট বছর হবে। একদিন একটা ঝিলের ধারে ঝোপের আড়ালে বসেছিল। দেখলো, অনেক হাঁস চরছে ঝিলে। হঠাৎ তার মনে হলো রাক্ষসেরা মাংস খেতে খুব ভালোবাসে।

ঝিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো নরসিংহ। ঝিলের স্থির জলে আপন ছায়া দেখে তার মনে হলো, সত্যিই সে রাক্ষস। তারপরই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি ছোট হাঁস ধরলো। ঝোপের আড়ালে এসে হাঁসটার গলা টিপে ধরলো। খানিক ছটফট করে হাঁসটা মরে গেল। তারপর হাঁসটার পালক ছাড়িয়ে হাড়, রক্ত মাংস চিবিয়ে খেতে আরম্ভ করলো। তখন তার মনে হয়েছিল, সত্যিই সে রাক্ষস—মানুষ নয়।

শ্মশানে মৃতের অনেক কাপড়চোপড়, বিছানাপত্তর পড়ে থাকে—রাতের অন্ধকারে গোপনে সে সব সংগ্রহ করে আনতো নরসিংহ। কখনো-সখনো লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো। দেখা হলে হয় সে ছুটে পালাতো, নয়তো লোকজন ভয় পেয়ে পড়ি কি মরি ছুটতো।

এমনিভাবে দুঃসহ জীবন কাটায় নরসিংহ। এক-একবার তার মনে হতো আত্মহত্যা করে। কিন্তু আত্মহত্যার পথ সে নেয়নি। শেষটা তার মনে হতো, সব মানুষ তো মানুষ হয়েই বাঁচে, সে না-হয় পশু হয়ে বাঁচবে।

জীবনের আরো অনেক কথা বলে গেল নরসিংহ। কথার শেষে আকৃতি মিশিয়ে বললে, সাহেব, আমি কি মানুষ হয়ে বাঁচতে পারি না? এই তো আপনি কুকুর বানর পুষেছেন, একজন মানুষকে কি পুষতে পারেন না?

সূরযপ্রসাদ বললেন, তুমি আমার কাছেই থাকবে নরসিংহ।

—সত্যি বলছেন!

—কেন তোমায় মিথ্যে বলবো নরসিংহ!

—জানি না সাহেব, আমি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারবো কিনা। সাহেব, আমি যখন নিজের কথা ভাবি, আমার দম আটকে আসে। ভীষণ কষ্ট হয়। দিনের পর দিন জন্তু-জানোয়ারের রাজ্যে বাস করেছি, কিন্তু সাহেব, আমার মনটা যে মানুষের মন—এই মনটা যদি মরে যেতো তাহলে বোধহয় এত কষ্ট থাকতো না।

সূরযপ্রসাদ বললেন, পুরনো কথা ভুলে যাও নরসিংহ।

নরসিংহ বললে, পুরনো কথা কি ভোলা যায়? যায় না।

সূরযপ্রসাদ এত সময় একভাবে বসে কথা বলছিলেন। এবারে উঠে দাঁড়ালেন। নরসিংহর কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, আমি যদি তোমাকে কোনো কাজে লাগাই, পারবে তো সে কাজ?

—সাহেব। নিজের বুকে চাপড় মেরে বললে, আপনার জন্যে আমি জীবন দিতেও পারবো সাহেব। এখন আর আমার কোনো দুঃখ নেই। সাহেব, আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, ভাবছি আমাকেও ভালোবাসার মতো মানুষ আছে।

দেয়ালের ঘড়িটা বেজে উঠলো। রাত দুটো বাজে।

॥ তিন ॥

সকাল সাড়ে দশটা। জরুরি বার্তা এলো বনবিভাগের রাঁচি অফিস থেকে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সূরযপ্রসাদ যেন চাঁইবাসা বন অফিসের দায়-দায়িত্ব সহকারীকে বুঝিয়ে দিয়ে ডালটনগঞ্জ অফিসে চলে আসেন।

বার্তায় শুধু এইটুকুই জানা গেল। কেন যেতে হবে, কত দিনের জন্যে, সে সব কথা নেই।

বার্তা পেয়ে সূরযপ্রসাদ ধরেই নিলেন, পালামৌ এলাকার আজব জন্তু হোক আর যাই হোক, তার মোকাবিলা করবার জন্যেই জরুরি তলব এসেছে। ভালোই হলো। চাঁইবাসা এখন শান্ত। ছিঁচকে-ছাঁচকা ঘটনা ছাড়া কোনো অঘটনই এখানে ঘটছে না। চুপচাপ বসে থাকতে আর ভালো লাগছিল না। তার মানে এই নয় যে, তিনি জঙ্গল এলাকায় অশান্তি চান।

অফিসেই ছিলেন সূরযপ্রসাদ। এবার আর ওয়ারলেসে বার্তা নয়, ফোন এলো রাঁচি অফিস থেকে। ফোন করেছেন সহকারী বন-অধিকর্তা পিটার বিকর্ন গোমেস।

প্রথমেই একটি দুঃসংবাদ জানালেন গোমেস। বেতলার জঙ্গলের মধ্যে দুটি টাওয়ার কে বা কারা ভেঙে দিয়েছে।

দুঃসংবাদ জানানোর পর গোমেস বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন, কাল সকালেই সূরযপ্রসাদ যেন ডালটনগঞ্জ চলে আসেন। একথাও বললেন গোমেস, তিনি আজই রাতে ডালটনগঞ্জ পৌঁছবেন। পালামৌ এলাকার বনমহলে শান্তি না ফেরা পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকবেন এবং সূরযপ্রসাদকেও থাকতে হবে।

এরপর আরো কিছু কথা বাড়াতে চেয়েছিলেন গোমেস। কিন্তু সূরযপ্রসাদই বলেছিলেন, আর কোনো কথা নয়—যা কিছু কথা, ডালটনগঞ্জ পৌঁছেই হবে।

সূরযপ্রসাদ খুবই ব্যস্ত। প্রথম কাজ হলো সহকারী বিকাশ হেমব্রমকে বুঝিয়ে দিতে হবে এখানকার কাজকর্ম। যদিও বিকাশ হেমব্রম বুদ্ধিমান মানুষ, কিন্তু একটু ভীতু স্বভাবের। কোনোরকম জটিলতার সৃষ্টি হলে দুর্বল এবং দিশেহারা হয়ে পড়ে। তবে অন্যদিক থেকে বিশ্বাসযোগ্য মানুষ।

অফিসে বিকাশ হেমব্রমকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সূরযপ্রসাদ। টাইগার বসেছিল চেয়ারের পিছনে। হঠাৎ টাইগার কেমন গোঁ গোঁ করে উঠলো। দেখলেন দরজার পর্দা সরিয়ে ঢুকছে দ্বিজু যাদব।

দ্বিজু চৌকাঠ পেরোতেই টাইগার গর্জন করে উঠলো। দ্বিজু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। শোনা গেল দ্বিজুর গলা, কুকুরটা কি অফিসে চাকরি করে দারোয়ানজী?

দ্বিজু যাদব এখানকার পরিচিত মানুষ। পঞ্চায়েতের মুখিয়া। লোকটির নাম আছে, কিন্তু বদনাম। নানারকম অপকর্মের সঙ্গে সে জড়িয়ে।

বেল টিপলেন সূরযপ্রসাদ। রক্ষী বেণীমাধব ঘরে ঢুকলো। নমস্কার জানিয়ে দাঁড়ালো। সূরযপ্রসাদ বললেন, দ্বিজু যাদব ঘরে ঢুকলো, তুমি কিছু বললে না?

বেণীমাধব বললে, যাদবজীকে বললাম, ভিতরে যাবেন না, কিন্তু কথা কানেই তুললেন না।

—ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও তোমার যাদবজীকে।

দ্বিজু যাদব ভিতরে ঢুকলো। বসতে বলার আগেই সে বসলো।

সূরযপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলবেন?

দ্বিজুর পাশে এসে টাইগার জিব বার করে হাঁস হাঁস করছে। দ্বিজু কথা বলবে কি, ভয়ে ভয়ে টাইগারের দিকে তাকাচ্ছে।

সূরযপ্রসাদ হেসে উঠলেন, বললেন, আরে আমার দিকে তাকান না! বলুন, কি বলবেন?

দ্বিজু বললে, স্যার—এদিকে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম, একটু দেখা করে যাই।

সূরযপ্রসাদ বললেন, যাদবজী, শুধু কি

দেখা করাই দরকার?

—না, হ্যাঁ, মানে, দ্বিজু গলায় গিটকিরি দিয়ে বললে, চারদিকে সব বলাবলি করছে, আপনার এলাকায় নাকি কাল রাতে এক আজব জীব ধরা পড়েছে? জীবটি নাকি আপনাদের এখানেই আছে?

সূরযপ্রসাদ বললেন, আছে।

দ্বিজু বললে, স্যার, দেখতে ইচ্ছে করছে।

সূরযপ্রসাদ বললেন, আমি দুঃখিত যাদবজী। আপনি এখন আসতে পারেন।

দ্বিজু যাদব উঠে দাঁড়ালো। বললে, যাচ্ছি স্যার। জানেন তো আমি পঞ্চায়েতের মুখিয়া, সব কিছু জানার একটা আইনসঙ্গত দাবি আছে।

হো হো করে হেসে উঠলেন সূরযপ্রসাদ। বললেন, আরে যাদবজী, এটা জঙ্গলমহল, জীব-জানোয়াররা থাকে। আপনি তো তাদের মুখিয়া নন।

কথার খোঁচাটা দ্বিজু যাদব বেশ ভালোই বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু নীরবে হজম করা ছাড়া উপায় নেই। তবু দরজার চৌকাঠ পেরোবার মুখে একবার বলে গেলেন, ডালটনগঞ্জ থেকে ভালোয় ভালোয় ফিরুন, তারপর দেখা হবে আবার।

সূরযপ্রসাদ রীতিমতো অবাক। ডালটনগঞ্জে যাবার খবর দ্বিজু যাদব জানলো কি করে!

সারাদিন গেল। সন্ধ্যায় প্রতিদিনের মতো আজও বারান্দার কোণটিতে বেতের ডেকচেয়ারে এসে বসেছেন সূরযপ্রসাদ। কিন্তু আজ আর বসে থেকে বনের সৌন্দর্য উপভোগ করা নয়, এখন ভাবছেন কখন ডালটনগঞ্জের পথে রওনা হবেন, এবং কোন পথে যাবেন।

এর মধ্যে দুপুরে একবার নরসিংহের সঙ্গে কথা বলেছেন। পালামৌ-এর বন এলাকায় যে ঘটনা ঘটছে, নরসিংহ সে খবর রাখে না। ঘটনার কথা শোনার পর সে বলেছিল, আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন সাহেব। আমাকে আপনি জঙ্গল-মহলে ছেড়ে দেবেন, দেখবেন আমি কি করতে পারি। জন্তু-জানোয়ারের রাজত্বে আমাকে অনেক দিন কাটাতে হয়েছে। বেঁচে তো আছি সাহেব। কতোবার জন্তু-জানোয়ারের মুখে পড়েছি, কিন্তু আজ অব্দি আমার গায়ে কেউ আঁচড় কাটতে পারেনি। নররাক্ষসকে সবাই ভয় পায় সাহেব।

একটু চুপ করে থেকে নরসিংহ বলেছিল, আমি যদি নিজেকে মানুষ মনে করে জঙ্গলে যাই তাহলে জন্তু-জানোয়ারের হাতে আমার জীবন যাবে। আর যদি—

কথা শেষ করেনি নরসিংহ। হঠাৎ চুপ করে দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দিল।

সূরযপ্রসাদ ভাবছেন, কি ভাবে তিনি কাজে লাগাবেন নরসিংহকে। ভাবছেন বনবিভাগে কর্মজীবনের কথা। বনবিভাগে দায়িত্বশীল পদে থেকে তিনি অজস্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। বিচিত্র সে সব অভিজ্ঞতা। তাঁর জীবননাশের চেষ্টাও হয়েছে বহুবার। কিন্তু আজ অব্দি কোনো দুষ্কৃতকারী তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারেনি। বহুবার চরম বিপদের মুখে পড়েছেন, রক্ষাও পেয়েছেন আশ্চর্যজনক-ভাবে।

কিন্তু এবার!

ঠিক ছিল রাত দুটোয় চাঁইবাসা থেকে রওনা হবেন, কিন্তু তিনটে বাজতে চললো এখনো সূরযপ্রসাদ শুয়ে আছেন। এর মধ্যে সান্ত্রী কিষণলাল একবার ডাকতেও এসেছিল। সাড়াও দিয়েছিলেন সূরযপ্রসাদ। বলেছিলেন, তোমরা তৈরি হও, আমি যাচ্ছি। কিন্তু এখনো উঠলেন না। এদিকে রাত তিনটে বাজে।

জিপ তৈরি। সান্ত্রী কিষণলাল, ভজন মাহাতো তো যাচ্ছেই, এছাড়া মকর-রামকেও নিয়ে যাবেন ঠিক করেছেন সূরযপ্রসাদ। টাইগার আর বাহাদুর তো আছেই। আর নতুন সঙ্গী নরসিংহকেও সঙ্গে নেবেন ঠিক করেছেন। নরসিংহের সঙ্গে গোপন কিছু আলোচনাও হয়েছে, তা তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেননি।

সূরযপ্রসাদের ঘরে আলো জ্বলছে। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে আছেন তিনি।

চোখের সামনে দেয়াল ঘড়ি। ঘড়ির কাঁটা তো থেমে থাকে না। সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

তিনটে বেজে গেছে।

এবারে বিছানা ছাড়লেন সূরযপ্রসাদ। উঠলেন। দরজা খুলে বারান্দায় এলেন।

দারুণ শীত। তারপর ঘন কুয়াশা। বন-বাংলো এবং বন-অফিসের চারদিকে যদিও আলো জ্বলছে কিন্তু কুয়াশা এতই ঘন যে কিছু চোখে পড়ে না। শুধু দেখা যাচ্ছে নিমগাছের নিচে জিপটা দাঁড়িয়ে। ওই জিপটিই ব্যবহার করেন সূরযপ্রসাদ।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন সূরযপ্রসাদ। কিষণলাল দাঁড়িয়েছিল জিপের কাছে।

সূরযপ্রসাদ বললেন, এবারে যাওয়া যাক, কি বলো কিষণলাল?

কিষণলাল বললে, সাহেব, দেরিই যখন করলেন, তখন আর ঘণ্টা তিনেক যাক না। যে রকম কুয়াশা, তাতে এখন বেরোনো কি ঠিক হবে?

সূরযপ্রসাদ বললেন, তুমি মহীরাবণকে ডাকো। আমি আসছি একবার ওপর থেকে।

ড্রাইভারের নাম মহীরাবণ।

কিষণলাল বললে, মহীরাবণের শরীর ভালো নেই সাহেব। তাই—

জিপের আড়ালেই ছিল সুখন মাহাতো। সে-ও ড্রাইভার। সামনে এসে বললে, আমি যাবো স্যার। মহীরাবণ ভাইয়ার শরীর ভালো নেই। তার শিরে দরদ হচ্ছে।

—চলো তো দেখে আসি কিষণলাল। সূরযপ্রসাদ বললেন, রাত এগারোটায় সে আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। জেনে গেল কখন রওনা হবো। চলো, দেখে আসি।

বন-বাংলোর একতলায় মহীরাবণ থাকে। সূরযপ্রসাদ দেখলেন দরজা বন্ধ মহীরাবণের ঘরের। দরজা নাড়তেই মহীরাবণ দরজা খুললো। নিশ্চয়ই ঘুমোয়নি মহীরাবণ। ঘুমোলে এত তাড়াতাড়ি দরজা খুলতে পারতো না।

হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে দেখলেন সূরযপ্রসাদ, পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সুখন মাহাতো।

—কি মহীরাবণ, কি হয়েছে তোমার?

—ভালোই তো ছিলাম সাহেব, হঠাৎ মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেল।

সূরযপ্রসাদ মনে যাই বুঝুন, মুখে বললেন, হয়তো ঠাণ্ডা লেগে থাকবে। ঠিক আছে, কাল একবার ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্তর খেয়ে নিয়ো। কদিন তো শীতও পড়ছে বেশ। ঠিক আছে, তুমি বিশ্রাম করো, আমি সুখনকে নিয়ে যাচ্ছি।

মহীরাবণ বেশ নিচু গলায় বললে, কি আর বলবো, সাবধানে যাবেন স্যার।

সূরযপ্রসাদ হঠাৎই ফিরে তাকালেন সুখন মাহাতোর দিকে। চতুর সুখন মাহাতো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, সাহেব, মহীরাবণ আপনাকে সাবধানে যেতে বলছে কেন, গাড়ি চালাবো তো আমি।

সূরযপ্রসাদ বললেন, আরে এইরকম ভুল হামেশা হয়। তুমি তৈরি হও সুখন। আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি।

দশ মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টা হয়ে গেল, তারপর সূরযপ্রসাদ নামলেন। টাইগার আর বাহাদুরের সঙ্গে মকররামও এলো। সান্ত্রী কিষণলাল আর রামপূজন তো আগেভাগেই তৈরি হয়ে আছে।

বিকাশ হেমব্রমও এসে দাঁড়িয়েছে। বললে, স্যার, ডালটনগঞ্জ পৌঁছেই ফোন করবেন। আমরা কিন্তু চিন্তায় থাকবো।

—কিসের চিন্তা! সূরযপ্রসাদ হাসি মিশিয়ে বললেন, আমার জন্যে? আমার জন্যে কোনো চিন্তা কোরো না হেমব্রম। আমি ঠিকই তোমাদের কাছে ফিরে আসবো। হয়তো দু-চার দিনের মধ্যেই।

ইতিউতি তাকালেন সূরযপ্রসাদ। হঠাৎ বলে উঠলেন, কিষণলাল, আমাদের নতুন অতিথিকে ডাকো।

কিষণলাল বুঝতে পারলো না, নতুন অতিথি কে।

সূরযপ্রসাদ বললেন, যাও, নরসিংহ অবতারটিকে ডেকে আনো। দোতলার পিছনের ঘরটিতে সে আছে। তাকে যে সঙ্গে নিতেই হবে।

কিষণলাল ওপরে চলে গেল। ফিরে এলো ব্যস্তভাবে। বললে, এত ডাকাডাকি করছি, সাড়া দিলে না। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

—সে কি! সূরযপ্রসাদ বললেন, চলো তো দেখি।

সবাই ওপরে এলো। ড্রাইভার সুখন মাহাতোও। সত্যি, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। একটি জানালা আধখোলা অবস্থায় ছিল। জানালার কপাট সরিয়ে দেখা গেল ঘর ফাঁকা। জানালা দিয়ে পুরো ঘরটাই দেখা যায়। ঘরটি বেশ ছোট। একজনই থাকতে পারে হাত-পা ছড়িয়ে।

কিষণলাল বলে উঠলো, ওই দেখুন পিছনের জানালার একটা গরাদ দোমড়ানো।

সূরযপ্রসাদও দেখলেন। বললেন, লোকটার গায়ে দেখছি মহিষের মতো শক্তি। ওই লোহার গরাদ বাঁকানো কি মুখের কথা!

জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো লোকটি, কিন্তু বাইরে বেরুলো কি ভাবে! সামনের গেট ছাড়া তো বেরুবার পথ নেই। তবে পিছনে ছোট একটি দরজা আছে। কিন্তু সেটি তো বন্ধই থাকে।

পিছন দিকটায় খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ আসে না। এদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাঁচিলের ভিতরে নানারকম গাছপালা লাগানো। কয়েকটি বাঁধানো বেদীও আছে, বসবার জন্যে। বনবিভাগের অনেক কর্মীর ডিউটি না থাকলে এখানে বসে তাস-টাস খেলে কিংবা গল্পগুজব করে।

দেখা গেল পিছনের দরজা বন্ধই আছে।

সূরযপ্রসাদ ভালোমন্দ আর কিছু বললেন না।

বিকাশ হেমব্রম বললে, স্যার—আমার মনে হয় লোকটি সুবিধের নয়।

সূরযপ্রসাদ বললেন, এখন তো তাই মনে হচ্ছে। যাকগে—তাকে নিয়ে আর মাথাব্যথা নেই।

সুখন মাহাতো বললে, সাহেব, এখানেই তো রাত শেষ হয়ে গেল।

—রাত যখন শেষই হলো, তখন দিনের আলোতেই যাওয়া যাবে। সূরযপ্রসাদ বললেন, জানোয়ারটা যে এমন কাণ্ড ঘটাবে বুঝতে পারিনি। ভাবছি কি জানো সুখন, ভাবছি নরসিংহ অবতার আমাকে বোকা বানিয়ে গেল।

দেখা গেল মহীরাবণ কম্বল মুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে।

সূরযপ্রসাদ বললেন, কি, কেমন আছো?

মহীরাবণ বললে, একটু ভালো সাহেব।

সূরযপ্রসাদ বললেন, তুমি আবার ঠাণ্ডার মধ্যে উঠলে কেন? যাও, ঘরে যাও।

বিকাশ হেমব্রম পাশেই ছিল। বললে; এখনই কি যাবেন স্যার?

—না। সূরযপ্রসাদ সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন, আজ আর যাবো না ভাবছি। তা-ও যাই তো রাতের দিকে।

শেষ বিকালে ডালটনগঞ্জ বন-অফিস থেকে ফোন এলো। ফোন করেছেন রেঞ্জার কেদার শর্মা।

সূরযপ্রসাদই ফোন ধরেছেন। সূরযপ্রসাদের গলা পেয়ে কেদার শর্মা বলে উঠলেন, কি আশ্চর্য, প্রসাদজী আপনি! আমরা তো জানি, আপনি রাত দুটোয় চাঁইবাসা থেকে বেরোবেন।

সূরযপ্রসাদ চুপিস্বরে বললেন, ঘরে কি আপনি একা? শুধু হ্যাঁ কি না বলুন।

—না।

—তবে শুধু আমার কথাটাই শুনুন—মনে করুন আমি আপনাদের কাছেই আছি। আর কিছু জানতে চাইবেন না। ছাড়ছি। নমস্কার।

ফোন ছেড়ে দিয়ে বারান্দায় এলেন সূরযপ্রসাদ। নির্দিষ্ট কোণে বেতের ডেক-চেয়ারটিতে বসলেন। বাহাদুর আর টাইগার ঠিকই আছে। ওরা দুটি যেন তাঁর ছায়া অনুচর।

সূরযপ্রসাদের মনে নানা চিন্তা। তার মধ্যে একটা চিন্তাই বড়ো হয়ে উঠেছে, জঙ্গলমহলের মহিষাসুর কে বা কারা!

এখন এই চিন্তার মধ্যেও সিকিমের এক লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ছে। অনুষ্ঠানটি দেখেছিলেন কলকাতায় রবীন্দ্রসদনে।

নৃত্য-অনুষ্ঠানটি ছিল জীবজন্তুদের নিয়ে। অবশ্য এখানে কোনো জীবজন্তু ছিল না, ছিল জীবজন্তুর আবরণে নর্তক-নর্তকী। বাঘ, সিংহ, হরিণ, ভালুক ইত্যাদি জন্তুর চামড়া পরে তারা নেচে ছিল। কিন্তু কে বলবে, যে সত্যি জন্তু নয়!

এখন সেই নৃত্য-অনুষ্ঠানের কথা মনে

পড়ছে সূরযপ্রসাদের। আর ভাবছেন, পালামৌ-এর জঙ্গলে যে রহস্যময় জীবটির আবির্ভাব ঘটেছে, এটি আদৌ কোনো জন্তু নয়—এর নেপথ্যে আছে দুঃসাহসী কোনো দুষ্কৃতকারী। যারা বাইসনের চামড়ার আবরণের আড়ালে থেকে বনচারী জীবজন্তুদের বিষপ্রয়োগে হত্যা করছে। দুটি মানুষের চারটি পা—সহজেই চতুষ্পদ প্রাণী সাজা যায়।

কিন্তু এরা কারা!

॥ চার ॥

রাত তখন সাড়ে এগারোটা, সূরযপ্রসাদ হঠাৎই সহকারী বিকাশ হেমব্রমকে বললেন, দুটি জিপ যেন তৈরি থাকে। আর চারজন সান্ত্রী। আর যেই যাক, কিষণলাল আর রামপূজন যাবে।

বিকাশ হেমব্রম একটু অবাক হলো। বললে, কি ব্যাপার বলুন তো স্যার! কাল রাতে যাওয়ার কথা ছিল, গেলেন না, আজ সারাদিন গেল, কোনো কথাই বললেন না। এখন রাত সাড়ে এগারোটা বাজলো, এখন বলছেন—

সূরযপ্রসাদ শেষ করতে দিলেন না বিকাশ হেমব্রমের কথা। বললেন, আমি ঠিক বারোটায় রওনা হতে চাই। যদি ডালটনগঞ্জ কিংবা রাঁচি থেকে ফোনটোন আসে, সত্য কথাটাই জানিয়ে দেবেন। আর একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিই—আপনি কোনো অবস্থাতে অফিস ছেড়ে যাবেন না।

বিকাশ হেমব্রম বললে, আমি স্যার কিছু বুঝতে পারছি না।

সূরযপ্রসাদ বললেন, এখন আমার মাস্টারি করার সময় নেই। যান, আমার যাওয়ার আয়োজন করুন।

বিকাশ হেমব্রম চলে গেল।

সূরযপ্রসাদ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে একবার ফোনের রিসিভার তুলে দ্বিজু যাদবের বাড়ি ফোন করলেন। একবার রিং হতেই দ্বিজু যাদবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সূরযপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। আপন মনে বললেন, এই হাড়-কাঁপানো শীতের রাতে দ্বিজু যাদব জেগে বসে আছে, এবং ফোনের কাছে।

বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে আবার দ্বিজু যাদবের বাড়িতে ফোন করলেন সূরযপ্রসাদ। এবারেও বিপরীত দিক থেকে দ্বিজু যাদবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হ্যালো।

সূরযপ্রসাদ কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন এনে বললেন, আমি তোমার জিগরি দোস্ত বলছি।

দ্বিজু যাদব বললেন, কি নাম তোমার?

আবার রিসিভার নামিয়ে রাখলেন সূরযপ্রসাদ।

রাত সাড়ে বারোটা। সূরযপ্রসাদ নেমে এলেন নিচে। দুটি জিপ পর পর দাঁড়িয়ে।

সূরযপ্রসাদ বললেন, চটপট উঠে পড়ো।

সুখন বললে, স্যার, আপনি উঠুন।

সূরযপ্রসাদ সামনের জিপটায় উঠে স্টিয়ারিং ধরে বসলেন। সুখনকে বললেন, বড্ড ঘন কুয়াশা, তাই না?

সুখন বললে, হ্যাঁ স্যার—আপনার অসুবিধে হতে পারে।

সূরযপ্রসাদ বললেন, আরে অসুবিধে হলে তুমি তো আছো। নাও, উঠে পড়ো। দেখি না, কুয়াশার মধ্যে জিপ ছোটাতে কেমন লাগে।

পর পর দুটি জিপ ছুটছে। একটিতে সূরযপ্রসাদ, সান্ত্রী কিষণলাল, আর হরিশ ছেত্রী। এ ছাড়া ড্রাইভার সুখন মাহাতো তো আছেই। অন্যটিতে ড্রাইভার মহীরাবণ, সান্ত্রী রামপূজন, ভজন শর্মা আর বলরাম দুবে। বলরাম দুবে বনবিভাগের কর্মী নয়, বন-অফিসের সামনে তার একটি দোকান আছে। টুকটাক খাবারদাবার থেকে তেল, মশলা সবই পাওয়া যায়। বলরামের বয়স বেশি নয়, কিন্তু অসাধারণ তার বুদ্ধি। তাছাড়া শরীর যেমন মজবুত, মনও তেমনি শক্ত। বলরামকে মাঝে মাঝে জঙ্গলে নিয়ে যান সূরযপ্রসাদ। এবারেও নিয়ে চলেছেন।

ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে জিপ বেশ দ্রুতগতিতে ছুটিয়েই নিয়ে চলেছেন। মহীরাবণ মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়ছে।

টাইগার বসে আছে সামনে। সুখন আর সূরযপ্রসাদের মাঝখানে। একসময় সুখন বললে, সাহেব, এবারে আপনি একটু আরাম করুন।

সূরযপ্রসাদ বললেন, কেন আরাম বুঝি তোমার সহ্য হয় না? বেশ তো বসে আছো—ঠিক অমনি চুপচাপ বসে থাকো।

সুখন বললে, সাহেব রাগ করলেন সামান্য কথায়! আমার ওপর আপনি রাগ করবেন না, আমি আপনার নোকর।

সূরযপ্রসাদ একটু শব্দ করে হাসলেন।

এখন গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পথ। তবে এখন তেমন চড়াই-উৎরাই নেই। অরণ্যের বুক চিরে বনবিভাগের পথ চলে গেছে পালামৌ জেলার দিকে। পালামৌ আর দূরে নয়।

কিন্তু পালামৌ জেলা তো সামান্য এলাকা নয়। এখন পাঁচটা বাজে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। সূরযপ্রসাদ জিপের গতির সঙ্গে দূরত্বের হিসেব করে দেখলেন ডালটনগঞ্জ পৌঁছতে বেলা সাড়ে নটা কি দশটা বাজবে। আরো দেরি যে হবে না, তা-ও বলা যায় না।

জিপের গতি মন্থর করলেন সূরযপ্রসাদ। পথ এখানে দু ভাগ হয়ে গেছে। একটা পথ গেছে ম্যাকল্যাসকিগঞ্জের দিকে, অন্য পথ মহুয়াদাড় হয়ে বেতলা বন-অফিসের দিকে। বেতলার জঙ্গল এলাকা থেকে ডালটনগঞ্জ সামান্য পথ। পনেরো কিলোমিটারের মতো হবে।

দুই পথের মুখে জিপ থামালেন সূরযপ্রসাদ। জিপ থেকে নামলেন তিনি। পিছনের জিপও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

অনেকদিন এদিকটায় আসেননি সূরযপ্রসাদ। বছর সতেরো আগে তিনি কিছুদিনের জন্যে বেতলায় ছিলেন। তখন যা এসেছেন। তারপর এদিকে আর আসা হয়নি। দরকার হয়নি বলেই।

পালামৌ-এর বন এলাকার মানচিত্র সঙ্গে এনেছেন সূরযপ্রসাদ। অ্যাটাচি থেকে মানচিত্রটা বার করে জোরালো টর্চের আলোয় দেখতে লাগলেন খুঁটিয়ে। সুখনও পাশে দাঁড়িয়ে। তারও দৃষ্টি মানচিত্রের দিকে।

সূরযপ্রসাদ বললেন, মনে হচ্ছে, মানচিত্রের রেখা সম্পর্কে তোমার একটা ধারণা আছে। কোন কোন এলাকায় কোন

পশুপাখি বেশি আছে, সে তো ছবি দিয়ে আঁকা আছে। আচ্ছা, পুরনো দিনের কেল্লায় কোন পথে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে?

সুখন বললে, সাহেব, আমি দেখছি এই পর্যন্ত, নয়তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সূরযপ্রসাদ বললেন, তোমার তো বোঝা উচিত। তুমি বেশ কয়েক বছর বেতলা এলাকায় কাজ করেছো। তাই না?

সুখন কোনো কথা বললো না। কিন্তু তার চোখ তখনো মানচিত্রের দিকে।

আবার জিপে উঠলেন সূরযপ্রসাদ। যে পথ ডালটনগঞ্জের দিকে গেছে, সে পথে না গিয়ে ম্যাকল্যাসকিগঞ্জের পথের দিকে চলতে আরম্ভ করলেন সূরযপ্রসাদ।

সুখন বললে, এ পথ ধরলেন কেন?

সূরযপ্রসাদ বললেন, আরে ডালটনগঞ্জ তো এদিক থেকেও যাওয়া যায়। যায় না?

সুখন বললে, এ পথ তো সোজা ম্যাকল্যাসকিগঞ্জ চলে গেছে।

সূরযপ্রসাদ বললেন, আরে পথের শাখাপথ তো অনেক আছে। তাই না?

সুখন বার কয়েক ঢোঁক গিলে বললে, তা আছে সাহেব।

ওরা গুলি চালাবার উদ্যোগ করছে।

রাত শেষ হয়ে আসছে। কুয়াশার মধ্যেও আলোর আভাস স্পষ্ট। সূরযপ্রসাদ এখন কিছুটা মন্থর গতিতে জিপ ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন।

দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। কুয়াশাও উবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পাখিরা ডানা মেলছে আকাশে।

শিশির এবং কুয়াশায় সিক্ত বনভূমি। প্রভাত সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। সূরযপ্রসাদ এতদিন বনের রাজত্বে বাস করছেন, তবু বন যেন পুরনো হয় না।

এত সময় পাকা পিচঢালা সড়কের ওপর দিয়ে জিপ চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। এবারে লাল কাঁকর ছড়ানো পথে চলতে আরম্ভ করলেন।

সুখন বললে, এ পথে কোথায় যাবেন সাহেব?

সূরযপ্রসাদ বেশ সহজ সুরেই বললেন, কেন—কোয়েল নদীর কাছে।

পথের দুদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন সূরযপ্রসাদ। কি দেখছেন, কী দেখতে চাইছেন, তিনিই জানেন। হঠাৎ এক জায়গায় চোখে পড়লো এক টুকরো লাল কাপড় ঝুলছে গাছের নুয়ে পড়া ডালে। সূরযপ্রসাদের মনটা হঠাৎ খুশিতে ভরে উঠলো। কিন্তু বাইরে তার কোনো প্রকাশ নেই।

জিপ দাঁড় করালেন সূরযপ্রসাদ। পিছনের জিপও দাঁড়িয়ে পড়লো। অনেক সময় বাদে জিপ থেকে নামতে পেরে টাইগার তো ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিলে। আর বাহাদুর নেমেই একটি তেঁতুল গাছে উঠে মনের আনন্দে তেঁতুল খেতে আরম্ভ করলো।

সূরযপ্রসাদ ইতিউতি তাকালেন। তাঁর হিসেব মতো কোয়েল আর খুব বেশি দূরে নয়। তবে কোয়েলের কাছে এখন না যাওয়াই ভালো।

বলরাম দুবে পায়চারি করছিল। সূরযপ্রসাদ তাকে ডেকে বললেন, ডেকচি-টেকচি সবই আছে। তিন টুকরো পাথর নিয়ে উনুন বানিয়ে চায়ের জন্যে জল গরম করো। জানো দুবে, একটু চা না খেলে শরীরটা চাঙ্গা হচ্ছে না।

—ঠিক আছে স্যার। দুবে বললে, আমি চা বানাচ্ছি।

কিন্তু টাইগার কোথায় গেল!

টাইগার, টাইগার বলে চিৎকার করে ডাকলেন সূরযপ্রসাদ। ফিরে আসা দূরের কথা, ডাকে সাড়াও দিলে না। ফিরে না আসুক, সাড়া তো দেবেই। দেখলেন তেঁতুল গাছে বাহাদুরও নেই।

সূরযপ্রসাদ ধরেই নিয়েছেন, ওরা নিশ্চয় কোনো কিছু রহস্যের গন্ধ পেয়েছে। তাছাড়া একটু আগেও তো ওরা এখানে ছিল, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে আর কত দূরেই বা যাবে!

আবার মানচিত্রটা বার করলেন। দেখলেন খুঁটিয়ে। সামনেই যে

পাহাড়টা—তারই ওপারে ডালটনগঞ্জ যাবার রাস্তা। যদিও ওদিকটায় যাওয়ার সরাসরি রাস্তা নেই। ঘুরপথেই যেতে হয়।

তবে বনরক্ষীরা অনেক সময় পায়ে হাঁটা পথরেখা ধরে যাওয়া-আসা করে। ওই সব এলাকায় চোরা-শিকারীদের আনাগোনা খুবই বেশি। বিস্তৃত বন এলাকায় সব সময়ে তো রক্ষীবাহিনী চলাফেরা করে না। সেটা কোনোমতেই সম্ভব নয়।

চোরা-শিকারীদের সঙ্গে বন-বিভাগের লুকোচুরি খেলা চিরদিনই চলেছে। তবে এখন আর আগের দিনের মতো সম্ভব নয়।

ঘড়িতে সময় দেখলেন সূরযপ্রসাদ। প্রায় পঁচিশ মিনিট হতে চললো, না টাইগার, না বাহাদুর, কারো কোনো পাত্তা নেই। কোথায় গেল তারা!

চা পান পর্ব শেষ হয়েছে। সূরযপ্রসাদ আরো বার কয়েক টাইগারের নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। বাহাদুরের দিক থেকেও কোনো সাড়া এলো না।

মনে একটু দুশ্চিন্তা। তবু বিশ্বাস, টাইগার যদি বিপদে পড়তো, নিশ্চয়ই বাহাদুর গাছের ডালে ডালে চলে এসে তার বন্ধুর বিপদের খবর জানাতো।

কাছেই একটা বেলগাছ চোখে পড়েছে বলরাম দুবের। পেকেও আছে অনেক বেল। হয়তো গাছের নিচে কিছু পড়েও থাকবে।

দুবে চললো বেলের সন্ধানে। আট-দশটি বেল গাছের নিচে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলো। সঙ্গে অবশ্য রাইফেল নিয়ে রামপূজনও গিয়েছিল।

দুবে বললে, স্যার, গাছে উঠে কিছু পাকা বেল পেড়ে আনি। খালি প্যাকেট থাকে তো দিন।

খালি প্যাকেট নিয়ে গাছে উঠলো দুবে। হাত বাড়িয়ে বেশ কয়েকটি পাকা বেল থলেতে ভরলো। তারপর ঝুল ডালে বেশ কিছু পাকা বেল আছে দেখে গাছের ডাল নাড়াও দিলে। বেশ কয়েকটি পাকা বেল পড়লো নিচে।

এই সময় দুবে দেখতে পেল, কয়েকটি হাতিকে। তারা এদিকেই আসছে। ভয় কি তা জানে না দুবে, শুধু সূরযপ্রসাদকে জানিয়ে দিলে, স্যার, হাতি আসছে।

সূরযপ্রসাদ বললেন, আসতে দাও—গাছের নিচে এলে ওদের জন্যে কাঁচা-পাকা, যা পাবে বেল পেড়ে নিচে ফেলে দাও। তুমি বেল পাড়ছো দেখেই ওরা আসছে। জানো ওরা বড়ো ভালো।

বেলগাছে দুবে, গাছের নিচে দশ-দশটি হাতি। নিচে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বেল পড়ছে—ওরা পা দিয়ে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে এক-একটি বেল শুঁড়ে তুলে মুখের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। দুবে বেশ মজা পেয়েছে।

সূরযপ্রসাদ পশুপাখির চরিত্র ভালোই বোঝেন। নিজে এগিয়ে গেলেন হাতির দলের কাছাকাছি। দুটি শিশু হাতি ছিল, সূরযপ্রসাদ বেল কুড়িয়ে তাদেরকে দিলেন। শিশু হাতি দুটির চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

এবারে দুবেকে নামতে বললেন সূরযপ্রসাদ। বললেন, থলে হাতে নেমে এসো। বেলগুলো হাতিদের সামনে ঢেলে দাও। ওরা কিছু বলবে না তোমাকে।

দুবে নেমে এলো গাছ থেকে। থলে ভর্তি বেল দিয়ে দিল হাতিদের। হাতিদের আনন্দ দেখে কে! তারা শুঁড় তুলে খুশির আওয়াজ করে আনন্দ প্রকাশ করলে।

সূরযপ্রসাদ বললেন, যদি ওদের আনন্দধ্বনি শুনতে পায় আরো হাতিরা ছুটে আসবে দুবে। তখন আবার তোমাকে গাছে উঠতে হবে।

কিন্তু আর হাতি এলো না। যারা এসেছিল তারা হেলতে-দুলতে আবার বনের গভীরে চলে গেল। কিছুটা দূরে পৌঁছে আবার তাদের ডাক শোনা গেল।

টাইগার আর বাহাদুরের এখনো পাত্তা নেই। এক ঘণ্টা হয়ে গেছে, এখনো তাদের ডাক অব্দি শোনা গেল না।

চিন্তা থেকে দুশ্চিন্তা।

হঠাৎ মনে হলো সূরযপ্রসাদের, হয়তো টাইগার আর বাহাদুর চাইছে আমি তাদের খোঁজে যাই।

নিশ্চয়ই এই রকম কিছু হবে।

আরো এক চিন্তা—হাতিরা কি শুধু বেল খেতে এসেছিল! চলে গিয়েও দূর থেকে আবার তারা ডাকলো কেন! সূরযপ্রসাদ যে হাতিদের বন্ধু, এ কথা অনেক হাতিও জানে। এই তো বছর খানেক আগে একটি শিশু হাতিকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন। সে বিচিত্র ঘটনার কথা তো ভুলে যাবার নয়।

আর দেরি করা ঠিক নয়। কিষণলাল, রামপূজন আর দুবেকে নিয়ে বনের ভিতরে যাবেন ঠিক করলেন। আর যারা, তাদেরকে বলে দিলেন, তারা যেন সতর্ক থাকে। এবং এখানেই অপেক্ষা করে।

দুবে হঠাৎ সূরযপ্রসাদকে নিচু গলায় বললে, মহীরাবণকে সঙ্গে নিন স্যার।

সূরযপ্রসাদ বললেন, হঠাৎ এ কথা বললে কেন?

দুবে বললে, সেটা আপনি ভালো বুঝেছেন। স্যার, ক বছর তো দোকানদারী করছি আপনাদের অফিসের সামনে—কে কেমন ভালোই জানি। মহীরাবণ লোকটি মোটেই ভালো নয়। এলাকার দুশমনদের সঙ্গে ওর ওঠাবসা।

বনে যাওয়ার কথা বলতে মহীরাবণ নানা ওজর-আপত্তি করলো। তার শরীর ভালো নয়, তাছাড়া পায়ে একটু ব্যথাও আছে এ কথাও বললে। শেষটা তো বলেই বসলো, আমার কাজ ড্রাইভারি করা, আমি কেন জঙ্গলে যাবো।

সূরযপ্রসাদ বেশ কড়া মেজাজেই বললেন, আমার সঙ্গে তোমাকে যেতেই হবে। খাবার আর জলের ফ্লাস্ক বইবার তো লোক চাই। নাও, খাবারের থলে আর জলের ফ্লাস্ক কাঁধে ঝুলিয়ে নাও।

যাবার আগে সবাইকে বলে গেলেন সতর্ক থাকতে। এ কথাও বলে গেলেন বেশ গোপনে, কোনো বার্তা যেন না পাঠানো হয়। তাহলে বিপদ বাড়তে পারে।

বনের গভীরে এসে পৌঁছেছেন সূরযপ্রসাদ। সামনেই পাহাড়। ঘন জঙ্গলে ঢাকা। বনের গভীরে সূরযপ্রসাদের মনটা বনের সঙ্গেই মিশে যায়। বেশ একটা আনন্দ-শিহরন জাগে মনে।

কিন্তু এখন, এই চলার মুহূর্তে আনন্দ অনুভব করার মতো মন নেই। এখন তাঁর

মনে একটাই চিন্তা, কতক্ষণে দেখা পাবেন টাইগার আর বাহাদুরের।

পাহাড়ের পাদদেশে থমকে দাঁড়ালেন সূরযপ্রসাদ। কোনখান দিয়ে পাহাড়ে উঠবেন এইটাই তাঁর চিন্তা।

চিন্তায় ছেদ পড়লো ময়ূরের কর্কশ সুরে। একটি নয়, বেশ কয়েকটি ময়ূর চোখে পড়লো। একটি ময়ূর সাপ ধরেছে।

দুবে বললে, স্যার, চলুন না ওদিকটায় যাই। ওই যে দেখছেন না, খানিকটা জায়গায় গাছপালার ডাল ভাঙা। নিশ্চয়ই হাতির দল ওই দিকে গেছে।

—তাই চলো।

মহীরাবণ হঠাৎ 'উঃ' বলে বসে পড়লো।

—কি হলো?

—হাঁটুটায় কেমন খচ্‌কা লাগলো স্যার। মহীরাবণ হাঁটু চেপে ধরে বললে, হাঁটুর মালাইচাকিটা আমার কমজোরি।

—তা তো কমজোরি। সূরযপ্রসাদ বললেন, এখন যদি বাঘে তাড়া করে তখন তো পড়ি কি মরি ছুটবে। নাও ওঠো, এখন যেতে হবে।

উঠে দাঁড়ালো মহীরাবণ। খাবারের ঝোলা এবং জলপাত্র মহীরাবণের কাঁধে তুলে দিলে দুবে। একবার কটমটিয়ে দুবের দিকে তাকালো মহীরাবণ।

এবারে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবার পালা।

হাতির দল যেখান দিয়ে গেছে, ডালপালা ভেঙে চিহ্ন রেখে গেছে। সেই পথ ধরে এগিয়ে চললেন সূরযপ্রসাদ।

পথ বলে কিছু নেই। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। তবে এদিকটায় বড় বড় গাছপালার চেয়ে ঝোপঝাড়ই বেশি। এইরকম জায়গা হরিণদের প্রিয়। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে, হরিণ আর নীলগাই। এক জায়গায় কয়েকটি বাইসনও দেখা গেল।

হরিণ এবং নীলগাইরা শান্ত এবং নিরীহ। ওরা কখনো থমকে দাঁড়ায়, কখনো ছুটে পালায়। বাইসনরাও নিজেদের খেয়ালে থাকে। তবে কখনো-সখনো ক্ষেপে যায়। বনের রাজ্যে সব পশুপাখি শান্তিতে থাকতে চায়।

নানা জাতের পাখপাখালিও চোখে পড়ছে। মাঝে মাঝে ময়ূরেরও দেখা মিলছে। এই এলাকায় বাঘ, চিতা, নেকড়েও আছে। আর আছে এক ধরনের বন্য কুকুর। তারা বড় ভয়ংকর। ক্ষিপ্র গতিতে পিছন থেকে এসে আচমকা আক্রমণ করে। তবে বন্য কুকুর তেমন চোখে পড়ে না। বন্য কুকুরেরা দল বেঁধে থাকে।

এখন চড়াই পথে উঠতে হচ্ছে। এমন কিছু কষ্টকর নয়। তবে উঠতে হচ্ছে সাবধানে এবং চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে।

এখান থেকে নেতারহাটের পাহাড়-চূড়া চোখে পড়ে। চোখে পড়ে কোয়েল নদী। আর একটু ওপরে উঠলে ঔরঙ্গা নদীও দেখা যাবে।

সূরযপ্রসাদের মনে পড়ছে, চাকরি জীবনের প্রথমে একবার তখনকার রাজ্য বন-অধিকর্তা সুজীব উপাধ্যায়ের সঙ্গে এই এলাকায় এসেছিলেন। ঠিক জায়গাটা মনে নেই, মনে রাখা যায়ও না—তবে এই রকমই কোনো পাহাড়ের ওপরে চোরা-শিকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল।

সূরযপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো দুবে, স্যার, এই দেখুন।

সূরযপ্রসাদ দেখলেন, একটা শিরীষ গাছের বেশ ওপরের দিকে একটা ডালে লাল কাপড়ের টুকরো বাঁধা।

দেখলেন এই পর্যন্ত। সূরযপ্রসাদ কোনো কিছু বললেন না। শুধু একবার মহীরাবণের মুখের দিকে তাকালেন। চোখাচোখি হতে মহীরাবণ চোখ ফিরিয়ে নিলে।

শিরীষ গাছের প্রায় মগডালে লাল কাপড়ের টুকরো পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। সূরযপ্রসাদ মনে মনে সবই বুঝতে পারছেন, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করার সময় এখন নয়।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে শুধু পায়ে পায়ে ওপরের দিকে ওঠা।

॥ পাঁচ ॥

পাহাড়ের ওপর উঠে সূরযপ্রসাদ চারদিকের রমণীয় পটভূমিকায় দৃষ্টিপাত করলেন।

চারদিকে পাহাড়। মাঝে উপত্যকার মতো খানিকটা জায়গা। শুধু কোয়েল নয়, ঔরঙ্গা নদীও এখান থেকে দেখা যায়। তবে স্পষ্ট নয়, রূপালি রেখার মতো।

যদিও এখন বিশ্রাম করার মতো মানসিকতা নেই, তবু একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। সেই অবসরে একটু চা পান। আর যাহোক কিছু মুখে দেওয়া। সঙ্গে বিস্কুট-টিস্কুট আছে। আর দুবের সংগ্রহে কয়েকটি বেলও রয়েছে। বেলগুলো থাক। পরে কাজে লাগবে।

দুবে পাথরের টুকরোয় উনুন বানিয়ে চায়ের জন্যে জল গরম করতে বসলো। শুকনো কাঠপাতার অভাব তো এখানে নেই।

সূরযপ্রসাদের ইচ্ছে হলো একবার টাইগারের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকেন। কিন্তু না। যদিও টাইগার আর বাহাদুরের জন্যে এখন মনটা ছটফট করছে।

চা পান পর্ব চুকলো। এবারে আবার চলার পালা। কিন্তু কোন দিকে যাওয়া ঠিক হবে, এই নিয়ে চিন্তা করছেন।

দুবে ও কিষণলালের সঙ্গে পরামর্শও করলেন সূরযপ্রসাদ। কিন্তু সবাই কেমন ধাঁধার মধ্যে।

হঠাৎ কানে এলো একাধিক জিপের হর্নের আওয়াজ। বেশ দূর থেকেই আসছে। সূরযপ্রসাদ একটু বিচলিত হলেন। তাঁদের জিপের হর্নের আওয়াজ নয় তো! পরক্ষণে মনে হলো, হয়তো শত্রুপক্ষ তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তারা হয়তো চাইছে আমরা আর না এগিয়ে ফিরে যাই।

নিচের দিকে আঙুলের নিশানা করে দুবে বলে উঠলো, স্যার—ওই দেখুন। কটা হাতি আসছে।

ঝোপঝাড়, বন তোলপাড় করে একদল হাতি এদিকেই আসছে। সূরযপ্রসাদের মন আনন্দে নেচে উঠলো।

দুবে আবার সোল্লাসে বলে উঠলো, ওই একটা হাতির পিঠে বানর বসে আছে।

সূরযপ্রসাদ বললেন, ওটি বানর নয়—আমার বাহাদুর, সময়-অসময়ের সাথী। কিন্তু দুবে—আমার টাইগারের কি

তোকে আমি আছড়ে মেরে ফেলবো।

হলো? আর একজনের কথাও ভাবছি, সেদিন গভীর রাতের অন্ধকারে তুমি যাকে মোটর বাইকের পিছনে বসিয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলে গভীর জঙ্গল এলাকায়।

হাতির দল এসে পড়লো। সূরযপ্রসাদ দেখেই বুঝলেন, সেই দলটি, যারা কিছুক্ষণ আগে বেল খেয়ে এসেছে।

হাতিরা ঘিরে ধরলো সূরযপ্রসাদদের। একটি মা-হাতি, দেখেই মনে হয়, যার বেশ বয়স হয়েছে, সূরযপ্রসাদের কাছে শুঁড় নেড়ে যেন কিছু বলতে চাইছে।

সূরযপ্রসাদ তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিতে, সে শুঁড় তুলে আওয়াজ করলো। দেখাদেখি আর আর হাতিরাও।

কিন্তু হাতিরা চক্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ এক পা এগুবে না, কিংবা পিছোবে না। মা-হাতিটির কানে গোলাকার একটি ছিদ্র দেখেই সূরযপ্রসাদ বুঝতে পারলেন, বোধহয় এই হাতিটিকেই তিনি একবার দেখেছিলেন জঙ্গলের মধ্যে এক ঝিলের কাছে শুয়ে থাকতে। ওর গা দিয়ে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। দেখেছিলেন, ওর গুলিবিদ্ধ কানে এবং পায়ের এক জায়গায় গুলি লেগে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। তারপর অনেক কষ্টে হাতিটিকে জঙ্গল অফিসের কাছে আনিয়ে ওর ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করিয়েছিলেন। সুস্থ হলে হাতিটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আবার সে তার জঙ্গলের দেশে ফিরে যায়।

সূরযপ্রসাদ এবার হাতিদের ইচ্ছার কথা বুঝতে পারলেন। আর বাহাদুর তো একটি হাতির পিঠে বসে অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাতে চাইছে, হাতির পিঠে উঠে পড়ো, দেরি কোরো না।

—বনের হাতির পিঠে ওঠা কি ঠিক হবে? রামপূজন বললে, হাতির খেয়াল তো।

সূরযপ্রসাদ বললেন, ওরা কেন ক্ষতি করবে আমাদের! তা যদি করতো তাহলে ওরা এতক্ষণে আমাদের ছারপোকার মতো পিষে মেরে ফেলতো। ভয় কোরো না—মনে কোরো এখন ওরাই তোমাদের বন্ধু। চলো, আর সময় নেই। ওদের শুঁড় ধরে উঠে পড়ো।

সূরযপ্রসাদ আগেভাগে উঠে পড়লেন মা-হাতিটির পিঠে। দেখাদেখি আর সবাই।

হাতির দল যে পথে এসেছিল সেই পথেই চলতে লাগলো। ওদিকে দূর থেকে ভেসে আসা হর্নের আওয়াজ আবার শোনা গেল। খানিক সময় বাজার পরই আবার থেমে গেল। পাহাড় আর অরণ্য অঞ্চল এমন, সব সময় বোঝা যায় না—শব্দ কোন দিক থেকে আসছে।

বনবাদাড়, ঝোপঝাড় তোলপাড় করে দশ-দশটি হাতি শুঁড় উঁচু করে ছুটে চলেছে।

সূরযপ্রসাদ সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, সাবধানে বোসো। ভয় নেই।

দুবে চিৎকার করে বলে উঠলো, স্যার, ওই দেখুন—আগুন জ্বলছে।

যে কোনো জীবজন্তু আগুনে ভয় পায়। হাতিও। কিন্তু এখন তারা ভয় পাওয়া দূরের কথা, আরো দ্রুত ছুটতে আরম্ভ করলো।

আগুন জ্বলছে পাহাড়ের গায়ে। দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। সূরযপ্রসাদের চোখে পড়লো পাশেই টিলার মাথায় তিনজন দাঁড়িয়ে। দুজনের হাতে রাইফেল। ওরা গুলি চালাবার উদ্যোগ করছে।

রামপূজন আর কিষণলালের হাতেও উদ্যত রাইফেল। শুধু সূরযপ্রসাদের নির্দেশের অপেক্ষা।

কোনো সময়ে অহেতুক রক্তপাত চান না সূরযপ্রসাদ। কিন্তু এই মুহূর্তে গুলি চালানো ছাড়া আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই। শুধু একটি ভরসা, দশ-দশটি হাতি সঙ্গে আছে। শত্রুরা ভালো করেই জানে দুটি রাইফেল দশটি হাতিকে কাবু করতে পারবে না। আর এই চিন্তা করেই ওরা রাইফেল তাক করেও গুলি চালাচ্ছে না।

সূরযপ্রসাদ চিৎকার করে বলে উঠলেন, রাইফেল নামাও, হাত তোলো।

এই চরম মুহূর্তে এক নাটকীয় ঘটনা

ঘটলো। নরসিংহ পিছন দিক থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে রাইফেলধারী দুটি লোককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। আর তৃতীয় ব্যক্তি তখন টাইগারের কব্জায়।

সূরযপ্রসাদ অবাক।

আরো বিস্মিত বনকর্মীরা। তারা ভেবেই পাচ্ছে না এই নরসিংহ কিভাবে এখানে এলো।

আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। টিলার ওপর দেখা গেল ভয়ংকর বাইসনকে যার চোখ দুটিতে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। বাইসনটা আক্রমণ করতে চাইছে নরসিংহকে।

হাতিরা ছুটলো বাইসনের দিকে। আর তখনই বাইসনের চামড়ার আবরণ থেকে বেরিয়ে এলো দুটি বলিষ্ঠ মানুষ। তারা দু-হাত তুলে দাঁড়ালো। একজনকে দেখতে অবিকল মহীরাবণের মতো। তার পিঠে বাঁধা ভারী ব্যাটারি।

সূরযপ্রসাদ ফিরে তাকালেন মহীরাবণের দিকে। মহীরাবণ এগিয়ে সূরযপ্রসাদের পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো। কাঁদতে কাঁদতে বললে সাহেব, ওর নাম অহীরাবণ, ও আমার যমজ ভাই। সাহেব, ওকে যে শাস্তি হয় দিন, মারবেন না। আমি এদের সব কথা জানি সাহেব। সব আপনাকে বলবো।

নরসিংহ যাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল, তাদের একজন বোধহয় অচেতন হয়ে গেছে। আর একজন কালো কুতকুতে চেহারার লোক ছিটকে পড়া রাইফেল কুড়োতে চেষ্টা করছে। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই লোকটির। সূরযপ্রসাদের ইঙ্গিতে নরসিংহ ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটির ওপর। দু-হাতে উঁচু করে তুলে বলে উঠলো, তোকে আমি আছড়ে মেরে ফেলবো। শয়তানের বাচ্চা।

—ওকে ছেড়ে দাও নরসিংহ। আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ো না।

সূরযপ্রসাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল মা-হাতিটি। সূরযপ্রসাদ তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে বললেন, তোমরা তো আমার ভাষা বুঝবে না—তবু বলছি, তোমরা আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে।

মা-হাতিটি সূরযপ্রসাদের ভাষা বুঝলো কিনা সেই জানে, শুঁড় তুলে আওয়াজ করলো। তার দেখাদেখি আর আর হাতিরাও।

নরসিংহকে কাছে ডাকলেন সূরযপ্রসাদ। তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। বললেন, তুমি কি করে কি করলে বলো তো?

—সে অনেক কথা সাহেব। প্রথম কথা কি জানেন, ওরা আমাকে বিশ্বাস করে ওদের কাজে লাগাতে চেয়েছিল। এইটাই তাদের ভুল।

—আমিও তো তোমাকে বিশ্বাস করেছি নরসিংহ। সূরযপ্রসাদ বললেন, তাহলে আমিও ভুল করেছি।

—বিশ্বাস নয় সাহেব, নরসিংহ বললে, তার চেয়ে অনেক বড়ো কথা আপনি আমাকে ভালোবেসেছেন।

—তুমি এতো সুন্দর করে কথা বলতে পারো, আশ্চর্য! সূরযপ্রসাদ বললেন, নরসিংহ, তোমাকে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে, তোমার কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কথা বলার কিংবা শোনার সময় এখন নেই। এখনি আমাদের যেতে হবে ডালটনগঞ্জ। তবে তোমরা ভেবো না আমাদের কাজ শেষ।

বন্দীদের নিয়ে সূরযপ্রসাদ যখন ডালটনগঞ্জ বন-অফিসে পৌঁছলেন তখন রাত বারোটা।

তীব্র শীতের মধ্যেও প্রচুর মানুষ অপেক্ষা করছিল বন-অফিসের বাইরে। আর ভিতরে তো বনবিভাগের লোকজন আছেই। রাজ্যের বন-অধিকর্তা অনুপম দত্তগুপ্তও এসেছেন। এসেছেন পুলিশ প্রশাসনের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

অনুপম দত্তগুপ্ত নিজে এগিয়ে সূরযপ্রসাদকে জড়িয়ে ধরে বললেন, সাবাস প্রসাদজী। আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই।

সূরযপ্রসাদ বললেন, স্যার—এর জন্যে যদি সাধুবাদ জানাতে হয়, এদের সবাইকে জানান। এই মহিষাসুরদের বন্দী করতে পেরেছি নরসিংহ অবতারের জন্যে।

অনুপম দত্তগুপ্ত কৌতূহলী হলেন। নরসিংহকে দেখিয়ে সূরযপ্রসাদ বললেন, এই হচ্ছে নরসিংহ।

বিকটদর্শন নরসিংহের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বন-অধিকর্তাকে হাত জোড় করে নমস্কার জানালো।

সূরযপ্রসাদ বললেন, তবে এরা, মানে যারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সবাই আমাকে সাহায্য করেছে। জানেন স্যার, আমাদের সঙ্গে ছিল দশটি হাতি, তাদের অবদানও কম নয়। স্যার, আর কথা নয়—আমরা সবাই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত—

অনুপম বললেন, ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি। শুধু একটা অনুরোধ, আসামিদের লকআপে পাঠানোর আগে ওরা যদি একবার ওদের মহিষাসুর রূপ দেখাতো—

ডালটনগঞ্জ বন-অফিসের প্রাঙ্গণের ভিতরে-বাইরে ভিড় করা মানুষেরা মহিষাসুর রূপ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলো।

শান্তি ফিরে এলো পালামৌ-এর অরণ্যে।

ছবি : বিজন কর্মকার

চিন্ময়ী

নটরাজন

সেকালের মগধ সাম্রাজ্যের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা অজাতশত্রুর রাজসভা। সুপুরুষ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী রাজা অজাতশত্রু বসে আছেন সিংহাসনে। চারিদিকে পাত্র-মিত্র-অমাত্যের দল। দ্বারে শাণিত অস্ত্র হাতে সভাগৃহ পাহারায় রত ভীমদর্শন রাজপ্রহরীরা।

সুশাসন প্রতিষ্ঠিত মগধ সাম্রাজ্যে। প্রজারা সুখী। অজাতশত্রু একহাতে পালন করেন প্রজাদের, অন্যহাতে দমন করেন। তাঁর পরাক্রমে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। তাঁর পিতা বিম্বিসারের আমলের মগধ সাম্রাজ্যের সীমানা আপন বাহুবলে তিনি অনেকটাই বাড়িয়েছেন।

মহারাজা বিম্বিসার ছিলেন বৌদ্ধ। ভগবান বুদ্ধের কাছ থেকে তাঁর একটুকরো পায়ের নখ ভিক্ষা করে নিয়ে এসে তার ওপর তৈরি করেছিলেন আশ্চর্য সুন্দর এক বুদ্ধমন্দির। সেই মন্দিরে রাত-দিন লেগে থাকতো ভক্তের ভিড়। দূর-দূরান্ত থেকে বৌদ্ধ ভক্তেরা আসতো মন্দিরের শিল্পকলা দেখতে ও সেই সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের পুজো দিতে। মন্দিরে ভক্তের সেই সমাগম দেখতে দেখতে মহারাজা বিম্বিসারের মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠতো।

প্রজাপালনে, পরাক্রমে অজাতশত্রু ছিলেন তাঁর পিতা বিম্বিসারের মতোই ন্যায়বান, বিচক্ষণ ও পারদর্শী। তবে একটা ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে ছিল ভয়ানক গরমিল। বৌদ্ধধর্ম ছিল অজাতশত্রুর দু'চোখের বিষ। কিন্তু বিম্বিসার বেঁচে থাকতে এ নিয়ে মুখ খুলতে পারতেন না তিনি। অবশেষে বিম্বিসারের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে বসেই তিনি খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন বৌদ্ধধর্মের ওপর। সারা মগধ সাম্রাজ্যের যেখানে যত বৌদ্ধমন্দির ছিল সবই ধ্বংস করে ফেললেন। প্রজাদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে সাম্রাজ্যের কেউ ভগবান বুদ্ধের পুজো করতে পারবে না। তার বদলে সনাতন হিন্দু ধর্মের নিয়ম মতো পুজো-অর্চনা করতে হবে। ভগবান বুদ্ধের বদলে তারা মেনে চলবে কেবল বেদ, ব্রাহ্মণ ও দেশের রাজাকে। এর অন্যথা হলে তাদের ভোগ করতে হবে মৃত্যুদণ্ড।

এই একটিমাত্র বিষয়ে মগধের প্রজাকুল অখুশি হলেও তারা নিরুপায়। রাজ-আদেশ লঙ্ঘন করার স্পর্ধা তাদের নেই। প্রকাশ্যে তো নয়ই, এমনকি গোপনেও ভগবান বুদ্ধের পুজো করতে সাহসী হয় না তারা। রাজ-অনুচরদের প্রখর দৃষ্টি চারিদিকে। ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। নিশ্চিত মৃত্যু।

সনাতন হিন্দুধর্মের নিয়ম-কানুনের ওপর অজাতশত্রুর এমনই শ্রদ্ধা যে তিনি দেশের প্রজাকুলকে জানিয়ে দিলেন যে হিন্দুধর্মের নিয়মকানুনের সামান্যতম বিচ্যুতিও তিনি সহ্য করবেন না। ধর্মের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। এর অন্যথা দণ্ডনীয় অপরাধ। কাজেই ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী স্ত্রীলোক ও শূদ্রের বেদপাঠ বন্ধ হলো। একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া পুজো-অর্চনার অধিকারও রইলো না কোনো অব্রাহ্মণের। অজাতশত্রুর মতে ধর্মের নির্দেশের বাইরে দেবতার আরাধনা করা দেবতাকে অপমান করারই সামিল। কাজেই এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

মহারাজ অজাতশত্রুর এই নির্দেশের পরে সাবধান হয়ে গেল রাজ্যের অধিবাসীরা। ধর্মাচরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হতে আরম্ভ করলে। আর তাতেই রাজ্যের ব্রাহ্মণকুলের কাছে এসে গেল সুবর্ণ সুযোগ। অসৎ ব্রাহ্মণেরা সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ধর্মাচরণ-বিধির নানারূপ অপব্যাখ্যা করে ধার্মিক প্রজাকুলের কাছ থেকে অর্থ ও সেইসঙ্গে দ্রব্যসামগ্রী আদায় করতে শুরু করলে।

পৃথিবীর কোনো দেশে কোনোকালেই প্রবঞ্চক বা ঠকের অভাব ছিল না। আপন বুদ্ধিবলে অন্যকে ঠকানোই তাদের পেশা। এই জাতীয় ঠকেরা অতীতেও যেমনি ছিল, আজও তেমনি আছে আমাদের সমাজে। রাজ্যব্যাপী ব্রাহ্মণকুলের এই ক্ষমতা ও বাড়-বাড়ন্ত তাদের চোখ এড়ালো না। ব্রাহ্মণের এই প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে তারাও শুরু করলে আপন আপন কাজ গুছিয়ে নিতে।

স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট অজাতশত্রু রাজকর্মচারী ও অমাত্যদের একে একে ডেকে রাজ্যের খবরাখবর নিতে শুরু করলেন।

রাজ-আদেশে প্রথমেই উঠে দাঁড়ালেন মন্ত্রপাল অর্থাৎ পররাষ্ট্রবিষয়ক রাজপুরুষ। তাঁর কথা শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে ওঠেন অজাতশত্রু। খানিকক্ষণ চিন্তা করেন। তারপর বললেন, আপনি অনতিবিলম্বে দূত পাঠান লিচ্ছবিতে। ওখানকার রাজাকে জানিয়ে দিন যে এক পক্ষকালের মধ্যে যদি তিনি আমার বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী না হন তাহলে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করা হবে।

মন্ত্রপাল রাজ-আদেশ শিরোধার্য করে আসন গ্রহণ করতেই উঠে দাঁড়ান গূঢ়পুরুষ অর্থাৎ গুপ্তচরদের অধ্যক্ষ। তিনি কিছু বলার আগেই অজাতশত্রু আদেশ দিলেন, লিচ্ছবি সাম্রাজ্যে একদল সুশিক্ষিত গুপ্তচর পাঠিয়ে দিন। তারা গোপনে লিচ্ছবির সৈন্যবল, অস্ত্রবল ইত্যাদির সঠিক খবর যোগাড় করে আনবে। ঐ খবরের ওপর ভিত্তি করেই যুদ্ধযাত্রা করবে আমার সৈন্যরা।

এরপর মহাপ্রতীহারের পালা। অপেক্ষাকৃত যুবাপুরুষ মহাপ্রতীহার অর্থাৎ রাজধানীর নগররক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে রাজধানীর রক্ষাব্যবস্থার যাবতীয় খবরাখবর এক এক করে বলে গেলেন। শুনে খুশি হলেন অজাতশত্রু। তাঁর মুখে ছড়িয়ে পড়লো তৃপ্তির হাসি।

এবার রাজ্যের দণ্ডনায়ক অর্থাৎ বিচার-ব্যবস্থার অধ্যক্ষ। বৃদ্ধ দণ্ডনায়ক তাঁর বক্তব্য পেশ করতেই অজাতশত্রু জিজ্ঞেস করেন, আমার আদেশ লঙ্ঘন করে বুদ্ধকে পুজো করার অপরাধে বিগত পক্ষকালের মধ্যে আমি যাদের মৃত্যুদণ্ড দান করেছি, তাদের সেই দণ্ড কি কার্যকর হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ। শূলে চাপিয়ে তাদের দণ্ডদান করা হয়েছে।

এই জাতীয় অপরাধী আর কতজন আছে বিচারের অপেক্ষায়?

আজ্ঞে, আরও দশজন।

বেশ, একটু চিন্তা করেন অজাতশত্রু। তারপর আবার বললেন, সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ সহ আগামী সপ্তাহে তাদের বিচারের জন্যে আমার কাছে উপস্থিত করুন।

তাই হবে, মহারাজ। দণ্ডনায়ক আসন গ্রহণ করেন।

এবার উঠে দাঁড়ান পানীয়াগারিক অর্থাৎ রাজ্যের বিশ্রামগৃহ, পানশালা ইত্যাদির অধ্যক্ষ। অজাতশত্রু জিজ্ঞেস করেন, রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দ বিশ্রামগৃহ, পানশালা ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ ঠিকমতো পাচ্ছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ।

এ ব্যাপারে তাদের কোনো অভিযোগ আছে কি?

না মহারাজ, তেমন কিছু নেই। তবে—

তবে কি? অজাতশত্রু তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে।

একটু সময় দ্বিধা করে জবাব দেন পানীয়াগারিক, রাজ্যের অধিবাসীদের তুলনায় বিশ্রামগৃহের সংখ্যা কিছু কম। তাই মাঝে মাঝে তাদের সবাইকে আশ্রয়-দান করতে কিছু অসুবিধে হয়, মহারাজ।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে অজাতশত্রু তাকান রাজ্যের কোষাধ্যক্ষের দিকে। তারপর হুকুম দেন, আগামী এক মাসের মধ্যে সারা রাজ্যে এক সহস্র নতুন বিশ্রামগৃহ তৈরি করে দিন। দুঃস্থ ও পথিক প্রজাদের সেখানে থাকতে যেন বিন্দুমাত্র অসুবিধে না হয়।

তাই হবে, মহারাজ। কোষাধ্যক্ষ মাথা দুলিয়ে রাজাকে অভিবাদন করেন।

অজাতশত্রুর আদেশে এবার উঠে দাঁড়ান রাজ্যের জাঙ্গলিক। মগধ সাম্রাজ্যের মধ্যে যত জঙ্গল অর্থাৎ বনসম্পদ আছে, তার অধ্যক্ষ হচ্ছেন এই জাঙ্গলিক। গাছের গুঁড়ির মতোই বিরাট চেহারা তাঁর। কালো কুচকুচে গায়ের রং। ঝাঁকড়া চুল, মুখে দাড়ি-গোঁফ। তাঁর আর একটি উপাধি 'বিষবৈদ্য'। বনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও জঙ্গলের সাপ-খোপের হাত থেকে পথিক ও জঙ্গলের অধিবাসীদের রক্ষা করাই তাঁর প্রধান কাজ।

জাঙ্গলিকের দেওয়া খবরে অজাতশত্রুর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন খানিকক্ষণ। তারপর একসময় জাঙ্গলিকের উদ্দেশে বললেন, যদিও আমি মগধ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এবং সাম্রাজ্যের যাবতীয় বনভূমির মালিকও আমি, কিন্তু নিম্নবর্ণের যে অধিবাসীরা পুরুষানুক্রমে জঙ্গলে বাস করে, তাদেরও কিছু অধিকার রয়েছে ঐ জঙ্গল ও বনসম্পদের ওপর। সেই অধিকার থেকে তাদের আমি বঞ্চিত করতে পারি না। ঐ বনসম্পদের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে

আছে তারা। আজ যদি তাদের গাছ কাটা বন্ধ করে দিই তাহলে তাদের বেঁচে থাকার পথই বন্ধ হয়ে যাবে।

অজাতশত্রু একটু থামেন। তারপর বলতে থাকেন আবার, শুনুন জাঙ্গলিক, প্রচারের মাধ্যমে ওদের বুঝতে দিন, বনসম্পদই যখন ওদের বাঁচার একমাত্র পথ তখন ঐ সম্পদ রক্ষা করাও ওদের কর্তব্য। প্রয়োজনমতো ওরা যেমনি গাছ কাটবে তেমনি প্রতিটি গাছের বদলে একটি গাছ ওদের লাগাতে হবে এবং যত্ন করে সেটিকে বড় করে তুলতে হবে। এটাই জঙ্গলের অধিবাসীদের প্রতি আমার আদেশ। এই আদেশের অন্যথা হলে কঠিন শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

সাধু—সাধু। বনসম্পদ ধ্বংসের সমস্যার এমনি সমাধানে রাজসভার পাত্র-মিত্র-অমাত্যরা সাধুবাদ জানান মহারাজকে।

সবশেষে মহারাজ অজাতশত্রু রাজপুরোহিতের দিকে তাকাতেই বৃদ্ধ রাজপুরোহিত উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করেন তাঁকে। অজাতশত্রু এবার হালকা সুরে জিজ্ঞেস করেন, বলুন, কী বলার আছে আপনার?

আজ্ঞে মহারাজ, তেমন কিছুই বলার নেই। জবাব দেন রাজপুরোহিত।

রাজ্যের প্রজারা নিরুদ্বিগ্নে ধর্মাচরণ করছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ।

বেদ, ব্রাহ্মণ আর রাজাকে মেনে চলছে তো তারা?

মাথা নেড়ে সায় দেন রাজপুরোহিত।

হিন্দুধর্মের অনুশাসন তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্রাহ্মণ তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছেন তো?

এবার জবাব দিতে একটু সময় নেন রাজপুরোহিত। তারপর বললেন, তা অবশ্য পাচ্ছেন, মহারাজ। আপনার আদেশে রাজ্যে নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই সুযোগে পুকুরে কিছু বেনো জলও ঢুকে গেছে।

তার অর্থ? ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে অজাতশত্রুর।

জবাবে রাজপুরোহিত বললেন, খবর পেয়েছি কোনো কোনো অঞ্চলে নাকি একদল প্রতারক-প্রবঞ্চকের আবির্ভাব ঘটেছে।

ও—এই কথা? অজাতশত্রু মৃদু হাসেন। তারপর আবার বলতে থাকেন, মানুষের সমাজে চোর-ডাকাত-প্রতারক-প্রবঞ্চক তো থাকবেই। তা যদি না থাকতো তাহলে তো রামরাজ্য হয়ে যেতো। ওসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, রাজপুরোহিত। ওসবের প্রতিকার ও প্রতিবিধানের জন্যে মহাপ্রতীহার, দণ্ডনায়ক রয়েছেন। তাঁরাই এর বিহিত করবেন।

অজাতশত্রু থামতেই রাজপুরোহিত আবার বললেন, না মহারাজ, এরা সাধারণ প্রতারক, প্রবঞ্চক নয়। এরা দেশের প্রজাবৃন্দকে প্রতারণার মাধ্যমে দেবতাকে প্রতারণা করে চলেছে।

দেবতাকে প্রতারণা? সিংহাসনের ওপর সোজা হয়ে বসেন অজাতশত্রু। চোখে-মুখে ফুটে ওঠে ক্রোধের চিহ্ন।

হ্যাঁ মহারাজ। ঐ পাষণ্ডেরা হিন্দুর দেব-দেবীকে প্রতারণা করছে।

হিন্দুর দেব-দেবীকে প্রতারণা! উত্তেজিত অজাতশত্রু সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর রোষকষায়িত নেত্রে রাজপুরোহিতের দিকে এমনভাবে তাকান যেন রাজপুরোহিত নিজেই এর জন্যে দায়ী। ভয়ে রাজপুরোহিতের বুক দুর দুর করতে থাকে। মাথা নিচু করে চুপ করে থাকেন তিনি।

বজ্রনির্ঘোষে জিজ্ঞেস করেন অজাতশত্রু, বলুন রাজপুরোহিত, সব কথা খুলে বলুন। আমার এই সাম্রাজ্যে কোন সেই হতভাগ্য যারা নাকি দেব-দেবীর সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে? কে তারা? কী তাদের পরিচয়? তাদের আমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবো।

বিনীত ভঙ্গিতে জবাব দেন রাজপুরোহিত, তাদের সঠিক পরিচয় এখনও জানতে পারিনি, মহারাজ। তবে, তারা একদল ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ। জাতিতে শূদ্র। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ধনী প্রজাদের বাড়ি গিয়ে কেবলমাত্র অর্থ ও মূল্যবান পূজা-সামগ্রীর লোভে তারা দেব-দেবীর পুজো করে। সরল প্রজাবৃন্দ প্রতারিত হয়। সেই সঙ্গে প্রতারিত হন দেব-দেবীরা।

কী, এতবড় স্পর্ধা! উত্তেজিত অজাতশত্রু সেই মুহূর্তে নিষ্ফল আক্রোশে হাতের রাজদণ্ড দিয়ে সিংহাসনের ওপর আঘাত করেন। তারপর গূঢ়পুরুষ, দণ্ডনায়ক ও মহাপ্রতীহারের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাতেই সেই রাজপুরুষেরা শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ান।

বলতে থাকেন অজাতশত্রু, দেখুন—দেখুন আপনারা। বুঝুন নিজেদের কর্মদক্ষতা। পুজো-অর্চনা নিয়ে ব্যস্ত থেকেও রাজপুরোহিত যে খবর রাখেন, আপনারা প্রশাসনের কর্ণধার হয়েও আমার রাজ্যে এই অনাচারের কোনো খবর রাখেন না। এর চাইতে লজ্জার আর কী থাকতে পারে?

অজাতশত্রুর কথায় খানিকটা স্বস্তিবোধ করেন রাজপুরোহিত, আর অন্য রাজপুরুষেরা মাথা নিচু করে চুপ করে থাকেন।

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে অজাতশত্রু আবার বসেন তাঁর সিংহাসনে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দেন, শুনুন আপনারা। আমার রাজ্যে দেব-দেবীর এই অপমান এখনই বন্ধ করতে হবে। ধর্মের অনুশাসনকে অবজ্ঞা করে যে শূদ্র পুজোপাঠ করে দেববিগ্রহকে কলুষিত করবে, তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। আপনারা এখনই গোটা রাজ্যে আমার এই আদেশ ঘোষণা করে দিন। আর নজর রাখুন চারিদিকে। কোনো নরাধম যদি এমন কাজ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন্দী করে নিয়ে আসুন আমার কাছে।

বেশ কিছুকাল কেটে গেছে তারপর। মহারাজ অজাতশত্রুর আদেশ পালন না করার মতো বুকের পাটা কারুর নেই। এমনকি সেই ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী প্রবঞ্চক শূদ্ররাও আর সাহসী হয় না সেই অন্যায় কাজ করতে। তারা জানে, ধরা পড়লে মরতে হবে তাদের। অজাতশত্রুর মতো রাজার কাছে অন্য কোনো অপরাধে অপরাধী ক্ষমা পেলেও পেতে পারে, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে অনাচারীর কোনো ক্ষমা নেই।

সেদিন ছিল বিষ্ণু-উৎসবের দিন।

রাজ্যবাসীর ঘরে ঘরে সেই উৎসব। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর মূর্তি তৈরি করে পুজোর আয়োজন করেছে প্রজারা। রাজ্যজুড়ে শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে ব্রাহ্মণের উচ্চারিত পুজোর মন্ত্রে আকাশ-বাতাস মুখরিত। উৎসবের ছোঁয়া খোদ রাজপ্রাসাদেও। রাজ-অন্তঃপুরেও পুজোর আয়োজন।

উৎসব উপলক্ষেই সেদিন একটু তাড়াতাড়ি রাজসভা ভঙ্গের আদেশ দিলেন অজাতশত্রু। সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে পাত্র-মিত্র-অমাত্যরাও।

অন্দরমহলে যাবার জন্যে অজাতশত্রু সবে পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ সেখানে আবির্ভাব ঘটলো একজন শ্রেষ্ঠীর। চোখে তার জল।

ঘুরে দাঁড়ালেন অজাতশত্রু। জিজ্ঞেস করেন তাকে, কী হয়েছে আপনার? কাঁদছেন কেন?

আজ্ঞে মহারাজ, কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে সেই শ্রেষ্ঠী, না জেনে ঘোরতর পাপে আমি ডুবে গেছি। আর এ জন্যে যে দায়ী সেই পাপিষ্ঠের নাম মধুকর।

কী পাপ আপনার? কে সেই মধুকর? সব খুলে বলুন। বলতে বলতে অজাতশত্রু ফিরে এসে আবার সিংহাসনে বসতেই সেই শ্রেষ্ঠীর দিকে বিরক্তভঙ্গিতে তাকিয়ে সভাসদেরাও আবার আপন আপন আসন গ্রহণ করেন।

বিনীত ভঙ্গিতে শ্রেষ্ঠী বলতে থাকে তার কাহিনী—

শ্রেষ্ঠীর নাম ধনঞ্জয়। মোটামুটি সৎপ্রকৃতির এবং একটু ধর্মভীরু। প্রতি বছর বিষ্ণু-উৎসবের দিনে সেও উপোসী থেকে বাড়িতে পুজোর আয়োজন করে। আজও পুজোর আয়োজন শেষ করে পারিবারিক পুরোহিতের জন্যে সপরিবারে অপেক্ষা করছিল সে। কিন্তু পুরোহিতের আর দেখা নেই। অবশেষে খবর নিয়ে জানতে পারলে যে তাদের সেই পারিবারিক পুরোহিত হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দারুণ বিপাকে পড়ে শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়। এই অসময়ে সে কোত্থেকে যোগাড় করবে একজন নতুন পুরোহিত?

ইনি নিজেই হয়তো স্বয়ং বিষ্ণু।

মেঘ না চাইতেই জল। হঠাৎ ধনঞ্জয়ের বাড়িতে আবির্ভাব ঘটে একজন মধ্যবয়সী পুরোহিতের। গায়ে নামাবলী, পায়ে খড়ম, শিখায় বাঁধা একটি ফুল। হাতে যেন চাঁদ পায় শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়। মনে মনে ভাবে, ভগবান বিষ্ণুর তার প্রতি অপার করুণা। তাই এই অসময়ে স্বয়ং তিনিই এই পুরোহিতকে পাঠিয়েছেন। মনের কোণে আরও একটা সম্ভাবনা উদয় হয়। কে বলতে পারে, ইনি নিজেই হয়তো স্বয়ং বিষ্ণু। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে তিনি নিজেই হয়তো ছদ্মবেশে এসেছেন।

মিষ্টি কথাবার্তা, মধুর ব্যবহার পুরোহিতের। ধনঞ্জয় সপরিবারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তাঁর দিকে। যথাসময়ে আরম্ভ হয় পুজো। আশ্চর্য ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের উচ্চারণ পুরোহিতের। পরিবারের সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ।

পুজো শেষ। যথারীতি নির্মাল্য গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় যখন নিজের হাতে পুরোহিতের প্রাপ্য অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী তাঁর হাতে তুলে দিতে যাবে, ঠিক সেই সময় সেখানে এসে হাজির হয় ধনঞ্জয়ের এক বন্ধু ভাস্করদেব।

পুরোহিতের দিকে তাকিয়েই চমকে ওঠে ভাস্করদেব। বিস্ময়সূচক শব্দ করে সে চেঁচিয়ে ওঠে, একী মধুকর, তুমি এখানে? শূদ্র হয়ে তুমি এভাবে আমার এই বন্ধুকে ঠকিয়েছ?

ধরা পড়ে মুখ শুকিয়ে ওঠে মধুকরের। রাজদণ্ডাদেশের ভয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে তার দেহ। একমুহূর্ত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সে। পরক্ষণেই তার প্রাপ্য অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী সেখানেই ফেলে রেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়। দেবপুজোয় এমন অনাচারে কান্নায় ভেঙে পড়ে শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়। তার কেবলই মনে হতে থাকে এ জন্যে সে নিজেও কম দায়ী নয়। এক অজ্ঞাতকুলশীলকে এনে পুজোর আসনে বসিয়ে দেওয়া তার উচিত হয়নি। এর চাইতে পুজো না করাও ছিল অনেক ভালো।

শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের কাহিনী শুনতে শুনতে মহারাজ অজাতশত্রুর মুখখানা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে। এক ঝড়ের আশঙ্কায় সভাগৃহ নিস্তব্ধ। ধনঞ্জয়ের কাহিনী শেষ হতেই অজাতশত্রু জিজ্ঞেস করেন তাকে, আপনার সেই বন্ধু কোথায়?

আজ্ঞে, বাইরে অপেক্ষা করছে।

ডাকুন তাঁকে।

মহারাজকে প্রণাম করে ভাস্করদেব এসে দাঁড়াতেই অজাতশত্রু জিজ্ঞেস করেন, আপনি সেই মধুকর লোকটাকে চেনেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ।

কোথায় থাকে সে?

আজ্ঞে, রাজধানীর বাইরে যক্ষনাগ গ্রামে।

কী করে লোকটা?

আজ্ঞে, তা বলতে পারবো না, মহারাজ।

আপনি জানেন যে লোকটা ব্রাহ্মণ নয়?

লোকটার অপরাধ প্রমাণ হয় না?

আজ্ঞে, হ্যাঁ মহারাজ। লোকটা জাতিতে শূদ্র।

অজাতশত্রু এবার রাজসভায় দণ্ডনায়কের দিকে তাকাতেই দণ্ডনায়ক উঠে দাঁড়ান। অজাতশত্রু বললেন, শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় ও তাঁর বন্ধু ভাস্করদেব এতক্ষণ যা বললেন, তাতে কি সেই মধুকর লোকটার অপরাধ প্রমাণ হয় না?

জবাব দেন দণ্ডনায়ক, হ্যাঁ মহারাজ। ঐ মধুকর লোকটা নিঃসন্দেহে অপরাধী।

তাহলে এই মুহূর্তে তার অনুপস্থিতিতেই তাকে আমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। কথার শেষে অজাতশত্রু রাজপুরোহিতের দিকে তাকিয়ে অনুযোগের সুরে বললেন, আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে আমার রাজ্যে নাকি এই পাপ বন্ধ হয়ে গেছে। এবার প্রমাণ হলো যে আপনার খবর একান্তই ভুল।

অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন রাজপুরোহিত।

একটু সময় চুপ করে থেকে অজাতশত্রু আবার বললেন, আপনার ওপর ভার রইলো অপরাধী মধুকরকে ধরে আনার। এই কাজে আপনাকে সাহায্য করবেন মহাপ্রতীহার।

একদিন-দু'দিন করে এক সপ্তাহ কেটে যায়, কিন্তু ধরা পড়ে না মধুকর। তার বাসস্থান যক্ষনাগ গ্রামেও সে নেই। বিরাট দলবল নিয়ে রাজপুরোহিত ও মহাপ্রতীহার গোটা রাজ্যে খুঁজে বেড়ান সেই অপরাধীকে। অবশেষে অষ্টম দিনে ধরা পড়লো মধুকর। কৃষকের ছদ্মবেশে একজন ভূস্বামীর জমিতে যখন সে চাষ করছিল তখনই সে ধরা পড়লো রাজপুরুষদের হাতে।

সিংহাসনে মহারাজ অজাতশত্রু। সামনে শৃঙ্খলিত মধুকর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। ভয়ে সে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। ইতিমধ্যেই সে শুনেছে যে রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। শূলে চড়িয়ে তাকে হত্যা করা হবে।

অপরাধী মধুকরকে কোথায় কীভাবে ধরা হয়েছে, রাজপুরোহিত সেকথা সগর্বে মহারাজের কর্ণগোচর করে আপন আসনে বসতেই অজাতশত্রু মধুকরকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করছো?

সহসা কোনো জবাব দেয় না মধুকর। ধমকে ওঠেন অজাতশত্রু, কী চুপ করে রইলে কেন? কথার জবাব দাও।

কম্পিত কণ্ঠে বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করে মধুকর, আমার কোন অপরাধের কথা বলছেন, মহারাজ?

কেন, তুমি কি একাধিক অপরাধ করেছ?

জবাব দিতে একটু সময় নেয় মধুকর। তারপর বললে, শুনেছি মহারাজ নাকি আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। মরতেই যখন হবে তখন আর মিথ্যে বলবো না, মহারাজ। পেটের দায়ে অনেককেই আমি প্রতারণা, প্রবঞ্চনা করেছি।

তুমি কি ব্রাহ্মণ?

আজ্ঞে না মহারাজ, আমি শূদ্র।

বিষ্ণু-উৎসবের দিন তুমি কি শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়ের বাড়িতে নিজেকে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে পুজো করেছিলে?

একটু দ্বিধার সুরে জবাব দেয় মধুকর, হ্যাঁ মহারাজ।

কেন করেছিলে?

অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রীর লোভে।

শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে পুজো করে আমার আদেশ লঙ্ঘন করতে তোমার ভয় হলো না?

জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে মধুকর। অজাতশত্রু আবার জিজ্ঞেস করেন, শুনলাম তুমি নাকি খুব সুন্দর পুজোর মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলে। পুজোর মন্ত্র ও নিয়মকানুন তুমি শিখলে কোথায়?

আজ্ঞে তাও প্রবঞ্চনা করে। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে নিজেকে ব্রাহ্মণ সন্তান পরিচয় দিয়ে।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন অজাতশত্রু, এখন বুঝতে পারছি প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করাই তোমার পেশা। এমন প্রবঞ্চকের একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য। সেই দণ্ডই আমি তোমাকে দিয়েছি। মৃত্যুর জন্যে তুমি প্রস্তুত হও।

অজাতশত্রুর কথায় মধুকরের সারা দেহ আবার কাঁপতে থাকে থরথর করে। ভয়ে নীল হয়ে ওঠে তার ঠোঁটজোড়া। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে কপালে। আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে মধুকর, আমাকে—আমাকে বাঁচতে দিন, মহারাজ। ক্ষমা করুন আমাকে।

ক্ষমা? একমুহূর্ত মধুকরের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে অজাতশত্রু আবার বললেন, মানুষকে প্রবঞ্চনা করলে তাকে যদিও বা ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু দেবতাকে প্রবঞ্চনা করার কোনো ক্ষমা নেই। শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণের কাজ করে তুমি ভগবান বিষ্ণুকে প্রবঞ্চনা করেছ, দেবতাকে কলুষিত করেছ। তোমার এই অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। মরতেই হবে তোমাকে।

অজাতশত্রুর কথায় উপস্থিত সভাসদেরা একযোগে সমর্থন করেন তাঁকে, হ্যাঁ, এই জঘন্য অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

বিনীত ভঙ্গিতে হঠাৎ বলে ওঠে মধুকর, না মহারাজ, আমি শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয়কে প্রবঞ্চনা করলেও দেবতাকে প্রবঞ্চনা করিনি। ভগবান বিষ্ণুকে ঠকাইনি।

তার অর্থ?

নিচু কণ্ঠে তেমনি ভয়ে ভয়ে জবাব দেয় মধুকর, শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে যে বিষ্ণুমূর্তির আমি পুজো করেছি সেটা ছিল কেবল একটা মাটির পুতুল। তাতে প্রাণ ছিল না।

মধুকরের কথায় সভাসদেরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। লোকটা কী সব অসংলগ্ন কথা বলছে! পাগল নাকি লোকটা!

স্বয়ং মহারাজ অজাতশত্রুও বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মধুকরের দিকে। অবশেষে কঠিন সুরে তিনি আবার বললেন, এভাবে কথা বলো না মূর্খ। দেবতার মূর্তিকে বলছো মাটির পুতুল? এত বড় স্পর্ধা তোমার?

অপরাধ নেবেন না মহারাজ। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে মধুকর, আমি সত্যিই মূর্খ, মহারাজ। আমি প্রতারক, প্রবঞ্চক। তবে শূদ্র হলেও আমি পুজোর মন্ত্র ও নিয়মকানুন জানি। আমি এও জানি পুজোর শুরুতে দেবমূর্তির হৃদয় স্পর্শ করে মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবমূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। কিন্তু তা না করা পর্যন্ত ঐ মূর্তি কেবল মাটির পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তো পুজোর যাবতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করলেও প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র আমি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গিয়েছি, মহারাজ। পাছে দেবতাকে ঠকাতে হয় সেই ভয়ে মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা আমি করিনি। ইচ্ছে করেই মৃন্ময়কে চিন্ময় করিনি।

নিস্তব্ধ সভাগৃহ। সবাই একযোগে কেবল তাকিয়ে থাকেন প্রতারক মধুকরের দিকে। তাদের মনের মধ্যে মধুকরের কথাগুলোই বারে বারে আন্দোলিত হতে থাকে। গভীর চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে রাজপুরোহিতের কপালে।

নিস্তব্ধ অজাতশত্রু স্বয়ং। তাঁর মনের অবস্থাও অন্যদের মতো। পুরোহিত দেবমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করলে কি সত্যিই মৃন্ময় চিন্ময় হয়ে ওঠে না? দেবমূর্তির মধ্যে জেগে ওঠে না প্রাণের স্পন্দন?

অভিভূত অজাতশত্রু সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর ধীরে ধীরে রাজমঞ্চ থেকে নেমে এসে মধুকরের সামনে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এইমাত্র যা বললে তা কি তুমি বিশ্বাস করো, মধুকর?

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল মধুকর। অজাতশত্রুর প্রশ্নে ধীরে ধীরে সে মাথা তোলে। দু'চোখে তার জলের ধারা। সেই সজল চোখে অজাতশত্রুর দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় সে বললে, হ্যাঁ মহারাজ। আমি প্রতারক, প্রবঞ্চক। কিন্তু আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র উচ্চারণ করলেই দেবমূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠে পুজো গ্রহণ করেন।

মহারাজ অজাতশত্রু আর সামলাতে পারেন না নিজেকে। প্রতারক মধুকরের একটা হাত চেপে ধরে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে ওঠেন, ধন্য তুমি, মধুকর। তুমি শূদ্র হয়ে মনে-প্রাণে যা বিশ্বাস করো, আমি জানি না সত্যিকারের ব্রাহ্মণের মধ্যে ক'জনের সেই বিশ্বাস আছে?

কথার শেষে অজাতশত্রু একবার তাকান রাজপুরোহিতের দিকে। তারপর আবার মধুকরের উদ্দেশে বললেন, এই মুহূর্তে আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম, মধুকর। শূদ্র হয়েও আমার আদেশে আজ থেকে তুমি ব্রাহ্মণের কাজ করার অধিকার লাভ করলে। মিথ্যে ব্রাহ্মণের পরিচয়ে নয়, সত্যিকারের শূদ্রের পরিচয়েই এখন থেকে তুমি দেবতার পুজো করতে পারবে। তোমার মতো শূদ্রের পুজোই গ্রহণ করবেন মৃন্ময়ের মধ্যে জেগে ওঠা চিন্ময় দেবতা।

ছবি : সুফি

ম্যাডাম শিখছে হিন্দি

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

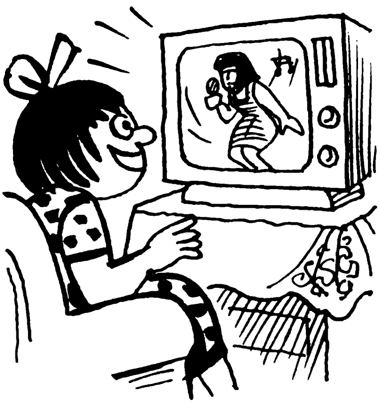

ইন্দি বিন্দি সিন্দি
ম্যাডাম শিখছে হিন্দি
সঙ্গে শিখছে ইংলিশ
মিথ্যে শিখছো বাংলা
ম্যাডাম হবে যে আমলা
তোমরা করবে কুর্নিশ!

টিভিটা যখনি খুলছে
যা-জানে বাংলা ভুলছে
হিন্দি গানের চটকে
ম্যাডাম অ্যাপার্টমেন্টে
তোমরা থাকবে টেন্টে
কিংবা দাঁড়াবে ফটকে!

হিন্দি লিখছে পড়ছে
ব্রেনটা ওয়াশ করছে
মগজ ধোলাই মেশিনে
হিন্দিতে দাঁত মাজছে
হিন্দির জল ঢালছে
বাংলার ফাটা বেসিনে!

বাংলা ভাষার গর্বে
তোমরা যে শেষ পর্বে
ম্যাডাম প্রথম পৃষ্ঠায়
তোমরা এবার বুঝবে
বার্নিং ঘাট খুঁজবে
বাংলা শেখার নিষ্ঠায়!!

ভুলো আর বুতাইমাসি

কার্তিক ঘোষ

ভুলো যে খুব ভুলোমনের এমন নয়। বরং একটু বেশি বেশি সব কিছু মনে থাকে ভুলোর। তবু বুতাইমাসি বুলানদের বাড়ি বেড়াতে এসে ওর নাম দিলেন কি না ভুলো। অবশ্য বোনটারও একটা নাম হলো পরের দিন। বুলানের মা বললেন, ভুলোর বোন তাহলে ভুলি।

নাম দুটো শুনে ভুলোর মা তো খুব খুশি।

ভাগ্যিস বাচ্চা দুটোকে নিয়ে চুপি চুপি বুলানদের মিটার ঘরের ঘুপসিতে ঢুকে পড়েছিল সেদিন। না হলে কী আর শান্তিনিকেতনের হাড়কাঁপুনি শীতে বাছারা বাঁচত এতদিন!

চোখ ফুটতেই ভুলো কিন্তু বুঝে নিয়েছিল ব্যাপারটা। পরের বাড়িতে মা যেন চোরের মতো আছে। সব সময় ভয়। এই বুঝি বুলানের বাবার চোখে পড়ে গেল বাচ্চা দুটো! বাপরে! কুকুর দেখলেই সবার আগে জুতো সামলান বুলানের বাবা। কুকুর মানেই নাকি জুতো-চোর।

ভুলো অবশ্য বিশ্বাস করে না ব্যাপারটা।

মা কখনো চুরিটুরি পছন্দ করে না—ভুলো এটা জানে। শুধু ভুলিটাকে নিয়ে একটু মুশকিল। খিদে পেলেই কুঁই কুঁই করে কাঁদে। ছুঁক ছুঁক করে এদিক-ওদিক।

ওই রকম কুঁই কুঁই করে কাঁদতে গিয়েই তো একদিন ধরা পড়ে গেল দুজনে।

সবে তখন চোখে ফুটেছে ওদের। মা ওদের দুধটুধ খাইয়ে টিফিন করতে গেছে অতিথিশালার পিছনে। সেখানে রান্নাঘরের জানলার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেই বুড়ো রান্নার ঠাকুর এঁটো-কাঁটা যতটা পারে ছুঁড়ে দেয় নেড়ির দিকে। হ্যাঁ। শান্তিনিকেতনের সবাই ভুলোর মাকে নেড়ি বলেই চেনে।

নামটা অবশ্য মায়েরও তেমন পছন্দ নয়, ভুলো জানে। কিন্তু কী আর করা যাবে! মায়ের ছোটবেলায় তো আর বুতাইমাসি ছিলেন না।

আহা! কী নরম মিষ্টি মন বুতাইমাসির। প্রথম দেখেই ভুলোকে একেবারে কোলে তুলে নেন বুতাইমাসি।

ভাগ্যিস ভুলিটা খিদের চোটে কুঁই কুঁই করে কাঁদছিল! তাই তো হইচই করে বাড়ি মাথায় তুলল বুলান।

ওর বাবা তো কুকুরছানা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন রাগে। মা বললেন, মিটার ঘরে কখন এলো ওরা! বুতাইমাসি সাত তাড়াতাড়ি ভুলোকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, সত্যিই তো! কী ফুটফুটে বাচ্চা!

বুলান হাঁ করে চেয়ে রইল বুতাইমাসির দিকে। ভুলো মনে মনে বললে, ঠিক হয়েছে।

সেদিন সারাদিনই বুলানদের বাড়িতে কুকুরছানাদের নিয়ে চলল নানা রকম ঝক্কি-ঝামেলা। মা ঠিক কী করবে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে বুঝে উঠতে পারছিল না। মিটার ঘরের দরজাটা একটু ভাঙা ছিল তাই রক্ষে!

সাত তাড়াতাড়ি একটা তালা ঝুলিয়েও ওদের জব্দ করতে পারলেন না বুলানের বাবা। সন্ধ্যে হতেই মা ঠিক বাচ্চা দুটোকে কায়দা করে ঢুকিয়ে দিলে ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে। শীতের ভয়ে সে রাতটা ভাই-বোনে জড়াজড়ি করে শুয়ে রইল মা'কে ছেড়ে।

মা রইল মিটার ঘরের বাইরে। চোরের মতো। চুপটি করে।

পরের দিনই অবশ্য ওদের ভাই-বোনের নাম রাখলেন বুতাইমাসি।

বললেন, যাবার সময় ভুলোকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। বুঝলি নেড়ি?

ভুলোর মায়ের চোখটা বোধহয় খুশিতে একটু চিকচিক করে উঠল। যাক। তবু ভুলোটার একটা হিল্লে হবে। খাবে-দাবে। আদর-যত্নে বুতাইমাসিদের বাড়ি থাকবে। সবাই আর রাস্তার কুকুর বলে দূরছাই করবে না ছেলেটাকে।

শুধু ভুলির একটু রাগ হলো ভায়ের ওপর। মিছিমিছি ল্যাজটা একটু কামড়ে দিয়ে বললে, কার সঙ্গে খেলবি কলকাতায়?

ভুলো বললে, আমি চাকরি করব পুলিশে।

সেইটুকুই যা কথা।

তারপর তো যাবার দিন বুতাইমাসি সত্যি সত্যিই কোলে করে নিয়ে রিকশায় উঠলেন। ভুলোর মা সামনে এসে দাঁড়াল ফ্যালফ্যালে চোখে।

বুতাইমাসি বললেন, ভাবিস না নেড়ি, তোর ভুলো আমার কাছে ভালোই থাকবে। মাঝে মাঝে ওকে নিয়েও আসব শান্তিনিকেতনে।

তবু মায়ের মন তো। ভুলোর মা বোলপুর স্টেশন পর্যন্ত এলো ছেলের জন্যে। ট্রেন ছাড়বার আগে বুতাইমাসি একবার কোল থেকে নামিয়ে দিলেন ভুলোকে। ওর মা এসে ছেলের গা-টা একটু চেটেচুটে, গলার কাছটা কামড়ে-কুমড়ে আদর করে দিলে।

কলকাতা যাবার আনন্দে ভুলো মায়ের জন্যে কাঁদতেও ভুলে গেল।

ভর দুপুরে ট্রেনটা ছেড়ে দিলে।

সত্যি সত্যিই সেদিন সন্ধ্যে হবার আগেই ভুলো কলকাতা চলে এলো।

বাড়িটা মন্দ নয় বুতাইমাসিদের। খাতির-যত্নও ভালো। তবু কোথায় যেন কী হলো। চোখে ঘুম আসে না ভুলোর। মায়ের জন্যে মন কেমন করে। ভালো বিস্কুট, দুধমাখা ভাত খাবার থালায় পড়ে থাকে। ভুলিটার জন্যে মনটা হুহু করে ওঠে। খিদে পেলে ভুলিটা কেমন কুঁই কুঁই করে কাঁদে।

ভুলো মনে করার চেষ্টা করে সব রাস্তাঘাট।

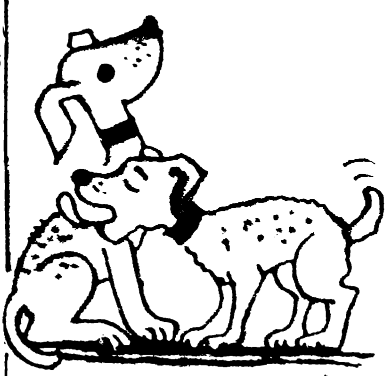

কদিন ধরে বুদ্ধি খাটায় মনে মনে। কলকাতার কুকুররা যদি সেই বড় ইস্টিশনটা চিনিয়ে দেয় তাহলেই হবে। শান্তিনিকেতনের ট্রেনটা কেমন দেখতে ভুলোর ঠিক মনে আছে।

আসবার সময় অবশ্য ভুলোর জন্যে টিকিট কেটেছিলেন বুতাইমাসি। যাবার সময় কী হবে! কে টিকিট কাটবে ভুলোর?

ভুলো অত সব ভাবতে পারলে না আর। বুতাইমাসির মেয়ে ইস্কুলে যাবার পর থেকেই ভুলো কিনা একা একাই বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

সেই থেকে কেঁদেকেটে হইচই করে একাই একশা করলেন বুতাইমাসি। আহারে! ভুলোটা যে এখনও দুধের বাছা। রাস্তায় না গাড়ি চাপা পড়ে।

বাড়ির সবাই খুঁজে খুঁজে হয়রান হলো ভুলোকে।

পাড়ার ডাকাবুকো কুকুরগুলো সব জেনেশুনেও যেন চুপ করে রইল সবাই। কেউ রা কাড়লে না ভুলোকে নিয়ে।

তারপর...

দেখতে দেখতে বেশ কদিন চলে গেল। হঠাৎ একদিন একটা পোস্টকার্ড এলো বুলানের। ছোট্ট একটুখানি চিঠি।

'বুতাইমাসি, ভুলো কাল শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছে। ওরা ভাই-বোনে এখন আমাদের বাড়িতে ভালোই আছে। চিন্তা কোরো না।'

ছবি: অমিত চক্রবর্তী

ভালো বাসা

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

পবনবাবুর ভবন ভালো
মদনদাদুর সদন,
নাশাদদাদার প্রাসাদ দারুণ
বললে হেসেই বদন!

জালান-জেঠুর দালান ভালো
শীলাদিদির ভিলা,
অ্যাংলো-কাকুর বাংলো খাসা
ওই যে পাহাড়টিলায়!!

ঢাউস হাউস, ফ্ল্যাট-হাউজিং
ঘরগুলো খোপ-খুপরি,
স্বস্তিবিহীন বস্তি জুড়েই
লক্ষ ঝোপড়া-ঝুপড়ি!

একচালা বা দোচালা ঘর
চারচালা-আটচালা,
গ্রামের বুকে বসছে সুখে
দোকান ও পাঠশালা!!

হোটেল-মোটেল, পান্থনিবাস
চটি-সরাইখানা,
লজ-মেস-ইন, হলিডে হোম
থাকার জায়গা নানা!

হর্ম্য-পুরী-সৌধ-মহল
কতই জগৎ জুড়ে,
স্বর্ণঢালা পর্ণশালা
আমার মাটির কুঁড়ে!!

ছবি: সুফি

বরযাত্রী হোঁৎকা

শক্তিপদ রাজগুরু

বরযাত্রী যাবার আনন্দে হোঁৎকা অধীর হয়ে তার দেশজ ভাষায় বলে—হঃ! বিহার মধ্যে বরযাত্রী যাওনই আনন্দের। গাড়িতে যামু—খামু—হৈচৈ করুম।

গোবর্ধনের ছোট মামার বিয়ে, হরিপালের ওদিকে কোন এক গ্রামে। তাই গোবর্ধনের বন্ধু হিসাবে লিস্টের মধ্যে আমরাও আছি। তবে বরযাত্রী দলে তরুণদের সংখ্যা কমই, মাত্র আমরা ক'জন। পটলা, ফটিক, আমি আর হোঁৎকা। গোবর্ধন তো নিতবর হতে হতে রয়ে গেছে।

এখান থেকে বাসে বরযাত্রীকুল যাবে, বর অবশ্য আলাদা গাড়িতে যাবে। বর বলে কথা! ফেরার সময় নতুন কনেও আসবে ওই গাড়িতে। বেশ ফুল, সবুজ শেওলা-টেওলা দিয়ে প্রজাপতি বানানো হয়েছে গাড়ির সামনে।

বিকেল নাগাদ বের হতে হবে। গোবর্ধনের মামার কুমড়োর আড়তে আমরা জমায়েত হয়েছি। ওপাশে ওদের বাড়ি, আড়তে কুমড়োর টাল, এক কেজি থেকে মৃদঙ্গের সাইজের আট-দশ কেজিটাকও আছে, ওদিকে চালকুমড়োর স্টক। পাউডার মাখানো পাশবালিশ, তাকিয়ার সাইজও আছে।

আজ কুমড়ো সেল বন্ধ। গোবরার মামা নদুবাবু তারকেশ্বরের কুমড়োর সাইজের ভুঁড়ি ঢেকে গরদের পাঞ্জাবি পরেছে। বর্ণটি কালো—তাতে চালকুমড়োর গায়ের মতো পাউডারের প্রলেপ পড়েছে, গলায় মফচেন হার।

ওদিকে এসে পড়েছে পাড়ার অনুকূল কবরেজ। শীর্ণ, পাকা বেলের মতো চকচকে মাথা, কণ্ঠস্বর খাগড়াই ফাটা কাঁসরকেও হার মানায়। রয়েছে গুরুগম্ভীর মানুষ আমাদের স্কুলের সংস্কৃত স্যার, গলায় উত্তরীয়, পরনে চটি। বাজারের ম্যানেজার হাবুলবাবু। বাজারের মাছ, ডিম, আনাজপত্র বিনা পয়সায় খেয়ে খেয়ে দেহটিকে যেন একটি জিপিও থামে পরিণত করেছে। কথায় কথায় লোককে শাসায়। গোবর্ধনের মামার বন্ধু কেশব ডাক্তারও এসেছে। বাজারে কেশববাবুর হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা।

অনুকূল কবরেজ ওকে দেখে বলে—ওই সাদা গুলিটাও বরযাত্রী যাচ্ছে?

কেশব ডাক্তারের পাশেই অনুকূলের কবরেজখানা। দুজনের প্রায়ই ঝগড়া বাধে। ও বলে—আমার রুগী ভাঙাবি?

কেশব বলে—শেকড়বাকড় দে রোগ

সারে? সারে না। হ্যানিম্যান বলেন—
—রাখ তর হ্যানিমুন। চরক-শুশ্রুতের নাম শোনসনি? গণ্ডমূর্খ—
—খবরদার!
দুজনেই দোকান ছেড়ে পথে অবতীর্ণ হয়। এদিকে চকচকে টাক, অন্যদিকে বাবরি চুল কেশব। শেষে রোগীরাই তাদের ডাক্তার-কবরেজকে সামলায়। আজ কেশব এখানে এসে ওই মন্তব্য শুনে বলে—বরযাত্রী যাচ্ছো চলো কবরেজমশাই, বাজে কথা বলো না। নো টক।
আমাদের সংস্কৃত স্যার আশুবাবু বলেন—শান্তি-শান্তি—
ওদিকে বাকি বরযাত্রী দলও এসে পড়েছে। বরের গাড়ি রেডি। যেতে হবে অনেকটা পথ। আর কলকাতা থেকে বিকেলের দিকে যানজট ভেদ করে বের হওয়া অভিমন্যুর চক্রব্যূহ ভেদ করে বের হবার মতোই কঠিন ব্যাপার।
অবশ্য লগ্ন রাত্রি নটার পরই। তবু দূরের পথ। গোবর্ধনের মামাই বরকর্তা। মামা ওই গাড়িতে বরের সঙ্গে নাপিত, পুরুতকে নিয়ে নিজে উঠে ম্যানেজারকে বলে—গাড়ি এলে এদের নে এসো। হরিপাল রোডের থেকে ডানদিকে কানা নদীর ধারে মাথাভাঙা কাদাপোঁতা গ্রাম।
কুমড়োর আড়তদার রাজুবাবু। ম্যানেজার ওখানে কুমড়ো আমদানি করতে কয়েকবার গেছে। বলে—ঠিক আছে।
এদিকে শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বরকে বিদেয় করা হলো। বরযাত্রীদের বাহনের দেখাই নাই। কে জানে বরযাত্রীবিহীন বিয়েই হবে। ওদিকে ফোন করে ম্যানেজার। বাসওয়ালা জানায় গাড়ি শ্রাদ্ধবাড়িতে গেছে, পার্টিকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাবে।
পণ্ডিতমশাই বলে—শ্রাদ্ধ তৎপর বিবাহ! কেমন অশুভ ব্যাপার হে—
অনুকূল কবরেজের আবার ভূতের ভয়। অবশ্য এ খবরটা অনেকেই জানে না। আমরা দেখেছি কুলেপাড়ার বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে সন্ধ্যার পর যাবার সময় কবরেজমশাই সজোরে রামনাম করে। সেদিন আমাদের দূর থেকে দেখে রামনাম ছেড়ে বু বু বু...করতে শুরু করে। ছিটকে পড়ে আর কি! আমাদের চিনতে পেরে ধড়ে প্রাণ ফিরে পায়—তো-তো তোরা! সাড়া দিবি তো! আমরা হাসছি ওর অবস্থা দেখে। কবরেজ বলে—কাউকে বলিসনি বাবা। ওই কেশব যেন না শোনে।
আমরা অবশ্য কাউকে বলিনি, কবরেজমশাই ঘুষ বাবদ চ্যবনপ্রাশের গুলি কিছু দেয় আমাদের।
এহেন কবরেজ বলে—সত্যিই শ্রাদ্ধের ছোঁয়া-টোয়া নিয়ে বিয়েতে যাবে!
ম্যানেজার বলে—লোহাতে দোষ নেই।
বিকেল গড়িয়ে আসছে। শীতের দিন। আলো মুছে আসছে খালের বুকে। গাছগাছালিতে কাকের দল দিনের পরিক্রমা সেরে ফিরছে। বাসটা এলো এইবার।
বরযাত্রী দল রেডিই ছিল। বাহান্ন সিটের বাস ভর্তি হয়ে গেল দেখতে দেখতে। আমরা কজন অবশ্য উঠেই সিটকটা দখল করেছি। ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় কবরেজ বসেছে কেশবের পাশেই, দুজনের মুখ দুদিকে, যেন ছোঁয়াও লাগাতে রাজী নয় কেউ কারোও।
ম্যানেজার লাদাই পর্ব শেষ করে। কুমড়ো লোড করা মাথা, তাই বাকি কয়েকজনকেও তুলে এদিক-ওদিকে দাঁড় করিয়ে দেয়। বাসও যাত্রা করলো।

দিল্লী রোড ছাড়িয়ে এবার বাস বাবার পথ দিয়ে চলেছে। সংস্কৃতের স্যার দু'হাত তুলে বাবা তারকনাথের উদ্দেশে স্তোত্র আওড়ায়—

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং
. . . .
প্রণমামি শিবম্ শিবকল্পতরুম্॥

কে জয়ধ্বনি দেয়—জয় বাবা ভূতনাথ! এ ভূতপ্রেতের রাজ্য হে।
অনুকূল কবরেজের টাক ঘামছে।
কেশব বলে—ভূতের দেশই বটে।
ধমকে ওঠে কবরেজ—ওনাদের নাম না নিলেই নয়?
ওদিকে বাজারের মাছের কারবারী নকুল এর মধ্যে বাবার প্রসাদও পেয়ে গেছে। সিগ্রেটের ভিতরে গঞ্জিকা পুরে জোরসে টান দিয়ে হিসাব করে দামী ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চোখ বুজে সে বলে—মলে সব ব্যাটাকেই তো ওই-ই হতে হবে গো। ভূতনাথই পরম গতি। জয় বাবা ভূতনাথ।
পথ অন্ধকার। বাস চলেছে এবার নাচতে নাচতে। বরযাত্রী দলের পেটে দুপুর থেকে কিছুই পড়েনি। খালি পেটে বাসের নাচনে খোল-কত্তাল বাজতে শুরু করে।
কালীবাবু বাজার ম্যানেজার হাবলুবাবুকে বলে—কি হে ম্যানেজার, তুমি বরযাত্রী নে যাচ্ছো না কুমড়ো চালান দিচ্ছ হে? লোকগুলোর কি খিদে-তেষ্টাও নাই? একটু চা-টা খাওয়াও হে।
ম্যানেজার ভেবেছিল এই বাবদ খরচটা পুরো বাঁচিয়ে নিজেই ম্যানেজ করে নেবে। কিন্তু গোবর্ধন বলে—সামনেই একটা ধাবা আছে, ম্যানেজারবাবু ওখানেই চা-টা মিলবে।
ম্যানেজার গাঁইগুঁই করে—এই তো এসে গেছি। কিন্তু বরযাত্রীদের চটানো নিরাপদ নয়। কাজেই থামাতে হলো বাসটাকে।
ম্যানেজারের বেশ কিছু লোকসানই হলো। বরযাত্রীর দল শুধু চাতেই থামেনি, টাও খেয়েছে—বিস্কুট, টোস্ট, কেউ আবার ওমলেট।
ম্যানেজার বলে—তাড়াতাড়ি করুন ডাক্তারবাবু, বিয়েবাড়িতে গিয়ে জলটল খেতে হবে আবার। কিন্তু সে কথাতে কেউ কান দেয় না।

বিয়েবাড়ি অবশ্য সেখান থেকেও ঘণ্টা খানেকের রাস্তা। তবে এটা পাকা রাস্তা নয়, মেঠো রাস্তা। মোরাম ইঁটভাঙা ঢালা। কুমড়ো, আলুর লরিই যাতায়াত করে। বাসওয়ালা বেঁকে বসে—নেহি যায়েগা।
একেবারে মাঝ মাঠ। রাতের অন্ধকার নেমেছে। পথের ধারে একটা পুরোনো বটগাছ, এদিক-ওদিকে ঝুরি নেমেছে।
দত্তমশায় নেমে বলে—এ কোথায় এলেম হে?
কবরেজ মশাই নেমেই আঁৎকে ওঠে। ওর চকচকে টাকে সাদা চুনগোলা কিছুটা বস্তু পড়েছে গাছের উপর থেকে। তারপরই ডাল কাঁপিয়ে শন শন শব্দ। কোথায় একটা বাচ্চা ছেলে ককিয়ে ওঠে।

কাঁটাগাছে কাপড়টা রেখেই হাওয়া।

—রাম রাম রাম! কবরেজমশাইয়ের টাক থেকে সেই তরল বিষ্ঠা গড়িয়ে কপালে এসেছে। রুমাল দিয়ে মুছে নেয়। তবু কপালে খানিকটা লেগে থাকে তিলকের মতো।

হাবলুবাবু বলে—শকুনির পাল রয়েছে গাছে। কাছেই শ্মশান।

—অ্যাঁ! কবরেজমশাই কেন, অনেকেই আঁৎকে ওঠে। ভূতের রাজ্যে এসে পড়েছে। কেশব ডাক্তার ভয় পেলেও চুপ করে থাকে। সংস্কৃতের পণ্ডিত তখন কালীস্তোত্র শুরু করেছে—ওঁ কালী কালী মহাকালী—শুভদে বরদে দেবী—

ম্যানেজার বলে—ড্রাইভারজী, থোড়া চলো জী। সামনেই বিয়েবাড়ি।

ড্রাইভার বলে—শ্বশুরবাড়ি হলেও ভি নেহি যাবে। গাড়ি ব্যাক করবে কাঁহা? বহুত খারাব রাস্তা।

সংস্কৃত স্যার বলে—এ যে বহুত অপবিত্র স্থান হ্যায়। অপদেবতা রহতা ইধার।

ড্রাইভার বলে—অপদেবতা! সো কোন চীজ!

হাবলুবাবু বলে—ভূত, পিরেত জানতা?

—হ্যাঁ ভূত! রহনে দেও। আপলোক পায়দল চলা যাইয়ে। নজদিক তো হ্যায়। হম নেহি যায়েগা।

বলে সে ব্যাটা সিটের উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে। নড়ার লক্ষণও নেই। কবরেজ বলে—ও মানুষ না ভূত-পেরেত হে? অ্যাঁ! ভূতের কথা শুনে শুয়ে পড়লো। ছেরাদ্দ বাড়ি থেকে গাড়ি নে আসাই ভুল হয়েছে। কে জানে ভূত-টুত কিছু রয়ে গেছে কিনা!

সংস্কৃত স্যার বলে—ভাববার কথা!

ওদিকে খিদের জ্বালা শুরু হয়েছে। গাড়ি যাবার লক্ষণ নেই। গ্রামের বিয়ে বাড়ি কতদূরে জানি না। গোবরা বলে—মুশকিল হলো।

হোঁৎকার খিদে সহ্য করার অভ্যাস নেই। দুপুরের পর পেটে কিছুই তেমন পড়েনি। উল্টে ঝাঁকানির চোটে যা ছিল তাও হজম হয়ে গেছে।

পটলা বলে—ভূ-ভূতের দেশে এনে ফেলেছে।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—তহন কইলাম যামু না। হালায় কুমোড় মহাজনের বিহা, তার বরযাত্রী! ল্যাঙোটের কয় বুক-পকেট! এহন কি খামু?

শেষ অবধি পেটের জ্বালায় আর ভূতের ভয়েই এরা রাজী হয় হেঁটে যেতে। ম্যানেজার অভয় দেয়—পথ বেশি নয়।

অন্ধকার রাত্রি, তবু আকাশে ঝকঝকে তারার মেলা। ওরই আভায় দেখা যায় পথের রেখাটা। ওই পথ ধরে সঙ্গের দু'একটা টর্চের আলোয় কোনোমতে এগিয়ে চলি।

সামনে চলেছে বদন খাঁড়া, সে নাকি এসব অঞ্চলে, সুন্দরবনে, মধ্যপ্রদেশের বনে-পাহাড়ে বাঘ, হাতি শিকার করেছে। সেই লিড করে চলেছে। হঠাৎ এদিকের ঝোপ থেকে নীল জ্বলন্ত চোখ নিয়ে দুটো প্রাণী এসে রাস্তার উপর আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে চাপা গর্জন করতে থাকে।

দলটা থেমে যায়। বদন খাঁড়া বাপ্‌রে বলেই তুড়ি লাফ দিয়ে এপাশের বনবাদাড় ভেদ করে দৌড় লাগায়। পিছনেই ছিল সংস্কৃত স্যার। তিনি তো কাঁটাগাছে কাপড়টা আটকে যেতে কাপড় রেখেই আন্ডারওয়ার পরে যঃ পলায়তি সঃ জীবতি—এই নীতি গ্রহণ করে হাওয়া। বাকিরা অস্ফুট আর্তনাদ শুরু করেছে।

হোঁৎকা পথের থেকে গোটা দুই আধলা ইঁট নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়তে ওরাও পালায়। টর্চের আলোয় দেখা যায় এক জোড়া শিয়াল। তারাও এসময়ে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

শিয়াল তো গেল—এদিকে বদন খাঁড়া আর পণ্ডিতমশাই উধাও। হাঁকডাক করতে দূর থেকে সাড়া মেলে সংস্কৃত স্যারের —এই যে এইস্থানে। আমার বস্ত্রটা দাও।

বস্ত্রদান করে স্যারকে ফিরে পেলাম, বদন তখনও লা পাত্তা। শেষে দূর থেকে বদন সাড়া দেয়—আসছি।

বদনচন্দ্রকে আর চেনা যায় না। বেগে ধাবমান হয়ে বোধহয় অন্ধকারে কোনো জলার মধ্যে পড়েছে। কাদা-পাঁকে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি বিবর্ণ। বদন বলে —ব্যাটাদের ধরবো বলেই ওৎ পেতেছিলাম, তা ব্যাটারা পালালো বদনের চোখে ধুলো দিয়ে।

বরযাত্রী দল চলেছে সামনে। ক্রমে দূরে আলো দেখা যায়, শোনা যায় লোকের কোলাহল। পটলার অভ্যাস পথেঘাটে বের হলে জলের বোতল সঙ্গে রাখা। অবশ্য দেখলাম অনেকেই জলের বোতল নিয়ে এসেছে। পথেঘাটে জল ঠিক মেলে না। এতক্ষণ ওই জলের উপরই চলেছি। এবার সামনে বিয়ে বাড়ি দেখে আমাদের চলার স্পিডও বেড়ে ওঠে।

গ্রামের সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাড়ি। রাস্তা থেকে বাগান, বাঁশবন শুরু, তারপর বড় এলাকা জুড়ে বাড়ি। সামনে বিরাট প্যান্ডেল করে জেনারেটারে আলো জ্বালা

হয়েছে। বাইরে দু'তিনটে গাড়ি, তার মধ্যে বরের গাড়িও রয়েছে।

ম্যানেজার এগিয়ে যায়। বিয়েবাড়িতে আমাদের দেখে অভ্যর্থনার ধুম পড়ে। হাঁক-ডাক শুরু হয়, বসার জায়গা এগিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে জলখাবার এসে যায় প্লেটে। সিঙ্গাড়া, কচুরি—চার-পাঁচ রকম মিষ্টি। খিদের মুখে তখন পাল্লা দিয়ে জলখাবারই চলেছে। হোঁৎকা তো একসঙ্গে তিনটে এডিশন শেষ করে দিল। কবরেজ মশাই, সংস্কৃত স্যার মায় হাবুল, দত্তবাবুও দু'প্লেট করে শেষ করে গরম চা নিয়ে বসে।

ওদিকে বাদ্যভাণ্ড চলেছে। অন্দরে উলু-শঙ্খধ্বনি হচ্ছে। রাত তখন প্রায় বারোটা।

গোবরা বলে—কই মামাদের কাউকে দেখছি না?

হোঁৎকা বলে—এহানে এহন হক্কলেই তর মামা। পাইবি। মামা যাইব কনে! চুপ মাইরা বোস।

এর মধ্যে হাবুলবাবু খোঁজ এনেছে এদের খাওয়ার আয়োজনও দারুণ। মাছ-মাংস ভরপেট, মিষ্টান্ন পাঁচ পদের।

সংস্কৃত স্যার বলে—ভূষিমাল বেশি খেয়ে নিলাম হে।

অনুকূল কবরেজ ব্যাগ থেকে একটা মাঝারি বয়াম বের করে বলে—কোনো ভয় নাই। লৌহজারকচূর্ণ এনেছি, খেলে লোহা অবধি হজম হয়। এক মাত্রা করে খেয়ে নাও—

নিজেও এক মাত্রা খায়। সংস্কৃত স্যার, হাবুল, গোবরা-হোঁৎকা আরও অনেকে খায়। কেশব ডাক্তার বলে—ওসবে কি হয়? পালসেটিলা থার্টি খেয়ে নে, ডবল খিদে হবে।

কবরেজের তেতো-কষা বিস্বাদ গুলির চেয়ে ওই মিষ্টি লবেনচুসের মতো গুলিই খাই আমরা। অনুকূল কবরেজ বলে—ঠকলে। হাতে হাতে ফল পাবে এর। ওই হনিমুনের গুলিতে কি হবে? কিস্সু না।

—খবরদার!

—অ্যাও! গর্জে ওঠে কবরেজ।

বিয়ের আসরেই দুজনের বাধে আর কি লড়াই। হঠাৎ কন্যাকর্তাদের কে বলে—রাত হয়েছে। ভোজনপর্ব সেরে নিলে হতো না?

—উত্তম প্রস্তাব। সংস্কৃত স্যারই এসব ব্যাপারে একটু তৎপর। ফলে কবরেজ আর কেশবের লড়াইটা মুলতুবি রইলো। খাবার জায়গায় গিয়ে বসা গেল।

নাহ্। উত্তম ব্যবস্থা। গরম রাধাবল্লভী, কাশ্মিরী আলুর দম, বিরিয়ানি—তার সঙ্গে গরম মাংসের কারী পাতে পড়েছে। বেশ জমে উঠেছে ভোজনপর্ব। মাংস রিপিট হচ্ছে। হঠাৎ এমন সময় দেখা যায় আর একদল বরযাত্রী উইথ বর এসে গেছে।

এবার সেই কন্যাকর্তাদের রূপও বদলে যায়। একটু আগেই কত খাতির আপ্যায়ন, এবার গর্জে ওঠে মুশকো সেই কন্যাকর্তা আরও কজন—এটা কি! দল বেঁধে লোক ঠকানো! অ্যাই ন্যাপা—ভুতো—গজু, ঘিরে ফেল সবকটাকে, এক ব্যাটাও যেন পালাতে না পারে। ফাঁকি দিয়ে বরযাত্রী সেজে ঠকিয়ে যাবে হাড়ভাঙা নিকেশপুরে এসে! সব কটার হাড় ভেঙে দফা নিকেশ করে দেব। ওঠো—

বদন খাঁড়া ওদিকের লাইনে প্রথম কাদা মাখা জামাকাপড় পরে বসেছিল। তার নুড়ো ধরে তুলে সপাটে একটা রদ্দা ঝেড়ে গর্জায় সেই মুগুরের মতো চেহারার লোকটা।—তখনই বোঝা উচিত ছিল, ধানখেতের কাদা থেকে উঠে এল কোন ব্যাটা! বরযাত্রী! আবার এক রদ্দায় বদনের বদনই বিগড়ে যায়।

সংস্কৃত স্যার তিড়িং করে লাফিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে বলে—আমাদের খোঁজখবর নিতে দিলেন? সোজা জলখাবারের প্লেট ধরিয়ে দিলেন, আমরাও প্রাপ্তিমাত্রেন ভক্ষয়িষ্যৎ —খাইলাম।

—চোপ! বিটলে বামুন, ঘাটের মড়া, এখনও নোলা গেল না?

ম্যানেজার বলে—বিশ্বাস করুন, ভুল হয়ে গেছে। আমরা বরযাত্রীই।

—তবে এখানে এসে জুটলে কেন?

অনুকূল কবরেজের কপালে তখনও শকুনের বিষ্ঠা তিলকের মতো বিদ্যমান। কবরেজ বলে—ভ্রমপূর্বক। বিশ্বাস করুন।

সংস্কৃত স্যার বলে—আমরা প্রবঞ্চক

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কয়েকটি অপরিহার্য্য গ্রন্থ

• সুবল চন্দ্র মিত্রর •

সরল ছাত্রবোধ অভিধান

(পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ)

৬৫,০০০ উর্দ্ধে শব্দার্থ ছাড়াও বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের প্রয়োজন অনুসারে পদ পরিচয়, বিপরীতার্থক শব্দ, বাগধারা, বাক্য সঙ্কোচন, ব্যুৎপত্তি, সমাস ইত্যাদি এই অভিধানে পাওয়া যাবে ৭০

POCKET BENGALI TO ENGLISH DICTIONARY

An uptodate dictionary containing current words and phrases together with their exact English equivalents. Meanings of proverbs and idioms with their English equivalents, collective words and a section on common errors in translation makes this dictionary essential for all students. 50/-

POCKET ENGLISH TO BENGALI DICTIONARY

ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিধান। ইংরাজীতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত সমস্ত শব্দ, তার উচ্চারণ, বাংলা অর্থ ও প্রতিভাষা, বিভিন্ন প্রবাদ বাক্যের বাংলা রূপান্তর এবং সরল শুদ্ধ ইংরাজী লেখার উপর একটি অধ্যায় বইটিকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। 70-

THE STUDENTS CONSTANT COMPANION

A dictionary of phrases and idioms and group verbs. Bengali meanings and illustrative examples have beeen given in every case in order to facilitate easy comprehension. The book is a must for students of English. 80/-

• চিত্তরঞ্জন মাইতির •

নামকরণ অভিধান

পৌরাণিক থেকে আধুনিক নামের তালিকা ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা করে আভিধানিক আঙ্গিকে সাজানো—প্রতিটি নামের অর্থ উপযুক্ত নামটি বাছাই করতে সাহায্য করবে। ৬০

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—৭৩

নই।

ম্যানেজার শোনায়—মাথাভাঙায় আমার মালিক কুমড়োমার্চেন্ট গদাইবাবুর ভাইয়ের বিয়ে। সেখানে যেতে এখানে এসে পড়তে এই কাণ্ড। কিছু বলার অবকাশই দিলেন না।

এর মধ্যে অবশ্য বরযাত্রীদের দু'চার জন গজু-ন্যাপার দলের হাতে বেশ দুচার ঘা খেয়েছে। হোঁৎকা কি বলতে গিয়ে তার দেশজ ভাষায় তালগোল পাকাতে তাকেও নাক বরাবর কে একটা ঘুঁষি ঝেড়েছে। গোবরার কপাল আমড়ার মতো ফুলেছে, তার সিল্কের পাঞ্জাবি বুকখোলা চাইনিজ শার্টে রূপান্তরিত হয়েছে।

শেষ অবধি রেহাই পাই অনেক কাকুতি-মিনতির পর। তারাই জানায়—মাথাভাঙা ওই বড়তলা থেকে উত্তরে দেড় মাইল মাঠ পার হয়ে। আমরা দক্ষিণে চলে এসেছি পথ ভুলে। ফিরতে হবে আবার সেই বটতলায়।

কোনোমতে পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে বের হলাম। মাঠ ভেঙে আবার সেই বনঢাকা বটতলায় এসে উত্তরের পথ ধরে যেতে হবে। তবে সেই বিয়ে বাড়ি। রাত তখন দুটো বেজে গেছে। মধ্যরাত্রি। যুদ্ধে পরাজিত, বিপর্যস্ত, ছত্রভঙ্গ সৈন্যবাহিনীর মতো কোনোমতে ফিরছি। দূরে অন্ধকারে ঘন বটগাছ, জঙ্গলটা দেখা যায়। গাড়ির ভিতর একটা মোমবাতির মতো আলো জ্বলছে।

এবার শুরু হয় আসল বিপর্যয়। পথের ধারে জঙ্গলে কে দৌড়ে সেঁদলো, তারপরেই সংস্কৃত স্যার বলে ওঠে—উদরে তীব্র বেদনা, উঃ! তিনিও দৌড়লেন এদিকের বনে। অন্ধকার চারিদিক। দেখি এতগুলো বরযাত্রীদের অনেকেই এদিক-ওদিকে দৌড়চ্ছে।

হোঁৎকা বলে—জলের বোতল। পরক্ষণেই গর্জে ওঠে—বোতলটা দেহি। ছোঁ মেরে জলের বোতল নিয়ে দৌড়লো সেও, পিছু পিছু গোবরাও।

বটতলার জঙ্গলে আমরা ক'জন দাঁড়িয়ে আছি। বাকি যে যেদিকে পেরেছে দৌড়েছে। অনুকূল কবরেজও দৌড়েছে। অন্ধকারে বসে পড়ে।

ঘন জঙ্গল। গাছের উপরে ছোট ছেলের আর্তনাদ, শন শন হাওয়া বয়। ঠাণ্ডাও বোধ হচ্ছে। কোথায় যেন হাসছে কারা।

কবরেজ প্রকৃতির ডাকে চোখে অন্ধকার দেখে বসে পড়েছে। হঠাৎ নাকীস্বরে কে বলে—কঁবরেজ, জঁলের বোঁতলটা রেঁখে যাঁও। কঁবরেজ—

কার ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া। কবরেজ ভাবে, বুঝি বটগাছের ভূত-প্রেতরাই ধরেছে তাকে। আর্তনাদ করে ওঠে কবরেজ—ভূ-ভূ-ভূত! মেরে ফেললো রে—

ছুটে যাই আমরা। কবরেজ তো ধরাশায়ী আর বদন বলে—ওঁ কঁবরেজ মঁশাই—আঁমি।

মারের চোটে বদনের নাক বিগড়ে এখন নাকী স্বর বের হচ্ছে। সেও প্রকৃতির তাগিদে ঝোপে বসে পড়েছিল। এবার জলের দরকার হতে কবরেজের বোতলটা চাইতেই এই বিভ্রাট। চোখেমুখে জল দিয়ে কবরেজকে সুস্থ করে তুলতে, উঠেই সে আবার দৌড়লো ঝোপের দিকে। অনেকেই দৌড়াদৌড়ি করছে। এবার কবরেজ চিঁ চিঁ করে বলে—লৌহজারকচূর্ণ মনে করে উৎকৃষ্ট জোলাপের শিশিটাই এনেছিলাম বোধহয়। ওরে বাবা—

আবার দৌড়লো কবরেজ ঝোপের দিকে। একা কবরেজই নয়, লৌহজারক-চূর্ণ যারাই খেয়েছিল তাদের অবস্থা তখন কাহিল।

এমন সময় হৈ হৈ করে ওদিকের গ্রাম থেকে আলো, লাঠিসোঁটা নিয়ে এসে পড়ে মাথাভাঙার কুমড়োমামার বেহাইয়ের লোকজন। বরযাত্রীদের গাড়ি পৌঁছায়নি দেখে তারা এইবার খোঁজ নিতে এসে দেখে বরযাত্রীদের ওই অবস্থা। ঘন ঘন ঝোপের দিকে দৌড়চ্ছে তো দৌড়চ্ছেই। আর নতুন করে বরযাত্রী যাবার তাগদ তাদের নেই।

কেশব ডাক্তার কিছু জরুরি ওষুধ সঙ্গে নিয়ে গেছল, তাই দিচ্ছে সকলকে। হোঁৎকাও খায়। অনুকূল কবরেজও বলে—তাই দে কেশব। জয়পালের মাত্রাটা জোলাপে বেশি হয়ে গেছে—উঃ। আবার দৌড়ায় সে।

সংস্কৃত স্যার কিছুটা সামলে বলে—আর বরযাত্রী যাইতে পারিব না। মাপ করিতে আজ্ঞা হয়। সংস্কৃত স্যার একটা সিটে এলিয়ে পড়েছে। প্রায় সকলের ওই অবস্থা। বদনের তো পেটে-নাকে দুদিকেই যন্ত্রণা।

ভোর হয়ে আসছে। পাখিদের ঘুম ভাঙে। সারা মাঠ আলোয় ভরে ওঠে। কন্যাপক্ষ নিয়ে যাবেই। বরযাত্রী বলে কথা! ড্রাইভার বলে—হম্‌কো অন্নপ্রাশনের ট্রিপ লে যানে হোগা বারো বাজে। অব যায়েগা হম্‌ কলকাত্তা। যানে হ্যায় তো চলো—নেহি তো হম গাড্ডি লেকে ভাগেগা।

বিয়ের আসরে আর যাওয়াই হলো না। ভুতুড়ে বটতলা থেকেই ফিরে এলাম। কারোও আর সাড়াশব্দ নেই।

সংস্কৃত স্যার বলে—বরযাত্রী কদাপি যাওয়া উচিত নয়। যাহারা বাপের কুপুত্র তাহারাই যায় বরযাত্রী। সুপুত্রেরা ওই কর্ম কদাপিও করে না।

তবু অনুকূল কবরেজ বলে—কি কেশব, ওষুধ আমি খাঁটিই তৈরি করি দেখলি তো? নেহাৎ অদল-বদল হয়ে গেছল, তাই। এ তোর ঘুমন্ত হনিমুন হোমিওপ্যাথি নয়, জীবন্ত ওষুধ। বুঝলি। তাই এই হাল!

অবশ্য গোবরার কুমড়োমামা বৌভাতে এই খামতিটা পুষিয়ে দিয়েছিল। দারুণ খাইয়েছিল।

ছবিঃ সুফি

বাঁটুল দি গ্রেট

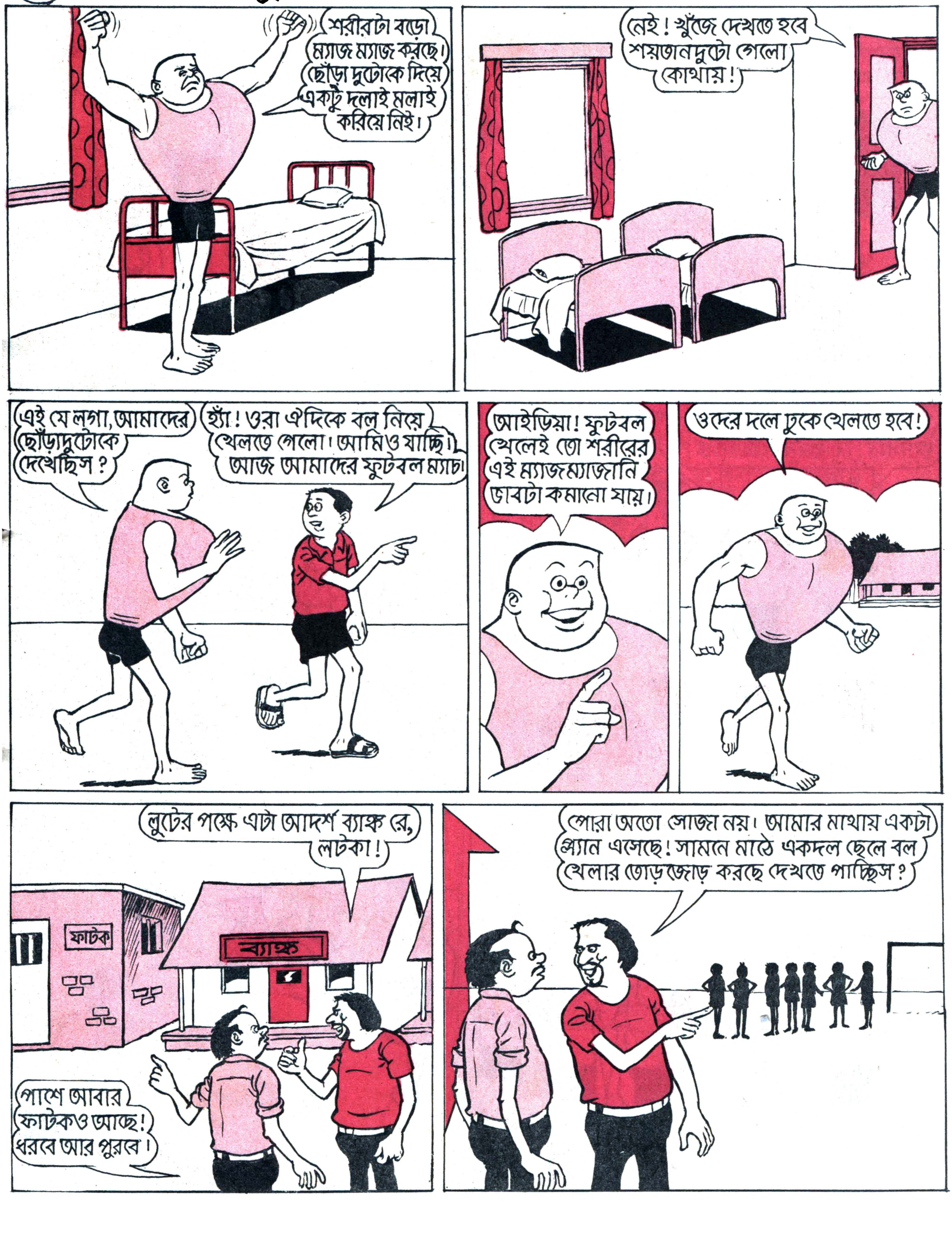
শরীরটা বড়ো ম্যাজ ম্যাজ করছে। ছোঁড়া দুটোকে দিয়ে একটু দলাই মলাই করিয়ে নিই।
নেই! খুঁজে দেখতে হবে শয়তান দুটো গেলো কোথায়!
এই যে লগা, আমাদের ছোঁড়াদুটোকে দেখেছিস?
হ্যাঁ! ওরা ঐদিকে বল নিয়ে খেলতে গেলো। আমিও যাচ্ছি। আজ আমাদের ফুটবল ম্যাচ।
আইডিয়া! ফুটবল খেলেই তো শরীরের এই ম্যাজম্যাজানি ভাবটা কমানো যায়।
ওদের দলে ঢুকে খেলতে হবে!
লুটের পক্ষে এটা আদর্শ ব্যাঙ্ক রে, লটকা!
ফাটক
ব্যাঙ্ক
পাশে আবার ফাটকও আছে! ধরবে আর পুরবে।
পোরা অতো সোজা নয়। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে! সামনে মাঠে একদল ছেলে বল খেলার তোড়জোড় করছে দেখতে পাচ্ছিস?

তুই ওখানে গিয়ে ওদের কারও দলে খেলোয়াড় কম থাকলে ম্যানেজ করে দলে ঢুকে পড়বি, আর আমি এদিকে অপারেশান চালাবো! চেঁচামেচি হলে তুই ছেলেদের সামলে রাখবি।
তারপর কাজ হাসিল হলে বমাল সমেত হাওয়া!
সেই মতো-
এই শোন! আমাদের গোলকিপার আসেনি। কি হবে বলতো?
আমি কিন্তু ভালো গোলকিপিং করতে পারি। যদি তোমরা চাও তো আমি খেলে দিতে পারি।
মাঠের অপরপ্রান্তে-
আমাদের গোল করার লোকই আসেনি! কি হবে বলতো, দোস্ত?
দক্ষিণ পাড়ার ওদের গোলকিপার আসেনি, ওরা জোগাড় করে নিয়েছে। আমাদেরও জোগাড় করতে হবে।
এখন কোত্থেকে স্ট্রাইকার জোগাড় করি!
করতেই হবে না হলে তো গোলের গোড়ে মালা পরিয়ে দেবে—মরেছে! বাঁটুলদা আসছেরে!
সব ভণ্ডুল না করে দ্যায়!
তোদের দলে খেলতে নিবি? শরীরটা বড়োই ম্যাজম্যাজ করছে, খেললে যদি কমে।
খেলতে পারো তবে স্ট্রাইকার পজিশনে। কিন্তু নো গড়বড়!
খেলা শুরু হলো
সতর্ক থাকতে হবে!

তোমার কাছে বল দিলাম, বাঁটুলদা!
মরেছে! বাঁটুলদার পায়ে বল গেছে!
বাঁটুলদাকে আটকাও!
ইতিমধ্যে ওদিকে
এইযে, স্যার! গুলি খেয়ে যদি চোখের ঠুলি চিরতরে বন্ধ করতে না চান তাহলে ঝড়াক করে ঐ থলে দুটো আমার কাছে ট্র্যান্‌স্‌ফার করে দিন।
কি হলো? গুলি না ঠুলি? কুইক!
ঠুলি ঠুলি! টাকুবাবু টাকার থলেগুলো ট্র্যান্‌স্‌ফার করুন।
আমাদের স্ফূর্তি করার টাকার খুবই অভাব ছিলো, আপনি সেটা মেটালেন। এবার তাহলে চলি-বাই-বাই!
ডাকাত! ডাকাত! ব্যাঙ্ক লুট করে পালাচ্ছে!
ফাটক
হিঃ হিঃ! কেউ আসবে না!

!
ওর্‌র্‌ফ্‌!
গোওওল!
কম্ম হাসিল। এবার চল এখান থেকে খসে পড়ি—ইর্‌ক্‌!
ই-ই-ই-ই-ই!
ই-ই-ই!
দড়াম!
তাজ্জব! আমরা ফাটকে আটক হলুম কি করে?
কি করতে কি হয়ে গেলো রে, ঝট্‌কা! আমরাই শেষে লটকে গেলুম।
থলে আবার ট্র্যান্‌স্‌ফার হবে। আর এই কৃতিত্বের জন্যে বাঁটুলকে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।
একই দিনে একই সঙ্গে দ্বিমুকুট জয়ী বাঁটুলদা—
হিপ্‌-হিপ্‌ হুর্‌র্‌রা!
আর ব্যাঙ্কের তরফ থেকে পাঁচ হাজার টাকার চেক!

'ব্যবসাটা ভালই ফেঁদেছিলাম... কিন্তু...!' বলে মিঃ বদরিকানাথ সাহু হঠাৎ থেমে গেলেন।

মিঃ বদরিকানাথ সাহু বা সংক্ষেপে মিঃ বি. সাহুকে তোমরা হয়তো চিনবে না। আমরা কিন্তু ওঁর খুব ভক্ত। এই মানুষটার গল্পের পুঁজি প্রায় অফুরন্ত। উনি অবশ্য ওগুলোকে গল্প বলতে চান না; কারণ গল্পে থাকে কল্পনা। মিঃ সাহু বলেন ওঁর গল্প শতকরা একশভাগই বাস্তব—একেবারে সত্যি ঘটনা, ডকুমেন্টারি। আমরা অবশ্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকি; কিন্তু ওঁর সঙ্গে মোটেও তর্ক করি না। তাতে আখেরে আমাদেরই লোকসান।

আজও কাহিনী শুরু হয়েছিল; কিন্তু হঠাৎ থেমে যেতেই আমরা উসখুস করতে শুরু করলাম। আজকে আসর বসেছিল অশোকদের 'মেঘমল্লার'-এর ফ্ল্যাটে। আমি, জয়ন্ত, অশোক, সুবোধ আর রণজিত অপেক্ষা করছিলাম অশোকদের ফ্ল্যাটে। মিঃ সাহু রবিবারের সকালগুলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে আসেন। মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। ফল না বেরুনো পর্যন্ত আমাদের বিশেষ কিছু করার নেই। রবিবারের সকালে 'বোকা বাক্স'র সামনে বসতে আমাদের একটুও ভাল লাগে না, তাই আমরা মিঃ সাহুর গল্পের বা 'ডকু'র ভক্ত। শুধু আমরাই নই, অনেক সময় বড়রাও হাতের কাজ সরিয়ে রেখে মিঃ সাহুর গল্পের আসরে হাজির হন।

মিঃ সাহুর বয়স আন্দাজ করা খুবই মুশকিল। আমাদের ধারণা ওঁর বয়স বাষট্টি থেকে বিরাশির মধ্যে যে কোনো জায়গায় হতে পারে। লম্বা একহারা চেহারা। একমাথা সাদা চুল। চোখে ভারী চশমা। পরনে ট্রাউজার ও টিশার্ট। সদা হাস্যময়। এই বয়েসেও যথেষ্ট স্মার্ট। শুনেছিলাম যে উনি কাজ করতেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থায়।

অশোক ওর মাকে বলে রেখেছিল সময়মতো চা-জলখাবারের যোগানটা যেন ঠিক থাকে, কারণ ওটার সঙ্গে মিঃ সাহুর গল্পের বেশ একটা যোগাযোগ আছে।

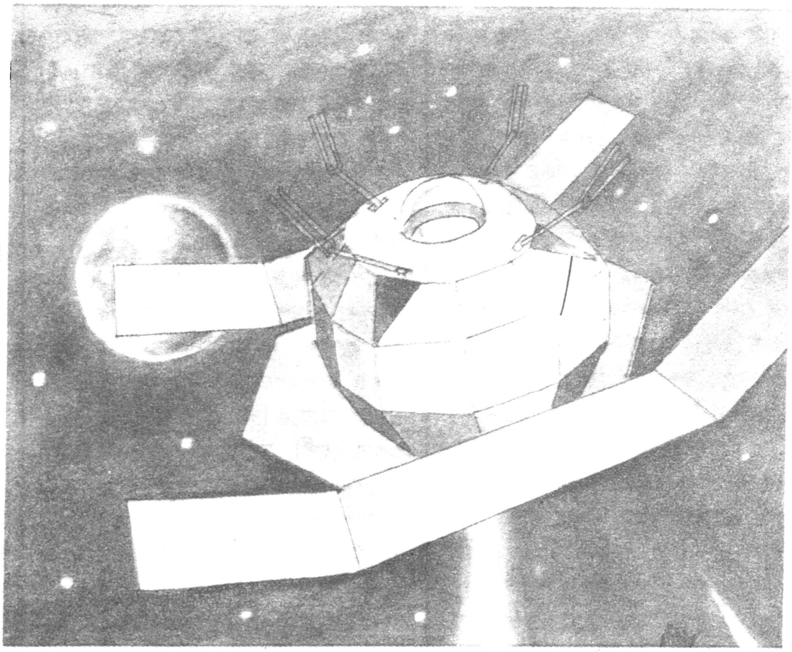

অভিনব ব্যবসা

নিরঞ্জন সিংহ

আমি বলে উঠলাম, 'মিঃ সাহু কি একটা ব্যবসার গল্প শুরু করলেন? আজ একটা জম্পেশ দেখে গল্প শোনাতে হবে।'

মিঃ সাহু মিটিমিটি আমাদের সবার মুখের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, 'তোমাদের কতদিন বলেছি আমি যা বলি তা গল্প নয়, একেবারে বাস্তব!'

'সরি, বাস্তব, কিন্তু ব্যবসা নয়।' বললাম আমি।

'আরে বাবা ব্যবসা বলে নাক সিঁটকোচ্ছ কেন? একি তোমার বড়বাজারের মুদির ব্যবসার কথা বলছি! এ ব্যবসার জায়গা বড়বাজার তো নয়ই, এই পৃথিবীপৃষ্ঠও নয়। মহাকাশ।'

'মহাকাশে ব্যবসা! হুররে!' আমরা সবাই একসঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

'হ্যাঁ, মহাকাশের ব্যবসার কথা। তোমরা যদি একে গল্প বলে চালাতে চাও তো আপত্তি করব না, তবে আবার বলছি সেটা হবে অসত্য কথন। মানুষের রুচি তো ভিন্ন, কি আর করা যাবে বল।'

রণজিত তবু খুঁতখুঁত করতে লাগল, 'এ মাঃ ব্যবসা! সে মহাকাশ ব্যবসাই হলো, এর মধ্যে কি আকর্ষণীয় আছে? শুধু মালপত্তর লেনদেন, টাকাপয়সার হিসেব, লাভ-লোকসান ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

মিঃ সাহু স্বীকার করলেন, 'রণজিত তুমি ঠিকই বলেছো। ব্যবসা বলতে তুমি যা বললে মোটামুটি তাই। তবে বন্ধু হতাশ হয়ো না, এর মধ্যে রোমাঞ্চকর কিছু থাক না থাক ব্যবসাটা কিন্তু মোটেও সাধারণ নয়, অভিনব।' বলে মিঃ সাহু আমাদের সবার মুখের দিকে আর একবার তাকালেন।

এতক্ষণে আমরা যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছি তা মিঃ সাহু আমাদের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন।

এবার আমরাই তাড়া লাগালাম, 'মিঃ সাহু, দয়া করে শুরু করুন।' ঠিক এই সময় অশোকের মা চা আর গরম গরম

পকোড়া পাঠিয়ে দিলেন। সেগুলোর সদ্গতি করার দিকে মনোযোগ দিলাম আমরা সবাই।

মিঃ সাহু শুরু করলেন, 'আমি তখন সদ্য রিটায়ার করেছি। চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। কিছু একটা করতে হবে, কিন্তু কি করা যায় তা ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। একবার ভাবলাম আর কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজ হাতে নেব না। একসময় বই কেনার খুব বাতিক ছিল। বইমেলা থেকে প্রতিবছর বেছে বেছে প্রচুর বই কিনেছিলাম; কিন্তু সব বই ভাল করে পড়া হয়ে ওঠেনি। ওইসব বইপত্তর, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন পড়ে সময় কাটানো যেতে পারে। এইরকম যখন মনের অবস্থা ঠিক সেই সময় আমার সহকর্মী ও বন্ধু সরিৎ মুখার্জীর একটা ফোন এল। সরিৎ মাস ছয়েক আগে রিটায়ার করেছে। ও ছিল একজন দক্ষ স্যাটেলাইট ইঞ্জিনীয়র। মানে আমরা যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি করে মহাকাশে পাঠাতাম, সরিতের কাজ ছিল সেইসব উপগ্রহ তৈরি করা। এ লাইনে ও যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিল। তবে জানো তো এরা পাবলিক ফিগার নয় যে সাধারণ মানুষও এদের নাম খবরের কাগজ, টিভি ইত্যাদিতে দেখবে। এদের পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল সরকারী মহলের মধ্যে। অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার। ও এখন গল্ফগ্রিনে থাকে। ওর ফোন পেয়ে তো আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। আমার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে ও একটু বিব্রত হলো বলে মনে হলো। আসলে ও বরাবরই একটু চাপা স্বভাবের। বলল, তুই তো রিটায়ার করেছিস?

সদ্য।

জানি, আর তাই কদিন ধরে তোর কথাই ভাবছিলাম।

কেন হঠাৎ?

হঠাৎই বলতে পারিস। একটা ব্যবসায় হাত দিয়েছি, তোকে দরকার। কখন আসছিস বল আর ঠিকানাটা লিখে নে।

ঠিকানা তো টেলিফোন গাইডে আছে, তুই বরং ডিরেকশানটা দিয়ে দে, দেখি পারি তো আজ সন্ধ্যেবেলায় তোর ওখানে যাব। সরিতের দেওয়া ডিরেকশানটা নিয়ে নিলাম। আমার মনের অবস্থা তখন কী তা তো তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ। নেড়া ভাত খাবি? না, হাত ধুয়েই তো বসে আছি। কাজের কথায় দারুণ উৎসাহ পেলাম, অবশ্য বইপত্র পড়ার পরিকল্পনাও ত্যাগ করলাম না। কাজ করেও তো ও কাজটা নিয়মিত করা যেতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা সরিতের ফ্ল্যাটে গেলাম। দেখলাম ড্রইংরুমে আর একজন বসে রয়েছে। মুখটা চেনাচেনা মনে হলেও ঠিক ধরতে পারলাম না। সরিতই আলাপ করিয়ে দিল, মিঃ মনোহর প্রকাশ যোশী, আমাদের সংস্থাতেই চাকরি করতেন। একজন অতি দক্ষ মহাকাশচারী। বছর পাঁচেক আগে ভলেন্টারী রিটায়ারমেন্ট নিয়ে সংস্থা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এবার মনে পড়ল। চাক্ষুষ না দেখলেও যোশীর প্রচুর ছবি দেখেছি টিভিতে, খবরের কাগজে। যোশী ভি. আর. নিয়ে একেবারে নাকি উধাও হয়ে গিয়েছিল। এইসব নিয়ে সংস্থার সহকর্মীদের মধ্যে আলোচনা হতো তা জানি। সেই হারিয়ে যাওয়া যোশীকে সরিতের ড্রইংরুমে দেখে একটু অবাকই হলাম। সরিৎ আমার পরিচয় দিল।

যোশী বলল, খুশি হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে।

আমি বলে ফেললাম, আপনার কথা আমি শুনেছি। ভি. আর. নেওয়ার পর আর কেউ নাকি আপনার খোঁজ পায়নি, তাই কি?

মিঃ যোশী কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে একটু হাসলেন। মিঃ যোশীর বয়স আমাদের থেকে অনেক কম।

সরিৎ বলল, দেখ সাহু, তোকে ডেকেছি যার জন্যে তা বলি, যোশী অনেকদিন থেকে একটা কাজ করবে বলে চেষ্টা করছিল, এখন সেটা একটা শেপ নিতে চলেছে। তুই যদি রাজী থাকিস তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিস।

ব্যবসাটা কি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সরিৎ বলল, তুই জানিস পৃথিবীর বহুদেশের রাশি রাশি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে ঘুরছে। এই সব উপগ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। মাঝেমধ্যেই এই সব উপগ্রহে কোনো না কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে। তখন গ্রাউন্ড কন্ট্রোল থেকে রিমোট পদ্ধতিতে সেইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সারিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় ত্রুটি ঠিক করে নেওয়া সম্ভব হয়, আবার কোনো সময় হয় না। যখন হয় না তখন উপগ্রহটিকে বাতিল বা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। কত বিশাল টাকার ক্ষতি বুঝে দেখ। অতি সম্প্রতি ভারতের জিও-সিনক্রোনাস কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট-২ডি পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয় বৈদ্যুতিক গোলোযোগের জন্য। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'র সূত্রে পাওয়া হিসেব অনুযায়ী ওই উপগ্রহ প্রোজেক্টে খরচ হয়েছে ৫২৫ কোটি টাকা। কক্ষপথে স্থাপনের চার মাসের মধ্যে এই যোগাযোগ উপগ্রহটিকে পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হলো। কি বিপুল অর্থের অপচয়। অথচ আজকের যুগে মহাকাশ গবেষণা না করেও উপায় নেই। কিন্তু উপগ্রহগুলোর যদি মেরামতির ব্যবস্থা থাকত তাহলে এই বিপুল ক্ষতি বাঁচানো যেত। আমরা এই ধরনের বাতিল বা পরিত্যক্ত উপগ্রহ মেরামতির ব্যবসা করব টাকার বিনিময়ে। সরিৎ প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে বলল ব্যবসার কথা।

আমি এতক্ষণ একমনে শুনছিলাম। সরিতের বলা শেষ হলে আমার মুখ থেকে শুধু বেরিয়ে এল, একি সম্ভব!

সম্ভব। জোর দিয়ে বলল সরিৎ।

কিভাবে এই মেরামতির কাজ করা হবে? আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

যোশী বহুদিনের চেষ্টায় এবং আমার সহায়তায় একটা স্পেস-টাও বা মহাকাশের টানাগাড়ি তৈরি করেছে। এতে চড়ে আমরা মহাকাশে উপগ্রহ মেরামতির কাজ করব।

ব্যাপারটা কিন্তু এখনো আমার কাছে স্পষ্ট নয় সরিৎ।

কারখানাটাও মহাকাশেই হবে। অর্ডার পেলে স্পেস-টাও-এর সাহায্যে খারাপ

উপগ্রহটিকে টেনে নিয়ে আসা হবে মহাকাশ কারখানায় তারপর মেরামত করে উপগ্রহটিকে আগেকার কক্ষপথে স্থাপন করে একটা মোটা অঙ্কের বিল পাঠানো—ব্যস! সরিৎ আরো খোলসা করে বলল।

আমি বললাম, ব্যবসাটা তো ভালই মনে হচ্ছে, কিন্তু উপগ্রহ মেরামতির কাজ পাওয়া যাবে তো?

সরিৎ বলল, নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

আমি তখনো কিন্তু কিন্তু করছি দেখে যোশী এতক্ষণে মুখ খুলল, আসলে এ বিষয়ে দু'একটা দেশের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। সবাই খুব উৎসাহী, তাই আশা করি কাজের অভাব হবে না।

আমার ভূমিকা যদি আর একটু স্পষ্ট করে বলেন, বললাম আমি।

যোশী বলল, দেখুন মিঃ সাহু, আপনাকে আমরা এই ব্যবসায় নিতে চাই এক তৃতীয়াংশ মালিকানার ভিত্তিতে। প্রথম দিকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পেলেও, নিজেদেরও অনেক টাকা যোগাড় করতে হবে। একটা পরিত্যক্ত স্পেস-স্টেশনকে ঠিকঠাক করে নিয়ে মহাকাশ কারখানা খুলব। এ ব্যাপারে আমাদের আমেরিকার NASA-র সঙ্গে কথাবার্তাও হয়ে গেছে। ওরা ওদের পরিত্যক্ত একটা স্পেস-স্টেশন বিনা পয়সায় আমাদের দিয়ে দেবে, একটি শর্তে।

কি শর্তে? আমিই আবার প্রশ্ন করলাম।

ওদের কৃত্রিম উপগ্রহ মেরামত করলে দশ শতাংশ ডিসকাউন্ট দিতে হবে। আমরা রাজী হয়েছি। আপাতত লো-অরবিট উপগ্রহ অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠের ৫০০ থেকে ১০০০ কিলোমিটার উপরে ঘুরছে এইরকম উপগ্রহ দিয়ে আমাদের কাজ শুরু করব। ৩৬০০০ কিলোমিটার উপরে যেসব ভূসমলয় যোগাযোগ উপগ্রহ আছে সেগুলো মেরামতির কাজ এক্ষুণি আমরা হাতে নিতে পারছি না। তবে ভবিষ্যতে ওগুলো নিয়েও চিন্তাভাবনা করা যাবে; কারণ ওগুলোকে মেরামতের জন্য কারখানায় আনতে গেলে রোবট-চালিত বিশেষ ধরনের স্পেস-টাও-এর দরকার হবে।

যাহোক এই আমাদের পরিকল্পনা, এখন আপনি রাজী হলেই আমরা ব্যবসাটা শুরু করতে পারি। যোশী পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলল।

আমি ভেবে দেখার জন্য দু'দিন সময় চাইলাম। ওরা রাজী হলো। ভেবে দেখলাম এরকম একটা ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলে আমরা টাকার উপর গড়াগড়ি খাব। লোভই হলো। রিটায়ার করার পর যেসব টাকাপয়সা পেয়েছিলাম তার কিছুটা ইমারজেন্সির জন্য রেখে বাকি টাকাটা ব্যবসায় ঢালব ঠিক করলাম।

ব্যবসা শুরু হলো। যোশী যথেষ্ট করিৎকর্মা। মহাকাশ কারখানা ঠিকঠাক হয়ে যেতেই স্পেস-টাও করে তিনজনে গিয়ে আস্তানা গাড়লাম সেখানে। ইতিমধ্যে যত কৃত্রিম উপগ্রহ বিভিন্ন দেশ মহাকাশে তুলেছে তাদের ঠিকুজি-কুষ্টি সব পারসোনাল কমপিউটারে ঢোকানো হলো। তাদের বর্তমান অবস্থার যতটুকু হদিস পাওয়া গেল তাও ঢোকানো হলো P.C.তে।

মাসখানেকের মধ্যে গুছিয়ে বসতে না বসতে প্রথম অর্ডারটা পেলাম আমেরিকার কাছ থেকে। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম কাজে। পরিকল্পনা মতো কাজটা ঠিক সময়ে করে ফেলতে পেরে আমরা তিনজনেই খুব খুশি হলাম। আরো খুশি হলাম যখন দেখা গেল যে দশ শতাংশ ডিসকাউন্ট দিয়েও আমরা যা ডলার পেলাম তাতে তিনজনে যে ব্যক্তিগত টাকা ঢেলেছিলাম তা উঠে এলো।

এরপর আমাদের ব্যবসায় অর্ডারের যেন বান ডেকে গেল। যোশী আর সরিতের কেরামতিতে ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগলো। বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, ভারতবর্ষ থেকে অর্ডারের পর অর্ডার পেতে লাগলাম। কোম্পানির যেমনি রমরমা, তেমনি সুনাম।

কিন্তু কথায় আছে না লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। লোভ করে পাপ করলাম। না, এ ব্যাপারে যোশীকে একা দায়ী করে লাভ নেই। লোভ আমার আর সরিতের মনের মধ্যেও লুকিয়ে ছিল। টাকা তখন আমরা ভালই রোজগার করছি, অতিরিক্ত টাকার লোভ না করলেও পারতাম, কিন্তু

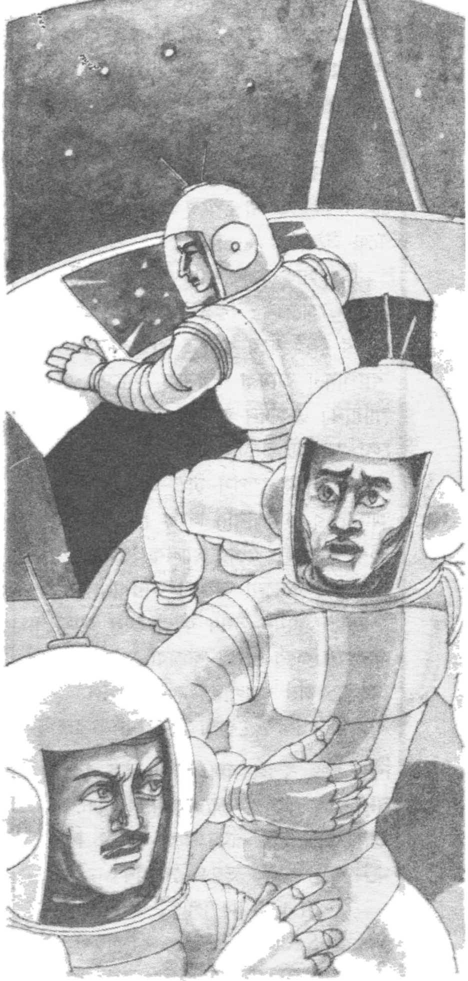

সরিৎ বলল, ব্যাপারটা কি?

লোভ নামক নিয়তি যে তখন আমাদের তিনজনকে হিড়হিড় করে টানছে। কথাটা যোশীই একদিন তুলল, যে লো-অরবিটে বহু কৃত্রিম উপগ্রহ এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে যেগুলো হয়তো আর একেবারেই মেরামত করা যাবে না অথবা ওইসব উপগ্রহের মালিক-দেশ ওগুলোকে মেরামত করতে চায় না, এইরকম উপগ্রহের মধ্যে অনেক দামী দামী যন্ত্রাংশ থাকে যেগুলো খুলে বিক্রি করলে বিরাট মুনাফা। এই সব যন্ত্রাংশ কেনার জন্যে পৃথিবীর অনেকগুলি দু'নম্বরী কোম্পানি ভীষণভাবে আগ্রহী। টাকার একটা নেশা আছে। আর একাজে খুব একটা ঝুঁকি

আছে বলেও মনে হলো না। অতএব এক নম্বর ব্যবসার পাশাপাশি আমরা গোপনে দু'নম্বর ব্যবসাও শুরু করে দিলাম। দেখা গেল এই দু'নম্বর ব্যবসায় লাভের পরিমাণ অনেক বেশি।

কিন্তু বলে না চোরের দশদিন সাধুর একদিন, কথাটা একদিন ফলে গেল।'

'কি রকম?' আমরা আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলাম।

মিঃ সাহু হঠাৎ বাধা পেয়ে একটু থমকে গেলেন; কিন্তু পরমুহূর্তে আগের কথার খেই ধরে বলতে শুরু করলেন, 'ব্যাপারটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। একদিন আমরা একটা লো-অরবিট বাতিল উপগ্রহ লোকেট করে ওটাকে স্পেস-টাও-এর সাহায্যে আমাদের কারখানার দিকে টেনে আনতে শুরু করেছি, ওটার মালিক ছিল কানাডা। তখনো আমরা কারখানায় পৌঁছুইনি এমন সময় কারা যেন আমাদের সাবধান করে দিল। আমরা তিনজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। সরিৎ বলল, ব্যাপারটা কি? যোশী কি যেন ভাবল কিন্তু কিছু বলল না। আমি কিছু বুঝতে না পেরে ওদের দুজনের মুখের দিকে তাকালাম এবং সত্যি কথা বলতে কি মনে মনে একটু ভয়ও পেলাম।

'স্পেস-টাওকে বলছি, আমরা Space Security Force—তোমরা এক্ষুণি বাতিল উপগ্রহটিকে ছেড়ে দাও, না হলে ফল ভাল হবে না।' আমাদের রেডিওতে কথাগুলো আছড়ে পড়ল। আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। হ্যাঁ, এরকম একটা সংস্থা তৈরি হয়েছে বটে আমেরিকা, জাপান, ভারত, বৃটেন ও অন্যান্য আরো কয়েকটা মহাকাশ-বিজয়ী দেশকে নিয়ে। কিন্তু তাদের কাজ তো বহির্বিশ্ব থেকে কোনো শত্রুর আক্রমণ ঘটলে তার মোকাবিলা করা। তারা আমাদের উপর চড়াও হবে কেন? আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম যোশী আর সরিৎকে, কিন্তু তার আগেই ভিউস্ক্রীনের দিকে তাকাতেই আমার শরীরের রক্ত জমে গেল যেন। চারপাশ থেকে চারখানা রকেট তীব্রবেগে আমাদের স্পেস-টাও লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। ওরা যে Space Security Force তা আর বলে দিতে হলো না। বড় বড় অক্ষরে রকেটগুলোর গায়ে সেকথা লেখা আছে।

যোশী একবার পাশ কাটিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হলো। আমরা জানালাম কানাডা সরকারের অনুমতি নিয়েই অকেজো উপগ্রহটাকে আমাদের কারখানায় নিয়ে যাচ্ছি মেরামতির জন্য। বাঁচবার জন্য তখন মিথ্যে কথা বলা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ওরা যে আটঘাট বেঁধে আমাদের ধরতে এসেছে তখনো ব্যাপারটা আমাদের মগজে ঢোকেনি। ওরা বলল, ঠিক আছে মেরামতি অর্ডারের Fax পাঠাও। অর্ডার কোথায় যে Fax পাঠাব? ওদের কমান্ডার কড়া গলায় বলল, তোমাদের কীর্তিকলাপ আমরা সব জানতে পেরেছি। এবার ভ্যানতাড়া বন্ধ করে আত্মসমর্পণ করো নইলে এখানেই তোমাদের কবর দেব।

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। আগে বাঁচি তারপর দেখা যাবে কি হয়। আমরা আত্মসমর্পণ করলাম। কোর্টে অনেকদিন কেস চলল। আমাদের অ্যাডভোকেট একটা কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, তা হচ্ছে এ ধরনের কাজকে আদৌ বে-আইনী বলা যায় না। কিন্তু শুনানীর শেষে মহামান্য বিচারক আমাদের দোষী বলে রায় দিলেন। কোম্পানির টাকাপয়সা ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। আমাদের অবস্থা 'পুনর্মূষিক ভব' হলো। সুতরাং ব্যাক টু প্যাভিলিয়ান। যেহেতু ব্যাকবোন ভেঙে গিয়েছিল তাই আমরা অভিনব রোমাঞ্চকর ব্যবসা তো দূরের কথা, তেলেভাজার ব্যবসাও শুরু করতে পারলাম না।'

মিঃ সাহু থামলেন। আমরা এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে এই অভিনব ব্যবসার কথা শুনছিলাম। আমাদেরও মনে হচ্ছিল মিঃ সাহুরা যদি অতিরিক্ত অর্থের লোভ না করে ওঁদের এক নম্বর ব্যবসাটা চালিয়ে যেতেন তাহলে...। তবে কি আমরা মিঃ সাহুর গল্পটা সত্যি বলে বিশ্বাস করে ফেলেছি? হয়তো...!

ছবিঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

জোনাকি

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

আঁধারে বনের ঝোপে জ্বলে জোনাকিরা
মনে হয় গুঁড়ো গুঁড়ো কাচ-মণি-হীরা
কেউ যেন ছড়িয়েছে মুঠো মুঠো করে
চিকমিক করে তারা বনছায়া ভরে।

সাধ হয় ছুটে যাই, দু'হাতে কুড়াই
ফুলঝুরি করে কিছু আকাশে উড়াই
নীলার ফুলকি হয়ে রাতের গলায়
আঁধারে দুলুক তারা রঙের মালায়।

আকাশ পরেছে দেখো তারামণি-হার
ঝিকমিক করে তার রঙের বাহার।
তার চেয়ে আরো ভালো এ মণির গুঁড়া
আয় ভাই ছুটে আয় দুই হাতে কুড়া।

তিন ছড়া

শৈলেন্দ্র হালদার

১. উনাই উনাই উনাই
আপনারে কি শুনাই?
রামছাগলের বিয়ে হবে
সর্ষে মাঠে বুনাই!

২. আয় কন্যা ভাসিয়া
পদ্মদিঘির ঘাটে,
পাঁকাল মাছে উড়ে বেড়ায়
ফড়িং সাঁতার কাটে!

৩. কুটুম কুটুম কুটুম
ডুমুর হইয়া ফুটুম,
ঘি মউ মউ গন্ধে ভেসে—
এক পা তুলে ছুটুম!!

ছবি: সূফি

হঠাৎ যখন আবিষ্কার

সন্দীপ সেন

একটা প্রবাদ আছে—উদ্যমী পুরুষকেই ভাগ্যদেবী বরণ করেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলির পিছনে উদ্যম এবং দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা নিশ্চয় থাকে। কিন্তু তার পরেও থেকে যায় একটা চান্স ফ্যাক্টর। আজ এমন কয়েকটা আবিষ্কারের কথা বলব যেগুলো শুধু সাধনা আর অধ্যবসায়ই নয়, হঠাৎ একটা সুযোগে বা দুর্ঘটনার ফলে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

প্রথমেই বলি চার্লস গুডইয়ারের কথা। আমেরিকান এই বৈজ্ঞানিক বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করছিলেন কচাও গাছের রস বা রাবারকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে। রাবার গরমে গলে গিয়ে চটচটে হয়ে যায়। আবার ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে ভঙ্গুর হয়ে যায়। অথচ এটা জল নিরোধক, হাল্কা। এছাড়াও এর অনেক গুণ। তিনি তাই কাঁচা রাবারকে কঠিন নমনীয় উষ্ণতাসহিষ্ণু এক বস্তুতে পরিণত করতে চাইছিলেন। গবেষণার কাজে ব্যয় করতে করতে তিনি নিঃস্ব হয়ে গেলেন। পাওনাদাররা তাঁকে জেলে পাঠালো। জেলে বসে তিনি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে মুক্তি পেলেন। কিন্তু গবেষণার ভূত তো মাথা থেকে যায়নি। তাই যেখানে যা ছিল তাই বিক্রি করে আবার শুরু করলেন গবেষণা। দু'বছর কাটলো। কোনো সাড়া নেই গবেষণায়। অবশেষে এলো ১৮৩৯-এর সেই সন্ধ্যে। পরপর দু'দিন অনাহারে। ঘর গরম করারও কোনো ব্যবস্থা নেই। একটা পয়সা নেই পকেটে। স্থির করলেন আত্মহত্যা করবেন গন্ধক খেয়ে। ছেঁড়া ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন গুডইয়ার। পাড়ার মুদী দোকানে এক জোড়া জুতোর বিনিময়ে নিয়ে এলেন গন্ধক। এবার গন্ধকটা খেতে হবে। গুডইয়ার হঠাৎই ভাবলেন খালি পেটে মরবো কেন? যে রাবার-এর জন্য এত কষ্ট তার দুটো কাঁচা তাল তো এখনও মজুত। তারই একটা গন্ধকের সঙ্গে মিশিয়ে পেট ভরে খেয়ে মরবো। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। অনাহারে ঠাণ্ডায় শরীর কাঁপছে। তবু কোনোরকমে উনুন জ্বালিয়ে সসপ্যানে কাঁচা রাবার আর গন্ধকের তাল চাপিয়ে দিলেন। তারপর খিদে আর ঠাণ্ডায় অজ্ঞান। পরের দিন অনেক বেলায় সূর্যের তাপে জ্ঞান ফিরলো। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন সসপ্যানের কাছে। খেতে হবে এবার। উনুন নিভে গেছে কখন কে জানে। সসপ্যানের মধ্যে হাত দিয়ে মুঠো করে নিতে চাইলেন রাবার আর গন্ধকের মিশ্রণ। কিন্তু একি দেখছেন? এ যে অন্যরকম এক বস্তু। তবে কি? তিনি সেটা নিয়ে প্রচণ্ড উত্তাপ আর ঠাণ্ডার মধ্যে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন তিনি পেয়ে গেছেন যা চাইছিলেন। অতএব মরা আর হলো না। আবিষ্কৃত হলো ভলকানাজাইড রাবার। যা পথ পরিবহনে বিপ্লব এনেছে।

এবার আসা যাক মধ্যযুগের একটি আবিষ্কার ফসফরাসের কথায়। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে এটি আবিষ্কৃত হয়। সে সময়ও কিমিয়াবিদ্যার প্রচলন ছিল। কিমিয়াবিদরা

গবেষণাগারে চার্লস গুডইয়ার।

কেকুল অর্থাৎ বিজ্ঞানী এফ. এ. কেকুল তিনদিন তিনরাত্রি নিদ্রাহীন। অস্থিরচিত্তে কেবল ভাবছেন বেঞ্জিনের সম্ভাব্য আণবিক গঠন কি হতে পারে। তাঁর চোখের সামনে কেবল অণু-পরমাণু-গুলো ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে, সাপের মতো কিলবিল করছে। কিন্তু ছয় কার্বন অণু বেঞ্জিনের আণবিক গঠন! সে তো দূর অস্ত। একসময় শ্রান্ত কেকুল নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। বিক্ষিপ্ত নিদ্রায় স্বপ্ন দেখলেন সাপ। অনেক সাপ। হঠাৎ দেখলেন একটা সাপ তার নিজের লেজটা কামড়ে ধরেছে। ঘুম ভেঙে গেল কেকুলের। তিনি নতুন করে ভাবলেন। কার্বন শৃঙ্খল নিশ্চয় সাইক্লিক রিং গঠন করে। পেয়ে গেলেন বেঞ্জিনের আণবিক গঠন।

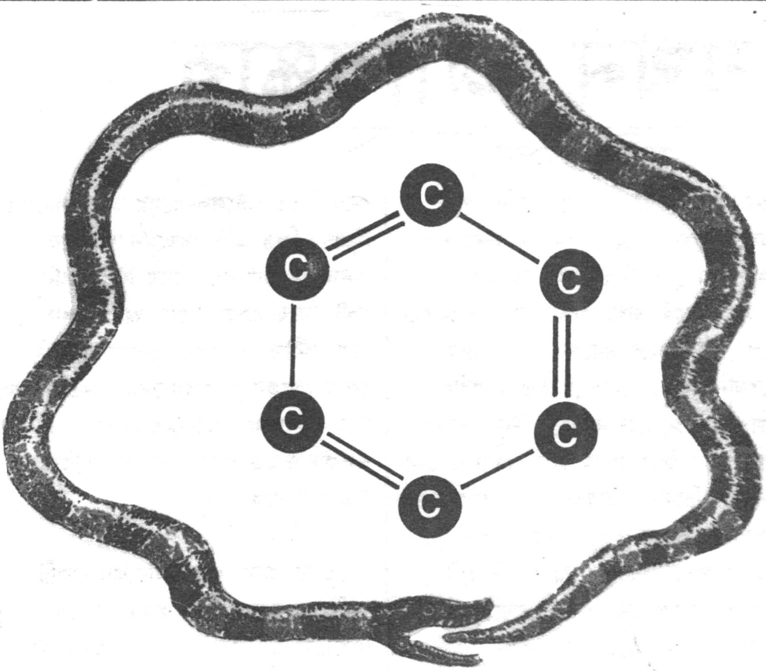

একটা সাপ নিজের লেজই কামড়ে ধরছে—এই স্বপ্নের মধ্যে বিজ্ঞানী কেকুল পেয়ে গেলেন কার্বনের আণবিক গঠন।

বিশ্বাস করতেন পরশপাথর বলে একটি মৌল বা বস্তু আছে। যেটি সব জিনিসকে সোনাতে পরিণত করতে পারে। হেনরী ব্রান্ড নামে জার্মানীর এক দেউলিয়া ব্যবসায়ীও কিমিয়াবিদ্যায় বিশ্বাস করতেন। রাতারাতি বড়লোক হবার নেশায় ব্রান্ড মানুষের প্রস্রাব থেকে পরশপাথরের সন্ধান শুরু করেন। প্রস্রাবের নানারকম মিশ্রণ তৈরি করে, বাষ্পীভবন করে, পাতন করে প্রস্রাবের তেল নামে এক লাল রং-এর তরল তৈরি করেন। পরে এটি পুনঃপাতন করে, ভস্মীভূত করে অণুপ্রভা সৃষ্টিকারী একটি সাদা পদার্থ পান। বস্তুটি বাতাসের সংস্পর্শে আগুন ধরে যায়। ব্রান্ড প্রথমে এই আবিষ্কার গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, পরে ২০০ থ্যালার জার্মান প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে জে. ক্রাফটকে তাঁর আবিষ্কারের তত্ত্ব বিক্রি করেন। এই আবিষ্কারটিই ফসফরাস।

গাছ থেকে আপেল পড়া দেখে নিউটন আবিষ্কার করলেন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব। আর

নীলদর্পণ তোমরা অনেকেই পড়েছো। সে সময় সব রংই পাওয়া যেত উদ্ভিদ থেকে। বয়নশিল্পের জন্য কৃত্রিম রঙের কথা অনেকে ভাবলেও কেউ চেষ্টা করে দেখেননি। তাই সস্তায় রং পাবার জন্য চাষীদের ওপর চালানো হতো অমানুষিক অত্যাচার। ১৮৫৬ সালে তোমাদের মতো বয়সী এক কিশোর ইংরেজ আবিষ্কার করে ফেললেন কৃত্রিম রং। নাম তাঁর উইলিয়াম হেনরী পার্কিন। ১৮৫৩ সালে পার্কিন চোদ্দ বছর বয়সে লন্ডনের রয়েল কলেজে

পরিণত বয়সে পার্কিন

রসায়নশাস্ত্র পড়তে আসেন। দু'বছর পরেই তিনি বিজ্ঞানী ভন হফ্‌ম্যানের সহকারী হয়ে যান। হফ্‌ম্যান তাঁকে আদেশ করেন রাসায়নিক কুইনাইন তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য। তখন কুইনাইন পাওয়া যেত কেবলমাত্র সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে। পার্কিন কয়লার আলকাতরা, অ্যানিলিন, পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট ইত্যাদি নিয়ে চেষ্টা করছিলেন। হঠাৎই একদিন তিনি একটা ঘন রঙের বস্তু পেলেন। যেটা অন্য যা কিছু হতে পারে, কুইনাইন নয়। অন্য কেউ হলে বস্তুটি ফেলে দিত। পার্কিন ঐ বস্তুটি নিয়েই গবেষণা চালাতে লাগলেন। অবশেষে পেলেন বেগুনী রঙের কেলাস। যা বস্ত্রকে রঞ্জিত করতে পারে। পার্কিনের আবিষ্কৃত রং ছিল অ্যানিলিন পার্পল। তাঁর আবিষ্কার রসায়নে এক নতুন শিল্পের সূচনা করল।

এভাবেই পরীক্ষার ডিশে বাইরে থেকে উড়ে আসা অজানা বস্তু ফেলে না দিয়ে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন ডঃ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। মানুষের দেহে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি না করে তার দেহের রোগজীবাণু ধ্বংস করবে, ক্ষত সারাবে, প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে এরকম একটা ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন ডঃ ফ্লেমিং অনেকদিন ধরে। স্ট্যাফিলোককাস বা স্টাফ জীবাণু নিয়ে তিনি গবেষণা করছিলেন। এই জীবাণুগুলি ক্ষত বিষিয়ে দেয়। দেহে ফোঁড়া, মেনিনজাইটিস ইত্যাদি উৎপন্ন করে। গবেষণাগারে তিনি বিভিন্ন কালচার ডিশে এদের রেখে গবেষণা করছিলেন। কয়েকদিন তিনি গবেষণাগারে আসতে পারেননি। সেদিন এসে কালচার ডিশের ঢাকনা তুলে দেখেন বাইরে থেকে কি এসে পড়ে তাঁর সব স্টাফগুলো মেরে গেছে। তা বাতাসে তো হাজারো জীবাণু আছে। তাদের কেউই স্টাফকে মেরেছে। তিনি ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিলেন না। আর একদিন এভাবে ফ্লেমিং-এর গবেষণাপাত্রে বাইরের বায়ু থেকে কি একটা এসে জমল। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তিনি সেটা পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন। দেখলেন জীবাণুদের উপর একটি সবুজ ছত্রাক গজাচ্ছে। প্রথমে তিনি খুব বিরক্ত হলেন। ফের নতুন করে শুরু করতে হবে। কারণ এরপরই আবার পুরো গবেষণাগার সাফ-সুতরো করে নতুনভাবে কাজ শুরু করতে হবে। হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হলো ডিশটা ধুলেন না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সেটা লক্ষ্য করতে লাগলেন। মজার ব্যাপার তাঁর চোখে পড়ল। ছত্রাক যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্টাফরা তত মরছে। তাঁর মনে হলো ছত্রাকটি এমন কোনো পদার্থ নিঃসৃত করছে যা জীবাণুগুলিকে সহজে মেরে ফেলছে। এবার তিনি নতুন উদ্যমে গবেষণা শুরু করলেন। ছত্রাক বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে জানলেন ছত্রাকটি হলো পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। কোনোরকমে বাতাসে উড়ে এসেছিল তার স্পোর। এই ছত্রাকের নির্যাস থেকে তৈরি হলো পেনিসিলিন——সর্বপ্রথম অ্যান্টিবায়োটিক।

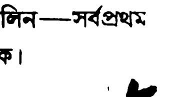

ঘুড়ির লড়াই

নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়

সুতোটাতে মাঞ্জা দাও
পাঞ্জা লড়া চলবে না——
নবাব যদি খাঞ্জা খাঁ
মাঞ্জাতে হাত কাটবে না।

খাঞ্জা খাঁ যে ঘুড়ির নবাব
যুদ্ধ খেলা খানদানি——
ঘুড়ির লড়াই পাঞ্জা তো নয়
রঙিন সুতোর মাঞ্জানি।

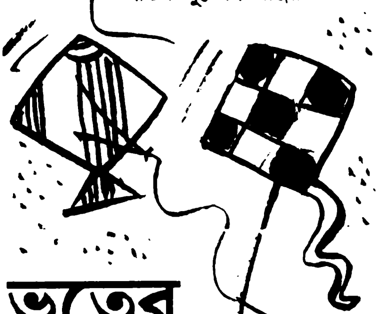

ভূতের ব্যাভার

সুধীন্দ্র সরকার

গরমকালে ভূতগুলো সব
রাত্তিরেতে একা
পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়
তাই তো মেলে দেখা!
কুকুরগুলো ভূতের ভয়ে
ডাক ছাড়ে 'ঘেউ-ঘেউ',
অন্ধকারে শুয়ে ভাবি
চোর না অন্য কেউ?

ভূতগুলো ফের শীতকাতুরে
হাড়-ঠক্-ঠক্ মাঘে
ঘাড়ের ওপর সাপটে পড়ে
দাঁতকপাটি লাগে!

"মানুষ হয়ে ভূতের ব্যাভার
কেমন করে জানুস?
মানুষ মরে ভূত যদি হয়,
ভূত মরে কি মানুষ?"

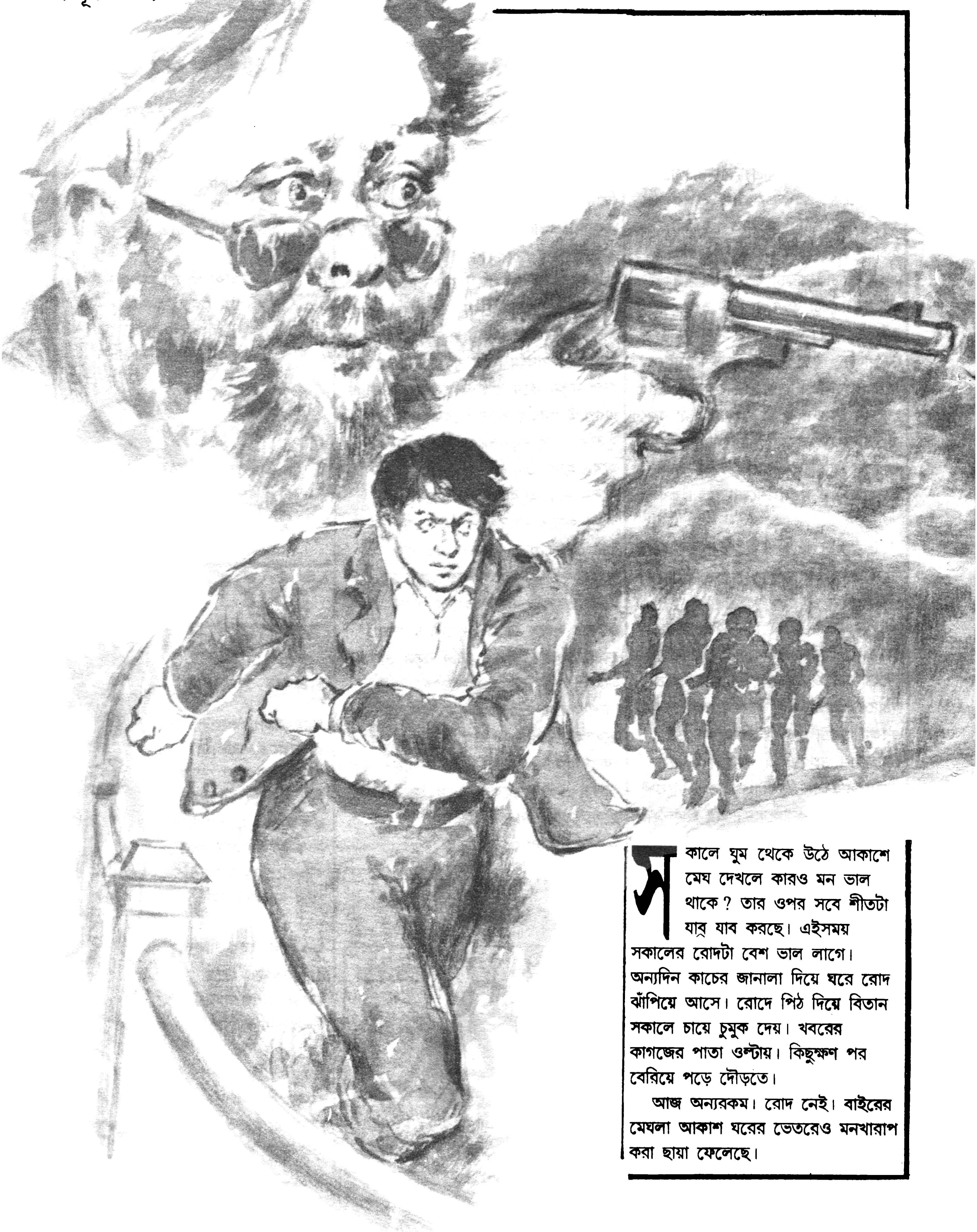

সকালে ঘুম থেকে উঠে আকাশে মেঘ দেখলে কারও মন ভাল থাকে? তার ওপর সবে শীতটা যায় যাব করছে। এইসময় সকালের রোদটা বেশ ভাল লাগে। অন্যদিন কাচের জানালা দিয়ে ঘরে রোদ ঝাঁপিয়ে আসে। রোদে পিঠ দিয়ে বিতান সকালে চায়ে চুমুক দেয়। খবরের কাগজের পাতা ওল্টায়। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে পড়ে দৌড়তে।

আজ অন্যরকম। রোদ নেই। বাইরের মেঘলা আকাশ ঘরের ভেতরেও মনখারাপ করা ছায়া ফেলেছে।

মঙ্গলে ভয়ঙ্কর অভিযান

সঞ্জীব সিংহ

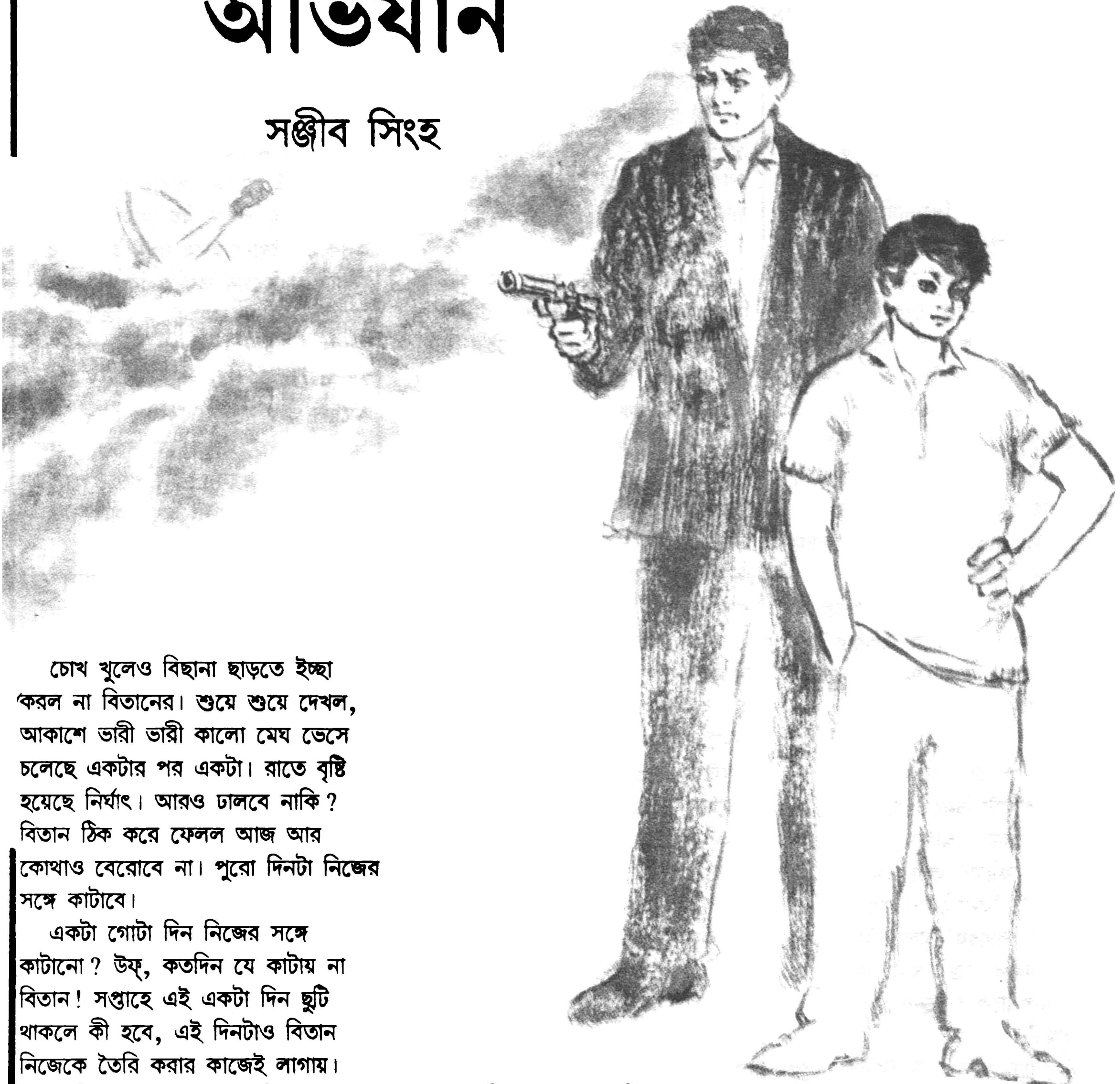

চোখ খুলেও বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা করল না বিতানের। শুয়ে শুয়ে দেখল, আকাশে ভারী ভারী কালো মেঘ ভেসে চলেছে একটার পর একটা। রাতে বৃষ্টি হয়েছে নির্ঘাৎ। আরও ঢালবে নাকি? বিতান ঠিক করে ফেলল আজ আর কোথাও বেরোবে না। পুরো দিনটা নিজের সঙ্গে কাটাবে।

একটা গোটা দিন নিজের সঙ্গে কাটানো? উফ্, কতদিন যে কাটায় না বিতান! সপ্তাহে এই একটা দিন ছুটি থাকলে কী হবে, এই দিনটাও বিতান নিজেকে তৈরি করার কাজেই লাগায়। লাইব্রেরিতে যায়। পড়ে। নোট নেয়। একটুও পিছিয়ে থাকলে চলবে না। মহাকাশ-বিদ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় খবর, গবেষণা, তথ্য সম্পর্কে জেনে রাখাটা বিতানের কাজের মধ্যেই পড়ে। যদিও ঠিক জেনে রাখার জন্যই জানা নয়, মহাকাশ বিজ্ঞান বিতানের সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। শুধু পেশা নয়, এখন নেশাও।

প্রথমে বিতানের নেশা ছিল শুধুই আকাশে ওড়া। কলেজে পড়তে পড়তেই বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের সার্টিফিকেট পেয়ে যায়। সেখান থেকে এয়ারফোর্সে। একজন দক্ষ বৈমানিকের স্বীকৃতি পাওয়ার পর আরও ওপরে ওঠার নেশাটা নিবিড় হলো।

আকাশ থেকে নিচের নদী, মাঠ, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত অনেক দেখেছে বিতান। একদিন মনে হলো, মহাকাশ থেকে আস্ত পৃথিবীটাকে দেখতে পেলে তো মন্দ হয় না!

যা ভাবা তাই কাজ। যদিও বিতান জানত, অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার কাজটা মোটেই সহজ নয়। কত ঘণ্টা তুমি আকাশে উড়েছ সেটা ওরা দেখবে। প্যারাশুট জাম্পিংয়ে

কতটা দক্ষতা রয়েছে সেটাও বিচার্য। সব মিলিয়ে পাশ করে যাওয়ার পর চার-চারটে বছর কেটে গেছে। বিতান এখন বোঝে, অ্যাস্ট্রোনটদের সবচেয়ে বেশি যেটা চাই, সেটা হলো ধৈর্য।

এমন অ্যাস্ট্রোনটও আছেন, যিনি কুড়ি বছর অপেক্ষা করেও মহাকাশে যাওয়ার সুযোগ পাননি! যেমন কম্যান্ডার চোপড়া। পুরো নাম রীতেশ চোপড়া। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখে অবশ্য অনেকই কম মনে হয়। বিতানের থেকেও বেশিক্ষণ সময় দেন জিমন্যাসিয়ামে।

হাসতে হাসতে চোপড়া বলেন, 'বেশি বেশি ব্যায়াম না করলে তোদের মতো ইয়ংম্যানের সঙ্গে পাল্লা দেব কী করে?'

মাঝেমধ্যে হতাশও হয়ে পড়েন কম্যান্ডার চোপড়া। বলেন, 'স্পেসশিপ চালানো এ জীবনে বোধহয় আর হলো না, বুঝলি!'

পরপর চারটে প্রোগ্রামে নির্বাচিত হয়েও শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়েছেন। হতাশা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু ভদ্রলোক সহজে হাল ছাড়ার মানুষ নন।

শুয়ে শুয়েই ফোনের দিকে হাত বাড়াল বিতান। চোপড়াকে একবার গুড মর্নিং বলা যাক। আর ঠিক এইসময়েই ফোনটা বেজে উঠল!

'হ্যালো।'

'হু ইজ স্পিকিং? বিতান?'

শুনেই গলাটা চিনতে পারল বিতান। কম্যান্ডার চোপড়া! আশ্চর্য, এইমাত্র চোপড়াকেই ফোনের কথা ভাবছিল, আর সেই চোপড়াই কিনা ফোন করলেন! একেই বলে বোধহয় টেলিপ্যাথি!

বিতান বলল, 'গুড মর্নিং কম্যান্ডার। এইমাত্র আপনাকে ফোনের কথাই ভাবছিলাম।'

'টেলিপ্যাথি ম্যান!' উল্টোদিক থেকে রীতিমতো উত্তেজিত শোনাল চোপড়ার গলা, 'লিসেন্, আই হ্যাভ আ বিগ নিউজ ফর ইউ।'

'হোয়াট নিউজ কম্যান্ডার?'

'আওয়ার মিশন টু মার্স ফেইলড!'

'হোয়াট?'

একটা খবরের ধাক্কাতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল বিতান। অন্যদিক থেকে চোপড়া বললেন, 'ওয়েট, ওয়েট। ডোন্ট বি এক্সাইটেড। আরও আছে।' দম নিলেন চোপড়া। বললেন, 'আওয়ার গ্রাউন্ড কন্ট্রোল লস্ট অল কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য স্পেসশিপ। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে!'

'হরিবল!' আঁতকে উঠল বিতান, 'কী হবে এখন?'

'কী আর হবে!' উল্টোদিক থেকে খুকখুক করে হাসলেন কম্যান্ডার চোপড়া, 'নাও উই হ্যাভ টু গো অ্যান্ড ডেসট্রয় দ্যাট স্পেসশিপ।'

'রিয়েলি!'

'ইয়েস স্যার। দে হ্যাভ অলরেডি সিলেক্টেড বোথ অফ আস। ইটস ফাইনাল। এনি মোমেন্ট দে উইল গিভ ইউ আ কল। প্রিপেয়ার ফর দ্যাট মাই বয়। বেস্ট অফ লাক।'

'সেম ফর ইউ কম্যান্ডার।'

ফোন বাজল মিনিট তিনেকের ভেতরেই। ফ্লাইং-লেফটেন্যান্ট জে কে ভার্মা একটাও বাড়তি শব্দ খরচ না করে নির্দেশ জানিয়ে দিল: রিপোর্ট অ্যাট টেন শার্প।

ফোন রেখে ঘড়ির দিকে তাকাল বিতান। সবে সাতটা কুড়ি। এখনও অনেক সময় আছে। বাইরে বৃষ্টি শুরু হলো। আকাশে প্রচুর মেঘ। ওই আকাশ পেরিয়ে যেতে হবে? আগে যখনই ভেবেছে রোমাঞ্চ হয়েছে। এখন সত্যিই ডাক এসে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে আগেও যেন বেশ কয়েকবার ঘুরে এসেছে মহাশূন্য থেকে।

কিন্তু 'মিশন টু মার্স' এভাবে ব্যর্থ হলো কেন? রোবট-চালিত মহাকাশযান 'অভিযাত্রী'কে মঙ্গলে পাঠানো হয়েছিল বিভিন্ন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য। 'অভিযাত্রী' মঙ্গলগ্রহে পৌঁছলে গবেষণার বিভিন্ন দিক খুলে যেত। মঙ্গলে পৌঁছনোর আগেই কীভাবে সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল? তবু ভাল, ওটা রোবট-চালিত। আর সেই রোবট-চালিত 'অভিযাত্রী'কে ধ্বংস করতে হবে ওকেই! এত দক্ষ, অভিজ্ঞ অ্যাস্ট্রোনট থাকা সত্ত্বেও ওকে বেছে নেওয়ার কারণটা বুঝল বিতান। এয়ারফোর্সের অভিজ্ঞতা! নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানার কাজটা বিতানের চেয়েও ভালভাবে আর কে পারবে? আর বিপদের সম্ভাবনা আছে নিশ্চয়ই! নইলে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়া 'অভিযাত্রী'-কে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রশ্নই বা উঠবে কেন?

বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই। জানলা থেকে সরে এল বিতান। বাড়িতে একটা ফোন করা দরকার। বাবা, মা নিশ্চয়ই এখন ব্রেকফাস্ট টেবিলে। মা সবসময় বই পড়েন। খাবার টেবিলেও তাঁর চোখের সামনে বই খোলা থাকে! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ইংরেজির অধ্যাপিকা ছিলেন তখনও বিতান দেখেছে, মা সবসময় ট্রামে যাতায়াত করতেন, বই পড়তে পারবেন বলে! বাবা আবার ঠিক উল্টো। শিল্পী-মানুষ। ছবি আঁকেন আর বলেন, 'বুঝলি বিতান, আগেকার দিনে মানুষ কম পড়ত, বেশি ভাবত। আর এখন, বেশি পড়ে, কম চিন্তা করে। যার জন্য এখন আর দার্শনিক জন্মায় না!'

মা প্রতিবাদ করতেন, 'তার মানে তুমি বলতে চাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাবতেন না? রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনো সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা আছে? জানো কি, তামিল ভাষার ব্যাকরণ বইতেও আন্ডারলাইন করা কবির হাতের লেখায় নোট পাওয়া গেছে! না পড়লে চিন্তায় ধার বাড়বে কী করে?'

বাবা কথায় পারতেন না মায়ের সঙ্গে। বিতানকে দলে টানার চেষ্টা করতেন। একমাত্র বাড়ির কথা ভাবলেই বিতানের মনটা একটু একটু খারাপ-খারাপ হয়। বাবা, মা দুজনকেই ও ভীষণ মিস করে। রঙ, তুলি, ইজেল, ক্যানভাস আর ছোট-বড় নতুন-পুরোনো বিভিন্ন বইয়ে ভর্তি বাড়িটার জন্যও কম মন কেমন করে না।

চান-টান সেরে কোয়ার্টারের লাগোয়া গ্যারেজ থেকে জাপানি কাওয়াসাকি বাইক বের করে বিতান যখন রওনা হলো, তখন নটা দশ।

কোয়ার্টার থেকে অফিস, মিনিট কুড়ির রাস্তা। হাতে একটু সময় নিয়ে বেরিয়েছে বিতান। আজ ও অফিসে তাড়াতাড়ি

ঢুকতে চায়।

কোয়ার্টারের বাউন্ডারি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ার সময় বিতান খেয়াল করল না, দাঁড়িয়ে থাকা একটা কালো মারুতি ভ্যান স্টার্ট নিল। পরের মোড় থেকে যোগ দিল আরও একটা কালো ভ্যান।

যাওয়ার রাস্তায় একটা সরু ব্রিজ পড়ে। স্পিড কমাতেই হয়। অতিকষ্টে দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। ব্রিজ পেরিয়ে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। সামনে ছোট পাহাড়, জঙ্গল। পহাড়ের কোল ঘেঁষে ডানদিকে আরও মিনিট দশেক গেলে বিতানের অফিস। বাঁদিকে বেঁকে যাওয়া রাস্তাটা চলে গেছে সোজা ন্যাশনাল হাইওয়েতে।

ব্রিজের মাঝখানে পৌঁছে বিতান দেখল, সামনে আড়াআড়ি রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো মারুতি ভ্যান। খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। নেমে হাত লাগাতে হবে?

একপাশে বাইক থামিয়ে বিতান যখন এগোতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই খেয়াল করল, ওর পেছনে ব্রিজে উঠে আসছে পরপর দুটো কালো মারুতি ভ্যান। সামনের কালো ভ্যানটার মতোই দেখতে দুটোকে! অজানা বিপদের আশঙ্কায় আচমকা মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে এল বিতানের। সামনের গাড়িটাকে যে ওভাবে দাঁড় করানো হয়েছে স্রেফ ওকে আটকানোর জন্যই তা বুঝতে পারলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দুদিক থেকে দৌড়ে আসছে অন্তত ছয় থেকে সাতজন লোক। প্রত্যেকের মুখ ঢাকা ধূসর মুখোশে। হাতে চকচক করছে ধাতব অটোমেটিক অস্ত্র। বিতান বুঝে গেল বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না। কয়েক মিনিটও লাগল না। বিতানকে ওরা ঠেলেঠুলে তুলে দিল একটা ভ্যানে।

বিতানের চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা। মারুতি ভ্যানগুলো ধরল বাঁ দিকের রাস্তা। সোজা গিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়েতে পড়ার আগে দুটো ভ্যান ঢুকে গেল পাশের জঙ্গলে। আরেকটা ছুটে চলল বিতানকে নিয়ে।

মনিটরের পর্দায় ভেসে উঠছে বিতান রায়ের ছবি।

॥ ২ ॥

সমুদ্র যেখানে আকাশের সঙ্গে মিশেছে, সেখানটায় গাঢ় নীল আর সবুজ রঙে মাখামাখি। ভোরের দিকে আকাশে মেঘ ছিল। তখন রঙটা পাল্টে হয়ে গিয়েছিল কালচে নীল। এখন যেমন সবুজের মধ্যে নীলের ভাগটাই বেশি, তখন বেশি চোখে পড়ছিল কালো রঙটা।

শমি ভেবে দেখল, বিক্রমদাই ঠিক বলেছেন, আকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের রঙ বদলায়। আগের দিন ওরা যখন সকালে পুরী এসে পৌঁছল, তখন ঝকঝকে নীল আকাশ। শীতের শেষে এই সময়টা ঘোরতর ঘোরার মরশুম। সি বিচে সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ। কলকাতায় এখনও শেষরাতের দিকটায় চাদর লাগছে। এখানে একেবারেই ঠাণ্ডা নেই। এলোমেলো হাওয়াতে শুধু একটু শিরশিরে ভাব।

এই সময়টায় পুরীতে খুব ভিড় হয় শুনে বিক্রমদা প্রথমে আসতে চাননি। কিন্তু এই নতুন হোটেল বেলাভূমির তিনদিকের জানলা খুললেই সমুদ্র দেখা যায় শুনে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যান। আর সেটাও কিছুটা বেলাভূমির মালিক শশধর বাগচীর চাপাচাপিতে।

ভদ্রলোকের বড়বাজারে বিশাল কারবার। একেবারে হালে একটা বড় জালিয়াতি ধরে দিয়ে বিক্রমদা বাঁচিয়ে দিয়েছেন শশধরবাবুকে। আর যেহেতু কেসটা ছিল প্রাথমিকভাবে রাকেশদার, তাই পয়সাকড়ি নিতে পারেননি বিক্রমদা। লালবাজারের ডি সি ডি ডি টু রাকেশ চৌধুরী বিক্রমদার ছোটবেলার বন্ধু। খুব জটিল কেস হলে বিক্রমদার সাহায্য নেন।

স্রেফ কৃতজ্ঞতা থেকেই শশধর বাগচী

অনুরোধ জানান বিক্রমদাকে, 'তাহলে স্যার, আপনিই ক'দিন থেকে আমার হোটেলটা উদ্বোধন করে দিয়ে আসুন।'

আর যেভাবে বলেছিলেন ভদ্রলোক তাতে বিক্রমদার কথায় 'লোভ সামলানো সত্যিই কঠিন।'

শশধর বাগচী বলেছিলেন, 'নিজের হোটেল বলে বলছি না স্যার। বিশ্বাস করবেন না, এত ভালো সমুদ্র, পুরীর আর কোনও হোটেল থেকে দেখতে পাবেন না—গ্যারান্টি! আপনার সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে তিনদিকেরই জানলা খুললে—উঠতে সমুদ্র, বসতে সমুদ্র, শুতে সমুদ্র...। নেহাতই পেছন দিকটা দেওয়াল রাখতে হয়েছে—তাই...।'

'নইলে কি পেছনের জানলা থেকেও সমুদ্র দেখা যেত?'

বিক্রমদার কথায় একহাত জিভ কেটেছিলেন ভদ্রলোক, 'না, না, সে কী করে হয়! তাহলে তো হোটেলটাকে সমুদ্রের মাঝখানে বানাতে হয়। হেঁ হেঁ হেঁ...। এখন তো আবার সি বিচের পাঁচশ মিটারের মধ্যে কোনও হোটেল বাড়ি বানাতে দিচ্ছে না।'

একটু আগেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভোর হওয়া দেখেছে শমি। বাথরুম থেকে বেরোতে বেরোতে বিক্রমদা বললেন, 'খুব একটা ভুল বলেননি রে ভদ্রলোক। উঠতে সমুদ্র, বসতে সমুদ্র, শুতে সমুদ্র।' ঠিক শশধরবাবুর মতো গলা করেই শেষের কথাটা বললেন বিক্রমদা।

হেসে ফেলল শমি। বলল, 'টিটোকে কিন্তু খুব মিস করব আমরা।'

বিক্রমদা বললেন, 'ঠিক বলেছিস। ও যেন বাড়ির সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেছে?'

'আন্দামান।'

'ঠিক আন্দামানেই গেছে তো?'

শমি হেসে ফেলল, 'তা ঠিক। ও একবার বনগাঁয় মাসির বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে স্কুলে কী বলেছিলো জানো?'

'কী?'

'বাংলাদেশ ঘুরে এলাম।'

'খুব একটা বাড়িয়ে তো বলেনি। দেশভাগের সময় একটু এদিক-ওদিক হলেই বনগাঁ বাংলাদেশে পড়ে যেতে পারত।'

শমিকে একটু চিন্তিত দেখাল। বলল, 'ইউরোপের সব দেশগুলো মিলে যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হচ্ছে, এখানে তেমন করা যায় না? ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ মিলে...।'

বিক্রমদা হাসলেন, 'যদি সত্যিই কোনোদিন হয়, তাহলে ক্রিকেট আর হকিতে যে আমরা আবার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হব, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ...' বিক্রমদার কথা শেষ হলো না, তার আগেই দরজায় ঠুকঠুক।

বিছানায় আধশোয়া ভঙ্গিতেই বিক্রমদা বললেন, 'ইয়েস, কাম ইন।'

আধখোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালেন হোটেলের ম্যানেজার, 'আপনার সঙ্গে একজন কথা বলতে চান ফোনে।'

'কলকাতা থেকে?'

'না, দেলাং।'

'দেলাং!' বিক্রমদার কপালে ভাঁজ পড়ল। উঠে পড়লেন। ঘর থেকে বেরিয়েই বারান্দায় ফোন। এখনও ঘরে ঘরে কানেকশন দেওয়ার কাজটা হয়নি।

দেলাং জায়গাটার নাম আগেও শুনেছে শমি। ভারতের একমাত্র কসমোড্রম। এই স্পেসশিপ লঞ্চিং সাইট থেকেই কিছুদিন আগে রোবট-চালিত 'অভিযাত্রী' মঙ্গলগ্রহে পাঠানো হয়েছে, খবরের কাগজে পড়েছে শমি। সেই দেলাং থেকে কে ফোন করল বিক্রমদাকে? কিছু হয়েছে সেখানে?

শমি বেরোতে যাবে, বিক্রমদা ঘরে ঢুকলেন। মুখটা গম্ভীর। শমিকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না। নিজে থেকেই বললেন, 'রেডি হয়ে নে। এখনই বেরোতে হবে।'

'কোথায়?'

'আপাতত দেলাং। তারপর জানি না।'

'দেলাং. মানে যেখান থেকে মঙ্গলগ্রহে অভিযাত্রী পাঠানো হয়েছে?'

ফুলস্লিভ শার্টের হাত গোটাতে গোটাতে বিক্রমদা বললেন, 'হ্যাঁ, গণ্ডগোলটা সেখানেই।'

'কিন্তু অভিযাত্রী তো মঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে গেছে!'

'তা যাক না। যাওয়ার পর সমস্যা দেখা দিতে পারে না? আর সমস্যাটা যথেষ্ট গুরুতর।' বিক্রমদার গলা খুব চিন্তিত আর গম্ভীর শোনাল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফ্লাইং-লেফটেন্যান্ট জে কে ভার্মা ফোন করেছিলেন। মিনিস্ট্রি থেকে ওঁকে বলা হয়েছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। বেচারা কলকাতার বাড়িতে ফোন করে আমাকে না পেয়ে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। লাকিলি এই হোটেলে ফোনটা এসে গেছে।'

কথা বলার ফাঁকেই দ্রুত ব্যাগ গোছাতে শুরু করেছিল শমি। বিক্রমদা বারণ করলেন, 'লাগেজ এখানেই থাক। পুরী থেকে দেলাং বিশেষ দূরে নয়। গাড়িতে ঘণ্টা-দুয়েকের রাস্তা। আগে গিয়ে দেখা যাক। তেমন বুঝলে পরে এসব নিয়ে যাওয়া যাবে।'

দেলাং যে ওড়িশাতে, তা জানত শমি। জায়গাটা পুরীর কাছে শুনে আশ্বস্ত হলো। যাক, আবার আসা যাবে এখানে!

হোটেলের ম্যানেজারের বয়স কম। চটপটে। শমিরা বেরোবে শুনে চটপট গাড়ি যোগাড় করে ফেলল। রাস্তায় যেতে যেতেই ওরা খেয়ে নেবে। ড্রাই ফুডের প্যাকেট গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়েছে। মেঘলা সকাল। রোদ মাঝেমধ্যে উঁকি দিয়েও মিলিয়ে যাচ্ছে। এমন দিনে কোথাও বেরোতে বেশ ভালোই লাগে।

গাড়িতে যেতে যেতে কেসটার গুরুত্ব কতখানি বোঝালেন বিক্রমদা। এর সঙ্গে দেশের মান-সম্মান জড়িয়ে।

রোবট-চালিত মহাকাশযান অভিযাত্রী মঙ্গলগ্রহে পাঠানোর সময় কোনও গণ্ডগোল হয়নি। প্রথম তিনটে পর্ব ঠিকঠাক উতরে যাওয়ার পর সমস্যা দেখা দেয় শেষপর্বে এসে। ব্যাক-আপ ক্রু অর্থাৎ যাঁরা দেলাং থেকে মহাশূন্যে মহাকাশযানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন, তাঁদের সঙ্গে হঠাৎই সব যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় অভিযাত্রীর। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, অভিযাত্রীর ওপর আর কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই এখানকার ইঞ্জিনীয়ার, বিজ্ঞানীদের। অভিযাত্রীকে মনিটরে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। ঠিক এই অবস্থায়

সবচেয়ে বড় বিপদ ঘটতে পারে যদি এই নিয়ন্ত্রণহীন অভিযাত্রী পৃথিবীর বায়ুস্তরে ঢুকে পড়ে।

এই পর্যন্ত শোনার পরেও শমি বুঝতে পারছিল না, বিক্রমদার এখানে কি করার থাকতে পারে! শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে শমি জিজ্ঞেস করে বসল, 'কিন্তু এই সমস্যা তুমি কীভাবে সলভ করবে?'

বিক্রমদা মজা পেলেন শমির প্রশ্নে। মুচকি হেসে বললেন, 'তুই কি ভাবছিস আমরা টিনটিন আর ক্যাপ্টেন হ্যাডকের মতো স্পেসসুট পরে চাঁদের বদলে মঙ্গলগ্রহে যাব?'

শমি লজ্জা পেল। বুঝল এত তাড়াতাড়ি ধৈর্য হারানো ঠিক হয়নি। বিক্রমদা প্রায়ই একটা কথা বলেন, 'রহস্য সমাধানে সবচেয়ে বেশি চাই ধৈর্য।' লজ্জা ঢাকতে শমি তাড়াতাড়ি বলল, 'তারপর...পৃথিবীর বায়ুস্তরে ঢুকলে কী হবে?'

বিক্রমদা বললেন, 'আসল সমস্যাটা ওখানেই। নিজের অর্বিটে ওটার ঘোরার কথা দিন তিরিশেক। তারপর পৃথিবীর বায়ুস্তরে ঢুকে অভিযাত্রী পুড়ে যাবে। ভাঙাচোরা মহাকাশযানের কিছুটা আছড়ে পড়বে পৃথিবীর মাটিতে। কিন্তু সেটা নিয়ে মাথাব্যথা নেই বিজ্ঞানীদের। আসল ভয় হলো, মহাকাশযানের জ্বালানি নিয়ে। ওটাই সাংঘাতিক।'

'কেন?'

'গাড়ি চালাতে গেলে যেমন ডিজেল বা পেট্রল লাগে, সেইরকম একটা মহাকাশযানকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে মহাশূন্যে পাঠাতে গেলেও তো ফুয়েল লাগবে। এই অভিযাত্রীর রকেটে রয়েছে চারটে থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর যার ফুয়েল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল রেডিওঅ্যাকটিভ প্লুটোনিয়াম। বিভিন্ন সামরিক প্রয়োজনেও এই প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তার তেজস্ক্রিয়তা অনেক কম। অভিযাত্রীর জন্য যে প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছিল তার তেজস্ক্রিয়তা অন্তত একশ গুণ বেশি। এই তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম পৃথিবীর বায়ুস্তরে ছড়িয়ে পড়লে ক্যান্সারের মতো মারণরোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কয়েকশো গুণ বেড়ে যাবে। পরিবেশ দূষিত হবে সাংঘাতিকভাবে। তাই যেমন করে হোক অভিযাত্রীকে এখন আটকাতে হবে। হাতে আর দিন তিরিশেকও নেই।' বিক্রমদা থামলেন। দম নিলেন। বললেন, 'অভিযাত্রীকে মহাশূন্যেই ধ্বংস করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুজন অ্যাস্ট্রোনটকে বেছে নিয়েছিল সামরিক মন্ত্রক। কিন্তু গতকাল সকালে তাদের মধ্যে একজনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

শমির কাছে ব্যাপারটা এখন দিনের আলোর মতো। বলল, 'তার মানে ওই কিডন্যাপড অ্যাস্ট্রোনটকে খুঁজে বের করতে হবে?'

'শুধু খুঁজে বের করাই নয়।' গাড়ির জানলা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে বিক্রমদা বললেন, 'সেইসঙ্গে জানতে হবে কারা আছে এর পেছনে। কেউ একটা চাইছে বাইরের মানুষের কাছে ভারতের মাথা নিচু হয়ে যাক। হঠাৎ অভিযাত্রী খারাপ হওয়ার পেছনেও এই সব অপরাধীদের হাত থাকার ঘটনাকে এখন আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।'

'ভেতরের চক্রান্ত?' অনেক ভেবে শমি বলল।

বিক্রমদা বললেন, 'আন্দাজে কিছু বলা মুশকিল। তবে এরা তো শুধু ভারতের ক্ষতি চাইছে না, এদের জন্য অমঙ্গল হবে গোটা বিশ্বের। যেমন করে হোক এদের থামানো দরকার।'

॥ ৩ ॥

বিতান রায়। বয়স আঠাশ। হাইট পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি। চেহারার গড়ন—অ্যাথলেটিক। স্বাস্থ্য—চমৎকার। আইডেন্টিফিকেশন মার্ক—ডান ভুরুর ওপর কাটা দাগ আছে।

কম্পিউটারের পর্দায় একটার পর একটা তথ্য ভেসে উঠছিল বিতান রায় সম্পর্কে। ফ্লাইং লেফটেনান্ট জে কে ভার্মার দু'হাতের দশটা আঙুলই খুব দ্রুত ঘোরাফেরা করছে কি বোর্ডের ওপর।

একটু আগে দেলাং পৌঁছেছে শমিরা। পাহাড়-জঙ্গলের আড়ালে যে এমন একটা মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র রয়েছে, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এসে একটুও সময় নষ্ট করেননি বিক্রমদা। এখানকার প্রত্যেক অ্যাস্ট্রোনট, ব্যাক আপ ক্রুদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য কম্পিউটারে রেকর্ড করা আছে। জানতে চাইলে কি বোর্ডের সুইচ টিপলেই হলো!

'বিতান রায়ের কেরিয়ার স্ট্যাট কি দরকার?' মনিটরের পর্দায় চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন জে কে ভার্মা।

'নাঃ, আপাতত এটুকুই ঠিক আছে।' বিক্রমদার কথার ফাঁকেই মনিটরের পর্দায় ভেসে উঠেছে বিতান রায়ের ছবি। প্রথমে দাঁড়ানো অবস্থায় পুরো শরীর। তারপর মুখের ক্লোজ-আপ। হাসিখুশি, স্মার্ট। এখন কোথায় আছে কে জানে? ভাবতেই খারাপ লাগল শমির।

সুইচ অফ করে জে কে ভার্মা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'মিনিস্ট্রি থেকে ডিরেকশন আছে, আপনাকে সবরকম হেল্প করার জন্য। যা যা দরকার বলবেন—এই লঞ্চিং সাইটে কিছু প্রহিবিটেড প্লেস আছে। সবাই ঢুকতে পারে না সেখানে। কিন্তু আপনার জন্য সব খোলা। আমাকে শুধু একটু আগে জানালেই আমি ব্যবস্থা করে দেব। এমনকি আপনি যদি কারও সঙ্গে কথা বলতে চান...।'

বিক্রমদা বললেন, 'সবার আগে কথা বলব বিতান রায়ের পার্টনার রীতেশ চোপড়ার সঙ্গে। তারপর যাব সেই ব্রিজটাতে, যেখান থেকে বিতানকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল।'

জে কে ভার্মা মাথা নাড়লেন। 'ও কে। আই উইল অ্যারেঞ্জ। ক্যাপ্টেন চোপড়া এখন অফিসেই আছে। জাস্ট এ মিনিট।'

ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন ভার্মা। কারও সঙ্গে দ্রুত, নিচু গলায় কথা বললেন ইন্টারকমে। বিক্রমদার দিকে ঘুরলেন, 'হি ইজ কামিং।'

চোপড়া আসার আগে ভার্মাকে বিক্রমদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কিডন্যাপ হওয়ার কতক্ষণ পর আপনারা খবরটা পান?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একটা ইঙ্গিত পেয়ে যাই। ব্রিজ দিয়ে আমাদেরই একটা জিপ আসছিল। ওরা বিতানের মোটরবাইক পড়ে থাকতে দেখে ওখানে

নামে। বিতানের বাইকে কিছু স্পেশালিটি আছে। এখানে এরকম জাপানি কাওয়াসাকি বাইক কারও নেই। তারপর ও মডিফাই করার ফলে ইট লুকস ম্যাগনিফিসেন্ট। আর ও ছিল এমনিতেই খুব ডেয়ার-ডেভিল ছেলে। বাইকটা কাছ-ছাড়া করত না। মোটর র‍্যালিতে ওর প্রচুর প্রাইজ আছে।'

বিক্রমদা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইকটার কাছে আর কিছু পাওয়া যায়নি?'

'ইয়েস, দেয়ার ওয়াজ এ নোট।'

কথাটা এসেছে দরজার দিক থেকে। সবার ঘাড় ঘুরে গেল ওদিকে। রীতেশ চোপড়া কখন এসে দাঁড়িয়েছেন, শমি খেয়াল করেনি। লম্বা-চওড়া পেটানো চেহারা। বেশ একটা চোখে পড়ার মতো পাকানো গোঁফ আছে।

ভার্মা পরিচয় করিয়ে দিলেন। চোপড়া বসে বললেন, 'স্যরি টু ডিসটার্ব ইউ...আপনারা বোধহয় বিতানের কিডন্যাপিং নিয়ে কথা বলছিলেন।'

বিক্রমদা ঘুরলেন চোপড়ার দিকে। 'আপনি কী যেন পাওয়া গেছে বলছিলেন...।'

'ইয়েস, আ মেসেজ।'

'কিডন্যাপারস মেসেজ?'

ভার্মা ঘাড় নাড়লেন। 'এগজ্যাক্টলি সো। এই যে সেই মেসেজ।'

হাত বাড়িয়ে একটা সাদা পৃষ্ঠা দিলেন ভার্মা। সেই সাদা পাতার ওপর খবরের কাগজের বিভিন্ন ইংরেজি অক্ষর কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। মূল বক্তব্য এরকম: 'তোমাদের অ্যাস্ট্রোনটকে নিয়ে গেলাম। অভিযাত্রী ধ্বংস করার প্ল্যান বাতিল কর। নইলে এ মরবে।'

ভাঁজ করে কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন বিক্রমদা। বললেন, 'এটা আমার কাছে থাক।' ঘুরলেন রীতেশ চোপড়ার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যে এই মিশনের জন্য সিলেক্টেড হয়েছেন, সেই খবর কখন পান?'

'গতকাল সকালেই।'

'বিতান যে আপনার পার্টনার তা কি জানতেন?'

'হ্যাঁ।'

'বিতানকে ফোন করে সারপ্রাইজিং নিউজটা দেওয়ার ইচ্ছে হয়নি?'

'উঁ...' শুনতে না পাওয়ার ভান করলেন রীতেশ চোপড়া। একটু সময় নিয়ে বললেন, 'হোয়াই শুড আই? দ্যাট ইজ নট মাই জব।'

ভার্মাকে জিজ্ঞেস করলেন বিক্রমদা, 'বিতানকে প্রথম খবরটা কে দেন?'

'আমি। গভীর রাতে মিনিস্ট্রি থেকে গ্রীন সিগনাল আসে। সিনিয়র হিসেবে সেই রাতেই প্রথম জানাই কমান্ডার চোপড়াকে। তারপর সকালে বিতানকে। হি ইজ মাচ জুনিয়র।'

'এত সিনিয়র অ্যাস্ট্রোনট থাকতে বিতানকে বাছার কারণ?'

'মেইনলি ফর হিজ এক্সপেরিয়েন্স ইন এয়ারফোর্স। তাছাড়া এক্সপ্লোসিভ নিয়ে কাজ করার দক্ষতা ওর মতো কারও নেই।'

চোপড়ার দিকে ঘুরলেন বিক্রমদা, 'আপনার ট্র্যাক রেকর্ড বলছে, এর আগে চারবার সিলেক্টেড হয়েও আপনি বাতিল হয়েছিলেন।'

হতাশ দেখাল চোপড়াকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আমার লাকটাই খারাপ। নইলে...' কথা শেষ না করে আচমকা বিক্রমদার হাত চেপে ধরলেন চোপড়া। আবেগে গলা কেঁপে গেল, 'যেমন করে হোক বিতানকে আপনি খুঁজে বের করুন ক্যাপ্টেন মুখার্জি। আপনি আগে আর্মিতে ছিলেন, আমাদের সেন্টিমেন্ট বুঝবেন।'

বিক্রমদা উঠে পড়লেন, 'চেষ্টা করব। তবে সবচেয়ে বেশি চাই আপনাদের সাহায্য। একটা ছোট্ট মিথ্যাও কিন্তু তদন্তকে ভুল পথে নিয়ে যাবে। এটা মনে রাখলেই চলবে।'

বিক্রমদা হঠাৎ কেন কথাটা বললেন বুঝল না শমি। এটুকু বুঝল কম্যান্ডার চোপড়া সামান্য অস্বস্তিতে রয়েছেন। চোপড়া কি কিছু লুকিয়ে যাচ্ছেন? যা একমাত্র বিক্রমদাই বুঝতে পেরেছেন!

ব্রিজটা ভারি সুন্দর। এখানে আসার পথে দূর থেকে দেখেছিল। সবুজ রঙ চমৎকার মানিয়ে গেছে আশপাশের পাহাড়, জঙ্গল আর নদীর সঙ্গে। নদীটা ছোট। কিন্তু স্রোত আছে। ব্রিজের ওপারে অফিসারদের কোয়ার্টার। এপারে লঞ্চিং সাইট ঢাকা রয়েছে জঙ্গলে। সহজে চোখে পড়ে না।

ভার্মা বললেন, 'যুদ্ধের সময় বিদেশী শত্রুদের যাতে চোখে না পড়ে সেজন্যই এমন জায়গা-বাছা হয়েছে।'

ব্রিজের ঠিক কোনখানে বিতানের বাইক পড়েছিল, তা দেখিয়ে দিলেন ভার্মা। উবু হয়ে বসে জায়গাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করে দিলেন বিক্রমদা। উল্টোদিকে ব্রিজের রেলিংয়ে ভর দিয়ে শমির সঙ্গে গল্প জুড়েছেন ভার্মা। কিছুদিন তিনি কলকাতায় ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ামে। চোখের সামনে দ্বিতীয় সেতু হতে দেখেছেন। গল্প যখন বেশ জমে উঠেছে ঠিক তখনই ডাকলেন বিক্রমদা। শমি কাছে যেতে বললেন, 'আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তুই ব্রিজের ওদিক থেকে ছুটে আসবি। নে যা।'

শমি ছুটে এল। বিক্রমদার ঠিক পছন্দ হলো না। বললেন, 'এবার রেলিং ঘেঁষে আয়। আর আসার সময় দৌড়তে দৌড়তে এই কাগজটা হাত থেকে ফেলবি।'

শমির হাতে একটা ছোট্ট কাগজ ধরিয়ে দিলেন বিক্রমদা। শমি দৌড় শুরু করে কাগজটা ফেলল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ছোট্ট কাগজের টুকরোটা ঘুরপাক খেতে খেতে অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে।

'ওয়েল ডান।' বিক্রমদা সন্তুষ্ট হয়েছেন। বললেন, 'চল, এবার যাওয়া যাক।'

যেতে যেতে ভার্মাকে বললেন বিক্রমদা, 'কলকাতায় একটা ফোন করা দরকার।'

ভার্মা মাথা নাড়লেন, 'নো প্রবলেম। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

বিক্রমদা জিজ্ঞেস করলেন, 'আশপাশের সব পুলিশ স্টেশনকে অ্যালার্ট করা আছে তো?'

'হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গেই বলা হয়েছে। কোনও সন্দেহভাজন গাড়ি দেখলেই থামিয়ে সার্চ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

'এখনও পর্যন্ত কোনও খবর নেই তো?'

'নাঃ।'

'থাকার কথাও নয়। ওরা খুব একটা কাঁচা কাজ করার লোক নয়।'

॥ ৪ ॥

দেলাংয়ে লঞ্চিং সাইটে পৌঁছেই কলকাতায় রাকেশদাকে ফোন করেছিলেন বিক্রমদা। ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাকেশদার জবাবী ফোনটা যখন এল, তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। স্নানটান সেরে আধঘণ্টার ন্যাপ নেওয়া হয়ে গেছে বিক্রমদার। রাকেশদার ফোনটার জন্যই যে ওয়েট করছিলেন, তা বোঝা গেল কথা বলার ভঙ্গিতেই।

বিক্রমদা জিজ্ঞেস করলেন, 'নামটা পেয়েছিস? এক মিনিট দাঁড়া। শমি লিখে নে তো একটা জায়গায়। মহেশ কুমার...। হ্যাঁ..., ওরফে বাবলা...ওরফে...কী? ছিটকিনি? ও মাই গুডনেস! কী নাম রে! হ্যাঁ, ট্র্যাকরেকর্ড কী বলছে? প্রথমে ট্রেন ডাকাতি... তারপর জেলব্রেক করেছে? টাফ গাই! তারপর বোম্বেতে? সুপারি-কিলার হিসেবে...মানে ভাড়াটে খুনী আর কী!'

বিক্রমদা যা যা বলছেন, শমি না বুঝে লিখে যাচ্ছে। প্রথমে কিছুই ওর মাথায় ঢুকছিল না। পরের দিকে বিক্রমদার কথায় কিছুটা বুঝতে পারল। বিক্রমদা যখন রাকেশদাকে বললেন, 'না, না, কিছুটা আন্দাজে ঢিল মারা হয়ে যাচ্ছে। তবে সবরকম সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখে নেওয়া দরকার। হ্যাঁ, ট্রেনের টিকিটটা ওই স্পটেই কুড়িয়ে পেলাম। ব্রিজের ফাঁকে আটকে ছিল। সম্ভবত দৌড়তে গিয়ে অথবা রিভলবার বের করার সময় বেরিয়ে পড়ে গিয়ে থাকবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ,...চান্স আছে। তুই আর একটু খোঁজ নে। কলকাতায় ও কবে এসেছে, কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে,...এই সব। টিকিটটা রয়েছে পুরী পর্যন্ত। সম্ভবত পুরী থেকেই গাড়ি নিয়ে এখানে এসেছিল ওরা। আর পুরী ছাড়া থাকবে কোথায়? পুরীর এস পি পট্টনায়েক তোর ব্যাচের আই পি এস? তাহলে তো ভালই হলো। তুই ওঁকে ফোনে বলে দে। এদিকটা উনি দেখুন। আমি প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করে নেব। একটা চান্স নেওয়া যাক। আইদার তুই আমাকে এখানে পাবি নয়তো পুরীতে শশধরবাবুর হোটেলে।'

ফোন রেখে শমির দিকে ঘুরে হাসলেন বিক্রমদা, 'ইচ্ছে করেই তখন তোকে ঘটনাটা বলিনি। কারণ, খোঁজ নিয়ে যদি দেখা যেত যে টিকিটের মালিক নেহাতই ছাপোষা মানুষ, তাহলে আর ঢিলটা ঠিক জায়গায় লাগত না।'

'এই জন্যই কি তুমি আমাকে ব্রিজে কাগজটা ফেলে দেখতে বলেছিলে?'

'হুঁ, কিডন্যাপিংয়ের একটা ছোট রিহার্সাল।' মজার গলায় বিক্রমদা বললেন, 'অনেক সময় এই সব ছোটখাটো সূত্র কাজে লেগে যায়। আবার উল্টোটাও হয়। হয়রানির একশেষ হয়ে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত কিছুই মিলল না।'

'আশা করা যায় এখানে তেমন কিছু ঘটবে না।'

'আশা করা যায়।' পায়চারি করতে করতে বিক্রমদা বললেন, 'এই সব ধরনের কাজে ভাড়াটে গুণ্ডা লাগানোই সুবিধেজনক। কারণ, কাজ শেষ হয়ে গেলে এদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দেওয়া সহজ। এদের জীবনেরও কোনও দাম নেই—সেদিক থেকে দেখতে গেলে,' বিক্রমদা থামলেন। একটু ভেবে বললেন, 'আমাদের ইমিডিয়েটলি পুরীতেই ফিরে যাওয়া দরকার। এখানে সবাই থাকবে। পুরীর গুণ্ডারা কিন্তু থাকবে না। হয়তো এতক্ষণে বেরিয়েই গেছে। তবু আরেকটা চান্স নেওয়া দরকার।'

ভার্মাকে অবশ্য এত সব কিছুই বললেন না বিক্রমদা। শমিরা পুরীতে ফিরে যাচ্ছে শুনে একটু অবাক হলেন ভার্মা। বাইরে বেরিয়ে একটা জোঙ্গা জিপ দেখিয়ে বললেন, 'আপনাকে সবসময়ের জন্য একটা গাড়ি দেওয়ার ইনস্ট্রাকশন আছে। এই জিপ আপনি রাখতে পারেন।'

বিক্রমদা বললেন, 'থ্যাঙ্ক য়্যু। আপাতত দরকার নেই। আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে। পরে দরকার হতে পারে। যদি ফোন করে পাঠাতে বলি তাহলে কাইন্ডলি

হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন।

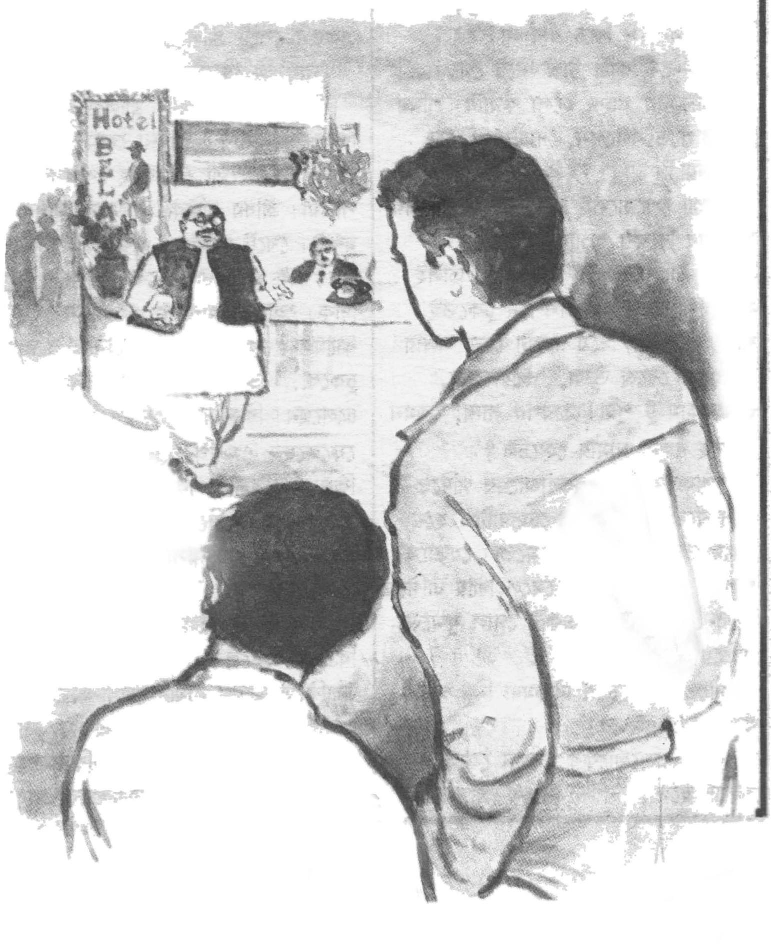

পাঠিয়ে দেবেন। আর ড্রাইভার যেন একটু শক্তপোক্ত হয়। কম্যান্ডো ট্রেনিং থাকলে সবচেয়ে ভাল।'

ভার্মা হাসলেন, 'তাহলে তো আমাকেই যেতে হয়!'

'ইউ আর ওয়েলকাম।'

পুরীতে যখন শমিরা পৌঁছল তখন সন্ধ্যে নেমে গেছে। স্বর্গদ্বার উজ্জ্বল হ্যালোজেন আলোয় ভাসছে। আছড়ে পড়া সমুদ্রের আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে বেড়াতে আসা ট্যুরিস্টদের গলা। জোরালো আলোয় ঢেউয়ের মাথার সাদা ফেনাকে আরও সাদা লাগে। হাজার হাজার মানুষ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে।

শমিকে বারবার সমুদ্রের দিকে তাকাতে দেখে বিক্রমদা বললেন, 'তুই কি সি বিচে যাবি? তাহলে যা ঘুরে আয়। আমি এদিকে ফোন-টোনগুলো সারি। এখানকার এস পিকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই রাকেশ বলে দিয়েছে। একবার ফোন করে চেক করে নেওয়া যাক।'

শমি দুদিকে মাথা নাড়ল, 'না, না। আমি এখন সি বিচে যাব না। বরং রাতের দিকে কাজ-টাজ মিটে গেলে...।'

বিক্রমদার পছন্দ হলো কথাটা। শমির পিঠ চাপড়ে বললেন, 'দ্যাটস এ গুড আইডিয়া।'

রাস্তা পেরোলেই বেলাভূমি হোটেলের সামনের দিকের বাগান, ফোয়ারা। আলো-টালো জ্বলছে বলে বেশ ভালই লাগছে দেখতে। রিসেপশনে ঢুকতেই শমিদের চমকে দিয়ে একটা চেনা গলার আওয়াজ বেজে উঠল, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম টু পুরী। তারপর স্যার, কেমন লাগছে বলুন আমার হোটেল?'

শশধর বাগচী! বড়বাজারের গদিতে বসে বসে ভদ্রলোকের চেহারাটাও হয়ে গেছে তাকিয়া বালিশের মতো। যেভাবে হাসতে হাসতে দু'হাত মেলে দিয়ে এগিয়ে এলেন, মনে হলো একটা গোল কুমড়ো গড়িয়ে এল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিক্রমদা নিচু গলায় বললেন, 'এই রে!'

যদিও ভদ্রলোকের সামনে হেসে বলতে হলো, 'দারুণ, দারুণ আপনার হোটেল। অসাধারণ।' শমি বলল, 'আমার তো ছেড়ে বেরোতেই ইচ্ছে করছিল না। উঠতে সমুদ্র...' শমির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শশধর বাগচী বললেন, '...বসতে সমুদ্র, শুতে সমুদ্র! ঠিক বলেছিলাম কী না? বলো ভাই...।' শমির পিঠে হাত রেখে ভদ্রলোক ঘুরলেন বিক্রমদার দিকে, 'তারপর সকালে আপনারা কি সাইট সিয়িংয়ে বেরিয়েছিলেন?'

বিক্রমদা বললেন, 'তা একরকম বলতে পারেন।'

'কোথায় গিয়েছিলেন? কোনারক?'

'না, ওদিকটায় এবার যাওয়ার বিশেষ ইচ্ছে নেই।'

'আর যাবেন কোথায়?'

শশধরবাবু হালকা চালে বললেন, 'কথায় বলে না, তুমি যাও বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে। আপনিও এলেন আর পুরীতেও ডেডবডি পাওয়া গেল!'

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন বিক্রমদা, 'কোথায় পাওয়া গেছে ডেডবডি?'

'এই তো পাঁচ-ছটা হোটেল পরে। তিনজন উঠেছিলেন। দুজন ধাঁ। আর একজন পেটে গুলি খেয়ে পড়ে আছেন।'

'নাম কী হোটেলের?'

'হোটেল রাজলক্ষ্মী। মালিক হাওড়া শিবপুরের লোক। পুরনো চেনা। এই জমির সন্ধান তো ওর কাছ থেকেই পাওয়া। শ্রীধর মল্লিক। ছাপোষা মানুষ মশাই। খেটে খাচ্ছিল, এবার পুলিশে ছুঁল! এই ম্যাও এখন কে সামলাবে বলুন দিকি। হোটেল ব্যবসার এই হচ্ছে ঝামেলা। কে যে কী ধান্দা নিয়ে ঘরে ঢুকবে...' ভদ্রলোক নিজের মনে বকেই চলেছেন। বিক্রমদা ততক্ষণে ফোনে ধরে ফেলেছেন এস পি পট্টনায়েককে। দ্রুত কিছু কথা বলার পর ফোন নামিয়ে রেখে ঘুরলেন শমির দিকে, 'মার্ডার ফর গেইন নয়। প্রচুর টাকাপয়সা পাওয়া গেছে ডেডবডির পাশে। খুনের কারণ অন্য।'

শমি যা ভাবছিল তাই-ই হলো। বিক্রমদা বললেন, 'মৃতব্যক্তির হাতের উলকিতে মহেশ নামটা লেখা আছে। অর্থাৎ আন্দাজে ঢিলটা খুব একটা ভুল জায়গায় মারা হয়নি, বুঝলি। বিতানকে কিডন্যাপ করার জন্য মহেশকুমার এবং তার আরও কিছু সঙ্গী এসে উঠেছিল পুরীতেই। কাজ সেরে এসে দু'একদিন থেকে গিয়েছিল ফুর্তি-টুর্তি করবে ভেবে। কিন্তু, তারপর কী এমন ঘটল যে মহেশকুমারকে মরতে হলো?'

চিন্তিত দেখাল বিক্রমদাকে। বললেন, 'ব্যাপারটা যদি এমন হয় যে মহেশকুমার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে জানার পর...' বিক্রমদা শমির দিকে তাকালেন। বললেন, 'সেক্ষেত্রে এদের নেটওয়ার্ক তো সাংঘাতিক! পুলিশ, মিলিটারি সর্বত্র এদের লোক ছড়ানো। অ্যাডভান্স খবর পেয়ে যাচ্ছে। আর ঠিকই, নইলে এতবড় একটা কাজে হাত দেওয়ার সাহস হতো না।'

শশধর বাগচী কিছুই বুঝতে পারছেন না। একবার বিক্রমদার, একবার শমির মুখের দিকে দেখছেন ভদ্রলোক। শেষ পর্যন্ত কিছু না বলে থাকতে পারলেন না, 'কী মশাই, কোনও গণ্ডগোল? আপনাকে কেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

বিক্রমদা বললেন, 'তা একটু গণ্ডগোল আছে। বুঝলেন শশধরবাবু, আপনার হোটেলে আর আমাদের থাকাটা বোধহয় ঠিক হবে না। আমি চাই না কোনও গুণ্ডা-বদমাশ আপনার এই সাজানো, নতুন হোটেলে এসে হামলা করুক।'

মুখটা শুকিয়ে গেলেও একটুও বুঝতে দিলেন না ভদ্রলোক। বরং উল্টে বিক্রমদার হাত ধরে বললেন, 'আমাকে এতটা কাপুরুষ ভাববেন না স্যার। একসময় রেগুলার লোহালক্কড় তুলে ব্যায়াম করেছি। ওটা ছেড়ে দিয়েই তো কাল হলো। দুম করে মোটা হয়ে গেলুম। রোগা হওয়ার কম চেষ্টা করি! এই তো সাঁতারে ভর্তি হয়েছি...। রোজ কলেজ স্কোয়ারে যাচ্ছি।'

শমি এতদিনে বুঝে গেছে, ভদ্রলোক একবার কথা শুরু করলে চট করে তাঁকে থামানো মুশকিল। নিজের কথা বলতেই বেশি ভালবাসেন। অন্যেরটা শুনতে তত আগ্রহী নন।

পুরীতে খবরের কাগজ পৌঁছয় সন্ধ্যের দিকে। হোটেলের রিসেপশনে সব কাগজই দিয়ে গেছে। শশধরবাবুর কথা শুনতে শুনতেই সেদিনের টেলিগ্রাফ তুললেন বিক্রমদা। শশধরবাবু তখনও তাঁর

ব্যায়ামের গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন। বিক্রমদা পড়ে চলেছেন কাগজ। শমি দেখল কাগজ পড়তে পড়তে চোখমুখ গম্ভীর হয়ে গেছে বিক্রমদার। শমির দিকে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দ্যাখ, প্রেসও খবরটা পেয়ে গেছে আগের দিনই। এরা যে কী সিক্রেসি মেন্টেন করে, কে জানে! সব খবরই বেরিয়ে যায়!'

প্রথম পাতাতেই চোখে পড়ার মতো জায়গায় খবরটা রয়েছে: মিশন টু মার্স ফেইলড! খবরটা আর কোনও কাগজে নেই। অর্থাৎ টেলিগ্রাফের এক্সক্লুসিভ। মোটামুটি মূল ব্যাপারটা রয়েছে। অভিযাত্রীর সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার কথা লিখেছে, বিজ্ঞানীরা চিন্তিত, ইত্যাদি। তবে আসল ভয়ের কথাটা দেয়নি। এমনও হতে পারে অতটা খবর পায়নি। এটা এখনও গোপন রয়েছে!

বিক্রমদা বললেন, 'যাক, বিতানের খবরটা যে এখনও ওরা পায়নি এই যথেষ্ট। তবে যেভাবে সবকিছু এগোচ্ছে তাতে পেতে বেশি দেরি হবে বলে তো মনে হয় না।'

হুমড়ি খেয়ে শমির পাশ থেকে খবরটা পড়ে ফেলেছেন শশধরবাবুও। যথারীতি প্রশ্নটা করলেন, 'মশাই, মঙ্গলগ্রহে আবার কী ফ্যাকড়া বাধল?'

বিক্রমদা হাসলেন, 'এখনও বাধেনি। তবে ভবিষ্যতে বাধবে। আগে মানুষকে ওখানে পৌঁছতে দিন, তারপর দেখবেন কত নিত্যনতুন ফ্যাকড়া বাধছে।'

॥ ৫ ॥

'প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ বছর আগের ঘটনা। একটা বিশাল ধূমকেতু আছড়ে পড়েছিল মঙ্গলগ্রহের বুকে। যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তা কয়েক লক্ষ হাইড্রোজেন বোমা ফাটার চেয়েও বেশি। ওই বিস্ফোরণের ফলে মঙ্গলের বুক থেকে রাশি রাশি ধুলো আর পাথরের টুকরো এত জোরে ওপরের দিকে ওঠে যে মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে কিছু চলে যায় মহাশূন্যে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে। তারপর লক্ষ লক্ষ বছরে মহাকাশে যে পরিবর্তন ঘটে তার ফলে একটা পাথরের টুকরো চলে আসে পৃথিবীর খুব কাছে। পৃথিবী তাকে টেনে নেয়। ১৩ হাজার বছর আগে যখন প্রস্তরযুগের মানুষ সবে চাষবাস শিখেছে, তখন সেই মঙ্গলের পাথর আছড়ে পড়ে। অ্যান্টার্টিকার বরফের তলায় সেই পাথর ঘুমিয়ে ছিল ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত। সেই পাথর আবিষ্কৃত হওয়ার পর এতদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে কোটি কোটি বছর আগে মঙ্গলে প্রাণ থাকলেও থাকতে পারে। অর্থাৎ লাল গ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।'

একমনে এতক্ষণ বিক্রমদার কথা শুনছিল শমি। জিজ্ঞেস করল, 'পাথফাইন্ডার পৌঁছে যাওয়ার পর এ ব্যাপারে কোনও জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়নি?'

বিক্রমদা বললেন, 'না। এত তাড়াতাড়ি প্রমাণ আশা করাও মুশকিল। হয়তো আমাদের 'অভিযাত্রী' পৌঁছলে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যেতে পারত।'

'অভিযাত্রীকে কেউ যদি এখান থেকেই খারাপ করে দেয়, তাহলে তা জানার উপায় আছে?'

বিক্রমদা মাথা নাড়লেন। 'ভেরি, ভেরি ডিফিকাল্ট। এরকম একটা প্রোজেক্টে কয়েকশো থেকে হাজারখানেক বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার জড়িত থাকেন। কারও পক্ষে সাবোতাজ করা যেমন শক্ত, ঠিক তেমনই শক্ত সেই বিশেষ দু'একজনকে খুঁজে বের করা। তাই ওদের ভুলের অপেক্ষায় থাকতে হবে। অপরাধী ভুল করবেই। কিছু না কিছু সূত্র ঠিকই ফেলে যাবে। রাশিয়ার মহাকাশযান মির কেন খারাপ হয়েছিল জানিস? এক ইঞ্জিনীয়ার ভুল করে একটা প্লাগ খুলে দিয়েছিলেন।'

বিক্রমদার কথার ফাঁকে ঢেউ আছড়ে পড়ল। সাদা ফেনা এসে ধুয়ে গেল শমির পা। রাত বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সি বিচ ফাঁকা হতে শুরু করেছে। নির্জন মেরিন-ড্রাইভ ধরে চলে যাচ্ছে একটা-দুটো সাইকেল। এক জায়গায় বালির ওপর গোল হয়ে বসে পয়সা গুনছে ঝালমুড়িওয়ালারা। ওরা এবার বাড়ি যাবে। সকালের মেঘলা আকাশ কেটে গিয়ে আকাশ এখন ঝকঝকে। হালকা চাঁদের আলোয় মিটমিট করে জ্বলছে অগুন্তি তারা।

শমিরা যেখানে বসে আছে, তার থেকে কিছুদূরে এসে বসল একজন। মুণ্ডিত মস্তক, গায়ে উড়নি। এক সন্ন্যাসী।

শমি জিজ্ঞেস করল, 'এখনও পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে, তাতে কি কিছুটা এগোনো যাচ্ছে?'

বিক্রমদা বালির ওপর আধশোয়া হলেন, 'নারে, ব্যাপারটা যত সহজ মনে হচ্ছে ততটা সহজ নয়। একটা বীভৎস বুদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সেটা যদি মিলে যায়...।' বিক্রমদা একটু থামলেন। ঢেউয়ের আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ চারদিক শান্ত হয়ে গেল।

আকাশের দিকে তাকাল শমি। কোনদিকে যেন লাল গ্রহ মঙ্গল? আর কোথায়ই বা রয়েছে অভিযাত্রী? রোবট-চালিত সেই মহাকাশযান কোন মহাশূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কে জানে! একটা একটা করে দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর ঠিক আঠাশ দিন পর অভিযাত্রী পৃথিবীর বায়ুস্তরে ঢুকে পড়লেই মানুষের সর্বনাশ হবে। কী দরকার ছিল এই মারাত্মক অভিযানের? যে প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরপাক খাচ্ছিল শমির মনে, সেটা এই ফাঁকে করে ফেলল, 'আচ্ছা কিডন্যাপ করার জন্য শুধু বিতান রায়কে বেছে নিল কেন ওরা?'

বিক্রমদা বললেন, 'কারণটা খুব সহজ। অভিযাত্রীকে ধ্বংস করার জন্য যে ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন তা একমাত্র বিতান রায়েরই আছে। অ্যাস্ট্রোনটদের মধ্যে এই দক্ষতা সবার থাকে না।'

'বিতান রায়কে ধরা যাক পাওয়া গেল না। তাহলে কী হবে?'

'সেই জায়গায় অন্য কাউকে তৈরি করে পাঠাতে হবে। তৈরি করার কাজ অলরেডি শুরুও হয়ে গেছে গোপনে।'

'বিতান রায়ের বদলে যাকে তৈরি করা হবে, তার ওপরেও তো শেষমুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে?'

'সে সম্ভাবনা যথেষ্ট।' বালি ঝেড়ে উঠে পড়লেন বিক্রমদা। বললেন, 'তবে এখন সামরিক মন্ত্রক অনেক সাবধান হয়ে গেছে। চল, এবার আমরা হাঁটতে হাঁটতে

যাব হোটেল রাজলক্ষ্মীতে। মালিক শ্রীধর মল্লিক এতক্ষণে ফিরে এসে নিশ্চয়ই রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে ফেলেছেন। মৃত মহেশকুমার এবং তার সঙ্গীসাথীদের সম্পর্কে কিছু আলোকপাত তিনি নিশ্চয়ই করতে পারবেন।'

শ্রীধর মল্লিকের চেহারাটা লম্বা, রোগাটে। গায়ের রঙ সমুদ্রের হাওয়ায় তামাটে। ভদ্রলোকের চোখমুখ থেকে আতঙ্ক এখনও যায়নি। বিক্রমদার চেহারা দেখে বোধহয় একটু ভরসা পেলেন। নিয়ে গেলেন একেবারে নিজের ঘরে। বললেন, 'এস পি সাহেব আপনার কথা বলেছেন। আমি অবিশ্যি অনেক আগে থাকতেই নামে চিনি আপনাকে। আপনার সেই অস্ত্র-জলায় ক্ষেপণাস্ত্র রহস্য সমাধানের কথা কাগজে পড়েছি।'

শমি জানে বিক্রমদা এই সব প্রশংসা পারতপক্ষে গায়ে মাখেন না। পারলে এড়িয়ে যান। দ্রুত প্রসঙ্গ বদলে ফেলে কাজের কথায় ঢুকে পড়লেন বিক্রমদা, 'কতজন ছিল ওরা?'

'প্রথমে তিনজন। আগের দিন রাতে আর একজন এসেছিল।'

'ঘর ভাড়া নিয়েছিল কবে?'

'গত পরশু।'

'অর্থাৎ বিতান কিডন্যাপ হওয়ার আগের দিন।' মনে মনে দ্রুত হিসেব সেরে নিয়ে বিক্রমদা বললেন, 'ভালো করে ভেবে বলুন, গতকাল ওরা কখন বেরিয়েছিল? খুব সকালে কি?'

শ্রীধর মল্লিক একটু সময় নিলেন। বললেন, 'তাহলে একটু দাঁড়ান। ওদের ঘরে খাবার-দাবার দিত বাঁটুল। ও ঠিক সময়টা বলতে পারবে। বাঁটুলকে ডাকি।'

বাঁটুলের চেহারার সঙ্গে কমিকসের চরিত্রের কোনও মিলই নেই। লম্বা, প্রচণ্ড রোগা। বাঁটুল একটু নার্ভাস প্রকৃতির। শমি দেখল, ছেলেটার হাঁটু কাঁপছে।

বিক্রমদা বললেন, 'তোমার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই বাঁটুল। শুধু যা যা জিজ্ঞেস করব ভেবেচিন্তে উত্তর দেবে, কেমন?'

বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল বাঁটুল। বিক্রমদা জিজ্ঞেস করলেন, 'গতকাল সকালে বাবুরা কখন বেরিয়েছিলেন?'

বাঁটুল বলল, 'তা ধরেন ছটা, সাড়ে ছটা হবে। তার আগের রাতেও অনেকক্ষণ জেগেছিলেন। খুব হইচই করছিলেন। আমাকে বলে রেখেছিলেন, সকালে ঘুম ভাঙিয়ে চা টোস্ট ওমলেট দিবি।'

'কেমন দেখতে ছিল লোকগুলোকে? আর কী কথা বলত নিজেদের মধ্যে?' বিক্রমদা একটা চকচকে দশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন বাঁটুলের হাতে। হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বড় করে একটা নমস্কার ঠুকল বাঁটুল। বলল, 'যে বাবুটা মরে গেছে...' বিক্রমদা হাত তুলে থামালেন, 'উঁহু, ওর কথা বলতে হবে না। বাকি দুজনের কথা বল।'

'একজনের স্বাস্থ্য ব্যায়ামবীরের মতন। কিন্তু গলাটা পাতলা। খোনা গলায় কথা বলছিল হিন্দিতে।'

'হিন্দিতে?'

'হ্যাঁ, তিনজনেই হিন্দিতে কথা বলছিল। একজনই শুধু খুব ইংরেজি ঝাড়ছিল।'

'কে? যে মরেছে?'

'না, না। আরেকটা লোক ছিল। সাহেবদের মতো গায়ের রঙ। বেড়াল-চোখো।'

'মানে কটা-চোখ।' শমিকে বললেন বিক্রমদা।

'তুই হিন্দি বুঝিস? ওরা কী কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে?'

'তেমন কিছু নয়। ইয়ার্কি মারছিল বেশির ভাগ সময়। ওই ব্যায়ামবীরের পেছনে লাগছিল বাকি দুজন। ওকে ডাকছিল একটা অদ্ভুত নামে—।'

'নামটা মনে পড়ছে না?'

বাঁটুল মাথা নামাল, 'ঠিক পেটে আসছে স্যার, কিন্তু মুখে আসছে না।'

'ঠিক আছে। পরে মনে এলে বলবি। আর ওই বেড়াল-চোখোটা? ওকে কী নামে ডাকছিল বাকিরা?'

'জন। কখনও-সখনও আবার জুয়ানও বলছিল।'

'ওদের অনেকগুলো নাম থাকে।' বিক্রমদা বললেন, 'যে মারা গেছে, তার নামটা মনে আছে?'

'মহেশ।' বলার পর একটু উসখুস করল বাঁটুল। বলল, 'ওদের কাছে প্রচুর টাকা ছিল। একটা বড় বাক্স-বোঝাই টাকা।'

'নিজেদের মধ্যে একবারও ঝগড়া করেনি টাকা নিয়ে?'

'না, তবে...' বাঁটুল একটু সময় নিয়ে বলল, 'আজ বিকেলে একটা লোক এসেছিল। চাপদাড়ি, কালো চশমা। ও আসার পর খুব ধমকাচ্ছিল তিনজনকে। বারবার বলছিল, আসলি নাম সে কিঁউ পুকারতা হ্যায়? টিকিট মে ভি আসলি নাম দিয়া...আভি কলকাত্তা সে ফোন আয়া...।' বাঁটুল থামল।

বিক্রমদা নিজের মনেই বললেন, 'তাহলে ঠিকই ধরেছি। মহেশ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার খবরটা ওরা সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গিয়েছিল! আচ্ছা বাঁটুল, কোনও অস্বাভাবিক শব্দ পাওনি?'

'হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত শব্দ।' বাঁটুল একটু ভেবে বলল, 'ধমকানি দেওয়ার সময়েই একটা চাপা আওয়াজ পেয়েছিলাম। হাততালির শব্দের মতন অনেকটা। তারপরেই একটা চাপা আর্তনাদ। আমি ভাবলাম ওই লোকটা বোধহয় কাউকে চড়-থাপ্পড় মারল। পায়ের আওয়াজ পেয়ে সরে গেলাম জানলার ধার থেকে।'

'সাইলেন্সার!' বিক্রমদা বললেন, 'ঠিক আছে। শেষ প্রশ্ন, গতকাল সকালে ওদের নিতে কি গাড়ি এসেছিল?'

বাঁটুল মাথা নাড়ল, 'এখানে আসেনি। ওরা স্বর্গদ্বারের সামনে থেকে গাড়িতে উঠেছিল। সকালে ওদের চা-টোস্ট দিয়ে বাজার গিয়েছিলাম। ফেরার সময় দেখলাম ওরা কালো রঙের মারুতি ভ্যানে উঠছে।'

উঠে পড়লেন বিক্রমদা। বিড়বিড় করে নিজের মনে দুবার বললেন, 'কালো মারুতি ভ্যান...। কালো মারুতি ভ্যান।'

॥ ৬ ॥

পরপর দুটো দিন কাটল ঝড়ের গতিতে। এই দুটো দিন দেলাংয়েই বেশি কাটিয়েছেন বিক্রমদা। মিশন টু মার্সয়ের সঙ্গে যুক্ত অনেকের সঙ্গে কথা বলেছেন। কমান্ডার চোপড়ার সঙ্গে আবারও একবার কথা বললেন—এবার প্রায় দু'ঘণ্টা। এই দুদিন বিক্রমদার সঙ্গে শমির কথা হয়েছে

খুবই কম। বিক্রমদা যখন একটা কেসের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে পড়েন, তখন চোখমুখই বদলে যায়। শমি জানে এসব সময়ে প্রশ্ন করে কনসেনট্রেশন নষ্ট করা ঠিক নয়। যদি কিছু বলার থাকে, বিক্রমদা নিজেই বলবেন। সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

অবশেষে মুখ খুললেন বিক্রমদা। দ্বিতীয় দিন রাতে। বিক্রমদাকে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে কাজ করতে দেখে হোটেলের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল শমি। দূরে অন্ধকারে সমুদ্রের সাদা ঢেউ ভাঙছে। প্রচণ্ড গর্জন ঠিক বলা যাবে না। দিনের চেয়ে শব্দটা শুধু একটু বেড়েছে। কখন বিক্রমদা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, টের পায়নি শমি।

ঘোর ভাঙল বিক্রমদার কথায়, 'কেমন লাগছে সমুদ্র?'

শমি হাসল, 'সমুদ্রে চান না করা পর্যন্ত ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না যে সমুদ্রে এসেছি।'

শমির পিঠ চাপড়ে দিলেন বিক্রমদা, 'মন খারাপ করিস না। কাল সমুদ্রে চান করা যাবে।'

'কাল সকালে দেলাংয়ে যাবে না? কোনও কাজ নেই? সবার সঙ্গে কথা বলা হয়ে গেছে? কিছু পাওয়া গেল?' সুযোগ পেয়ে এক নিঃশ্বাসে অনেক প্রশ্ন করে ফেলল শমি।

'নাঃ, আপাতত কোনও কাজ নেই। একেবারেই বেকার হয়ে গেছি, বুঝলি।'

বিক্রমদার গলায় একধরনের মুষড়ে পড়া ভাব। শমি একটু অবাক হয়ে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'এতজনের সঙ্গে কথা বলেও কিছুই পাওয়া গেল না?'

'উঁহু!' বিক্রমদা মাথা নাড়লেন। বললেন, 'কিচ্ছু না। বিতানের কিডন্যাপ হওয়ার রহস্য আপাতত কুয়াশার আড়ালেই রয়ে গেছে। এক পাও এগোনো যায়নি। কিডন্যাপারদের তরফ থেকেও কোনও খবর নেই। বোঝা যাচ্ছে না, ওরা একেবারে চুপ করে গেছে কেন!'

'কিন্তু কিডন্যাপারদের মধ্যে যে ঝামেলা হলো, সেখান থেকেও কোনও

হেঁটে যাচ্ছেন এক সন্ন্যাসী।

সূত্র পাওয়া গেল না?'

বিক্রমদার গলায় হতাশা, 'নারে, ওখান থেকে যে খুব বড় ব্রেক থ্রু পাওয়া যাবে না তা আমি আগেই জানতাম। ওদের মধ্যে যদি কেউ ধরাও পড়ত, তাহলেও কিন্তু বিশেষ লাভ হতো না।' বিক্রমদা কারণটা ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, 'এদের টাকা দিয়ে একটা কাজ করতে বলা হয়। যে আসল লোক, সে কিন্তু অনেক দূরে থাকে। মহেশকুমার খুন হওয়ার দিন, বাঁটুলের কথামতো, একজন চাপদাড়ি, কালো চশমা পরা লোক এসেছিল। কী তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তোর কি ধারণা, লোকটা নিজের আসল পরিচয় দিয়ে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে?'

'না, তেমন হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

'সম্ভাবনা কী রে', অন্ধকারে বিক্রমদা হাসলেন, 'কখনই আসল পরিচয় দেয় না এরা। এমনকী নিজেকে কেমন দেখতে সেটাও আড়ালে রাখে...।'

'ছদ্মবেশ!' শমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

'এগজ্যাক্টলি।' বিক্রমদা বললেন, 'লোকটা যে ছদ্মবেশে ছিল তা আমি বাঁটুলের কথা শুনেই বুঝেছি।'

'লোকটা কি সামরিক বাহিনীরই কেউ?'

'জানি না।'

'কালো মারুতি ভ্যান ওরা কোথা থেকে পেল?'

'লোকাল ট্র্যাভেল এজেন্ট নরসিংহ গুছাইতের কাছ থেকে গাড়িগুলো ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। নরসিংহকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এদিকটা ঠিক আছে। তদন্তে কোনও ফাঁক রাখেনি পুলিশ।'

শমি জিজ্ঞেস করল, 'গাড়িগুলো কে নিয়েছিল?'

'সেই কালো চাপদাড়ি আর কালো চশমা।' বিক্রমদাকে অধৈর্য দেখাল। পায়চারি করতে করতে বললেন, 'ঠিক এই জায়গায় এসে গোটা ব্যাপারটা

আটকে যাচ্ছে। লোকটার চেহারার বিবরণ যা পাওয়া গেছে, তাতে ওরকম চেহারার কয়েক কোটি মানুষ এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু খটকাটা অন্য জায়গায়।'

কোন খটকার কথা বলছেন বিক্রমদা, তা জানে না শমি। ওর কাছে পুরো রহস্যটাই জট পাকিয়ে আছে।

রোবট-চালিত মহাকাশযান অভিযাত্রী পাঠানো হয়েছিল মঙ্গলগ্রহে। মহাশূন্যে সেই অভিযাত্রী খারাপ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই রহস্যের শুরু। এই প্রোজেক্টে জড়িত কয়েকশো বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার, অ্যাস্ট্রোনটদের মধ্যে কেউ যে এই ষড়যন্ত্রে জড়িত, তা বোঝা গেছে বিতান রায় কিডন্যাপ হওয়ায়। কারণ, অভিযাত্রী পৃথিবীর বায়ুস্তরে প্রবেশ করলেই ঘোর সর্বনাশের আশঙ্কা। অথচ, অভিযাত্রীকে মহাশূন্যে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হলো তাকে শুরুতেই ভেস্তে দেওয়ার চেষ্টা হলো অ্যাস্ট্রোনট বিতান রায়কে কিডন্যাপ করে। রহস্যের দ্বিতীয় ভাগ শুরু এখান থেকে। যারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারা চায় মঙ্গলে অভিযানকে কেন্দ্র করে বিশ্বের দরবারে ভারতের মাথা নিচু হোক। এজন্য তারা খুন-খারাপি করতেও পেছপা নয়। বিতান রায়ই বা এখন কোথায়? মহেশকুমারকে যেভাবে মেরে দিয়েছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে সর্বত্র ওদের লোক ছড়ানো! বিতানকেও মেরে দেয়নি তো?

প্রশ্নটা করতে বিক্রমদার অস্থিরতা বাড়ল। বললেন, 'ওটাই তো আমাকে বেশি ভাবাচ্ছে রে। ইয়ং, স্মার্ট, সাহসী এরকম ছেলেই তো দরকার এখন বেশি বেশি করে। বিতানের যদি কিছু হয় তাহলে আমি নিজেকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারব না।' রেলিংয়ে হেলান দিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ অন্ধকার সমুদ্রর দিকে তাকিয়ে রইলেন বিক্রমদা। নিজে থেকেই বললেন, 'একটা অঙ্ক কিছুতে মিলছে না। প্রথম দিন বেশি উদ্বিগ্ন দেখেছিলাম কমান্ডার চোপড়াকে। তুলনায় কিছুটা নিশ্চিন্ত, নির্বিকার ছিল লেফটেন্যান্ট ভার্মা। ছবিটা হঠাৎ উল্টে গেল কেন?'

'অর্থাৎ উদ্বেগ বেড়ে গেছে ভার্মার?'

'ঠিক তাই। তুলনায় অনেক নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে চোপড়াকে। একটা কারণ হতে পারে।' বিক্রমদা থামলেন। যেন দম নিলেন। বললেন, 'আগে চারবার নির্বাচিত হয়েও বাতিল হয়েছিল চোপড়া। এবার পার্টনার কিডন্যাপড হয়ে যাওয়ায় প্রথমদিকে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল এটাও বোধহয় ফসকে গেল। উদ্বেগ স্বাভাবিক। কিন্তু তারপর যখন শুনল, বিতানের জায়গায় আরেকজনকে তৈরি করা হচ্ছে তখন উদ্বেগ কিছুটা কমল।' নিজের যুক্তি যেন ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, এভাবে মাথা নাড়লেন বিক্রমদা।

দূরে অন্ধকারে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে প্রসঙ্গ বদলাল শমি। জিজ্ঞেস করল, 'মঙ্গলে গিয়ে কি সত্যিই থাকা যাবে কখনও? এত যে চেষ্টা করা হচ্ছে!'

প্রসঙ্গ বদলাতে যেন খুশিই হলেন বিক্রমদা। বললেন, 'কেন যাবে না? মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। বিভিন্ন দেশ মহাকাশযান পাঠাচ্ছে। মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে আরও বেশি করে জানছে। এখন রোবট যাচ্ছে। তারপর মানুষ যাবে। তবে থাকতে গেলে সবার আগে পৃথিবীর মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার মঙ্গলে। এই কাজটাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে টেরাফর্মিং। কল্পবিজ্ঞানে প্রথম ভাবা হলেও এখন বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে টেরাফর্মিং ব্যাপারটা বাস্তবে সম্ভব। তবে প্রচুর সময় লাগবে।'

'কত?'

'তা শ'তিনেক বছর তো লাগবেই।'

'তিনশো!' অবাক হয়ে গেল শমি।

বিক্রমদা হাসলেন, 'এখানেও সেই ধৈর্যের পরীক্ষা। দেখেছিস তো! আর তাছাড়া উপায় কী! জনসংখ্যা আর দূষণ যেভাবে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তাতে আর কতদিন এখানে থাকা যাবে? অন্য কোথাও তো একদিন পাড়ি জমাতেই হবে মানুষকে।' বলতে বলতেই রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে বিক্রমদা মুখ বাড়ালেন নিচের দিকে।

শমি দেখল, নিচের নির্জন মেরিন-ড্রাইভ দিয়ে ওদের হোটেলের দিকেই তাকাতে তাকাতে হেঁটে যাচ্ছেন একা এক সন্ন্যাসী। মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া পোশাক। ওদের দেখে মুখ নামিয়ে নিলেন সন্ন্যাসী। দ্রুত ঢুকে পড়লেন পাশের অন্ধকার গলিতে।

বিক্রমদার কপালে ভাঁজ, চোখের দৃষ্টি তীব্র। গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুই শুয়ে পড়। আমার দেরি হবে।'

বিক্রমদার এই গলা চেনে শমি। জানে এসব সময়ে একা থাকতে চান বিক্রমদা। ঘরে চলে এল শমি। ঘুমনোর চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম কি সহজে আসে? অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসছে। অন্ধকার রাতে একা হাঁটেন, কে এই সন্ন্যাসী? ওদের হোটেলের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন কেন? কেনই বা ওদের দেখতে পেয়ে দ্রুত গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন? প্রশ্নগুলো জট পাকিয়ে গেল শমির মনে।

॥ ৭ ॥

সকালে ঘুম থেকে উঠে বিক্রমদার হাতে লেখা চিরকুটটা পেল শমি। লেখা আছে: একটা দরকারে স্টেশনে গেলাম। ফিরতে দেরি হতে পারে। হোটেলে থাকিস। ফিরে সমুদ্রে চান করতে যাব।

বারান্দায় বসে একা একাই ব্রেকফাস্ট সারল শমি। বিক্রমদা হঠাৎ স্টেশনে গেলেন কেন? কেউ আসবে? কারও আসার কথা আছে? আগে জানলে বিক্রমদা নিশ্চয়ই বলতেন। হয়তো রাতে ও ঘুমিয়ে পড়ার পর কোনও ফোন এসেছিল। জানতে কৌতূহল হচ্ছে। ব্রেকফাস্ট সেরে একতলার রিসেপশনে নামল শমি। ম্যানেজার প্রকাশ সেন তালতলার ছেলে। খুব আড্ডাবাজ। শমিকে দেখে একগাল হাসলেন, 'কি, দাদা তো নেই, একা একা বোর হচ্ছ?'

শমি মাথা নাড়ল। হেসে বলল, 'নাঃ, সমুদ্রে খুব একটা একা লাগে না।'

'এটা ঠিক বলেছ। এজন্যই তো পাহাড় ছেড়ে পালিয়ে এলাম। সবসময় কুয়াশা, বৃষ্টি...কেমন একটা মন খারাপ করা ব্যাপার। এখানে এসব বালাই নেই। সারাক্ষণ সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। মন খারাপ হতে দেয় না।'

ভদ্রতা করে শমি জিজ্ঞেস করল, 'এর

আগে কোন কোন পাহাড়ে ছিলেন আপনি?'

'কোথায় ছিলাম না বলো! ওদিকে তোমার সিমলা, কৌশানি, এদিকে দার্জিলিং, গ্যাংটক...সব জায়গাতেই এক-দেড় বছর করে কাটানো হয়ে গেছে। এর মধ্যে ডিপ্রেশিং মনে হয়েছে গ্যাংটককে। ভারি রহস্যময় জায়গা কিন্তু।'

'সমুদ্রে এই প্রথম বোধহয়?'

'না, না।' দুদিকে মাথা নাড়লেন প্রকাশ সেন, 'কোভালমে মাস ছয়েক ছিলাম। মাইনেপত্রে পোষাল না, ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। তারপর ধরো গিয়ে এখানকার মতো বিচও নেই। ইন ফ্যাক্ট, গ্লোবট্রটারদেরও বলতে শুনেছি পুরীর মতো সি বিচ নাকি কোথাও নেই।'

উসখুস করল শমি। কেউ ফোন করেছিল বিক্রমদাকে? জানা দরকার। নিশ্চয়ই কারও ফোন পেয়েই বিক্রমদা স্টেশনে গেছেন। কার আসার কথা আছে? না জানা পর্যন্ত ঠিক স্বস্তি হচ্ছে না। কাউকে ফলো করে যাননি তো বিক্রমদা? ভাবতেই ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বোধ করল শমি। আচমকা গতরাতে দেখা সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ে গেল। এখানে অবশ্য এরকম অনেক সন্ন্যাসীই ঘুরে বেড়ান। প্রচুর মঠ আছে। আশ্রম আছে। সেখানে প্রচুর সন্ন্যাসীও থাকেন। শমি নিজেকে বোঝাল হয়তো সেই সন্ন্যাসী রাতের অন্ধকারে একা একা এমনিই ঘুরে বেড়ান। হয়তো তাঁর ঘুম আসে না। কিন্তু সেই সন্ন্যাসীকে দেখে বিক্রমদা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন কেন? ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই কেসের কোনও যোগাযোগ নেই তো?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই শমি চমকে উঠল। সেই সন্ন্যাসীই যাচ্ছেন না? হ্যাঁ, অবিকল একই ভঙ্গির হাঁটা। গতরাতে যেমন দেখেছিল! ঋজু, মেরুদণ্ড টানটান করে হেঁটে চলেছেন। হাঁটতে হাঁটতে বারবার হোটেলের দিকেই ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছেন।

চট করে একপাশে সরে গেল শমি। এই সুযোগ ছাড়া যায় না। সন্ন্যাসী কোথায় থাকেন তা দেখা দরকার।

প্রকাশ সেনকে শমি বলল, 'সি বিচ থেকে একটু ঘুরে আসছি।'

'দাদা এলে কি সি বিচেই যেতে বলব?'

শমি তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, কিছু বলার দরকার নেই। আমি এখনই আসছি ঘুরে।'

শমি প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এল। মেরিন ড্রাইভ ধরে সোজা হেঁটে যাচ্ছেন সন্ন্যাসী। রাস্তায় এমনিতে খুব একটা ভিড় নেই। দু'একজন ট্যুরিস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে। পেছন পেছন গেলে ধরে ফেলতে পারেন। তার চেয়ে সি বিচের ভিড়ে মিশে গিয়ে দূর থেকে ফলো করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সি বিচে পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল শমি। কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? বিক্রমদা হোটেলে থাকতে বলেছেন। কিন্তু এরকম সুযোগও তো হাতছাড়া করা ঠিক নয়। বরং বিক্রমদাই শুনলে পরে বলবেন, 'তোর মাথায় ব্যাপারটা ক্লিক করল না একবারও?' তাছাড়া শমির কৌতূহলও কম হচ্ছে না। সন্ন্যাসীর হাবভাব সত্যিই ভারি রহস্যময়!

মনস্থির করে হাঁটতে শুরু করল শমি। রাস্তার দিকে চোখ রাখতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই দু'একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে। রাস্তা দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটছেন সন্ন্যাসী। তাঁর কোনও তাড়া নেই, বোঝাই যায়। অলস ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক দেখছেন। স্বর্গদ্বার ছাড়িয়ে সন্ন্যাসী চলেছেন শ্মশানের দিকে। এদিকটা অনেক নির্জন। স্বর্গদ্বারের মতো অত হোটেলের ভিড় নেই। দু'একটা হলিডে হোম আছে। টুকটাক এদিক-সেদিকে লোকের বাড়ি। মাঝেমধ্যে ঝাউবন।

ডানদিকের একটা ভাঙাচোরা গলিতে ঢুকে পড়লেন সন্ন্যাসী। এবার সি বিচ থেকে রাস্তায় উঠতেই হয় শমিকে।

একটা পুরনো বাড়ি বা হোটেল ভাঙা হচ্ছে। সরু গলিটার একপাশে যতরাজ্যের রাবিশ ফেলা হয়েছে। সামান্য দূর থেকে হেঁটে চলল শমি। সরু গলিটা গিয়ে পড়েছে একটা বাঁধানো ইঁটের রাস্তায়। পাশের একটা পাঁচিল ভাঙা। শমিকে অবাক করে দিয়ে সন্ন্যাসী সেই ভাঙা পাঁচিলের গর্তর মধ্যে দিয়ে গলে গেলেন। পাঁচিলের ভেতর হালকা হলুদ রঙের পুরনো ধাঁচের একটি একতলা বাড়ি। বারান্দায় বেশ কয়েকটা গেরুয়া রঙে ছোপানো কাপড় টাঙানো রয়েছে। এটাই তাহলে সন্ন্যাসীর থাকার জায়গা? পাঁচিলের ভাঙা অংশ পেরিয়ে শমি রাস্তা ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। কী করবে ঠিক করতে পারল না কয়েক মুহূর্তের জন্য। পাঁচিলের গর্ত দিয়ে মঠের ভেতর ঢুকবে? কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই ভাল দেখাবে না। কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, কী বলবে? শমি ঠিক করল হোটেলেই ফিরে যাবে। বিক্রমদা নিশ্চয়ই এতক্ষণে হোটেলে ফিরে এসেছেন। সন্ন্যাসী কোথায় থাকেন তা তো দেখা হয়েই গেল।

ফেরার রাস্তা ধরবে বলে শমি যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখনই দেখল সন্ন্যাসী আবার বেরিয়ে আসছেন পাঁচিলের গর্ত দিয়ে। সঙ্গে রয়েছেন আর একজন। বেশ ষণ্ডাগুণ্ডা, কালো মিশমিশে গায়ের রঙ। সাদা ধুতি, উড়নির মতো করে গায়ে ফেলা।

এবার সন্ন্যাসী ধরলেন সি বিচের রাস্তা। শমির সুবিধেই হলো। যদিও সন্ন্যাসীরা সমুদ্রতীরে নামলেন না। মেরিন ড্রাইভ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন আরও ডানদিকে। ওদিকে বেশ ঘন ঝাউবন। জায়গাটা ফাঁকা। ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে একটা দুধসাদা দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। দেখেই বোঝা যায়, কোনও হোটেল বা হলিডে হোম নয়। ছুটিছাটায় থাকার জন্য অবস্থাপন্ন বাঙালিরা আগে পুরীতে বাড়ি বানাতেন। এসে থাকতেন। সেরকমই কোনও বাড়ি হবে। ঝাউবন ডিঙিয়ে বালির ওপর দিয়ে সেই বাড়ির দিকেই এগোচ্ছেন সন্ন্যাসী আর তাঁর সঙ্গী। সাদা বাড়িটার সব দরজা-জানলা বন্ধ। কেমন চুপচাপ, রহস্যময়। দেখে মনে হচ্ছে না কেউ ওই বাড়িতে থাকে। শমির হঠাৎ মনে হলো, বিতান রায়ের কথা।

শমি এগোতে যাবে, ঠিক এমন সময়ে কাঁধে একটা ভারী হাত এসে পড়ল। চমকে গিয়ে ফিরে তাকাতে আরও চমকে গেল শমি। বিক্রমদা! দাঁড়িয়ে হাসছেন।

'কী রে চমকে গেছিস?'

'তুমি, এখানে?' শমির চমকের ঘোর তখনও কাটেনি।

বিক্রমদা হাসলেন, 'তুই যেভাবে এসেছিস, আমিও ঠিক সেভাবেই এখানে পৌঁছেছি।'

'তার মানে, ওই সন্ন্যাসীর পিছু নিয়ে?'

'উঁহু।' বিক্রমদা বললেন, 'ওই বাড়িতে কারা আছে, জানিস?'

শমির বুক উত্তেজনায় ধকধক করে উঠল, 'কারা? সেই গুণ্ডারা, যারা বিতান রায়কে আটকে রেখেছে?'

'না, না।' হো হো করে হেসে উঠে বিক্রমদা শমির উত্তেজনায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। বললেন, 'তোর মাথায় শুধু গুণ্ডা-বদমাশ ঘুরছে দেখছি। কোনও গুণ্ডা নয়, বিতান রায়ের বাবা আর মা এসে উঠেছেন ওই বাড়িতে। বিতানের বাবা বিখ্যাত শিল্পী—রামানুজ রায়। নাম শুনেছিস? মা বিনতি রায় ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা।'

'কিডন্যাপড বিতান রায়ের বাবা-মা?' আকাশ থেকে পড়ল শমি। সত্যিই ও এত অবাক হয়েছে যে বলার নয়। এই সম্ভাবনাটা ওর মাথায় একবারের জন্যও আসেনি।

বিক্রমদা বললেন, 'চল, হোটেলের দিকে ফেরা যাক। যেতে যেতে বলছি।' বালির ওপর হাঁটতে হাঁটতে বিক্রমদা বললেন, 'গতকাল রাতে তুই ঘুমিয়ে পড়ার পর রাকেশের ফোন এসেছিল কলকাতা থেকে। বিতান রায়ের বাবা, মা যে পুরীতে আসার জন্য জগন্নাথ এক্সপ্রেসে চড়েছেন তা রাকেশই জানায়। ওঁদের ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম একটাই কারণে, কিডন্যাপাররা কোনওভাবে ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিনা সেটা দেখার ছিল।'

'কিডন্যাপাররা যোগাযোগ করেছিল? সেজন্যই কি ওঁরা এখানে এসেছেন?'

'সেটা জানতে হবে। হঠাৎ কেন এখানে এলেন বিতান রায়ের বাবা, মা? কেউ তাঁদের খবর দিয়েছে, না কি অন্য কোনও ব্যাপার?' বিক্রমদাকে চিন্তিত দেখাল। নিজের মনেই বললেন, 'কেসটা অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে।'

'ওই সন্ন্যাসী...'

শমির কথা শেষ হলো না, বিক্রমদা বললেন, 'বিতান রায়ের বাবা, মা সম্ভবত কোনও ধর্মীয় মঠ বা আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। স্টেশনেও ওঁদের রিসিভ করতে মঠ থেকে লোক গিয়েছিল। এমনও হতে পারে, ছেলের মঙ্গল কামনায় ওঁরা এখানে পুজো দিতে এসেছেন। কারণটা খুঁজে বের করতে হবে। গোটা ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে, বুঝলি...।'

॥ ৮ ॥

'নো নিউজ ফ্রম দ্য কিডন্যাপারস।' ঘরে ঢুকতেই ঘোষণার ভঙ্গিতে বলে উঠলেন জে কে ভার্মা। শমি লক্ষ্য করল এই কদিনেই ভদ্রলোকের বয়স যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। চোখের তলায় কালি। গাল বসে গেছে। লম্বা, চওড়া চেহারার কাঠামো কেমন যেন শুকিয়ে গেছে।

বিক্রমদা বললেন, 'বিতানকে ওরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সেটা জানার থেকেও বেশি জরুরি হলো, বিতান এখনও বেঁচে আছে কিনা সে কথাটা জানা। কিডন্যাপাররা চুপ করে থাকলে সেটাই তো জানা যাবে না।'

জে কে ভার্মাকে উদ্বিগ্ন দেখাল। বললেন, 'ছেলেটার কিছু হলে আমি নিজেকে দায়ী মনে করব। আফটার অল, আমিই ওকে প্রথম খবরটা দিয়েছিলাম।'

'উঁহু, আপনি নন, আপনি ফোন করার আগেই বিতান খবরটা পেয়েছিল। এবং ওর বাবা-মাকে কলকাতায় ফোন করে সেকথা জানিয়েছিল।'

জে কে ভার্মার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল, 'দ্যাট ইজ নিউজ টু মি! আমি জানতাম না।' মুখ নামিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন ভার্মা। তারপর বললেন, 'আপনারা কি লাঞ্চ সেরেই বেরিয়েছেন? নইলে আমার সঙ্গে...।'

বিক্রমদা মাথা ঝাঁকালেন, 'আমরা লাঞ্চ সেরেই বেরিয়েছি।'

ভার্মা বললেন, 'তাহলে যদি কিছু মনে না করেন, আমি কোয়ার্টার থেকে লাঞ্চটা সেরে আসতে পারি।'

বিক্রমদা বললেন, 'ও সিওর! আপনি লাঞ্চ সেরে আসার ফাঁকে আমরা বরং বিতান রায়ের রিপ্লেসমেন্ট অশোক মেহরার সঙ্গে একটু কথা বলি।'

ভার্মা বললেন, 'ও কে। আমি মেহরাকে ফোনে বলে দিচ্ছি। ওকে আপনি লঞ্চিং সাইটে পেয়ে যাবেন। দেখবেন স্টকি চেহারা। গোঁফ-দাড়ি কামানো।'

বিক্রমদা উঠলেন, 'থ্যাঙ্ক য়ু লেফটেন্যান্ট ভার্মা।'

'নো মেনশন। লাঞ্চের পর তাহলে দেখা হচ্ছে। আপনারা কিছুক্ষণ আছেন তো? ইনভেস্টিগেশনের প্রোগ্রেস সম্পর্কে তখনই না হয় এসে শুনব। আপনি নিশ্চয়ই কিছুটা এগিয়েছেন।'

ভার্মা দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। চটপটে মানুষ। খুবই ক্ষিপ্র। চিতাবাঘের মতো চলাফেরা।

বিক্রমদা আর শমি হাঁটতে হাঁটতে এল লঞ্চিং সাইটে। বিতান রায়ের বদলে এখন তৈরি করা হচ্ছে কম্যান্ডার অশোক মেহরাকে। সঙ্গে ক্যাপ্টেন চোপড়াও রয়েছেন। বিক্রমদাকে দেখে চোপড়া এগিয়ে এলেন, 'হ্যালো ক্যাপ্টেন মুখার্জি, এনি প্রোগ্রেস? বিতানের কোনও খোঁজ পেলেন?'

'নাঃ।'

'কোনও সূত্র?'

'নাঃ।'

'বিতানকে কি পাওয়া যাবে না ক্যাপ্টেন মুখার্জি?' হতাশা চোপড়ার গলায়।

'জানি না।' বিক্রমদার গলা আচমকা কঠোর শোনাল। বললেন, 'আপনি যদি কিছু জেনে থাকেন তাহলে কিন্তু কাইন্ডলি লুকোবেন না। বিতানের কলকাতার বাড়িতে আপনি এর মধ্যে দুবার ফোন করেছেন—ঠিক কিনা?'

চোপড়ার মুখ শুকিয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললেন, 'ইয়েস, করেছিলাম বটে।'

'কিন্তু আমাকে তো বলেননি। এই সব ছোটখাটো তথ্যগুলো খুবই কাজে আসে কম্যান্ডার চোপড়া।'

'না, মানে...' যেন ঠিক কথা খুঁজে পাচ্ছেন না চোপড়া। বললেন, 'তেমন

কোনও ব্যাপার নয়। নেহাতই ওর বাবা-মাকে সহানুভূতি জানানোর জন্য। ...আফটার অল, বিতান ওঁদের একমাত্র ছেলে। আর আমার সঙ্গেও পুরনো পরিচয়। ওঁরা খুব ভেঙে পড়েছিলেন। তাই পাশে দাঁড়ানো...।'

'আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট।' বিক্রমদা বললেন, 'কিন্তু আমাকে বলতেই পারতেন। বিতানের বাবা-মা যে পুরীতে আসছেন, সেকথা তাহলে আর আমাকে কষ্ট করে জানতে হতো না। কি, তাই না?'

চোপড়া একেবারেই চুপ। বিক্রমদা হাসলেন, 'আপনি বোধহয় আমার ওপর ঠিক ভরসা করতে পারছেন না—।'

চোপড়া মাথা নামালেন। সম্ভবত লজ্জা পেলেন। মৃদু গলায় বললেন, 'প্লীজ আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

অশোক মেহরা মধ্যবয়স্ক। কম কথা বলেন। বিতান রায় কিডন্যাপড হওয়ার ফলে তিনি সুযোগ পেয়েছেন। এই ব্যাপারটা তিনি ঠিক মেনে নিতে পারছেন না। বারবার একটা কথাই বললেন, 'শুধু দেশের স্বার্থ জড়িত আছে বলেই নয়, বিতানকে কিডন্যাপ করা হয়েছে বলেও এটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।' জোর দিয়ে বললেন, 'আই মাস্ট সাকসিড। কাজটা কঠিন কিন্তু বিতানের জন্যই আমাকে পারতে হবে। তবে সবচেয়ে ভাল হয়',...অশোক মেহরা তাকালেন বিক্রমদার দিকে, 'আপনি যদি এরমধ্যে বিতানকে খুঁজে বের করতে পারেন। হি ইজ দ্য রাইট পার্সন। অভিযাত্রীকে ধ্বংস করার কাজটা ওই সবচেয়ে ভাল পারত।'

অশোক মেহরার সঙ্গে কথা বলে বিক্রমদা যে ইমপ্রেসড, তা বোঝা গেল একটা কথাতেই, যখন বললেন, 'মেহরা সত্যিকারের লড়াকু যোদ্ধা। বুঝলি শমি, এসব লোকের সঙ্গে কথা বললেই এদের মনের ভেতরটা দেখা যায়। বিতান রায়ের ফিরে আসাটা ও আন্তরিকভাবেই চায়।'

লঞ্চিং সাইটের একদিকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ঘন জঙ্গল। বিক্রমদার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন অশোক মেহরা। শমির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই হঠাৎ মেহরাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন বিক্রমদা। সামনের জঙ্গল থেকে একটা আলোর ঝলক আর তার সঙ্গেই কানফাটানো গুলির আওয়াজ শোনা গেল। দেখা আর শোনার মধ্যে যেটুকু ফাঁক, তারমধ্যেই বিক্রমদা মাটিতে পড়ে গেছেন শমিকে সঙ্গে নিয়ে।

শুয়ে শুয়েই শমি শুনল মাটিতে পড়ে থাকা মেহরার অবাক গলা, 'হোয়াটস হ্যাপেনড!' দেখল বিদ্যুৎগতিতে বিক্রমদা উঠে পড়েই ছুটেছেন জঙ্গলের দিকে। জঙ্গল থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে কোনাকুনি ছুটে অফিসঘরের পেছনে ঢুকে পড়ল। তার আগেই শমি একঝলক দেখতে পেল। চাপদাড়ি আর কালো চশমা।

কিছুক্ষণ পর হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এলেন বিক্রমদা।

'পাওয়া গেল না?'

'নাঃ। অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এতক্ষণে হয়তো ছদ্মবেশ ছেড়েও ফেলেছে টয়লেটে ঢুকে!'

'এখানকারই লোক!' শমির অবাক গলা শুনে বিক্রমদা জবাব দিলেন, 'কেন, তোর সন্দেহ আছে নাকি এ ব্যাপারে?' বিক্রমদা ঘুরলেন অশোক মেহরার দিকে। বললেন, 'আপনার কাজটা কত কঠিন বুঝতে পারছেন তো? এই অভিযান বাতিল করার জন্য অপরাধীরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিতান রায়ের পরিবর্তে যাকেই আনা হোক না কেন, ওরা তাকে মারার চেষ্টা করবেই। খুবই সাবধানে থাকতে হবে আপনাকে। একা কোথাও যাবেন না। আমি ভার্মাকে বলে দিচ্ছি, যাতে সবসময়ের জন্য আপনাকে একজন গার্ড দেয়।'

অশোক মেহরার চোয়াল শক্ত। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'একদিন তো মরতেই হবে ক্যাপ্টেন মুখার্জি। কাপুরুষের মতো মরতে আমি চাই না। শুধু আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট—দেশের শত্রুরা যখন আমাদের মধ্যেই আছে তখন তাদের দ্রুত খুঁজে বের করুন। ওরা যেন কঠোর শাস্তি পায়।'

বিক্রমদা হাসলেন, 'জানতাম আপনি ভয় পাবেন না। এই ফাইটিং স্পিরিটটা যদি সবার থাকত! যাকগে...' শমির দিকে ঘুরলেন বিক্রমদা, 'ক্যাপ্টেন চোপড়া কোনদিকে গেল বল তো?'

শমি মাথা নাড়ল, 'ঠিক খেয়াল করিনি।' সত্যি কথা বলতে কী, খেয়াল করার মতো অবস্থায় ও ছিল না। এত তাড়াতাড়ি সবকিছু ঘটে গেল যে বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিক্রমদা বললেন, 'জঙ্গলের দিকেই যেতে দেখেছিলাম। একবার দেখা যাক।'

বুকের মধ্যে চেনা ধকধক আওয়াজটা টের পাচ্ছে শমি। প্রচণ্ড উত্তেজনা হলেই বুকটা এমন ওঠানামা করে। জঙ্গলের মধ্যে কী অপেক্ষা করে আছে কে জানে! হঠাৎ চোপড়ারই বা খোঁজ করছেন কেন বিক্রমদা?

এদিকটা এমনিতেই শুনশান। গুলির আওয়াজ কেউ শুনতেই পায়নি! জঙ্গলের মধ্যে সেই নিস্তব্ধতা আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। একটা পাখিও ডাকছে না! পায়ে চলা পথে শুধু শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ।

বেশিদূর যেতে হলো না। কয়েক পা এগোতেই একটা অর্জুন গাছের তলায় পাওয়া গেল কম্যান্ডার চোপড়াকে। উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। মাথার পেছনে জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

'ডেড?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন অশোক মেহরা।

উবু হয়ে বসে নাড়ি দেখলেন বিক্রমদা। মুখ তুলে বললেন, 'বেঁচে আছে। মাথার পেছনে আচমকা আঘাত করায় জ্ঞান হারিয়েছে।'

বুকে ক্রস আঁকলেন মেহরা। উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'ওরা যতই বাধা দিক—উই উইল সাকসিড। আপনি মিলিয়ে নেবেন ক্যাপ্টেন মুখার্জি, মঙ্গল অভিযানে আমরা একদিন ঠিকই সফল হব।'

॥ ৯ ॥

মেডিকেল ইউনিটে চিকিৎসার পর জ্ঞান ফিরে পেতে দেরি হয়নি কমান্ডার চোপড়ার। ডাক্তাররা অবশ্য তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন ওষুধ দিয়ে। বিক্রমদা

বিদ্যুৎগতিতে ছুটছেন জঙ্গলের দিকে।

বললেন, 'আমার তাড়া নেই। পরেই কথা বলব। আগে সুস্থ হোন।' তার আগে জে কে ভার্মাকে গোটা ঘটনাটা জানিয়েছেন বিক্রমদা। অশোক মেহরার জন্য স্পেশাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে বিক্রমদা আর শমি যখন দেলাং ছেড়ে বেরোল, তখন বিকেলের আলো প্রায় মরে এসেছে। জঙ্গলের ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি দল বেঁধে ঘরে ফিরছে।

গাড়ির পেছনের সিটে গা এলিয়ে দিয়েছেন বিক্রমদা। সেভাবে বসেই বললেন, 'চোখ-কান এবার থেকে খুলে রাখতে হবে, বুঝলি শমি। নাটকের শেষ অঙ্কে আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। গুলিগোলা চলতেই মাথাটা একেবারে সাফ হয়ে গেল। এবার ছবিটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে।'

'বিতান রায়?'

শমির প্রশ্নে বিক্রমদাকে একটু চিন্তিত দেখাল। বললেন, 'অঙ্ক যদি ঠিকঠাক মিলে গিয়ে থাকে তাহলে বিতানের বিপদ এখনও কাটেনি। আর তার জন্য ও নিজেই কিছুটা দায়ী।'

জটিল কেসের জট ছাড়াতে ছাড়াতে শেষদিকে পৌঁছলে বিক্রমদার হেঁয়ালি করার ইচ্ছেটা বোধহয় বেড়ে যায়! শমি জানে বলেই আর খোঁচাল না। আসলে বিক্রমদা চান, শমিও সমানভাবে মাথা ঘামাক। শমি মাথা ঘামানোর চেষ্টা করে ঠিকই, কিন্তু এই কেসটা ওর কাছে পুরোটাই যেন কুয়াশায় ঢাকা!

এটা বোঝা যাচ্ছে, এখানকারই কেউ প্রথম থেকে কলকাঠি নাড়ছে। মহাশূন্যে অভিযাত্রী খারাপ হওয়া থেকে শুরু করে বিতানের কিডন্যাপ পর্যন্ত সেই লোকটারই হাত আছে। কিন্তু বিতান রায়ের বাবা-মা কেন পুরীতে এসেছেন? কমান্ডার চোপড়ার ফোন পেয়েই কি ওঁরা এখানে এসেছেন? চোপড়া কি কিছু জেনেও লুকিয়ে যাচ্ছেন! চোপড়াকে কে মাথায় মারল? নাকি পুরোটাই অভিনয়? একই সময় লাঞ্চ সারতে যাচ্ছি বলে বেরিয়েছিলেন ভার্মাও!

একটু আগেই বিক্রমদা বলেছেন, 'কেউই সন্দেহের বাইরে নয়!'

পুরীতে ঢুকতে ঢুকতে সেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। স্বর্গদ্বারের আগে হোটেল বেলাভূমিতে আর গাড়ি থামালেন না বিক্রমদা। গাড়ি চলল সোজা শ্মশান পেরিয়ে। ওদিকেই একটা সাদা নির্জন বাড়িতে উঠেছেন বিতান রায়ের বাবা-মা। সোজা ওখানেই কি যাচ্ছেন বিক্রমদা? ওঁদের সঙ্গে কথা বলবেন? ওঁরা কি কিছু জানেন? এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে একেবারেই অন্ধকারে শমি।

এদিকটায় রাস্তায় আলো নেই। অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। ঝাউবনে

এলোমেলো হাওয়ায় একটানা শিরশির আওয়াজ হয়েই চলেছে। একটার পর একটা ঢেউ ভাঙছে। তার একটানা শব্দ। সাদা ফেনা মাথায় নিয়ে একটার পর একটা ঢেউ ভাঙার শব্দ যেন কখনও পুরনো হয় না! গাড়ির ড্রাইভারকে বিক্রমদা বললেন, 'আপনি হোটেলে ফিরে যান। আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে।'

বাড়িটার দোতলায় একমাত্র সরু আলোর রেখা। এমন নির্জন অন্ধকারে মানুষ থাকে কী করে? তবু ভাল, সমুদ্রের একটানা আওয়াজটা আছে। নইলে আরও একা লাগার কথা! গাড়িটা চলে গেলে ঝাউবনের মধ্যে একপাশে অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে রইল শমিরা।

ঠিক কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল নেই শমির। আধঘন্টা? একঘন্টা? ধৈর্যের পরীক্ষা হলে ও যে বিক্রমদার কাছে ডাহা ফেল করত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিক্রমদা দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্তির মতো! এদিকে না নড়েচড়ে থাকতেই পারছে না শমি। কারণ মশা! ঝাঁকে ঝাঁকে না এলেও মাঝেমধ্যেই একটা-দুটো করে আসছে, পুটুস করে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। ঠিক বাড়িটার সামনে এসে আলো নিভি দিল। কুচকুচে কালো রঙের সুমো গাড়ি। রুদ্ধশ্বাস এই অপেক্ষা। বুকের ভেতরটা এত জোরে ধকধক করছে যে শমির মনে হচ্ছে পাশে দাঁড়ানো বিক্রমদা বোধহয় শুনতে পাবেন! শুধু একটাই ভরসা পাশে বিক্রমদা আছেন। বিক্রমদা থাকলে কাউকেই ভয় পায় না শমি। কারা আছে ওই গাড়িতে? শমির মনে হলো, বিক্রমদা একা না এলেও পারতেন। দরকার হলে পুলিশ বা সেনাবাহিনীর সাহায্য তো পাওয়া যেতেই পারত। আজ দুপুরেই একচোট হামলা হয়েছে। সেকথা ভাবতেই শমির বুকে ধকধক আওয়াজটা আরও বেড়ে গেল।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে গাড়িটা চলে গেল। আবার অপেক্ষার পালা! মশার কামড়ের কথা কয়েক সেকেন্ডের জন্য যেন ভুলেই গিয়েছিল শমি। মশার কামড় আবার ফিরে এল। কেন এল গাড়িটা, কেন চলে গেল, কিছুই বুঝতে পারছে না শমি। বিক্রমদাকে যে কিছু জিজ্ঞেস করবে, তারও উপায় নেই!

আচমকা একটা সরু টর্চের আলো এসে পড়ল শমির গায়ে। অবশ্য সরে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। চমকে উঠেছিল শমি। কোত্থেকে এল আলোটা?

দাঁতে দাঁত চেপে বিক্রমদা বললেন, 'গাছের আড়ালে সরে থাক। কেউ যেন বুঝতে না পারে।'

টর্চের আলোটা জ্বলছে-নিভছে। এঁকেবেঁকে উঠে আসছে সি বিচ থেকে রাস্তার দিকে। মাঝেমধ্যে বাড়ির দিকেও আলোটা ছুটে আসছে। কিন্তু থাকছে না। সরে যাচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দ তুলে একটা বড় ঢেউ ভাঙল। জলোচ্ছ্বাসের মতো সাদা ফেনা উঠল অনেকটা ওপরে। এগিয়ে আসছেন দুজন। রাস্তার ওপর উঠে দাঁড়ালেন দুজনেই। একটা স্কুটার গেল। হেডলাইটের আলোতে বোঝা গেল টর্চ জ্বালিয়ে যিনি আসছেন তিনি পরে আছেন পাজামা-পাঞ্জাবি। তাঁর ঠিক পেছনেই রয়েছেন একজন মহিলা।

'বিতানের বাবা-মা।'

ফিসফিস করে বলা বিক্রমদার কথা এলোমেলো হাওয়ায় হারিয়ে যেতে না যেতেই ওঁরা দুজন ঢুকে পড়লেন বাড়ির সামনের ঝাউবনে। এগিয়ে আসতে লাগলেন বাড়ির দিকে।

দুজন যখন বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন, ঠিক তখনই নিঃশব্দে রাস্তায় ফিরে এল গাড়িটা। কালো রঙের টাটা-সুমো অন্ধকারে মিশে আছে। হেডলাইট নেভানো। নিঃশব্দে, যেন হাওয়ায় ভেসে এসেছে! নিঃশব্দেই দরজা খুলল। লাফিয়ে নামল চারজন। ছুটে গেল বিতান রায়ের বাবা-মার দিকে।

'তুই এখানেই দাঁড়া।' শোনার সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষের মধ্যে শমি দেখল ওর পাশে আর বিক্রমদা নেই!

চারটে গুণ্ডা আর বিতানের বাবা-মার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন বিক্রমদা। গুণ্ডাগুলোকে থামিয়ে দিয়েছে বিক্রমদার হাতের অটোমেটিক।

সুমোটা স্টার্ট নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। পারল না। তার আগেই অনেক আলো জ্বলে উঠেছে। অনেকগুলো ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে এল।

মুহূর্তে পুলিশ আর মিলিটারিতে চারদিক ছয়লাপ হয়ে গেছে।

পুলিশের ইউনিফর্ম পরা, একজন দীর্ঘকায় মানুষ এগিয়ে এলেন, 'ওয়েল ডান, ক্যাপ্টেন মুখার্জি। আপনি ঠিকই গেস করেছিলেন।'

হাত মেলালেন বিক্রমদা, 'থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ পট্টনায়েক। সেই বিকেল থেকে আপনারা কষ্ট করে নজর রেখেছেন বলেই তো অবশেষে এদের ধরা গেল।'

'না, না, কষ্টের কী আছে, এ তো আমাদের কাজ।' বলতে বলতে এস পি পট্টনায়েক এগিয়ে গেলেন, 'এই নিন, আপনার মেইন কালপ্রিট।'...

দুজন মিলিটারি কম্যান্ডো দুদিক থেকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। কালো চাপদাড়ি আর কালো চশমা পরা লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন বিক্রমদা।

'রাতে কালো চশমাটা একেবারে মানাচ্ছে না লেফটেন্যান্ট ভার্মা!'

চশমাটা খুলে নিয়ে চাপদাড়ি ধরে টান দিতেই জে কে ভার্মার আসল চেহারা বেরিয়ে এল। চোখে খুনে দৃষ্টি।

বিক্রমদা বললেন, 'এবার আর একটা কাজই বাকি।' ঘুরলেন বিতান রায়ের বাবা-মার দিকে। হেসে বললেন, 'আপনাদের ছেলের জন্য আর দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। আসল অপরাধী ধরা পড়ে গেছে। আপনার ছেলে কোন মঠে সন্ন্যাসী সেজে লুকিয়ে রয়েছে, সেটা পুলিশকে বলে দিন।' থামলেন বিক্রমদা, দম নিয়ে বললেন, 'হাতে খুব বেশি সময় নেই। গোটা দেশের মান-সম্মান বাঁচানোর ভার এখন বিতানের ওপর।'

॥ ১০ ॥

'খটকা নাম্বার ওয়ান: বিতানের বাবা-মা, প্রখ্যাত শিল্পী রামানুজ রায় এবং ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা বিনতি রায় পুরী থেকে ফেরার টিকিট কেটেছিলেন তিনটি! কেন?'

বিক্রমদা থামলেন। সবার মুখের দিকে একবার তাকালেন। বললেন, 'এই প্রশ্নটা থেকেই আমার তদন্তের মোড় ঘুরে যায়।

এটা জানানোর কৃতিত্ব অবশ্যই আমার বন্ধু, লালবাজারের ডি সি ডি ডি টু রাকেশ চৌধুরীর। কলকাতায় বসে ও আসল কাজগুলো করেছে। নইলে আমি এগোতে পারতাম না। রামানুজ আর বিনতি রায় যে পুরীতে আসছেন সে খবরও আমি পাই ওর কাছ থেকে। আর ফেরার টিকিট তিনটে কাটা হয়েছে শুনেই বুঝতে পারি এই কেসে ওঁদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ হবে না।'

একটু আগেই জে কে ভার্মা আর গুণ্ডাদের নিয়ে চলে গেছে পুলিশ। ভার্মার বিচার করবে সামরিক বাহিনী। যে বাড়ির সামনে এতক্ষণ এত কাণ্ড ঘটল, সেই বাড়িরই দোতলার বারান্দায় বসে কফি খেতে খেতে জট ছাড়াচ্ছেন বিক্রমদা। বিক্রমদার পাশেই বসে আছে অ্যাস্ট্রোনট বিতান রায়। সন্ন্যাসীর গেরুয়া পোশাক আর নেই। পরে ফেলেছে পাজামা-পাঞ্জাবি। হাতে কফির কাপ। রয়েছেন বিতানের বাবা-মা।

বিক্রমদা বলে চললেন, 'বিতানকে কিডন্যাপ করার ব্যাপারে প্রথমে সন্দেহের তালিকায় ওপর দিকেই ছিল কমান্ডার চোপড়া। কারণ প্রথম থেকেই কিছু তথ্য লুকিয়ে যাবার একটা প্রবণতা আমি লক্ষ্য করেছিলাম ওঁর মধ্যে। পরে সবার সঙ্গে কথা বলার পর এই সম্ভাবনাটা আমি বাতিল করি। বুঝতে পারি, আরও ওপরমহলে এই ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে আছে। উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যে আর কারা জড়িত, সেটা জানা যাবে ভার্মাকে জেরা করলেই। ওটা সামরিক বাহিনীর কাজ। ওঁরা ভালই পারবেন। প্রশ্ন হচ্ছে, ভার্মা যে জড়িত তা কী করে বুঝলাম ? সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বরং বিতানের গল্প শোনা যাক।'

শমির কাঁধে হাত রেখে রেলিংয়ের ওপর পা তুলে বিতান বলল,তেমন কিছুই নেই! ওরা আমাকে ধরে নিয়ে এসে পুরীর কাছেই সাক্ষীগোপালে একটা বাড়িতে আটকে রেখেছিল। সত্যি কথা বলতে কী, আমার মজাই লাগছিল। এমন থ্রিল জীবনে কখনও পাইনি। আমি ওদের একটু স্টাডি করেই বুঝে গিয়েছিলাম যে একটারও মাথায় বিশেষ বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। ওপর থেকে নির্দেশ এলে খুন-খারাপি করতে পারে বড়জোর। আমি ওদের বুঝিয়েছিলাম, আমার বাবা বিরাট শিল্পপতি, কোটি কোটি টাকার মালিক। আমাকে ধরেছো শুনলেই টাকার থলি নিয়ে ছুটে আসবে। শুনে ওদের লোভ বেড়ে যায়। আমার বাবার কাছে ওরাই খবর পৌঁছে দেয় টাকা পাওয়ার লোভে। আমার সম্পর্কেও ভুল ধারণা জন্মায়। ভাবে আমি বড়লোকের আদুরে ছেলে। এভাবেই ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আমি শেষরাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যাই। পালিয়ে পুরীতে এসে বাড়িতে ফোন করি। বাবা-মার সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারি, সন্ন্যাসীর বেশ ধরে মাথা ন্যাড়া করে, গোঁফ কামিয়ে ফেললে কেউ চিনতে পারবে না। এখানকার এক মঠে আমার মামা থাকেন। সেখানে উঠি। ঠিক করেছিলাম, পরিস্থিতি ঠাণ্ডা না হলে আত্মপ্রকাশ করব না। এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে।'

বিতান থামল। বিক্রমদার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'একদিন রাতে পুরীর সি বিচে বিক্রমদা আর শমিকে দেখতে পাই। বিক্রমদার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও আগে ছবিতে দেখেছি। নানা অভিযানের গল্প পড়েছি। খুব ইচ্ছে করছিল পরিচয় দিয়ে গোটা ঘটনাটা বিক্রমদাকে জানাই। অতিকষ্টে নিজেকে সামলাই। কারণ তখন লুকিয়ে থাকাটাই বেশি দরকার। তাছাড়া বাবা, মা পুরীতে আসছেন। ভেবেছিলাম ওঁদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব। আর তখনও তো জানি না যে বিক্রমদা এই কেসের দায়িত্বে রয়েছেন! সেটা জানতে পারি পরদিন। চোপড়াকে ফোন করার পর। চোপড়াকেও অবশ্য জানাইনি কোথা থেকে ফোন করছি। আমি পালিয়েছি শুনে চোপড়া খুবই খুশি হয়। তারপর থেকে দিনে-রাতে মাঝেমধ্যেই শমিদের হোটেলের কাছ থেকে ঘুরে গেছি। বেশ মজাই লাগত। মনে হতো, দেখা যাক, বিক্রমদা আমাকে খুঁজে বের করতে পারেন কিনা। সেই ছোটবেলার লুকোচুরি খেলার মতন রোমাঞ্চ হতো।' কথা শেষ করে বিতান হাসল।

এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, এবার মুখ খুললেন বিতানের বাবা রামানুজ রায়। বিক্রমদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুনুন, ছেলের কথা শুনুন। নটোরিয়াস ক্রিমিনালরা ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পেলেই মেরে দেবে। আর ও কিনা মজা পাচ্ছে! বুঝুন কাণ্ডটা। এদিকে আমরা কীরকম দুশ্চিন্তায় মরেছি! ফোন পাওয়ার পর থেকেই রাতে ঘুম নেই। ওর মা সারাক্ষণ কাঁদছে।'

বিক্রমদা বললেন, 'সন্ন্যাসীর বেশে লুকিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতান ঠিকই করেছিল। কিন্তু আপনাদের এখানে আসার সিদ্ধান্তটা একেবারেই ভুল। এটা করা উচিত হয়নি। আপনারা তো বিপদে পড়তেনই। বিতানও নতুনভাবে বিপদে পড়ত। আপনাদের এখানে আসার খবরটা যদি ঠিক সময় না পেতাম তাহলে এতক্ষণে ভার্মা আপনাদের ধরে নিয়ে যেত। টর্চার করে জানার চেষ্টা করত বিতান কোথায় আছে। এতে সমস্যা বাড়ত। কলকাতায় থাকলে এই বিপদের সম্ভাবনা অনেক কম ছিল। কারণ, সারাক্ষণ সাদা পোশাকের পুলিশ নজর রাখছিল আপনাদের বাড়ির ওপর। বিতান যে কিডন্যাপারদের হেফাজতে নেই সেটা বুঝতে পারি আজ দুপুরেই, ভার্মা যখন গুলি চালিয়ে মারার চেষ্টা করে বিতানের বদলি অশোক মেহরাকে।'

পাশ থেকে বিনতি রায় শিউরে উঠে বললেন, 'কী সাংঘাতিক!'

বিক্রমদা বললেন, 'আরও আছে। তার আগেই ভার্মা মাথার পেছনে আঘাত করে মারার চেষ্টা করেছে কমান্ডার চোপড়াকে। এতটা মরিয়া হয়ে ওঠার কারণ তো একটাই। বিতান আর ওদের হেফাজতে না থাকায় ওরা চাইছিল অ্যাস্ট্রোনটদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে। এতে নতুনরা আসতে ভয় পাবে। অভিযাত্রী ধ্বংস করা যাবে না। তখনই বুঝলাম নিশ্চয়ই বিতান পালিয়েছে। স্মার্ট ছেলে, অল্পবয়সেই অনেক কঠিন কঠিন কাজ করেছে। ওর পক্ষে গুণ্ডাদের নজর এড়িয়ে পালানো অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয়। আমার অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট জোরালো সমর্থন আগেই পেয়েছি। যখন রাকেশ জানিয়েছে যে,আপনারা এখানে আসছেন। আর

ফেরার টিকিট কেটেছেন তিনটি!'

'কিন্তু ভার্মা?'

বিতানের প্রশ্ন শুনে বিক্রমদা বললেন, 'হ্যাঁ, এবার ভার্মার ব্যাপারটায় আসছি। ভার্মার পেছনে নিশ্চয়ই আরও বড় কোনও মাথা আছে। এবার সেটা খুঁজে বের করে ফেলবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। কিন্তু আমার চোখে ভার্মা পুরোপুরি ধরা পড়ে যায় আজ দুপুরেই। দ্রুত মেকআপ তুলতে গিয়ে কিছু চিহ্ন থেকে গিয়েছিল ওর চোখে-মুখে। বুঝতে পারছিলাম, আর দেরি করা ঠিক হবে না। তাই টোপটা ফেললাম। জানিয়ে দিলাম বিতানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় ওর বাবা-মার সঙ্গে কথা হবে। বিতানও থাকবে। ভার্মাকেও থাকতে বলেছিলাম। জানতাম ও রাজী হবে না। বরং একটা শেষ চেষ্টা করবে। ঠিক সেটাই হয়েছে। ও দলবল নিয়ে হানা দিয়েছে। ভার্মা ঠিকই জানত, বাবা-মাকে ধরে নিয়ে গেলে বিতান ধরা দেবে।'

'কিন্তু অভিযাত্রী পৃথিবীতে ভেঙে পড়লে ভার্মার কী লাভ?'

বিতানের প্রশ্নের জবাবে বিক্রমদা বললেন, 'খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি ভার্মার পারিবারিক ব্যবসা হলো বিভিন্ন জীবনদায়ী ওষুধ বানানো। বেশ বড় কোম্পানি হলে কী হবে, ওদের বিরুদ্ধে ওষুধে ভেজাল দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল দুবার। অভিযাত্রীর বিষাক্ত, তেজস্ক্রিয় জ্বালানি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মারণরোগের সম্ভাবনা যদি বেড়ে যায়, তাহলে লাভ তো এই সব অসাধু ব্যবসায়ীদেরই। কিন্তু এসবই অনুমান। তদন্তসাপেক্ষ। প্রমাণ করতে হবে। সম্ভাবনা আরও অনেক থাকতে পারে। বিদেশী শত্রুদের হাত থাকলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ভার্মা যখন ধরা পড়েছে, তখন নিশ্চয়ই জানা যাবে। তবে এখন অনেক বড় কাজ রয়েছে সামনে। বিতানকে সেটা পারতেই হবে। কী বিতান?'

বিক্রমদা হাত বাড়িয়ে দিতে শক্ত করে সেই হাত চেপে ধরল অ্যাস্ট্রোনট বিতান রায়। আবেগে গলা কেঁপে গেল বিতানের, 'কথা দিচ্ছি, পারবই। শমির মতো এইটুকু একটা ছেলে আমার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে, আর আমি পারব না?'

বিক্রমদা হাসলেন, 'শমিকে এইটুকু বল না। ও কিন্তু রেগে যায়।'

শমির পিঠ চাপড়ে বিতান বলল, 'স্যরি শমি! তুমি যে স্কুল ফাইনাল দিয়েছ আমি ভুলেই যাই। কি, রাগ করনি তো?'

শমি মাথা নাড়ল, 'না, না, রাগ করিনি। তবে আপনারা যখন মহাশূন্যে থাকবেন সেইসময়...'

বিক্রমদা বললেন, 'তুইও কি মহাকাশযানে থাকতে চাস নাকি?'

বিতান হেসে উঠে বলল, 'যাঃ, কেন মিছিমিছি ওর পেছনে লাগছেন? হ্যাঁ, শমি বলো, তুমি কী বলছিলে?'

শমি বলল, 'মনিটরে গোটা ব্যাপারটা দেখতে চাই।'

'ও এই কথা।' বিতান বলল, 'যদিও বাইরের লোক অ্যালাউড নয়, তবে তোমাদের জন্য সেদিন দরজা খোলা থাকবে লঞ্চিং সাইটের। সে ব্যবস্থা আমি করে দিয়ে যাব।'

রামানুজ রায় বললেন, 'তাহলে আমিই বা বাদ থাকি কেন?'

বিতান দুষ্টু দুষ্টু হেসে বলল, 'উঁহু, তুমি শিল্পী মানুষ। আগে অনেকবার বলেছ ওইসব মহাশূন্য-টুন্য নাকি বহুবার ঘুরে এসেছ, মনে মনে! বিজ্ঞানে এই সব কল্পবিলাসীদের স্থান নেই। আমরা মহাকাশে যাই—রীতিমতো ছবি তুলে নিয়ে আসি, বুঝলে! হাতেনাতে প্রমাণ দিই।'

রামানুজ রায় বিক্রমদাকে বললেন, 'শুনুন, ওর কথা শুনুন! আরে বাবা, শিল্পী, সাহিত্যিকরা আগে কল্পনা করে, তারপর তো বিজ্ঞান সেটাকে প্রমাণ করে। কী তাই না? যুগে যুগে তো এমনই ঘটেছে।'

বিনতি রায় উঠতে উঠতে বললেন, 'শুরু হলো বাবা-ছেলের গুরুগম্ভীর আলোচনা। নাঃ, আমি উঠি। ডিমভাজা না আনলে এই তর্ক থামবে না।'

॥ ১১ ॥

মিশন টু মার্সয়ের দ্বিতীয় পর্ব সাকসেসফুল। অভিযাত্রীকে ধ্বংস করা গেছে। মঙ্গলে ভয়ঙ্কর অভিযানের শেষপর্ব ভালয় ভালয় মিটেছে। তবে মনিটরে গোটা ব্যাপারটা দেখার ইচ্ছে থাকলেও শমিরই মাঝখান থেকে দেখা হলো না। অন্য একটা কেসে বিক্রমদার সঙ্গে বাঙ্গালোর যেতে হলো পুরী থেকে ফিরেই। শমি বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় বাড়িতে ফিরেই পেল অনেক রঙিন পোস্টকার্ড, ছবি। সবই মহাশূন্যে তোলা। স্পেসস্যুটে আলাদাভাবে চেনাই যাচ্ছে না বিতান আর কমান্ডার চোপড়াকে।

ছবির পেছনে শমিকে অনেক কথা লিখেছে বিতান। শুভেচ্ছা জানিয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিক্রমদার জন্য একটা দীর্ঘ চিঠি। সেই চিঠিতে বিতান লিখেছে, মহাকাশের অভিযানে তো আপনাদের আনতে পারব না, কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে বিভিন্ন অভিযানে মাঝেমধ্যে আমি আপনাদের সঙ্গী হতে চাই। যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ে মজা কোথায়? পুরোটাই শুধু নিখুঁত হিসেবের খেলা! যেখানে মানুষ নেই, সেখানে অ্যাডভেঞ্চারের মজা পাওয়া যায় নাকি? প্লীজ, আমার কথা ভুলবেন না। মাঝেমধ্যে ডাক পাঠাবেন। আমি অপেক্ষা করে থাকব।

বিতানের চিঠির শেষ অংশ আরও ছুঁয়ে গেল শমিকে। বিতান লিখেছে, মহাকাশ যতই টানুক না কেন, এই পৃথিবীর মাটিতে পা রাখার রোমাঞ্চ একেবারেই আলাদা। হিমেভেজা ঘাসের স্পর্শ মহাশূন্যে কোথায়? এই সুন্দর গ্রহর বিপদ কাটাতে কিছু করতে পেরেছি ভেবে ভাল লাগছে। যদিও জানি, আপনারা না থাকলে মঙ্গলে অভিযান সত্যিই মারাত্মক হয়ে উঠত পৃথিবীর পক্ষে।

ছবিঃ সৌমিত্র চক্রবর্তী

ফারাওয়ের অভিশাপ

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

ফসকে গিয়েছিল হাতটা, রেলিং খিমচে ধরে নিজেকে সামলে নিলাম কোনোরকম করে।

বুকের ভেতরটা ধক-ধক করছিল। এরকম হয় না বড়ো একটা আমার। না, সুশান্তদের মতো ডানপিটে ছেলে আমি নই ঠিকই, কিন্তু এ কাজটা তো আমায় করতে হয় মাসে অন্তত বার দুয়েক। ব্যাপারটা প্রায় জলভাত হয়ে গিয়েছে আমার। নিচের ব্যালকনির রেলিং অনেকখানি তোলা, সেটায় দাঁড়ালে ওপরের ব্যালকনির জলের নালিটা ধরা যায়। সেই নল ধরে একটু ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেই মাঝখানের ইটে পা পেয়ে যাবো। সেখানে পা দিয়ে বাঁ হাত বাড়ালেই আমার ঘরের জানলার শিক; তো পায়ের তলার ইটটা এভাবে নড়ে যাবে সেটা আর কে জানতো! দোতলার রেলিংটা ধরে ফেলতে না পারলেই হয়েছিল আর কি! দারোয়ান ব্যাটা ঠিক হাউমাউ করে ঝামেলা জুড়ে দিতো, আর বসে বসে তখন সুপারের কাছে জবাবদিহি করো ঘণ্টাখানেক ধরে।

আসলে আমাদের এই বেলতলা বোর্ডিং-এর ডিসিপ্লিনের ব্যাপারটা বড্ডো কড়া। সুপারের জন্যেই হয়েছে অবশ্য, খটখটে কাঠখোট্টা মানুষ—তিনকুলে কেউ নেই কোথাও। হস্টেল ছেড়ে নড়বেনও না একদিন, নিয়ম-কানুনেরও কোনো ঢিলে দেবেন না। ঘরে রেডিয়ো বাজলে সে আওয়াজ যেন ঘরের বাইরে না যায়, রাত দশটার পর ঘরে যেন বড় আলো না জ্বলে, রাত নটার পর কোনোরকম করেই

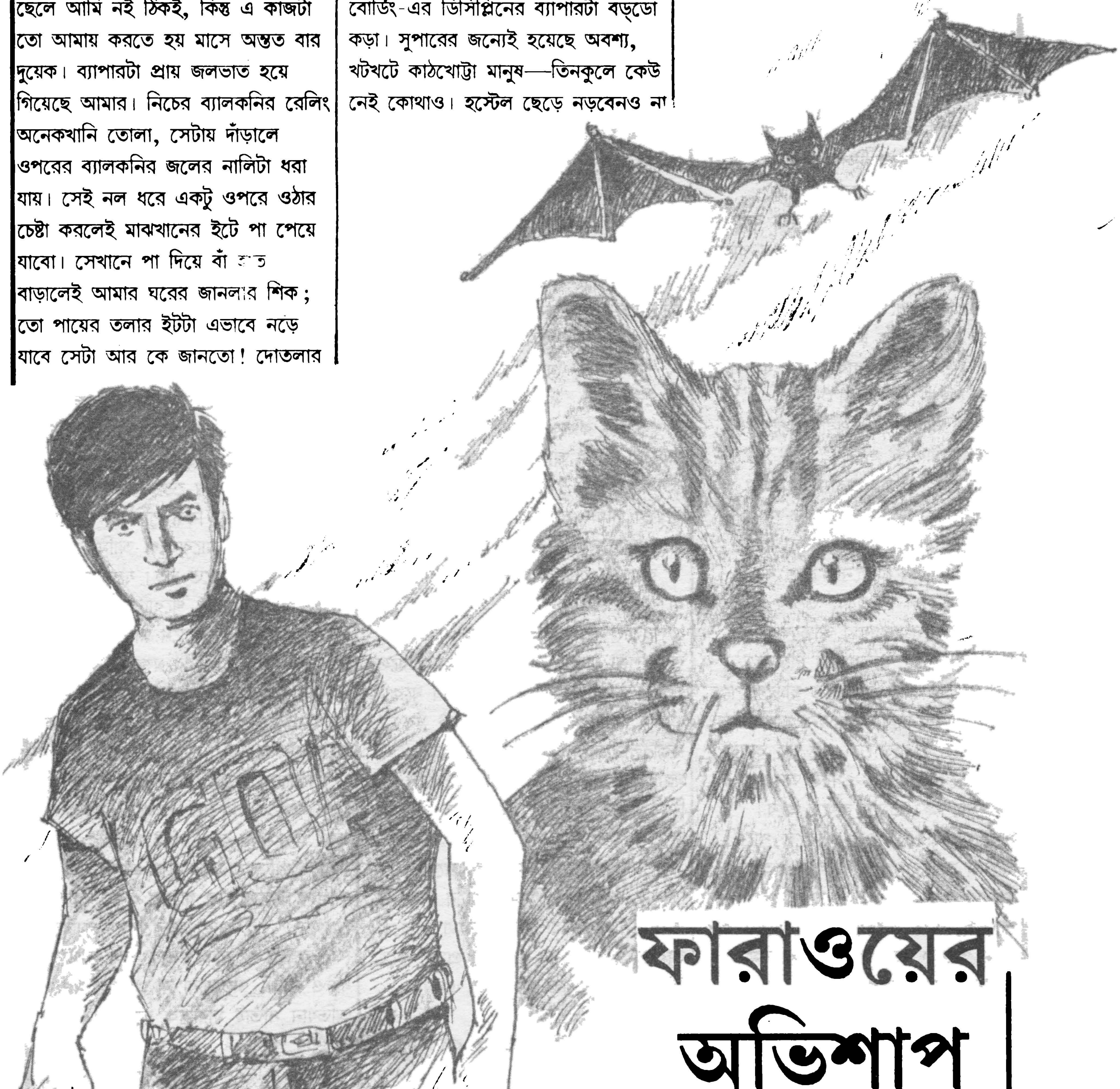

যেন বাইরের গেট খোলা না হয়, সে যেই হোক না কেন! কাজেই কোনো উপায় আছে, গেট টপকে এসে পেছন দিক দিয়ে এভাবে ঘরে ঢোকার চেষ্টা না করে! তাহলে তো বাড়ি যাওয়াই বন্ধ করে দিতে হয় আমাদের!

সত্যি, এই ব্যাপারটা সুপার কোনোদিন বুঝবেন না। এখন না হয় তবু পর পর চারটে দিন ছুটি পাওয়া গেছে, কিন্তু শুধু শনি-রবিবার যখন ছুটি থাকে! সকালের ট্রেনে এলে পৌঁছতেই এগারোটা বেজে যায়, ক্লাসের দফা গয়া, কাজেই আসতে গেলে এই রাতের ট্রেন! এমনিতেই নটায় রাইট টাইম, আধঘণ্টা লেট তো বাঁধা। মানে দশটার আগে বোর্ডিং-এ পৌঁছবার কোনো গপ্পোই নেই। তা, আমার রুমমেট সুদীপ অবশ্যি এ ব্যাপারে খুব সদয় আমার ওপর। ওর নিজের তো আর বাড়ি-টাড়ি যাওয়া নেই—পলাশীতে বিরাট একটা বাড়িই আছে শুধু, নিজের লোকজন তো আর কেউ নেই! থাকার মধ্যে ওই পাগলাটে এক বাবা, টাকা-পয়সার কোনো চিন্তা নেই, দেশ-বিদেশের যতো সব অদ্ভুত জিনিস—কিউরিও না কী বলে যেন, যোগাড় করে বেড়াচ্ছেন! কখনো-সখনো ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হন হস্টেলে, সকাল না হতেই ফুস্! অবশ্য হস্টেলের পাওনা-গণ্ডা আর সুদীপের হাত- খরচাটা এসে যায় একেবারে নিয়মমতো, সেদিকে কোনো গণ্ডগোল নেই। তা, সুদীপ জানেই, আমি বাড়ি গেলে রোববার রাত্তিরে এইভাবেই ফিরে আসবো। সেইজন্যে নিদেনপক্ষে একটু মুড়ি-চানাচুরের যোগাড় করে রাখে রাতটুকুর জন্যে, আর পৌঁছতে খুব বেশি রাত হয়ে গেলেও কখনও ঘুমিয়ে পড়ে না।

কিন্তু এবারে ওর হলোটা কী! বার দুয়েক টোকা দেবার পর আলতো গলায় একবার ডাকলাম, 'সুদীপ, এই সুদীপ—দরজা খোল।'

আশ্চর্য তো! জোরে ধাক্কা দেওয়াও মুশকিল, গলা চড়ানো তো আরো অসম্ভব। এরকম তো ছেলেটা কখনো করে না। ঝামেলায় ফেললো দেখছি!

সত্যি কথা বলতে কী, ঝামেলাটা অন্যান্যবারের চেয়ে এবার একটু বেশিই। হাফইয়ার্লি পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, পড়ার চাপও নেই। তার ওপর চার-চারটে ছুটির দিন একসঙ্গে, কখনো যে বাড়ি যায় না, সেও এবার চলে গেছে। ফলে হস্টেল এখন বলতে গেলে ফাঁকা, আমাদের দোতলায় দশখানা রুমের প্রত্যেকটি ভোঁ-ভাঁ, শুধু এই আমাদেরটি ছাড়া। হস্টেলে বলতে এখন সুপার আর দারোয়ান বদরী সিং। অবশ্যি ওর বউ তুলসী আর ছেলেপিলেরা তো আছেই। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, সুদীপ যদি আমাকে ডোবাবার জন্যে কোথাও চলে গিয়ে থাকে, তাহলেই তো আমি গেছি!

যা থাকে কপালে, এই মনে করে দরজায় জোরে ধাক্কা দিতে গিয়েই আমি বেকুব বনে গিয়েছি! আমায় অবাক করে দিয়ে দরজার পাল্লা দড়াম করে ভেতরের দিকে খুলে গেল।

তার মানে দরজা খোলাই ছিল! আমি আসবো বলে দরজা খুলে রেখেছে সুদীপ? কিন্তু এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার কেন ঘর! এমনি করে কেউ থাকতে পারে নাকি ঘরে! না, বড়ো আলো জ্বালার নিয়ম নেই মানছি, কিন্তু ওর বাবার এনে দেওয়া সেই সুদৃশ্য টেবিলল্যাম্পটা তো জ্বালা থাকে—নিদেনপক্ষে বেডলাইট!

নাঃ, এবারের যাত্রাটাই অশুভ হয়ে গেছে দেখছি। ট্রেন ধরতে গিয়ে ছোট-খাটো একটা আছাড় খেলাম, ওপরে উঠতে গিয়ে হাতটা স্লিপ করলো, আবার এখন সুদীপটাও এমন বেয়াড়া রসিকতা শুরু করেছে—

সুপারের কথা সেই মুহূর্তে ভুলে গিয়েই বোধহয় বড়ো আলোর সুইচে হাত দিয়েছিলাম, কিন্তু আলোটা জ্বলে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে উঠলো আমার।

ঘরে একটা খণ্ডযুদ্ধ ঘটে গেছে মনে হচ্ছে। দুটো বেডই বিধ্বস্ত, ওরটা একটু বেশি, আমারটা একটু কম—এই যা তফাৎ। সেন্টার-টেবিলটা ওলটানো, তাতেই মনে হচ্ছে আমার জন্যে তিনটে রুটি আর দুটো মিষ্টির যোগাড় করেছিল। এখন সেগুলো মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওর টেবিলের পেপার-ওয়েটটা গড়িয়ে গেছে ওদিকে, দরজার কাছে। নতুনই ছিল, এখন চক্‌লা-ওঠা, তার মানে নিশ্চয়ই ওটা ছুঁড়ে মারা হয়েছিল কাউকে।

মাথাটা প্রথমে কাজ করছিল না। তাড়াতাড়ি বড়ো আলো নিভিয়ে টেবিল-ল্যাম্পের সুইচটা টিপলাম। কী ভাগ্য, জ্বললো আলোটা। ব্যালকনির দিকে জানলা বন্ধই ছিল, দরজাটাও ভালো করে বন্ধ করে দিলাম। একটুও আলো যেন বাইরে না বেরোয়। এবার অন্য দরজার দিকে তাকালাম, ভেতরের বারান্দায় যাবার।

বন্ধই তো আছে দরজাটা। তাহলে! বাইরে গেলে তো এখান দিয়েই বেরুতে হবে! আর তার চেয়েও বড়ো কথা আমি আসবো জেনেও ও বেরিয়ে যাবে! আমার খাবার-দাবারের যোগাড় করেও? ঘরের সমস্ত কিছু এভাবে লণ্ডভণ্ড করে! কেন?

মাথায় কিছুই ঢুকছিল না, আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ভেতরের দরজাটা খুললাম। না, হস্টেল যদিও ফাঁকা, ভয়ের কিছু নেই। গোটা বারান্দাটায় ডিম আলো জ্বালা থাকে, এমনকি ছুটির দিন-গুলোতেও। ডান দিকে এগিয়ে গেলে সিঁড়ি, নিচের কোলাপসিবলে নির্ঘাৎ তালা পড়ে গিয়েছে। অন্যদিনই নটায় তালা মারে বদরী সিং, আজ রোববার বলে হয়তো আরো আগেই কাজ সেরে রেখেছে। বাঁ দিকে একেবারে শেষের দুটো ঘর বাথরুম আর টয়লেট।

এগিয়ে গেলাম বারান্দা ধরে। প্রত্যেকটি ঘরে তালা ঝুলছে, ঝুলবেই আমি জানি। আমার মতো দূরে তো আর কেউ থাকে না, কাল সকালের আগে আর কেউ ফিরছে না হস্টেলে।

বাথরুমেও ডিম আলো, বরাবরই থাকে। ভেতরে ঢুকে ভালো করে দেখলাম, দু'জায়গাতেই। না, সুদীপ এখানে নেই। থাকবে না সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু তাহলে! গেল কোথায় ছেলেটা!

ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়েছিলাম বোধহয় কয়েক সেকেন্ড, তারপরই কথাটা মাথায় ঢুকলো আমার।

ভেবে ভেবে অনর্থক মাথা গরম করছি আমি, ভেতরের দিকে দরজা যখন বন্ধ ছিল তখন এদিকে যে সুদীপ আসেনি এ তো একটা বাচ্চা ছেলেও বলতে পারে! তাছাড়া নিচের কোলাপসিবল গেট যখন বন্ধ, এদিক দিয়ে যাবেই বা কী করে সুদীপ! বেরুতে গেলে আমার মতো করে ওই ব্যালকনি দিয়েই নামতে হবে ওকে তার সেটা করেছে বলেই ব্যালকনির দিকের দরজাটা খোলা ছিল। ঠিক! তবে কোথায় গেছে ও, কেন গেছে, সেটা ও না ফিরলে জানা যাবে না। কিছু একটা হয়েছিল ঘরে, সেজন্যেই সব লণ্ডভণ্ড। হয়তো নিজের জন্যেই হঠাৎ কোনো ওষুধপত্তর দরকার হয়ে পড়েছিল ওর, সেইজন্যেই বেরিয়েছে। নয়তো আমার খাবারটা নষ্ট হয়ে গেছে দেখেই বেরিয়েছে, কতো কীই তো হতে পারে! তবে যেখানেই গিয়ে থাক, এসে পড়বে পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই, কাজেই অতো চিন্তা করার কিছু নেই আমার।

ঘরে ঢুকে ভেতরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। না, ব্যালকনির দরজাটা খুলে দিলাম আবার। যেখানেই যাক, ওইখান দিয়েই ফিরতে হবে সুদীপকে, অন্য কোনো পথ নেই।

ক্ষিধে ক্ষিধে এখন আর তেমন বুঝতে পারছি না, তবে ঘুম পাচ্ছিল খুব। এতোখানি রাস্তা ট্রেনে আসার পর এসব ঝঞ্ঝাট কি আর ভালো লাগে! নিজের বিছানার চাদরটা একটু টান টান করে নিতে গিয়েই হঠাৎ নজরে পড়ে গেল চিঠিটা।

আরে! এটা এতোক্ষণ দেখতে পাইনি কেন! ছিলই না, নাকি চাদরের ভাঁজে লুকিয়ে ছিল বলে বুঝতে পারিনি! তাড়াতাড়ি কাগজের টুকরোটা টেনে নিয়ে টেবিলল্যাম্পের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম।

না, হাতের লেখাটা সুদীপেরই কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু ভীষণ তাড়াহুড়ো করে লেখা। সেইজন্যেই বোধহয় এই ছোট্ট চিঠিও শেষ হয়নি, তার মধ্যেও আবার দুটো-একটা শব্দ কীরকম জড়িয়ে গেছে, ভালো বুঝতে পারছি না। তবে মোটামুটিভাবে যেটুকু বুঝতে পারলাম তাতেও তো বিশেষ কিছু ঢুকলো না মাথায়। এরকম একটা অর্থহীন চিঠি সুদীপ লিখতে গেল কেন! ও লিখেছে—

'যদি এসে পড়িস তাই লিখছি। কালো বেড়াল আর রক্তচোষা বাদুড় থেকে সাবধান। তার চেয়েও সাবধান আমার ওই—'

ব্যস! ওই লম্বা আঁচড়ের পরই চিঠি শেষ!

অবাক কাণ্ড! কালো বেড়াল আবার কী! এতোদিন আছি এই হস্টেলে, ঘরে বেড়াল-টেড়াল ঢুকতে কখনো দেখেছি নাকি! বেড়াল একটা অবশ্যি ঘুরঘুর করে, কিন্তু সে তো ডাইনিং হলে! আর সেটার রঙও তো একেবারে ধবধবে সাদা—গলা আর লেজে একটু গেরুয়া ছোপ। কালো বেড়াল এ তল্লাটেই কখনো দেখিনি। পরের ব্যাপারটা তো আরো হাস্যকর, রক্তচোষা বাদুড়! ঘরে কখনো আরশোলা দেখা যায় না একটা, এই ঘরে ঢুকবে বাদুড়—তাও আবার রক্তচোষা! বোঝ কাণ্ড!

নাঃ, গল্পের বই পড়ে পড়ে নির্ঘাৎ মাথায় পোকা হয়েছে সুদীপের, নইলে এসব আবোল-তাবোল কথা কেউ লিখতে পারে! কিন্তু যেভাবে লিখেছে তাতে এটা অন্তত বোঝা যাচ্ছে সুদীপ আজ আর ফিরে আসছে না। সেটাও একটা চিন্তার ব্যাপার। এতোদিন আছি ওর সঙ্গে, জীবনে কখনো তো ওকে বাইরে কাটাতে দেখলাম না। নেইই কেউ ওর তিনকুলে তা যাবে কোথায় ও!

ধুত্তেরি ছাই! অতো কথা ভাবতে এখন আর ভালো লাগছে না। যা ভাবার কাল সকালে ভাবলেই চলবে। আসবে না যখন, তখন পায়জামাটা গলিয়ে নিয়ে জামা ছেড়ে, টেনে একটা ঘুম লাগানোই ভালো।

চিঠিটা টেবিলে রেখে ব্যালকনির দরজাটা বন্ধ করে ফিরতে গিয়েই হঠাৎ সুদীপের চিঠির অসমাপ্ত শেষ বাক্যটা আমার মনে পড়লো। 'তার চেয়েও সাবধান আমার ওই—'

আমার কী? তাতে কী এমন ব্যাপার আছে যে সাবধান হতে হবে! সাবধান হবার মতো এমন আছেই বা কী এ ঘরে!

নাঃ, আর ভাবতে পারি না। মাথাটা কেমন যেন ভার ভার লাগছে। দরজাটা বন্ধ করে কুঁজোর কাছে এগিয়ে গেলাম। একটু জল অন্তত সুদীপ রেখেছে আশা করা যেতে পারে। গ্লাসটা হাতে নিয়ে কুঁজোর মুখের ঢাকা খুলতেই জিনিসটা আমার নজরে পড়ে গেল।

না, তেমন বড়োসড়ো কিছু নয়, চোখে পড়াটাই একটু আশ্চর্য। কুঁজোর সামনেই পড়েছিল জিনিসটা, না হলে হয়তো দেখতেও পেতাম না। হাতে তুলে নিলাম।

একটা আংটি!

সোনার নয়, পেতলের নয়, এমন একটা ধাতু দিয়ে তৈরি যেটা আমি চিনি না—কোনো একটা সংকর ধাতুও হতে পারে। তবে ভীষণ পুরনো যে, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। আংটিটার মধ্যে সবচেয়ে যেটা অবাক করবার মতো জিনিস, সেটা হলো তার ফলকটা। স্পষ্ট একটা স্ফিংকসের মূর্তি, একটু ভালো করে দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

জিনিসটা নিঃসন্দেহে সুদীপেরই, ওর বাবা নানারকমের মুদ্রা-টুদ্রা মাঝে মাঝে ওকে এনে দেন আমি দেখেছি। তবে এ জিনিসটা কোনোদিন দেখিনি আমি সুদীপের হাতে। এখানে সুদীপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে এক আমিই আছি। তো, আমিই যখন দেখিনি তখন আংটিটা যে

সুদীপ গত দু'-তিন দিনের মধ্যেই পেয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার মানে ওর বাবা এই ছুটির মধ্যেই এসেছিলেন, আর এই প্রাচীন আংটিটা—যতদূর মনে হচ্ছে মিশরেরই, তবে আমি আবার এসব ব্যাপার ভালো বুঝতে পারি না—এটা ওকে দিয়ে গেছেন।

আংটিটা নিয়ে টেবিলল্যাম্পের নিচে যাচ্ছিলাম আরো ভালো করে দেখবো বলে। ঠিক সেই সময়েই কানে এলো আওয়াজটা।

আশ্চর্য! বেড়ালের ডাক তো জীবনে কখনো শুনিনি এ ঘরে! কী ব্যাপার!

টেবিলল্যাম্প হলেও রাত তো অনেক হয়েছে—আলোর আভা মোটামুটি উজ্জ্বল হয়েই ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। একটা বেড়াল লুকিয়ে থাকবে অথচ আমি দেখতে পাবো না, এটা তো হতে পারে না!

ভুরু কুঁচকে যাচ্ছিলো আমার। ভীতু ছেলে আমরা নই, আমি বা সুদীপ কেউই না। এতো বড়ো একটা হস্টেলে আমি আর সুদীপ একা আছি, এরকম ঘটনা আগেও কয়েকবার হয়েছে। তেমন কিছু মনেই হয়নি আমার। এখন সুদীপ না থাকলেও আমি জানি একটা চিৎকার করলেই বদরী সিং লাঠি নিয়ে ছুটে আসবে, ওর ঘুম খুব পাতলা। কিন্তু শুধু শুধু আমি চেঁচাতেই বা যাবো কেন! ঘরে একটা বেড়াল ঢুকেছে বলে? আর সেই কথা সুপার যখন হেসে হেসে বেলতলা বোর্ডিংয়ের সব কটা ছেলের কাছে গল্প করবেন।

ধুস্। মিছিমিছি মনটাকে দুর্বল করছি। সুদীপ ব্যাটাই দায়ী এ জন্যে। ওইরকম বিদিকিচ্ছিরি একটা চিঠি লিখে না গেলে তো এসব কথা আমার মাথাতেই আসতো না। জামাটা ছেড়ে মুখে-চোখে একটু জল দিয়ে এলেই ওসব বাজে চিন্তা মাথা থেকে উবে যাবে।

জামাটা খুলবো বলে বোতামে হাত দিয়েছি, দ্বিতীয়বার শুনতে পেলাম আমি বেড়ালের ডাকটা। না, শুধু বেড়ালের ডাক হলে কানে ওরকম বেয়াড়া লাগতো না, ডাকটার মধ্যে একটা কিছু ছিল—কেমন যেন একটা চাপা গর্জন, যেন একটা চাপা রাগে কেউ ফুঁসে উঠছে। বেড়ালটাকে দেখতে না পেলেও ওর খাড়া খাড়া লোম আর ক্রোধে ফুলে ওঠা চেহারাটা যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

বেড়াল একটা আছে, কোনো ভুল নেই। কিন্তু কোথায়! ঘরে তো দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে ব্যালকনিতেই বসে আছে কি?

ভাবতে ভাবতেই কখন নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছি, মাথা নামিয়ে সুদীপের চৌকির তলায় তাকিয়েছি, জানি না। কিন্তু সেদিকে নজর পড়তেই পলকে বুকটা কেমন ছ্যাঁত করে উঠলো আমার।

জীবনে এলোমেলো ব্যাপার বেশ কয়েকবারই ঘটেছে আমার। এক বন্ধুর মা চোখের সামনেই মারা গিয়েছিলেন, অন্ধকার বাড়িতে বন্ধু ফেরার আগে পর্যন্ত সেই অবস্থায় আমাকে কাটাতে হয়েছে। শ্মশানে গিয়েও একবার আমার ভরসায় ডেডবডি ফেলে দলবল কাঠের যোগাড় করতে গিয়েছিল। কিন্তু কখনো এমন অদ্ভুত অনুভূতি হয়নি আমার। চোখ ফেরাতে পারছিলাম না আমি, বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছিল আমার!

অতো কালো বেড়াল যে হতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারি না। কোথাও এক বিন্দু সাদার ছিটেও নেই। এতো কালো যে মাঝে মাঝে শরীরটাই হারিয়ে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে থেকে। শুধু উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ।

এতো ভয়াবহ চোখ যে বেড়ালের হতে পারে সেটাও আমার অভিজ্ঞতায় একেবারে নতুন।

ভয়াবহ এবং বীভৎস। ঠিক যেন জ্বলন্ত দুটি অগ্নিগোলক। সেই আগুনের আঁচও যেন টের পাচ্ছি আমি। একেবারে আমার ওপরই নিবদ্ধ সেই চোখ!

কী অদ্ভুত যে আকর্ষণী শক্তি সেই চোখ দুটোর! আমি চেষ্টা করছি চোখ অন্যদিকে সরাতে, পারছি না, চোখ দুটো যেন একেবারে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে আমাকে। প্রতিমুহূর্তে আমাকে আরো দুর্বল, আরো অবশ করে ফেলছে। দেহের সমস্ত রক্ত যেন বিন্দু বিন্দু করে শুষে নিচ্ছে সেই চোখ।

কেমন একটা জোর এসে গেল যেন ভেতর থেকে হঠাৎ। এক ঝটকায় ঘাড় ঘুরিয়ে নিলাম আমি। উঠে দাঁড়ালাম সোজা হয়ে।

সেই মুহূর্তে একটা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছেড়ে বেড়ালটাও লাফিয়ে এসে পড়েছে আমার সামনে, একেবারে আমার বিছানার ওপর।

এই প্রথম খানিকটা উজ্জ্বল আলোয় আমি দেখতে পেলাম তাকে। কিন্তু না দেখাই ভালো ছিল যেন এর চেয়ে।

যতোটা আমি আন্দাজ করেছিলাম তার চেয়েও হিংস্র, তার চেয়েও ভয়ানক!

গোটা শরীরটা যেন তৈরি করা হয়েছে কালো মার্বেল পাথর দিয়ে। চোখ দুটো শুধু জ্বলন্ত ফসফরাসের পিণ্ড। একেবারে পাথরের মতো স্থির সমস্ত মূর্তিটা। কেবল চোখ দুটো দৃঢ়নিবদ্ধ আমার দিকে। লেজটা শুধু অল্প অল্প নড়ছে আর শরীরটা মাঝে মাঝে ফুলে উঠছে—তাতেই বোঝা যাচ্ছে ওটা পাথরের মূর্তি নয়।

কেন যেন আমার মনে হচ্ছিলো, ওই কালো শয়তানটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছে। মাঝে মাঝে একটু-আধটু ঘাড় ঘোরানো, লেজের অল্প আন্দোলন, ভেতর থেকে গুমরে ওঠা মৃদু একটা গরর্—গরর্ শব্দ। সমস্ত মিলে কেমন যেন অসহায় লাগছিল আমার নিজেকে। মনে হচ্ছিলো একটা বন্ধ ঘরে আমি আর মূর্তিমান শয়তান—কালান্তক যমের মতো অপেক্ষা করছে কখন আক্রমণের সবচেয়ে ভালো সুযোগটা পাওয়া যায়।

বন্ধ ঘরের কথাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো দরজাটা খুলতে হবে। এমন জায়গায় বেড়ালটা দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে টপকে ওদিকে যাওয়া ছিল

উড়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে।

প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া ভেতরের বারান্দায় গিয়ে আমার লাভ ছিল না কোনো। ওখান দিয়ে বেরুবার রাস্তাটাই তো বন্ধ। তার চেয়ে বরং ব্যালকনির দরজাটা খুলে রাখলে দরকার মতো বদরী সিংকে অন্তত ডেকে তোলা যেতে পারে।

অন্য যে-কোনো দিন হলে, বা অন্য যে-কোনো পরিস্থিতিতে, আমি পেছন ফিরে ব্যালকনির দরজার দিকে এগিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এই মুহূর্তে ওই শয়তানটার চোখের ওপর থেকে চোখ সরাতে আমি পারলাম না। আমার মনে হচ্ছিলো মুহূর্তের অসাবধানতায় অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। প্রতিমুহূর্তে আমাকে সাবধান থাকতে হবে এখন, প্রত্যেকটা মুহূর্তে চোখে চোখে রাখতে হবে ওকে, যেন কখনই ও অতর্কিতে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ না পায়।

কষ্ট করে নিজেকে ঠিক রাখছিলাম আমি। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, রাখতেই হবে। মাথা গরম হয়ে গেলেই আমি দুর্বল হয়ে পড়বো এবং সেই দুর্বলতারই সুযোগ খুঁজছে ওই শয়তানটা।

চোখ আমার নিবদ্ধ ছিল কুচকুচে কালো জীবটার ওপর, কিন্তু অত্যন্ত ধীর গতিতে, প্রায় পা টিপে টিপে আমি পিছিয়ে যাচ্ছিলাম ব্যালকনির দিকে। আমাদের দূরত্ব যে বেড়ে যাচ্ছে, সেটা ও বুঝতে পারছিল বলে আমার মনে হচ্ছিলো। সেটা বুঝেই কেমন যেন একটু অস্থির হয়ে পড়ছিল ও—ওর লেজ দুলছিল ঘন ঘন, ভেতরের আওয়াজটা বাড়ছিল, একবার যেন লাল টকটকে জিভ বার করে খাড়া খাড়া গোঁফও চেটে নিল।

কিন্তু আমি তখন দরজার কাছে পৌঁছে গেছি। দরজার কাঠে আমার পা লাগছে, আমি বুঝতে পারছি। এবার মাত্র সেকেন্ড দুয়েক সময় আমার দরকার, পেছনে ফিরবো এবং ছিটকিনিটা খুলে দেব। ওই অবস্থাতেও এটা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, দেরি করার কোনো মানে হয় না। দেরি করা মানেই রাত বাড়া এবং রাত বাড়া মানেই আমার সাহায্যের সম্ভাবনা কমে যাওয়া।

সুতরাং দেরি আমি করিনি। অতর্কিতে পেছন ফিরেছি। ছিটকিনিটা নামিয়েই দরজার পাল্লা টেনে ধরেছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে—

ব্যাপারটা ঠিক কী হলো বোঝার আগেই মুখের ওপর দমকা হাওয়া ছড়িয়ে পাখা ঝটপট করতে করতে কী একটা উড়ে চলে গেছে আমার মাথার ওপর দিয়ে। গিয়ে বসেছে ঘুলঘুলিটার ওপর।

কিছু বোঝার ক্ষমতাই ছিল না প্রথমটা। বুকের ভেতরে দমাস দমাস করে কে হাতুড়ি পিটছিল যেন। নিজেকে একটু সামলে নেবার পর আমার মনে হলো, এই কি তাহলে বাদুড়! ওই যাকে সুদীপ বলেছিল রক্তচোষা বাদুড়! কী করে বাদুড়টা? রক্ত চোষে? ঘরে তো আর কেউ নেই, তাহলে কি ওটা—

ভালো করে দেখার চেষ্টা করলাম। টেবিলল্যাম্পের আলোয় ভালো দেখা যায় না ওপরটা। কিন্তু আপাতত আমার শরীরে এতো জোর নেই যে ভেতরের দরজার কাছে সুইচবোর্ড অবধি যাই। মোটামুটি এই আলোয় যতোটুকু দেখা যায় তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

আমি যেগুলোকে চামচিকে বলে চিনি এটা অনেকটা তারই মতো, তবে আকারে খানিকটা বড়ো। সেটা অবশ্য ওই পাখনা ছড়িয়ে বসে আছে বলে মনে হতে পারে। গোটা জিনিসটা দেওয়ালের সঙ্গে যেন সাঁটা, কেবল জালের ওপর মাকড়সার মতো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে যেন। মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে আবার ধেয়ে আসতে পারে এদিকে, এবং প্রথমবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বলেই যে-এবারও তাই হবে এরকম মনে করার কোনো—

একেবারে অতর্কিতে ঘটে গেল ব্যাপারটা। এরকম সময়ে বোধহয় আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় কাজ করে, সেইজন্যেই বিদ্যুৎগতিতে মাথাটা সরিয়ে নিতে পেরেছিলাম। তা সত্ত্বেও নখের একটা আঁচড় বোধহয় ছুঁয়ে গেছে আমার মুখ। গালটা কেমন চিনচিন করে জ্বলছে।

আসলে কয়েক মিনিটের জন্যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কালো শয়তানটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। আর সেই সুযোগেরই বোধহয় অপেক্ষা করছিল ওটা। ধীরেসুস্থে নিজেকে আক্রমণের উপযুক্ত জায়গায় নিয়ে এসেছে, তারপর ঠিক সময়মতো একেবারে লাফিয়ে পড়ে—

রাগে সমস্ত শরীরটা জ্বলে উঠলো আমার। রগ দুটো দপ দপ করছে, বেশ বুঝতে পারছি। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যেন একটা উষ্ণ তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। আমার বিছানা থেকে এক লাফে এখন ওটা সুদীপের বিছানায় গিয়ে পড়েছে, কিন্তু উদ্যত ভঙ্গিটা আমার দিকেই ফেরানো। দেখছি আর কান দুটোয় আগুনের হলকা খেলে যাচ্ছে আমার।

তোমার শয়তানি আমি বার করছি! তোমায় আমি ছাড়বো না—মনে মনেই কথাটা বললাম আমি। তারপর ঠিক ওই আগের বারের মতোই ওটার চোখে চোখ রেখে আক্রমণের ছক কষতে লাগলাম। পেপার-ওয়েট, হ্যাঁ, ওটাই সবচেয়ে ভালো অস্ত্র হবে। হাতের টিপ বরাবরই আমার একেবারে মোক্ষম। একবার যদি ওটার মাথা লক্ষ্য করে জিনিসটা ছুঁড়তে পারি, মাথা তোলার আর সাধ্যি থাকবে না বাছাধনের। ওদিকের দরজা খোলার সময় পেপার-ওয়েটটা তুলে রেখেছি টেবিলে, স্পষ্ট মনে আছে আমার। আর একটু পিছিয়ে এলেই সেটা আমি হাতের নাগালে পেয়ে যাবো। সেজন্যে ওদিকে তাকাতে হবে না আমাকে।

গালের চিনচিনে যন্ত্রণাটা এখন বেশ টের পাচ্ছিলাম। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম আমার অস্ত্র। চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছিলো আমার, দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজ পাচ্ছিলাম।

শয়তানটা কিন্তু আমার হাতে ওটা দেখেও একদম চুপ, একেবারে ছবির মতো নিশ্চল হয়ে আছে এখন, চোখ দুটোই শুধু জ্বলছে তীব্র প্রতিহিংসায়। কিন্তু ওই চোখকে কেমন করে চুপ করিয়ে দিতে হয় আমার জানা আছে। আর দু'-চার সেকেন্ড, তারপরই একটি মোক্ষম আঘাতে তুমি লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। শয়তানী খেলা তোমার ঘুচিয়ে দেব এক মুহূর্তে।

কথা কটি ভাবার যেটুকু অপেক্ষা, তারপরই সেকেন্ড দুয়েকের মধ্যে অনেকগুলি কাজ হয়ে গেছে পর পর—বাঁ হাতের পেপার-ওয়েট চলে এসেছে আমার ডান হাতের মুঠোয়, আমি টিপ করে নিয়েছি নির্ভুলভাবে, সজোরে সেই পেপার-ওয়েট ছুঁড়ে দিয়েছি ওর মাথা লক্ষ্য করে এবং—

এবং সেই পেপার-ওয়েট এমনভাবে বেড়ালটার মাথা ভেদ করে আছড়ে গিয়ে পড়েছে দেওয়ালে যেন ওখানে কিছু ছিলই না আদৌ।

হতভম্বের মতো দাঁড়িয়েছিলাম আমি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি কি ভুল দেখলাম। পেপার-ওয়েট কি লাগেনি শয়তানটার মাথায়?

অসম্ভব! হতেই পারে না এটা। টেবিলল্যাম্পের আলো এখন প্রায় সোজাসুজি গিয়ে পড়েছে ওটার গায়ে, এই অবস্থায় ভুল আমি দেখতেই পারি না। তাছাড়া এতো কাছাকাছি আমি অতো বড়ো একটা জানোয়ারকে টিপ করতে পারবো না, এ ব্যাপারটা আমায় যারা একটুও চেনে তারা কেউ বিশ্বাস করবে না।

তাহলে! বেড়ালটা কি তাহলে সত্যি বেড়াল নয়! ওটা কি তাহলে—

বুকের রক্ত হঠাৎ কেমন হিম হয়ে উঠলো আমার। সেইজন্যেই কি ওটা ঘরের মধ্যে একেবারে শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়েছিল! সেইজন্যেই কি ওরকম কোনো বেড়াল জীবনে কখনো দেখিনি আমি! সেইজন্যেই কি এতো ভারী একটা জিনিস ওর শরীর ভেদ করে—

আমার শরীরটা কেমন কেঁপে উঠলো একবার। সেইজন্যই কি কালো বেড়ালটা থেকে সাবধান থাকতে বলেছিল আমায় সুদীপ? ও তো বাদুড়টার কথাও বলেছিল! বাদুড়টাও কি তাহলে ওই ধরনেরই কোনো জীব? সুদীপ কি তাহলে ওদের ভয়ে—

আমার গলাটা কেমন শুকিয়ে আসছিল। শরীরে যেন একবিন্দু শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। কোনোরকমে ঘাড় ঘুরিয়ে যেটুকু দেখতে পেলাম তাতে আমার মাথার ভেতরটা যেন কেমন করে উঠলো।

বাদুড়টা নেমে পড়েছে সিলিং ফ্যানের ব্লেডের ওপর। ওটাকে আমি এখন মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। যতোটা বড়ো ভেবেছিলাম ততোটা বড়ো না হলেও এখন আমি ওর কুচকুচে কালো শরীর দেখতে পাচ্ছি, ছোট্ট দুটো কান আর ছোট্ট অথচ তীব্র দুটো চোখ দেখতে পাচ্ছি, আর দেখতে পাচ্ছি পায়ের বীভৎস নখগুলোকে।

আমি ওইভাবে তাকিয়ে থাকার মধ্যেই রক্তচোষা বাদুড় হঠাৎ ডানা ঝাপটে উঠেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর একটা হিমশীতল স্পর্শ আমি অনুভব করেছি। ঠিক এর আগের মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল একটা কালো চাদর যেন কেউ ছুঁড়ে দিচ্ছে আমার দিকে!

বুঝতে পারিনি বাদুড়ের এক তীব্র দংশন আমার মুখের কোথাও আঁকা হয়ে গেছে। বুঝলাম, যখন আমার অসাড় হাত ধীরে ধীরে মুখ পর্যন্ত উঠেছে, হাতে একটা চটচটে তরলের অস্তিত্ব আমি অনুভব করেছি এবং হাত নামিয়ে দেখতে পেয়েছি সেটার রং লাল।

আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলেই আমি মরে যাবো। চিন্তাটা আমার মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে উঠে দাঁড়িয়েছি।

কিন্তু বড়ো দেরি হয়ে গিয়েছিল। কালো শয়তানটা এই দ্বিতীয়বার আমায় লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিয়েছে।

জানি না সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যাবার পরেও মানুষ কোথা থেকে বাড়তি শক্তি যোগাড় করে আনে! নিজেকে সরিয়ে নেবার ক্ষমতা আমার এবার ছিল না ঠিকই, কিন্তু দু'হাত তুলে তাকে আমি আটকাতে পেরেছি।

একরাশ কালো ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে হাত চালালে যে অনুভূতি হয়, ঠিক সেই অনুভূতি! অথচ কি বিশাল তেজ তার! টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়েছি আমি।

অবাক হতেও যেন ভুলে গিয়েছিলাম আমি এখন। কারণ আমি দেখতে পেয়েছি কালো শয়তানটার দুটো আগুনে চোখ আমার দিকে তাগ করা। যে-কোনো মুহূর্তে আবার ওটা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমার ওপর।

তবে আরো বীভৎস একটা ব্যাপার শুরু হয়ে গিয়েছে তার আগেই। রক্তচোষা বাদুড় সহসা ডানা ঝাপটে অশান্ত হয়ে উঠেছে। ঘরময় দাপাদাপি করতে শুরু করেছে। এক-একবার নেমে আসছে নিচের দিকে, ঠিক যেন ছোবল মেরে যাচ্ছে শরীরে। পরমুহূর্তেই তীক্ষ্ণ এক যন্ত্রণা ছড়িয়ে যাচ্ছে স্নায়ুকোষে। আবার সেই অশান্ত চক্কর, আবার চকিত নেমে আসা, আবার সেই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা—

উন্মাদের মতো টলতে টলতে আমি এবার উঠে দাঁড়িয়েছি। আমাকে পালাতে হবে, এই একটা চিন্তাই শুধু আমাকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি যুগিয়েছে। কিন্তু ব্যালকনির দরজার দিকে তাকিয়ে আমার পালাবার সেই শেষ সম্ভাবনাও অন্তর্হিত হয়ে গেল।

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখাটাই যেন মুছে গিয়েছে আমার কাছে, তা নইলে একটা বেড়াল কেমন করে দরজা আটকাবার মতো অবিশ্বাস্য আকার বানিয়ে তুলতে পারে নিজের, সে কথাটা নিশ্চয়ই আমার মনে হতো। সে সব প্রশ্ন কিন্তু আমার মনে ওঠেনি। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম তার পিঠটা অসম্ভব উঁচু হয়ে প্রায় একটা সিংদরজায় পরিণত হয়েছে, সমস্ত গায়ে সজারুর মতো কাঁটা এবং মুখের আওয়াজটা এখন প্রায় হুঙ্কার।

সবচেয়ে তীব্র এবং ভয়ঙ্কর এখন তার চোখ দুটো—আরো যেন প্রখর হয়ে উঠেছে, আরো হিংস্র এবং বিধ্বংসী। আমাকে এগুবার সুযোগ না দিয়ে সেটাই এক পা এগিয়ে এলো সামনে।

পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না আমার। অথচ আমি জানতাম পিছিয়ে গেলেই আমায় কোণঠাসা করে ফেলবে শয়তানটা। তারপর ওই রক্তচোষা বাদুড় আর এই শয়তানে মিলে আমায়—

না, তা আমি হতে দেব না, কক্ষণো না। আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। পালাতে হবে আমাকে, ওই ব্যালকনির রাস্তা দিয়েই। যদি বাধা পাই আমি তো অন্তত চিৎকার করতে পারবো, চিৎকার করে ওদের জাগাতে পারবো, তাহলেই তো—

মরীয়া হয়ে দু'পা এগিয়ে গেলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে কী যে একটা হয়ে গেল ভালো বুঝতে পারলাম না।

বাদুড়ের চিৎকার আমি কখনো শুনিনি, কিন্তু সেই অলৌকিক, তীক্ষ্ণ শব্দটা আর কার গলা দিয়ে বার হতে পারে! সেই সঙ্গে কালো বেড়ালটা এক বিশাল শরীর নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে আমার ওপর। চোখের সামনে নিবিড় অন্ধকার, সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠেছে আমার, কাঁধের ওপর তীক্ষ্ণ নখ বসে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি, আর আমার চেতনা লুপ্ত হয়ে আসার মুহূর্তে এবার আরো একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেল।

অকস্মাৎ যেন মন্ত্রবলে হালকা হয়ে গেল আমার বুকের ওপরের ভারটা। যে কালো শয়তানটা প্রায় ভালুকের আকৃতি নিয়ে আমায় ছিঁড়ে খেতে এসেছিল, কেমন একটা বিশীর্ণ ভয়ে সিঁটিয়ে সে এখন ছিটকে গেছে আমার কাছ থেকে। বাদুড়ের তীক্ষ্ণ আওয়াজ এবং ডানা ঝটপটানিও যেন সেই যাদুমন্ত্রেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। এ সমস্ত অঘটনের কারণটা জানবার জন্যে ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়েই আমার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে।

সুদীপ। ভেতরের দরজার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত একটা ভঙ্গি তার মুখেচোখে।

কী করে সুদীপ এলো ওখানে? দরজা তো আমি নিজে হাতে বন্ধ করেছি! সুদীপকে দেখে কালো শয়তানটা এরকম মিইয়েই বা গেল কেমন করে! রক্তচোষা বাদুড় এখন দিনের চামচিকের মতো নির্জীব কেন!

প্রশ্নগুলো করার আগেই কিন্তু সুদীপের মুখচোখের ভাব পালটে গেছে। মুখচোখ কঠিন হচ্ছিলো তার। কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলো, 'তোকে আমি বারণ করিনি! কেন তুই নিতে গেলি ওটা, কেন?'

কী নিয়েছি বুঝতে পারছিলাম না, গলা দিয়ে আওয়াজও বেরুচ্ছিল না কোনো। বোধহয় আমার মুখচোখের ভাব দেখেই বুঝতে পারছিল সুদীপ, আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, 'আমার আংটি তুই কেন পরতে গেলি?'

আংটি! এতোক্ষণে আমার মনে পড়লো মেঝেয় কুড়িয়ে পাওয়া আংটির কথা। হাতের দিকে চেয়ে দেখলাম আমি। কখন যে আংটিটা নিজের আঙুলে গলিয়ে ফেলেছি মনেই নেই আমার।

'খুলে দে, খুলে দে বলছি শীগগির।' চিৎকার করে উঠলো সুদীপ। আমি তাড়াতাড়ি আংটিটা খুলে ওর দিকে এগিয়ে দিতেই কেমন চুম্বকের টানের মতো আংটিটা যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল আমার হাত থেকে।

সুদীপ আংটিটা পেল কিনা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আংটিটা আমার হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদীপের কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন পালটে গেল। কথা বলছিল সামনে দাঁড়িয়ে, অথচ আমার মনে হচ্ছিলো গলাটা যেন ভেসে আসছে অনেক, অনেক দূর থেকে।

'না জেনে কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলি তুই জানিস না—' সুদীপের মুখটা এখনো ছায়ায়, ভালো দেখতে পাচ্ছি না আমি, ও বলছিল, 'কী করেছে জানিস ওরা আমার? দেখবি, তুই দেখবি?'

পায়ে পায়ে সুদীপ এগিয়ে আসছিল। আলোটা পেছনে থাকায় ওর মুখটায় ছায়া পড়ে যাচ্ছিলো। সেটা তো একটা অস্বস্তির ব্যাপার বটেই, কিন্তু আরো অস্বস্তি লাগছিল, যখন একটা বিশ্রী মাংসপচা গন্ধ আমার নাকে এসে লাগলো। গন্ধটা যেন উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিলো।

চোখ খুলে আমি তাকাতে পারছিলাম

না। শেষ পর্যন্ত সুদীপ যখন একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বলে চলেছে, 'দেখ, ভালো করে দেখ আমাকে—কী অবস্থা করেছে আমার দেখ'—তখন চকিতে একবার মুখ তুলেছি আমি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এসেছে আমার বুক চিরে।

টলে পড়ে যাচ্ছিলাম আমি। কোনো রকমে চৌকির কোনাটা ধরে সামলে নিয়েছি। আমার মাথা ঘুরছিল, পেটের মধ্যে মুচড়ে সমস্ত কিছু উঠে আসতে চাইছিল। আর সেই সঙ্গে বেশ বুঝতে পারছি মাথা থেকে একটা বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা স্রোত ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে শিরদাঁড়া বেয়ে, নিচে, আরো নিচে—

চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম আমি, কিন্তু যা দেখার তার মধ্যেই দেখে নিয়েছি আমি।

সুদীপের বাঁ চোখটা দেখা যাচ্ছে না, সেখানে একটা বিশাল গহ্বর।

সমস্ত মুখে জ্যামিতির আঁকিবুকির মতো অজস্র কাটা দাগের সরলরেখা।

গলার কাছটায় একটা গভীর ক্ষত, সেখানটা দগদগে লাল রঙের হয়ে রয়েছে। 'কীরে, দেখবি না? ভালো করে দেখ—'

কে যেন জোর করে আমার মুখটা ওপরে তুলে ধরলো। চোখের সামনে ঘরটা দুলে উঠলো আমার। দেয়াল যেন কেঁপে গেল। চোখের সামনে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে সুদীপ কেন, একটা মানুষ ভাবতেই আমার কষ্ট হচ্ছিলো। হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়েছিল আমার চোখের সামনে। সমস্ত হাত খর গ্রীষ্মের মাঠের মতো ফুটিফাটা। ফাটা দাগগুলো বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

সুদীপ হাসছে। অদ্ভুত ধরনের একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে তার গলা দিয়ে।

চোখের সামনে সুদীপের রক্তাক্ত হাত দুটো আরো চিড় খেয়ে যাচ্ছে—দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, ফটফট করে শব্দ হচ্ছে।

কী করে সরে আসতে পেরেছিলাম জানি না, কেমন করে ব্যালকনিতে পৌঁছেছি জানি না। শরীরটাকে কোনোরকমে হিঁচড়ে টেনে এনে ব্যালকনির ওপর থেকে নিচে ছেড়ে দিয়েছি, এইটুকু শুধু মনে আছে। চেতনার শেষ মুহূর্তে জেগে ছিল সুদীপের অদ্ভুত ধরনের হাসি, কালো বেড়ালের আওয়াজ আর বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

জ্ঞান হতে নাকি আমার পুরো তিন দিন সময় লেগেছিল। কিন্তু তখনও সুপার কিছু বলেননি আমাকে, বলেছিলেন আরো সপ্তাহ দুয়েক পরে। আমি যেভাবে লাফিয়ে পড়ি, আধঘণ্টা আগে সুদীপও সেইভাবেই লাফিয়ে পড়েছিল। আমি যখন ঘরে ঢুকেছি, উনি তখন সুদীপকে নিয়ে ওখানকার হাসপাতালে। যমে-মানুষে লড়াই চলছে তখন। তার মধ্যে একটু জ্ঞান পেয়ে সুদীপ বলেছিল, আগের দিনই বাবা তাকে ওই আংটিটা দিয়ে গেছেন। মিশরের এক ফারাওয়ের সমাধি থেকে উদ্ধার করা আংটি। সেই আংটি পরার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি অলৌকিক ওই কালো বেড়াল আর বাদুড়ের আক্রমণের সামনে পড়তে হয় তাকে। এর বেশি কিছু সুদীপ বলতে পারেনি, রাত ঠিক বারোটা দশ মিনিটে সুদীপ মারা যায়।

সুপারকে আমি কিছু বলিনি—সুদীপ যে আমাকে কেমন করে সাবধান করে দিয়েছিল সেটাও না, কেমন করে বাঁচিয়ে ছিল সেটাও না। কেবল সুপারের কথাগুলো শোনার সময় হঠাৎ নিজের হাতঘড়ির দিকে নজর পড়ে গিয়েছিল আমার। সুদীপকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। হাতটা মেঝেতে আছড়ে পড়ে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কাচটাও ফেটে গিয়েছিল। বন্ধ হয়েই আছে ঘড়িটা এখনো। সময় বারোটা দশ।

ছবিঃ অমিত চক্রবর্তী

নানা স্বাদের বই

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কেল্লা রহস্য ১২.০০
ভাঙা বাড়ির রহস্য ১৪.০০
জঙ্গল রহস্য ১৮.০০
পাতালঘর রহস্য ২০.০০
সুড়ঙ্গ রহস্য ২০.০০
তীরন্দাজ ১২.০০
মুখোশ ১৬.০০

গৌরী দের
রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প ২৪.০০
গা ছমছমে ভূতের গল্প ২২.০০

শিশির কুমার মজুমদারের
অমাবস্যার রাতে ২৫.০০

মানবেন্দ্র পালের
আতঙ্ক ৩৫.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর
অদ্ভুত যত ভূতের গল্প ২৬.০০

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গুহা মন্দিরের দেবী ২৮.০০
(বৈষ্ণোদেবী পরিক্রমা)

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আজব দেশে বুম্বাই ১৪.০০

জ্ঞানাচার্য শর্মার
বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৪.০০

ভিক্ষু বুদ্ধদেবের
বুড়োর শুধু খাই খাই ৭.০০

প্রণবেশ চক্রবর্তীর
এই বাংলায় (১ম ও ২য়) প্রতিটি ৩৫.০০

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এই কলকাতায় ১২.০০

রাধারমণ রায়ের
কলকাতা বিচিত্রা ৫০.০০

ডঃ বাসন্তী চৌধুরীর
সঙ্গীত দর্শন (১ম) ২০.০০

প্রসাদ সেনের
রবীন্দ্রসঙ্গীতে মিলন মেলা ৩০.০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১ ঝামাপুকুর লেন □ কলকাতা-৯

অপারেশন এক্স

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

সোফায় বসে সিগ্রেট ধরালো কর্নেল ব্যান্ডো। ছিপছিপে চেহারায় ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা। উজ্জ্বল চোখ দুটোয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি।

অ্যাশট্রে এগিয়ে দিয়ে পিটার হাসলো, দাদা মাস দুয়েক আগে মারা গেছেন। এয়ারফোর্সের দুর্ধর্ষ বৈমানিক ছিলেন। যুদ্ধবিমান ছিল হাতের খেলনা। হি ডায়েড আনসীন এন্ড আনসাঙ্গ। এমনই হয়। এয়ার কমোডর রনি ডিমেলোকে ভুলে গেছে ফৌজি দপ্তর। পিটারের কণ্ঠে ঘন বিষণ্ণতা, তবু আমি খুশি কর্নেল, দাদা ছিলেন আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনি তার খোঁজ নিতে এসেছেন। বলতে বলতে চুপ করে গেলো পিটার ডিমেলো।

ওদের বংশে ফৌজি রক্ত। রনির বাবা সানি ছিলেন বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। ঠাকুর্দা জনি ডিমেলো এয়ার ভাইস মার্শাল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্বনামধন্য অফিসার, ভিক্টোরিয়া ক্রসে সম্মানিত বায়ুসৈনিক।

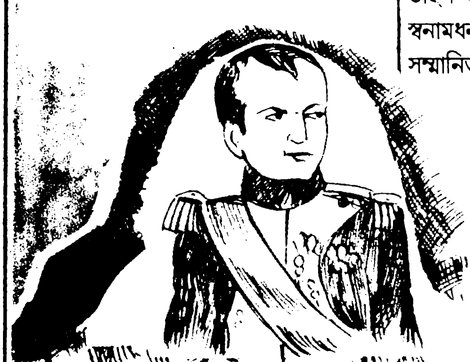

সিগ্রেট নিভে গেছিল, লাইটারে ধরালো ব্যান্ডো, সঙ্গে মিষ্টি জলতরঙ্গের বাজনা। তাকিয়ে আছে পিটারের দিকে—বলিষ্ঠ চেহারা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, পরনে ড্রেসিং গাউন। চশমা খুলে সেন্টার টেবিলে রাখে পিটার, দাদার অসুখের খবর পেয়ে ছুটে এসেছি। কিন্তু কদিনই বা সময় পেলাম। দিন সাতেকের মধ্যে সব শেষ—কলেরায় মারা গেলেন। চেষ্টার ত্রুটি করিনি, বড় শ্বাস ফেললো, আমি এডুকেশন কোরে রয়েছি। লিয়েন সার্ভিসে বাইরে। গাল্ফ কান্ট্রির বিভিন্ন য়ুনিভার্সিটিতে পড়াই—সাবজেক্ট হিস্ট্রি, নেপোলিয়ন।

এসব কথা কানে ঢুকছিল না ব্যান্ডোর। কর্নেল আসলে সামরিক বিভাগের নামকরা গুপ্তচর, সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ এন্ড অ্যানালিটাক উইং 'র'তে কর্মরত। সতর্ক চোখে ঘরটা দেখছিল। বসবার ঘর যেমন হয়। সাজানো-গোছানো। সোফা সেট, লম্বা টানা কাচের আলমারি, শো পিস। ওপরে পর পর ছবি—সামরিক পোশাকে ডিমেলো বংশের তিন পুরুষ। এখন বাবার পাশে ফটো হয়ে হাসি হাসি মুখে রনি। সামনের দেয়ালে মস্ত বড় অয়েল পেন্টিং-এ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। রনির হিরো। বাঁ দিকের দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যীশু, পাশে মা মেরীর প্রতিমূর্তি। ঘরে ধূপ জ্বলছিল—আবহাওয়া কেমন গম্ভীর। ডিমেলোরা বাঙালী ক্রিশ্চান—ক্যাথলিক। বারাসাত ছাড়িয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়ে দৌড়ে গেছে টাকি রোড বাংলাদেশ বর্ডারের দিকে। এই রাস্তার পাশে একটু ভেতরে গির্জার পেছনদিকে ওদের বাড়ি। হাত-পা ছড়ানো মস্ত কম্পাউন্ড, নাম সেন্ট হেলেনা। ব্যান্ডোর চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই নির্জন দ্বীপ—যেখানে বন্দী ছিলেন পরাজিত নির্বাসিত সম্রাট। চারদিকে সমুদ্র, তীরে আছড়ে পড়ছে ঢেউ আর ঢেউ। নীল শুধু নীল। এই বাড়ির নামে নাম—সেন্ট হেলেনা। আর এখানে অ্যানুয়েল লিভে এসে মারা গেল রনি, সম্রাটের মতন। ব্যান্ডো ছবির দিকে তাকিয়ে কত কি যেন ভাবছে।

পিটার বললো, নেপোলিয়ন শুধু দাদার নয়, আমারও হিরো। শুনে খুশি হবেন গবেষণা করে একটা বই লিখেছি—'নেপোলিয়ন দ্য গ্রেট'। দেশে-বিদেশে সামরিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হচ্ছে।

জানি মিঃ পিটার। রনি ছিল আমার ফার্স্ট ফ্রেন্ড, ওর মুখে বইটার কথা শুনেছি। রাশিয়া থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছিল। তারপরই ছুটিতে এখানে। ফি বছর আসতো। আমিও অনেকবার এই বাড়িটায় এসেছি। থেকেছি ওর সঙ্গে।

আপনিও আসতেন?

হ্যাঁ, আমি। আপনার জানার কথা নয়। বাইরে থাকতেন বেশির ভাগ। এবার অনেক বছর পর ফিরলেন। তাই না?

শূন্য দৃষ্টি পিটারের, ইয়েস কর্নেল, আট বছর।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ব্যান্ডো। রনি এ জায়গাটা মনের মতো সাজিয়েছিল। বলতো, রিটায়ার করে নিজেকে গুটিয়ে নেব সেন্ট হেলেনায়। লেখাপড়া, বই আর কুকুর নিয়ে সময় কাটাবো।

আগ্রহ বাড়ে পিটারের, কুকুর কেন?

ব্যান্ডো হাসলো, ওর পোষা কুকুরের নাম লাকি, প্রভুভক্ত ডোবারম্যান। এখানে লাকিকে নিয়েই মেতে থাকতো। ও ফিরে গেলে সকাল-বিকাল বাড়ির গেটের সামনে অপেক্ষা করতো লাকি, মাসের পর মাস। রনি ছুটিতে এলে ওর আনন্দ দেখে কে। রনি বলতো, বই, গাছগাছালি আর কুকুর মানুষের প্রকৃত বন্ধু। কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। মানুষের শত্রু মানুষ নিজে।

এবার আসল কথায় আসি। আমি এখানে এসেছি দিল্লীর নির্দেশে। আমাদের সন্দেহ রনির মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।

চমকে উঠলো পিটার, সন্দেহের কারণ?

ওর মতো দুর্ধর্ষ বৈমানিক মারা গেলে শত্রুপক্ষের লাভ, আমাদের ক্ষতি—তাই।

একথা আমিও ভেবেছিলাম কর্নেল ব্যান্ডো। গির্জার ফাদার এলবার্টের মেসেজ পেয়েই ছুটে এসেছি। কিন্তু দাদার মৃত্যু হয়েছে আন্ত্রিক রোগে। ন্যাচারাল ডেথ, ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। তবুও আমি পোস্টমর্টেম করিয়েছিলাম। জানি মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। সেই রিপোর্টেও কিছু নেই।

আমরা ফৌজি। উই ডোন্ট বিলিভ রিপোর্ট অব দ্য সিভিলিয়ন ডক্টরস, কবর থেকে ডেডবডি তুলে এনে আমরা দেখব। পোস্টমর্টেম করবেন আমাদের এ এম সির বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা।

বলেন কী! চমকে উঠলো পিটার, না ব্যান্ডো, মাটির তলা থেকে দাদার ডেডবডি—সে আমি সইতে পারবো না। কঙ্কাল হয়ে গেছে এতদিনে। মাস দুয়েক হয়ে গেল।

হাঁ, কঙ্কালটাই পরীক্ষা করব আমরা। তার ওপর আর্মি বিশেষজ্ঞরা বসিয়ে দেবেন নকল মাংসপেশী, মুখ। দেখলে মনে হবে জীবন্ত।

তাতে লাভ?

মিঃ পিটার, প্লীজ ডোন্ট গেট আপসেট। আজকাল স্বনামধন্য লোকদের কবর দেওয়ার বদলে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মৃতদেহ প্রিজার্ভ করা হচ্ছে, মিশরের মমির মতো। লেলিনের কথা নিশ্চয়ই জানেন। কাচের বাক্সে শুয়ে আছেন। মনে হয় ডাকলেই উঠে বসবেন। পুনেতে আর্মড ফোর্স মেডিক্যাল কলেজের মিউজিয়ামে রনির মতো বীরদের মমি করে রাখব আমরা, ফর ইনসপিরেশন অব ইয়ঙ্গার জেনারেশন। তাছাড়া কাচের জারে স্পেশিমেন হিসেবে থাকবে স্মৃতিস্মারক, প্রয়াত হিরোদের চুল, নখ। ভুললে চলবে না, দে গেভ দেয়ার লাইভ্স ফর আওয়ার বেটার টুমরো।

এখন ফৌজি কর্তৃপক্ষ যা ভাবছেন, একশ বছর আগে ডিমেলো পরিবার সে কথা চিন্তা করেছিল। এই যে, শো-পিসের দিকে তাকান, পর পর তিনটে কাচের জার। ভেতরে রয়েছে সামরিক পোশাক পরা পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ—সঙ্গে মাথার চুল আর নখ। রনি, বাবা, ঠাকুর্দার। কফিনে ঢোকাবার আগে স্মৃতিচিহ্ন আমরা রাখি, পারিবারিক প্রথা আমাদের।

দুঃখ লাগে পিটার, বড় মাপের মানুষগুলোর ছবি ছোট কাচের জারে—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো ব্যান্ডো। এগিয়ে গিয়ে বাজপাখির দৃষ্টিতে

দেখছিল, আমি জানি মিঃ পিটার। আপনাদের ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনের কথা রনির কাছে শুনেছি। দেখে খুশি হলাম, রনির চুল আর নখও রয়েছে। এগুলো আমাদের দিন। সযত্নে মিউজিয়ামে রাখবো।

দীর্ঘশ্বাস পিটারের, পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন কেই বা হাতছাড়া করতে চায়, তবে যখন বলছেন নিশ্চয়ই পাবেন। তিনটে কাচের জার নামিয়ে সেন্টার টেবিলে রাখলো।

ব্রিফকেস থেকে ফাইল বার করলো ব্যান্ডো, ওপরে লেখা অপারেশন এক্স।

পিটার অবাক, অপারেশন এক্স কেন?

হো হো করে হাসলো কর্নেল, লাইটারে সিগ্রেট ধরালো, সেই টুংটাং সুরেলা আওয়াজ—এক্স মানে অজানা। রনি ডিমেলো ছিল এয়ার কমোডর, তার মৃত্যুটা আমাদের কাছে রহস্যের মতো। সেই জন্যে গোয়েন্দা বিভাগের নতুন ফাইল 'অপারেশন এক্স'।

এই ব্যাপারে আপনাকে আমিও সাহায্য করতে চাই কর্নেল সাব, আমার ফাইল আপনাকে দিচ্ছি, ভেতরে রয়েছে দাদার ডেথ সার্টিফিকেট, অসুখের বিবরণ, সঙ্গে আমার ডায়েরি। এতে পাবেন শেষ সাতদিনের কথা। আলমারি থেকে ফাইল আর ডায়েরি বার করে জারগুলোর পাশে রাখলো পিটার।

রক্তের রঙ লাল?

ডাক্তারি রিপোর্ট আর ডায়েরিতে চোখ বুলোচ্ছে ব্যান্ডো। বাকরুদ্ধ কণ্ঠস্বর পিটারের, এই মস্ত বাড়িটা আর ভালো লাগে না। দাদার স্মৃতি আমায় সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়ায়। এখানে আমরা মাত্র দুজন। আমি আর পরিচারক যোশেফ। আমার সিকিউরিটি কাম বডিগার্ড বলতে পারেন। গির্জার ফাদার অনুগ্রহ করে য়োশেফকে দিয়েছেন। আর আছে লাকি, দাদার প্রিয় ডোবারম্যান।

লাকি! চোখ দুটোয় আনন্দ ব্যান্ডোর, সাড়াশব্দ পাচ্ছি না যে! আগে দেখলেই ছুটে আসতো, লাফ দিয়ে জড়িয়ে ধরতো।

বিমর্ষ গলা পিটারের, দাদা চলে যাবার পর খেতেই চায় না, দিনরাত বসে আছে কবরের পাশে। আমায় দেখলে তাড়া করে, দাদাকে মাটির তলায় রাখতে দিচ্ছিলো না। হয়তো ভাবে জোর করে শুইয়ে দিয়েছি, মাটি খুঁড়ে দেখতে চায়।

ব্যান্ডো নিরুত্তর। তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। এখন মে মাস। দুপুরের বাতাসে আগুনের হলকা। কিন্তু এ জায়গাটা খোলামেলা। গরমের তেজ কম। পাঁচিল ঘেরা চকচকে ঝকঝকে বাড়ি, রনির ড্রিম হাউস—সেন্ট হেলেনা। অন্যদিকে পারিবারিক সমাধিস্থল। শান বাঁধানো বেদী—পাথরের ক্রস। শিলালিপিতে পরিচয়। জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। সামনে ফৌজি প্রথায় মাটিতে গেঁথে আছে বেয়োনেটের ফলা—উল্টানো রাইফেলের হাতলের মাথায় হেলমেট। সামরিক শোক চিহ্ন—লাস্ট স্যালুট।

কর্নেলের থমথমে গলা, এয়ার কমোডর ডিমেলোকে ভুলে গেছে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স—এ ধারণা ঠিক নয় মিঃ পিটার। মৃত্যুসংবাদ আমরা দেরিতেই পেয়েছি। কাছেই কলকাতা—কমান্ড হসপিটাল, সেখানেও নেওয়া হয়নি। যাকৃগে বোধহয় সময় পাননি। কিন্তু মরণোত্তর সম্মান জানাবো আমরা। ডেডবডি তুলে এনে কাটা ছেঁড়া হবে—সেটা ডাক্তারদের ব্যাপার, অপারেশন এক্স-এর একটা দিক। অপরদিকে ফৌজি কায়দায় সমাধি দেব—জোয়ানরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে উইথ 'রিভার্স আর্ম'—শূন্যে ছোঁড়া হবে গুলি, থার্টি গান স্যালুট। বিউগলে বাজবে বিদায়ের করুণ সুর, মাটি ছড়িয়ে দেবেন স্বয়ং এয়ার মার্শাল—বায়ুসেনার সর্বাধিনায়ক।

কথায় বাধা পড়লো। যোশেফ ঘরে ঢুকলো। হাতে ট্রে—কোল্ড ড্রিঙ্কস, গ্লাস। পিটার ড্রিঙ্কস গ্লাসে ঢেলে কাচের জারগুলো সরিয়ে এগিয়ে দিলো, নিন, গলা ভিজিয়ে নিন ব্যাণ্ডো সাহেব। বড্ড গরম। অনেকক্ষণ এসেছেন, ভালো লাগবে।

থ্যাঙ্কস্, গ্লাসে চুমুক দিল, ফটো সহ জারগুলো ভালো করে দেখছে, আশ্চর্য! রনির চুল এই জারে—সত্যি? ধবধবে সাদা চুল। অথচ ঘন কালো চুল ছিল ওর।

সেটাই আশ্চর্য। হঠাৎই যেন সব চুল পেকে গেছল রনিদার। এই নিন, জারটা হাতে তুলে দিল পিটার, ভালো করে দেখুন।

তাড়াহুড়োয় ভুল করেছেন পিটার সাব, এটাতে আপনার ঠাকুর্দার ছবি রয়েছে। ঘুরিয়ে দেখালো। আসল কথা মন খারাপ হলে যা হয়, ফটোটা না দেখলে আমারও ভুল হতো। এই যে এটা রনির স্মৃতি-স্মারক কাচের স্পেশিমেন বাক্স, সঙ্গে ছবি। চুলগুলো পাকা—অন্য দুটোয় তা নয়—পূর্বপুরুষ দুজনের আই মিন রনির ড্যাডি এন্ড গ্রান্ডপার হেয়ার ব্ল্যাক। অবশ্য অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁদের। বীর যোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন।

ব্যান্ডোর কথা শুনতে শুনতে করুণ হয়ে উঠছে পিটারের চোখ-মুখ। এবারে প্রসঙ্গান্তরে আসতে চাইলো সে, আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে, আপনি বরঞ্চ ফাইল আর আমার দেওয়া ডায়েরিটায় চোখ বুলোন। আমার লেখা এই বইটাও পড়তে পারেন। চলুন, ওপরের গেস্টরুমে, রিলাক্স করবেন।

বইটা হাতে নিল কর্নেল। ফরেন পাবলিকেশন। দুর্দান্ত গেট আপ, সুন্দর ছাপা। মিঃ পিটার, বইটার দাম কত বলুন, কিনব। রনির মুখে বইটার কথা শুনেছি।

কিনবেন কেন? একটা কপি আমি

আপনাকে দিচ্ছি, উইথ কমপ্লিমেন্টস। দিন সই করে দিই, ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত দিয়ে ডট পেন বার করলো পিটার।

না, না, নীল কালিতে নয়, ব্রিফকেস খুলে একগাদা পেন মেলে ধরলো ব্যান্ডো, পেন জমানো আমার হ্যাবিট। এই নিন লাল পেন। রক্তের অক্ষরে লিখুন, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য সৈনিকদের ধমনীতে টগবগ করে ফুটছে ফৌজি রক্ত।

হাসলো পিটার, মলাট উল্টে প্রথম পাতায় খসখস করে লিখলো কর্নেলের নাম, তলায় স্বাক্ষর—পিটার ডিমেলো।

খুশির গলা ব্যান্ডোর, দেখুন পিটার সাব, সাদা পাতায়, আই মিন হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে রেড লেটার, লাল হরফে আপনার সুন্দর সই। দারুণ কন্ট্রাস্ট, সো প্রমিনেন্ট তাই না?

হ্যাঁ, লাল কালিতে লেখা, আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের চিহ্ন।

হঠাৎ হো হো করে উঠলো ব্যান্ডো, ধরা পড়ে গেলেন পিটার, আপনি কালার ব্লাইন্ড, রঙ চিনতে পারেন না।

ধেৎ, কী বলছেন আপনি?

ঠিকই বলেছি সাহেব, আই অ্যাম ডেফিনিট, সাদা চুল আই মিন রনির জারটা গুলিয়ে ফেলেছিলেন, ফটো দেখে সামলে নিলেন। দেখুন বই-এর পাতা, সাদা বললাম, মেনে নিলেন, ওটা কিন্তু সাদা নয়। ইচ্ছে করেই অন্য কালির পেন দিয়েছিলাম—ধরতে পারেননি। ওটা লাল নয়, কালো। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, অনেকের এরকম থাকে। বুঝতে দেয় না। খুঁত কেই বা জানাতে চায়।

পিটার চুপ।

কালার ব্লাইন্ডদের আর্মিতে নেওয়া হয় না—আপনি এডুকেশন কোরে রয়েছেন—টিচার। সিভিলিয়ান পোস্ট। আপনার ক্ষেত্রে ছাড়।

কাঁপা গলা পিটারের। ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি—কে আপনি?

পরিচয় ঠিকই দিয়েছি, আমার নিক নেম ব্যান্ডো। ফার্স্ট নেম সত্যজিৎ, সেকেন্ড নেম বন্দ্যোপাধ্যায়। খাঁটি বঙ্গ-সন্তান আপনাদেরই মতো। কর্নেল এস. বি. বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে হয়ে গেছি ব্যান্ডো।

পিটারের চোখ-মুখ শুকনো, মাই গুডনেস, আপনি সেই 'অপারেশন ঈগলের' দুর্দান্ত গোয়েন্দা! এয়ারপোর্ট হোটেলে জাল পেতে ধরেছিলেন মিসাইল বিজ্ঞানীদের হত্যাকারীকে! অভিনন্দন স্যার!

লাইটার-রহস্য এবং সংস্কৃত

ব্যান্ডোর মুখের হাসিটা কেমন যেন রহস্যময়। লাইটারের টুংটাং শব্দে সিগ্রেট ধরালো, মিঃ পিটার, একটু আগে প্রশ্ন করেছিলেন বার বার সিগ্রেট ধরাচ্ছি, দু' এক টান দিয়ে রেখে দিচ্ছি অ্যাশট্রেতে, নিভে যাচ্ছে আবার ঠোঁটে সিগ্রেট হাতে লাইটার। অবাক হয়ে গেছেন তাই না। রহস্যটা বলি।

নড়ে-চড়ে বসলো পিটার। বাইরে দুপুরের রোঁদ নরম হয়ে আসছে ক্রমে। পর্দা দুলিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকলো।

লাইটার জ্বাললো ব্যান্ডো, আলোর ঝলক। সঙ্গে শব্দ, বইটা সরিয়ে দাঁড় করালো ছোট টেবিলে। অপরদিকে সোফায় পিটার—ব্যগ্রতার চোখমুখ।

এবার দেখুন, আসলে এটা কিন্তু ট্রান্সমিটার, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, মিনি রেকর্ডপ্লেয়ার উইথ মাইক্রোফ্লিম। ভেতরে রয়েছে মাইক্রোটেপ, রিল। লাইটারের পেছন দিকে ছোট একটা বোতাম টিপতেই পিটারের টেপ করা কথা সব ভেসে উঠলো। ব্যান্ডো বললেন, জানেন পিটার সাহেব, লাইটারের আলোতেই প্রয়োজনীয় ছবি উঠে আসছে।

অস্ফুট কণ্ঠস্বর পিটারের, ফ্যানটাসটিক!

এবার কবজির ঢাউস হাতঘড়ির চাবিটা টান দিতেই বেরিয়ে এল অ্যান্টেনা, সঙ্গে পাতলা সরু তার, এটা মোবাইল ফোন। মাইক্রো সেট, ডায়ালের অক্ষরে চাপ দিতেই বিপ বিপ শব্দে রিং হচ্ছে কোথাও, মুখের কাছে ধরলো ঘড়িটা, ইয়েস দিস ইজ ব্যান্ডো। কোড অপারেশন এক্স। ক্যালকাটা কলিং—অ্যান্টেনার সরু তারের প্রান্তে ছোট্ট বোতাম—ইয়ার পিস। কানে গুঁজে কথা শুনছে। ভালো করে না দেখলে ধরে কার সাধ্যি! অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে কর্নেল। ভাষা বুঝতে পারছে না পিটার। তাকিয়ে রয়েছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

কী ভাষা ধরতে পারলেন না নিশ্চয়ই, সংস্কৃতে কথা বলছিলাম।

ইউ মিন স্যান্সক্রিট। আশ্চর্য!

ইয়েস, দেবভাষা। ঘড়িতেও টেপ হয়ে গেছে। আশ্চর্য হবার কথাই বটে। নিশ্চয়ই জানেন টেররিস্ট মোকাবিলায় ইজরায়েলের নো হাউ বিশ্ববিখ্যাত। আমাদের বন্ধু দেশ। ওখানকার সামরিক দপ্তর থেকে এক সাহেব এসেছেন। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত জুড়ে সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তাণ্ডবে সরকার হিমশিম। পেছনে রয়েছে পাকিস্তানের আই. এস, আই-এর মদত। ইন্ডিয়া ইজ গোয়িং টু বি আ সুপার পাওয়ার—ওরা ভয় পাচ্ছে। ইজরায়েলের সাহেব আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন, হাউ টু ট্যাক্‌ল দেম। ইংরেজি জানেন না, ওঁর ভাষা আমরাও বুঝি না। কিন্তু সংস্কৃত অনর্গল বলেন। ওখানে স্যান্সক্রিট স্কুলের পাঠ্য—আমারও প্রিয় ভাষা। কথাবার্তা সেই ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছিলো। এটা বর্ডার এরিয়া তাই। রনি সম্পর্কে অ্যাডভাইস নিলাম।

ওয়ান মিনিট প্লিজ, ঘড়িতে চাপ দিয়ে নম্বর মেলাতেই লালবাজার গোয়েন্দা সদর দপ্তর...গুড আফটার নুন কবিরুল সাহেব,...ইয়েস... কী বললেন ফ্যাক্সে বায়ুসেনার সদর দপ্তর থেকে এই মাত্তর খবর পেয়েছেন...থ্যাঙ্কস, স্টেট গভর্নমেন্ট হ্যাজ এগ্রিড ফর এক্সহিউমেশন অব ডেডবডি...নো ডিফিকাল্টি...আজ রাতেই পোস্টমর্টেম হবে। রাইট, আমি রনির চুল আর দাঁত সহ স্পেশিমেন জার পাঠিয়ে দিচ্ছি...কমান্ড হাসপাতালে...থ্যাঙ্কস মিঃ ইসলাম, ওভার।

পিটারের বিস্ময়ের কণ্ঠ, চুল আর দাঁত দিয়ে কী হবে?

জানি না, ওটা আর্মি মেডিক্যাল কোরের ব্যাপার। দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে মিলিটারি পুলিশ হ্যাজ মুভড্ অলরেডি টু কালেক্ট ইট ফর কমান্ড হসপিটাল।

সার্টিফিকেট

কথা শেষ হতে না হতেই এসে গেল

স্পেশাল মেসেঞ্জার। স্পেশিমেন নিয়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের গতিতে। বার বার ঘড়িতে সময় দেখছে পিটার। জিপের শব্দে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখলো, যোশেফ স্টিয়ারিং-এ বসে। আই অ্যাম অলরেডি লেট কর্নেল, মিঃ মালহোত্রা আমার লিগাল অ্যাডভাইসার, ওয়েট করছেন। অনেক দূরের পথ। এয়ারপোর্টের কাছে, যশোর রোড, ২নং গেট। ব্যাপারটা খুলে বলি, দাদার অবর্তমানে সমস্ত পারিবারিক সম্পত্তি, জমিজিরেত আমার ঘাড়েই চেপেছে। বাজার দর প্রায় কোটি টাকা। সাক্সেসন সার্টিফিকেট বেরিয়ে গেছে কোর্ট থেকে।

নিশ্চয়ই আপনার ফেবারে।

বংশে আর যে কেউ নেই। এসব নিয়ে কি করব? না, না, এদেশে থাকার ইচ্ছে নেই। প্রমোটারদের সঙ্গে কথা হয়েছে। দাদার স্মৃতি সেন্ট হেলেনা অক্ষত থাকবে—গাছগাছালি জংলা জায়গা সাফাই করে, পুকুর বুজিয়ে তৈরি হবে রনি হাউসিং কমপ্লেক্স। মধ্যবিত্তদের জন্য খুবই কম দামে বিক্রি হবে বাড়িগুলো। থাকবে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল। ফিরে যাবার আগে ফাইনাল করে যেতে চাই।

ব্যান্ডোর কণ্ঠে হতাশা, তার মানে বিজনেস? অনেক টাকা পাবেন।

উত্তর নেই পিটারের মুখে।

প্রমোটারকে না দিয়ে ডিফেন্স মিনিস্ট্রিকে দান করে দিন। যতদূর শুনেছি রনির তাই ইচ্ছে ছিল। আমরা পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে ফৌজি কলোনি বানাব। গাছগাছালি কাটবো না। গাছ আমাদের বন্ধু। এখানে তৈরি হবে মিলিটারি স্কুল, কম্যান্ডো ট্রেনিং সেন্টার।

ঠিক বলেছেন, আপনার কথা ভেবে দেখার মতো। আগে সাক্সেসন সার্টিফিকেট হাতে আসুক, তারপর দেখি কি করা যায়।

আবার ঘড়ি দেখলো পিটার, হর্ন দিচ্ছে যোশেফ, এক্সকিউজ মি কর্নেল সাহেব আমি সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরব। উঠে দাঁড়ালো রনির ভাই।

ব্যান্ডো উঠলো, জাস্ট আ মিনিট প্লিজ, মিঃ ডেভিড সুরিটা সাড়ে ছটায় আসবে খবর পাঠিয়েছে। আপনার সঙ্গে দরকার, ওয়েট করবে।

চমকে উঠলো পিটার, ডেভিড, কোন ডেভিড?

আপনি চেনেন নাকি?

না, না—নিশ্চয়ই আপনাদের ফৌজি লোক।

আমিও চিনি না। তবে আপনি এখানে পৌঁছুবার আগে হপ্তা তিনেক ছিল এ বাড়িটায়। ওর কাছে রনির অনেক খবর পাবো আশা করি।

গাড়ির হর্ন আবার, পিটার উত্তরে কি বললো, বোঝা গেল না।

চটপট ড্রেস চেঞ্জ করে তিনতলা থেকে নেমে এলো। ব্যান্ডো হাত নাড়ালো, বেস্ট অব লাক মিঃ পিটার, আমিও কাজে বেরোচ্ছি। পরে দেখা হবে। জিপ বেরিয়ে যেতেই ওয়াকি টকিতে কথা বলছে ব্যান্ডো, ফ্লাইট লেফটেনান্ট কাপুর, ক্যান ইউ হিয়ার মি...ইউ আর ওয়েটিং আউট-সাইড...ফলো দ্য জিপ...ছায়ার মতো লেগে থাক, ওর সঙ্গে, ওভার।

পিটার চলে যেতেই মাথায় একরাশ চিন্তা। নেপোলিয়নের ছবিটা দেখছিল। বাঁ দিকের দেয়াল আলমারির দিকে হঠাৎই নজর গেল। আগে এখানে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ভলিউমগুলো থরে থরে সাজান ছিল। রনির প্রিয় বই। কোথায় গেল? তার বদলে আলমারি ভর্তি নতুন বই—নেপোলিয়ন দ্য গ্রেট। কেন? হাতল টানলো, না—বন্ধ, চাবি দেওয়া। যে কোনো তালা খুলতে পারে কর্নেল। একটা সরু তারই যথেষ্ট। ডট পেনের রিফিল বার করে বিশেষ কায়দায় ঘোরাতেই খুলে গেল পাল্লা। একটা বইয়ের পাতা উল্টাতেই বিস্ময়ে হতবাক, সব বিদেশী টাকা—ডলার। পাতার পর পাতা উল্টে চলেছে ব্যান্ডো—খাঁজে খাঁজে ডলার আর ডলার। হাত বুলোতে মিহি পাউডারের মতো গুঁড়ো উঠে আসছে আঙুলে। পোকায় না কাটার জন্যে বিশেষ ওষুধ হয়তো। নোটের নাম্বারগুলো মনে হচ্ছে পরিচিত—পকেটের মিনি কম্পিউটারের মেমরি চালু করতেই বেরিয়ে এল খবর। ইন্টারপোলের মেসেজ—এ সবই ব্যাঙ্ক ডাকাতির অর্থ, মিলে যাচ্ছে নম্বর। সিঙ্গাপুর লয়েড ব্যাঙ্ক থেকে লুঠ হয়ে যাওয়া ডলার।

ব্রিফকেসের রহস্য

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো ব্যান্ডো। এখন বিকেল। চারদিকে বেলা শেষের আলোয় বিষণ্ণতার ঢল। আকাশে মেঘ। এলোমেলো হাওয়ায় গাছের মাথাগুলো দুলছিল। আম, জাম, হিজল, শিরিষ য়ুক্যালিপটাস। কবরখানার পাশে ফুটে আছে নানা রঙের মরসুমী ফুল। টাটকা তাজা বাতাস সুবাসে ভরপুর। ফুলে ফুলে প্রজাপতির ওড়াউড়ি। হাওয়ায় সঙ্গীতের সুর। সব শেষ হয়ে যাবে? বিক্রি হয়ে যাবে রনির সাধের সেন্ট হেলেনা! অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক চিরে।

হঠাৎ কোথা থেকে দৌড়ে এলো লাকি। ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিল এতক্ষণ। আগের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো, উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলো। ঈশ্! কত রোগা হয়ে গেছে লাকি! মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো কর্নেল, লাকি, মাই ডিয়ার বয়, মাই সান। লাকি মুখ ঘষছে ব্যান্ডোর বুকে, চোখ দুটোয় জল।

হাই সাটাজিত, মাই সান। কখন এলে?

এই নামে আজকাল কেউ ডাকে না। কে? চমকে পেছন ফিরে দেখে ফাদার এলবার্ট, ছেলেবেলাকার স্কুলে প্রিন্সিপাল ছিলেন, রিটায়ার করে এখানে। গির্জার পুরোহিত। সোসাইটি অব জেসুইট্সের সেন্ট ভিনসেন্ট গির্জা। ধবধবে সাদা চুল, দাড়ি এবং আলখাল্লায় চোখে-মুখে পবিত্রতার ঢল। কাঁধে ঝুলছে লম্বা সাইড ব্যাগ। বুকে লম্বা চেনের সঙ্গে ক্রস।

প্রণাম করলো ব্যান্ডো। ফাদার বললেন, গড ব্লেস ইউ মাই সান। ব্যাগ থেকে রুটি, বিস্কুট, মাংসের বাটি বার করে লাকির সামনে ধরলেন। গত বছর পাঁচেক ধরে এখানে আছি। এই বাড়িতে রোজই আসি, ঠিক বিকেলের দিকে।

গোগ্রাসে ফাদারের দেওয়া খাবার খাচ্ছে লাকি। ঘাড়-পিঠে হাত বুলোচ্ছেন ফাদার, জানো সাটাজিত, সারাদিন ও কিছু

খায় না। রনিকে পাহারা দেয়। বসে থাকে আমার প্রতীক্ষায়। রনির সমাধিক্ষেত্রের সামনে দাঁড়ান ফাদার, বুকে ক্রস আঁকলেন, যিসাসের লকেটে হাত দিয়ে চোখ বুঁজে একটু বাদে তাকালেন, প্রার্থনা করো। প্রার্থনার একটা শক্তি রয়েছে। শুধু রনি কেন, আমি তোমাদের সবার জন্যেই প্রার্থনা করি। তুমি আর রনি দুজনেই আমার ছাত্র। ডু গুড আনটু অল। ভালোবাস, সবাইকে ভালোবাস। লভ ইজ গড।

ফাদারের সামনে বাচ্চা ছেলে হয়ে গেছে যেন ব্যান্ডো, হাতটা ধরে মাথায় ঠেকালো, কী সৌভাগ্য আমার, আপনাকে দেখব ভাবিনি। চলুন ফাদার, ওপরে গেস্টরুমে। আপনার সামনে বসে বাইবেলের গল্প শুনব সেই আগের মতো।

ওকে জড়িয়ে ধরেছেন ফাদার, চলো মাই সান, আই লাইক মাই স্টুডেন্টস।

ফুলবাগানের মাঝ দিয়ে সুন্দর রাস্তা চলে গেছে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। কবরখানা থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছেন ফাদার, সঙ্গে ব্যান্ডো। প্রজাপতি আর ফড়িং উড়ছে ঘুরে ফিরে। ঘরে ফিরছে পাখিরা। টিয়া, চন্দনা ফুলটুসি। য়ুক্যালিপটাস গাছের দিক থেকে একজোড়া ময়ূর ডেকে উঠলো।

হঠাৎ সামনে এসে পথ আটকাল লাকি, ফাদারের আলখাল্লা ধরে টানছে, গর্জে উঠছে বারবার, কিছু বলতে চায় বুঝি। ফাদার দাঁড়িয়ে পড়লেন, হোয়াট হ্যাপেন্ড মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, এনিথিং রঙ?

লাকি ততক্ষণে একদৌড়ে দেয়ালের কাছে বাড়ির সীমানায় পৌঁছে গেছে, চিৎকার করছে, ডেকে উঠছে বার বার, মাটি আঁচড়াচ্ছে।

ফাদার বললেন, চলো ব্যাপারটা দেখি গে। থাবার নখে মাটি সরিয়ে ফেলেছে লাকি। দুজনে পৌঁছুতে শান্ত হলো। দু' পায়ের থাবার মধ্যে একটা ব্রিফকেস, দাঁতের কামড়ে হ্যান্ডেল ধরে তুলে দেখাচ্ছে।

ব্রিফকেসের ধুলো ঝাড়ল ব্যান্ডো, বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে আছেন ফাদার,, বিদেশী জিনিস, কম্বিনেশন লক। নম্বর তিনটা নয় ছটা।

ফাদার বলেন, নম্বর যার ব্রিফকেস সেই জানে। জানি না কি আছে ভেতরে? অন্য লোকের পক্ষে খোলা ইমপসিবল।

ইমপসিবল কথাটা আমার অভিধানে নেই ফাদার, হিপ পকেট থেকে পাঁতলা চৌকো বাক্স বার করে নম্বরগুলোর সামনে ধরলো, ক্যালকুলেটারের মতো দেখতে—মৃদু চাপ দিতেই বাক্সের পর্দায় লেখা ফুটে উঠলো 'ডাজ নট কনটেন মেটাল অর বোম্ব'—যাক্ ফাদার, নিশ্চিন্ত হলাম, কোনো বিস্ফোরক পদার্থ বা অস্ত্রশস্ত্র নেই। কিন্তু ভারী বাক্স, দেখা যাক কী আছে। চৌকো বাক্সটার নিচে চাপ দিল, বললো, কম্বিনেশন লকের নম্বরের জন্য সার্চার রোবটকে নির্দেশ দিলাম:...বাক্সের মুখটা তখন লকের দিকে, পর্দায় ফুটে উঠছে নম্বর বার বার, মুছে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ বাদে স্থির হয়ে গেল ছটা সংখ্যা, সিক্স ডিজিট—৭৫১৮২১। যন্ত্রটা পকেটে রেখে হাসলো ব্যান্ডো, ফাদার, সার্চার ভুল করে না। এই দেখুন।

নম্বরগুলো ঘুরিয়ে সাজাতেই খুলে গেল ব্রিফকেস—নোটে ভর্তি! আমেরিকান ডলার!

ফাদার বললেন, আশ্চর্য!

আশ্চর্য হবার কিছু নেই ফাদার। এ সমস্ত ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকা। পিটার এখানে আসার মাস খানেক আগে বাড়িটায় রহস্যময় এক আগন্তুক এসেছিল। অস্ত্রশস্ত্রের চোরা-কারবারী, দেশের শত্রু, বিদেশী এজেন্ট। কাঁচাপাকা চুল, মুখভর্তি দাড়ির জঙ্গল। আশ্চর্য সমুদ্রনীল রঙ চোখ দুটো। কুচকুচে কালো মণি। এবার তড়ি-ঘড়ি ফিরে এসেছিল রনি, বোধহয় ওকেই ধরতে। আর্মি ইনটেলিজেন্সের খবর এদিকে কোথাও গুপ্ত অস্ত্রভাণ্ডার রয়েছে, এ কে ৪৭, রকেট লঞ্চার, মর্টার, অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র। এটা বর্ডার এলাকা। পাচার হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ হয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে, উগ্রপন্থীদের হাতে হাতে ঘুরছে।

দীর্ঘশ্বাস ফাদারের, বাড়িটার দেখাশুনা গত বছর চারেক ধরে আমিই করে আসছি। কেয়ারটেকার বলতে পারো। কেউ এলে খুলে দিই। রনির চিঠি নিয়ে একজন এসেছিল, আমি থাকতে দিয়েছিলাম। পরে শুনেছিলাম চিঠিটা জাল।

রনির মুখে আর কিছু শোনেননি ফাদার?

সময় পেল কোথায় বলার। এসেই ম্যালেরিয়া, সর্দি, কাশি, জ্বর। দিন দশেকের ভেতর ভালো না হতেই আবার অসুস্থ। আমার কাছে খবর পেয়ে পিটার এল। আশ্বস্ত হলাম। রনি সেই যে বিছানা নিল, আর উঠলো না। কঙ্কালসার চেহারা—কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

একতলার বসার ঘরের সামনে পৌঁছে গেছে দুজনে কথা বলতে বলতে। ব্যান্ডোর কাঁধে ফাদারের হাত, জানো সাটাজিত, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

একথা কেন ফাদার?

বারান্দায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরের গাছগাছালির উপর উদাস দৃষ্টি ফাদারের, রিটায়ার করে এই চার্চে এলাম, কলকাতার মতো পলিউশন নেই। টাটকা তাজা বাতাস। কেমিস্ট্রি পড়াতাম তোমাদের, মনে আছে?

ব্যান্ডো হেসে উঠলো, সেজন্যই তো কথা বলতে ভয় পাই। মনে হয় এখুনি জিজ্ঞেস করবেন নাইট্রাস অক্সাইডের কম্পোজিশন, না পারলে কান ধরে দাঁড় করিয়ে দেবেন বেঞ্চে।

ইয়েস কেমিস্ট্রি, এটম আর মলিকুলের খেলা জগতে—বছর পাঁচেকের মধ্যে

দেখতে দেখতে বদলেই গেল জায়গাটা। কাতারে কাতারে লোকজন আসছে, আসছে বর্ডার পেরিয়ে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। গাছ কেটে, পুকুর বুজিয়ে, গড়ে তুলেছে নতুন বসত। শ্যালো ওয়াটার পাম্প এবং ডিপ টিউবেল দিয়ে সেচের জন্য উঠিয়ে নিচ্ছে মাটির জল। আমি কেমিস্ট্রির লোক, বুঝতে পারি কী ভয়ঙ্কর এক সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, ফাদারের গলা কাঁপছিল, পরীক্ষা করে দেখি, এখানকার খাবার জলে আর্সেনিক বিষ। ছোট লেবরেটারি আছে আমার, রোজ পরীক্ষা করি আর চমকে উঠি।

আর্সেনিক কেন ফাদার?

প্রকৃতির প্রতিশোধ বলতে পারো। পুকুর-টুকুর বুজিয়ে, গাছ-টাছ কাটলে ভূস্তরের পরিবর্তন হয়। মাটির তলায় স্বাভাবিক খনিজ স্তরে আর্সেনিক থাকে। সবুজ বিপ্লব আর অধিক খাদ্য ফলানোর নামে বাড়ছে ক্ষেতখামার—কীটনাশক পদার্থ স্প্রে হচ্ছে। সেচের জন্য পুকুর না কেটে মানুষ তুলে নিচ্ছে পৃথিবীর সঞ্চিত জল। অনেকগুলো ডিপ টিউবেলের জল পরীক্ষা করে আর্সেনিক পেয়েছি। সরকারকে জানিয়েছিলাম। প্রথমে গা করেনি। কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যে বেশ কিছু লোক অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। হাতে-পায়ে-চামড়ায় ঘা, ক্ষতস্থানে ক্যান্সার। সুদীর্ঘকাল ধরে আর্সেনিকযুক্ত জল খেয়ে লোকজনের এই উপসর্গ। তখন টনক নড়লো। সিল করে দিয়েছে দূষিত জলের নলকূপ, কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়েই গেছে। আর্সেনিককে বলবো 'নীরব হত্যাকারী', চুপিসাড়ে শরীরে ঢোকে। বিষে বিষে ক্ষয়ে যায় মানুষ। এদিকে কেন, বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই এখন সেই ভয়ঙ্কর শত্রুর দাপট। মৃত্যু মনে হয় স্বাভাবিক। ধরে কার সাধ্যি! আর্সেনিকমুক্ত জল পেতে গেলে যে সব দরকারী যন্ত্রপাতি দরকার, কারখানার প্রয়োজন—তা নেই এদেশে। কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে এই আর্সেনিক—কী ভয়ঙ্কর!

ব্যান্ডোর চোখে ভাবান্তর, বলে উঠলো, সেন্ট হেলেনা, নেপোলিয়ন—এয়ার কমোডর রনি ডিমেলো, আর্সেনিক। মনে হয় মিল আছে ফাদার, ইংরেজরা যতই সাফাই গাক, ওরা স্লো পয়জনিং করেছিল। নেপোলিয়ন মারা গেছলেন ঐ সেঁকো বিষের জন্য।

ইউ আর কারেক্ট মাই বয়, আর্সেনিক ইজ 'ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক'। শরীরে ঢুকে যায়, বেরোতে পারে না। চুল, নখ, দাঁত আর হাড়ের কানাগালিতে আটকে যায়। বহু বছর বাদে চুল, হাড় পরীক্ষা করলেও ধরা পড়ে। মমির মতো সাদা ফ্যাকাশে হয় মৃতদেহ—সাদা চুল।

কী বলছেন ফাদার! রনির কেসটা আর্সেনিক পয়জনিং নয় তো?

নো, নো, ঝটপটই চলে গেছে রনি। দূষিত জলের আর্সেনিকে মৃত্যু হয় কিন্তু সময় লাগে অনেক অনেক বেশি।

হাতের মুঠি দৃঢ় হলো ব্যান্ডোর, কণ্ঠে উত্তেজনা, নো ফাদার, আই অ্যাম ডেফিনিট ইট্স আ কেস অব মার্ডার, পেছনে বিদেশী এজেন্ট। পরমাণু অস্ত্র বহনকারী বিশেষ প্লেন চালাবার দক্ষতা একমাত্র এদেশে ওরই ছিল। সেকেন্ড অ্যাটম বোম্ব টেস্ট আন্ডারগ্রাউন্ডে এ বছরই হবার কথা। পরমাণু বোমা গুপ্ত জায়গা থেকে রাজস্থানের মরুভূমির কাছে ফৌজি বিমানে ল্যান্ড করার কথা ছিল ওর, পিছিয়ে গেলাম আমরা। একটু থামলো ব্যান্ডো, সেঁকো বিষ পারদের তুলনায় চার গুণ শক্তিশালী। মারণ ডোজ, আই মিন ফ্যাটাল ডোজ অব আর্সেনিক ১২৫ মিলিগ্রাম, ঠিক বলছি তো?

আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ মাই বয়, তোমার ঠিকই মনে আছে—সেই কবে পড়িয়েছিলাম।

যদি ঐ পরিমাণ বিষ চা কিংবা কফির সঙ্গে এক চামচ মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মৃত্যু অবধারিত—পোস্টমর্টেমে ধরা পড়বে না। রনির মতো উপসর্গে মরে যাবে যে কেউ।

রাইট মাই সান—এ কথাটা কিন্তু ভাবিনি। রনির মৃত্যু কলেরার মতো রোগে।

রহস্য নম্বর ৭৫১৮২১

নিচের ঘরে সোফায় বসে কথাবার্তা হচ্ছিলো। ফাদার এবং ব্যান্ডো। সামনে লাকি থাবা গেড়ে বসে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ঘরে আলো জ্বলছে—ধূপ পুড়ছে যিসাসের সামনে।

ফাদার বলছিলেন, তোমার কথাটা ভাবার মতো, রনির মৃত্যু সম্পর্কে যা বলছো হতেও পারে। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? পোস্টমর্টেম নর্মাল।

ফাদার, এই ফটোটা কাইন্ডলি দেখুন, চিনতে পারেন কিনা—পকেট থেকে একটা পাসপোর্ট ছবি ফাদারের দিকে এগিয়ে দিল ব্যান্ডো।

ইয়েস দ্যাট ম্যান। সেই অদ্ভুত চোখ, দাড়ি, হাঁ, সেই রহস্যময় আগন্তুক, কোথায় পেলে?

যোশেফ দিয়েছে ফাদার। ও আমাদের লোক, বহুদিন ধরেই বাড়িটার দিকে নজর রাখছিল। ইন্টারপোল থেকেও এই ফটো পেয়েছি, ওর নাম ডেভিড ডিসুজা।

যোশেফ তোমাদের লোক! গোয়েন্দা! বুঝতেই পারিনি।

সোফায় বসে নেপোলিয়নের ছবিটা দেখছিল কর্নেল, ভাগ্যের কী আশ্চর্য পরিহাস—বাড়ির নাম সেন্ট হেলেনা! কেউ কেউ হয়তো ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আজ রাত্তিরে কবর থেকে তোলা হবে রনিকে। তারিখ ৮ মে। মে মাসের এই তারিখেই পোস্টমর্টেম হয়েছিল সেই সম্রাটের—অদ্ভুত মিল, কাকতালীয় কিন্তু আশ্চর্য সত্য।

ইয়েস মাই সান, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। ঈশ্বর করুণাময় অথচ কঠোর। যদি আর্সেনিক পয়জনিং-এ মৃত্যু হয় রনির তাহলে অপরাধী ধরা পড়বেই। প্লিজ ওয়েট।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ব্যান্ডো, ফাদার, সামনের অয়েল পেন্টিং দেখুন, নেপোলিয়ন—নিচে লেখা জন্ম ও মৃত্যু সাল, ১৭৬৯—১৮২১ এ. ডি.। ১৮২১ সালের ৭ মে মারা গেছলেন সম্রাট। তার মানে ৭।৫।১৮২১, ৭৫১৮২১—ব্রিফ- কেসের লকের নাম্বারটা কিন্তু তাই। অপরাধী যেই হোক, ওঁর মৃত্যু তারিখ মুখস্থ—প্রিয় নাম্বার। নিশ্চয়ই নেপোলিয়ন বিশেষজ্ঞ, ফোনের

নাম্বার, জন্মতারিখ, বিবাহবার্ষিকী—এসব নম্বর আমরা ভুলি না। সেরকমভাবে কম্বিনেশন লকের অক্ষর সাজাই—ভুল যাতে না হয়।

পিটারকে সন্দেহ করতে হয় তাহলে! হি ইজ অথোরিটি রিগার্ডিং নেপোলিয়ন।

নো ফাদার পিটার রনির নিজের ভাই। ও এ কাজ করবে না। লেট আস্ সি এন্ড ওয়েট।

ঘড়ি দেখলো ব্যান্ডো, অনুগ্রহ করে একটু বসুন ফাদার। আমি বাইরে যাচ্ছি, হেডকোয়ার্টারে মেসেজ দেব। এখন সোয়া ছটা, পিটার ফিরে আসছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে থাকুন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাব। লাকি, মাই ফ্রেন্ড, ফাদারকে দেখ।

একছুটে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় বেরিয়ে গেল ব্যান্ডো। মিশে গেল বাইরের অন্ধকারে। জিপ এসে গেছে, গাড়ি থেকে নামলো পিটার আর যোশেফ।

সেই চোখ

সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। বাইবেল পড়ছেন ফাদার। সাক্সেসন সার্টিফিকেট ভাঁজ করে ছোট টেবিলে রাখলো পিটার, ব্যান্ডো কোথায় ফাদার? ক্লান্ত দেখাচ্ছিল পিটারকে, যা ঝামেলা, সার্টিফিকেট বার করতেই মাস খানেক লেগে গেল।

বাইরে পায়ের শব্দ, ফাদার বললেন, নিশ্চয়ই ব্যান্ডো আসছে।

যোশেফ এসে দাঁড়ালো, ব্যান্ডো নয়, ডেভিড ডিসুজা, মিঃ পিটার স্যার।—হি ওয়ান্টস টু মিট ইউ।

ডেভিড ডিসুজা! বিস্ময়ের গলা পিটারের।

ঘরে ঢুকে পড়েছে তখন আগন্তুক। ফাদার অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। সেই লোক যার ফটো একটু আগে ব্যান্ডো দেখিয়েছিল, এই-ই জাল চিঠি নিয়ে এসেছিল। সেই অদ্ভুত চোখ, কাঁচাপাকা চুল, দাড়ি। ভয়ঙ্কর দৃষ্টি।

যোশেফ বললো, বসুন ডেভিড সাহেব, কী খাবেন চা না কফি?

কফি প্লিজ, চিনি নয় কিন্তু। গুড ইভিনিং ফাদার, আবার দেখা হলো। আর আপনি তো পিটার ডিমেলো, আমায় চিনতে পারছেন না? কী ব্যাপার, ওরকম বড় বড় চোখে তাকাচ্ছেন কেন?

মুহূর্তের ভেতর রিভলবার উঠে এল পিটারের হাতে, আপনি সেই ডাকাত, কুখ্যাত অপরাধী! নড়বার চেষ্টা করবেন না ডেভিড, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবেন।

সশব্দে হাসল ডেভিড, উত্তেজিত হচ্ছেন কেন পিটার। আপনার এত রাগ কেন? ডেভিডকে চেনেন নাকি? বলতে বলতে মাথা নিচু করে কন্টাক্ট লেন্স খুলে ফেলে তাকালো, চোখ আর মণির রঙ পাল্টে ফেলেছিলাম, এবার চোখের দিকে তাকান, আসল চোখ দেখুন। পরচুলা খুলে ফেলল ডেভিড একটানে।

ফাদারের বিস্ময়ের কণ্ঠ, ব্যান্ডো, তুমি!

ইয়েস ফাদার, আমি। গলার স্বরও পালটে দিয়েছিলাম। দুজনেই বোকা বনে গেছলেন। হাসছে ব্যান্ডো, ফটো দেখলে যে কোনো রূপে সাজতে পারি—এবার নিশ্চয়ই বুঝলেন ডেভিড আর ব্যান্ডো একই লোক। সাজপোশাক আলাদা।

বুলেটপ্রুফ জামাটা উল্টে পরেছিল ব্যান্ডো, এবার সোজা করে নিল। ডিপ মেরুন কালার থেকে নেভি ব্লু রং এখন। আগের মতন। ব্যান্ডো বলছিল, পিটার সাব, ওপরে তিনতলায় রেস্ট নিন, ধকল আপনার কম যায়নি। আমাকে সারারাত জাগতে হবে। আজ রনির ডেডবডি তোলা হবে কবর থেকে। আপনিও সাবধানে থাকবেন। মনে রাখবেন ইয়োর লাইফ ইজ অলসো ইন ডেঞ্জার। শত্রুপক্ষ আপনাকে ছাড়বে না, আপনি অনেক খবর জানেন। বলে যদি দেন তাহলে ওদের ক্ষতি।

আই ডোন্ট কেয়ার, সব আপনাকে বলেছি।

না, না, সাবধানের মার নেই। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এই পুরো জায়গা এখন আন্ডার আর্মি কমান্ড। মাছি গলার উপায় নেই।

ফাদার বললেন, এবার আমায় উঠতে হচ্ছে সাটাজিত, ঈশ্বরের আশীর্বাদে সত্য নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে।

হতাশ দেখাচ্ছিল পিটারকে। বিধ্বস্ত চেহারা, আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

যোশেফ ঘরে ঢুকলো সঙ্গে সঙ্গে। ব্যান্ডো বললো, থ্যাঙ্কস যোশেফ, তুমি খাবারের সঙ্গে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিও। সকাল ৮টার আগে যাতে ঘুম না ভাঙে পিটারের। জাল গুটিয়ে এনেছি। কাল ফাইনাল রাউন্ড।

ও. কে. স্যার।

মৃত্যু না হত্যা?

সকাল ৯টা। ড্রয়িং রুমে সোফায় গা এলিয়ে বসে ব্যান্ডো। একদিকে ফাদার এলবার্ট, অপরদিকে পিটার। ঘরে জমাট নিস্তব্ধতা। কথা নেই কারো মুখে।

রাতজাগা ব্যান্ডোর চোখে ক্লান্তির ছাপ নেই। বাইরের কবরখানার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল। বোঝার উপায় নেই কত কাণ্ড ঘটে গেছে রাত্তিরে। সামরিক বিভাগের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর— লিভিং মেটাল ডিটেকটার—দাপিয়ে বেরিয়েছে সারা জায়গা জুড়ে। গন্ধ শুঁকেছে, দাঁড়িয়েছে, ছুটেছে। জোয়ানরা খুঁড়ে ফেলেছে মাটি—উঠে এসেছে নানা ধরনের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। মেশিনগান থেকে রকেট লঞ্চার, আর ডি. এক্স-এর বাক্স—কলকাতা উড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কৃষ্ণপক্ষের রাত্তিরে নাইট ভিশন চশমা পরে জওয়ানরা কাজ সেরেছে। অপারেশন এক্স সম্পূর্ণ। গুপ্ত অস্ত্রভাণ্ডার থেকে গাড়ি বোঝাই অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলেন যখন ব্রিগেডিয়ার সিং তখন রাত তিনটে। অন্যদিকে আর্মির ডাক্তাররা কবর থেকে তোলা রনির ডেডবডি তুলে ছবি তুলেছেন বার বার। কী আশ্চর্য! মৃতদেহে পচন নেই! কোঁচকানো চামড়ায়, ফ্যাকাশে চোখমুখে মমি হয়ে শুয়ে আছে রনি। ধবধবে সাদা চুল।...রাত চারটায় জ্বলে উঠেছিল সার্চ লাইটের জোরালো আলো। পোস্টমর্টেম শেষ তখন। সামরিক অভিবাদন সহ বিদায়ের শেষ সুর তখন বিউগেলে। কফিনে ডেডবডি রেখে কবরের সামনে টুপি খুলে দাঁড়ালেন এয়ার মার্শাল—বায়ুসেনার সর্বাধিনায়ক। স্যালুট করলেন। ব্যান্ডো দাঁড়িয়ে ছিল। দ্রুত মেরামত করা হলো সব জায়গা। নতুন করে ঠিক করা হলো ক্ষতিগ্রস্ত কবরস্থান। ফিরিয়ে দেওয়া হলো সেই আগের

চেহারা। ব্যান্ডো দাঁড়িয়ে ছিল অশ্রুসজল চোখে—বুকের ভেতর অব্যক্ত এক যন্ত্রণা। ফৌজিরা ফিরে গেল ঠিক পাঁচটায়। ঘড়ির মাইক্রোফোনে মেসেজ পাঠালো ব্যান্ডো—দিল্লীর সদর দপ্তর—ইয়েস ব্যান্ডো স্পিকিং, অপারেশন এক্স ওভার—মিশন সাক্সেসফুল, ইয়েস মার্ডার। আর্সেনিক। কালকের ঘটনা চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলো।

প্রথম পিটার মুখ খুললো, এত কাণ্ড ঘটে গেছে বুঝতেই পারিনি। কেস অব মার্ডার? কী বলছেন আপনি?

ব্যান্ডোর কণ্ঠস্বর শান্ত, হ্যাঁ খুন। গুপ্ত অস্ত্রভাণ্ডারের খবর আগেই পেয়েছিল রনি। অপরাধীকে চিনতেও পেরেছিল। কিন্তু তখন আর তার কথা বলার শক্তি নেই। তার আগেই ব্রেকফাস্টের দুধে আর্সেনিকের মারণ-ডোজ মিশিয়ে দিয়েছে খুনী। আমরা তাকে সনাক্ত করেছি পিটার। ক্লোজ সার্কিট টিভিতে দিল্লীতে বসেই দেখেছি।

হু ইজ দ্যাট মার্ডারাব? টেবিলে ঘুষি মেরে চেঁচিয়ে উঠল পিটার, আই ওয়ান্ট টু কিল হিম। হি মাস্ট বি অ্যান এজেন্ট অব আই. এস. আই।

ঠিক বলেছেন। তিনি ভারতীয় কিন্তু দেশদ্রোহী। আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন, আপনার কাছ থেকে পাওয়া রনির চুল আর নখে পাওয়া গেছে আর্সেনিক—লিথাল ডোজ। খুনী সেই মিঃ ডেভিড, বিদেশী এজেন্ট। ছাত্র সেজে পি. এইচ. ডি. করার ছুতোয় আপনার কাছে আই মিন পীটার ডিমেলোর সঙ্গে মিশে গেল। নতুন গবেষণা—'টু স্টোরি অব সেভেন ফাইভ এইট্টিন টুয়েন্টি ওয়ান, এ ডেথ অব অ্যান এম্পারার।' নেপোলিয়নের মৃত্যু রহস্যের উপর আলোকপাত। বই হয়ে বোধহয় বেরিয়ে গেছে এতদিনে।

সিগ্রেট ধরালো ব্যান্ডো, লাকি বসে আছে পিটারের পেছনে, গোঁ গোঁ করে উঠছে বার বার। আক্রোশের গলা। উঠে দাঁড়ালো লাকি, সেই ব্রিফকেসটার হাতল মুখে করে ব্যান্ডোর পাশে রাখলো।

থ্যাঙ্কস মাই ফ্রেন্ড, ব্রিফকেসটা এগিয়ে

দিল পিটারের দিকে ব্যান্ডো, এটা চিনতে পারেন—কম্বিনেশন লক, দেখুন না যদি খুলতে পারেন।

এর নাম্বার আমার জানার কথা নয় কর্নেল।

দৃঢ় কণ্ঠস্বর ব্যান্ডোর, আপনি নেপোলিয়ন বিশেষজ্ঞ—'টু স্টোরি' বই লিখেছেন। নিশ্চয়ই পারবেন, ইয়েস ইউ নো দ্য নাম্বার। কালপ্রিট আপনার মতোই নেপোলিয়ন ভক্ত, সাহায্য করেছে বই লেখায়। এই কেসটা ডেভিডের।

তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? সে খুনী, ব্যাঙ্ক ডাকাত।

কী করে জানলেন খুনী, কাকে খুন করেছে? রনিকে? আপনাকেও খুন করার চেষ্টা করেছিল নাকি? বলুন খুলে বলুন।

ম্লান হাসি পিটারের, যখন অপরাধী ধরেই ফেলেছেন, আমাকে বলতে হবে কেন, এই কম্বিনেশন লকের সুন্দর গল্প বানাতে পারেন—এখন হয়তো বলেই বসবেন আমিই অপরাধী, খুন করেছি রনিকে, নেপোলিয়নের মতো, আর্সেনিক প্রয়োগে।

ফাদার বাইবেল পড়ছেন, এবার তাকালেন, পিটার মাই সান, কিছু জানলে বল, ঈশ্বরের কাছে কেঁদে বললে তিনি সব ক্ষমা করে দেন।

ব্যান্ডো বলে উঠলো, রাইট ফাদার, তিনি ক্ষমা করেন—করুণাময় অথচ কঠোর! তাঁর কাছে সবই ধরা পড়ে। যাক্‌গে পিটার সাহেব, কালপ্রিট হিসাবে আপনাকে মিন করছি না, আপনি রনির ভাই, আপনার কথা আলাদা। সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। রনির হত্যাকারী এখন হাতের মুঠোয়।

সিগ্রেটটা নিভিয়ে গ্লাসের জলে চুমুক দিল ব্যান্ডো, অতি চালাকির গলায় দড়ি—পচা শামুকে মাঝে মাঝে পা কাটে। সেই নতুন বইটায় নেপোলিয়নের মৃত্যুরহস্য রয়েছে—তারিখটা মনে করুন—এবার নাম্বার ঘোরান। ৬টা নাম্বার—কী! মনে হচ্ছে ভুলে গেছেন। আমি সেই ৭।৫।১৮২১-এ ঘুরিয়ে দিচ্ছি—এই যে খুলে গেছে ব্রিফ-কেস। নেপোলিয়নের মৃত্যুদিন—ডেথ অব এম্পারার।

চমকে উঠলো পিটার, এত টাকা! ভাবাই যায় না!

আপনার আলমারিতে বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে আরো আছে পিটার। ব্রিফকেসের ডালার ভেতরে আঙুলের ছাপ, বইয়ের টাকায় ছাপ, রনিকে যে গ্লাসে দুধে লিথাল ডোজ আর্সেনিক দেওয়া হয়েছিল সেখানেও ছাপ পাওয়া গেছে।

কর্নেল, মুখে হাসি পিটারের, ছাপ দিয়ে কি আসে যায়, নিশ্চয়ই ডেভিডের সঙ্গে মিলে গেছে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানেন হাতের ছাপে আমরা সবাই আলাদা। একজনের সঙ্গে আরেকজনের মেলে না। কিন্তু ফিঙ্গার প্রিন্টগুলো একই ব্যক্তির, আপনি যখন এখানে তখন ডেভিড হাওয়া হয়ে গেছে। রনিকে দুধ রোজ সকালে আপনি দিতেন অথচ গ্লাসে ডেভিডের আঙুলের ছাপ কি করে এলো সেটাই রহস্য।

খুব সোজা কর্নেল, বোধহয় ছদ্মবেশে এসেছিল।

তাহলে ডেভিড পিটার সাজতে পারে, প্রয়োজন হলে পিটার ডেভিড—তাই না?

পিটার ছটফট করছিল, কথা ঘুরোতে চাইছে, আমাকে একটু লিগাল অ্যাডভাইসারের কাছে যেতে হবে কর্নেল সার্টিফিকেট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো, হাউ টু সেল দ্য প্রপার্টি।

ঐ সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলে দিন পিটার।

কেন?

ফাদার বললেন, রনির উইল আমার কাছে, অলরেডি রেজিস্টার্ড। এই সব জমি জায়গা বাড়ি সব এখন চার্চের সম্পত্তি, সোসাইটি অব জেসুইট্স অনাথ আশ্রম বানাবে, হোম ফর দ্য হোমলেস—

ব্যান্ডো বললো, আই. এস. আই এজেন্টদের কাছে এ জায়গাটা ছিল আদর্শ স্থান। আপনি সাঙ্কেসন সার্টিফিকেট পেলে ওদের সুবিধা হতো, গুপ্ত অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলতই। আর এটা হয়ে উঠতো বিদেশী এজেন্টদের স্বর্গরাজ্য। অলরেডি তাই হয়ে গেছলো। আপনিও খুন হয়ে যেতেন একদিন।

কথাগুলোয় পাত্তা দিল না পিটার, বাঃ চমৎকার গল্প। সুন্দর বলতে পারেন—রনি আমার ভাই, ওর সঙ্গে শেষের দিকে কত কথাই না হয়েছে। ডেভিড কিংবা অস্ত্রভাণ্ডার সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু বলতো—

না, বলার মতো অবস্থায় ছিল না, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, যে কোনো লোক নিজেকে পিটার বলে পরিচয় দিলে মেনে নিত।

হোয়াট ডু ইউ মিন, আমি পিটার নই? শুনুন ফাদার, কর্নেল কীসব বলছে—

মাই সান, গত পাঁচ বছর ধরে আমি এখানে, তোমায় প্রথম দেখলাম। আগে চিনতাম না। যার চেনার কথা সে রনির শোকে পাগল—তোমাকে পিটার বলে মানতে চায় না, তাড়া করে। হ্যাঁ, আমি লাকির কথা বলছি। সুদীর্ঘকাল পরে দেখলেও কুকুরের চেনার ক্ষমতা প্রশ্নাতীত।

পিটার চুপ, জানি না আপনাদের কি উদ্দেশ্য, আমাকে ফাঁসিয়ে কী লাভ? কর্নেল, আসল কথা খুলে বলুন। আমি আসতামই না, ফাদারের তার পেয়েই এসেছি—

হ্যাঁ পিটার—চোরের মায়ের সবসময়ই বড় গলা। আগে আমায় বলতে দিন। রনি হত্যার ছক বছর চারেক আগেই কষা হয়েছিল। ডেভিডকে ছাত্র সাজিয়ে পাঠানো হলো পিটারের কাছে। দারুণ ভাবে মিশে গেল ডেভিড। ও এদিককারই ছেলে। থিসিসের নাম করে কাছের মানুষ হয়ে গেল পিটারের। উদ্দেশ্য অন্য। তার স্যার পিটার ডিমেলো আসলে আমাদের গুপ্তচর। ওঁর কাছ থেকে বিদেশী চক্রান্তের খবর নিয়মিত পেতাম। ম্যাপে দেখবেন এ জায়গাটার কী ইমপর্টেন্স। দেশপ্রেমিক ডিমেলো পরিবারের বাড়ি আই. এস. আই-এর সদর দপ্তর হলে অনেক সুবিধা। কারও সন্দেহ হবে না। তক্কে তক্কে ছিল ডেভিড। রনির অসুস্থতার খবর ডেভিডের হাতে পৌঁছেছিল—তার আগে অবশ্য এখানকার সব জেনে নিয়েছে ও। তিল তিল করে জায়গাটাকে গুপ্ত অস্ত্রাগার এবং অস্ত্র বেচাকেনার টাকার স্বর্গ করে তুলেছিল। আর ডেভিড ছিল কালার ব্লাইন্ড, মিঃ পিটার, আপনিও কালার ব্লাইন্ড—সেই অপরাধী।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো পিটার, দু' হাতে দুটো রিভলভার, একটা যোশেফ আরেকটা ফাদারের দিকে, ইয়েস আমিই ডেভিড। বিদেশী এজেন্ট। রনির ভাই সেজে এসেছিলাম, পিটার এখন আমাদের হাতে বন্দী। রনি আর লাকি আমায় ধরে ফেলেছিল। রনিকে বলার সুযোগ দিইনি, তার আগেই সরিয়ে দিয়েছি। আমায় যেতে দিন, না হলে এ দুজন খুন হয়ে যাবে। ব্যান্ডো—কম মেহনত করিনি, পিটারের আস্থা অর্জনের জন্য। নেপোলিয়ন গুলে খেয়েছি। জানি এই এলাকাটার জলে আর্সেনিক, রনির মৃত্যুতে সন্দেহ হবে না কারো। আর সাতটা দিন সময় পেলেই সব অস্ত্র, টাকা-পয়সা পাচার করে এখানকার মালিক হয়ে যেতাম—খুন করে ফেলতাম পিটারকে।

হেসে উঠলো ব্যান্ডো, হাতের অস্ত্র ফেলে দিন ডেভিড, ওদের দুজনকে খুন করতে পারেন, আমায় পারবেন না—আমার বুলেটপ্রুফ জামা আর শরীরে রয়েছে পাতলা কৃত্রিম চামড়ার ইলেকট্রনিক আস্তরণ। গুলি লাগে না—ইজরায়েলে তৈরি। ডবল প্রোটেকশন বলতে পারেন। আর বেরোবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ। বেরুটে সমুদ্রের ধারে নির্জন জায়গায় পিটারকে বন্দী করে রেখেছেন? বাঁচিয়ে রেখেছেন এখনও? কিন্তু কোনো লাভ নেই। মরে গেলেও পিটার মুখ খুলবে না। বলবে না বর্ডারের কোথায় কোথায় ক্ষেপণাস্ত্র বসান আছে।

লাফ দিয়ে হঠাৎই ডেভিডের ঘাড়ে কামড়ে ধরল লাকি। এক ঝটকায় বসে পড়ল ডেভিড, ট্রিগার টিপল—

লাভ নেই ডেভিড। একটা গুলিও নেই আপনার অস্ত্রে, যোশেফ আগেভাগে সব সরিয়ে ফেলেছে। তবে আপনি দারুণ অভিনয় জানেন, ভালোই হলো স্বীকার করলেন। আমি সব জানতাম। গল্প ফাঁদতে হয়েছিল ঠিকই, সেটা কাচের জার মানে রনির চুল আর নখ হাতাবার জন্যে। মাস দুয়েক ধরে আপনি এখানে। বাইরের কোনো খবর পাচ্ছেন না। আপনার শক্তিশালী ওয়ারলেস যন্ত্রটাও খারাপ করে রেখেছে যোশেফ। তা না হলে ধরে ফেলতেন পিটার এখন মুক্ত। ইজরায়েলের আর্মি ইনটেলিজেন্সের সাহায্যে কমান্ডোরা নির্জন গুপ্ত স্থান থেকে তুলে নিয়ে এসেছে পিটারকে। আপনার গোটা দশেক শাগরেদ মারা গেছে। পিটার এখন তেল আবিবে, ভালো আছে। আমিও সেই অপারেশনে ছিলাম। ওখান থেকেই এসেছি ডেভিড সাহেব ওরফে নকল পিটারকে গ্রেপ্তার করতে—বড় বড় শ্বাস ফেলছে ব্যান্ডো, হাতে রিভলবার।

এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন ডেভিড, দেশদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যু—আমি পাঁচ গুনছি, যিসাসের কাছে পাপ স্বীকার করুন—ওয়ান, টু, থ্রি..., হঠাৎ থেমে গেল ব্যান্ডো, না, আপনাকে মারবো না, আমার একটা গুলির মূল্য আপনার মতো ঘৃণ্য লোকের জীবনের চেয়েও বেশি।

ফাদার বললেন, আইন নিজের হাতে তুলে নিও না ব্যান্ডো, দেখলে তো ঈশ্বর আছেন, তিনি ধরিয়ে দিলেন, শাস্তি তিনিই দেবেন।

বাইরের জিপ থেকে ভারী পায়ের শব্দে ঘরে ঢুকে পড়েছেন তখন পুলিশ কমিশনার মিঃ ইসলাম, সঙ্গে ফৌজি পুলিশ। ব্যান্ডো বললো, ডেভিডকে মারলে তোমাদের গুপ্ত খবর আর পাবে না—কাইন্ডলি অ্যারেস্ট হিম মিঃ ইসলাম, যা বলবার উনি আদালতে বলবেন।

ছবিঃ রাজা সরকার

দানপত্র

মঞ্জিল সেন

জ্যাঠামণির চিঠিটা পেয়ে খুব অবাক হলো কুশল। সেই যে বছর কুড়ি আগে ওর বাবা ওদের নিয়ে গ্রাম ছেড়েছিলেন, তার পরে ওখানকার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেননি। জ্যাঠামণিও এতদিন ওদের খোঁজখবর করেননি। ওর তখন বয়স মাত্র সাত। বাবার সঙ্গে জ্যাঠামণির কি নিয়ে যেন খুব কথা কাটাকাটি হয়েছিল, জ্যাঠাইমাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। ওর এখনও মনে আছে, মা দরজার একপাশে ঘোমটা টেনে পাষাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলেন। একটা কথাও বলেননি।

সেই দিনই বাবা ওকে আর মাকে নিয়ে হুগলি শহর থেকে একটু দূরে ওর মামাবাড়ি গিয়ে উঠেছিলেন। ওদের ওখানে রেখে তিনি চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন তারপর ওদের মামাবাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলেন। যতদিন ওরা মামাবাড়ি ছিল, বেশ সুখেই ছিল। দাদু-দিদিমা বেঁচে ছিলেন না, কিন্তু দুই মামা ওকে আর মাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। বাবাকেও ওখানে থেকে যেতে বলেছিলেন, ওখানে কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন এ কথাও বলেছিলেন। কিন্তু বাবা রাজী হননি। তিনি ছিলেন খুব আত্মাভিমানী। নেহাৎ নিরুপায় হয়েই ওদের মামাবাড়ি রেখেছিলেন।

পরে কুশল জেনেছিল গাঁয়ে ওদের দোতলা বাড়ি, প্রচুর জমি-জমা, ধান ভাঙার কল যা কিছু ছিল সবই জ্যাঠামণি বাবার সরলতার সুযোগ নিয়ে নিজের আর জ্যাঠাইমার নামে করে নিয়েছিলেন। জ্যাঠতুতো দুই দিদি পর্যন্ত মার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত। এসব নিয়েই বাবা একদিন কথা বলতে গিয়েছিলেন, তার ফলেই কথা কাটাকাটি।

এসব কথা কিন্তু কুশল বাবা কিংবা মার মুখে শোনেনি, শুনেছে বড় মামীমার মুখ থেকে। তিনি বলতেন, ঠাকুরজামাইকে এমন ভাবে যারা ঠকিয়ে আখের গুছিয়ে নিল, ভগবান তাদের একদিন না একদিন শাস্তি দেবেনই।

বড় মামীমার মনটা ছিল বড় কোমল। মাকে বুঝতেই দিতেন না যে তিনি ভায়েদের আশ্রয়ে আছেন। সংসারের সব কাজে মার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। বড় হয়ে কুশল বুঝেছিল মাকে সংসারের মধ্যে একাত্ম করে নেবার জন্যেই তিনি ওটা করতেন।

ছোট মামীমা আবার ছিলেন বড় মামীমার ভীষণ অনুগত। তাঁর ছেলে-মেয়ে ছিল না, তাই কুশলকে খুব আদর-যত্ন করতেন। বড় মামার দুই ছেলে-মেয়ে, তাদের সঙ্গে কুশলের খুব ভাব হয়েছিল। বাবা যখন ওদের ওখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন শুধু বড় মামীমা, ছোট মামীমা আর মামাতো ভাই-বোনেরাই কাঁদেনি, দুই মামার চোখও শুকনো ছিল না।

মামার বাড়ির প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে কলকাতায় এসে জীবনের কষ্টকর রূপটা দেখল কুশল। বাবাকে তখনও উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। সামান্য রুজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন, মোটামুটি দাঁড় করিয়েছেন। একটা পুরনো বাড়ির একতলার সেঁতসেঁতে একটা ঘর, এজমালি

কলঘর, আর বারান্দার একপাশে চট দিয়ে ঘেরা রান্নার ব্যবস্থা—এই ছিল ওদের সংসার।

কুশলের তো কান্নাই পেয়ে গিয়েছিল। মার মুখে কিন্তু এতটুকু ম্লান ছায়া পড়েনি, বরং তিনি যেন নিজের সংসার পেয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠেছিলেন।

কুশল বাড়ির কাছেই একটা সাধারণ ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল। লেখাপড়ায় বরাবরই ভাল ছিল ও। ইস্কুল, কলেজে খুব ভাল রেজাল্ট করেছিল। ইলেকট্রনিক্স ছিল ওর প্রিয় বিষয়, তাই নিয়ে শেষ করেছিল পড়া। দু'বছর হলো ও দিল্লিতে একটা বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করছে। ভাল মাইনে, ফ্রি কোয়ার্টার্স, গাড়ি, আরও অনেক সুবিধে পেয়েছে আপিস থেকে। তার আগে অবিশ্যি কিছুদিন কলকাতায় চাকরি করেছিল।

দুঃখ শুধু একটাই। যখন সবে ওরা সুখের মুখ দেখতে শুরু করেছে, একটা ভাল বাড়িতে গুছিয়ে বসেছে, ঠিক তখনই পর পর বাবা আর মা মারা গেলেন।

জ্যাঠামণির চিঠিটা তাই ওকে অবাক করেছিল। মনে মনে ও যে একটু বিরক্তি বোধ করেনি তাও নয়। ওদের দুঃখ-কষ্টের জন্য জ্যাঠামণিই যে দায়ী এটা ও কেমন করে ভুলবে!

চিঠিটা ও পড়ল।

স্নেহের কুশল,

তুমি আমার পত্র পাইয়া খুব আশ্চর্য হইবে। সেটাই স্বাভাবিক। তার আগে জানাই, তোমার বর্তমান ঠিকানা আমি তোমার মামাবাড়ি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

তোমার পিতা আমার সহোদর, তাহার সহিত আমি যে ব্যবহার করিয়াছি ঈশ্বরের বিচারে তাহার ক্ষমা নাই। তাই এই বৃদ্ধ বয়সে আমি অনুশোচনায় দগ্ধ। তোমার জ্যাঠাইমা অনেকদিন হইল গত হইয়াছেন। খুব কষ্ট পাইয়া তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমার দুই কন্যাও অকালে আমাদের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে। যে লোভে অন্ধ হইয়া আমি আমার সহোদরকে সব কিছু হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলাম, সেই পাপের শাস্তি এখন আমাকে ভোগ করিতে হইতেছে।

আমি বৃদ্ধ, অনুতপ্ত, তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার কাছে একান্ত অনুরোধ একবার তুমি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর। তোমাকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ একবার আমাকে দাও ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ। নতুবা মরিয়াও আমি শান্তি পাইব না। আশা করি তুমি এই অনুতপ্ত, সর্বহারা বৃদ্ধের অনুরোধ উপেক্ষা করিবে না।

আং

তোমার জ্যাঠামণি

পুঃ তুমি যথাশীঘ্র সম্ভব আসিও কারণ আমি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি।

বারকয়েক পড়ার পর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কুশল। ছোটবেলার দিনগুলির কথা যেন ছবির মতো ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

কয়েকদিন পরে রাজধানী এক্সপ্রেসে হাওড়া স্টেশনে এসে নামল কুশল। ট্রেন সেদিন অস্বাভাবিক লেট ছিল। রিটায়ারিং রুমে স্নান-পর্ব সেরে স্টেশনের ডাইনিং রুমেই ও খেয়ে নিল। তারপর একটা লোকাল ট্রেন ধরল। যে স্টেশনে ওকে নামতে হবে সেখান থেকে ওদের গ্রাম বেশ কিছু দূরে।

শীতকাল। স্টেশনে যখন ও নামল তখন চারদিক অন্ধকার। একটা সাইকেল রিকশায় ও উঠে বসল। সঙ্গে শুধু ছোট একটা সুটকেস। চারদিকে অনেক পাকা বাড়ি উঠেছে, সেই গ্রাম এখন আর চেনা যায় না। জ্যাঠামণির নাম বলতেই রিকশাচালক চিনতে পারল। আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট পর দোতলা বাড়িটার সামনে এসে থামল রিকশা। কুশল তাকিয়ে দেখছিল। এই বাড়িতেই ওর বাল্যকাল কেটেছে। অনেকটা জমি নিয়ে বাড়ি তাই আশপাশ ফাঁকা।

অন্ধকারে যেন ডুবে আছে বাড়িটা। রিকশাচালক বলল, বাড়িতে কেউ আছে বলে মনে হতেছে না বাবু।

আমি কুশল, দিল্লী থেকে আসছি।

কুশল ভাবল এই অভিশপ্ত পুরীতে জ্যাঠামণি এখন একাই থাকেন তাই বোধহয় এত অন্ধকার। ও রিকশাচালককে বলল, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি দেখে আসি।

ও সুটকেসটা হাতে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ওর এখন সব মনে পড়ছে। গেট থেকে বেশ কিছুটা ভেতরে বাড়িটা, গাছ-গাছালিতে ঘেরা। সদর দরজায় কয়েকবার কড়া নাড়তে হলো, তারপর খুলে গেল দরজা। অস্থিচর্মসার এক বৃদ্ধ লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। এই কি ওর জ্যাঠামণি! এখন নিশ্চয়ই বয়স সত্তরের কোঠায়।

কে? বৃদ্ধ জিগ্যেস করলেন।

আমি কুশল, দিল্লি থেকে আসছি, কুশল জবাব দিল।

আয় বাপ, আয়। বৃদ্ধ বলে উঠলেন, আমি যে তোর অপেক্ষাতেই আছি, তুই না আসা পর্যন্ত যেতে পারছি না।

জ্যাঠামণি কোথায় যাবার কথা বলছেন কুশল বুঝতে পারল না। ও বলল, আমি আসছি, রিকশাটা ছেড়ে দিয়ে আসি।

ও গিয়ে রিকশাচালকের ভাড়া মিটিয়ে পাঁচ টাকা বখশিস দিল। লোকটি খুশি হয়ে বলল, নমস্কার বাবু।

চলে গেল রিকশা।

কুশল ফিরে এল। জ্যাঠামণিকে প্রণাম করল। জ্যাঠামণির খালি পা, গায়ে একটা চাদর পর্যন্ত নেই। পা ঠাণ্ডায় যেন হিম হয়ে গেছে।

জ্যাঠামণি ওকে আলো দেখিয়ে দোতলায় নিয়ে গেলেন। বললেন, আমি এই পাপপুরী যক্ষের মতো আগলে আছি কুশল। তুই এসব নিয়ে আমাকে মুক্তি দে।

এসব নিয়ে আমি কি করব জ্যাঠামণি, কুশল বলল, এখানে আমি কোনোদিনই থাকব না। তাছাড়া বাবা-মা যা ভোগ করতে পারলেন না, তা আমি ছেলে হয়ে কোন মুখে ভোগ করব!

ওসব কথা বলে আর আমায় অপরাধী করিস না কুশল, জ্যাঠামণি বললেন, জানি আমার পাপের ক্ষমা নেই। অহরহ বৃশ্চিক দংশনের মতো আমার বুকের ভেতরটা জ্বলছে। এই বিষয়-সম্পত্তি এখন

আমার কাছে বিষ। তোকে যদি এসব ফিরিয়ে না দিই তবে যে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না বাবা।

কিন্তু এসব নিয়ে এখন আমি কি করব! কুশল অনেকটা অসহায়ের মতো বলল।

তোর যা খুশি তাই কর। সব বিক্রি করে দে, বিলিয়ে দে, যা তোর ইচ্ছে, শুধু আমাকে তুই মুক্তি দে বাবা। আমাকে দায়মুক্ত না করলে আমার যে মুক্তি নেই।

জ্যাঠামণির গলায় যেন কাকুতি ঝরে পড়ল। কুশল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে, তোমার যদি তাতে শান্তি হয় তবে তাই হোক।

লণ্ঠনের আলোয় কুশল লক্ষ্য করল জ্যাঠামণির মুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন ভীষণ একটা উদ্বেগের হাত থেকে মুক্তি পেলেন তিনি।

তুই আমাকে বাঁচালি বাবা, পরম স্বস্তির কণ্ঠে তিনি বললেন, ভগবান তোর মঙ্গল করুন। তুই একটু বোস, আমি আসছি।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কুশল তাকিয়ে দেখল ঘরে একটা বড় খাট আর কিছু আসবাব। দুটো আলমারিও চোখে পড়ল।

জ্যাঠামণি ফিরে এলেন। তাঁর হাতে একটা বড় খাম। সেটা কুশলের হাতে দিয়ে তিনি বললেন, এর মধ্যে আমার দানপত্র আছে। বাড়ি, জমি-জমা, বিষয়-সম্পত্তি সব আমি তোর নামে লিখে দিয়েছি। উকিলের সামনে সই করেছি, দু'জন সাক্ষীর সইও আছে, কোনো গোলমাল নেই।

কুশল খামটা টেবিলের ওপর রাখল। জ্যাঠামণি বললেন, রাত্তিরে তোর খাবার অসুবিধে হবে। আমি একা মানুষ, রাত্তিরে আর রান্নাবান্নার ঝামেলা করি না, খই-দুধ খেয়েই কাটিয়ে দিই। তুই আজ আসবি জানলে ব্যবস্থা করতাম...

ও নিয়ে তুমি চিন্তা কোর না জ্যাঠামণি, কুশল বলল, আমি আজ বেলা করে খেয়েছি, একেবারে খিদে নেই।

তবে তোর বিছানাটা করে দিই, জ্যাঠামণি বললেন।

তুমি কেন করবে! কুশল বাধা দিয়ে বলল, আমি নিজেই করে নিতে পারব। লেপ, মশারি সবই তো আছে দেখছি।

ঠিক পারবি তো বাবা? জ্যাঠামণির গলায় একটু কিন্তু কিন্তু ভাব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুশল বলল, দিল্লিতে আমি একাই তো থাকি, নিজের অনেক কাজই আমাকে করতে হয়, তুমি চিন্তা কোর না।

তবে তুই বিছানা করে শুয়ে পড়, অনেক ধকল গেছে আজ তোর। এই লণ্ঠনটা ঘরে রইল।

জ্যাঠামণি বেরিয়ে যেতে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, তোরা যখন এখান থেকে চলে গেলি তখন তুই খুব ছোট। ছোটবেলার কথা মনে আছে তোর?

কিছু কিছু আছে, কুশল বলল, বাবার সঙ্গে তোমাদের কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, আর মা ঘোমটা টেনে দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই দৃশ্যটা স্পষ্ট মনে আছে।

তোর মা ছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, জ্যাঠামণি বললেন, শত অবিচারেও কোনোদিন মুখ ফুটে প্রতিবাদ করেননি।

আমি মা লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলেছি।

কুশলের কানে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এল। তারপরেই চলে গেলেন জ্যাঠামণি।

কুশল বিছানা করে শুয়ে পড়ল। শীতের রাত, তার ওপর সারাদিনের ধকল, লেপ মুড়ি দিয়ে বালিশে মাথা ঠেকাতে না ঠেকাতেই চোখে নেমে এল রাজ্যের ঘুম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে কুশল ঘরে ফিরে এল। খামটা টেবিলের ওপর ছিল, সেটা হাতে নিয়ে ভেতরের কাগজটায় ও একবার চোখ বুলাল, তারপর রেখে দিল সুটকেসের ভেতর।

একটু চা পেলে ভাল হতো। জ্যাঠামণি হয়তো এখনও ওঠেননি। বুড়ো মানুষ। ও বেরিয়ে পড়ল, যদি বাইরে কোনো চায়ের দোকান চোখে পড়ে। কিছুটা হাঁটবার পর একটা বাড়ি দেখতে পেল কুশল। এই বাড়িটা আগেও ছিল, ওর মনে পড়ল এই বাড়িতে ও আসত।

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কুশল ইতস্তত করছিল এমন সময় আধপাকা চুল একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, কাকে চাই?

না, মানে, কুশল একটু আমতা আমতা করে বলল, আমি ছোটবেলায় এখানে ছিলাম। আমার নাম কুশল মজুমদার। আমার জ্যাঠামণির নাম অম্বিকা মজুমদার, গতকাল রাত্তিরে আমি এখানে এসেছি।

কুশল! ভদ্রলোকের দু'চোখ যেন বিস্ফারিত হলো, তুমি অনন্তর ছেলে!

হ্যাঁ, কুশলের মুখে হাসি ফুটল, এ বাড়িতে আমি ছোটবেলায় আসতাম।

আসতেই তো, তোমার বাবা যে আমার খুব বন্ধু ছিলেন, ভদ্রলোক বললেন, আমি কত বলেছিলাম বিষয়-সম্পত্তির জন্য কেস লড়তে। এখানকার সবাই জানত তোমার জ্যাঠামণি কেমন করে তোমার বাবাকে ঠকিয়েছিলেন, সাক্ষীর অভাব হতো না। কিন্তু তোমার বাবা কিছুতেই রাজী হননি। দাদার বিরুদ্ধে কোর্ট-কাছারি প্রাণ গেলেও নয়, এ কথাই বলেছিলেন তিনি। এসো, ভেতরে এসো।

তিনি কুশলকে ভেতরে নিয়ে গেলেন, বাড়ির সবাইকে ডেকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এর মধ্যে একটি বউ এক পেয়ালা চা আর একটা রেকাবিতে কুচো নিমকি দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিয়ে কুশল যেন বাঁচল।

তারপর হঠাৎ তুমি এখানে! সেই ভদ্রলোক বললেন, তোমার জ্যাঠামণির খবর তোমাকে কে দিল?

কে আবার দেবে, কুশল হাসল, জ্যাঠামণি নিজেই আমাকে এখানে আসার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। বিষয়-সম্পত্তি সব আমাকে দিয়ে তিনি মুক্ত হতে চান।

এই সুবুদ্ধিটা যদি তাঁর আগে হতো, ভদ্রলোক বললেন। তা গতকাল রাত্তিরে তুমি এসেছ বললে, কোথায় উঠেছ?

কেন, আমাদের বাড়িতেই। কুশল অবাক হয়ে জবাব দিল, আর কোথায় উঠব! জ্যাঠামণি তো আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন।

তোমার অপেক্ষায় ছিলেন! এবার যেন ভদ্রলোকের অবাক হবার পালা।

হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হলো। জ্যাঠামণি অনেক দুঃখ করলেন অতীতের ঘটনার জন্য। তাঁর দানপত্র আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি অবিশ্যি নিতে চাইনি, কি হবে এসব দিয়ে আমার!

ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত কেউ কথা বলল না। তারপর সেই ভদ্রলোকই মৃদু কণ্ঠে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি, তিনদিন হলো তোমার জ্যাঠামণি মারা গেছেন। শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। বাড়িতে একজন কাজের লোক ছিল, সেই তাঁর দেখাশোনা করত। সেও চলে গেছে। আমরাই তোমার জ্যাঠামণিকে দাহ করেছি।

কিন্তু আমি যে..., হতভম্বের মতো বলল কুশল। তখুনি ওর মনে পড়ল জ্যাঠামণির সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বলেছিলেন, 'আমি যে তোর অপেক্ষাতেই আছি, তুই না আসা পর্যন্ত যেতে পারছি না।' তবে কি তাঁর অনুতপ্ত আত্মা যতক্ষণ পর্যন্ত না দলিলটা ওর হাতে তুলে দিচ্ছে ততক্ষণ মুক্তি পাচ্ছিল না!

ছবিঃ অমিত চক্রবর্তী

ভুতুড়ে

শৈবাল চক্রবর্তী

তিনটে ভূতের শোন না মজা,
একটা হারু, একটা গজা,
আর একটা তো নেহাৎ খোকা,
দিলদরিয়া কিন্তু বোকা।
এই তো সেদিন ছুটির দিনে,
কোত্থেকে এক তবলা কিনে,
ধাঁই ধমাধম বাজায় জোরে,
রাতবিরেতে ঘুমের ঘোরে।

লাফিয়ে পড়ে এ ওর ঘাড়ে
বেজায় ক্ষেপে রদ্দা ঝাড়ে।
যতই বলি, হল্লা থামা,
কেউ শোনে না, পেটায় ধামা।
ভূত তো তারা সত্যি বটে,
কিন্তু আছে বুদ্ধি ঘটে।
বেকার বলেই এমনি করে,
সারাটা দিন হেদিয়ে মরে।
কাজ পেলে সব খোশমেজাজে,
কাপড় কাচে বাসন মাজে।
হাটখোলাতে দৌড়ে হাঁটে,
চটকলেতে চিমনি চাটে।

ছবিঃ সুফি

হার্জ আবিষ্কৃত তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ।

বৃটেনকে বাঁচিয়েছিল একটি আবিষ্কার

শৈলেন দত্ত

প্রায় ষাট বছর আগের কথা। বিশ্বজুড়ে তখন মহাযুদ্ধের দামামা বাজছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ, আগুনের লেলিহান শিখা। বোমারু বিমান হানা দিচ্ছে যখন-তখন মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে। চারিদিকে হাহাকার। বুক-ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ছে মানুষ।

১৯৪০ সাল। মে-জুন মাস।

জার্মান বাহিনীর মুখে ফ্রান্সের পতন ঘটল। রাশিয়া, আমেরিকা তখনো বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানি তখন সারা দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

এবার বৃটেনের পালা। জার্মানির করাল গ্রাসের মুখে এবার বৃটেন। জার্মানির উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে বৃটেনেরও শীঘ্রই পতন ঘটবে।

'তিন সপ্তাহের মধ্যে মুরগীর ছানার মতো জার্মান বাহিনী বৃটেনের ঘাড় মটকে দেবে'—ফ্রান্সের পতনের পর ফরাসি অধিনায়ক ম্যাক্সিমে ইগান্ড মন্তব্য করলেন।

হিটলারেরও সেইরকম ধারণা। বার বার বিমান আক্রমণ করে আর সাগরপথে ডুবোজাহাজের আক্রমণে বৃটেনকে পদানত হতে বাধ্য করবে জার্মানি। জনপদের হাট-বাজার, কল-কারখানা, অস্ত্রাগার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে আর বন্দরের জাহাজের সারি আক্রমণের মুখে পর্যুদস্ত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তামাম বৃটেনের ভাগ্য আসন্ন মৃত্যুর ট্রাপিজের ওপর ঝুলছে। কখন পড়ে যায় কে জানে!

জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জার্মান বাহিনী আকাশপথে বারবার হানা দিয়েছিল। জার্মানির যুদ্ধজাহাজ ও বোমারু বিমান একের পর এক ধ্বংস করে যাচ্ছিল বৃটেনের পোতাশ্রয়, বিমানবন্দর, কল-কারখানা, অফিস-আদালত, জনবসতি।

রাস্তার দু' ধারের সারি সারি প্রাসাদ-অট্টালিকা-বাড়িঘর বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়ছে ঝুপ ঝুপ করে। কাতারে কাতারে মানুষ প্রাণভয়ে জীবন হাতে করে পথে পথে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথায় আশ্রয়! যতদূর চোখ যায় শুধু শ্মশানের নিস্তব্ধতা। জনমানবহীন খাঁ-খাঁ করছে চারিধার। কোথায় আশ্রয় মিলবে! দিনের বেলাতেও লন্ডন নগরী যেন চোখে কালো ঠুলি পরে বসে আছে।

আসন্ন পতনের মুখে দাঁড়িয়েও দাঁতে

দাঁত দিয়ে লড়াই করে চলেছে বৃটেন। প্রথম প্রথম ফ্রান্স-পোলান্ডের মতোই জার্মানির সবরকম চাপের মোকাবিলা করছিল বৃটেন। কিন্তু হল্যান্ডের রোটারডামের আঘাতের মতোই আঘাত যখন নির্বিবাদী শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ওপর বারংবার পড়তে লাগল তখন বৃটেনের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়তে লাগল।

এবার মরণ-কামড়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল বৃটেন। হিটলারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বৃটেনের যুদ্ধেও তাঁর জয় অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু হিটলারের নাৎসী বাহিনী ভাবতেই পারেনি ভাগ্যদেবী অলক্ষ্যে বসে হাসছেন। বৃটেনের ফাইটার প্লেনগুলো আকাশে উড়ে জার্মানির বোমারু বিমানগুলোকে এবার ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক স্থানে শনাক্ত করে আকাশপথেই একের পর এক ধ্বংস করে দিতে লাগল। মাটির অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট বন্দুকের আগুনগুলো ঠিক সময়ে ঠিক মতো জার্মানির বোমারু বিমানগুলোকে টার্গেট করতে লাগল। অব্যর্থ লক্ষ্য, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ! জার্মান বিমান ভূপতিত হতে লাগল একের পর এক। মনে হতে লাগল বৃটেন যেন অদৃশ্য কোনো চোখের সাহায্যে সব কিছু নিখুঁতভাবে তল্লাশী করে ফিরছে। বস্তুত তাই ঘটতে লাগল।

জার্মান বাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

এই নিগূঢ় রহস্যের চাবিকাঠিটি কি?—বৃটেনের হাতের চাবিকাঠিটি ছিল 'রাডার'। এই প্রথম শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করার কাজে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হলো রাডার। ইংলন্ডের দক্ষিণ উপকূলের রাডার স্টেশনগুলো বৃটেনের বিমানপথে আসার অনেক আগেই ধরে ফেলতে লাগল জার্মান বিমানগুলোর গতিবিধি। শুধু কি তাই, ক'টা বিমান আসছে, আকাশে কত ওপরে তাদের অবস্থান, কোন দিকে যাচ্ছে, কত তাদের গতিবেগ সবই জানিয়ে দিতে লাগল রাডার।

বৃটেনের রয়েল এয়ারফোর্সের বিমানের সংখ্যা অনেক কম হলেও ঐ অল্পসংখ্যক

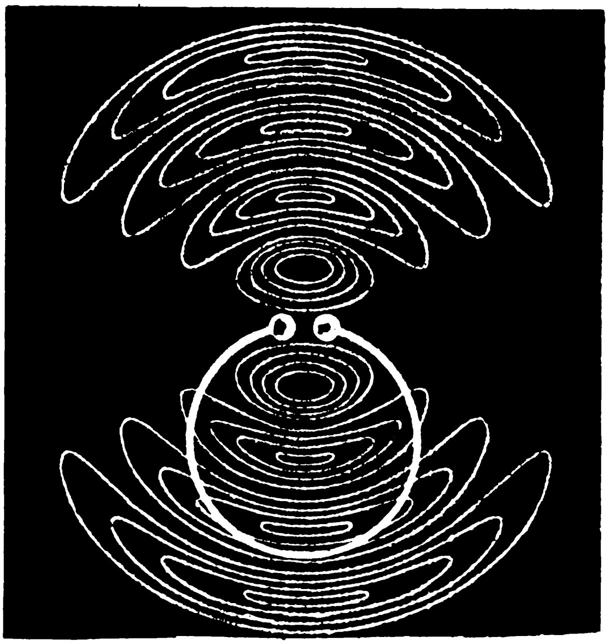

আংটি-আকারের রেসোনেটরের ফাঁকে ইলেকট্রিক স্পার্ককে ঘিরে এরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

বিমান ও সাজসরঞ্জাম নিয়েই বৃটেন সেদিন মরণপণ লড়াই করল জার্মান বাহিনীর সঙ্গে। রাডারের সাহায্যে ঠিক সময় ঠিক জায়গায় সেগুলো কাজে লাগিয়ে বৃটেন অমন শক্তিশালী জার্মান বাহিনীকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। জার্মানির ক্ষতির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগল।

১৯৪০ সালে শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বৃটেনের প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোনো ক্ষতিই হয়নি। অক্ষত, অটুট রয়ে গেছে বৃটেনের যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম।

ভাগ্যলক্ষ্মী বিজয়মাল্য পরিয়ে দিলেন বৃটেনের গলায়। প্রবল পরাক্রমশালী অমন দুঁদে রাষ্ট্রনায়ক হিটলার মাথা হেঁট করলেন বৃটেনের কাছে। বৃটেনের আক্রমণের মুখে হিটলারের বাহিনীকে পিছু হটতে হলো। তিনি সে বছরের মতো বৃটেন আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন।

'রাডার' তখনো জার্মানির হাতে আসেনি। তারা ভাবতেই পারেনি বৃটেন এত কম অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তাদের পর্যুদস্ত করে ফেলবে। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জার্মানির কাছে বৃটেনের এই সমর অভিযান পরম বিস্ময়কর হয়ে উঠল।—'বৃটেনের এই সাফল্যের পশ্চাতে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে?'—হিটলার রক্তচক্ষু মেলে দিবারাত্র চিন্তা করতে লাগলেন। সমরবাহিনীর উপর্যুপরি পতনে তিনি তখন অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছেন। কিন্তু কি আর করা!

রাডার প্রস্তুতির বিস্ময়কর সাফল্যই বৃটেনকে সে দিন রক্ষা করেছিল। সে দিন তার পাশে ঐ আক্রমণের মুখে আর কোনো মিত্রশক্তির সাহায্য সে পায়নি। পরের বছর হিটলার বৃটেন জয়ের আশা ত্যাগ করে রাশিয়ার দিকে মুখ ঘোরালেন। বৃটেন বেঁচে গেল যুদ্ধের লেলিহান শিখা থেকে। অধিকৃত ইউরোপের মুক্তির দূত হয়ে দাঁড়াল বৃটেন। অধিনায়ক ম্যাক্সিমে ইগান্ডের কটাক্ষপূর্ণ উক্তির প্রত্যুত্তরে বৃটেনের আপৎকালীন পরিস্থিতির শেষে উইনস্টোন চার্চিল বললেন, 'হ্যাঁ, কিছু মুরগীর ঘাড় মটকেছে, বৃটেনের নয়—জার্মানির আর অন্য কয়েকটি দেশের।'

যে মানুষটি সেদিন বৃটেনকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবিস্মরণীয় জয়ের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি স্যার রবার্ট ওয়াটসন ওয়াট। স্কটল্যান্ডের ব্রেচিনে তেরই এপ্রিল

আঠার শ' বিরানব্বই সালে তাঁর জন্ম। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ দেখা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডান্ডি কলেজ থেকে তিনি পদার্থবিদ্যায় ডিগ্রি লাভ করেন। বেতার টেলিগ্রাফি হয়ে উঠল তাঁর প্রিয় বিষয়।

১৯১৫ সালে ওয়াটসন আবহাওয়া দপ্তরে যোগদান করলেন। বজ্র-বিদ্যুৎসহ প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস জানার জন্যে ঐ দপ্তর নানা কলাকৌশলের কথা ভাবছিল। ওয়াটসন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে একটা উপায় উদ্ভাবন করলেন। বেতার-তরঙ্গ মেঘের পরপারে পাঠিয়ে এবং ক্যাথড রশ্মিতে তাকে সংগ্রহ করে তিনি ঝড়ের পূর্বাভাস শনাক্ত করতে লাগলেন।

১৯৩৩ সাল। ইংলন্ডের জাতীয় পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারে বেতার বিষয়ক গবেষণার সর্বময় কর্তারূপে নিযুক্ত হলেন ওয়াটসন। এই সময় অভিযোগ উঠল আকাশে বিমান থাকলে বেতার তরঙ্গ প্রেরণে ও গ্রহণে বিঘ্ন ঘটছে। ওয়াটসন গবেষণার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করলেন যে প্রায় আলোকের গতিবেগের সমতুল্য বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ (electro-magnetic waves) আকাশের বিমানের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তার গতিপথ থেকে সরে যাচ্ছে।

বিষয়টা শাপে বর হয়ে দাঁড়াল বিজ্ঞানী ওয়াটসনের কাছে। এই অসুবিধাটাই পরম সুবিধা হয়ে দাঁড়াল পরবর্তীকালে রাডার উদ্ভাবনের কাজে। ওয়াটসন স্থির নিশ্চিত হলেন যে, এই বিষয়টিকেই উড়ন্ত বিমানের গতিপথ নির্ণয়ের কাজে সদ্ব্যবহার করা যায়। মাটি থেকে বেতারতরঙ্গকে যে কোনো দিকে প্রেরণ করা যায় এবং সেই বেতারতরঙ্গ যখন বিমানের মতো কোনো কঠিন বস্তুর গায়ে গিয়ে ধাক্কা খায় তখন তা আবার প্রতিবিম্বিত হয়ে ফিরে আসে। এই প্রতিবিম্বিত রশ্মিকে ক্যাথড রশ্মির যন্ত্রে সংগ্রহ করে কঠিন বস্তুটির দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। তারপর বিশেষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে সুদক্ষ যন্ত্রচালকেরা বিমানের দূরত্ব, গতিবেগ, দিক ও বিমানের সংখ্যা সঠিকভাবে ধরে ফেলতে পারবেন। এই মূলনীতিকে আশ্রয় করেই ওয়াটসনের রাডার যন্ত্র তৈরি হয়।

রাডার-এর ভাবনা-চিন্তা অবশ্য বিজ্ঞানীদের মাথায় এর অনেক আগেই ঘোরাফেরা করছিল। প্রকৃতপক্ষে জার্মানিতে এবং আমেরিকায় রাডার নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে গবেষণা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দশকেই। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হেনরিচ্ হার্জ এই গবেষণায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। হার্জ একটা মাইক্রোতরঙ্গ প্রেরক (micro wave transmitter) এবং সংগ্রাহক (receiver) ও পার্শ্ব প্রতিফলক (reflector) স্থাপন করে ধীরে ধীরে সংগ্রাহক যন্ত্রটি সরাতে থাকেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে কতকগুলো এলাকা পড়বে যেখানে তিনি আর কোনো সংকেত পাবেন না। তিনি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (wave length) নির্ণয় করলেন। তিনি দোলনের কম্পাংক (frequency) জানতেন ফলে তাঁর প্রায় সমস্ত তথ্যই জানা হয়ে গেল। কম্পাংক (frequency)-কে তরঙ্গদৈর্ঘ্য দিয়ে গুণ করে তিনি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের গতি নির্ণয় করলেন। দেখা গেল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের গতি আলোকের গতির সমান—প্রতি সেকেন্ডে তিরিশ কোটি মিটার। প্রেরক (transmitter) ও সংগ্রাহক (receiver) যন্ত্র দুটি এবার হার্জ প্রতিফলক (reflector) বা বৃহদাকার অবতল দর্পণের সাহায্যে সুসজ্জিত করলেন। হার্জ আবিষ্কার করলেন যে আলোকরশ্মি যে ভাবে কেন্দ্রীভূত করা যায়, ঠিক সেই ভাবে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গও কেন্দ্রীভূত করা যায়। তরঙ্গগুলি আলোকতরঙ্গের মতোই সব কিছু করল। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের তত্ত্বটির জয় সূচিত হলো। হেনরিচ্ হার্জ মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে রাডার-এর এই আবিষ্কারের দ্বার উদ্ঘাটন করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করলেন। তিনি 'বন' বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। আজকের টেলিভিশন অ্যান্টেনার কলাকৌশল এই বিজ্ঞানী হার্জই উদ্ভাবন করেন। আজকের 'রেডিও'-ও হার্জের আবিষ্কার।

কিন্তু ওয়াটসনের কৃতিত্ব, তিনি রাডারকে অন্য সব প্রতিযোগী দেশের অনেক আগেই কাজে লাগান এবং সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেন।

১৯৩৫ সালে ওয়াটসন তাঁর দলবল নিয়ে রাডারের কার্যকারিতা দেশের সামনে তুলে ধরেন। আকাশপথে আট মাইল দূরে উড়ে যাওয়া বিমানের ছায়া রাডারে ধরা পড়ল। যন্ত্রপাতির আরও উন্নতিসাধন করে এবং আরও দূরপাল্লার বিমানকে এর সীমানায় নিয়ে ১৯৩৭ সালে বিশেষ গোপনীয়তার সঙ্গে রাডারকে কাজে লাগানো হয়। বৃটেনের দক্ষিণ উপকূল জুড়ে রাডার স্টেশন স্থাপিত হলো। মাটির নিচে সংগ্রাহক যন্ত্র স্থাপন করা হলো। অপারেটররা শত্রুপক্ষের বিমানকে আকাশপথে চিহ্নিত করে তৎক্ষণাৎ খবর প্রেরণ করে দিতে লাগল অ্যান্টি এয়ারক্রাফট বাহিনীর কাছে। সমস্ত তথ্যই এত গোপন রাখা হয় যে, যুদ্ধের সংকট ও বিভীষিকা কেটে যাবার পর দেশবাসী 'রাডার' সম্বন্ধে জানতে পারে। এই কৃতিত্বের জন্যে ওয়াটসনকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

রাডার-এর বিস্ময়কর আবিষ্কার আজকের বিজ্ঞান-নির্ভর দুনিয়ায় আরও কত কাজেই না ব্যবহৃত হচ্ছে। 'রাডার' ছাড়া আজকের ঝাঁকে ঝাঁকে অন্ধভাবে বিমান চলাচল করা সম্ভবই হতো না। সাইক্লোন এবং মৌসুমী মেঘের বার্তা রাডারই আগেভাগে জানিয়ে দিয়ে মানুষকে সতর্ক করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই একটি আবিষ্কার কত মানুষের যে প্রাণরক্ষা করে এবং দেশকে কত সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে যে বাঁচায় তা পরিমাপ করে শেষ করা যায় না। ওয়াটসন বৃটেনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন ঐ একটি আবিষ্কারের প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করার জন্য যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম সংকট মুহূর্তে বৃটেনকে রক্ষা করেছিল।

রক্তচোষা

গৌরী দে

ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে পাথর হয়ে গেল মালিনী। কতই বা বয়স ওর? এই তো তিরিশে পা দিয়েছে, এরই মধ্যে হঠাৎ যেন সে বুড়িয়ে গেছে। সংসারে দাদাই ছিল তার সব। ছোট্ট বয়সে সে বাবা মাকে হারিয়েছে। তাঁদের কথা তার মনেও নেই। দাদাই তাকে এতদিন আগলে রেখেছিল। কিন্তু কি যে হলো; সেদিন রাত্তিরে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে শুতে গেল দুজনে। মালিনীর ঘর প্রণবেশের ঘরের একটু দূরে। পরদিন ভোরবেলা বীণার চিৎকারে ঘুম ভাঙল মালিনীর। বীণা তাদের কাজের লোক। ভোরবেলা দাদাবাবুকে চা দিতে গিয়ে সে দেখে, ঘরের দরজা খোলা আর দাদাবাবু বিছানায় শুয়ে। তার সমস্ত শরীর রক্তহীন। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ডাক্তার এলো, থানা-পুলিশ হলো, সবশেষে পোস্টমর্টেম। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পড়ে চমকে গেল মালিনী। প্রণবেশের গলার কাছে দুটো দাঁতের দাগ পাওয়া গেছে। কেউ যেন ঐ দুটো ক্ষত দিয়ে শরীরের সমস্ত রক্ত টেনে নিয়েছে।

মালিনীর ধারণা—তাদের বিরাট সম্পত্তির লোভে কেউ দাদাকে হত্যা করেছে, এবার তার পালা। কেন না তারা দুজন ছাড়া আর তো কেউ নেই এই সম্পত্তি ভোগ করার। ভাইবোনে কেউই বিয়ে করেনি। ঠিক করেছিল তাদের মৃত্যুর পর সব দান করে যাবে ভাল কাজে। কি করেই বা জানবে মালিনী, এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে? ঠিক এই মুহূর্তে তার একজন অভিভাবক থাকলে ভাল হতো।

মনে পড়ল কৌশিকের কথা। দাদা কয়েকমাস আগে একদিন হঠাৎ একটি ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ঢুকল। বলল, দেখ মালিনী, নিচের ঘরটা তো খালি থাকে, একটা লোক থাকলে ভাল হয়। এই ছেলেটির নাম কৌশিক, চন্দননগরে থাকতো, এখানে চাকরি নিয়ে এসেছে। এদিককার কিছুই ওর জানা নেই। তাই বলছি কিছুদিনের জন্যে ও পেয়িং গেস্ট হিসেবে ওই ঘরেই থাকুক। অবশ্য ওকে খেতে দিতে হবে না। ওর চাকরিটা বড় অদ্ভুত। নাইট ডিউটি, সারাদিন ও ঘুমোবে, রাত্তিরে বেরোবে আবার ভোরবেলা ফিরে আসবে। কোনো ঝামেলা নেই।

দাদার কাণ্ড দেখে খুব রাগ হলো মালিনীর। কোথাকার কে তাকে দুম করে বাড়ি এনে তুলল দাদা, এ তো রীতিমতো বাড়াবাড়ি। কৌশিকের সামনে আর কিছু বলল না সে। পরে আড়ালে বলল, জানাশোনা নেই, কেমন লোক জান না, একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলে দাদা? যদি কিছু হয়...

হো হো করে হাসল প্রণবেশ। কি হবে? চুরি, ডাকাতি, মারপিট, দাঙ্গা করবে? আরে বাবা, ছেলেটাকে দেখেই এনেছি আমি। বাঙালী খ্রিশ্চান, বাড়ির সামনে রাস্তায় বসে ছিল, দেখে মায়া হলো বুঝলি। যাকগে, তোর যদি পছন্দ না হয়, চলে যেতেই বলব।

ক্ষুণ্ন হলো মালিনী, বলল, আমি কি তাই বলেছি—দাদা?

সান্ত্বনা দিয়ে বলল প্রণবেশ, আমি জানতুম রে। তুই কখনও আমার কাজের বিরুদ্ধে যাবি না।

এখন মনে হচ্ছে মালিনীর, বিরুদ্ধে গেলেই বোধহয় ভাল ছিল। কেন না কৌশিককে সে কিছুতেই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেনি। কৌশিক হয়তো তারই বয়সী। কিন্তু এমন ধরনের চাকরি সে জীবনে দেখেনি। সারারাত ওর কিসের ডিউটি?

ভাবতে ভাবতে মালিনী দাদার ঘরে

ঢুকল। সন্ধ্যা হয় হয়। অল্প পাওয়ারের আলো জ্বেলে ও তাকাল দাদার খাটের ধারে দেওয়ালে টাঙানো বিরাট আয়নাটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে খাটটাকে ধরে ফেলল মালিনী। সেই আলো-আঁধারে আয়নার গায়ে ফুটে উঠতে লাগল একটা ছায়া। চট করে মালিনী পেছন ফিরে তাকাল। পেছন থেকে কেউ...না তো! দরজা তো ভেজানো, তবে কার ছায়া পড়ল? আবার সে তাকাল আয়নার দিকে। কেউ কোথাও নেই। তবে কি সে ভুল দেখল? তার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল নাকি!

মালিনী ভাবতে ভাবতে ফিরে এলো ঘরে। বারান্দা দিয়ে একতলার ঘরটা দেখা যায়। নিজের ঘরে ঢোকার মুখে মালিনী একবার তাকাল কৌশিকের ঘরের দিকটায়। এখনও অন্ধকার। আশ্চর্য, ঠিক রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘরের আলোটা রোজ জ্বলে ওঠে!

পরদিন সন্ধ্যেবেলা মালিনী দাদার কথাই ভাবছিল। ভাবছিল ওর ভবিষ্যতের কথা। ও মনে মনে বলল, হায় ভগবান! একবার যদি জানতে পারতুম কে দাদাকে খুন করেছে তবে হয়তো কিছু করতে পারতুম। নিজেকেও বাঁচাতে পারতুম বোধহয়। ঠিক সেইসময় মালিনীর হঠাৎ মনে হলো আগের দিনে দেখা ছায়ামূর্তির কথা। খুব যেন চেনা গড়নটা। ছায়াটা কার?

ভাববার সঙ্গে সঙ্গে মালিনী দেখল সে চলতে শুরু করেছে। ঘর পেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে ওকে কে যেন টানতে টানতে নিয়ে চলল প্রণবেশের ঘরের দিকে।

ঘরের আলোটা জ্বালাতেই সেটা দপ করে নিভে গেল। লোডশেডিং। সূর্য অস্ত গেছে। অন্ধকার বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। বীণার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল মালিনী, কারো সাড়া পেল না। কোথায় যে যায় সব—নিজের মনেই গজগজ করতে করতে বেরোতে গেল মালিনী। আশ্চর্য! তার নিজের বাড়ি, অথচ ঘরের দরজা খুঁজে পাচ্ছে না কেন? হাতড়াতে হাতড়াতে ওর হাতে একটা কি নরম মতো লাগল! কে কে করে চিৎকার করে উঠল মালিনী। বরফের মতো ঠাণ্ডা, একটা মানুষের দেহ বলে মনে হলো। মালিনী আবার চিৎকার করে ডাকতে লাগল বীণাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে আলোটা ফের জ্বলে উঠল। মালিনী দেখল কৌশিক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। চমকে উঠল মালিনী। তুমি...তুমি এখানে?

কৌশিক বিনীত স্বরে বলল, আপনি চিৎকার করছিলেন, ভাবলাম ভয় পেয়েছেন, তাই ছুটে এলুম।

তুমি তো এসময় ঘুমোও। বীণা কোথায়?

আজ আমার ছুটি। আপনার যদি দরকার থাকে আমি থাকতে পারি।

কৌশিকের চোখ দুটো কেমন যেন। মালিনীর ভাল লাগল না। বলল, না তুমি যাও। আমি ঠিক আছি।

কৌশিক চলে যেতে মালিনী ভাবতে লাগল, যদি সত্যিই কৌশিকের গায়ে হাত পড়ে থাকে তবে তার গা এতো ঠাণ্ডা কেন?

কি মনে হতে ঘরের দরজায় খিল তুলে দিল মালিনী, তারপর তাকাল আবার আয়নার দিকে। একটা ভয় মেশানো প্রচণ্ড কৌতূহল তাকে পেয়ে বসল। ঐ ছায়ামূর্তি কার? কেনই বা আয়নায় সে দেখছে ছায়ামূর্তিটা ছুটে আসছে তার দিকে? সে যদি মৃত্যু হয় তবে তার মুখ দেখতে চায় সে? হঠাৎ সে একটা কাণ্ড করল। দাদার আলমারি থেকে ভাগবত গীতা বার করল, চেপে ধরল সেটা বুকের ওপর। তারপর আয়নার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, দাদা, আমি বুঝতে পেরেছি আয়নার মধ্যে যাকে তুমি দেখাতে চাইছ সে আমাকে হত্যা করতে চায়। তোমাকেও সে হত্যা করেছে। আমি তার মুখ দেখতে চাই। তুমি দেখাও। বুকের ওপর গীতা। মালিনীর হঠাৎ আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হলো। গীতা থাকায় কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সে আবার চাপা গলায় বলে ওঠে, দাদা তুমি দেখাও কে তোমাকে হত্যা করেছে।

আয়নায় ছায়ামূর্তিটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে লাগল। মালিনী চিৎকার করে উঠল—কৌশিক!

এ সে কী দেখছে! কী বীভৎস কৌশিকের মুখটা, দু'পাশে দুটো শ্বদন্ত—দু'কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। এ যে রক্তচোষা! কৌশিক তাহলে মানুষ নয়, জীবন্ত প্রেত! যারা শুধু রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে?

কতক্ষণ যে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিল মালিনী সে জানে না। জ্ঞান যখন ফিরল তখন গভীর রাত। ভয়ে ও দরজা খুলতে পারল না। ও জানে দিনের আলো নিভে এলেই এরা জীবন্ত হয়ে ওঠে আর দিনের বেলা মরে থাকে। সারারাত সে বসে কাটিয়ে দিল। পরদিন ভোর হতেই সে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল ওর প্রিয় বান্ধবী বিপাশার বাড়ি। বিপাশার বাবা তন্ত্রসাধক। সব শুনে উনি বললেন, কৌশিকের ঘরের দরজা কি খোলা থাকে দিনের বেলা?

ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। বলল মালিনী। খোলে গভীর রাতে।

সেই সময় ওর ঘরে ঢুকে ওর ব্যবহার করা কোনো জিনিস যদি এনে দিতে পার তাহলে আমি ওর হাত থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে পারি। কিন্তু মনে রেখো এর জন্যে তোমার প্রাণসংশয় হতে পারে।

মরতে তো বসেছি কাকাবাবু। যদি বাঁচতে পারি সে চেষ্টা তো করতেই হবে। তবে কাজটা খুব শক্ত।

বিপাশার বাবা বললেন, আমি তোমার কাছাকাছিই থাকবো। কোনোরকম বিপদের আভাস পেলে চিৎকার করে উঠবে। ও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

বাড়ি ফিরে বীণাকে কোথাও খুঁজে পেল না মালিনী। তবে কি শয়তানটা বীণাকেও মেরে ফেলল! সারাদিন এতটুকু অন্নস্পর্শ করতে পারল না মালিনী। আজ সে এর শেষ করতে চায়—তাতে সে বাঁচুক বা মরুক।

সমস্তক্ষণ খেয়াল রাখছিল মালিনী। ঠিক বারোটা নাগাদ কৌশিকের ঘরে আলো জ্বলতেই, পা টিপে টিপে নেমে এলো মালিনী। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা। তবু নিজেকে শক্ত করল মালিনী। বুকে তার গীতা। তার ভয় কী!

ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক ছিল। তার

ভেতর দিয়ে মালিনী পরিষ্কার দেখল একটা দেহ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে পড়ে আছে আধশোয়া হয়ে। মুখটা একটু ঘোরানো। ঠিক বুঝতে পারল না ওটা কে, তবে চেহারা দেখে মনে হলো বীণা। ঠিক সেই মুহূর্তে কৌশিক পাশের ঘরে ঢুকল। টেবিলের ওপর শার্টটা খুলে রেখেছিল, ঐ শার্টটাই হাতাতে হবে মালিনীকে। কৌশিক পাশের ঘরে, যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে, টেবিলের কাছেই মৃতদেহটা। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে মালিনী। কিন্তু উপায় নেই, এ তার জীবনমৃত্যুর সংগ্রাম। মুহূর্ত দেরি না করে পা টিপে টিপে টেবিলের কাছে গেল মালিনী। চট করে শার্টটা টেনে নিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল আধশোয়া মৃতদেহের দিকে। অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে। বীণা মৃত, কিন্তু জীবন্ত। ওর দুটো শ্বদন্ত রক্তমাখা। চোখদুটো ঘুরছে। মালিনীকে দেখে উঠে বসল বীণা। দু'হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে গেল ওর শাড়ির আঁচল। ছিটকে ঘর থেকে পালিয়ে এলো মালিনী। দেখল কৌশিক দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। এক মুহূর্ত দেরি না করে মালিনী ছুটতে লাগল বাড়ির দরজা খুলে রাস্তা দিয়ে। কাছেই ছিলেন বিপাশার বাবা, চট করে ওকে গাড়িতে তুলে নিলেন।

বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরের সামনে গাড়িটা রাখলেন বিপাশার বাবা। তাঁর পরনে ছিল লাল চেলি, কপালে সিঁদুরের তিলক, গলায় রুদ্রাক্ষ। মালিনীকে বললেন, এসো, তাড়াতাড়ি।

মালিনীকে নিয়ে উনি ঢুকলেন মন্দিরের ভেতর। মালিনী দেখল মা কালীর মূর্তি, তার সামনে পুজোর আসন—উপচার সব আছে। পাশে একটা মাটির পুতুল রাখা, পুতুলটা প্রায় এক হাত লম্বা। বিপাশার বাবা মালিনীর হাত থেকে কৌশিকের ব্যবহৃত শার্টটা নিয়ে তাড়াতাড়ি পুতুলটার গায়ে পরিয়ে দিলেন। তারপর আসনে বসে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। মালিনী এখনও কাঁপছে। কৌশিক বীণাকে মেরে তাকে পিশাচ তৈরি করে রেখেছে। মালিনী পরিষ্কার দেখেছে বীণার দু'দিকের দুটো দাঁত তীক্ষ্ণ হয়ে বেরিয়ে আছে। তার দাদার গলাতেও এমনি দুটো দাঁতের ক্ষত পাওয়া গিয়েছিল। কেউ তার রক্ত শুষে নিয়েছিল। তাহলে তো মালিনীরও ওই পরিণতি হতো। ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল মালিনী। আর সেই মুহূর্তে ও যা দেখল, তা বুকফাটা আর্তনাদ হয়ে বেরিয়ে এলো কণ্ঠ দিয়ে কাকাবাবু, কৌশিক!

মালিনীর চিৎকার শুনে বিপাশার বাবা তাকিয়ে দেখলেন, যেখানে তাঁর গাড়িটা রেখেছিলেন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কৌশিক আর বীণা। মালিনীর চিৎকারে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। ওদের মুখে ফুটে উঠল বীভৎস এক হাসি। মালিনীর চোখের সামনে সব ঘুরতে লাগল। বুঝিবা অজ্ঞান হয়ে যায়। ওরা এগিয়ে আসছে মন্দিরের দিকে। আসছে বললে ভুল হবে, যেন উড়ে আসছে। প্রায় মন্দিরের চাতাল ছুঁই ছুঁই ঠিক তখুনি বিপাশার বাবা, মায়ের হাতের খাঁড়াটা খুলে নিয়ে পুতুলটার গলায় মারলেন এক কোপ। পুতুলের ধড় থেকে গলাটা আলাদা হয়ে মায়ের পায়ের কাছে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কৌশিকের ধড় থেকে গলাটা কেটে পড়ে গেল মাটিতে। কৌশিকের শক্তিতেই বীণা চালিত ছিল বলে সেই মুহূর্তে বীণার প্রাণহীন শরীরটাও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বিপাশার বাবা মন্ত্রপূত পুতুলটাকে তুলে নিয়ে মালিনীর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। তারপর খানিক দূরে একটা ডোবার মধ্যে ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে চললেন বাড়ির দিকে।

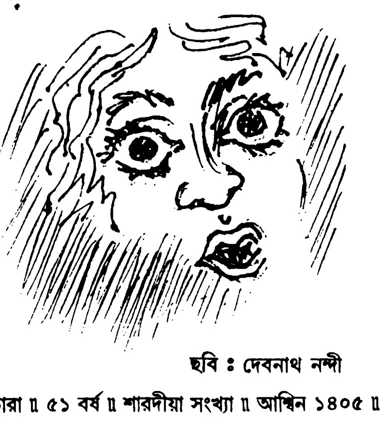

ছবি : দেবনাথ নন্দী

গরম ! গরম !

অমর দাশ

গরম খাবার দারুণ মজার,
দারুণ খাসা কচুরি।
জিলিপি গরম, রসগোল্লা গরম,
গরম ভালো ফুলুরি॥
বেগুনি গরম, খিচুড়ি গরম,
গরম ভাজা মাছ—
গরম খেয়ে হজম করুন—
ফুলকো লুচির রাশ।
গরম খবর দারুণ কাটে,
কাগজওয়ালা খুশি।
গরম গরম বক্তিমা করেন—
ভোট কুড়োনো মাসি॥
গরম যদি 'টাটকা' হয়,
শীতটা তবে 'বাসি'—
বরষা হলে ছুটোপুটি
বেশি ভিজলে কাশি।
রোদটা যদি বেজায় হয়,
পারা যদি বাড়ে।
গরম আর বরণ নয়,
প্রাণটা থাকুক ধড়ে॥

ছবি

আনসার উল হক

কি আঁকছিস, বাড়ি?
রামছাগলের দাড়ি।
সাপ না এটা ব্যাঙ?
দিশি ভেড়ার ঠ্যাং।

কি আঁকলি, বাঁশ?
দুলপো কচি ঘাস।
হাট না এটা ঘাট?
নকশী কাঁথার মাঠ।

আঁকিস কেন শুনি?
বল না রে টুনটুনি—
সবার মনের ছবি
আঁকাই আমার 'ছবি'।

ছবি : সুফি

মেজদাদার সাইকেল কাণ্ড

দীপঙ্কর বিশ্বাস

॥ সূচনা ॥

মাধ্যমিকে সেকেন্ড হবার পরেই মেজদার নাম হৈ-হৈ করে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আমাদের জেলা স্কুল থেকে কষ্টেসৃষ্টে দু' চারটে ফার্স্ট ডিভিশন পেলেও মাধ্যমিকে ফার্স্ট-সেকেন্ড হবার কথা আগে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। অন্য স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেরা মেজদার সঙ্গে আলাপ করতে এলো ছোটখাটো উপহার নিয়ে। কেউ নিল অটোগ্রাফ, কেউ তুলল ছবি। ব্যাপারটা চরমে পৌঁছোল যেদিন স্থানীয় পত্রিকা 'দুর্দান্ত দামামা' মেজদার একটা ছবি ছাপল। ঘোড়ায় চড়া মেজদা। বেশ দৃপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। ছবির তলায়

মেজদার নাম ধাম সব ঠিকঠাক লেখা।

ছবিটা দেখেই ছোড়দি খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। মেজদা একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাকাল ছোড়দির দিকে। "কিরে? হাসছিস যে!"

"হাসব না তো কি করব! তোমায় ওটা কিসে চড়িয়েছে? কেন চড়িয়েছে?"

"ঘোড়ায়, আবার কিসে?" আরো বেশি অপ্রস্তুত হলো মেজদা।

"ভালো করে আবার দেখো। ওটা ঘোড়া না—"

সেজদা বলল, "গ্-গ্-গা-গাধার মতন..."

সেজদাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল মেজদা, "তুই গাধার মতন বকিস না। ভালো করে তাকিয়ে দেখ...পরিষ্কার ঘোড়া।"

আমি আর সেজদা এক ঘরে থাকি বলে আমি সেজদার কথা অনেক চট করে বুঝতে পারি। আমি বললাম, "সেজদা ঠিক ওই কথাগুলোই ছোড়দিকে বলতে চাইছিল মেজদা, তোমায় কিন্তু বেশ মানিয়েছে ঘোড়ার পিঠে। বেশ আকবর বা নেপোলিয়ন বা শিবাজীর—"

আমার মুখের কথা ছোঁ মেরে নিয়ে নিল ছোড়দি। "ও মা। এ তো শিবাজীর ছবি গো। টুপির জায়গায় চুল বানিয়ে দিয়েছে। দাড়ি মুছে, কপাল চওড়া করে মুখের আদল খানিকটা তোমার মতন এনেছে। কিন্তু গোঁফটা মুছতে ভুলে গেছে।"

আমরা ঠাহর করে দেখলাম। একদম ঠিক বলেছে ছোড়দি। ঘোড়ায় চড়া অন্য কাউকে মেজদা বানানো হয়েছে। হতেও পারেন শিবাজী।

"কিন্তু ঘ্-ঘোড়ায় চড়ালো ক-কেন?" ছোড়দি বলল, "গাধায় চড়ানো অপমানের। ঘোড়ায় চড়ানোটা সম্মানের তো।"

"ঠিক জানো?" আমি জিজ্ঞেস করি।

ব্যাপারটা অপমানের না সম্মানের ভাবতে ভাবতে আমি, সেজদা আর মেজদা দৌড়োলাম পত্রিকার অফিসে। তখন বেলা দশটা।

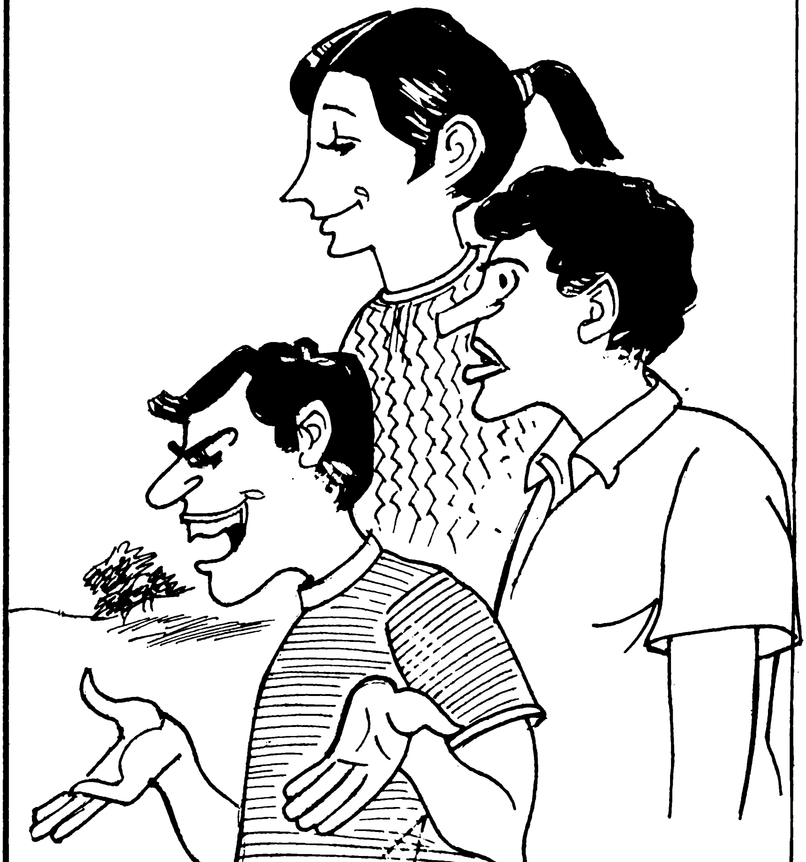

॥ দুর্দান্ত দামামা ॥

যারা গল্প-কবিতা লেখে বা পত্র-পত্রিকা চালায় তাদের দেখলেই চেনা যায়। উস্কোখুস্কো চুল, ঢোলা পাঞ্জাবি, একজনের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, একজনের কামানো দাড়ি, আরেকজনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ছোট অফিসঘরে তিনজন একমনে চানাচুর, মুড়ি, চা খাচ্ছিল আর টেবিলের ওপর ঠ্যাং নাচাচ্ছিল। মেজদা কোনও ভণিতা না করে নম্র গলায় জিজ্ঞেস করল, "এটা কি আমার ছবি বলে মনে হচ্ছে আপনাদের?"

ফ্রেঞ্চকাট মুড়ি চিবোতে চিবোতে পাল্টা প্রশ্ন করল, "আপনার ছবি মনে হবে কেন? আপনি পড়তে পারেন না?"

কামানো দাড়ি বলল, "তলায় তো পরিষ্কার লেখাই আছে আমাদের জেলার প্রতিভা, জেলার গৌরব, জেলার বারুদ, জেলার ইত্যাদি—শ্রীঅজয় কুমার রায়—"

খোঁচা খোঁচা দাড়ি বাকিটা শেষ করে দিল, "মাধ্যমিকে সেকেন্ড।"

মেজদার মেজাজটা স্বভাবতই এরপর অনেকটা নরম হয়ে এলো। মেজদা বিনীত স্বরে জানাল, "আমিই সেই অজয় রায়।"

মাত্র চারটে ছোট সাইজের কথায় যে এতো জোর, তা না দেখলে ভাবাই যায় না। মেজদার দিকে তিনজনেই এক লহমার জন্য তাকাল। তিনজনের মুখের ভাব দেখলে মনে হয় যেন ঘরের ভেতর একটা ছোট অ্যাটম বোমা ফেটেছে। ফ্রেঞ্চকাট "বাবাগো" বলে দরজা দিয়ে এক লাফে বেরিয়ে সামনের মাঠে গোল হয়ে দৌড়তে লাগল। খোঁচা খোঁচা চোখ কপালে তুলে চিৎ মেরে ভির্মি গেল,

আর বিড়বিড় করে কি সব আওড়াতে লাগল। মনে হলো তিনের নামতা। কামানো এমন একখানা বিষম খেল যে আমরা তিনজনে মিলে মাথায় ফুঁ আর পিঠে চাপড় লাগিয়ে ঠাণ্ডা না করলে বেচারা হয়তো অক্কাই পেত। কামানোর মুখটা আমার কেমন যেন চেনা চেনা লাগল। খোঁচা খোঁচা চোখ কপালে তুলে শুয়েই রইল। সেজদা বলল, "চ্..চ্..চা..."

মেজদা বলল, "কি? চান করবে বলছে, বিড় বিড় করে?"

আমি সেজদার কথা বুঝে, গেলাসের অবশিষ্ট গরম চা খোঁচা খোঁচার গলায় ঢেলে দিলাম। খোঁচা খোঁচা উঠে বসল।

মিনিট পাঁচেক লাগল তাদের ধাতস্থ হতে। তারপর তারা একযোগে বলে উঠল মেজদার পদধূলিতে 'দুর্দান্ত দামামা'র অফিস ধন্য।

মেজদা শুধোল, "আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়েছেন কেন?"

"সম্মান দেবার জন্য। নামী সব লোককেই ঘোড়ায় চড়াতে হয়।"

আমি বললাম, "ঘোড়া দূরের কথা, মেজদা তো সাইকেলেই চড়তে জানে না।"

সম্পাদক মণ্ডলীর তিনজনেই অবাক হলো।

"আশ্চর্য মশায়! মানুষ প্রথমে হাঁটে, তারপর সাইকেলে চড়ে, তারপরে অ..আ পড়ে।"

"পড়াশোনার ফাঁকে সাইকেল চড়ার সময় পাননি বোধহয়।"

"এমনিতেই এতো পড়া ছিল যে সাইকেল থেকে পড়াটা বাদ দিয়েছেন।"

মেজদার মুখটা সাইকেল চড়তে না জানার অপমানে লাল হয়ে উঠল। বেশ গরম গলায় মেজদা জিজ্ঞেস করল, "আমার অতো বড়ো গোঁফ লাগালেন কেন? আমার কি গোঁফ আছে? লোকে কি বলবে?"

"আপনি গোঁফের জন্য মোটেই ব্যস্ত হবেন না। গোঁফ আজ নেই কাল গজাবে। আপনি যখন পরের পরীক্ষায় জেলার মুখোজ্জ্বল করবেন তখন ওই ছবিটাই আবার ছাপবো আমরা। ওটা

সস্তা ফটো নয়, পোর্ট্রেট। আমাদের রিপোর্টার কাম আর্টিস্ট ভজা", কামানো দাড়ির দিকে আঙুল দেখাল ফ্রেঞ্চকাট, "আপনার বাড়ি গিয়ে আপনাকে দেখে এসে তবে ছবি বানিয়েছে। ওর মনের ছবিতে আপনার নিশ্চয়ই গোঁফ ছিল।"

মুহূর্তে আমার চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল। রঙচঙে পাঞ্জাবি পরা দাড়ি কামানো ঢুলু ঢুলু চোখের ভজাকে মেজদা, সেজদা আর আমি চোর নয় তো পাগল ভেবে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছিলাম। ভজা "আমি কাগজের লোক, আমি কাগজের লোক" বলে বহুত অনুনয়, বিনয়, চিৎকার, চেঁচামিচি করেছিল। তাই প্রথম থেকেই আমার ভজার মুখটা অত চেনা চেনা লাগছিল।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল যে ছবির বিকৃতি বা অতিমাত্রা মেজদার গৌরব পরিস্ফুট করতেই জোড়া হয়েছে। ভজাকে না তাড়ালে হয়তো পোর্ট্রেটটা আরো অনেক ভালো হতো।

মনে শান্তি নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু মেজদার মগজে কটা কথা সমানে ঘুরেই চলল, "পড়াশোনার ফাঁকে সাইকেল চড়ার সময় পাননি বোধহয়। মানুষ প্রথমে হাঁটে..." মেজদা গম্ভীর মুখে একা একা তিন ঘণ্টা ছাতে পায়চারি করল। তারপর ভীষ্মের মতন মুখ করে বলল, "কাল থেকে সাইকেল শেখা শুরু। এলাকার সবচেয়ে ভালো সাইকেল চালক না হয়ে ছাড়বো না।"

।। মামুর সাইকেল ।।

সাইকেল শেখা মানেই মামুর দোকান। আমাদের এলাকার মোটামুটি সকলেই মামুর দোকানের সাইকেলে সাইকেল চালাতে শিখেছে। মামুও বোধহয় মামুর সাইকেলেই শিখেছে। সাইকেল শেখার জন্য মামুর দোকানের ভাড়ার সাইকেল সত্যিই অদ্বিতীয়। বড়ো, ছোট, মেজ, সেজ সব ধরনের সাইকেল আছে মামুর। সেগুলোর শারীরিক আর চারিত্রিক গঠন একদম এক। মামু মনে হয় স্পেশাল মিস্ত্রীর কাছ থেকে ওগুলো অর্ডার দিয়ে বানায়।

সাইকেলের কাঠামোটা একটা লোহার পাইপের বরফির মতন। তার নাম ফ্রেম। পেছনের চাকা, বসার সিট, ধরার হ্যান্ডেল, চালানোর প্যাডেল আর সামনের চাকা লাগানোর ফর্ক সবই গিয়ে লাগে এই ফ্রেমে। মামুর সাইকেলের যে কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন খুশি, যেমন খুশি, যেখানে খুশি হঠাৎ খুলে আসতে পারে, কোনও নোটিশ না দিয়ে। শুধু ব্রেক আর বেল ছাড়া। ওগুলো মামু আগেই খুলে রাখে। পায়ের চটি ঝুলিয়ে দিতে হয় সামনে, হ্যান্ডেলের তলায় আংটায়, কারণ মামুর সাইকেল থামাতে হয় পা দিয়ে। খালি পায়ে সুবিধে অনেক বেশি। একটু প্র্যাকটিশ লাগে। নাহলে অবশ্য সামনের লোকই সাইকেল থামিয়ে দেয় হুড়মুড় করে হামাগুড়ি দিয়ে। শিক্ষার্থীদের অনেককেই খুলে যাওয়া হ্যান্ডেল ধরা অবস্থায় ধরার থেকে ধরাধরি করে তুলতে হয়েছে।

সাইকেলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া লাগানোর জন্য একটা হসপিটাল সেকশন আছে মামুর দোকানে। সেখানে নিমেষে হ্যান্ডেল, প্যাডেল, চেন, ফর্ক, ফ্রেম জোড়া লাগিয়ে দেয় নিমাইচাঁদ। মামুর মেকানিক। চার্জ খুব অল্প। সাইকেল ভাড়ার মতনই কম। উল্টে রাখা গাড়ির ব্যাটারির খোলে বসে, নিমাইচাঁদের সাইকেল মেরামতি তদারকি করে স্বয়ং মামু।

মামুর বাড়ির রাস্তাটা সাইকেলের দোকানের ভেতর দিয়ে। বড়ো ছেলে খুব দামাল, তাই ওর নাম দামু। ছোট ছেলের নামটা ঠিক জানি না। মনে হয় হামুই হবে। যা হামা দেয় সর্বক্ষণ।

মামুর সাইকেলের আসল গুণটাই বলা

হয়নি। চালকের সঙ্গে দু'চার দিনে ভাবসাব না হলে, সাইকেল কিছুতেই চলবে না চালকের মতে। ডাইনে যেতে চাইলে ডাইনে যাবে না। বাঁয়ে চাইলেও অন্যমুখো ছুটবে। তার ওপরে আবার সাংঘাতিক টিপ। যে কোনও পাকা তীরন্দাজ বা বন্দুকবাজের চেয়ে বেশি তো কম না। ফাঁকা মাঠ বা ফাঁকা রাস্তায় একটা মানুষ, গাছ, ঢিবি, ডোবা, গরু, গাধা যাই থাক না কেন, নতুন চালককে পিঠে নিয়ে মামুর সাইকেল তীরবেগে সেটার দিকে ছুটতে থাকবে। শিক্ষানবিশ আরোহী মাটিতে পা নামিয়ে ব্রেক দেবার কথা ভুলে যাবেই যাবে। হ্যান্ডেলটাকে জোর করে ধরে যতো অন্যদিকে যাবার চেষ্টা করবে, সাইকেলের লক্ষ্য যাবে ততো বেড়ে। অবশেষে সংঘর্ষ। সাইকেলের কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিচ্ছেদ। অতএব তাদের সব জুটিয়ে-পাটিয়ে ছড়ে যাওয়া হাত-পা আর মাথার আলু নিয়ে আবার মামুর দোকানের দিকে হাঁটা সাইকেল সারাতে। সব মিলিয়ে কিছু ক্ষতি কিছু লাভ। হ্যাঁ। লাভও হয়। গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আম জাম ডাব নারকেল তো আছেই, কখনও-সখনও তার বেশিও লাভ হয়।

সাইকেল শিখতে গিয়ে বড়দা লাগাল গাছে এক প্রচণ্ড গুঁতো। তারপর সটান চিৎপাত। বড়দা সহজে চিৎপাত হবার পার্টিই না। আমরা অনেক পেছনে ছিলাম তাই প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারিনি। কাছে গিয়ে দেখি তিন-তিনটে তাল। বড়দার জ্ঞান ফিরতে লেগেছিল পাক্কা দু'দিন। ছোড়দি একটা চোর পাকড়াও করেছিল সাইকেল দিয়ে। বামাল নিয়ে বাছাধন ফাঁকা মাঠ পেরোচ্ছিল, পড়ল ছোড়দির সাইকেলের সামনে। ব্যস। আর যায় কোথায়! সাইকেলের বেগ গেল বেড়ে। ছোড়দি চোখ বুজল। খ্যাপা ষাঁড়ের মতন ছোড়দিসুদ্ধু সাইকেল মাত্র আধ মিনিটের ভেতর চোরকে করল ধরাশায়ী। অজস্র পুরস্কার পেল ছোড়দি। নাম বেরোল মহিলা পত্রিকা 'বামালিপি'তে।

মামু আমাদের তিরিশ গজের প্রতিবেশী। মেজদাকে বহুবার বলেছে, "ও অজু, দামুটাকে একটু দেখে শুনে পড়িয়ে দে না ভাই। তোর ছোঁওয়া একটু পেলে, ও বর্তে যাবে। যতো চাইবি ততো সাইকেল চড়তে দেব তোকে। একটা পয়সাও লাগবে না।" মেজদা দীর্ঘকাল অনুরোধটা এড়িয়ে এসেছে, কিন্তু আজ সকালে হঠাৎ সব অন্যরকম হয়ে গেল।

মেজদা সাধারণত ঘুম থেকে ওঠে বেলা সাতটা নাগাদ। আজ উঠে পড়ল ভোর ছটায়। তারপর আমাকে, ছোড়দিকে আর সেজদাকে ডেকে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে করতে মেজদা প্রথমে বলল, "আমি সাইকেল চড়া শিখব।" তারপর আরো বেশ খানিক পায়চারি করে বলল, "আমি দামুকে পড়াবো।"

সেজদা উত্তেজিত হলো, "এক্-কটা দা-দা-দা..দা..ন.." আটকে গেল সেজদা।

ছোড়দি সায় দিল, "ঠিক বলছে সেজদা, এটা কি একটা দাদার মতন কাজ হবে?"

মেজদা ধমকে উঠল, "কি যে বলে তার মাথামুণ্ডু নেই। একটা দানাদার খাবি?"

আমি বুঝিয়ে দিলাম যে সেজদা বলতে চাইছে "একটা দাঙ্গা বাধবে।"

সেজদার এই বড়ো দোষ। দাঙ্গা বলার কি দরকার ছিল? মারামারি, মহামারি, কোলাহল; ঝামেলা, বিদ্রোহ, ঝঞ্ঝাট কিছু একটা বললেই পারত। ওঃ! না, বিদ্রোহ আর ঝঞ্ঝাট সেজদাকে এই ঝঞ্ঝাটেই ফেলত। কিন্তু বাকিগুলো তো বলতেই পারত সেজদা। তাহলে আর...

সকাল আটটার ভেতরেই দেখি পড়াশোনার ব্যবস্থা পাকা। মেজদার পড়ার টেবিলে দামু আর মেজদা মুখোমুখি বসে। আমি আর ছোড়দি টুক্ করে ঘরে সেঁধিয়ে মেজদার খাটের ওপর বসে পড়লাম খবরের কাগজ নিয়ে। দামু আর মেজদার মিলনের প্রথম প্রহর কেমন কাটে সেটা কাগজের আড়াল থেকে দেখার জন্য। মেজদা সবই বুঝল কিন্তু কিছু বলল না।

খুব নম্র কিন্তু দৃঢ় স্বরে, প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রাইভেট টিউটরের মতন মেজদা বলল, "তুমি অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরিজি কেমন শিখেছ সেটা আমাকে আগে জানতে হবে। তারপর শুরু হবে আমাদের পড়াশোনা।"

খবরের কাগজের আড়াল থেকে মেজদার প্রথম প্রশ্নটা আমরা ভেবেছিলাম হয় ইংরিজির নয় জীববিদ্যার।

"Mosquito মানে কি?"

দামু এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমাদের জানিয়ে দিল যে প্রশ্নটা জ্যোগ্রাফির।

"উত্তর মেরুর কাছে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের রাজধানী মসকো। মসকোর লোকেদের বলে মসকিটো।"

ছোট্ট উত্তরে মেজদার মুখের জ্যোগ্রাফি পুরো পাল্টে গেল। আমরা কাগজের আড়ালে বহুকষ্টে হাসি চাপলাম মুখে হাত চাপা দিয়ে। মেজদা ঝটপট অঙ্কের প্রশ্নে চলে গেল, "আমি যদি এখানে চারটে ডিম পাড়ি আর ওখানে চারটে ডিম পাড়ি, তাহলে মোট কটা ডিম হবে?"

দামু মাথা চুলকোতে চুলকোতে গভীরভাবে মেজদার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল, তারপর বলল, "তুমি দিনে একটার বেশি ডিম পাড়তেই পারবে না। আমাদের মুরগীগুলোই পারে না।"

মেজদা যে চেষ্টা করলে একটা ডিম পাড়তে পারবে এই গাঢ় বিশ্বাস আর একটার বেশি ডিম যে পাড়তে পারবে না এই ঘোর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব আমার আর ছোড়দির সব বাঁধন ছিঁড়ে দিল। আমরা "হা হা" করে অট্টহাসিতে ফেটে মেজদার বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে ফেললাম। মেজদা একরকম জোর করে দুজনকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। মধুর আলাপের বাকিটা আমরা শুনতে পেলাম না। দামু প্রথমদিনের পড়া সেরে ন'টার ভেতর বিদায় নিল।

।। প্রথম পাঠ ।।

মেজদাকে সবচেয়ে ভালো সাইকেলগুলোই দিতে চাইল মামু। আমি সেজদার কানে কানে বললাম, "দেখতে

ভালো হলে কি হবে, মামুর সাইকেলের সব একই ধারা।" মেজদা সাইকেল বেছে নিয়ে রওনা দিল ঘোষেদের বাড়ির সামনের মাঠের দিকে। মেজদাকে সাইকেল শেখাতে সঙ্গে চললাম সেজদা, ছোড়দি, আমি, জলের বোতল, সিঙাড়া আর জিলিপি।

সাইকেল শেখানোর প্রথম দিকটা বড়ো খাটনির। মেজদার মতন এক্সাইজ করা ভারী চেহারা হ্যান্ডেল ধরে প্যাডেল করছে ঠিকই, কিন্তু পুরো হেলান দিয়ে আছে আমার গায়ে। আমি বাঁ হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল আর ডান হাতে সিটের পেছনটা ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। সেজদা সাইকেলের ওপাশ থেকে সাজেশন দিয়ে চলেছে আর ছোড়দি পেছন থেকে উৎসাহ দিচ্ছে, "বাঁ দিকে...এবার ডান দিকে হ্যান্ডেল ঘোরাও। ঠিক হচ্ছে, চালিয়ে যাও, আর ক'পাক মারলেই শিখে যাবে...।" দিনটা মেঘলা, গরমও বেশ কম, আমি তাতেও যখন গলদঘর্ম হয়ে উঠছি তখন সেজদা আর আমি জায়গা পাল্টাচ্ছি। ছোড়দি একাই উৎসাহ আর থেকে থেকে জল সিঙাড়া জিলিপি সাপ্লাই করে চলেছে আমাদের।

আমি বহুবার দেখেছি, সাইকেল শেখার প্রথম দু'কিলোমিটার পরের ওপর পুরোপুরি ভর করতে হয়। তারপরের দু'কিলোমিটার আধা ভর করতে করতে নিজেকে একটু একটু করে বেশ নির্ভরযোগ্য মনে হয়। তখন অন্যের ওপর ভর না করে শুধু নির্ভর করলেই চলে। ছাত্র চলে আগে, শিক্ষকেরা পাছে। কিন্তু এটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা।

মেজদার ঠিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ নিজেকে বেশ নির্ভরযোগ্য বলে মনে হলো। দু'হাতে হ্যান্ডেল সাপটে ধরে বেশ জোরে প্যাডেল করতে লাগল মেজদা। মনে খুশির জোয়ার; একটা গুনগুনে গান বেরিয়ে পড়ল মেজদার ভেতর থেকে। ছোড়দি পেছন থেকে সমানে উৎসাহ দিয়ে চলেছে, "দারুণ হচ্ছে মেজদা...আরো জোরে মেজদা...।"

কাবুলিওলার কপালটা আরো বেশি

খারাপ হতে পারত। সে সবে ঘোষেদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে উত্তরমুখো যেতে যেতে বার দুই "সুর্মা হিং" বলেছে। মেজদা আর সাইকেল দুজনেই দেখল কাবুলিওলাকে বেশ দূর থেকে। তারপরেই মামুর সাইকেল আসল কেরামতি দেখাতে শুরু করল। মেজদা জোর কদমে প্যাডেল করতে করতে প্রাণপণে হ্যান্ডেল ঘোরানোর চেষ্টা করছে অন্যদিকে কিন্তু আমরা যা বোঝার তা বুঝছি। আমি ছোড়দি আর সেজদাকে বললাম, "কি সর্বনাশ! কাবুলিওলা তো আলুকাবলি হয়ে যাবে।"

ছোড়দি বলল, "হ্যাঁ, হিং দেওয়া। ওকে আগেভাগে সাবধান করা দরকার।"

সেজদা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার শুরু করল, "কা..কা..কা..কা...."

ছোড়দি বলল, "শুধু কাকা বললে বুঝতে পারবে না সেজদা। কাবুলিকাকা বলো তাহলে বুঝবে।" সেজদা কিন্তু প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ ও দ্বিতীয় স্বরবর্ণের ব্যঞ্জনের থেকে বেরোতে পারল না কিছুতেই। সেই একই ব্যঞ্জোর ব্যঞ্জনা চালিয়ে চলল, "কা..কা..কাকা..."

আমি আর ছোড়দি ইমার্জেন্সি বুঝে চেঁচাতে লাগলাম, "কাবুলিকাকা সাবধান, কাবুলিকাকা সাবধান।" মেজদা আর সাইকেল তখন ঝড়ের বেগে ধেয়ে চলেছে ওর দিকে। লোকটা হয় কালা নয় উদাস, কাবুলিভাষায় ফিলজফি চর্চা করে। মোটে শুনতেই পেল না আমরা কি বলছি। মেজদা আর সাইকেল যখন ক্ষ্যাপা দৈত্যের মতন দশ গজের ভেতর পৌঁছে গেল তখন আমরা ভয়ে হরিনাম জপতে জপতে চোখ বুজলাম। কয়েক মুহূর্তের ভেতর একটা খুব জোরে দু...ম ফটাস করে আওয়াজ হলো। আমরা ভাবলাম কাবুলিওলার পিলে ফাটার আওয়াজ অমন বিদকুটেই হয়, কিন্তু চোখ খুলে দেখলাম এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। মেজদা কাবুলিওলার দিকে ধেয়ে চলেছে মাটির থেকে আট ফিট শূন্যে, হাতে ধরা সাইকেলের হ্যান্ডেল। মেজদার সাংঘাতিক উপস্থিত বুদ্ধি। সার্কাসের ফ্লাইং ট্রাপিজের খেলোয়াড়রা যেমন দোলনা পাল্টায়, মেজদা নিমেষে, ঠিক তেমনিভাবে সাইকেলের হ্যান্ডেল ছেড়ে কাবুলিওলার গলা পাকড়ালো পেছন থেকে। লোকটার বিশাল দশাসই চেহারা, একটু হুমড়ি খেয়েই স্ট্যাচু হয়ে গেল। পিঠে ঝুলন্ত মেজদা।

তাড়াতাড়ি দৌড়ে ওদের কাছে যেতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। মাঝরাস্তায় একটা বেশ বড়ো সাইজের পাথর পড়েছিল। মেজদার আর সাইকেলের দিগবিদিক জ্ঞান ছিল না, পাথরটাকে দেখতেই পায়নি। সামনের চাকাটা সপাট্টা ভিড়েছে পাথরে। সামনের টায়ার ফেটেছে, হ্যান্ডেল খুলে গেছে। সেই খোলা হ্যান্ডেল ধরে মেজদা মহাশূন্যে লাফ মেরেছে কাবুলিওলার ঘাড়ের উদ্দেশে। টায়ার ফাটার আওয়াজটা আমরা পিলের ভেবেছিলাম।

মেজদা তো নেমে পড়ল কাবুলিওলার ঘাড় থেকে কিন্তু কাবুলিওলা স্ট্যাচুর মতন দাঁড়িয়েই রইল চোখ বুজে। আর বিড় বিড় করতে লাগল, "জিন জন জনার্দন... জিন জন..." জানা গেল কাবুলিওলার ধারণা তাকে মিডল ইস্ট-এর বিখ্যাত ভূত 'জিন'-এ ধরেছে। আমরা বহু কষ্টে তার ভুল ভাঙালাম। কাবুলিওলা তখন সন্তর্পণে চোখ খুলল। তারপর একটু জিরিয়ে নিয়ে সিঙাড়া, জিলিপি আর জল খেয়ে "সুর্মা হিং" বলে রওনা হয়ে গেল নিজের পথে।

আমরা এতক্ষণে সাইকেলের দিকে তাকানোর সুযোগ পেলাম। বেচারা সাড়ে সাত টুকরো হয়ে গেছে। সাইকেলের টুকরোগুলো ঘাড়ে করে আমরা রওনা হলাম মামুর দোকানের দিকে।

অন্য কেউ হলে মামু ভাঙা সাইকেল

দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতো কিন্তু মেজদা ভেঙেছে, দামুর মাস্টার বলে কথা। মামু একগাল হেসে বলল, "তাতে কি হয়েছে অজয়—সাইকেল শিখতে অমন বারোটা সাইকেল ভাঙতেই পারে। আমি লেখাপড়ি শিখতে কুড়িটা কলম ভেঙেছি।" মেজদাকে ছোড়দি বলল, "মেজদা, তুমি কিন্তু মনে রেখো যে সাইকেল শিক্ষায় তুমি 'অচল অধম'র বেশি এগোওনি।"

।। দ্বিতীয় গাঁট ।।

বিকেলবেলায় মাঠে গিয়ে বুঝলাম মেজদার সারা সকালের সকল সাইকেল শিক্ষা কাবুলিওলা এক ধাক্কায় গুলিয়ে দিয়েছে। আবার রামসে শুরু করতে হবে। মেজদা আমাদের, মানে ছোট ভাই-বোনেদের সহায়, সম্বল, গর্ব। আমি, সেজদা আর ছোড়দি আবার শুরু করলাম প্রথম থেকে। মেজদা আবার ঝুলে পড়ল আমার গায়ে। সকালের ব্যালেন্স-ট্যালেন্স সব বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছে।

বেশ ক' পাক দিব্যি সাইকেলচর্চা চলল, কোনও বিপাক ছাড়া। নতুন করে আবার পাকে পাকে পেকে উঠতে লাগল মেজদা। ধীরে ধীরে আবার ফিরে পেল সকালের অর্জিত ব্যালেন্স। সকালের মনোবল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল মেজদা নিজেই বেশ চালাতে পারছে। আমরা উৎসাহ যোগাতে যোগাতে চললাম পেছনে পেছনে। মেজদার গতি ক্রমশ বাড়তে লাগল, আমরা তাল রাখতে হিমশিম, দৌড়োতে শুরু করলাম।

সাইকেল শেখার নেশা বড়ো নেশা। সন্ধ্যে হয়ে এলো, মেজদা তখনও ছাড়বে না। সাইকেল শিক্ষায় দুটো জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এক ব্যালেন্স, আরেক লক্ষ্য। মেজদার ব্যালেন্স মোটামুটি হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্যের কোনও পরিচয় আমরা, শিক্ষকবৃন্দ তখনও পাইনি। সেজদা মেজদাকে বলল, "মেজদা...ওই ত্-তাল গাছটা ছুঁয়ে এসো তো দেখি। সাইকেল থেকে নামবে না কিন্তু।" তালগাছটা আমাদের থেকে শ'খানেক গজ দূরে।

মেজদা খুব মনোযোগ দিয়ে তালগাছের দিকে একদৃষ্টে অর্জুনের মতন তাকিয়ে শুরু করল লক্ষ্যভেদ। টাল খেতে খেতে প্রথম ক্ষেপে তালগাছের পনেরো ফিট দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল মেজদা। আমি সেজদাকে বললাম, "না চাইলে কিন্তু মেজদা প্রথমেই তালগাছে ধাক্কা খেত। মামুর সাইকেল তো—"

দ্বিতীয় ক্ষেপে তালগাছের থেকে দূরত্ব বাড়ল। তৃতীয়, চতুর্থ ক্ষেপে দূরত্ব বাড়ল বই কমল না। ক্ষেপে ক্ষেপে মেজদা উঠল ক্ষেপে। আমাদের পাশে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "এবার ঠিক ছুঁয়ে আসব।" মেজদা সাইকেলে উঠে (আমাদের সাহায্যে) একরোখা ভাবে লটরপটর করতে করতে ভীষণ জোরে সাইকেল চালাতে লাগল। আমরা দেখলাম মেজদা যতো তালগাছের দিকে যাবার চেষ্টা করছে, মামুর সাইকেল ততো অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। আমরা সকালের কথা ভেবে একটু শঙ্কিত হবার সুযোগও পেলাম না। তার আগেই প্রচণ্ড শব্দ করে মেজদা সরাসরি সাইকেল ভিড়িয়ে দিল মাঠের বাঁ কোণে অশোকদের বাড়ির পাশের গাব গাছে। আলো-আঁধারিতে ঠিক ঠাহর হলো না মেজদার ঘাড়ে ওপর থেকে ঝপ করে কি একটা পড়ল। এই একইভাবে সাইকেল শিক্ষা করতে গিয়ে গাছে ধাক্কা লাগিয়ে সেজদার ঘাড়ে একবার বাঁদর পড়েছিল সেটা মনে আছে আমাদের। তাই আমরা প্রাণপণ দৌড় লাগালাম মেজদার দিকে। কিন্তু জিনিসটা যেন আরো বড়ো। হনুমান না তো!

গাব গাছের নিচে অন্ধকারে মেজদা উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। খানিকদূর থেকেই বুঝতে পারলাম কেস কেলেঙ্কারির। ভন ভন করে একঝাঁক মৌমাছি মেজদার সারা শরীরে ডন দিয়ে চলেছে। মেজদার ঘাড়ে পড়েছে একটা বেশ বড়ো সাইজের মৌচাক। মাথায় বাঁদরের আস্ত গুষ্টি পড়া এর চেয়ে ঢের ঢের ভালো ছিল। ছোড়দি বলল, "আমি আগুন নিয়ে আসি। বইয়ে পড়েছি মৌমাছিরা আগুন দেখলে পালায়।" আমি আর সেজদা ছোড়দিকে বুঝিয়ে দিলাম যে মৌমাছিরা হাইজিনের বই পড়েনি; তাছাড়া আগুন আনার আগে ওরা গুন গুন করে মেজদার ছাল, বেগুনপোড়ার মতন ছাড়িয়ে নেবে। তাড়াতাড়ি মেজদাকে উঠিয়ে নিয়ে চম্পট দিতে হবে। মুহূর্তে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। হুড়োহুড়ির ভেতর মৌমাছিরা যথেচ্ছ হুলোহুলি চালাতে লাগল আমাদের ওপর। হুল দিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধালো। মেজদা হুলের আঘাতে বাক্যহারা, মানসিক আঘাতে দিশেহারা। আমি, সেজদা আর ছোড়দি মেজদাকে তুলে নিয়ে সাইকেল-টাইকেল ফেলে প্রাণপণ দৌড় লাগালাম। ভোঁ ভোঁ করে একপাল মৌমাছি ওদের সাজানো সংসার তছনছ করার সাজা দিতে দিতে তাড়িয়ে নিয়ে চলল আমাদের। আমরা সকলেই অনেকগুলো করে কামড় খেলাম কিন্তু মেজদার তুলনায় তা কিছুই নয়। ছোড়দি মাথা-মুখ কাপড়ে ঢেকে ফেলেছিল বলে কামড় খেল শুধু হাতে।

বাড়ি ফিরে চারজনেই কিছুক্ষণ জ্ঞানশূন্য হয়ে হাঁফাতে লাগলাম মেজদার ঘরে। ধাতস্থ হতে খেয়াল হলো মেজদার মুখটা ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে।

আমি বললাম, "মেজদার মুখটা পাঁচের..."

সেজদা বাধা দিল, "ন্ না। প-প্যা-প্যা-প্যাঁচার মতন।"

"নাঃ। একদম পাঁচ। বাংলার পাঁচ।"

"প্যাঁ-প্যাঁচা। ঠ্-ঠিক প্যাঁচা।"

বিবর্তনশীল মুখটা মেজদার থেকে পাঁচ হলো। পাঁচের থেকে পাল্টে প্যাঁচার মতন রইল কিছুক্ষণ তারপর সোজা বুনো ওলের দিকে চলে গেল via হনুমান।

এতো দুঃখের ভেতরেও ছোড়দি হঠাৎ হেসে উঠল সেজদার দিকে তাকিয়ে। "তোমার মুখটাও যে প্যাঁচার মতন হয়ে গেছে গো!" আমি নজর করলাম সেজদার মুখটা সত্যিই হয়ে উঠেছে প্যাঁচার মতন। পাঁচের মতন না। সেজদাকে যে প্যাঁচার থেকে খুব ভালো কিছু দেখতে ছিল তা না। কিন্তু প্যাঁচার মতন ছিল না মোটেই। সেজদা রেগে উঠে ছোড়দিকে বলল, "ত্-তোর মতন

প্যাঁচালো।" ছোড়দি চুপ মেরে গেল। এতোক্ষণে আমাদের দিকবিদিক জ্ঞান ফিরে এসেছে। আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, একটা নিষ্পাপ, নিঃসঙ্গ, নীরব ওরাংওটাং চেয়ে আছে আমার দিকে।

আমরা ছোড়দিকে দিয়ে ছোড়দাকে ডেকে আনলাম। ছোড়দার বন্ধুর দাদা অমিতদা বেশ ভালো ডাক্তার। ছোড়দা দৌড়োল ওষুধ আনতে। অমিতদার ওষুধ খেয়ে বেশ তাড়াতাড়িই ব্যথা কমল। কিন্তু ফোলা কমতে অনেক বেশি সময় লাগবে। বাড়ির বড়োদের আমরা এসব জানাতে চাইনি, কারণ নানান বেকার কথা উঠবে। "কাদের মৌমাছি? কেন কামড়ালো! খগেনকে তো কক্ষণও কামড়ায় না। খগেনকে দেখে শিখতে পারিস না?" ইত্যাদি। কিন্তু উপায় নেই। খাবার টেবিলে সবাই জেনে গেল। অমিত ডাক্তারের ওষুধ পড়েছে শুনে অবশ্য সকলের উত্তেজনা অল্প সময়েই কমে গেল।

মেজদা রাত দশটার সময় প্রথম কথা বলল, "শিক্ষকগুলো বোগাস। ভালো টিচার ছাড়া কি কিছু শেখা যায়?"

আমি বললাম, "সকালে দামুকে পড়ানোর কথা মনে পড়ছে বুঝি?"

মেজদা আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে থাকার পর বলল, "সাইকেলগুলো আরো বোগাস। এই সাইকেলে কেউ শেখে? আমি ঢাকনাকে সঙ্গে নিয়ে দূরে চলে গিয়ে সাইকেল চড়া শিখব। ব্যাপারখানা নেড়েচেড়ে দেখব। শক্ত না সোজা।"

আমরা আর কথা বাড়ালাম না কারণ মেজদা আমাদের সকলের পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু আমরা অনুমান করে নিলাম যে মৌমাছিদের আঘাতে মেজদা আবার সাইকেল শিক্ষা ভুলেছে। কি ব্যালেন্স, কি লক্ষ্য, স...ব। সেজদা একবার সান্ত্বনার গলায় বলেছিল, "ভী..ভী..ভী..ম।" মেজদা খ্যাঁক করে উঠল, "ভীমের মতন দেখানো তোর চেয়ে ঢের ভালো।" আমি বললাম, "তুমি বেকার বেকার চটছ। সেজদা ঠিকই বলছিল, ভীমরুলে কামড়ালে আরো

সাংঘাতিক হতো।"

পরদিন ভোরে উঠে আমি আমার মুখটা আবার আয়নায় দেখলাম। জীবজন্তুর ক্রমবিবর্তনে হনুমান থেকে মানুষের মাঝের যে ধাপ মানে 'মিসিং লিঙ্ক', ঠিক তার মতন লাগল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন, মানুষের ক্রমবিবর্তন বুঝতে এই ছবিটাই খুঁজেছিলেন কিন্তু পাননি। আমায় পেলে কোলে তুলে নিতেন।

।। তৃতীয় পাট ।।

ভাঙা সাইকেলের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুটিয়ে নিয়ে আমরা মামুর দোকানে দিলাম। মেজদা দামুকে পড়াল কিন্তু আমাদের ঘরে ঢুকতে দিল না। তারপর মামুর একটা সাইকেল আর ঢাকনাদাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বলে গেল, দুপুরে বাড়িতে খাবে না। গতকালের অভিজ্ঞতা আর মেজদার কথায় আমরা ভেবেছিলাম যে মেজদা আর মামুর সাইকেল ছোঁবে না, কিন্তু দেখলাম আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মেজদা মামুর সাইকেলই নিল। অবশ্য একটা কথা আমাদের খেয়াল ছিল না। ভাড়া লাগবে না।

মেজদা ফিরল সন্ধ্যেবেলা ক্লান্ত ঘর্মাক্ত কলেবরে। সঙ্গে সাইকেল আর ঢাকনাদা। দুজনের হাতে চারটে দিশি মুরগী। আমরা মুরগী দেখে অসম্ভব উৎসাহ পেলাম। কিন্তু মেজদা আগেভাগেই বলে দিল, "মুরগীগুলো আজ রাতে আমার ঘরে থাকবে, কাল অন্যত্র চলে যাবে।" আমরা সকলে দপ করে জ্বলেছিলাম, ধপ করে নিভে গেলাম। অন্যত্র না বলে মেজদা অন্যদের পেটে বললেই পারতো। কারণ মুরগী শেষমেশ কারো না কারো পেটেই যায়।

মেজদার কাণ্ড প্রায়ই বোঝা যায় না। আমরা আশ্চর্য হলাম। মেজদা গেল সাইকেল শিখতে আর ফিরল মুরগী নিয়ে! তাও আবার খাবার জন্যে নয়। উত্তেজিত না হলে সেজদা প্রায় তোতলায়ই না। সেজদা বলল, "যাকে ভ্-ভিড়িয়েছে—তারই মুরগী। সে বেচারা এখন হাসপাতালে মুরগীর বদলে খ-খাবি খাচ্ছে।"

ছোড়দি বলল, "আমার কিন্তু মনে হয় যে গাছে গুঁতো মেরেছে তার ওপর মুরগীর বাসা ছিল।"

আমি আশ্চর্য হলাম, "গাছে কাক, বক, বাঁদর, হনুমান, পেত্নী, শাঁকচুন্নী, দেবতা, অপদেবতা সকলেরই বাসা থাকে কিন্তু মুরগীর বাসা!"

"হতেই পারে। মাউন্ট এভারেস্টেও বহুকাল মানুষ চড়ত না—"

যাই হোক ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। আমরা খবর নিয়ে জানলাম যে মেজদা আর ঢাকনাদা চুপি চুপি চারবার মামুর দোকানে সাইকেল সারিয়েছে।

পরের দিন মেজদা আবার দামুকে কিছুক্ষণ পড়িয়ে, ঢাকনাদা, মুরগী আর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা ফিরল সঙ্গে পাঁচটা প্যাঁকপ্যাঁকে পাতিহাঁস নিয়ে। আমাদের পাত্তাই দিল না মেজদা, হাঁসগুলোকে নিজের ঘরে পুরে ফেলল।

ছোড়দি বলল, "মেজদা কি ইতিহাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে? কি করছে কি সারাদিন?"

"ইতিহাস তৈরি করতে পাতিহাঁস লাগে বুঝি?"

"ব্ বাজে..ব..ক্-কিস না।"

"ছোড়দি, তোমার মতে কি আজকের গুঁতোনো গাছের ওপর পাতিহাঁসের বাসা ছিল?"

ছোড়দি চিন্তিত মুখে মাথা চুলকোল। কিছু বলল না।

"আজ যাকে হাসপাতালে পাঠিয়েছে, হাঁসগুলো ত্-তারই হবে। ক্-কাল মনে হয় ওকে ব্-বাড়ি পৌঁছে দেবে হাঁস সমেত।"

আমরা অবাক হলাম। সত্যি মেজদা করছেটা কি? এতোদিনে তো সাইকেল নিয়ে জিব্রালটার ঘুরে আসার কথা। আমাদের সব কেমন গুলিয়েই রইল। মেজদাকে জিজ্ঞেস করলাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। কিন্তু জবাব থেকে কোনও আভাসই পাওয়া গেল না।

পরের দিন মেজদারা ফিরল একটা মাঝারি সাইজের ছাগল আর তিনটে বড়ো সাইজের কাঁঠাল নিয়ে। কাঁঠালগুলো সাইকেলের বিভিন্ন জায়গায় বাঁধা। আমরা কৌতূহলের আঁচে আগে সেদ্ধ হচ্ছিলাম, এবার সরাসরি আগুনে পড়লাম। ছোড়দি বলল, "মেজদার পক্ষে সবই সম্ভব। নির্ঘাৎ পোলট্রির ব্যবসা ফেঁদে বসেছে।"

রাতের দিকে বাবার বন্ধু কমলকাকা এসে বৈঠকখানায় সেঁধোল। কমলকাকা জেলা হাসপাতালের ডাক্তার, থাকে দু'কিলোমিটার দূরে। যে বিরাট মাঠে হাট বসে, সেই হাটের মাঠের সামনে। সেজদা বলল, "ক্-কী? আমি ব্-বলিনি? পরের পর লোকেদের হাসপাতালে প্-পাঠাচ্ছে মেজদা। তাদের মালপত্তর প্রথমে আগলাচ্ছে তারপর ঘাড়ে করে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে। ক্-ক্-ক্-কমলকাকা আর থাকতে না পেরে ছুটে এসেছে বাবার কাছে।"

"ঠিকই তো—তাই মেজদা সাইকেল শেখা কমপ্লিট করার সময় পাচ্ছে না। আজকে মেজদার হবে একচোট বাবার কাছে।"

যা ভেবেছি তাই। একটু পরেই বাবার জলদগম্ভীর গলা ভেসে এল, "অজু..."

মেজদা নিমেষে নিজের ঘর ছেড়ে বৈঠকখানায় সেঁধোল। বাবার গলার ধরনে আমরা বৈঠকখানায় উঁকি দেবার সাহস পেলাম না। দু'চারটে ভারী ওজনের কথাবার্তা আর কড়া ধমক-টমকের আওয়াজ ভেসে এল বৈঠকখানা থেকে। কিছুক্ষণ পরে মেজদা কাঁচুমাচু মুখে বেরিয়ে আবার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পরের দিন সকালে যা ভেবেছিলাম তাই। দামুকে পড়ানোর পর ঢাকনাদা আর মেজদা ছাগল, কাঁঠাল ধরাধরি করে নিয়ে গেল, কিন্তু মামুর সাইকেল নিল না সঙ্গে। ছোড়দি বলল, "হুঁ হুঁ বাবা! ঠেলার নাম বাবাজী।" সেজদা সম্মতি জানাল, "আজকে যাদের হাসপ্-পাতালে যাবার ক্-ক্-কথা ছিল তারা ক্-ক্-ক্-কপাল জোরে বেঁচে গেল।" আমি বললাম, "মেজদার সাইকেল শেখা শেষ হলো না। মুরগী ছাগল ঘাড়ে করেই সময় কাটলো।"

।। চমক দিয়ে সাইকেল চর্চা ।।

আমাদের প্রচণ্ড চমক লাগিয়ে মেজদা আর ঢাকনাদা ফিরল বেলা সাড়ে বারোটার সময়। সঙ্গে একটা নতুন, ঝকঝকে 'কমান্ডো' সাইকেল আর একগাল করে হাসি। আমরা হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। নাঃ। মামুর দোকানের সাইকেল হতেই পারে না। ঝকঝকে মাডগার্ড, ব্রেক, বেল যার যেখানে থাকার সব ঠিক সেখানেই আছে। মেজদা "ক্রি...রি..ং..ং..ং..." করে একবার বাজিয়ে চারদিন পরে আমাদের সঙ্গে এই প্রথম স্বাভাবিক গলায় কথা বলল, "কি! কেমন দিলাম!"

আমরা তাড়াতাড়ি চলে গেলাম সাইকেলের কাছে। আমাদের সকলেরই বহুদিনের শখ একটা সাইকেলের। সম্পূর্ণ নিজেদের সাইকেল। প্রথমটায় বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিল। নিজেদের অজান্তেই আমরা সাইকেলটার গায়ে-মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে ফেললাম। ছোড়দি শুধোল, "তুমি কিনলে বুঝি?" ঢাকনাদা বলল, "তবে না তো কি?" মেজদা বেশ দৃপ্ত গর্বিত স্বরে জানাল, "আমি আর ঢাকনা একটা সাইকেল ট্রেনিং ইস্কুল খুলেছি হাটের মাঠে। কোর্স ফি তিরিশ টাকা, সময় দু'দিন। দিনে আধ ঘণ্টা ট্রেনিং। বেশি চাইলে এক্সট্রা চার্জ। মোট পনেরজন শিখেছে। বেশির ভাগই হাটের লোক।" ঢাকনাদা জুড়ে দিল, "তাই বেশির ভাগ পেমেন্টই নগদ টাকায় না। হাঁস, মুরগী, কাঁঠাল, পাঁঠায়। সেগুলো বিক্রি করে..."

"গত তিন দিনে প্রচুর পরিশ্রম করে সাড়ে চারশো টাকা যোগাড় করতে হয়েছে।"

"কিন্তু তোমার ব্যাঙ্কে তো স্কলারশিপের অনেক টাকা?"

"অনেক টাকা...।" ভেংচে উঠল মেজদা। "তোমাদের খাওয়া-দাওয়া আর ফুর্তির ঠেলায় সাইকেল কেনার চোদ্দশো টাকাও ছিল না। রোজগার করতে হলো।"

"ক্-কজন হাসপাতালে গেল?"

মেজদা আর ঢাকনাদা লজ্জিত মুখে হিসেব করে বলল, "হাসপাতালে কেউই যায়নি, কিন্তু ফার্স্ট এড্ দিতে হয়েছে মোট বত্রিশজনকে।"

আমরা আরো অনেক প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সকলকে থামিয়ে দিয়ে মেজদা ঘোষণা করল, "তাহলে আজ বিকেলে ঘোষেদের মাঠে আমার সাইকেল শেখার বাকিটা কমপ্লিট করে ফেলব। ঢাকনাও যাবে তোদের সঙ্গে।"

আমরা আকাশ থেকে পড়লাম। সকলের হাঁগুলো নারকেলের মালার মতন হলো। "তুমি নিজে এখনও সাইকেল চালাতে শেখোনি, অন্যদের শিখিয়ে এলে!"

"বোকার মতন বকিস না। বলেই তো ছিলাম মামুর ওই লজ্ঝড়ে সাইকেলে আমি শিখব না। তাই তো সাইকেল কিনতে হলো। ঢাকনা খুব ভালো সাইকেল চালাতে জানে। ও আর আমি শিখিয়েছি। কিন্তু সাইকেল শেখাতে গেলে সাইকেল চালাতে জানতে হবে এটা কে বলেছে?"

আমরা এতোক্ষণ খেয়াল করিনি যে মেজদার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছোটকা কখন এসে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে মেজদার কথা শুনছে। ছোটকা বলল, "ঠিকই তো। যারা খেলতে পারে না তারাই হয় কোচ। যারা লিখতে পারে না তারাই হয় সমালোচক।"

আমি একবার ক্রি..রি..ং..ং..ং করে বেলটা বাজালাম। কি মিঠে আওয়াজ। মনের ভেতর যেন সেতারের ঝংকার উঠল। সাইকেলের এই সুন্দর অনুভূতি থেকে আমরা সকলেই বঞ্চিত। মামুর সাইকেলে বেল-ব্রেকের বালাই নেই। আমি, সেজদা, আর ছোড়দি সাইকেলটা

বাড়ির চৌহদ্দির ভেতরেই দু'চার পাক করে চালালাম। দারুণ লাগল নিজেদের সাইকেল চালাতে। দারুণ সাইকেল। সত্যি—মেজদার এলেম আছে। মামুর সাইকেলে না শেখার জন্য খেটেখুটে নতুন সাইকেল কিনে ফেলেছে।

বিকেলবেলা আমরা পাঁচজনে সাইকেল নিয়ে ঘোষেদের মাঠের দিকে চলেছি। প্রফুল্ল মন, উৎফুল্ল মেজাজ। আমি বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেজদাকে বললাম, "মেজদা, একটা কথা কিন্তু কিছুতেই বুঝলাম না আমরা!"

"কী কথা?"

"কমলকাকা আর বাবা সেদিন তোমাকে ডেকে পাঠাল কেন?"

একগাল হাসল মেজদা। "এটা বুঝলি না? কমলকাকার বাড়িটা তো আমাদের সাইকেল ট্রেনিং স্কুলের সামনে। কমলকাকার বুড়ো বয়সের আবদারটা একবার শোন। কম করে বিশবার আমার কাছে সাইকেল শিখতে চেয়েছে। আমি রাজী হইনি। এই বয়সে ঠ্যাং ভাঙলে বাবা আমার ঠ্যাং ভাঙবে। তাই বাবাকে এসে ধরেছিল, আমায় একটু বলে দিতে। আমি আর বাবা দুজনেই পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি যে এই বয়সে আর সাইকেল শেখার দরকার নেই। বাবাকে তো শেষমেশ কমলকাকাকে বোঝাতে ধমকাতেই হলো।"

সেজদা জিজ্ঞেস করল, "স্-সাইকেল স্..স্..স্..কু..কু..।"

ঢাকনাদা সেজদাকে আশ্বাস দিল, "হ্যাঁ, সাইকেল থেকেই স্কুটার হবে। তার থেকে মোটর।"

আমি বুঝিয়ে দিলাম, "না গো, সেজদা জানতে চাইছে সাইকেল স্কুলটার কি হবে।"

মেজদা আর ঢাকনাদা পরস্পরের দিকে তাকাল। "ঠিক কথা তো। ভেবে দেখতে হবে।"

মেজদাকে সাইকেলে চাপিয়ে ঘোষেদের মাঠে ঢোকার পর মাত্র কয়েক মিনিটের ভেতরই সাইকেল আর চালককে কি ভাব। এমনটা মামুর সাইকেলে জীবনে সম্ভব না। বার দুয়েক মেজদাকে ধরে ধরে পাক খাওয়াতে হলো। তারপরে মেজদা নিজেই চলল সাইকেলে লটরপটর করতে করতে। আগের সেই ভয়ানক স্মৃতিগুলো আমাদের মনের সমুদ্রে ডলফিনের মতন লাফিয়ে উঠতে লাগল।

হঠাৎ দেখি তাজ্জব ব্যাপার, সে...ই কাবুলিওলা বেরোল ঘোষেদের বাড়ির থেকে হিং বিক্রি করে। স্বপ্ন দেখছি কিনা বোঝার আগেই কাবুলিওলা মেজদাকে দেখল সাইকেলের ওপর। ও যে স্বপ্ন দেখেনি, সত্যিই মেজদাকে দেখেছে সেটা বোঝা গেল। কাবুলিওলা আঁতকে লাফিয়ে উঠে "জিন, জন..জনার্দন..." গোছের সেই মন্ত্রটা বলতে বলতে দিগবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হলো। কাবুলিওলাকেও মেজদা আর মেজদার সাইকেল দুজনেই দেখেছে। মেজদার বা সাইকেলের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। সাইকেল কাবুলিওলার দিকে এক ইঞ্চিও এগোল না। মেজদা আপনমনে ঘুরপাক খেয়ে চলল। ওদের সুন্দর আচরণ থেকেই আমরা পরিষ্কার বুঝলাম, মামুর সাইকেলগুলো কি পরিমাণ অসভ্য, কুচুটে আর পাজী।

আমি সেজদাকে শুধোলাম, "মেজদাকে তাল গাছটা একবার ছুঁয়ে আসতে বলব?"

"ক্-কাছের গাব গ্-গাছের মৌমাছিরা যদি ওকে মনে রেখে থাকে! কি দরকার?"

মেজদা অল্প সময়ের ভেতরেই দিব্যি চালাতে লাগল। তারপর ক্লান্ত হয়ে নেমে পড়ল। আমরা সাইকেলটা পালা করে অনেকক্ষণ চালালাম। সকলেরই দারুণ লাগল। সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ঢাকনাদা আর মেজদার কাছে আমি আর ছোড়দি জানতে চাইলাম সাইকেল ট্রেনিং স্কুলটার কি হবে। ঢাকনাদা বলল, "ইস্কুলটা চালানোই তো ভালো, ওটা থেকে দিব্যি রোজগার করা যায়, হাতখরচটা অন্তত উঠে আসবে।" মেজদার মুখটা একটু গম্ভীর হলো, "এই সাইকেল সাইকেল করে আমার পড়াশোনার ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। আমি এখন আর বেশি সময় দিতে পারবো না। আপাতত চালাতে হলে তোমরাই চালাবে। সাইকেলটা কিন্তু বিকেলে অন্তত এক ঘণ্টা আমায় ছেড়ে দিতে হবে। আমি চালিয়ে মকসো করব।" মেজদা পড়তে চলে গেল।

আমরা চারজন যে যার পড়তে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম—সাইকেল ট্রেনিং স্কুলটাকে কি করে টিঁকিয়ে রাখব। তখনও আমরা জানতাম না যে সাইকেলের কবলে মেজদাসুদ্ধ আমরা সকলে কি ভীষণ জড়িয়ে পড়ব।

।। চোট ।।

অনেক জল্পনা-কল্পনা, অনেক পায়চারির পর আমি, সেজদা আর ছোড়দি ঠিক করলাম সাইকেল ইস্কুলটা চালাতেই হবে। মেজদা বা ঢাকনাদা কারুরই এখন অত সময় নেই। যা করার আমাদেরই করতে হবে। স্থির হলো সামনের রবিবার সকালে আমরা তিনজনে মিলে 'সাইকেল ট্রেনিং' স্কুল আবার নতুন করে চালু করব।

ছোড়দি বলল, "সামনের মন্দিরে পাঁচ টাকার পুজো দেব। সাইকেলানন্দকে একটা ভালো গাঁদা ফুলের মালা পরাতে হবে—"

"বেড়ে নামখানি দিয়েছ তো—সাইকেলানন্দ।"

"আর সাইকেলানন্দর কপালে মানে হ্যান্ডেলের মাঝ বরাবর একটু প্রসাদ আর একটা সিঁদুরের তিলক। ব্যস। সাইকেল স্কুল চলবে গড়গড়িয়ে।"

রবিবার সকালে আমরা সাইকেলানন্দকে বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বার করে ভালো করে ঝেড়ে মুছে নিলাম। ছোড়দি একটা মোটা গাঁদার মালা পরিয়ে দিল। আমি আর সেজদা গেলাম সামনের বিষ্ণুমন্দিরে পুজোর প্রসাদ আনতে।

প্রসাদী পেঁড়া চিবোতে চিবোতে মিনিট সাতেকের ভেতর ফুলবেলপাতা নিয়ে ফিরে আমরা অবাক হলাম। সাইকেলও নেই ছোড়দিও নেই। ছোড়দির সাইকেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকার কথা। সেজদা আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললাম, "ছোড়দি নির্ঘাৎ একটা চক্কোর দিয়ে আসছে, এক্ষুণি এসে পড়বে।"

ছোড়দি এক মিনিটের ভেতর এলো

ঠিকই কিন্তু বাড়ির ভেতর থেকে, হাতে খানিকটা সিঁদুর। "সিঁদুরের কথা একদম ভুলে—" বলেই থমকে গেল ছোড়দি। "সাইকেলানন্দ কোথায় গেল?"

"আমরাও তো তাইই ভাবছি। ত্-তুই ক্-কোথাও নিয়ে যাসনি?"

"আমি আবার কোথায় নিয়ে যাবো? আমি তো দৌড়ে সিঁদুর আনতে গেলাম।"

"তাহলে!" তিনজনে তিনজনার দিকে তাকালাম। চোখ গোল, মুখ হাঁ, তিনজনের মনে একই চিন্তা বিদ্যুতের মতন খেলে গেল। "সাইকেলটা কি চুরি হয়ে গেল?" এই নির্মম সত্য প্রথমটায় আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। চারদিকে উদভ্রান্তের মতন ছুটে বেড়ালাম আমরা। আশপাশের বাড়ির সকলকে ধরে ধরে জিজ্ঞেস করলাম। কেউ যদি ভুল করে বা রসিকতা করে সাইকেলটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে সেই আশায়।

ঘণ্টাখানেক কেটে যেতে বুঝতে পারলাম যে আমরা ভ্রান্ত আশার পেছনে ছুটে চলেছি। সাইকেলের কোনও হদিস নেই। চুরিই হয়ে গেছে। আমি ধপ্ করে বাড়ির সামনের রকে বসে পড়লাম একটা থামে হেলান দিয়ে। আমার পাশে সেজদা আর ছোড়দিও বসে পড়েছে। বহুক্ষণ কেউ কোনও কথা বললাম না। আমাদের সকলের সাধের সাইকেল, মেজদাদের কষ্টের টাকায় কেনা নতুন সাইকেল, চুরি হয়ে গেছে, এই নিষ্ঠুর সত্য আমাদের মগজে প্রতিষ্ঠিত হতে কিছু সময় নিল।

মনের ভেতরটা এতো বিশ্রী লাগছে যে কেউ কারো দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছি না। অনেকক্ষণ পরে ছোড়দিই প্রথম অনুতাপের দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। "সাইকেল একা ফেলে আমার যাওয়াটা একদম উচিত হয়নি। আমার জন্যেই সাইকেলটা চুরি গেল। মেজদাকে কি করে যে মুখ দেখাবো—" রুমাল বার করে ফুঁপিয়ে উঠল ছোড়দি।

সেজদা বিষণ্ন হলে ভীষণ কম তোতলায়। "সত্যিই তো ক্কতো কষ্টের টাকায় কেনা।"

আমরা অনুতপ্ত তাই আত্ম

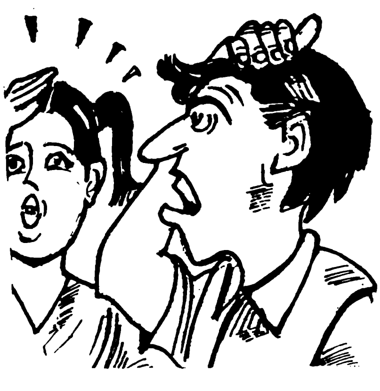

সমালোচনা শুরু করলাম। তাতে মন পরিষ্কার হয়।

ছোড়দি বলল, "আমিই যতো নষ্টের গোড়া। এ জীবন আমি আর রাখব না, জলে ডুবে মরব।"

"কিন্তু তুমি তো সাঁতার জানো। হাইজিন বইয়ে লেখে সাঁতার জানলে জলে ডোবা অসম্ভব।"

"তাহলে আমি গলায় দড়ি দেব।"

"ছিঃ। তোমার মতন মডার্ন মেয়ে শেষে এই প্রাগৈতিহাসিক পন্থায়—"

"তাহলে রেললাইনে গলা দেব।"

"রেললাইন কম করেও সাড়ে তিন মাইল দূরে। পরের ট্রেন সন্ধ্যেবেলা। তুমি শেষে মারা পড়বে।"

"তাহলে...তাহলে..." আত্মনিগ্রহের আরো রাস্তা ভাবতে লাগল ছোড়দি।

সেজদা বলল, "আমি এক্ক্টাকার সেঁক্কো বিষ খাবো। দুনিয়া আর ভ্ভালো লাগছে ন্-না।"

""এক টাকার সেঁকোবিষে তোমার কিসসু হবে না সেজদা, তুমি ছটা পচা ডিম হজম করো অনায়াসে।"

"তাহলে চ্-চার ট্টাকার খাবো।"

"চার টাকার খেতে পারবে না।"

"ক্-ক্..কেন? তার আগেই..."

"তোমার পকেটে একটাই টাকা আছে। আজ সকালে আমি তিন টাকা ধার নিয়ে জিলিপি খেয়েছি, তখন তো জানতাম না তোমার এমন ইমার্জেন্সি পড়বে।"

ছোড়দি এতক্ষণ ভেবে সমাধান পেয়ে গেছে। "আমি বাড়ি থেকে চলে যাবো যেদিকে দু'চোখ যায়।"

"আমিও চ্চলে য্যাবো যেদিকে দু চোখ যায়।"

"আমার দিকে কিন্তু নয়। বলে দিলাম। অন্যদিকে যাবে।"

"আমার ব্ব্বয়ে গ্গেছে তোর দিকে যেতে।"

"তাড়া করছ কেন ছোড়দি, আজ বাদে কাল তুমি এমনিই যাবে। বড়দি চলে গেছে, মেজদি চলে গেছে, কিন্তু তাতে আমরা সিকিখানা সাইকেল বা আধখানা ফাটা টায়ারও পাইনি। কি পেয়েছি বল?"

"কি?"

"দুটো হোঁৎকা জামাইবাবু। যাদের সঙ্গে সাইকেলের কোনও মিলই নেই। তার চেয়ে ছোড়দি, বুদ্ধি দিচ্ছি একটা কাজ করো, যাতে সত্যিই সাইকেল চুরির সমাধান হবে। যাও, আমাদের তিনজনের জন্য চা করে আনো, সকাল থেকে ভালো করে চা খাওয়া হয়নি। ও সাইকেল খুঁজে বার করতেই হবে নইলে মেজদার কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।" ছোড়দি চা করে নিয়ে আসতে বললাম, "আগে মেজদা ফিরুক তারপর প্রথমেই থানায় গিয়ে চুরির কথা রিপোর্ট করতে হবে।"

মেজদা ফিরল ঘণ্টাখানেক পরে। আমাদের তিনজনকে নীরব হতাশ মুখে রকে বসে থাকতে দেখে জানতে চাইল ব্যাপারখানা কি। বাড়ির কারুর শরীর-টরির খারাপ হয়নি তো? আমরা মাথা হেঁট করে নিচু গলায় দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মেজদাকে সব কথা জানালাম। ছোড়দি একটু ফুঁপিয়ে উঠল, "দোষটা পুরো আমার। আমিই সাইকেলটাকে...।" ছোড়দির রুমালটা ভিজে গেছল, আমি আমারটা এগিয়ে দিলাম।

মেজদা ছোট ভাইবোনেদের ভীষণই ভালবাসে। কাউকে কিছু বলল না। ভীষণ গম্ভীর হয়ে বইখাতা নামিয়ে আমাদের পাশে বসে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল মেজদার পুরো ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে। মুখ দেখে আমরা মেজদার মনের ভাব বুঝলাম। মেজদা ভাবছে কি করা উচিত।

অনেকক্ষণ পর মেজদা শীতল গলায় বলল, "থানায় যাবার সময় ছোটকা সঙ্গে

থাকলে অনেক সুবিধে হবে। যাই দেখি ছোটকা কোথায়।"

আমাদের কথাটা আগে খেয়াল হয়নি। ছোটকা রাজনীতির বিরাট মাতব্বর লোক। লোকাল এম. এল. এ.। কথার অনেক দাম। পুলিশের সঙ্গে প্রচুর জানাশোনা, ওঠাবসা। মেজদা বাড়ির ভেতর থেকে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, "ব্যাড লাক্‌। ছোটকা ওদের কি একটা মিটিং অ্যাটেন্ড করতে বেরিয়ে গেছে আজ সকালে। দু' তিন দিন পরে ফিরবে। বড়দাকে খুঁজে আনতে হবে।" বড়দাও রাজনীতি করে। সুতরাং বড়দা সঙ্গে থাকলেও খানিকটা কাজ হবে। আমরা সকলে বেরিয়ে পড়লাম বড়দার সন্ধানে।

থানাটা আমাদের বাড়ির থেকে মাইল খানেক দূরে। বেশ বড়ো থানা। বিরাট এলাকা থানার অধীনে। বড়দাকে সামনে রেখে আমরা হন্তদন্ত হয়ে ওসির ঘরে ঢুকে পড়লাম। ওসির নাম জগন্নাথ সুর। সবাই আড়ালে ডাকে 'জগাসুর' বলে। এক কনস্টেবল ওসির মাথা ম্যাসেজ করে দিচ্ছিল। ওসি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে একটা গানের কলি গুনগুন করছিল। এক কনস্টেবল আমাদের পরিচয় জানাল জগাসুরকে। "স্যার গুদোমপাড়া থেকে কজন এয়েছেন একটা সাইকেলের ব্যাপারে নালিশ জানাতে।" ওসি চোখ না খুলেই বললে, "উফঃ! আর পারা যায় না। আবার সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট। সাইকেলটাকে হাজির করতে বলো," গুনগুনুনিতে ব্যাক করে ওসি।

"সাইকেলটা যে চুরি গেছে স্যার..."

"তাহলে আমাদের কিছু করার নেই, ওদের যেতে বলো।"

কনস্টেবল এবার এগিয়ে গিয়ে ওসির কানে কানে চাপা স্বরে কি সব বলল। মনে হলো ছোটকা আর বড়দা সম্বন্ধে কিছু। জগাসুর ধড়মড় করে উঠে বসল। "কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য, অক্ষয়বাবু যে! কেমন আছেন?"

বড়দা সাইকেল চুরির বৃত্তান্ত জানিয়ে বলল, "আমরা একটা প্রাথমিক ডায়রি করব। সাইকেলটা খোঁজার ব্যাপারে আপনি আমাদের কিরকম হেল্প করতে পারবেন—"

"সাধারণত আমরা তেমন একটা কিছু করতে পারি না। তবে আপনার কথা আলাদা। আমরা তো খোঁজ করবই কিন্তু আপনাদেরও বলছি কাল খুব ভোরে কতুলপুর রেল স্টেশনে যেতে। ওখানে রোজ পাঁচটা থেকে সাতটা অবধি একটা চোরাই জিনিসের হাট বসে। নতুন সাইকেল নিয়ে চোরেরা অনেক সময়েই এই হাটে বেচে দেয়।"

মেজদা জিজ্ঞেস করল, "তবে যে শুনি চোরেরা প্রথমেই সাইকেলটার সব অংশ খুলে ফেলে ফ্রেমের নম্বর-টম্বর তুলে পার্টস বেচে দেয়, যাতে মূল সাইকেলটার অস্তিত্ব হারিয়ে যায়?"

"কথাটা ঠিক। কিন্তু একদম নতুন সাইকেল হলে ওরা চেষ্টা করে আস্ত সাইকেলটা বেচতে, কারণ তাতে অনেক বেশি দাম পাওয়া যায়। আমাদের গোটা এলাকায় তিনটে পাকা সাইকেল চোর আছে। একটাকে যদি ধরতে পারেন তাহলে সব খবর বেরিয়ে পড়বে। ওরা সাইকেল চুরির সব খবর রাখে।"

"কি করে একজনকে পাকড়াও করা যেতে পারে?"

"শক্ত কাজ। কারণ চোরেদের নামের তো কোনো ঠিকঠিকানা নেই। আজ ছিল কালুয়া, কাল হয়ে গেল জনার্দন। বদ্রীমিয়া ওরফে ছকুয়া হয়ে গেল কালীপদ। সবচেয়ে নামকরা সাইকেল চোরের নাম ঈশানপ্রসাদ ওরফে জুলফিচন্দ্র ওরফে হাডুডু ওরফে ভূতের ছানা। একটু ভাবল জগাসুর। বরং তিনটে লোকের কিছু বিবরণ দিই, কাজে লাগবে। একজন ছ' ফিট লম্বা, দেখলে মনে হবে যেন একটা ঝিঙের ওপর চোখ-মুখ-নাক-কান বসানো হয়েছে। দু' নম্বর আরো চিমসে। বরবটির মতন চেহারা। অত ঢ্যাঙা না। তিন নম্বরকে চিনতে ভুল হওয়া সম্ভব না। চেহারাটা ষণ্ডাপানা, দেখলে মনে হবে একটা স্টীলের আলমারির মাথায় টাক।"

"আমাদের এলাকায় কোন কোন জায়গা থেকে সবচেয়ে বেশি সাইকেল চুরি যায়?"

পায়চারি করতে করতে জগাসুর যেন একটু ভাবলো, "সবচেয়ে বেশি...সবচেয়ে বেশি বুড়ো বটতলার রেশন দোকানের সামনে থেকে। অত সাইকেল এলাকায় আর কোথাও জড়ো হয় না। সাইকেল রেখে লোকেরা আড্ডা, তাস, দাবায় মশগুল হলেই সাইকেল হাওয়া। আরেকটা জায়গা স্টেশন রোডের চৌমাথায় কালীতলা। অফিস বা কাজফেরতা বাবুরা স্টেশন থেকে সাইকেল নিয়ে মাকে প্রণাম জানিয়ে ঘরে ফেরে। দুটো "মা-মা মা গো দেখিস মা" বলার সময়টাই সাইকেল চুরির পক্ষে উৎকৃষ্ট। কারণ তখন সকলেরই চোখ বোজা। এতো সাইকেল আর জুতো কালীতলা থেকে চুরি গেছে যে এখন সকলেই এক চোখ বুজে মায়ের ধ্যান করে। অন্য চোখ খুলে রাখে সাইকেল আর জুতোর ওপর নজরদারির জন্য।"

।। কোতুলপুর ও ছকু ।।

সন্ধ্যেবেলা আমি, সেজদা আর ছোড়দি অনুতপ্ত মনে আমাদের ঘরে বসেছিলাম। মেজাজ এতো খারাপ যে একটু উত্যক্ত করলে খ্যাঁক করে কামড়ে দেওয়া বা ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠা কোনোটাই অসম্ভব না।

গণেশ আগে আমার বন্ধু ছিল। ঢাকনাদা ছিল মেজদার। কিন্তু "মেজদাদার কারবার"-এর পর গণেশ আর ঢাকনাদা আমাদের গুষ্টির বন্ধু হয়ে গেছে। ঢাকনাদা আর গণেশ আমাদের কারুর দেখা না পেয়ে সন্ধ্যেবেলা হাজির হয়ে গেল একের পর এক।

ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনতে শুনতে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল দুজনে। ঢাকনাদা বলল, "এক্ষুণি জরুরি মিটিং-এ বসা দরকার। চোর ধরার প্রাথমিক প্ল্যান তৈরি করতে হবে।" এক হাঁক মারল ঢাকনাদা, "অজু..."

ভাবতে গেলে তেলেভাজা লাগে। মেজদাই আমাদের তেলেভাজার একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক কিন্তু আজ আর মেজদাকে বলার মুখ নেই। আমরাই চাঁদা তুলে তেলেভাজা আনালাম। ঢাকনাদা মিটিং-এ

বসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা—তোতলারা কি চোর ধরে?'

সেজদা উত্তেজিত, "ক্‌-ক্‌-কে তোতলা?"

"তুই নিজে। সর্বক্ষণ তোতলাচ্ছিস আবার জিজ্ঞেস করছিস কে তোতলা?"

সেজদাকে এমন নিষ্ঠুর কিছু বললেই আমার গায়ে লাগে। আমি সেজদার পক্ষ নিলাম।

"সেজদা মোটেই সর্বক্ষণ তোতলায় না। খালি কথা বলার সময় একটু। তাও কখনও-সখনও।"

গণেশ বলল, "চোর ধরতে গেলে কি ভাষণ দিতে হয় নাকি?"

সেজদা বলল, "ত্‌তোতলারা পাশ করে। ঢ্যাকনার মতন ব্‌বার ব্‌বার চারবার ফেল করে না।"

ঢাকনাদা চেপে গেল। মিটিংয়ে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হলো, পরেরদিন ভোরে কোতুলপুর স্টেশনের কাছে চোরাই বাজারে, আমরা সাইকেলের খোঁজ করব। রাতে অ্যালার্ম দিয়ে শুলুম। খুব ভোরে উঠে বেরোতে হবে। কোতুলপুর রেল স্টেশন বাড়ি থেকে মাইল পাঁচেক দূর। যেতে হবে প্রথম বাসে।

মেজদা, সেজদা, ঢাকনাদা, গণেশ আর আমি বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দেখলাম শুধু ছোড়দিই না, ছোড়দির বন্ধু নিমকিদিও আমাদের সঙ্গে জুটে গেছে। আমাদের সঙ্গে চলেছে এক হাঁড়ি ল্যাংচা আর বড়ো ফ্লাস্কে চা।

আমরা কোতুলপুর রেল স্টেশনের পাশে নেমে পড়লাম। তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। ভোরের শীত শীত ভাব কাটেনি। একটা রোয়াক ঝেড়েঝুড়ে বসে পড়লাম সকলে।

কোতুলপুরের চোরাই বাজার দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কতরকমের লোক (মনে হয় চোর) যে কতো চোরাই মাল বিক্রি করছে তার ঠিক নেই। কাপড়-জামা, রুপোর বাসন, স্টোভ, ছাতা, হাঁড়ি, কড়া, আরো অনেক কিছু। সাইকেলও দেখলাম দু' চারটে। কিন্তু আমাদের সাইকেলটা নেই। অপেক্ষা করে দেখতে হবে কেউ নিয়ে আসে কিনা।

ছোড়দি জিজ্ঞেস করল, "এত্তো চোরাই মাল! সব বিক্রিবাটা হয় এখানে, পুলিশ কিছু বলে না কেন?"

উত্তরটা আমাদের অজানা। মেজদা বলল, "এগুলো যে চোরাই মাল, মনে হয় সেটা প্রমাণ করা খুব শক্ত।"

আমি বললাম, "বারে—এগুলো চোরাই মাল জানা সত্ত্বেও প্রমাণ করা যাবে না!"

"হ্যাঁ। তবে অনেক খুব জানা জিনিস প্রমাণ করা শক্ত। তুই প্রমাণ করতে পারবি আমি তোর দাদা। নাকি ঢাকনা প্রমাণ করতে পারবে ওর বুদ্ধির কথা—।"

একটু ভাবতেই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকল। সত্যিই শক্ত।

ঢাকনাদাটা ভীষণ ঘুমকাতুরে। সুযোগ পেলেই আমার পিঠে হুমড়ি খেয়ে মিহিসুরে নাক ডাকিয়ে নিচ্ছে, "পোঁ পোঁ পিঁ...উ, পোঁ...পোঁ...পিঁ...উ।" আমি নড়েচড়ে ঢাকনাদাকে তুলে দিলেই বলছে, "এক মিনিট দাঁড়া প্লিজ। মাংস খেতে সবে শুরু করেছি।"

ভোরের দিকে সেজদার অসম্ভব বেশি ক্ষিদে পায়। সেজদার মুখ দেখে বুঝলাম পেটের ভেতর ইঁদুর-ছুঁচোর কবাডি খেলা শুরু হয়ে গেছে। আমি মেজদাকে বললাম, "সেজদার ক্ষিদে পেয়েছে, ল্যাংচার হাঁড়িটা এদিকে দাও।" মেজদা মশগুল হয়ে বাজার দেখতে দেখতে ল্যাংচার হাঁড়িটা হাতড়াতে লাগল। তারপর উঠে পড়ে চারপাশে ভালো করে খুঁজল। হাঁড়ি পাওয়া গেল না। মেজদা আর ঢাকনাদা আর্তনাদ করে উঠল, "ল্যাংচাগুলো চুরি হয়ে গেছে।" সেজদা "হু-হু-হু, হাউ হাউ হাউ" করে ককিয়ে উঠল। গণেশ বলল, "সেটাই তো সকলে জানতে চাইছে, Who আর How?"

আমরা মানে মেজদার পুরো পল্টন স্রেফ ক্ষিদেয় মারা যেতুম কিন্তু একটা কণ্ঠস্বর আমাদের বাঁচিয়ে দিল।

"মিষ্টি—মিষ্টি—রসের মিষ্টি—একটাকা— একটাকা—একটাকা।" ধারেপাশে আর কোনও খাবারের দোকান নেই। আমরা তাড়াতাড়ি হাঁটা দিলাম মিষ্টিগুলোর দিকে। একটা ঝোপের পাশে হাঁড়ি নিয়ে উবু হয়ে বসে একটা লোক মিষ্টি বিক্রি করছে। উঁকি মেরে ঢাকনাদা বলল, "আজ আমাদের কপালে ল্যাংচা নাচছে। চুরি গেলে কি হয়, আবার জুটল।" শালপাতায় দুটো করে ল্যাংচা নিয়ে নিমেষে সকলে ক্ষিদে মেটালাম। ল্যাংচাগুলো একটাকার তুলনায় বেশ বড়ো। সেজদার আরো খাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ল্যাংচা শেষ। লোকটা উঠে পড়ে ট্যাঁকে টাকা গুঁজে হাঁটা দিল। নিমকিদি আর ছোড়দি একমত, "ল্যাংচাগুলো খেতে আমাদের পাড়ার কালিকা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ল্যাংচার মতন, কিন্তু দাম অর্ধেক।"

ঢাকনাদা বলল, "হাঁড়িটাও কালিকা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হাঁড়ির মতন।"

সেজদা ধমকে উঠল, "হাঁ...আড়ি স...অবি এক্‌ ক্‌ ক্‌ রক্‌ রক্‌ম।"

ঢাকনাদা বলল, "তুই বকবকম করলেই কি সেটা মেনে নিতে হবে নাকি?"

গণেশ নিচু হয়ে যে কাগজে লোকটা বসেছিল সেটা তুলে নিয়ে উল্টে ধরে বলল, "ঠিক যা ভাবছিলাম। কাগজটাতেও একই রকম লেখা, 'কালিকা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'।"

মেজদা আমার দিকে ফিরে বলল, "লোকটাকে এখনও দেখা যাচ্ছে। যা ওর কাছে গিয়ে প্রমাণ কর ওগুলো চোরাই ল্যাংচা—"

আমরা কেউই চুরিচামারিতে অভ্যস্ত নই। এই ল্যাংচা চুরির ব্যাপারটাই আমাদের হঠাৎ কেমন ক্ষেপিয়ে দিল।

আমি চাপা গলায় হুমকি দিলাম, "সাইকেল না পেলেও এক বেটা সাইকেল চোরকে পাকড়ে নিয়ে যাবো আমাদের সঙ্গে। ওসির কথা মতন তাতে সুবিধে হতে পারে। এখানে অনেকগুলো সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেচার অপেক্ষায়।"

মেজদা ভাবে খুব তাড়াতাড়ি, "ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া। সাইকেল চুরির খবর সাইকেল চোরে রাখবেই। খাইয়ে-দাইয়ে আমাদের সাইকেল চোরের খবর বার করে নেব।"

উত্তেজিত সেজদা সোচ্চার হলো, "ঘু..ঘু..ঘু..."

"না। ঘুঁষি মারলে মুখ খুলবে না। ওদের মার খাওয়ার অভ্যাস থাকে।"

"ঘুম পাড়ালে কথা বলবে কি করে?"

"ঠিক বলেছ, ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি।"

"না গো সেজদা বলছে ঘুষ-টুষ দিয়ে কথা বার করতে হবে।" সেজদা আমার পিঠ চাপড়ে দিল।

ঢাকনাদা আঙুল দেখাল, "ওই যে লোকটা শ্যাওড়া গাছের তলায় সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে বেশ এক্সপিরিয়ান্সড আর বিজ্ঞ মনে হয়। চলো সকলে মিলে ওকে জাপটে ধরি, তারপর টানতে টানতে বাড়ি।"

মেজদা বলল, "তোর মাথায় গোবর আছে বললে গোবরের অপমান হবে। এই হাটে সবাই চোর। চোরে চোরে মাসতুতো, পিসতুতো, মামাতো...সব রকমের ভাই। এখানে গায়ের জোর দেখাতে গেলে সকলে এককাট্টা হয়ে পিটিয়ে কাঠঠোকরায় খাওয়া তক্তা বানিয়ে দেবে। একটু ভাব, কৌশলের দরকার। বুদ্ধি দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে।"

আমরা ঠায় বসেই রইলাম লোকটার ওপর নজর রেখে। হাট যখন প্রায় ভেঙে এসেছে তখন লোকটার সাইকেল বিক্রি হয়ে গেল। লোকটা হাটের পাশের ঝোপলা জমির ওপর দিয়ে হাঁটা দিল। আমরা সাতজন লোকটার সঙ্গে গজ পঞ্চাশের তফাৎ রেখে পিছু নিলাম। দুশো গজের পর বেশ ফাঁকা জায়গায় একা

হাঁটতে লাগল সাইকেল চোর। ঘড়িতে তখন বাজে বেলা সাতটা।

মেজদার ইঙ্গিতে আমরা লাগালাম দৌড়। এক দৌড়ে পঞ্চাশ গজের দূরত্ব কমিয়ে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেললাম মানুষটাকে। লোকটা ভীষণ হকচকিয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করল। ঢাকনাদা জুডো ক্যারাটে কুংফুর নয়, বাংলা ল্যাঙের এক্সপার্ট। কবাডি খেলে খেলে হয়েছে। একটা ফ্লাইং ল্যাঙ লাগাল। অব্যর্থ। লোকটা নিমেষে পপাত ধরণীতলে। আমরা ওকে ঝেড়েঝুড়ে দাঁড় করিয়ে দিলাম। মেজদা হঠাৎ পেছন থেকে পাঞ্জাবির পকেটে হাতটাকে রিভলভারের মতন পুরে, তর্জনীটা লোকটার পিঠে ঠেকিয়ে একটা খোঁচা দিল। তারপর গলাটাকে অসম্ভব ভারী করে হুকুম চালাল, "হাত মাথার ওপরে তোল, সামনে তাকাও তারপর কুইক মার্চ। যেমন বলব ঠিক তেমন চলবে। একটু বেগড়বাঁই করলে এক গুলিতে মাথা উড়িয়ে দেব।" লোকটা ভূত দেখার মতন আতঙ্কিত মুখে মাথার ওপর হাত তুলে চলতে শুরু করল।

মেজদা জিজ্ঞেস করল, "তোমার এখন নাম কি?"

"এজ্ঞে ভালো নাম ছকু, ডাকনাম ছকুয়া।"

"তুমি এই এলাকার অন্য সাইকেল চোরেদের খবরাখবর দিতে পারবে?"

"পারব এজ্ঞে।" ছকুয়ার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

"আমাদের সঙ্গে যেতে হবে তোমায়। চোরেদের আর সাইকেলের হদিস দিলে ছেড়ে দেব নইলে—" বাকিটা সাসপেন্সে ঝুলিয়ে রাখল মেজদা।

বাসরাস্তায় ওঠার আগে আমি বললাম, "ইন্সপেক্টর রায়, আপনি রিভলভারটা পকেটে পুরে ফেলুন। আর ওকে হাত নামাতে বলুন নাহলে রাস্তায় ভিড় জমে যাবে। বেচারাকে মিছিমিছি জনতার হাতে মার খাইয়ে আমাদের কোনও লাভ নেই। ও পালাতে পারবে না। তিনজন ক্যারাটে কিং, একজন ল্যাংলর্ড, আর দুজন গিটকিরিয়ান (ছোড়দি আর নিমকিদি দুজনেই গিটকিরি দিয়ে দারুণ গান করে) আর তেমন দরকারে আপনার রিভলভার তো আছেই।"

ছোড়দি আর নিমকিদি হঠাৎ পিছিয়ে গেল। পেছন ফিরে আমি দেখলাম, ওরা এই সিরিয়াস সিনেও হেসে গড়িয়ে যাচ্ছে।

ছকু হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। "কোথাও পালাবনি স্যার—আপনি শুধু পিঠ থেকে ওই নলটা সরিয়ে লিন। আপনার ভুল করে একটা হেঁচকি উঠলে আমি পটলের ছেঁচকি হয়ে যাবো। যেখানে যেতে হয়, যা খেতে হয় সব কথা শুনব।"

সেজদা বলতে চাইছিল, "পেটুক আছে তো!" কিন্তু 'পে..পে..' করতেই গণেশ সময় মতন ধামা চাপা দিল। "পেয়াদার দরকার হবে না স্যার, আমরাই যথেষ্ট।"

।। আরো ছকু ।।

আমাদের বাড়িতে হঠাৎ চোর নিয়ে গিয়ে পোরার অনেক ঝামেলা। বাবা, জেঠারা প্রথমেই প্রচুর প্রশ্ন তুলবে। "কি চোর, কেন চোর, কাদের চোর, কতোদূর পড়েছে" ইত্যাদি। তার চেয়ে ঢাকনাদাদের বাড়ির একতলায় তোলা অনেক ভালো। ঢাকনাদার বাড়িতে অনেক লোক। সকলেই ভারি উদার। কেউ কারো খবরই রাখে না। ঢাকনাদা যে মাধ্যমিকে ক'বার... তা বাড়ির কেউই বলতে পারবে না। অবশ্য এখন হয়তো আর ঢাকনাদা নিজেও পারবে না।

ছকুকে নিয়ে আমরা সকলে সেঁধিয়ে

পড়লাম ঢাকনাদার বাড়ির একতলার ঘরে। ঘরটা বেশ পরিষ্কার। একপাশে একটা তক্তপোশ আর একটা কাঠের টুল। ঘরে একটাই মাত্র জানলা। ছকু জানলা-দরজাগুলো দেখে নিল। "বেশ মজবুত ঘর এজ্ঞে।"

ঢাকনাদা ভেংচে উঠল, "পঙ্কা হলেও লাভ হতো না এজ্ঞে। তোমার ঠ্যাং আমি তক্তপোশের ঠ্যাঙের সঙ্গে বেঁধে দেব এজ্ঞে।"

গণেশ শুধোল, "হাত বাঁধবে না?"

"বোকার মতন কথা বলিস না। হাত বাঁধব কেন? হাত দিয়ে কি দৌড়ে পালানো যায়?" সকলে হেসে উঠল। ছকু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। ঠিক বোধগম্য হলো না ব্যাপারটা।

সেজদা বলল, "ঘ্ ঘরে তা..তা.. তা—"

"ঠিক তাই। ঠ্যাং বেঁধে না রাখলে ঘরময় তাতা থৈথৈ নেচে বেড়াবে।"

"ন্ না। ঘরে ত্ তালা দেওয়া দরকার।"

ছকু বলল, "একটা পাখা থাকলে বড়ো ভালো হতো।"

"এটা তো তোমার শ্বশুরবাড়ি নয়।"

ছকুয়ার ইন্টারভিউ শুরু হয়ে গেল ঝটপট।

"তুমি এই এলাকায় আগে কাজ করেছ?"

একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল ছকুয়া, "হাসালেন দাদাদিদিরা। এই বাড়ি থেকেই কালীপুজোর দিন সাইকেল নিয়ে গেছি। সক্কলে ছাতে বাজি পোড়াচ্ছিল। তা বছর তিনেক হবে।"

আমরা ছকুর কেরামতিতে মুগ্ধ হলাম। খবরটা আমাদের সকলেরই জানা। ইন্টারভিউ চলল।

"সাইকেল চুরিতেই তোমার নাম?"

"এজ্ঞে হ্যাঁ।" গর্বের হাসি হাসল ছকুয়া। "তবে সময় খুব খারাপ পড়লে অন্য কাজ করতে হয়।"

"মোট কতোগুলো সাইকেল চুরি করেছ?"

একটু ভাবল, একটু গুনল ছকু। "এজ্ঞে চার কুড়ি, দশ আর চার। মানে আর ছটি হলেই সেঞ্চুরি। তখন এলাকার চোরেদের কি যেন...কি যেন ইংরিজি কুকুরের নামের মতন—"

"বুলডগ?"

"না।"

"টেরিয়ার?"

"না। অ্যা দিয়ে শুরু—"

"অ্যালসেশিয়ান?"

"হ্যাঁ। ঠিক বলেছ। চোরেদের অ্যাসোসিয়েশান আমায় মেডেল দেবে। বিরাট ভোজ হবে।"

আমরা নিজেদের কৃতিত্বে নিজেরা চমৎকৃত হলাম। যাক—সাইকেল না পেলেও আমরা এক সাচ্চা সাইকেল চোর ধরে এনেছি, যে আজ বাদে কাল সম্মানের এভারেস্টে চড়বে। মেজদাদার সাইকেল সে উদ্ধার করে দিতেও পারে, চেষ্টা করলে।

"তুমি বদ্রীমিঞা, ঈশানপ্রসাদ, ভূতের ছানা, হাড়ুডু, জুলফিচন্দ্র এই সব নামের চোরদের কাউকে চেনো?"

মেজদার প্রশ্নে আকাশ থেকে পড়ল ছকু। "এজ্ঞে এদের আপনি জোটালেন কোথা থেকে!"

মেজদা একটু যেন অপ্রস্তুত। "পুলিশের থেকে।"

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ছকু। "আপনি এসব কথা বিশ্বাস করলেন? আমায় যখন বোকা বানালেন—তখন ভেবেছিলাম অন্যরকম। এখন দেখছি আপনার বুদ্ধিও তো পুলিশেরই মতন। পুলিশ খালি ঘুমায়। ওরা জেগে ঘুমায়, দাঁড়িয়ে ঘুমায়, ঘুমায়ে ঘুমায়েও ঘুমায়। হিঃ হিঃ আপনি পুলিশের কথায় সাইকেল চোর ধরবেন?" ছকু হেসে গড়িয়ে পড়ল, "হি হি হি।"

মেজদা ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে কান-টান চুলকে ফেলল। ছকু একটু ধাতস্থ হয়ে আমাদের অসহায় মুখগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে বলল, "আমি সাইকেল চোর ধরার চেষ্টা করতে পারি তবে চারটে কন্ডিশন থাকবে।"

ছকুর মুখে ইংরিজি শুনে আমাদের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। গণেশ জিজ্ঞেস করল, "কি কন্ডিশন?"

"বলছি—এক, চোরকে পুলিশে দিতে পারবেন না। দুই, ঠেঙাতে পারবেন না। আপনাদের সাইকেল পেলেই হলো। তিন, আমি যখন যা খেতে চাইবো খাওয়াতে হবে। চার, সুবিধে মতন পরে জানাবো।"

ছকু মেজদাকে বলল, "চলুন পেথ্থমে সাইকেলের খবর নিয়ে আসি।" দুটো সাইকেল রিকশায় ঢাকনাদা, মেজদা, ছকু আর গণেশ রওনা হয়ে গেল।

ছকুরা ফিরল ঘণ্টা দেড়েক বাদে। জানা গেল ছকু অনেক চেনা লোকের কাছে আর সাইকেলের দোকানে খোঁজ করেছে। ছকু বলল, "খবর পেলাম আস্ত কমান্ডো সাইকেল এখান থেকে বাইরে বিক্রি হয়নি। পার্টস খুলেও বিক্রি করা হয়নি। সাইকেল এই এলাকাতেই আছে। মনে হয় কোনও নতুন সাইকেল চোরের কাছে। চেনাশোনা পুরোনো পাকা চোরেরা সাইকেল নেয়নি। নতুন চোরকে ধরতে পারলেই সাইকেল পাওয়া যাবে মনে হয়।"

মেজদা ছকুর খাওয়ার যা ফিরিস্তি দিল তাতে আমরা বিস্মিত হলাম। অত মাল ও ঢোকাল কোথায়! বারোটা বেজে গেছল, আমরা সন্ধ্যেবেলা ঢাকনাদার ঘরে জরুরি মিটিং-এ বসার ঠিক করে, ছকুকে ঢাকনাদার জিম্মেয় রেখে বাড়ি চলে গেলাম।

সন্ধ্যেবেলা ছকুর ঘরে ঢুকে তো আমাদের চক্ষুস্থির। আমাদের দুই ঠাকুমা বাড়ি ছেড়ে এসে ছকুকে নারকেল নাড়ু, জিবেগজা আর ভারী ভারী উপদেশ গেলাচ্ছেন। আমরা বুঝলাম ছকুর খবরছড়িয়ে পড়েছে। ঠাকুমারা লোক ভারি ভালো, খালি একটু সোস্যাল ওয়ার্ক করার বাই আছে। আমাদের দেখে ঠাকুমারা বললেন, "ওদের কতো কষ্টে পড়ে চুরি করতে হয় জানিস? আহা বেচারা। ওকে আমরা অনেক বুঝিয়েছি, ও মনে হয় চুরি করা ছেড়ে দেবে। ও আগে জানতই না যে চুরি করা মহাপাপ।" মেজদা বলল, "হ্যাঁ। ওকে ধর্মযাজক বানিয়ে দাও।"

ঠাকুমারা বেরিয়ে যেতেই ছকু ডুকরে উঠল, "দাদাবাবু গো...ও..ও..ও আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দাও গো,

এখানে থাকলে আমি দু'দিনে মারা পড়ব।"

ছকুকে অনেক কষ্টে শান্ত করে যা বোঝা গেল তাতে ছকুর ডুকরে ওঠার লজিক আছে। ওকে ভালো হওয়ার জন্য সকালে বাংলা, বিকেলে ইংরিজি পড়তে হবে ঠাকুমাদের কাছে। ছোড়দির কাছে শিখতে হবে গান আর নিমকিদির কাছে উলবোনা। আমরা ছকুকে বোঝালাম যে মহৎ কাজে অমন একটু-আধটু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া ঠাকুমাদের কাছে পড়ার দরুন ও যা মিষ্টি আর নোনতা খেতে পাবে তাতে ওর পুষিয়ে যাবে। ছকুর শহীদ শহীদ মুখ দেখে, খুব একটা ভরসা পেয়েছে বলে মনে হলো না। সকলে এসে পড়ল। আমরা জরুরি মিটিং চালু করে দিলাম।

।। সাইকেল উদ্ধার—১ ।।

অনেক তর্ক, বিতর্ক, বাদ, প্রতিবাদ, মান, অভিমান আর পায়চারির পর আমাদের সাইকেল চোর ধরে সাইকেল উদ্ধার করার প্রথম ধাপ সাব্যস্ত হলো। ওসির কথা আমাদের মনে ছিল, স্টেশন রোডের মোড়ে কালীতলা থেকেও অনেক সাইকেল চুরি যায়। কাল সন্ধ্যেবেলা আমরা ছকুর কথামতন নতুন সাইকেল চোরকে ধরতে কালীতলায় যাবো। ছকু পুরোনো সব সাইকেল চোরেদের বলে এসেছে কাল সন্ধ্যেবেলা কালীতলায় কাজে না যেতে। সুতরাং সাইকেল চোর যদি কেউ থাকে তো সেই ছকুর নতুন চোর। যার কাছে আমাদের সাইকেল থাকার প্রচুর সম্ভাবনা। ছকুর মতে "সাইকেল চুরির নেশা সাংঘাতিক নেশা। তাস দাবার নেশার চেয়ে ঢের বেশি। একবার যখন সাকসেচ পেয়েছে তখন, চোর রোজ একটা করে সাইকেল চুরির চেষ্টা করবে। ওকে আসতেই হবে কালীতলায় আর বুড়ো বটতলায়।"

বিকেল পাঁচটা থেকে আমি আর গণেশ পাশাপাশি দুটো ছোট তেঁতুল গাছে উঠে বসে আছি তো আছিই। সাইকেল' চোরের ঘাড়ে বাঘের মতন (বাঁদরের মতনটা তেমন বীরত্বব্যঞ্জক নয়) লাফিয়ে পড়ব। মেজদা, ঢাকনাদা, ছকু, ছোড়দি

আর নিমকিদি কালীতলায় ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন সাজে, সাইকেল চোর যাতে আমাদের বাড়ির লোক বলে চিনতে পেরে ভেগে না যায়। এই রাস্তা দিয়েই পালাতে হবে চোরবাবাজীকে। অন্য সব রাস্তা সারানো হচ্ছে বলে বন্ধ। ছকু সক্কলকে সাইকেল চোর চেনার ট্রেনিং দিয়েছে। কালীতলায় সাইকেল চোরের দেখা পাওয়া গেলেই মেজদা "পীঁ.." করে হুইসিল বাজাবে। আমরা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে চোরকে বামাল সমেত ধরব। প্ল্যানটা আমার আর সেজদার মোটেই পছন্দ না। কিন্তু আপত্তি টেঁকেনি।

সন্ধ্যে হয়ে গেল। আমাদের হাতে ঘড়ি নেই। আমি চেঁচিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "দাদা কটা বাজে?" লোকটা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মেজদার হুইসিলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ভেসে এল কালীতলার দিক থেকে—পীঁ...। একবারই যথেষ্ট। আমার আর গণেশের শিরদাঁড়ায় টান পড়ল। ঠিক তিরিশ সেকেন্ডের ভেতর আমরা দেখলাম কালীতলার দিক থেকে একটা সাইকেল ধেয়ে আসছে। সোয়ারী আধময়লা শার্ট আর পাতলুন পরা। আমি লাফালাম কিন্তু সাইকেল মিস করে গেলাম। গণেশ এই সব লাফানো-ঝাঁপানোর ব্যাপারে অনেক বেশি পোক্ত। গণেশ লোকটার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাইকেল পড়ল কাত হয়ে। আমিও দৌড়ে গিয়ে পড়লাম লোকটার ঘাড়ে। লোকটা আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সারেন্ডার করল। গণেশ চোরকে দু' চারটে ক্যারাটে-কুংফুর লাফানো-ঝাঁপানো দেখিয়ে দিল। আমরা ওকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমাদের কথা মতন না চললে ওর মুণ্ডু উড়ে যাবে। আমরা দুজনে দু'হাত চেপে ধরে সাইকেলসুদ্ধু চোর নিয়ে গিয়ে তুললাম ঢাকনাদার বাড়িতে ছকুর ঘরে। শেকল তুলে দিয়ে বাইরে অপেক্ষায় রইলাম। কথা ছিল আমরা চোরের ঘাড়ে ঝাঁপালেই অন্যরা কালীতলা থেকে ছুটে এসে সাহায্য করবে, কিন্তু বহুক্ষণ কেউ এল না।

আমাদের দলবল ফিরল প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে। সক্কলে বিরক্ত গলায় বলল, "চোরটা সাইকেল নিয়ে পালাল, তোরা ধরলি না! তোরা নির্ঘাৎ ভূতের ভয়ে আগেভাগেই পালিয়েছিলি আমাদের হুইসিল বাজার ঢের আগে। আমরা দৌড়ে গিয়ে তোদের দেখলাম না।"

"চোর ঘরের ভেতর। ওই দেখ চোরাই সাইকেল!!" আমরা একটু যাত্রার ঢঙে বললাম।

"সত্যি বলছিস! এতো জলদি!! তোদের ক্রেডিট আছে—"

দরজার শেকল খুলে সক্কলে একসঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়লাম। "কি! বিশ্বাস হলো?"

চোর দেখে ছকুর মুখটা কুমড়োর ছক্কা মেরে গেল। ঢাকনাদা "আইব্বাপ" বলে এক লাফে ছিটকে বেরিয়ে গেল। নিমকিদি, ছোড়দি, মেজদা আর সেজদা পরিস্থিতিটা অনুধাবনের চেষ্টা চালাল। চোর নীরবে মাথা হেঁট করে তক্তপোশে বসে। ছকু চাপা স্বরে বলল, "এ তো সে লয়।" আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

"সর্বনাশ করেছিস রে! শীগগির ছেড়ে দে। এ তো আমাদের নতুন হিস্টরির স্যার কল্যাণবাবু। দুদিন হলো ইস্কুলে জয়েন করেছেন। আমাকে চিনে থাকলে..." ককিয়ে উঠল ঢাকনাদা।

অনেক মাফটাফ চেয়ে আমরা কল্যাণবাবুকে রওনা করে দিলাম। কিন্তু ঢাকনাদা এমন ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকল, "আমার কি হবে রে। ওরে আমার হয়ে গেল রে..." যে গণেশ বিরক্ত হয়ে শেষমেশ বলেই ফেলল, "তোমার আর

নতুন করে কি হবার আছে?" আমি সান্ত্বনা দিলাম, "ঢাকনাদা, তোমাকে এই কালিঝুলি মাখা ভিখিরির মেকআপে আমরা কেন, পুলিশও চিনবে না। কল্যাণবাবু তো অনেক দূরের কথা।"

আমার কথায় ঢাকনাদা সুস্থ হলো।

আমরা লেগে পড়লাম ঘটনার পর্যালোচনায়। সকলেই অবশেষে একমত হলো যে কাছেপিঠের কোনও হতভাগা, অসভ্য, মূর্খ মেজদা বাঁশী বাজানোর আগেই বাঁশী বাজিয়েছিল যাতে এই দুর্ঘটনা। কাছাকাছি হয়তো রেফারি বা পুলিশের বাড়ি-টাড়ি আছে।

গণেশ মেজদাকে বলল, "আচ্ছা মেজদা, তুমি সাইকেল চোর ধরে কি করবে বল তো? সাইকেল ফিরে পাবে? এই তো এক বেটা সাইকেল চোর দাঁত বার করে হাসছে আর মজা মারছে। পারছ সাইকেল উদ্ধার করতে?"

ছকুর গায়ে লাগল। "হ্যাঁ...মজা মারছে। সকালে বাংলা বিকেলে ইংরিজি, গান, সেলাই—এর চেয়ে পুলিশের থানা হাজার গুণে ভালো। ধকল অনেক কম।"

আমি বললাম, "মেজদা, অলরেডি আড়াই-তিন দিন কেটে গেছে। সেদিন আমাকে যা বলতে দিলে না কিছুতেই, তা আজকে শোন। সাইকেল যদি উদ্ধার হয় তো এতেই হবে। ছকুর কথামতন সাইকেল চোর সাইকেলটার পার্টস খুলে বেচেনি। হয় সরাসরি বেচে দিয়েছে নয় নিজে ব্যবহার করছে। সাইকেল যদি এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ও সাইকেল আমরা জীবনে পাবো না। ছকুর মতে সাইকেল এলাকার বাইরে যায়নি। চোর বা চোরাই সাইকেলের ক্রেতা যদি সাইকেলটা নিজে ব্যবহার করে তাহলে উদ্ধারের একটা ক্ষীণ আশা আছে। বুড়ো বটতলা এমনই একটা জায়গা যেখানে সকলেরই দিনে অন্তত একবার যাবার দরকার পড়ে। ছকু, বুড়ো বটতলায় সবচেয়ে বেশি সাইকেল কখন জড়ো হয়?"

"এজ্ঞে—বিকেল পাঁচটা থেকে ছটা।"

"তখনই কি ওখান থেকে সবচেয়ে বেশি সাইকেল চুরি যায়?"

"এজ্ঞে হ্যাঁ।"

আমার প্ল্যানটা আমি সকলকে বললাম। আজকের এই বিপর্যয়ের পর কেউই আপত্তি জানাল না। বরং প্ল্যানটা উন্নত করার ফিকির বাতলালো। সেজদা অনেকক্ষণ চুপ ছিল হঠাৎ উত্তেজিত হলো, "প্যাঁ...প্যাঁ..প্যাঁ...।" মেজদা বলল, "অনেক রাত হলো, অমুর প্যাঁ প্যাঁ প্যাঁ সানাই দিয়েই সভাভঙ্গ হোক।" আমিই শুধু বুঝলাম সেজদা বলতে চাইছে, "প্যাঁচালো প্ল্যান কিন্তু পাক্কা।"

।। সাইকেল উদ্ধার—২ ।।

পরদিন আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠছি। ছোড়দি নাচতে নাচতে এসে বলল, "আজ দেড়েল বাবা এসেছে। দারুণ খবর।"

ঠাকুমাদের ভীষণ শ্রদ্ধেয় এক জ্যোতিষী আছেন দাড়িওলা। আমরা তাঁকে দেড়েল বাবা বলি। ছোড়দি বলে চলল, "আমার কাছ থেকে সাইকেল চুরির বৃত্তান্ত আর সময় জেনে নিয়ে দেড়েল বাবা বলল, আজকে চোর সমেত সাইকেল আমরা খুঁজে পাবোই পাবো—।"

"ধ্যুৎঃ। যতো সব বুজরুকি।"

"কেন? সেবার মেজদা হারানো পার্কার পেন তো ওর কথাতেই খুঁজে পেল। মনে নেই—"

আমরা বুড়ো বটতলায় হাজির হলাম বিকেল পাঁচটায়। আজই সাইকেল খোঁজার শেষ প্রচেষ্টা। কপাল ঠুকে দেখা।

চৌমাথার মোড়ে বিরাট বটগাছ। তাকে ঘিরেই বুড়ো বটতলা। বটগাছটার কতো যে বয়স কেউ জানে না। মূল গুঁড়িটাকে ঘিরে একটা বেশ বড়ো সিমেন্ট বাঁধানো বেদির চারপাশে খানিকটা খোলা জায়গার পর বিভিন্ন ধরনের দোকান, স্থানীয় ক্লাব আর একপাশে একটা বড়ো খাটাল বা গোয়াল। শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক বেরিয়ে এল, "আরে তুমি অজয় রায় না! আমার ছেলে কমলের বন্ধু! আমি গগন হালদার! তোমার কথা যে কতো শুনেছি।"

আমরা মেজদার সঙ্গে আছি জেনে গগনবাবু সকলকে দুটো করে চমচম খাইয়ে দিলেন। গণেশ বলল, "লাকি সাইন।" মেজদার কাছে সংক্ষেপে সব শুনে গগনবাবু বললেন, "আমি আছি প্রয়োজনে। বটতলার লোকেরা আমায় গুরু বলে। লড়ে যাও।" গগনবাবুর কথায় আমরা বেশ ভরসা পেলাম।

কম করে দেড়শ সাইকেল দাঁড়িয়ে বুড়ো বটতলার বাঁধানো বেদির চারপাশে। বেদির ওপর বসে শুয়ে প্রচুর লোক, হয় তাস খেলছে, আড্ডা দিচ্ছে, নয় বেকার সময় কাটাচ্ছে।

প্ল্যান অনুযায়ী প্রথমেই আমরা খুঁজে বার করে ফেললাম চুরি যাওয়া সাইকেলের অনুরূপ সাইকেলগুলো। বিভিন্ন জায়গায় পাঁচটা, ঝকঝকে নতুন, কমান্ডো সাইকেল দাঁড়িয়ে। এর একটা মেজদার হতে পারে। আমরা প্ল্যানমাফিক লেগে গেলাম নতুন সাইকেলগুলোর পেছনের চাকার হাওয়া খুলতে। সাইকেলের যারা খাঁটি মালিক তারা ফিরে এসে চাকার হাওয়া খোলা দেখলেই ভীষণ হট্টগোল বাধাবে। কিন্তু চোরাই সাইকেলের মালিক কোনও শোরগোলে না গিয়ে মানে মানে কেটে পড়বে। যে সাইকেলটা পড়ে থাকবে সেটাই আমাদের। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখব কেউ সাইকেলটা দাবি করে কি না। তারপর সাইকেল নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা।

আমরা বুড়ো বটতলার চারপাশে ছড়িয়ে পড়লাম। সেজদা, ছোড়দি আর নিমকিদি গগনবাবুর মিষ্টির দোকানের কাছে। মেজদা আর ছকু রেশন দোকানের পাশে। গণেশ আর আমি গোয়ালের পাশে। ওত পেতে রইলাম সাইকেলের মালিক বা চোরের ফেরার অপেক্ষায়।

হিসেবে যে বেশ বড় একটা গরমিল হয়ে গেছে—তখন টের পাইনি। আমরা ভেবেছিলাম সাইকেল নিতে একজন একজন করে আসবে আর চাকার পাম্প নেই দেখে একজন করেই হট্টগোল করবে। তাকে সামলাতে আমাদের তেমন বেগ পেতে হবে না। আমাদের জানা ছিল না যে পাশের দুটো সিনেমা হল "সঙ্গিনী" আর "কবিতা"য় যারা সিনেমা

দেখতে যায় তারা অনেকেই সাইকেল রেখে যায় এই বুড়ো বটতলায়।

হঠাৎই দেখলাম অন্তত পঞ্চাশজন একসঙ্গে ঢুকছে বুড়ো বটতলায়। ওদের চলা, বলা, চুল আঁচড়ানো, মুখের ভাব, আলোচনা লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায় যে সবাই সিনেমা ফেরত পাবলিক। মিনিট দুইও কাটল না তিনটে বিভিন্ন গলার একই ধরনের হুংকার শোনা গেল, "কোন হতভাগা আমার সাইকেলের হাওয়া খুলেছে রে...। কোন উল্লুক... কোন বেল্লিক...ধরতে পারলে মুণ্ডু গুঁড়িয়ে দেব।"

বুড়ো বটতলার সাইকেলের ঝাঁক দ্রুত ফাঁকা হতে শুরু করেছে। আরেকটা আর্তনাদ শোনা গেল কয়েক মিনিটের ভেতর। "মেরেছে রে—পেছনের চাকা পাংচার হয়ে গেছে।" প্রথম তিনজন চতুর্থকে বলল, "পাংচার হয়নি দাদা—পাম্প খুলে দিয়েছে। রাসকেলগুলোকে খুঁজে পেলে ছাল ছাড়িয়ে নেব।"

গোয়ালঘরের পাশ থেকে পরিষ্কার দেখতে না পেলেও আমার মনে হলো পঞ্চম সাইকেলটা পর্যবেক্ষণ করে কেউ একজন যেন নীরবে সরে পড়ল। না চেঁচিয়ে। আমি গণেশের হাতে মৃদু চাপ দিলাম। গণেশ ব্যাপারটা খেয়াল করেনি। আমি ওকে চাপা স্বরে বললাম, "প্ল্যানটা কাজ করেছে মনে হচ্ছে।"

চার সাইকেলের মালিক উদভ্রান্তের মতন আমাদের খুঁজে চলেছে। পেলে ছাল ছাড়িয়ে নেবে। আমরা মেজদা, ছকু আর বাকিদের দেখতে পাচ্ছি। সকলেরই নজর পঞ্চম সাইকেলটার ওপর। চারটে লোক বটতলার রোয়াকের ওপর উঠে আমাদের খোঁজ করতে লাগল অন্যদের কাছে। হঠাৎ দেখলাম রোয়াকের ওপর থেকে দু' তিনটে লোক আমাদের আর মেজদাদের দেখিয়ে দিচ্ছে। হাওয়া খোলার ঘটনাটা ওরা নোট করেছিল। গণেশও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। "ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।" গণেশের কথা শেষ হলো না, দেখলাম চারজনের দুজন তেড়ে আসছে আমাদের দিকে আর দুজন তেড়ে যাচ্ছে

মেজদা আর ছকুর দিকে।

দুজনের যা ষণ্ডামার্কা চেহারা—দেখে তো আমাদের প্রাণ উড়ে গেল। মেজদার কপাল বরাবরই ভালো, প্যাংলা লোক দুটো পড়েছে ওদের ভাগে। আমরা বুঝলাম গণেশের যতোই ক্যারাটে জানা থাক না কেন, আমরা ওদের সঙ্গে পারব না। গোয়ালটার দেওয়াল ভর্তি বড়ো বড়ো ঘুঁটে। আমি দুখানা ভারী ঘুঁটে খুলে নিয়ে ছুঁড়লাম। দিব্যি কাজ হলো দেখে আমি আর গণেশ দু'হাতে ঘুঁটে ছুঁড়তে লাগলাম পরপর। ভারী ঘুঁটে বৃষ্টির আঘাতে লোক দুটো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আচমকা পেছন থেকে ওদের মাথায় ঘাড়ে এসে পড়তে লাগল পরের পর ভারী সাইজের পান্তুয়া। নিমকিদি, ছোড়দি, আর সেজদার গোলাবর্ষণ। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে ওরা পান্তুয়া ছুঁড়ছে। পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক গগন হালদার। লোক দুটো প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেল তারপর টপাটপ বেশ কটা পান্তুয়া শূন্য থেকে লুফে, মুখে পুরে দিল। প্যাংলা লোক দুটো মেজদা আর ছকুর দিকে বেশি না এগিয়ে রাস্তার খোয়া আর ইট তুলে ছুঁড়ছিল। হঠাৎ দেখি ইট, খোয়াটোয়া ফেলে ওরাও পান্তুয়া খাচ্ছে। আমাদের জিভে জল এসে গেল। আমরা হাত নেড়ে সেজদাদের ইশারা করলাম। সেজদার হাতের জোর আছে। ওই ওপাশ থেকে সেজদা আমাদের পান্তুয়া পাঠাল। দারুণ পান্তুয়া। প্যাংলাদের ইটের আঘাতে মেজদা আর ছকুর অল্প কেটে-ছড়ে গেছে, প্যাংলাদের পান্তুয়া খাওয়া শেষ হলো না। উন্মত্ত মেজদা বেরিয়ে এসে "রে-রে" করে একজনকে ছুঁড়ে ফেলে দিল আর ছকু অন্যজনকে লাগাল এক মোক্ষম ল্যাং। লোক দুটো উঠে, সকলকে শাসিয়ে কাছপিঠের থেকে দলবল ডাকতে গেল।

আমাদের ষণ্ডা দুটো ভ্যাবাচ্যাকা মেরে মেজদাদের মারপিট দেখছিল। একজন হঠাৎ নার্ভাস হয়ে গুলিয়ে ফেলে, বাঁ হাতে ধরা ঘুঁটে খানিকটা চিবিয়ে ফেলল। তারপর বিকৃত মুখে "থু..থু.." করে মুখ থেকে ফেলে দিল। আমি আগে কক্ষণো কাউকে ঘুঁটে খেতে দেখিনি। মনে হলো তেমন সুবিধের খেতে না। পান্তুয়া শেষ হতেই সম্বিৎ ফিরল ষণ্ডা দুজনের। আমাদের দিকে ওরা এবার প্রায় দৌড়ে আসতে লাগল। আমরা ঘুঁটে বৃষ্টি চালাতে চালাতে ভীষণ ভয় পেলাম। মেজদার মতন আমাদের গায়ে জোর নেই। মার আমাদের খেতেই হবে।

লোক দুটো যখন দশ গজের ভেতর এসে গেছে তখন একটা বিশাল গোবরের তাল গিয়ে পড়ল একজনের মাথায়। তারপরেই আরেকটা তাল ওদের সামনে।

ভগবান গোবর সৃষ্টি করেছিলেন মানুষকে আছাড় খাওয়ানোর জন্য। গোবরেরা সচরাচর বিফল হয় না। এবারও হলো না। দুজনেই "বাবা গো" বলে সটান চিৎপটাং। একজনের সর্বাঙ্গে আরেকজনের অর্ধাঙ্গে গোবর মাখামাখি। ভাবলাম ঝামেলা শেষ হলো। ক্লান্ত আমরা সাইকেল নিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বাড়ি ফিরব—কিন্তু ওদিক ফিরে দেখি মেজদা আর ছকুর হাতে মার খাওয়া লোক দুটো ফিরে এসেছে একপাল মারমুখি জনতা নিয়ে। আমি বললাম, "গণেশ, কেলেঙ্কারি কাণ্ড। এক্ষুণি আমাদের পিটিয়ে আমসত্ত্ব বানিয়ে দেবে।"

গণেশের এই একটা বড়ো গুণ যে কখনও কোনও পরিস্থিতিতেই ঘাবড়ায় না বা নার্ভাস হয় না। গণেশ বলল, "ওর দাওয়াই ভাবাই আছে।" আমি আর গণেশ খুব তাড়াতাড়ি দুটো গরু আর দুটো ষাঁড়ের দড়ি খুলে একের পর এক তাদের গোয়ালের দরজার কাছে এনে লেজ-টেজ মুলে আর লাঠির খোঁচা দিয়ে

ভীষণ ক্ষেপিয়ে, গোয়াল থেকে বার করে দিলাম। চার চারে ষোলটা পা খাটাল ছেড়ে প্রচণ্ড হাম্বা হাম্বা করতে করতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়োতে লাগল বুড়ো বটতলার চারপাশে। যারা মস্তানি করতে এসেছিল তাদের ভেতর দৌড়োদৌড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। দু'চারজন চারপেয়ের গুঁতোয় আর ধাক্কায় ধরাশায়ী হলো। অনেকেই শেলটার নিল দৌরাত্ম্যের হাত থেকে বাঁচতে। নিমেষে হট্টগোলের মাত্রা পঞ্চম থেকে দশমে উঠল একলাফে। ঠিক যেন কুরুক্ষেত্র D. S.। অর্থাৎ double strength-এর কুরুক্ষেত্র।

এই চক্কোর থেকে কি করে বেরোব তাই ভাবছি, হঠাৎ একটা পুলিশের জীপ, সাইরেন বাজাতে বাজাতে এসে ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল আমাদের পাশে। কেউ একজন পুলিশে খবর দিয়েছিল। জীপ থেকে কনেস্টবল পরিবৃত হয়ে নামল ওসি জগাসুর। নিমেষে চতুষ্পদেরা ছাড়া সকলে থেমে গেল।

মেজদার কপালে, গালে রক্ত ঝরছে। জগাসুরর রিভলভার হাতে গর্জে উঠল, "তোমার এমন অবস্থা কে করেছে অজয় রায়! তার মুণ্ডু আমি চিবিয়ে খাবো। তুমি আমাদের এলাকার বিদ্যা, সংস্কৃতির ধারক-বাহক। কোন হতভাগার এতো বড়ো সাহস! তোমার গায়ে হাত দেয়?"

।। শেষমেশ ।।

আমি হঠাৎই খেয়াল করলাম যে ছকু আমাদের ভেতর নেই। মেজদার দায়িত্ব ছিল ছকুর ওপর নজর রাখার। পুলিশ আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেনি ছকু। আমি মেজদা আর গণেশকে সজাগ করলাম। তিনজনের ছটা চোখ চারদিকে ঘুরতে লাগল। আমরা দূর থেকে দেখলাম ছকু অনেক সাইকেলের মাঝে ঘাপটি মেরে পাঁচ নম্বর, ঝকঝকে মালিকহীন কমান্ডো সাইকেলটার লক্ খোলার চেষ্টা করছে। ছকুর হাতে চাবির গোছা যেটা সর্বক্ষণ ওর ট্যাঁকে থাকে। ছকু পাকা চোর, নিমেষে তালা খুলে ফেলল। কেউই বুঝতে পারলাম না ছকু কি করতে চায় হাওয়া খোলা সাইকেল নিয়ে। ছকুকে বিশ্বাস নেই। আমরা দৌড় লাগালাম ওর দিকে। ঠিক যেন হার্ডল রেস। সাইকেল আর হাজারো হার্ডলের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলাম। গতিবেগ মন্থর। দিনের আলো তখন গড়িয়ে পড়েছে অন্ধকারের জালে। আলো-আঁধারিতে আমরা হঠাৎ দেখলাম একজন সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সী লোক আচমকা ছকুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছকুর কলার ধরে ঠাস করে একটা চড় দিল গালে। তারপর ছকুর ডান হাতটা পিছমোড়া করে মুচকে ধরে আমাদের দিকে ফিরল।

লোকটার মুখ দেখে আমরা আকাশের অনেক উঁচুর থেকে ধপাস করে পড়লাম। এতো আশ্চর্য আমরা জীবনে কখনও হইনি। আচমকা শকে ঢাকনাদা জিভ কামড়ে ফেলল আর আমি শুকনো ডাঙায় কোনও কারণ ছাড়া আছাড় খেলাম। সাতজনের মুখ থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এল "ছোট্কা...!" হ্যাঁ। ছকুর হাত মুচড়ে ধরে দাঁড়িয়ে 'স্বয়ং ছোটকা'।

জগাসুরর গদগদ কণ্ঠে বলল, "গুড ইভনিং এম. এল. এ. সাহেব।"

ছোট্কা আমাদের সকলের বিস্মিত মুখগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে বলল, "আমাকে দেখে এতো আশ্চর্য আর অবাক হবার কি আছে! ভাগ্যিস সময় মতন এসে পড়েছিলাম, নইলে এই হতভাগাটা আমাদের সাইকেল নিয়ে...জগাদা একে ধরুন তো...।" ছকুর হাত ট্রান্সফার হলো।

আমাদের অন্তরে একটা জলতরঙ্গের স্রোত বয়ে গেল। সাইকেলটা সত্যিই আমাদের সাইকেল। নতুন ঝকঝকে কমান্ডো, চব্বিশ ইঞ্চি।

"তুমি কখন ফিরলে?"

"ঘণ্টা দুয়েক আগে। আমাদের তো আর বিরাম-বিশ্রামের জো নেই। এখানে মিস্টার ভৈরবের সঙ্গে জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। হাতের কাছে সাইকেলটা পেয়ে গেলাম..."

"হাতের কাছে মানে? আমরা গত তিনদিন ধরে সকলে মিলে সাইকেলটাই তো খুঁজে মরছি।"

৬০ বছর পরে আবার প্রকাশিত হলো

ঝলমল

দাম ঃ ৫৫ টাকা

লিখেছেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়চৌধুরী, সুখলতা রাও, মণীন্দ্রলাল বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রিয়ম্বদা দেবী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, জলধর সেন, রাধারানী দেবী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, সুনির্মল বসু, হেমেন্দ্রলাল রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, সুবোধ-চন্দ্র মজুমদার, জসীমউদ্দীন, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সীতা দেবী, গিরিজাকুমার বসু, কামিনী রায় এবং আরও অনেকে।

ছবি এঁকেছেন

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রতুল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, সুবল-চন্দ্র পাল, সতীশচন্দ্র সিংহ, ফণীভূষণ গুপ্ত, চারুচন্দ্র রায় ও বলাইবন্ধু রায়।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন □ কলকাতা-৭০০ ০০৯

"সেসব কথা আমি শুনেছি। তোমাদের চোখ যদি অন্ধ হয় আর বুদ্ধি যদি না থাকে তো কিছু করার নেই।"

আমরা পরস্পরের দিকে পালা করে তাকালাম। জগাসুর , ছকুও বাদ গেল না।

ছোটকা বলে চলল, "রবিবার, জামালপুরে মিটিং-এর জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, দেখি তোমাদের নতুন সাইকেল বাড়ির সামনে একা দাঁড়িয়ে। দুটো লোক, মনে হয় কুমতলবে একদৃষ্টে ড্যাব ড্যাব করে সাইকেলের দিকে তাকিয়ে। আমাকে দেখেই সুড়ুৎ করে সরে পড়ল। আমার তাড়া ছিল, আমি সাইকেলটাকে সদর দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে গোয়ালঘরের ভেতর রেখে চলে গেলাম। আজও দেখি সাইকেল সেই নিভৃত আশ্রয়ে ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে। ধুলো ঝেড়ে চড়ে পড়লাম। তা তোমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে এতো খুঁজেছ আর বাড়ির ভেতর গরুর ঘরটা দেখার প্রয়োজন বোধ করনি?"

"গোয়ালে গরু নেই, কেন কেউ ঢুকবে?"

জগাসুর বলল, "এম. এল. এ. সাহেব একদম ঠিক বলেছেন। বাড়ির ভেতরটা তো আগে ভালো করে খুঁজবে।"

আমি খেয়াল করলাম, আমি আর জগাসুরই কেবল ছোটকার সঙ্গে কথা বলছি। বাকিরা সকলে ফিরে পাওয়া সাইকেলানন্দর রূপেগুণে মুগ্ধ। কেউ গায়ে হাত বোলাচ্ছে, কেউ ব্রেক টিপে দেখছে, কেউ দেখছে সামনের চাকার হাওয়া ঠিক আছে কিনা।

জগাসুর হুংকার ছাড়ল, "তুমিই তো ছকুয়া, ওরফে নিলয়নন্দন ওরফে..." ছকু ডুকরে উঠল, "সাইকেল নিয়ে পালাচ্ছিলাম না হুজুর, আমি আমাদের সাইকেলটা উদ্ধার করে নিয়ে আসছিলাম। আমি জানতাম ওটা আমাদের সাইকেল। আমি সাইকেলের গন্ধ পাই।" ছকুর কথায় আন্তরিকতা উছলে পড়ল।

আমরা ছকুর কথা ঠিক বিশ্বাস করলাম কিনা জানি না। অনেক কষ্টে

ওকে রক্ষা করলাম জগাসুরের লক্ আপের থেকে। ছকু আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি বরং প্রচুর সাহায্য করেছে। ছকুর ল্যাঙে আমাদের অপনেন্ট ঘায়েল হয়েছে। আমরা আমাদের সাইকেল ফিরে পেয়েছি। ছকুর কাজ শেষ। ছকু চলে যাক যেখানে ওর মর্জি।

জগাসুর ছোটকাকে ছাড়া ফিরবে না। ছোটকা জীপে চড়ে পড়ল।

ছকুর আর মেজদার কেটে-ছড়ে গেছল। আমরা কাছের ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে ওদের ফার্স্ট এড দিলাম।

।। অবশেষে ।।

অন্ধকার নেমে পড়েছে। কাজ শেষ। সাইকেল নিয়ে আমরা সাতজন বাড়ির পথে রওনা হলাম। ছকু আঁধারের অন্তরালে সটকে পড়ল। মাইল দেড়েকের পথ। হাঁটতে হাঁটতে মেজদা আর নিমকিদি বলল, "ছকুর অভাবটা বেশ বোধ করছি। দু' তিন দিনে ও আমাদের একজন হয়ে গেছল। বড়ো আপনার। বেচারা। চুরি ছাড়া গতি নেই। দুনিয়ায় নিজের বলতে কেউ নেই। থাকার একটা জায়গা পর্যন্ত নেই।"

সেজদা অনেকক্ষণ পরে কথা বলল, "ছ..ছ..ক..ক।"

"হ্যাঁ সেজদা, আমরা ছক্কা মেরে জিতে গেছি। ছকু আমাদের হেল্প করেছে।"

দিব্যি ফুটফুটে চাঁদ উঠেছে। কৃতিত্বের পর চাঁদটাকে আরো যেন সুন্দর লাগছে। মেজদা কালিকা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে এক হাঁড়ি ল্যাংচা কিনে নিল।

সকলে বাড়ি ঢুকছি হঠাৎ ছোট ঠাকুমার ঘর থেকে জোর গলায় ভেসে এল, 'এ, বি, হ্রস্বই, দীর্ঘই..'

"না না, এ, বি, সি, ডি, ই, এফ...।"

ছোট ঠাকুমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি, দুই ঠাকুমার সামনে ছকু বসে চেল্লাচ্ছে, "এ, বি, হ্রস্বই, দীর্ঘই, কিউ, পি, ঋ, লি, এ, এস, এম, জেড।"

আমরা আশ্চর্য আর হতভম্ব একসঙ্গে হলাম। মেজদা হাততালি দিয়ে উঠল। "সুন্দর আবিষ্কার। ইংরিজি-বাংলার অ্যাব্রিজ্‌ড্ অ্যালফাবেটরাজি।"

আমাদের দেখে ছকু পড়া থামিয়ে একগাল হেসে বলল, "আমার চার নম্বর কন্ডিশনটা কিন্তু বাকি ছিল মেজদা।"

"ফিরে যখন এতোদূর এসেছ, সেটা বলে ফেলো দয়া করে।"

"আপনাদের বাড়ির সিঁড়ির নিচে একটা থাকার জায়গা—"

"ভেবে দেখতে হবে।"

"বাড়িতে চোর পুষবে!!"

দুই ঠাকুমা একসঙ্গে ছকুর পক্ষ নিল। "ও তো আর চোর নেই। এখন পাক্কা ভালোমানুষের পো। অ, আ, ক, খ শিখছে, এ, বি, সি, ডি শিখছে, সারে গামা শিখবে—একঘর সোজা দু'ঘর উল্টোও শিখবে।"

সেজদা বলল, "সা..সা..সা..সা।"

ছকু সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের জ্ঞান দেখাল, "রে..রে..রে..রে।"

নিমকিদি গাইল, "গা-গা-গা-গা।"

ছোড়দি গাইল, "মা-মা-মা-মা।"

আমি সক্কলকে বুঝিয়ে দিলাম, "না গো সেজদা বলছে সাইকেল কাণ্ড শেষ।"

ছবিঃ রাজা সরকার

রেবন্ত গোস্বামী

আমার প্রতিবেশী কৌটিল্য সেনগুপ্ত একজন অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী। তাঁর এক অদ্ভুত শখের নেশা বা হবি আছে, যেটা আমরা, তাঁর অতি পরিচিত লোক ছাড়া অনেকেই জানে না। তিনি ঢাক পিটিয়ে সবাইকে জানানোর প্রয়োজনও মনে করেন না। তাঁর লেখাপড়ার টেবিলে পেপারওয়েট হিসেবে ব্যবহৃত যে পাথরটা আছে, কিংবা তাঁর অ্যাকোয়ারিয়ামের জলের তলায় বা বারান্দার গাছের টবের মাটির ওপর যে সব পাথরের টুকরো আছে, তাদের প্রত্যেকেরই একটা ইতিহাস আছে, যেটা তিনি ছাড়া অন্য কেউ মনে রাখতেও পারবে না। টেবিলের ওপর সুদৃশ্য পেপারওয়েটের বদলে ঐসব ভাঙাচোরা পাথরের টুকরো দেখে মন্তব্য করতে তিনি আমাকে সেদিনই প্রথম জানালেন তাঁর হবির কথা।

জীবনে তো অনেক জায়গায় ঘুরলাম এই দেশে। বাইরেও গিয়েছি। নিকট আত্মীয়স্বজনও গিয়েছেন। আমার আর তাঁদের সংগ্রহ করা এই সব পাথর। যেমন, ঐ পাথরটা মিশরের পিরামিডের পাশে পড়েছিল। একই পাথরে পিরামিড তৈরি। কয়েক হাজার বছর আগে হয়তো ঐ বাড়তি টুকরোটা ভেঙে ফেলে দিয়েছিল কোনো শ্রমিক। এনেছিল আমার জামাই। এটা সেরকমই কুতুবমিনার এলাকায় পড়ে থাকা একটা পাথর। আমিই এনেছি। ঐ ছোট্ট টুকরোটা দক্ষিণমেরু থেকে এনেছে আমার ভাইঝি। সে দলের সঙ্গে কুমেরু অঞ্চলে গিয়েছিল, সে তো আপনি জানেন। সব পাথরেরই এরকম একটা ইতিহাস আছে।

গল্পে পড়া বাতিকবাবু নামে একজনের কথা আমার মনে পড়ল। সেটা অবশ্য একটু লোমহর্ষক ব্যাপার ছিল। আমি কৌটিল্যবাবুকে বললাম, আপনি এইভাবে খোলামেলা ছড়িয়ে রেখেছেন, এগুলো তো চুরি হয়ে যাবে। তিনি হেসে বললেন, নাঃ। এগুলো সেরকম মহামূল্য কিছু না। ব্যক্তিগত স্মারক ছাড়া বাইরের লোকের কাছে এর কোনো মূল্যই নেই। তাছাড়া, তারা তো এগুলোর ইতিবৃত্তও জানে না।

প্রায় ছুটির দিনেই আমাদের দু'জনের গল্পগুজব হতো। তিনি তাঁর নানাস্থানে ভ্রমণের আর চাকরি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প করতেন। আমি তো কলকাতার বদ্ধ জীব। মাঝে মাঝে যেসব ভ্রমণে গিয়েছি, সেগুলো অনেকেই ছুটি নিয়ে পরিকল্পনা করে টিকিট সংরক্ষণ করে বা ভাড়া করা দূরপাল্লার বাসের মাধ্যমে করে থাকে। সেটা যেন বৈচিত্র্যহীন মাপা জলে স্নান। যে কোনো ভ্রমণের বইয়েই পাওয়া যাবে, আমার কাছে নতুন কিছু শুনতে আসবে না কেউ।

একদিন সকালে হঠাৎ একটা পাথর হাতে কৌটিল্যবাবু প্রায় হন্তদন্ত হয়েই আমার বাড়ি এলেন। বললেন, পতঞ্জলিবাবু, গত রাত্তিরে এক অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। এই পাথরটাকে তো আপনি দেখেছেন। এটা মানস সরোবরের ধারে কুড়িয়ে পাওয়া একটা মসৃণ পাথরের টুকরো। অনেকদিন থেকেই টেবিলে আছে। আমি রাত্রে ঐ ঘরেই শুই।

রাত্তিরে আলো নেভালে কিছুক্ষণ চকচক করে পাথরটা। তারপরে আর করে না। গতকাল রাত্তিরে কিন্তু সারা রাত ধরেই জ্বলজ্বল করেছে। আলো জ্বালাতেই কিন্তু যেমনকে তেমন। সারা রাত ঘুমোতেই পারিনি। ব্যাপারটা কী, আমি বুঝতে পারছি না। হঠাৎ কালই কেন এটা একটা আলোর মতন জ্বলতে লাগল! আপনি কী করতে বলেন, পতঞ্জলিবাবু? আরেক রাত্তির দেখব?

আমি পাথরটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে তেমন কিছু বুঝতে পারলাম না। আমার মতো একজন অবৈজ্ঞানিকের মনে একটু ভয়ও দেখা দিল—হঠাৎ তেজস্ক্রিয়-টিয় হয়ে যায়নি তো? খুব তো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম।

আমি তাঁকে আরেক রাত্তির দেখতে বলে পাথরটা ফেরৎ দিলাম। পরদিনও তিনি সেইরকম উদ্‌ভ্রান্তভাবে এলেন। পাথরটা অবশ্য আনেননি।

আমি তাঁকে বললাম, আমার পরিচিত একটি ছেলে আছে, সাত্যকি। বিজ্ঞানে গবেষণা করে দেশ-বিদেশে খুব খ্যাতি পেয়েছে। কাছেই থাকে। চলুন, তার কাছে যাই।

সাত্যকি বাড়িতেই ছিল। অপরিচিত একজনের সঙ্গে আমাকে আসতে দেখে সে একটু অবাক হলো। তাকে মানস সরোবরের পাথরটা দেখিয়ে সব বললাম। সে ওটা নিয়ে কীসব পরীক্ষা করে বলল, এটা একটা ফসফরেসেন্ট পাথর। বাংলায় বলা হয়, অনুপ্রভ। আলো নিভিয়ে দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ জ্বলজ্বল করতে পারে। কিন্তু আপনি বলছেন, পরশু রাত্তির থেকে হঠাৎ সারারাত ধরে জ্বলছে। তবে কি ঘরে অন্য কোনো রশ্মি আসছে? আচ্ছা কৌটিল্যকাকা, আপনি পরশুদিন ঘরে কি অন্য কোনো জিনিস রেখেছেন?

কৌটিল্যবাবু একটু ভেবে হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এইভাবে বললেন, হ্যাঁ, টেবিলে একটা জিনিস রেখেছি বটে। তবে খুবই সাধারণ একটা বস্তু—একটা ছোট শক্ত খেলার বল। বিকেলে ছাদে জলের ট্যাঙ্কটা খুলে ওষুধ দিতে যাওয়ার সময় একটা কালো বল এসে পড়ল জলে। পাশের বাড়ির দুরন্ত ছেলেটার কাণ্ড। ভাগ্যি ভালো যে মাথায় লাগেনি। আমি ওটা টেবিলে রেখে দিয়েছি। এখনো চাইতে আসেনি। কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

সাত্যকি বলল, বলটা একবার দেখে আসতে পারি? আপনার আসার দরকার নেই, আমিই যাব। কাকাবাবুর বাড়ি তো চিনিই। কাকাবাবুকে নিয়েই যাব।

আমারও একটা আগ্রহ জাগল। কৌটিল্যবাবুর সঙ্গে সরাসরি তাঁর বাড়িতেই চলে এলাম কালো বলটা দেখতে। অবশ্য বলের সঙ্গে পাথরের কী সম্পর্ক, সেটা আমার মাথায় ঢুকল না। এ যেন—হাঁটু দিয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেল রে বাবা!

আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই কৌটিল্যবাবু হতভম্ব। টেবিল থেকে বলটা উধাও! তবে কি তাঁর নাতি বিলটু নিয়েছে? বিলটুর খোঁজ শুরু করতেই ছাদ থেকে তার চিল চিৎকার শুনতে পেলাম। আমরা দুজনেই ছুটে ছাদে চলে এলাম। দেখি, বিলটুর পাশেই বলটা পড়ে আছে। বিলটু বলল, বলের মধ্যে নাকি একটা লাল ইঁদুর ছিল। তার হাতের ওপর দিয়ে পালিয়ে গেল।

ছাদের এদিকটা পরিষ্কার নয়। বিলটুর প্যান্টে ধুলোমাখা। জামায় আরশোলার পাখা আটকে আছে। তাকে ঝেড়েঝুড়ে কোলে তুলে কৌটিল্যবাবু নিচে নেমে এলেন। আমিও বলটা হাতে নিয়ে তাঁর পেছন পেছন এলাম। বলটাতে দেখলাম, একটা ফাটল ধরেছে।

সাত্যকি বিকেলেই এসে হাজির। তাকে বলটা দিতে সে ওটা অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। ফাটলের মধ্যে একটা ছোট্ট টর্চ দিয়ে আলো ফেলল। তারপর তার ব্যাগ থেকে একটা যন্ত্র বের করে বলটার যেন বুক পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে শুধু বলল, আশ্চর্য!

আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে তার কথা শোনার অপেক্ষায় রইলাম।

সাত্যকি বলটাকে টেবিলের ওপর রেখে সেটার দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন আপনমনেই বলতে লাগল, এটা বল নয়, কাকাবাবু। এটা কী, তা শুনলে তাজ্জব বনে যাবেন। বস্তুটা হচ্ছে খুব ছোট্ট একটা মহাকাশযান। এটার গা থেকে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি বেরোচ্ছে। তাই এটার রঙ বলতে পারেন অতি-বেগুনি, কালো নয়। কিন্তু ঐ রঙ আমাদের চোখে অদৃশ্য। তাই আমরা মহাকাশযানটাকে কালোই দেখছি। কিন্তু আপনার মানস সরোবরের পাথরকে এটা উদ্ভাসিত করেছে।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ মুখে কোনো কথাই সরল না। হঠাৎ কৌটিল্যবাবু বলে উঠলেন, তবে বিলটু যে ইঁদুরটাকে দেখেছিল, সেটা কি—

সাত্যকি হেসে বলল, বাচ্চা ছেলের কাছে ইঁদুর মনে হয়েছে। তবে মনে হয়, সেটি অজানা গ্রহের এক বুদ্ধিমান জীব। আমরা তাকে মানুষই বলতে পারি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার কি ইঁদুরের মতন আকার হতে পারে?

সাত্যকি উত্তর দিল, কাকাবাবু, বিলটুর হাতের ওপর দিয়ে পাঁচ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটা পৃথিবীর মানুষ ছুটে গেলেও সে সেটাকে ইঁদুরই ভাববে। তবে লাল রঙটা হয়তো ঠিকই দেখেছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানী, শিল্পী ও দার্শনিকরা অন্য গ্রহের সবচাইতে বুদ্ধিমান জীবের যে দৈহিক গঠন কল্পনা করেছেন, সেটা মানুষের মতনই—কিছু উদ্ভট কল্পবিজ্ঞানের গল্পে ছাড়া। প্রকৃতি যে মনুষ্যাকৃতি দিয়েছে, তার চাইতে সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ আমরা কল্পনা করতে পারিনি। মানুষ শারীরিক ও ইন্দ্রিয়শক্তির দিক থেকে কোনো না কোনো প্রাণীর থেকে পিছিয়ে আছে। তার দৃষ্টিশক্তি শকুন-প্যাঁচার করুণার উদ্রেক করবে, ঘ্রাণশক্তিতে হাতি-কুকুরের কাছে নস্যি, শ্রবণশক্তিতে বেড়াল-কুকুর এগিয়ে, সাপ-মাছও মানুষের চাইতে স্পর্শকাতর। তবুও সে এগিয়ে তার বুদ্ধিতে আর তার শারীরিক সামঞ্জস্যে—যে শরীরে শিং নেই, নখ নেই, কাউকে যে কাটে না।

আমি বললাম, সেই পলাতক বুদ্ধিমান জীবটি নিশ্চয় বুদ্ধি খাটিয়ে কোনো নিরাপদ জায়গায় আছে। সুযোগ পেলেই নিজ-গ্রহে ফিরে যাবে।

সাত্যকি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সন্দেহ

আছে, কাকাবাবু। মানুষ যত বুদ্ধিমান হয়েছে, যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া সে তত অসহায় হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, আমরা জানি না তার আয়ুষ্কাল কত। জানি না, এই পৃথিবীর পরিবেশে কতক্ষণ সে টিকতে পারবে, যদি না তার গ্রহের আবহাওয়া পরিবেশের সঙ্গে পৃথিবীর সাদৃশ্য থাকে—একটু চুপ করে থেকে সাত্যকি অনুরোধের ভঙ্গিতে বলল, যদি অনুমতি দেন, আমি কি এই মিনি মহাকাশযানটা কিছুদিনের জন্যে রাখতে পারি?

কৌটিল্যবাবু সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি যদি কিছু উদ্ভাবন করতে পারো, সে তো আমাদেরই গৌরব। তারপর হেসে বললেন, বলা যায় না, তেমন কিছু আবিষ্কার হলে সাত্যকি সোমের নামের সঙ্গে এই দুই অবিজ্ঞানীর নামও যুক্ত হতে পারে।

সাত্যকি সেই 'বলটা' নিয়ে চলে গেল। আমিও বাড়ি চলে এলাম।

পরদিন চায়ের কাপ আর খবরের কাগজ হাতে সকালটাকে উপভোগ করছি। পায়ের কাছে মেঝেতে হালুম দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আর দু'পায়ে বসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তার প্রাপ্য বিস্কুটের টুকরোর অপেক্ষায়। হঠাৎ সে ফ্যাঁস করে শো-কেসটার দিকে তেড়ে গেল। আমি চেয়ে দেখি, শো-কেসের কাচের ভেতরে একটা ছোট্ট লাল পুতুল। কাচের পাল্লায় একটু ফাঁক, তাতে হালুমের থাবা ঢুকলেও পাল্লাটাকে সরিয়ে পুতুলের নাগাল পাচ্ছে না। পুতুলটা নড়ে উঠতেই আমি ছুটে হালুমকে সরিয়ে দিলাম। সন্দেহ নেই একটুও। সেই গ্রহের জীব। ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি পাল্লার কাচটা সরিয়ে জীবটিকে অভয়ের ভঙ্গিতে বললাম, মা ভৈঃ! কী বুঝল কে জানে। ওটাকে ধরে আমি ওপরের তাকে রেখে দিলাম, যাতে বেড়ালের নজরে না পড়ে। জীবটি কি কিছু খায়? একটা বিস্কুট আর ছোট্ট একটা খেলনা বাটিতে কিছু জলও রেখে দিলাম। এবারে সে বোধহয় বুঝতে পারল যে, আমার কোনো বদ মতলব নেই। সে আমার কাছে এল। মনে হলো, তার গায়ের লাল রঙটা কোনো আবরণের রঙ। হয়তো মহাকাশচারীর পোশাক। সেটা শরীরের সঙ্গে এমন খাপ খেয়ে গিয়েছে যে চলতে ফিরতে দৌড়তে কোনো অসুবিধা হয় না। কী দিয়ে পোশাকটা তৈরি, তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা আমার কম্মো নয়। সাত্যকি বলতে পারবে। হ্যাঁ—আমি স্থির করলাম, জীবটিকে সাত্যকির কাছেই নিয়ে যাব। কৌটিল্যবাবুকে সঙ্গে নেব অবশ্যই। বাড়িতে এখনই কিছু ভাঙব না, নইলে এমনই হৈচৈ লেগে যাবে যে পাড়া-প্রতিবেশীর জানতে আর বাকি থাকবে না। আর তার ফলে জীবটিরই জীবন-সংশয় হবে।

সারা দুপুর সবার নজর থেকে কায়দা করে জীবটিকে আগলে রাখলাম। দেখলাম, সে বিস্কুট ঠুকরেছে। হয়তো জলও খেয়েছে। বিকেলে বেরুবার আগে বাড়িতে শুধু বললাম, কৌটিল্যবাবুর সঙ্গে সাত্যকির কাছে যাচ্ছি। যেতে যেতে ভাবলাম, কৌটিল্যবাবুকেও সাবধান করে দেব। একেবারে সাত্যকির সঙ্গে দেখা করার পরেই যেন ব্যাপারটা বাড়িতে বলেন।

রাতুলবাবুকে (প্রত্যেকবার 'জীবটি' বলার চাইতে একটা নামই দিয়ে দিলাম আমি) পকেটে পুরতে কোনো অসুবিধা হলো না। সেও বুঝতে পেরেছে, আমি তার ক্ষতি করব না। আকারে বৃহৎ হলেও পৃথিবীর মানুষ আমি যে রাক্ষসশ্রেণীভুক্ত নই, সেটা হয়তো সহজ বুদ্ধিতে সে ধরতে পেরেছে। কৌটিল্যবাবুকে দেখাতেই মনে হলো তিনি মাথা ঘুরে পড়বেন। নিজেকে সামলে নিতেই আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে সাবধান করে দিলাম। আগে সাত্যকির কাছে যাই, তারপরে—

কৌটিল্যবাবু যেন কুকুরের বাচ্চাকে আদর করছেন, এইভাবে রাতুলের কাছে গিয়ে চুকচুক শব্দ করতে লাগলেন। সন্দেহ নেই, বুঝতে পারলে রাতুল অপমানে আরো লাল হয়ে যেত। রাতুল নামটা কৌটিল্যবাবুর পছন্দ হলো না। তিনি বললেন, লালটু। তাঁর নাতির নামের সঙ্গে মিল বলেই হয়তো। আমারও তাতে আপত্তি নেই।

টেলিফোন করেই গিয়েছিলাম সাত্যকিকে লালটুর ব্যাপার জানিয়ে। গাড়ি থেকে নামতেই দেখলাম, সাত্যকি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাদের তার গবেষণাগারে নিয়ে গেল। লালটুকে একটা থালার উপর দাঁড় করিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে লাগল। লালটুও লক্ষ্মী ছেলের মতন দাঁড়িয়ে তার কুতকুতে চোখ দুটো দিয়ে সব কিছু দেখতে লাগল।

সাত্যকি বলল, দেখেছেন এর আকৃতি? অবিকল মানুষের মতো। আবার পরে আছে মহাকাশযাত্রীর পোশাকও। তবে পোশাকটা কি থেকে তৈরি জানি না। বিস্কুট যখন খেয়েছে, তখন ওদের খাদ্যও বোধহয় আমাদের মতোই প্রধানত চারটি মৌল উপাদানের যৌগ। এবার দেখা যাক, ওদের ভাষা কী রকম।

কৌটিল্যবাবু বললেন, দ্যাখো, দ্যাখো, লালটু মুখ খুলে কী যেন বলার চেষ্টা করছে!

সাত্যকি একটা যন্ত্রে কান লাগিয়ে বলল, হ্যাঁ। বলার চেষ্টা করছে না। বলছে। তবে আলট্রা-সোনিক ধ্বনি আমরা খালি কানে শুনতে পাচ্ছি না। দেখি তো, অডিও ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার লাগিয়ে।

যন্ত্রটা লাগাতেই একটু পরে সরু মেয়েলি গলায় কতকগুলো শব্দ শোনা গেল—অঙ্ক গাখ্খা উকাঙ ঘক্...

সাত্যকি বলল, লালটু কথা বলার সময় জিভ ব্যবহার করে না। অথবা ওর জিভ নেই। তাই স্বরবর্ণ আর ক-বর্গেই সব বলছে। কিন্তু কী বলছে সে?

সাত্যকি তার এ-এফ-সি যন্ত্রে নিজের কণ্ঠস্বরকে আলট্রা-সোনিকে পরিবর্তিত করে বিশুদ্ধ বাংলায় লালটুকে যা জিজ্ঞেস করল, সেটা বঙ্কিম উপন্যাসের নায়িকার প্রশ্নবাক্য—পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?

আমরা দু'জন হেসে উঠলাম। অবশ্য লালটু তা শুনতে পেল না। সে শুনল সাত্যকির প্রশ্ন। কী বুঝল সেই জানে। কিন্তু সে চুপ করে কথাটা শুনল, তারপর বলে উঠল, আখা, আখা, কক্—

সাত্যকি আমাদের দিকে ফিরে বলল, বলতে পারছি না, লালটু পৃথিবীতে নামার জন্যই এসেছিল, না দিকভ্রষ্ট হয়ে

দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

নেমেছে। প্রথমটা হলে জলের ট্যাঙ্কে পড়ত না। তার মহাকাশযান পৃথিবীকে ঘিরে পাক খেতে খেতে নেমে এসেছে একটু একটু করে, নইলে পৃথিবীর আকর্ষণে বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত উল্কার মতো। কিন্তু সে যদি সমুদ্রে পড়ত ?

সাত্যকি আমাদের দিকে চেয়ে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, দু'-একটা দিন একে আমার কাছে রাখবেন আপনারা ? যদি কিছু জানতে পারি চেষ্টা করে! অন্য বিজ্ঞানীদের হাতে পড়লে তারা কিন্তু একে গিনিপিগ বানিয়ে ফেলবে। মেরে ফেলে এর দেহ ব্যবচ্ছেদ করবে। সাধারণ মানুষের হাতে পড়লেও একই পরিণতি। আপনারা কি তাই চান ?

আমাদের দুজনেরই লালটুর ওপর একটু বাৎসল্য স্নেহ জন্মে গিয়েছিল এর মধ্যেই। আমরা আঁৎকে উঠে একমত হয়ে সাত্যকিকেই উল্টে অনুরোধ করলাম তার কাছেই লালটুকে রেখে দিতে। আমরা এখন কাউকে কিছু বলব না।

কৌটিল্যবাবু তাঁর তর্জনীটা আলতো ভাবে লালটুর থুতনিতে ছুঁইয়ে যেই বললেন, চলি দাদুভাই। সাত্যকি হেসে বলল, ওদের আয়ুষ্কাল কত জানি না। হয়তো আপনার দাদুর বয়সীও হতে পারে সে। সামান্য রেশমের মতো চুল থাকলেও দাড়িগোঁফ গজায় না এদের। যন্ত্রে সেরকম কোনো গ্রন্থি নজরে পড়ল না।

কৌটিল্যবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা সাত্যকি, লালটু কি তার গ্রহে ফিরতে পারবে ?

সাত্যকি উদাসভাবে বলল, জানি না। ওর মহাকাশযানটা মনে হয় ভালোই আছে। কিন্তু জন্মস্থানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে কিনা, সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া, ফিরতে পারলেও কোন অবস্থায় তার গ্রহকে দেখবে, সেটাও বলা সম্ভব নয়। দেখি, ওর কাছ থেকে কিছু জানতে পারি কিনা। আপাতত এই লালটুই আমার গবেষণা। বলে হাসল তরুণ বিজ্ঞানী সাত্যকি সোম।

পরদিন সকালে সাত্যকির বাড়িতে যাওয়ামাত্র সাত্যকি বলল, বেশ কিছু তথ্য জেনেছি কাকাবাবু। একটা কাগজে লেখার ভঙ্গি করে তার কাছে সেটা রাখলাম। লালটু মহাকাশযান থেকে একটা ছোট্ট যন্ত্র এনে কাগজের ওপর রাখল। দেখলাম, পেনসিল বা কলম নয়। কারণ লালটুরা আঙুলকে দিয়ে পরিশ্রম করায় না। যন্ত্রটাতে বোতাম টিপেই সে তরতর করে লিখে চলল। অবশ্য আতস কাচ ছাড়া সে লেখা বুঝতে পারবেন না। লালটু উচ্চারণ করে তাদের বর্ণমালা বলতে বলতে সেগুলো লিখল। দেখলাম, তাদের বর্ণমালার সংখ্যা খুব কম। সেগুলোকে পারমুটেশান কম্বিনেশন করেই লক্ষ লক্ষ শব্দ তৈরি করে ওরা। ওদের সংখ্যা কেমন জানেন ? দশমিক প্রথার বদলে দ্বাদশিক প্রথা ওদের জগতে।

আমি অবাক হয়ে বলি, সেটা আবার কী ?

সাত্যকি বলল, পৃথিবীর সব দেশে সংখ্যার নিয়ম এক। এক থেকে নয়, আর শূন্য—এই দিয়েই সব সংখ্যা। একের পর শূন্য এসে দশ হলো। লালটুদের গ্রহে কিন্তু এক থেকে এগারো পর্যন্ত এক অংকের। তারপরে একে শূন্য দিয়ে হলো বারো—এইভাবে।

আমার তো মাথা গুলিয়ে গেল।

সাত্যকি বলল, কিছু শব্দও শিখেছি। যেমন, অক্ক মানে আমি। ঘক মানে আসা—এই সব। মনে হয় এবার অল্প দিনের মধ্যেই অনেক কিছু জেনে যাব। আশা করি, তখন কেউ এর ক্ষতি করবে না।

এইভাবে ক'দিনের মধ্যেই জানলাম, ওদের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ আছে পৃথিবীর মানুষের মতোই। পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে কতদিন লাগে, সেটা এই ক'দিনের গতি দেখেই সে তার কমপিউটারে কষে ফেলেছে। তাদের গড় আয়ু সেরকম আবর্তনের প্রায় দেড় হাজার। অর্থাৎ দেড় হাজার বছর। শুনে কৌটিল্যবাবু আমার কানে কানে বললেন, সেদিন দাদুভাই বলাটা তাঁর ঠিক হয়নি। সম্বোধনটাকে যদিও উল্টোভাবে ধরে নিয়ে লালটুকে দাদু হিসেবে নেওয়া যায়, কিন্তু থুতনি ধরে আদর করাটা—ছি ছি ছি!

ক্রমে জানলাম লালটুর গ্রহের নাম ওদের ভাষায় গাখ্‌খা। এরকম অসংখ্য ভাষা আছে সেই গ্রহে। আছে অসংখ্য শ্রেণীর প্রাণী। গাছও। আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে প্রচুর সাদৃশ্য আছে এবং সেজন্যেই সে এখানে এসে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে আছে। তবে সেখানে মানুষের আকার তার মতোই বালখিল্য। এক মিটার উঁচু তাদের বনস্পতি—যেগুলোকে আমরা হয়তো বনসাই বলব। কিন্তু পাহাড়-পর্বত সমুদ্র-নদী এগুলোর আকার পৃথিবীর তুলনায় খুব হেরফের হবে না। বহু কোটি ক্ষুদ্রাকার মানুষের বাসযোগ্য সেই গাখ্‌খা, অথচ তাদের সংখ্যা সীমিত। তাই ওদের কোনো অভাব নেই। নেই মানসিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক অস্থিরতা। জলে বাতাসে দূষণ নেই। তাদের মাউন্ট এভারেস্টে কোনো মানুষ আরোহণ করে উঠতে পারেনি, হয়তো পারবেও না। অন্যভাবে উঠেছে। সাঁতরে নদী পার

হওয়াও তাদের কাছে সমুদ্রলঙ্ঘন। কারণ নদীর পরপারই খালি চোখে তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

শেষে লালটু মানুষের মতোই দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছে—এসবই সে যখন গাখ্‌খা ছেড়ে এসেছিল, সেইসময়কার কথা। পৃথিবীর হিসাবে কয়েক লক্ষ বছর আগে।

এসব জানিয়ে কাচের বাক্সের মধ্যে বসে থাকা লালটুর দিকে তাকিয়ে সাত্যকি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তবে জানেন কাকাবাবু, কৌটিল্যকাকা, কদিন থেকে লালটুর মনটা ভালো যাচ্ছে না। আগের মতন সে আর বেশি কথা বলে না। বলে, গাখ্‌খার কথা, তার অতীত কালের প্রিয়জনদের কথা ভেবে মন কেমন করছে। লালটুর মতো তো তাদের আয়ুবৃদ্ধি আটকে থাকেনি!

এটা অবশ্য আমরাও একটু অনুমান করতে পেরেছি। আমাদের দেখে তো কিছুদিন আগে পর্যন্ত চেনা বন্ধুর মতো অনেক কথা বলে যেত, যা যন্ত্রের সাহায্যে শুনে সাত্যকি তর্জমা করে দিত যতটা সম্ভব। আমাদের দুজনের নামকরণ করেছিল ওদের দুই উপগ্রহের নামে। সাত্যকি হেসে বলেছিল, সোজা বাংলায় যার অর্থ—মানিকজোড়। তা মহা-মহা-প্রদাদু এরকম একটু-আধটু ঠাট্টা করতেই পারেন।

মাঝে কৌটিল্যবাবু অসুস্থ হয়ে পড়াতে আমারও কিছুদিন লালটুকে দেখতে যাওয়া হয়নি। একদিন টেলিফোনে সাত্যকিকে জানালাম, এবার লালটুর সঙ্গে পৃথিবীর লোকজনের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই উচিত। মনে হয়, এরপর বিজ্ঞানীরা ওকে উত্যক্ত করবেন না। সাত্যকি কিন্তু এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। সে বলল, আর কদিন যাক। লালটু একটু অসুস্থ বোধ করছে। বোধহয় পৃথিবীর বাতাসের দূষণ ওর সহ্য হচ্ছে না, যদিও যতটা সম্ভব দূষণমুক্ত কাচের বাক্সে তাকে রাখা হয়েছে।

সেদিন ছিল আশ্বিন মাসের এক রবিবার। আমি আর কৌটিল্যবাবু সাত্যকির কাছে গিয়ে দেখি, সে টেবিলে দু'হাতের ওপর মাথা রেখে চেয়ারে বসে আছে। এক হাতে সন্না দিয়ে একটি অভ্রের টুকরো ধরা। আমাদের দেখে সেটা একটা ছোট্ট কৌটোর মধ্যে রেখে বলল, লালটু চলে গিয়েছে।

অ্যাঁ! কোথায়? দু'জনেই সমস্বরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম।

সাত্যকি সেভাবেই ধীরে ধীরে বলল, গন্তব্য তো তার গাখ্‌খা গ্রহে। তবে জানি না, তার পথের শেষ কোথায়। কদিন থেকেই মুষড়ে পড়েছিল। এদিকে এখানে চারপাশের পরিবেশে কেমন একটা সাজো সাজো ভাব। বাগানের শিউলি গাছ ফুলে ভরে গন্ধ ছড়াচ্ছে। সকালের রোদে সোনা। ফাঁকা জমিতে কীভাবে শরতের খবর পেয়ে সাদা কাশ মাথা তুলে তার অমল ধবল আন্দোলনের ইনফ্রাসোনিক ধ্বনিতে শরতের আগমনী গাইছে। এই পরিবেশে ওর নিঃসঙ্গতা দেখে আমারও মন খারাপ হয়ে উঠল। রাত্তিরে মহাকাশযান বলটাকে ছাদে নিয়ে এলাম। লালটু আমার মনোভাব বুঝতে পারল। সে আনন্দে সেখানে ছুটে এল। আমার হাতের তালুতে উঠে সে আলট্রাসোনিক তরঙ্গে সুর তুলে বলে উঠল—গিগা। না, এটা ওদের ভাষা নয়। বাংলা শব্দ—বিদায়! সে আমার কাছে কিছু বাংলাও শিখেছিল। তারপর সে মহাকাশযানে ঢুকে একবার বেরিয়ে এল। তারপর আবার ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই বলটা ছুটে চলে গেল আকাশের অসীমে।

আমরা চুপ। একটু পরে আমি বললাম, ভালোই করেছ সাত্যকি। ওর কোনো ক্ষতি হলে গাখ্‌খা গ্রহের কাছে দায়ী থাকতাম আমরা তিনজনই।

কৌটিল্যবাবু বললেন, পৃথিবীর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে গেল না সে?

সাত্যকি বলল, হ্যাঁ, আমি দিয়েছি। একটা মানুষের ছবি।

আমি বললাম, একটি পুরুষ ও একটি নারীর ছবি এর আগেও তো ভিন্ন জগতে পাঠানোর চেষ্টা হয়েছে। সেরকমই কি কিছু—

সাত্যকি বলল, না। এটি একজন পুরুষেরই ছবি—সমগ্র মানবজগতের প্রতিনিধি হিসাবে। প্রথম যে মানুষটির মধ্যে আমরা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, মনুষ্যত্ব ও বিপ্লবী চিন্তার পরিচয় পেয়েছি, তাঁরই একটি ধ্যানস্থ মূর্তির ছবি।

কৌটিল্যবাবু বললেন, তুমি কার কথা বলছ?

সাত্যকি হেসে আবৃত্তি করল, শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য। প্রথম আদর্শ মানব হিসাবে তাঁর কথাই মনে পড়ল।

আমি বললাম, সে কিছু দিয়ে যায়নি? অবশ্য মহাকাশযানে কী-ই বা দেওয়ার মতো থাকবে?

সাত্যকি সেই ছোট্ট কৌটোটা খুলে বলল, হ্যাঁ, সেও দিয়েছে। তবে খালি চোখ কিছু বুঝতে পারবেন না। একটু দাঁড়ান, ম্যাগনিফায়িং প্রজেক্টরে ছবি পর্দায় দেখাচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে সাদা ফাইবার গ্লাসের বোর্ডে ফুটে উঠল অনেকগুলি নানান আকারের দেবদূতের ছবি।

একটা লাঠি দিয়ে তার মধ্যে একজনের দিকে নির্দেশ করে সাত্যকি বলল, এটি হলেন আমাদের লালটুর দাদু। এগুলো তার পরিবারের লোকজন।

আমি বললাম, কিন্তু এরা তো দেখছি পরীর মতো পাখনাওয়ালা। লালটুও। কিন্তু আমরা তো লালটুর পিঠে কোনো পাখনা দেখিনি!

সাত্যকি প্রজেক্টর বন্ধ করে দিয়ে বলল, হ্যাঁ। লালটুরও ছিল। এদিক থেকে পৃথিবীর মানুষের তুলনায় একটু তফাৎ, একটু সুবিধে ওদের আছে। লালটুর পাখনাটা খোয়া গিয়েছে পৃথিবীতে এসে। খুবই পলকা। আবার গজাতে আমাদের হিসেবে প্রায় দশ বছর লাগবে। ওদের পৃথিবীতে এটা কোনো সময়ই নয়। যাই হোক, পৃথিবীতে এসে তার একমাত্র ক্ষতি এটাই।

কিন্তু কোথায় গেল সে দুটো! দু'জনেই বিস্ময়ভরা প্রশ্ন করে ফেলি।

সাত্যকি উদাসভাবে বলল, হয়তো মহাকাশযান থেকে প্রাণভয়ে ছুটে বেরোতে গিয়ে বিলটুর হাতের ধাক্কা লেগে খসে যেতে পারে। আমাদের কাছে খুবই হালকা-পলকা জিনিস। একটা আরশোলার পাখার মতো বই তো নয়।

ছবি : সৌমিত্র চক্রবর্তী

ফুন্টসোলিং-এর মূর্তিচোর

সুভাষ ধর

ভুটান পাহাড়ে বুদ্ধমূর্তির সন্ধানে দৌড়ঝাঁপের পর সুশান্তের হাতে তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ নেই অনেকদিন। একটু সময় পেলে বইপত্তর ঘাঁটার অভ্যেসটা ওর শিশুবয়স থেকে। আজকাল ক্রিমিনোলজি বা অপরাধবিজ্ঞানের মোটা মোটা কিতাব নিয়ে বসছে। রণজিতের আবার পড়তে বসলেই চোখে ঘুমের ঢল নামে। সুশান্ত যখন ফিঙ্গারপ্রিন্টের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে তন্ময়, রণজিৎ ততক্ষণে আগাথা ক্রিস্টির একখানা বই চোখের সামনে ধরে স্বপ্নের জগতে, মাঝে মাঝে নাসিকাধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। এমন সময় দরজার ঘণ্টি বেজে উঠলো। শিউপূজন দরজা খুলে দিতেই পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো।

সুশান্ত হাতের বই টেবিলে রেখে রণজিতের কাঁধে একটা খোঁচা মেরে বললো, উঠে পড়। আর ঘুমুসনে। মনে হচ্ছে দোরজি সাহেব ভূটানপাহাড় থেকে নেমে এলেন।

আজকাল সামন্তর বাড়িতে দোরজি সাহেবের ঘন ঘন আবির্ভাব ঘটছে। ইরা পাকাপাকিভাবে কোলকাতায় থেকে পড়াশুনোর কথা ভাবছে। ইদানীং সামন্তর কাছেই থাকছে আর ভাল কলেজগুলোতে ভর্তির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দোরজির আবার ইরাবোন অন্ত প্রাণ। মাসে দু'চারবার ইরাকে না দেখলে কেমন হয়ে যায় মনটা। পুলিশের বড়কর্তার কঠোর খোলস ছেড়ে নানা অজুহাতে কোলকাতায় আসছেন মাঝে মাঝে। দোরজির স্ত্রীও কোলকাতা ভালবাসেন, এখানেই পড়াশুনো করেছেন, তিনিও সঙ্গ ধরেন। কাজেই সামন্তর বাড়িতে মাঝে মাঝেই আজকাল আড্ডার আসর বসে। ক্বচিৎ সুশান্ত আর রণজিৎও হাজির হয়। দোরজি কোলকাতায় এলে যেমন করেই হোক সুশান্তর সঙ্গে দেখা করে যাবেনই।

দোরজি ঘরে পা রাখা মানেই তাঁর নাটকীয় আগমন। বললেন, ওয়েল, ওয়েল ব্রাদার্স, এমন সুন্দর সন্ধ্যায় ঘরে বসে আছো কি করে! চল, বাইরে বেরিয়ে পড়ি। সুশান্ত, চন্দ্রহাটি জায়গাটা কোথায়? মনে হয় খুব কাছেই। আমার একটু সরকারী কাজ আছে, তোমরা সঙ্গে যাবে নাকি?

সুশান্ত বললো, দোরজি সাহেব,

চন্দ্রহাটি খুব কাছে নয়। যদি হুগলীর চন্দ্রহাটি হয়, এখান থেকে গুনে গুনে সত্তর কিলোমিটার। আপনার পুলিশের গাড়ি কম করেও দু'ঘণ্টা নেবে। তা আপনার সরকারী কাজটা কি যদি একটু জানান তবে যাবার ব্যবস্থা করি!

দোরজি বললেন, তেমন জরুরি কিছু না। চন্দ্রহাটি জায়গাটা শুনেছি বেশ মনোরম, গঙ্গার গায়ে গা ঠেকিয়ে রয়েছে। ওখানে রয়েছেন রামসুন্দর মিত্র নামের এক বনেদী ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি। একলা মানুষ, নানান খেয়াল নিয়ে থাকেন। তার একটা হলো যতো কিম্ভূত ধরনের মূর্তি সংগ্রহ। শুনেছি তাঁর সংগ্রহে সিকিম, তিব্বত, ভূটান সব জায়গার তান্ত্রিক মূর্তির একটা বড়সড়ো কালেকশন আছে।

সুশান্ত বললো, দোরজি সাহেব, আপনি পুলিশের লোক, আমিও তাই। অতো সহজ-সরল কারণে আপনি চন্দ্রহাটি যেতে চাইবেন এটা আমি কি করে মেনে নিই! আসল গল্পটা বলুন।

দোরজি বললেন, সব কথা রাস্তায় হবে। চল বেরিয়ে পড়ি। রামসুন্দর মিত্রকে বাড়িতেই পাবো। উনি কখনো বাড়ি থেকে বার হন না এটা জানি। খালি গরমের সময়টায় তিন মাসের জন্য সিকিম, ভূটান, নেপাল চষে বেড়ান। এখন ছটা বাজে, পৌঁছতে পৌঁছতে আটটা হবে। দেখা করার পক্ষে সেটা নিশ্চয় এমন কিছু খাপছাড়া সময় নয়।

রণজিৎ ছোট্ট করে বললো, গাঁয়েগঞ্জে যাবি, রাতের খাবারটা জোটে কিনা ভেবে দেখিস।

দোরজি কোলকাতায় এলেই রয়াল ভূটানের সাদা ধবধবে অ্যাম্বাসাডার গাড়ি চাপেন, সঙ্গে থাকে সাদা পোশাকে ভূটান পুলিশের লোক। সুশান্ত, রণজিৎ আর দোরজি পিছনে বসলেন, সামনে একটি ভীমাকার ভূটানী আর্দালী ড্রাইভারের পাশে বসলো। তার কোমরের বেল্টের সঙ্গে আঁটানো ·৪৫ রিভলবারের বাঁট জামার উপর দিয়ে দৃশ্যমান, এটা সুশান্তের চোখ এড়িয়ে গেল না।

সুশান্ত ছোট্ট করে ড্রাইভারকে বললো, বি.টি. রোড ধরে কল্যাণীর পথ ধরুন। কল্যাণী ব্রিজ পার হলেই গঙ্গার ওপারে চন্দ্রহাটি। কম সময়ে পৌঁছে যাবো। হাওড়া হয়ে দিল্লী রোড ধরে চুঁচুড়া, চন্দননগর পার হতে হতেই রাত দশটা বেজে যাবে।

গাড়ি দমদম এয়ারপোর্টের রাস্তা ধরলো। দোরজি এতক্ষণ আনমনে শিস দিচ্ছিলেন, এবারে আস্তে করে বলতে লাগলেন, আমার পরমাত্মীয় মহাভাগ অনেক কুকীর্তির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। তোমরা হয়তো জানো না, ভূটানের রাজপরিবারে কিছু কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যাঁদের ঐশ্বর্য ও সম্মান রাজার চেয়ে কিছু কম নয়। যেমন ধরো রাজমাতা বা রাজার মামা। এঁরা সবাই অত্যন্ত সম্মানিত রাজপুরুষ। রাজার মামার প্রচুর ভূসম্পত্তি, থিম্পু, পারো ছাড়াও ফুন্টসোলিং-এ রয়েছে প্রাসাদোপম বাড়িঘর। ফুন্টসোলিং শহরের এমনি একজন রাজপুরুষের গৃহ থেকে একডজন মূর্তি অদৃশ্য হয়ে যায় কয়েকমাস আগে। আমি দুঃখিত তাঁর নাম বলা যাবে না, ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। যে মূর্তিগুলো চুরি যায় তার মধ্যে কিছু ছিল তান্ত্রিক সাধুসন্তের আর গোটা দুই বুদ্ধমূর্তি। তবে সচরাচর আমরা যে বুদ্ধমূর্তি দেখি, এ দুটো সেরকম নয়। আসলে ভূটানের বৌদ্ধধর্ম তন্ত্র প্রভাবিত, তাই বুদ্ধের মূর্তিরও অন্য রূপ। মূর্তিগুলোর ধাতুগত মূল্য নগণ্য, কিন্তু ভূটান রাজপরিবারের কাছে এদের দামের হিসেব কষা যাবে না এবং বিদেশী বাজারে এক থেকে দেড় লাখ ডলার অনায়াসে পাওয়া যাবে। প্রাথমিক তদন্তে মনে হয়েছিল এটা সাধারণ ছিঁচকে চুরি। কারণ মূর্তিগুলো অদৃশ্য হবার পরেই দেখা গেল বাড়ির এক ভৃত্যও নিরুদ্দেশ। শিশুবয়স থেকে সে ঐ পরিবারে আছে। এখন যুবক, নামটা ধরো নরজান গুরুং। অনেক খোঁজাখুঁজি হলো। নরজানের আত্মীয়-পরিজনদেরও জেরা করা হলো। কিছুই হদিস মিললো না। শুধু একটাই খবর ছিল, মহাভাগের আগড়ায় গুরুং যেতো মাঝে মাঝে।

দোরজি একটু থামলেন। গাড়ি ততক্ষণে এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে বারাসাতের পথ ধরেছে। দোরজি আবার শুরু করলেন, আজ থেকে ঠিক বাইশ দিন আগে গুরুং-এর খোঁজ পাওয়া গেল। জলপাইগুড়ির প্রান্তে একটা চায়ের দোকানের পেছনে এক চিলতে ঘরের কড়িকাঠ থেকে গুরুংয়ের দেহ ঝুলছে। বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করবো না। মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্সের সংজ্ঞা অনুযায়ী এটা আত্মহত্যা হতেই পারে না, নিছক নৃশংস হত্যা। তদন্তে জানা গেল গুরুং-এর সঙ্গে থাকতো তারই আরেক শাগরেদ রেশম বাহাদুর। যথারীতি রেশম বাহাদুরও সেদিন থেকে নিপাত্তা। মূর্তিগুলোর কোনো খোঁজ নেই। সুশান্তর বন্ধু কমল হালদার জলপাইগুড়িতে পোস্টেড, তদন্তে অনেক সাহায্য করলো সে। কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। দিন সাতেক আগে রেশম বাহাদুরের দেখাও মিলেছে। খিদিরপুরের এক বস্তিবাড়িতে, তারও দেহ ঝুলছে কড়িকাঠ থেকে। এটাও হত্যা, আত্মহত্যার ব্যাপার নয়। মূর্তির কোনো সন্ধান নেই। কোনো সূত্রও নেই। রেশম বাহাদুরের কোনো শাগরেদের খবর পেলাম না। যে সূত্রটি আজই পেয়েছি তা হলো একটি চিরকুট যেটা রেশম বাহাদুরের পকেট থেকে উদ্ধার হয়েছে। তাতে একটি নাম, একটি ঠিকানা—রামসুন্দর মিত্র, চন্দ্রহাটি, হুগলী। একটু হোমওয়ার্ক করতে হলো রামসুন্দর মিত্র সম্পর্কে এবং তাতেই জানা গেল ভদ্রলোক বেশ ছিটগ্রস্ত। বিয়েথা করেননি, নানান উদ্ভট খেয়াল নিয়ে থাকেন, তার মধ্যে একটা হলো ওই মূর্তি সংগ্রহ। তবে ভদ্রলোকের কোনো ক্রিমিন্যাল রেকর্ড নেই, পরিষ্কার চরিত্র।

সুশান্ত একটু বাধা দিল, দোরজি সাহেব, মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স আমাকেও পড়তে হয়েছে। তবু সংক্ষেপে বলুন, কেন ধরে নিলেন গুরুং এবং রেশম বাহাদুর আত্মহত্যা করেনি, এদের হত্যা করা হয়েছে।

দোরজি হেসে ফেললেন। বললেন, সুশান্ত, তোমার মতো বুদ্ধিমান এবং কৃতী পুলিশ অফিসারকে আত্মহত্যা আর হত্যার বিভাজনটা কি করে বুঝাই! দুটোই এসফিক্সিয়াল বা শ্বাসরোধ করা মৃত্যু। কিন্তু গলায় রশির দাগ আড়াআড়িভাবে রয়েছে,

কোনাকুনি নয় এবং কারো জিব মুখের বাইরে আসেনি। আত্মহত্যা হলে রশির দাগ থাকতো কোনাকুনি এবং জিব বেরিয়ে থাকত। এছাড়া আরো কিছু কিছু লক্ষণ আছে হত্যা আর আত্মহত্যার তফাৎটা ধরার জন্য। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে এটাও ধরা পড়েছে গলার চামড়ায় পরিষ্কার আঙুলের ছাপ। এই ছাপটা ধরা পড়েছে চামড়ার প্রথম পর্দা অর্থাৎ ফার্স্ট লেয়ার অব এপিডারমিস উঠিয়ে নেবার পর।

সুশান্ত বললো, অর্থাৎ কিনা দুজনকেই হত্যা করার পর দেহ কড়িকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাতে আরো একটা সূত্র জানা গেল। একাধিক ব্যক্তি এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত। কারণ একজন লোক, সে অসাধারণ শক্তিমান হলেও একা এই কাজ করে উঠতে পারবে না। দুই, মোডাস অপারেন্ডি বা অপরাধ পদ্ধতি ধরলে দুটো অপরাধই একদলের কাজ। তাহলে দোরজি সাহেব, আপনার হাতে দুটি কাজ। এক, হত্যারহস্যের সমাধান এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার; দুই, মূর্তিগুলো উদ্ধার করে যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া। শুধু একটা কথাই মাথায় ঢুকছে না। এই ঘটনার সঙ্গে মহাভাগের কি সম্পর্ক থাকতে পারে!

দোরজি বললেন, মহাভাগ সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয়নি। ছাত্রজীবনে মহাভাগ ভূটানের সেরা কুস্তিগীর ছিল। টাসিগাঙে একটা কুস্তির আখড়া বানিয়েছিল। অনেক ছেলেও আসতো, কুস্তিটুস্তি করতো আর এখানে-সেখানে গায়ের জোর ফলিয়ে বেড়াতো। এ লাইনে থাকলে মহাভাগ যথেষ্ট নাম কিনতে পারতো এটা নিশ্চিত। নরজান গুরুং আর রেশম বাহাদুর দুটোই ছিল মহাভাগের চেলা। পরে নানান হুজ্জতের মধ্যে মহাভাগ জড়িয়ে গেল, আখড়াটাও একসময় বন্ধ হয়ে গেল।

কথাবার্তার ফাঁকে গাড়ি কল্যাণীর কাছাকাছি মথুরাবিলে এসে পড়েছে। রণজিৎ প্রায় সারা রাস্তা ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে পার করেছে। একসময় চোখ খুলে বললো, আমার কথা বাসি হলে বুঝবি ঠিক। এই সব খালবিল জঙ্গল দেখতে খারাপ লাগছে না। কিন্তু রাতে খাবার জুটবে না এটাও ভুললে চলবে না।

সুশান্ত বললো, চন্দ্রহাটির কাজ শেষ করে তোদের নিয়ে যাবো আমার এক পরম শ্রদ্ধেয় জনের কাছে। একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে খাবার ভাবনাটা তাঁর উপরই ছেড়ে দেবো।

রণজিৎ, কে সে? কে সে? করে উঠলেও সুশান্ত কোনো উচ্চবাচ্য করলো না।

চন্দ্রহাটি না শহর না গ্রাম। আশেপাশে বেশ কয়েকটা বড় আয়তনের কলকারখানা। হুগলীর এই অঞ্চলটায় কাপড়, কাগজ, জুট তৈরির মিল। বহুবছর আগে ব্রিটিশ সাহেবরা এসবের পত্তন করে গেছেন, আজ সাহেব নেই, দিশী সাহেবরা দেখাশুনা করেন। তবে মিলগুলোর রমরমা যে কমে এসেছে এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। গঙ্গার গায়ে গা ঠেকিয়ে চন্দ্রহাটি। কলাবাগান, আমবাগান আর ঝোপজঙ্গলে জায়গাটা বেশ সবুজ। গঙ্গা এখানে এসে একটু সংকীর্ণ হয়ে পড়লেও যথেষ্ট মনোরম।

ফেব্রুয়ারি মাসের সন্ধ্যে হলেও একটু শীতের হিমেল ছোঁয়া গায়ে লাগছে। দুয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই রামসুন্দর মিত্রর হদিস পাওয়া গেল।

রামসুন্দরবাবুর বাড়ি যেন অট্টালিকা। বিশাল পরিধি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত দশ কাঠা জমির উপর বাড়ি। চারধার ঘিরে বেশ উঁচু দেয়াল, উপরে আবার তারকাঁটা লাগানো। বাড়িটা দোতলা, একদম মাঝামাঝি জায়গায়। পুরনো সাহেবী প্যাটার্নের বাড়ি, সাদা রং।

রণজিৎ মন্তব্য করলো, এ তো বাড়ি নয়, দুর্গ দেখছি।

বাড়ির কাছ বরাবর এসে গাড়ি ঘ্যাঁচ করে থামলো। আবছা আঁধারে মনে হলো চার-পাঁচটা মুখ এদিক-ওদিক সরে গেল। চোখের ভুলও হতে পারে।

সুশান্ত গেটের কাছে এসে কলিংবেল টিপলো। তারপরই এক অসহনীয় পরিস্থিতি! মনে হলো একপাল কুকুর বাড়ির ভেতর থেকে একইসঙ্গে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কানে তালা লাগার যোগাড়!

সুশান্ত আর দোরজি দুজনেই কুকুরপ্রেমী। সুশান্ত হেসে বললো, দোরজি সাহেব, মিত্তিরমশাই লোক খারাপ হবেন না, কম করেও চারটে স্পিজ আর চারটে পমেড়িয়ান কুকুর পুষে রেখেছেন। কলিংবেল টিপলেই এরা সারা বাড়ি জাগিয়ে তোলে।

এমন সময় একজন শীর্ণকায় ফর্সা লম্বা লোক দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিলের মতো চেঁচিয়ে বললো, কারা ওখানে? এই রাতদুপুরে কলিংবেল টেপা হচ্ছে কেন?

সুশান্ত বললো, মিত্তিরমশাই, রাত সবে আটটা। আমরা কোলকাতা থেকে আসছি। রাত আটটায় তো কোলকাতায় ভালো করে সন্ধ্যেই শুরু হয় না।

রামসুন্দর মিত্র বললেন, কোলকাতা থেকে আসছেন শুনে কৃতার্থ হলাম। কিন্তু মহাশয়রা কি কারণে আমার শান্তি বিঘ্নিত করছেন জানতে পারি কি?

দোরজির বাংলা ভাঙা ভাঙা, উচ্চারণও অন্য ধরনের তাই এসব কথাবার্তায় নিজেকে জড়ালেন না। সুশান্তই আবার বললো, মিত্তিরমশাই, ভয় পাবেন না, আমরা পুলিশের লোক।

রামসুন্দরবাবু আবার খেঁকিয়ে উঠলেন, পুলিশের লোক তবে উর্দি চড়িয়ে আসেননি কেন? চেহারাগুলো তো গুণ্ডাদের মতো, পুলিশ না গুণ্ডা বুঝবো কি করে?

রামসুন্দরবাবু ইতিমধ্যে কুকুরগুলোর উদ্দেশে দু'তিনবার ধমক দিতেই সেগুলো চুপ করে গেল।

সুশান্ত বললো, মিত্তিরমশাই, আমি ক্যালকাটা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসার। আমার নাম সুশান্ত। আপনি হয় কাছে এসে আমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখুন অথবা লালবাজারে ফোন করে জেনে নিন আমি সত্যি বলছি কিনা।

রামসুন্দরবাবুর গলার আওয়াজ হঠাৎ শান্ত নরম হয়ে গেল, বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, সুশান্ত নামটা আমি শুনেছি রায়মশাইয়ের কাছে। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বায়, ওজন পঁচাত্তর কেজি, শ্যামলা গায়ের রঙ, চওড়া ছাতি। ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করুন।

পিস্তল মাথায় ঠেকালো।

বলতে বলতে রামসুন্দরবাবু নিচে নেমে এলেন। তালায় চাবি ঘুরিয়ে দড়াম করে দরজা খুলে দিলেন। সুশান্ত, রণজিৎ আর দোরজি ঢুকলেন ভেতরে।

রামসুন্দরবাবু বললেন, আজ প্রায় এক মাস প্রাণ হাতে করে আছি মশাই। বাপ-ঠাকুর্দা বিলিতি সিগারেট কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ করে বিষয়-সম্পত্তি করে গেছেন, বাড়িটাও বানিয়ে রেখে গেছেন বিলিতি কেতায়। আমি মশাই একলা মানুষ, বিয়ে-সাদির ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়িনি, নিজের খেয়াল-খুশি নিয়ে থাকি। বই-পত্তর পড়ি, কখনো-সখনো লিখি, আর গরম পড়লে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই। পাহাড়ী লোকগুলো যেমন চ্যাপ্টা, নাকবোঁচা, মঙ্গোলীয়ান ধাঁচের, ওসব দেশের মূর্তিগুলোও তেমনি অন্য ধরনের। সমতলের মূর্তির সঙ্গে কোনো মিল খুঁজে পাবেন না। প্রথম প্রথম একটা-দুটো সংগ্রহ করেছি। পরে কেমন নেশায় পেয়ে বসলো। ফুন্টসোলিং-এ এসে কোন কুক্ষণে মহাভাগের সঙ্গে পরিচয়। সে নিজেকে ভূটান রাজবংশের লোক বলে জাহির করলো। বললো সে একজন মহাতান্ত্রিক অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সে মূর্তিচোরদের খাশ সর্দার। আমার মশায় হিসেবের পয়সা, তা সত্ত্বেও প্রথম দিকে কয়েকখানা মূর্তি বেশ ভালদামে মহাভাগের এজেন্টের কাছ থেকে নিয়েছি। ঐ গুরুং আর বাহাদুর দুটোই মাঝে মাঝে মূর্তি নিয়ে আনাগোনা করতো। মাস দুই আগে, তখনো মহাভাগ আপনাদের খপ্পরে পড়েনি, ওর ঐ দুই চেলাকে আমার কাছে পাঠায় এক ডজন বিভিন্ন ধরনের মূর্তি নিয়ে। বারোটা মূর্তির মধ্যে দুটো তান্ত্রিক বুদ্ধমূর্তি আমার চোখে লেগে গেল। আমি ঐ দুটোকে আমার কাছে রেখে বাকিগুলো ফেরৎ দিয়ে দিলাম। কিন্তু দাম হিসেবে ওরা যা চাইলো সেটা অকল্পনীয়। বললো মহাভাগ ঐ দুটো মূর্তির জন্য দশ লাখ টাকা চেয়েছে। আমি দুজনকেই একরকম খেদিয়ে দিয়ে বললাম বিশ হাজারের এক পয়সা বেশি যেন ওরা আশা না করে। আসলে দুটো মূর্তিই দামী, বাকিগুলোর তেমন চাহিদা নেই। বিদেশী বাজারে এই দুটোর দাম অনেক বেশি তা মানছি। কিন্তু আমি ফালতু টাকা ঢালবো কেন!

ওরা দুজন চলে যাবার পরেই মহাভাগ তল্পিতল্পা সমেত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। গুরুং আর বাহাদুরের উদ্দেশ্য ছিল ওদের গুরু ধরা পড়ে গেছে, এবারে

গুরুর উপরেই বাটপাড়িটা সেরে নেয়। এদিকে গুরুও চুপচাপ বসে নেই, মনে হয় জেল থেকেই তার অন্য চেলাদের এই দুজনের উপর শোধ নেবার জন্য পাঠিয়ে দেয়। আমি শান্তিপ্রিয় লোক, কোনো সাতেপাঁচে থাকি না, নিজের কিছু শখ-আহ্লাদ নিয়ে দিন কাটাই। তা মশাই, এই বুদ্ধমূর্তি দুটো আমার কাছে গচ্ছিত থাকার পর কি অশান্তি, কি অশান্তি! হঠাৎ রাতবিরেতে হুমকি দেওয়া ফোন আসা শুরু হলো। মূর্তি ফেরৎ দে, নাহলে ধড় থেকে মুণ্ডু নামিয়ে দেবো। তারপরে যখন-তখন ঢিল-পাটকেল ছুঁড়াছুঁড়ি। ভাগ্যিস বাড়িটা বাউন্ডারী ওয়াল থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ঢিল-পাটকেল ওয়াল টপকে ফেললেও ঘরের জানলা পর্যন্ত পৌঁছয় না। এরপরে বাজারে যাই তো, পেছনে কেউ ফেউয়ের মতো সেঁটে থাকে, অজানা-অচেনা সব গুণ্ডার মতো লোকগুলো। এদিকে না বেরিয়েও উপায় নেই। পেটে তো অন্ন দিতে হবে। আরো আছে এই পুষ্যিগুলো, ওরা আবার নির্ভেজাল মাংসাশী, দুধভাত মুখে রোচে না। এদেরও ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা চাই। এসবের ব্যবস্থা করতেই দিন দশেক আগে বিকেলে বেরিয়েছি। বাজার খুব একটা দূর নয়, হেঁটেই যাই। আমাদের চন্দ্রহাটি জায়গাটা খুব শান্ত, কখনো কোনো ঝুটঝামেলা দেখিনি। সন্ধ্যে নাগাদ ফিরছি, বাড়ির কাছাকাছি কলাবাগানের ভেতর থেকে বিটকেল আওয়াজ আর তারপরই দুটো ভুঁইপটকার মতো কিছু ফাটলো আমার দু'পাশে। ভয়ে আমি চোঁচা দৌড় লাগালাম। কোনোমতে পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে গেট পর্যন্ত পৌঁছেছি, সাঁই সাঁই করে দুটো পিস্তলের গুলি দু'কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল! বাড়ির ভেতরে তাড়াতাড়ি ঢুকে গেট বন্ধ করে দিলাম। তাও কি রক্ষা আছে! দূর থেকে থেমে থেমে এমন বিদকুটে একটা হাসি ভেসে আসছিল, যা শুনলেই শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়।

রামসুন্দরবাবু থামলেন। রণজিৎ তন্ময় হয়ে শুনছিল, কথার ছেদ পড়তেই বললো, তারপর?

রামসুন্দরবাবু বললেন, তারপর আর কি! আটদিন আগে রেশম বাহাদুর একাই এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে, তার কাছেই জানলাম নরজান গুরুং-এর শোচনীয় সংবাদ। রেশম এ যাত্রায় দু'লাখে নেমেছিল। আমি আর ঝঞ্ঝাটে যাই! দুটো বুদ্ধমূর্তিই আমি রেশমকে ফেরৎ দিয়ে বললাম, তোর আপদ তুই নিয়ে যা!

সুশান্ত প্রায় আপসোস করে বলে উঠলো, সে কী মিত্তিরমশাই, আপনি মূর্তিদুটো ফেরৎ দিয়ে দিলেন!

দোরজি এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, এইবারে মুখ খুললেন, মিঃ মিটার, আপনি বললেন দশদিন আগে আপনার কানের পাশ দিয়ে দুটো পিস্তলের গুলি বেরিয়ে গেল। আপনি নিশ্চিত জানেন, সেগুলো পিস্তল? না রিভলবার থেকে ফায়ার করেছিল? ফায়ার্ড কার্টরিজগুলো আপনি দেখেছিলেন কি?

রামসুন্দরবাবু বললেন, আপনি তো পুলিশের লোক! মশাই, আমার বাড়িতে পিস্তল, রিভলবার, দোনলা বন্দুক কি নেই! আমার বাবার আবার পিস্তল আর রিভলবারের শখ ছিল। আমার হেফাজতে আপাতত আছে ·৩২ কোল্ট পিস্তল, ·৩৮ স্মিথ ওয়েসন রিভলবার আর ·১২ বেলজিয়ান ডাবল ব্যারেল গান। ছেলেবেলায় অনেক ফায়ার প্র্যাকটিস করেছি, আওয়াজ শুনেই বলে দেবো কোনটা পিস্তল আর কোনটা রিভলবার! আর আমার বাড়িতে যে এসব আগ্নেয়াস্ত্র আছে, আশেপাশের সব মস্তানরাই সে খবর রাখে। কাজেই বাড়িতে ঢুকে আমাকে ঘায়েল করবে সে বুকের পাটা কারো নেই। তাছাড়া আমার কুকুরগুলো সারাক্ষণ ছাড়া থাকে, ওদের ডিঙিয়ে কেউ ঢুকতে পারবে!

দোরজি হঠাৎ ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, আমারও চারটে ভূটানী কুকুর, ওদের খুব মিস করছি আমি! কুকুর তো নয় যেন টর্পেডো, কি ভালবাসতেই না জানে!

সুশান্ত বললো, দোরজি সাহেব, আপনি কি ভেবেছিলেন বুদ্ধমূর্তিগুলো পেয়ে যাবেন এখানে এলেই? আপনার হিসেব মতো আরো দশটা তান্ত্রিক সাধুর মূর্তিও হাপিস হয়েছে, তাদের জন্য কি ব্যবস্থা?

দোরজি বললেন, ব্রাদার সুশান্ত, দশটা তান্ত্রিক সাধুর মূর্তি ভূটানের বাজারে ওজনদরে বিক্রি হয়, ওদের জন্য আমি মোটেও ভাবিত নই। এই দুটো বুদ্ধমূর্তির মূল্যায়ন করা খুব মুশকিল। যেমন তাদের অসাধারণ শিল্পশৈলী, তেমনি ঘটেছে ধাতুর মণিকাঞ্চন যোগ। এছাড়া রাজ-পরিবারে বংশপরম্পরায় রক্ষিত ভগবান বুদ্ধের মূর্তি গুম হয়ে যাওয়া অতি দুর্লক্ষণ।

সুশান্ত বললো, অতঃকিম? কোন পথে এগোবেন এবারে?

দোরজি চিন্তিত মুখ নিয়ে বললেন, রাস্তা একটাই খোলা। মহাভাগ এখন দিল্লীর তিহার জেলে ওর অন্য বিদেশী চোর ভাইদের সঙ্গে অন্তরীণ। অনেকগুলো মূর্তিচুরি কেসের তদন্ত সি. বি. আই করছে দিল্লীর দফতর থেকে। মহাভাগকে আরেকপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়। কারণ এটা নিশ্চিত, জেলে গেলেও বাইরের দোস্তদের সঙ্গে ওর নিয়মিত যোগাযোগ চলছেই এবং সুচারুভাবে নিজের চক্রও চালিয়ে যাচ্ছে।

রামসুন্দরবাবু বললেন, এহেন সমস্যায় মুশকিল আসান হলেন আপনাদের রায়মশাই। কিন্তু তিনি তো পুলিশ ছেড়ে একরকম সন্ন্যাস নিয়ে বসেছেন। সুশান্তবাবুর নামটা ওনার কাছেই শুনেছি।

সুশান্ত বললো, মিত্তিরমশাই, আমরা এবারে যাবো। চিন্তা করছি, উপায় একটা হবেই।

গাড়িতে উঠতে যাবে সুশান্ত, রণজিৎ আর দোরজি, একসঙ্গে তিনজনের মাথায়ই যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। মিত্তিরমশাই সশব্দে গেট বন্ধ করে দিয়েছেন ততক্ষণে। দোরজির আর্দালী গাড়ির দরজা খুলতে না খুলতেই কুপোকাৎ। ড্রাইভারের চোখের সামনে পাইপগান ঠেকিয়ে একটা সিড়িঙ্গে লোক, সে বেচারা নড়তে-চড়তে পারছে না, নড়লেই থ্রি-নট-থ্রি বুলেট কপাল ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে! রণজিতের শারীরিক ক্ষিপ্রতা ততটা নয়, দু'ফুট লম্বা বেতের ছড়ি কাঁধে নামতেই ভূমিশয্যা নিয়েছে। দোরজি পুলিশের হোমরাচোমড়া অফিসার, এককালে জুজুৎসু করেছেন। আচমকা

আঘাত ঘাড়ের কাছে নামতে নামতেই একটু সরে এসেছেন। আঘাত তেমন জমেনি, নিজেকে সামলে নিয়ে গাঢ় অন্ধকারে প্রতিপক্ষর মুকাবিলার জন্য তৈরি হচ্ছেন। সুশান্ত অন্য ধাতুতে গড়া। আততায়ীয় আঘাত শুধু ফুলের মতো তার পিঠ ছুঁয়ে গেছে এবং পরমুহূর্তেই তার বজ্রমুষ্টি আততায়ীর চোয়ালে আছড়ে পড়েছে। সে আঘাতে কয়েকখানা দাঁত নিশ্চিত খুলে পড়েছে এবং লোকটিও কাটা গাছের মতো ভূশয্যায় নিশ্চল। ততক্ষণে দোরজির লুগার পিস্তল সিড়িঙ্গে লোকটার মাথায় ঠেকানো হয়ে গেছে, আর্দালী ভূমিতল থেকে উঠে পড়ে রণক্ষেত্রে ভীমসেনের মতো একটি হুঙ্কার ছেড়ে কোমর থেকে ·৪৫ রিভলবার বার করেই দুদ্দাড় দু'রাউন্ড চালিয়ে দিয়েছে অন্ধকার কলাবাগানের দিকে তাগ করে।

সুশান্ত চেঁচিয়ে বললো, ব্যস, ফায়ার মৎ করো। পঁয়তাল্লিশ বোরকা গোলিসে হাতি মর যাতা, আদমীকা বাৎ কেয়া!

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার কলাবাগানের ভেতরে দুপদাপ আওয়াজের সঙ্গে গোটা দুই গুলির আওয়াজও ভেসে এলো।

রণজিৎ এতক্ষণে সামলে উঠে সিড়িঙ্গে লোকটার হাত থেকে পাইপগান ছিনিয়ে নিয়েই এক চপেটাঘাত। আওয়াজটা ছোটখাটো পটকা ফাটার চেয়ে কম হলো না।

সুশান্ত ইতিমধ্যে আততায়ী লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে গাড়ির সিটের নিচে শুইয়ে দিয়েছে। সিড়িঙ্গেকে আরো কয়েকটি চপেটাঘাত করে রণজিৎ গাড়ির ভেতর চালান করে দিল তারপর সবাই উঠে পড়লো গাড়িতে। সুশান্ত সামনে বসতে বসতে বললো, কম করেও পাঁচ-ছটা বদমাশ ছিল, দুটোকে ধরে ফেলেছি, এটাই লাভ। আপাতত এ দুটোকে চন্দ্রহাটি পুলিশ আউটপোস্টে গচ্ছিত রেখে একটু অন্য কাজ সেরে আসা যাক।

অতঃপর সুশান্তর নির্দেশে গাড়ি দু' ফার্লং চলার পর চন্দ্রহাটি আউটপোস্টের দেখা মিললো। আউটপোস্টের ইনচার্জ সাব-ইন্সপেক্টর চৌধুরী হাজির থাকাতে সুবিধেই হলো। সুশান্ত সংক্ষেপে নিজের এবং দোরজির পরিচয় দিতেই কাজ হলো। চৌধুরী বললেন, স্যার, এ দুটোকে আমরা চিনি। রোগাটা অন্ধ্রের লোক, নাম রাও, অন্যটা রাজপুত, নাম বৈঞ্জু। দুটোই নামকরা গুণ্ডা। কয়লা চুরি, ওয়াগন ভাঙা, খুনখারাপি কোনো বিদ্যেই বাকি নেই। পয়সা পেলে যেকোনো কুকর্মে রাজী। এদের বিরুদ্ধে অনেক কেস ঝুলছে। ধরা পড়াতে ভালোই হলো।

সুশান্ত বললো, আপনার কাছে এরা আপাতত থাক, লকাপে পুরে রাখুন। এদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। সি. বি. আই., সি. আই. ডি., ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট সকলে একসঙ্গে কাজ করছে এই কেসটায়। আমরা একটু বাদে এসে আবার এদের চার্জ নেবো।

গাড়ি আবার চললো। এক ফার্লং যেতে না যেতেই একটা গেট পেরিয়েই অন্য এক জগৎ। আম, জাম, কাঁঠাল, নানান ফুলের, নানা রঙের বাগানওয়ালা সব বাংলো আলোয় আলোয় ঝলমল। সুশান্তদের গাড়ি একটি দোতলা বাংলোর সামনে দাঁড়াতেই এক দীর্ঘকায় ঋজু শরীর প্রৌঢ় বেরিয়ে এলেন গেটের কাছে। মনে হলো খাপখোলা তলোয়ার! কাটা কাটা বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। সুশান্তকে দেখেই বললেন, আরে মাস্টার, পৌঁছে গেছো তাহলে? বুদ্ধমূর্তির সন্ধান মিললো?

দোরজি পুলিশের বড় অফিসার, নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে বিলক্ষণ সচেতন। সেই দোরজির মতো লোকই একলাফে গাড়ি থেকে নেমে সুশান্তর প্রণাম করা শেষ হতে না হতেই আগন্তুকের পা ছুঁয়ে বলে উঠলেন, আমার কী সৌভাগ্য! রায়সাহেব, আপনার দেখা এখানে পাবো আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না!

রায়সাহেব একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, মিঃ দোরজি, আপনি আমাকে প্রণাম করতে গেলেন কেন?

দোরজি বললেন, আপনাকে প্রণাম করবো না এটা হতে পারে স্যার! পুলিশে ঢোকার পর আপনার কাছেই আমার প্রথম দীক্ষা ডিটেকটিভের কাজে। ভূটান পুলিশ আমাকে সেদিন ট্রেনিং-এর জন্য লালবাজারে পাঠিয়েছিল বলেই এই প্রফেশনে কিছু করে দেখাতে পারছি!

সুশান্ত বললো, স্যার, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টটাই একদিন আপনি তৈরি করেছিলেন। আপনার আশীর্বাদ আর পরিচালনায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বা এফ. বি. আই-এর সমতুল্য ছিলাম আমরা। আর আজ আপনিই স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিলেন পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের চাকরি থেকে!

রায়সাহেব বললেন, সুশান্ত, পুলিশের কাজ দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। সারা জীবন সে কাজটাই বুঝেছি, চাকরির শেষ পর্যায়ে এসে চাকরিতে রাজনীতি মেলাতে পারলাম না। এজন্যেই সসম্মানে সরে এসেছি।

সুশান্ত বললো, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আপনার উপদেশ আর অনুপ্রেরণা আজ আর পাই না, কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগে। আপনি কোলকাতায় ফিরে চলুন স্যার। নাহলে আমাকেও আপনার সাথী করে নিন।

রায়সাহেব বললেন, মাস্টার, তোমার সামনে বিরাট সম্ভাবনা, তুমি যা করছো করে যাও। আমি খানিকটা আত্ম-অনুসন্ধান করছি। সময় বুঝলে আবার কোলকাতায় ফিরে যাবো। কিন্তু তোমাদের কাজটা তো একটু সুরাহা করে দেওয়া উচিত। তোমরা দুটো গুণ্ডাকে ধরে চন্দ্রহাটি আউটপোস্টে রেখে এসেছো সে খবর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি পেয়ে গেছি। আসলে এই পুলিশ ফাঁড়িটা তৈরি হয়েছে আমাদের সংস্থার পয়সায় এবং জমিটাও আমাদের। দশ মিনিটের মধ্যে আমার কাছে দুটো ফোন এসেছে, একটা রামসুন্দর মিত্রের, আরেকটা চন্দ্রহাটি ফাঁড়ির ইনচার্জের কাছ থেকে। তোমাদের মিশনটা কি মোটামুটি বুঝে নিয়েছি। যে দুটো গুণ্ডাকে তোমরা ধরেছো, এরা লালা বলে একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধীর গ্যাঙের লোক। এদের পয়সা দিয়ে এ কাজে লাগিয়েছে বিদেশী মূর্তিপাচার চক্র। তোমাদের মহাভাগ একজন বড়সড় এশিয়ান এজেন্ট, এদের আসল কর্তা লন্ডনের আশেপাশে থাকে, ওকিং শহরে

এরই একটা ঘাঁটি ধরা পড়েছিল। লালা আসলে রাজস্থানের লোক, কিন্তু ওর কাজের জায়গা মূলত পশ্চিমবঙ্গ আর বিহারে। আমার কাছে খবর আছে আজকাল ও আলোয়ার শহরে অন্য নাম নিয়ে ঘাপটি মেরে আছে। আলোয়ার রাজস্থানের একটা ছোট্ট শহর, দিল্লী থেকে একশো সত্তর কিলোমিটার। চমৎকার পাহাড়ী জায়গা, আরাবলী পাহাড়ের গায়ে গা ঠেকিয়ে আছে। ওখানকার প্যালেস হোটেলে ক'দিন থাকতে হয়েছিল কয়েক বছর আগে। জয়পুরের এস. পি. ভ্রমর সিং সে সময় আমার সঙ্গে ছিলেন, খুব হৃদ্যতাও হয়েছিল। এখন তিনিই রাজস্থানের আই. জি। সুশান্ত, একটা কাজ করো। ফেরার পথে মগরা থানায় একটা ইন্টিমেশন যখন রেকর্ড করাবে, ভ্রমর সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো তখন। অত্যন্ত কাজের লোক, তার কানে ঢুকিয়ে দিতে পারলে লালাকে তিনি তুড়ি মেরে ধরে নেবেন। আর লালা ধরা পড়লেই গুরুং এবং বাহাদুরের খুনের মীমাংসা হয়ে যাবে।

পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, রাত দশটা বেজে গেল। খাওয়াটা আমাদের গেস্ট হাউসে এখনই সেরে নেবে, না মূর্তিচুরির আরেকটু তদন্ত করে নেবে?

কেউ কিছু বলার আগেই রণজিৎ বললো, না না স্যার, আগে কাজ, পরে আহার।

গাড়ি আবার স্টার্ট নিল। এবারে রণজিৎ দোরজির আর্দালীর পাশে সামনের সীটে স্থান করে নিল। সুশান্ত, দোরজি আর রায়সাহেব বসলেন পেছনের সীটে। রায়সাহেবের নির্দেশে গাড়ি আবার যেখানে এসে বাঁক নিল তার সামনে সুনসান কলাবাগানের পাশেই বিশাল জায়গা নিয়ে রামসুন্দর মিত্রের সেই বাড়ি। গাড়ি থামতেই রায়সাহেব তাঁর সহজাত ক্ষিপ্রতায় গাড়ি থেকে নেমে কলিংবেল টিপলেন। আবার শুরু হলো আটটা কুকুরের কর্ণত্রাসী কোরাস এবং একটু পরেই দোতলার বারান্দা থেকে রামসুন্দরবাবুর চিলের মতো চিৎকার, কে, কে ওখানে?

রায়সাহেব চেঁচিয়ে কথা বলেন না, কিন্তু তাঁর উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যই এমন যে তাঁর প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার শোনা যায়। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, রামসুন্দর, চেঁচামেচি করবে না, আমি এসেছি, দরজাটা খুলে দাও।

রামসুন্দরবাবু প্রায় উড়ে নেমে এলেন, বললেন, সে কী, সে কী, কি সৌভাগ্য, রায়মশাই আপনি স্বয়ং!

এদিকে আটটা কুকুরের হুলুস্থুল। রামসুন্দরবাবু শশব্যস্তে আটটাকেই তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ির কেনেলে ঢুকিয়ে দিলেন।

রায়সাহেব কোনো ভূমিকা না করেই জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, রামসুন্দর, বুদ্ধমূর্তি দুটো বার করে দাও।

রামসুন্দরবাবু বললেন, রায়মশাই, এসব আপনি কী বলছেন, আমার কাছে মূর্তি কোথায়? কবে আপদ বিদেয় করেছি!

রায়সাহেবের দু'চোখ দপ করে জ্বলে উঠলো, যেন আগুন, হিস হিস করে বললেন, রামসুন্দর, এ বয়সে জেলের ঘানি টানবে? সুশান্তর হাতের কাজ খুব চমৎকার, তোমার শুকনো চামড়া শরীর থেকে খুলে বার করে নেবে! দোরজিরও অনেক ভুটানী দাওয়াই আছে, পরখ করবে নাকি? দোরজি আর সুশান্ত দুজনেই ছেলেমানুষ। ওদের ধাপ্পা দিলেও আমায় মিথ্যা বলছো, তোমার ধৃষ্টতা তো কম নয়! মূর্তিদুটো তোমার কাছেই আছে, তুমি কস্মিনকালেও বাহাদুরকে ফিরিয়ে দাওনি। বাহাদুর খুন হবার পর তোমার উপর মিছিমিছি হামলা হবে কেন? তাছাড়া একটু আগে সুশান্ত আর দোরজির উপর আক্রমণ করা হয়েছিল এটা ভেবেই যে তুমি হয়তো মূর্তিদুটো ওদের হাতে সঁপে দিয়েছো। যদি বাঁচার ইচ্ছে রাখো, নিজের শখ আর লোভ সামলে মূর্তিদুটো এদের হাতে দিয়ে দাও, তোমার কোনো লোকশান হবে না।

এতক্ষণ রামসুন্দরবাবুর দোতলার ড্রয়িংরুমে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। রামসুন্দরবাবু এক মিনিট সময় নিলেন। ড্রয়িংরুমের দেয়ালে একটি চামুণ্ডামূর্তির ছবি। রামসুন্দরবাবু সেটি সরাতেই পেছনে দেখা গেল একটি গোল বোতাম। বোতাম টিপতেই বেরিয়ে পড়ল ১২" × ১২" পরিসরের একটি গুপ্ত চেম্বার। রামসুন্দরবাবু চেম্বারে হাত ঢুকিয়ে যা বার করে নিয়ে এলেন তা দেখে কারো চোখের আর পলক পড়ে না! দুটি একই ধরনের বুদ্ধমূর্তি। চোখ, কর্ণবলয়, শরীর সবই সাধারণত দেখা বুদ্ধমূর্তির থেকে আলাদা। গঠনশৈলী এবং ধাতুর মিশ্রণ এমন যে ঘরের আলো পড়ে মূর্তিদুটো থেকে একরকম দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

দোরজি দু'হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। রায়সাহেব মূর্তিদুটো রামসুন্দরবাবুর হাত থেকে নিয়ে দোরজির হাতে দিয়ে বললেন, মাস্টার, এ অমূল্যধন আপনিই ফিরিয়ে নিয়ে যান।

দোরজি বললেন, স্যার, আজ দুনিয়ায় সব সেরা সুখী যদি কেউ থাকে সে হলাম আমি। আপনি যাদের ভালবাসেন তাদের মাস্টার বলে সম্বোধন করেন। আপনার প্রিয়পাত্রদের মধ্যে আমিও একজন হলাম, এর বেশি খুশির আর কী থাকতে পারে!

রায়সাহেব স্মিত হাসলেন।

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

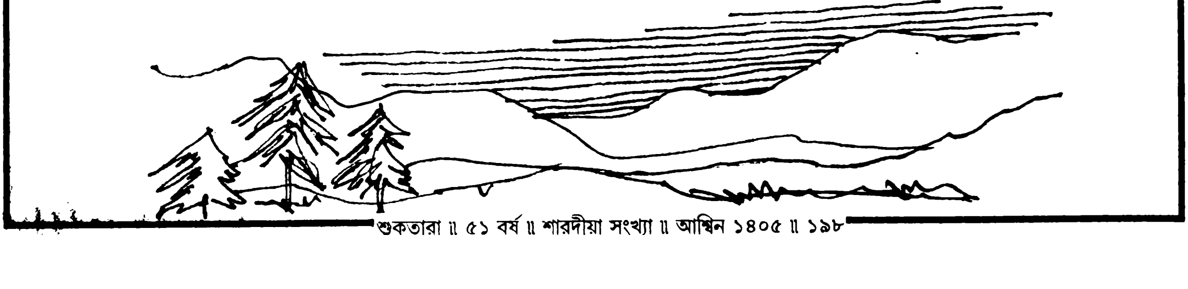

পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের গল্প

দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পেট্রোলিয়াম যে খুব দরকারী সে তো একটি বাচ্চা ছেলেও জানে। এর উপযোগিতা এতই বেশি যে অনেকে একে আদর করে ডাকেন 'তরল সোনা'। সত্যিই, তরল পেট্রোলিয়াম প্রায় সোনার মতোই দামী।

কেন দামী সেকথাটা একটু খুলেই বলি। এই যে রাস্তা দিয়ে হু হু করে ছুটে যাচ্ছে ট্রাক, বাস কিংবা মোটর, তা চালাতে লাগে পেট্রোল বা ডিজেল। এই পেট্রোল আর ডিজেল আমরা পাই পেট্রোলিয়াম থেকে। শুধু কি গাড়ি, এ যুগের পক্ষিরাজ ঘোড়া এরোপ্লেনের তরল জ্বালানিও পাওয়া যায় পেট্রোলিয়ামের পাতন (distillation) থেকে। পাড়াগাঁয়ে লণ্ঠন জ্বালাবার কেরোসিন অথবা পাকা রাস্তা বানাবার পিচ—এও আমাদের যোগান দেয় পেট্রোলিয়াম। কলকারখানার হরেক যন্ত্রপাতি চালাতেও লাগে সেই ঝাঁঝালো গন্ধের পেট্রোল।

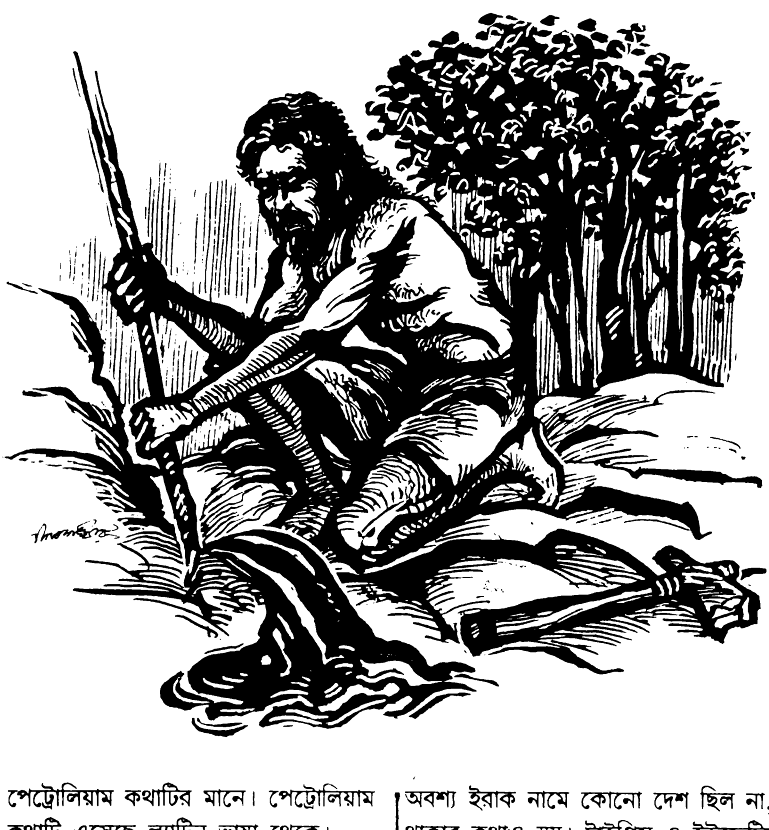

শুধু কি তাই? আমাদের জামা-প্যান্ট কিংবা শাড়ি তৈরি হয় যে টেরিলিন থেকে অথবা আধুনিক কায়দায় চেয়ার-টেবিল সাজাতে যে ডেকোলাম বা ফরমাইকা ব্যবহার করি, তা যোগায় আমাদের পরম বন্ধু পেট্রোলিয়াম। একথা শুনলে হয়তো অনেকেরই অবাক লাগবে, নানা দরকারী ওষুধপত্র, বিস্ফোরক পদার্থ, কৃত্রিম রবার, অ্যালকোহল, অ্যামোনিয়ার মতো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা মেয়েদের ঠোঁটে লাগাবার লিপস্টিক-এর জন্য পেট্রোলিয়ামের কাছে হাত পাততে হয় আমাদের।

পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের কথা বলতে বসে আমরা পেট্রোলিয়ামের গুণকীর্তন নিয়েই বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, তাই না! তা একটু গুণকীর্তন তো করতেই হবে, নাহলে আবিষ্কারের মাহাত্ম্য বোঝা যাবে কী করে? তাছাড়া জানা দরকার, পেট্রোলিয়াম কথাটির মানে। পেট্রোলিয়াম কথাটি এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে। 'পেট্রা' মানে পাথর আর 'আলিয়াম' বলতে বোঝায় তেল। সব মিলিয়ে মানে দাঁড়াল পাথরের বুকে জমে থাকা তেল। পাথরের বুকেই তো প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল এই খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম।

প্রাচীনকালে পেট্রোলিয়াম-এর নাম ছিল বিটুমেন। প্রাচীন ও নবীন প্রস্তর যুগে ঘর বানানোর কাজে বিটুমেন ব্যবহার করতে শিখেছিল মানুষ। পিরামিডের ভেতরে মমি সংরক্ষণ করার কাজেও প্রয়োজন হতো খনিজ তেলের।

নানারকম পুঁথি পড়ে জানা গেছে, পেট্রোলিয়াম প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রায় ৬০০০ বছর আগে, ইরাকে। তখন অবশ্য ইরাক নামে কোনো দেশ ছিল না, থাকার কথাও নয়। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝখানে এখন যেখানে ইরাক, তখন সেখানে ছিল কিশ, উর, ব্যাবিলন, নিনেভে নামের কয়েকটি প্রাচীন শহর। শহর হলেও সেগুলি ছিল এক একটি রাজ্য। সেসব জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করে যেসব প্রাচীন ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, স্নানের জায়গা, নৌকো ইত্যাদি পাওয়া গেছে, তা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা পেট্রোলিয়াম-জাত অ্যাসফাল্ট ব্যবহারের প্রমাণ পেয়েছেন। নৌকো ও চৌবাচ্চার জল চুঁইয়ে পড়া বন্ধ করতে কিংবা বাড়িঘর তৈরির সিমেন্ট হিসেবে, আবার কোথাও বা পোকামাকড় তাড়াবার রঙ হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে অ্যাসফাল্ট, যা পাওয়া যায় পেট্রোলিয়াম

থেকেই। আসলে সেইসব প্রাচীন যুগের মানুষ পেট্রোলিয়ামের আধুনিক ব্যবহারের কথা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি, শুধু বুঝেছিলেন পেট্রোলিয়াম-জাত পিচ (আলকাতরা) বা অ্যাসফ্যাল্ট ব্যবহারের কথা।

ইরাকের রাজধানী বাগদাদ থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার দূরে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রচীন শহর। নাম হিট। সেই শহরের কাছে এখনো রয়েছে বেশ বড়সড় একটা আলকাতরার পুকুর। একে আদর করে অনেকে বলেন 'আলকাতরার ফোয়ারা'। বিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা, এই অঞ্চলেই বোধহয় গড়ে উঠেছিল 'পৃথিবীর প্রথম পেট্রোলিয়াম-ক্ষেত্র' (Oilfield)।

ইরাক ছাড়াও প্রাচীনকালে অন্য যেসব জায়গায় পেট্রোলিয়ামের খোঁজ মিলেছিল, তার মধ্যে আছে ভারত-পাকিস্তানের সিন্ধু নদের অববাহিকা এবং চীন ও প্যালেস্টাইন এলাকা। সিন্ধু নদের অববাহিকায় যে সিন্ধু-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন, আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে, ভারত-পাকিস্তানের এই অঞ্চলে জানা ছিল পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার।

চীনের হোয়াং হো (পীত নদী, The Yellow River) নদীর অববাহিকায় একটি প্রাচীন উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পেট্রোলিয়াম-পণ্ডিতদের ধারণা, আজ থেকে প্রায় দু' হাজার বছর আগে এই অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের জন্য নাকি কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল। তবে অনেকের ধারণা পেট্রোলিয়াম নয়, কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল নুন উদ্ধার করতে। তখনকার দিনে নুন ছিল মহার্ঘ বস্তু। তবে একথাও ঠিক, সেই প্রাচীন যুগে পেট্রোলিয়াম পুড়িয়ে পাওয়া যেত আলো ও তাপ। শোনা যায়, চীনারা বাঁশের তৈরি পাইপে ধরে রাখত তেলকূপ থেকে পাওয়া প্রাকৃতিক গ্যাস।

যীশু খ্রিস্টের জন্মেরও প্রায় হাজার বছর আগে মরু সাগরের আশেপাশে প্যালেস্টাইন অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় পাথরের ফাটল চুঁইয়ে বেরিয়ে আসত পেট্রোলিয়াম। খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের বেশ কয়েকটি জায়গায় পেট্রোলিয়ামের উল্লেখ আছে। যেমন, ব্যাবেল টাওয়ার নির্মাণ করতে সিমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বিটুমেন। ফুটোফাটা বন্ধ করতে নোয়ার নৌকোর ওপরে-নিচে দেওয়া হয়েছিল আলকাতরার প্রলেপ। ধর্মপ্রচারের জন্য মোজেস যে বালতিটি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন, সেটির গায়েও ছিল আলকাতরার আস্তরণ। বাইবেলে এমন একটি পাথরের কথা বলা হয়েছে, যার ভেতর থেকে নাকি নদীস্রোতের মতো বেরিয়ে আসত নেফথার (অর্থাৎ পেট্রোলিয়ামের) স্রোত। উপাসনার জন্য আগুন জ্বালতে ব্যবহার করা হতো এই নেফথা। সব মিলিয়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না, বাইবেলের যুগেও পেট্রোলিয়াম ছিল বেশ পরিচিত একটি পদার্থ।

গ্রীস, রোম ও পারস্য দেশের প্রচীন ইতিহাস ও কিংবদন্তীতে রয়েছে পেট্রোলিয়ামের উল্লেখ। এই প্রসঙ্গেই শোনা যাক গ্রীসের একটি পৌরাণিক কাহিনীর কথা। সেই কাহিনীতে আছে কিমেরা নামে এক ভয়ংকর দৈত্যের শিহরন-জাগানো সব কাণ্ড-কারখানা। দৈত্যের শরীরটা ছিল ছাগলের মতো, মুখটা সিংহের মতো আর লেজটা সাপের মতো। দৈত্যটার মুখ থেকে সবসময় নাকি আগুন বেরোতো। পেট্রোলিয়াম-পণ্ডিতদের ধারণা, দৈত্যটৈত্য সব বাজে কথা। এটি আসলে একটি পাহাড়, যার মুখ থেকে সবসময় বেরিয়ে আসছে ভূগর্ভের প্রাকৃতিক গ্যাস (natural gas)। বাতাসের ঘর্ষণে এই গ্যাসে আগুন লেগে গিয়েছিল। এ

নোয়ার নৌকোয় পড়েছিল আলকাতরার প্রলেপ।

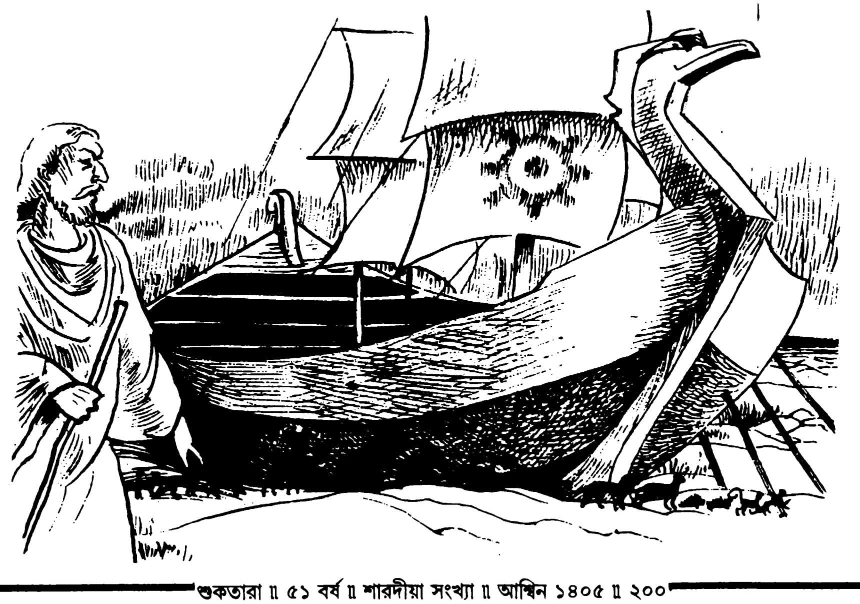

কিমেরা নামে সেই দৈত্য।

ধরনের প্রাকৃতিক গ্যাসের বেশ কিছু ফোয়ারা ছিল প্রাচীন এশিয়া মাইনর অঞ্চলে। গল্প শোনা যায়, গ্রীক সৈন্যরা নাকি একবার সমুদ্রে আগুনের গোলা ফেলে শত্রুদের সমস্ত জাহাজ ধ্বংস করে দিয়েছিল। ঐ আগুনের গোলার উপাদান ছিল গন্ধক, পটাশিয়াম নাইট্রেট (সল্ট পিটার), চুন ও অ্যাসফাল্ট। পেট্রোলিয়ামের আগুন বলে সমুদ্রের জলে পড়েও তা নেভেনি।

প্রথম শতাব্দীতে লেখা বড় প্লিনি-র (Pliny The Elder) বই পড়ে জানা যায়, রোমে জুপিটারের মন্দিরের বাতি জ্বলত পেট্রোলিয়ামের তেলে। এক রোমান সেনাপতি তো একবার পেট্রোলিয়াম-মাখা জ্বলন্ত একপাল শুয়োর শত্রুসৈন্যদের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে তাদের পালাতে বাধ্য করেছিলেন। শোনা যায়, পারস্যের এক সম্রাট প্রায় একইভাবে পরাজিত করেছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে। পারস্যের সম্রাট অবশ্য শুয়োরের বদলে ব্যবহার করেছিলেন চাকা-লাগানো জ্বলন্ত ফাঁপা লোহার ঘোড়া। এই ঘোড়াগুলির ভেতরে পুরে দেওয়া হয়েছিল পেট্রোলিয়াম।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহারও বাড়ল। আর চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃতিতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল পেট্রোলিয়ামের খোঁজে। তাই ভূগর্ভ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যেসব পেট্রোলিয়াম মাটির ওপরে উঠে এসেছিল, তা সবই দখল করল মানুষ। যেখানে মাটির নিচে মজুত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ যথেষ্ট, সেখানেই গড়ে উঠল পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক শিল্প। জেনে রাখার মতো খবর, এভাবেই প্রাচীনকালে কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে বাকু (Baku) অঞ্চলেই বোধহয় পৃথিবীর অন্যতম পেট্রোলিয়াম-ক্ষেত্র বা তৈলক্ষেত্র (oilfield) গড়ে উঠেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সাল থেকেই বাকু অঞ্চলের প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামের কথা জানা ছিল সকলের। রাতের বেলা বহুদূর থেকে সেসব জায়গায় দেখা যেত অগ্নিশিখা। কেউ কেউ মনে করেন, পেট্রোলিয়ামের এই আগুনকেই মানুষ পুজো করতে শুরু করে। জন্ম হয় অগ্নি-উপাসক ধর্মের।

আঠেরো ও উনিশ শতকে উত্তর আমেরিকায় লবণ বা নুন আহরণের জন্য গভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছিল বহু জায়গায়। এই কুয়োগুলিতে নুনের সঙ্গে প্রায়ই মিশে থাকত পেট্রোলিয়াম। লবণখনির মালিকরা মনে করতেন, পেট্রোলিয়ামই যত নষ্টের গোড়া, এরই ফলে নুন নষ্ট হচ্ছে, ঠিকঠাক দাম পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ক্রমে এ ধারণা বদলে যায়। সবাই বুঝতে পারেন পেট্রোলিয়ামের গুরুত্ব। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়ায় ড্রিলিং করে প্রথম তেল তোলা হয় ১৮৫৯ সালের আগস্ট মাসে।

এবার বলি ভারতে প্রথম পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের কাহিনী। ১৮৮৯ সাল। তখন অসমে লিডো থেকে ডিবরুগড় পর্যন্ত রেললাইন পাতবার কাজ চলছে। কাজ করবার সময় একদিন অসম রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোম্পানির ইনজিনিয়াররা দেখতে পেলেন, ওঁদের এক হাতির পায়ের তলায় কালো চটচটে কী একটা জিনিস। নেহাতই কৌতূহলের বশে হাতির পায়ের দাগ ধরে এক ডোবায় পৌঁছলেন ওঁরা। সেই ডোবাতেই ছিল পেট্রোলিয়াম। পাথরের ফাটল চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমে উঠেছিল। জায়গাটার নাম ডিগবয়। ১৮৯৯ সালে এখানেই প্রতিষ্ঠিত হলো অসম অয়েল কোম্পানি।

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

মধ্যপ্রদেশের পাহাড়-অরণ্য ঘেরা মাণ্ডিখেরা। পাশেই বয়ে চলেছে দেনওয়া নদী। নদীর লাগোয়া নালা। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম। সেসব গ্রামের অসহায় গ্রামবাসী ও তাদের গৃহপালিত গবাদি পশুর ওপর যে কোনো সময় হামলা করে গভীর অরণ্যের হিংস্র পশুরা। এমনই এক গ্রামের কাছে নিজের খামার বাড়িতে পরিজনদের নিয়ে বাস করেন মিঃ হাগ অ্যালেন।

কাছের বনে সম্বর হরিণের আস্তানা। সম্বর হরিণেরা খুব ভীরু। ধোবি তালাওয়ের কাছে লোকজনকে শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসে।

গ্রামের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে বাজে পোড়া একটা পিপুল গাছ। বাতাস বইলে নানারকম অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে গা ছমছম করে।

লোকালয়ের উত্তর দিকে বনের পশুদের পায়ে-চলা পথ। পাঁচটি পথ এক জায়গায় মিশেছে। রাত্রে এখানে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বসলে বনের পশুদের দেখা যায়। গ্রামের লোকেরা বলে, রাত্রে রাইফেল হাতে এক ছায়ামূর্তি নাকি ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

দক্ষিণে নালা, নদীর দিকে ছুটে গেছে। এখানে সব সময় একপাল বানর লাফালাফি করে। 'খোয়া' নদীর ধারে

বেপরোয়া চিতা

পরেশ দত্ত

গাছের উঁচু ডাল থেকে নদীর দুই তীরের অনেকটা অংশ দেখা যায়। তাই বানরেরা আগে থেকে জানতে পারে কোনো বিপদ এগিয়ে আসছে কিনা। বাঘ বা চিতাকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখলেই একদল বানর হুঁশিয়ার করে দেয় অন্য দলকে। মুহূর্তমধ্যে ছড়িয়ে যায় খবর। তিন মাইলেরও বেশি এলাকার মধ্যে যত পশু আছে সবাই সাবধান হয়ে যায়। জানতে পারে বিপদ এগিয়ে আসছে।

একটা বড় চিতা অনেকদিন থেকে এই অঞ্চলে উপদ্রব করছিল। গ্রামের লোকেরা তার নাম দিয়েছে 'বদমাশ'। দারুণ দুঃসাহসী চিতাটা আর ভীষণ শয়তানী বুদ্ধি ধরে। প্রথম দিকে অবশ্য সে ছোটখাটো উপদ্রব করত। তারপর গরুর পালের ওপর চড়াও হতে শুরু করল। একদিন একটা ভালো জাতের গরুকে মেরে সে টেনে নিয়ে গেল, খাটাল থেকে দুশো গজ দূরে জঙ্গলের মধ্যে। খবর পেয়ে মিঃ অ্যালেন ছুটলেন বাড়ি থেকে বন্দুক আনতে। কিন্তু তার আগেই চিতাটা গরুটাকে খেতে আরম্ভ করেছে। মড়ির কাছেই মাচান বাঁধার মতো একটা বড় গাছ পাওয়া গেল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই গাছের ওপরে মাচান বাঁধা হলো। মাচানের ওপর মিঃ অ্যালেনের বসার জন্য একটা চেয়ার তোলা হলো।

মিঃ অ্যালেন মাচানে বসে রাইফেল নিয়ে মড়ির কাছে চিতা কখন ফেরে সেই অপেক্ষায়। চিতা কয়েকবার মড়ির খুব কাছে এলো। তবে দেখা দিল না। একবার একটা ময়ূর চিতাটাকে দেখে ভয় পেয়ে মড়ির ওপর দিয়ে উড়ে গেল। বাঁদরগুলোও কয়েকবার শোরগোল করে জানিয়ে দিল, চিতার উপস্থিতি। কিন্তু মিঃ অ্যালেনের নিশানার মধ্যে সে ধরা দিল না। মিঃ অ্যালেনের দুপুরের খাওয়ার সময় চলে গেল, বেলা পড়ে এলো, তখনো চিতার দেখা নেই। সূর্য পশ্চিমদিকে গাছের মাথায় ঢলে পড়ল। গোধূলির সোনালী আলোয় সারা বন রাঙা হয়ে উঠল। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। দিনের আলো ফুরিয়ে যেতেই মিঃ অ্যালেন লক্ষ্য করলেন, সারাদিন রাইফেলের চাপে টর্চের আলো জ্বলে জ্বলে ব্যাটারি প্রায় শেষ হয়ে গেছে। অথচ অন্ধকারে শিকার করতে গেলে টর্চের আলো বিশেষ দরকার।

রাত আটটার পর গভীর অন্ধকারে চিতাটা আবার কয়েকবার মড়ির কাছে এলো কিন্তু খাবার কোনো লক্ষণ দেখাল না। মিঃ অ্যালেন স্থির করলেন রাত নটার মধ্যে চিতাটা না এলে তিনি মাচান থেকে নেমে বাড়ি ফিরে যাবেন।

জমাট অন্ধকারে মড়িটা পড়ে রয়েছে। অথচ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নক্ষত্রের আলো পর্যন্ত সেখানে পৌঁছায়নি। মিঃ অ্যালেন চিতাটাকে না দেখতে পেলেও গাছের নিচ থেকে হাড়-মাংস চিবোনোর কড়মড় শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলেন। তিনি বুঝলেন, চিতাটা মড়ির কাছেই রয়েছে।

মিঃ অ্যালেন জানেন, মাঝরাতের আগে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠবে না। কিন্তু তার আগেই ধূর্ত চিতা তার খাওয়া শেষ করে চলে যাবে। তিনি একবার ভাবলেন, শব্দ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বেন। তারপর স্থির করলেন, চিতা ঝোপ থেকে বেরোলে তারার আলোয় কয়েক সেকেন্ডের জন্যেও যদি সেটাকে দেখতে পান, তখন গুলি চালাবেন। কিন্তু আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও চিতাটা বাইরে এলো না। তখন মিঃ অ্যালেন আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। ভাবলেন, মাত্র কুড়ি গজ দূরে তো অতবড় চিতাটা রয়েছে। অন্ধকারে কিছু না দেখে গুলি ছুঁড়লেও নিশানা ভুল হবে না।

গুলি ছোঁড়ার আগে মিঃ অ্যালেন একটুও তাড়াহুড়ো করলেন না। সারাদিন বসে বসে তিনি লক্ষ্য করেছেন মড়িটা জঙ্গলের ভেতর ঠিক কোন জায়গায় পড়ে রয়েছে। এখন চিতার হাড় চিবানোর শব্দ অনুসরণ করে খুব সাবধানে রাইফেলের ট্রিগার টেনে দিলেন। কিন্তু গুলি চিতার গায়ে লাগল না।

মিঃ অ্যালেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন চিতাটা দিব্যি লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

চিতারা দারুণ দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হয়। মিনিট পনেরো বাদেই আবার ফিরে এলো মড়ির কাছে। মিঃ অ্যালেন ফের হাড়-মাংস চিবানোর শব্দ শুনলেন। শুনে নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। এত শীঘ্র ফিরে এসেছে চিতাটা! রাইফেলের প্রচণ্ড শব্দ শুনে, অন্ধকারে আগুনের ঝলক দেখেও সে এতটুকু ভয় পায়নি। মিঃ অ্যালেনের মাথা গরম হয়ে গেল। অন্ধকারে শব্দ লক্ষ্য করে ফের গুলি ছুঁড়লেন তিনি। এবারেও নিশানা ভুল হলো। চিতাটা এবার দারুণ রাগে প্রবল গর্জন করে লাফিয়ে চলে গেল। কিন্তু প্রায় তখনই ফিরে এসে মড়িটা খেতে শুরু করল। যেন একটু আগে কিছুই ঘটেনি।

মিঃ অ্যালেনের রাইফেলে তখন মাত্র আর একটা বুলেট। এই শেষ বুলেটটিকে খরচ করার প্রলোভন সম্বরণ করলেন তিনি। অন্ধকারে চিতাটাকে একবারও দেখা গেল না। আঁধারের আড়ালে সে সমানে হাড়-মাংস খেয়ে চলল। তারপর খাওয়া শেষ করে, চরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মিঃ অ্যালেনেরই কাছে একটা গাছে থাবা পরিষ্কার করে, ঢেঁকুর তুলতে তুলতে দিব্যি হেলেদুলে জঙ্গলের ভেতর চলে গেল।

পরের কয়েক মাস মিঃ অ্যালেন চিতাটার আর কোনো সাড়াশব্দ পেলেন না। তবে আন্দাজ করলেন সে আশপাশেই আছে। গ্রামের গবাদি পশুদের তাই দিন-রাত্রি পাহারা দিয়ে রাখার ব্যবস্থা হলো।

তারপর এক সন্ধ্যায় একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেল। মিঃ অ্যালেনের এক বন্ধু তাঁর টেরিয়ার কুকুরটিকে কিছুদিনের জন্য তাঁর কাছে রেখে গিয়েছিলেন। কুকুরটার নাম বিম্বো। সে থাকত মিঃ অ্যালেনের পোষা কুকুর ন্যান্সি আর হকিন্সের সঙ্গে। বিম্বোও তাঁদের পরিবারেরই প্রায় একজন হয়ে গিয়েছিল।

বিম্বোর একটা বদ অভ্যাস ছিল। বাঁদর দেখলেই সে তারস্বরে চেঁচাত। কুকুরের ডাক শুনে চিতাও কাছে এগিয়ে আসত। মিঃ অ্যালেনের অন্য কুকুর দুটিও প্রায় ডাকত, কিন্তু চিতা কাছে এসে পড়লে তারা ছুটে পালাতে পারত।

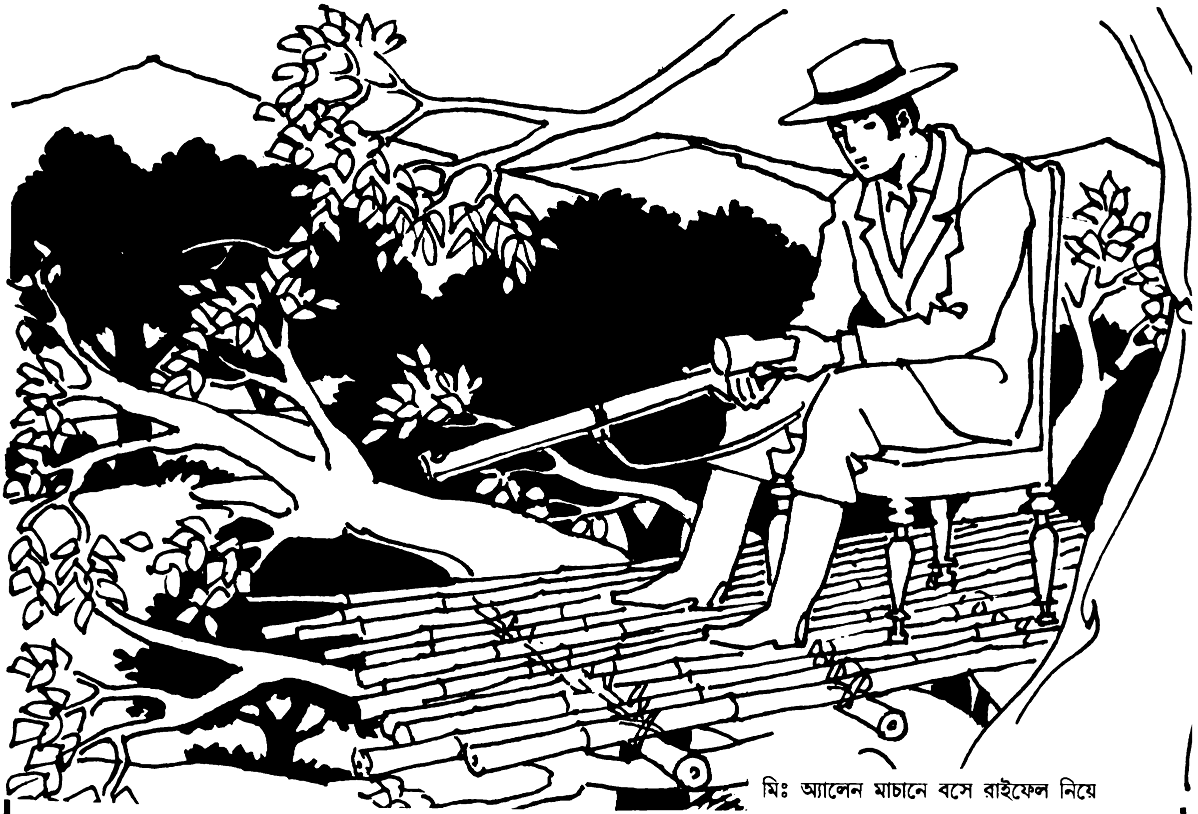

মিঃ অ্যালেন মাচানে বসে রাইফেল নিয়ে

সেদিন মিঃ অ্যালেনের কয়েকজন বন্ধু পাঁচমারি থেকে এসেছিলেন। প্রায় সারাদিন মিঃ অ্যালেন বারান্দায় বসে তাঁদের সঙ্গে গল্প করেছেন। বারান্দার এক কোণে বাঁধা ছিল বিম্বো। অনেকক্ষণ সে বাইরে বেরোয়নি। সান্ধ্যভ্রমণেও মিঃ অ্যালেন তাকে নিয়ে যাননি। তাই ছাড়া পেয়ে প্রথমটা সে মিঃ অ্যালেনের চেয়ারের কাছে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করল। তারপর সন্ধ্যা সাতটা বাজতেও মিঃ অ্যালেন যখন গল্প ছেড়ে উঠলেন না তখন বিরক্ত হয়ে বিম্বো একাই বেরিয়ে পড়ল।

বিম্বোকে বেরুতে দেখে প্রথমে তেমন চিন্তিত হননি মিঃ অ্যালেন। এর আগেও সে বহুবার একাই বেরিয়েছে। আর চিতার ভয় থাকলেও সব সময় সে কথা মনেও থাকত না মিঃ অ্যালেনের। তিনি ভাবলেন কুকুরগুলো একসঙ্গেই তো থাকবে সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।

রাত পৌনে আটটা নাগাদ ন্যান্সি আর হকিন্স ফিরে এলো। তারা খুবই উত্তেজিত। একজন তো রীতিমতো আতংকে গোঙাচ্ছে। কিন্তু বিম্বোর দেখা নেই। সকলে খুব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। ক্রমে আটটা বাজল। তবুও বিম্বো ফিরল না। মিঃ অ্যালেন লোকজন ডেকে টর্চ নিয়ে বিম্বোকে খুঁজতে বেরুলেন।

মাঝরাত পর্যন্ত জঙ্গলের ভেতর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বিম্বোর কোনো হদিস পাওয়া গেল না। সব জায়গা খোঁজা হলো। দুঃখে মিঃ অ্যালেন ও তাঁর ছোট বোন বারবারার বুক ভেঙে গেল। তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তাঁরা পালন করতে পারলেন না, এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে!

রাত শেষ হতেই মিঃ অ্যালেন ফের বিম্বোকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। দুপুরের পর চিতার সন্ধান পাওয়া গেল। চিতাটা কোথা থেকে বিম্বোকে টেনে নিয়ে গেছে তার চিহ্ন খুঁজে পেলেন। নালা যেখানে বড় নদীতে মিশেছে সেখানে চিতা একটা ডোবার জল পান করেছে। আরও এক ঘণ্টা পর মিঃ অ্যালেন নিশ্চিত জানলেন বিম্বো মারা গেছে।

তখনই মড়ির কাছে না বসার সিদ্ধান্ত নিলেন মিঃ অ্যালেন। বরঞ্চ একটা ছাগল জঙ্গলের এমন জায়গায় বেঁধে রাখলেন, যেখানে পেছনের ঝোপের আড়াল থেকে তিনি সহজেই গাছে উঠতে পারেন। বিকেলে কয়েকবার জায়গাটা ঘুরে দেখে গেলেন মিঃ অ্যালেন। ছাগলটা তখনো গাছেই বাঁধা রয়েছে। চা পানের পর তিনি ফের এলেন টোপের কাছাকাছি। আড়ালে দাঁড়িয়ে চিতার পায়ের শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু চিতা এলো না। কোনোদিক থেকে চিতা আসার কোনো সঙ্কেত পেলেন না। হতাশ হয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন মিঃ অ্যালেন। ভোরে গিয়ে দেখলেন, ছাগলটার একটা অংশ হায়েনারা খেয়ে গেছে।

মিঃ অ্যালেন নতুন করে আর টোপ বাঁধলেন না। তখনো বেশ শীত রয়েছে। তিনি ভাবলেন উঁচু গিরিশিরার মাথার দিকে রোদ পোহাতে চিতাটা হয়তো উঠে আসতে পারে। তাহলে সেখানেই তাকে পাওয়া যাবে। মাঠ দিয়ে আসার সময় প্রভাতসূর্যের আলোয় চিতাটাকে দেখতে পাওয়ার আশায় তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর পায়ের নিচে সকালের শিশিরভেজা গাছের ঝরা পাতা। পিছনে পশ্চিমা বাতাস। তাঁর মনে হলো কিছু একটা ঘটতে চলেছে। চিতার দেখা তিনি

পাবেনই।

চিতাকে মারার আগের সুযোগ হাতছাড়া হবার পর অনেকদিন মিঃ অ্যালেনকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। এবারও এক হপ্তার মধ্যে তিনি চিতার দেখা পেলেন না। সন্ধ্যাতে গিরিশিরায় খোঁজ করেও নয়। মিঃ অ্যালেনের সন্দেহ হলো চিতা তাঁর এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।

অবশেষে এক হাড়কাঁপানো শীতের সকালে আচমকা চিতার দেখা পেলেন মিঃ অ্যালেন। গিরিশিরার একটা দিক খুব সংকীর্ণ। পাহাড়ের গা দিয়ে সরু পথ খাড়া নিচে নেমে গেছে। এই পথে ব্রার গাছের ঝোপে ফুলের মতো ফল ধরে। বাঁ দিকের ঢালুর গাছে অনেক ফল ধরে রয়েছে। মিঃ অ্যালেন তাঁর পায়রার জন্য কিছু ফল তুলতে এগিয়ে গেলেন। পাহাড়ের ঢালে নিচের দিকে নামার সময় চারিদিকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন। আর ঠিক তখনই চিতাটাকে দেখতে পেলেন।

মিঃ অ্যালেন দেখলেন পাহাড়ের ঢালের মাঝামাঝি একটা গিরিখাদে চিতাটা লুকিয়ে রয়েছে। প্রথমে মনে হয়েছিল চিতাটা ঘুমোচ্ছে, নড়াচড়া করছে না। আসলে চিতাটাকে ভাল দেখাই যাচ্ছিল না। গিরিখাদের 'লালটানা' ঝোপের আড়াল থেকে তার দেহের একটা অংশই মাত্র দেখা যাচ্ছিল। মিঃ অ্যালেন ভালো করে লক্ষ্য করতে বুঝলেন চিতাটা ঘুমোয়নি। হামাগুড়ি দিয়ে গিরিখাদের নিচে একদল বাঁদরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মিঃ অ্যালেন পাহাড়ের যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখান থেকে চিতাকে গুলি করা সম্ভব নয়। ঘন ঝোপের আড়ালে সে ঢাকা পড়েছে। তবে বাঁদরদের দিকে এগোবার সময় ঝোপের আড়াল থেকে তাকে বেরোতেই হবে।

চিতাটা কিছুটা এগোতেই বাঁদরের দল তাকে দেখে আতঙ্কে চিৎকার শুরু করে দিল। মিঃ অ্যালেন দ্রুত এগিয়ে চললেন। আশা করলেন, চিতা যেন কোনো বাঁদরকে মারতে না পারে কারণ মারতে পারলেই তাকে আর সেখানে পাওয়া যাবে না।

মিঃ অ্যালেন ঝোপে ঢাকা পাহাড়ী পথের প্রায় শেষপ্রান্তে পৌঁছলেন। লক্ষ্য করলেন একটা গাছের ডালে আতঙ্কিত বাঁদরগুলো ভীষণ চিৎকার করছে। কয়েকটা উঠে যাচ্ছে গাছের আরও ওপর দিকে। বাঁদরগুলো ভীষণ রাগে লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে। গাছের ডালে প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছে। মিঃ অ্যালেনের ডান দিকে পঞ্চাশ গজ দূরে, ঘন ঝোপের দিকে, বাঁদরগুলো ঘনঘন তাকাচ্ছে। চিতাকে দেখতে না পেলেও তিনি বুঝলেন, সেটা ওই ঝোপের আড়ালেই গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তখনো সে কোনো বাঁদরকে ধরতে পারেনি।

চিতারা গাছের উঁচু ডাল থেকে কোনো সময়েই বাঁদর ধরতে পারে না। কিন্তু বাঁদররা চিতার মুখে প্রায়ই ধরা পড়ে। এর কারণ শত্রুকে দেখলেই দারুণ আতঙ্কে তারা এমন পাগলের মতো লাফালাফি শুরু করে দেয় যে হাত ফসকে গাছের উঁচু ডাল থেকে নিচে এসে পড়ে। কিছু বাঁদর ভয়ে দূরে পালাবার চেষ্টা করে। গাছ থেকে নিচে নেমে পাগলের মতো ছোটে অন্য কোনো গাছের আশ্রয়ে। ভাবে সেই গাছটা বুঝি আরো নিরাপদ।

সেইরকম একটা বাঁদর গাছের মগ-ডাল থেকে নিচের ডালে নেমে এলো। তারপর তড়িঘড়ি চিতার দিক থেকে অনেক দূরে যাবার চেষ্টায় মাটিতে লাফিয়ে নেমে একবার পিছনে তাকিয়েই ছুটতে শুরু করল।

একটা বিদ্যুতের ঝলকের মতো চিতাটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। বাঁদরটা কুড়ি গজ যেতে না যেতেই চিতাটা বাঁদরটাকে খপ করে ধরে ফেলল। চিতাটা একবার দাঁড়িয়ে বাঁদরটাকে জোরে ঝাঁকুনি দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ অ্যালেনের রাইফেলের নল থেকে গুলি ছুটে গেল।

বিশ্বের ঘাতক চিতা নিহত হলো। বাঁদরটা তখনো তার ধারালো দাঁতের ফাঁকে আটকানো।

ছবিঃ মদন সরকার

আটকাবে কে

সুখেন্দু মজুমদার

তোমার খাতায় অঙ্ক আছে
আকাশ, আমার খাতায়,
থাকে কি আর তোমার মতো
ফরমুলাটা মাথায়।

অঙ্ক করার সময় তোমার
সজাগ যেমন দৃষ্টি,
আকাশ দেখেই আমিও বলি
কোন মেঘে হয় বৃষ্টি।

তোমার মতো না হই যদি
আমার কিসের হিংসে,
এমন কাজে মন দেবে যে
সত্যিকারের হীন সে।

সবার মুখে তোমার তারিফ,
কে আর কাকে থামায়,
ফোরে যখন উঠবে সবাই
আটকাবে কে আমায়!

ঠাকুরদা

ধূর্জটি চন্দ

নরম গা কাজের না
সোনার গা সোনার না
খড়ম পা ঠাকুরদা
এই কথাটা মানেন না।
খেলেন না গরম চা
গেলেন না শেয়ালদা
জন্মদিনে সোনামণির
পেলেন না করমচা।

ছবিঃ সূফি

জীবন্ত কংকাল

মানবেন্দ্র পাল

॥ এক ॥

অম্বুজ লাহিড়ির আবির্ভাব

জুলাইয়ে এক মাসের ছুটি নিয়ে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু আর দেশের বাড়ি হরদেবপুর থেকে যে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছি, এখনও পর্যন্ত সে কথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। কিছুতেই ভেবে পাই না তেরো-চোদ্দ বছরের কংকালসার নেপালী ছেলেটা আসলে কী ছিল? সে আমাদের বাড়িতে ফাই-ফরমাশ খাটতে চায় বলেই তাকে কাঠমাণ্ডু থেকে নিয়ে এসেছিলাম। ছেলেটা যেন ম্যাজিক জানত। ঐ কংকালসার শরীর নিয়েই কী অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করত ভেবে এখনও অবাক হই। কিন্তু তার পরে সে আরও যে সব কাণ্ডকারখানা করেছিল তা রীতিমতো ভয়ংকর। আমি অবশ্যই সেসব ঘটনা লিখে রেখেছি। এটা স্পষ্ট বুঝেছি—কাঠমাণ্ডু থেকে দূরে পাহাড়ের নিচে বিষ্ণুমতি নদীর তীরে সেই তান্ত্রিকই আমাকে মারবার জন্যে ঐ ছেলেটাকে পাঠিয়েছিল। তাই বইটার নাম দেব ভাবছি 'অলৌকিক জল্লাদ'। তবে কলকাতায় এসে ঐসব ঘটনা আত্মীয়-বন্ধু কাউকেই বলিনি। কেননা বললে তারা বিশ্বাস করবে না। উল্টে ঠাট্টা-মশকরা করবে। তারা বলবে—এই বিজ্ঞানের যুগে এইসব গাঁজাখুরি ঘটনা ঘটে নাকি?

উত্তর দিতে পারব না। তবে কিনা আমিও বিজ্ঞানের যুগের মানুষ। আর আমি কলকাতার একটি থানার দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার। তা ছাড়া সেইসব ঘটনার একজন সাক্ষীও আছে। সে আমারই মতো কলকাতার আর একজন পুলিশ অফিসার এবং আমার বন্ধু প্রণবেশ। সে তো আমার সঙ্গেই ছিল।

কলকাতায় ফিরে আমরা প্রথমে ঠিক করেছিলাম ঘটনাটা কাগজে বার করব। পুলিশ-অফিসারদের অভিজ্ঞতা শুনে নিশ্চয়ই ছাপবে। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছিলাম তাতে অনেকের অনেক অবান্তর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তাই মুখে কুলুপ এঁটে থাকাই স্থির করেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত প্রণবেশই ঘটনাটা ফাঁস করে দিল এমন একজনের কাছে যাকে আমি চিনি না, জানি না।

প্রণবেশ একদিন বিকেল বেলায় একজন বেশ ফিটফাট ভদ্রলোককে নিয়ে আমার বাসায় এসে হাজির হলো। বয়েস বছর পঞ্চাশ। নেড়া মাথা। লাল টকটকে মুখ। চোখে সোনালী ফ্রেমের হালকা চশমা। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা। নাম অম্বুজবরণ লাহিড়ি। থাকেন সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকের কাছে রংপোতে।

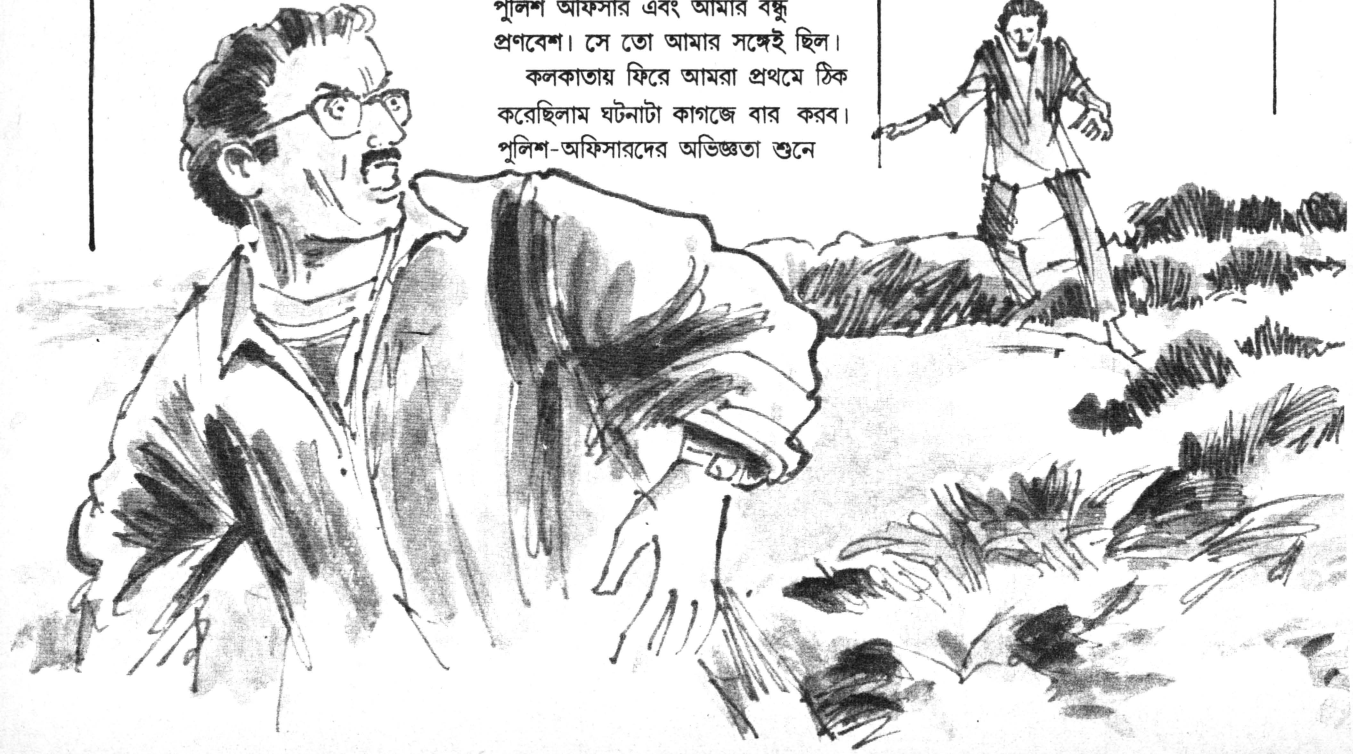

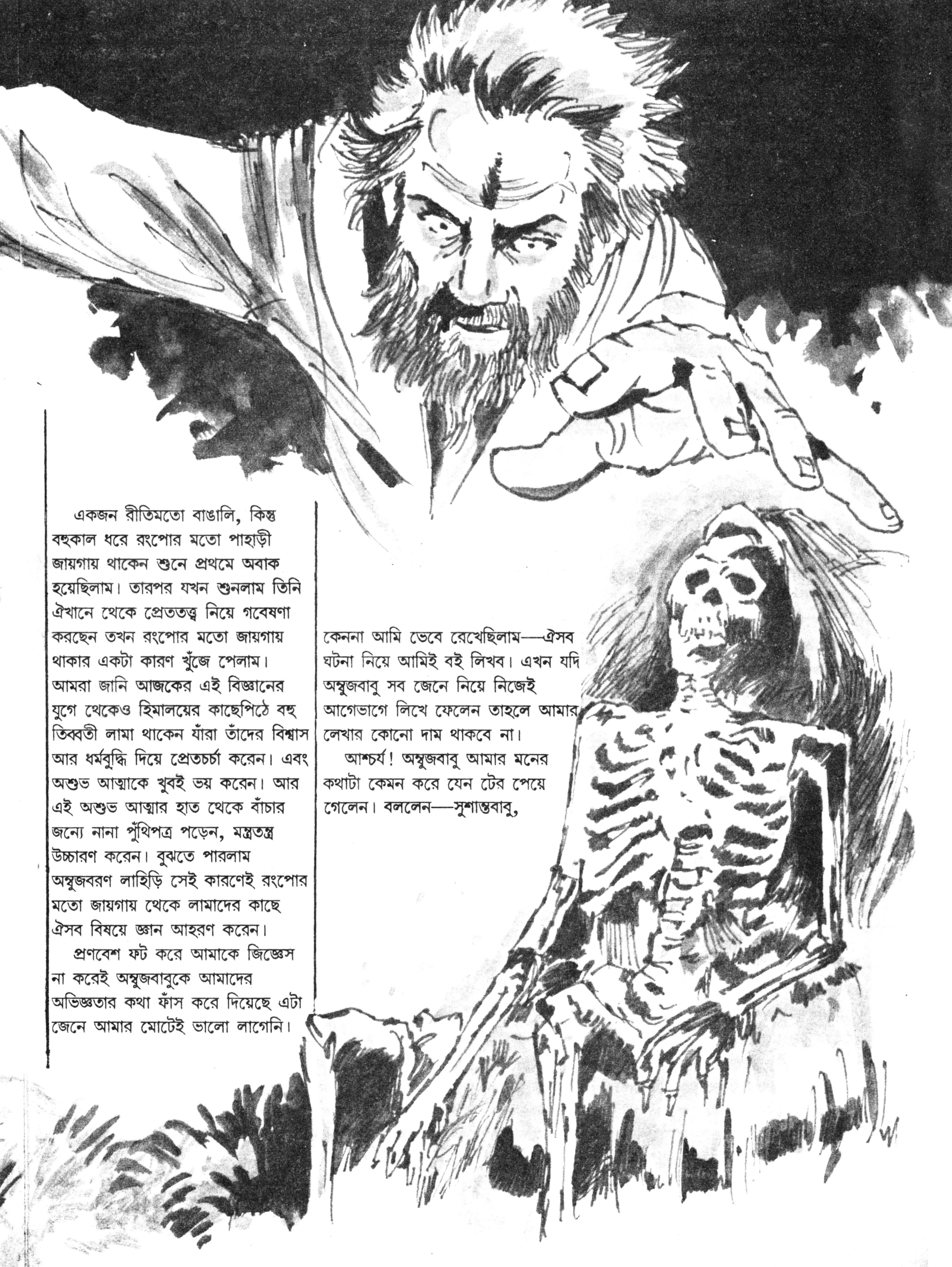

একজন রীতিমতো বাঙালি, কিন্তু বহুকাল ধরে রংপোর মতো পাহাড়ী জায়গায় থাকেন শুনে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম। তারপর যখন শুনলাম তিনি ঐখানে থেকে প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছেন তখন রংপোর মতো জায়গায় থাকার একটা কারণ খুঁজে পেলাম। আমরা জানি আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে থেকেও হিমালয়ের কাছেপিঠে বহু তিব্বতী লামা থাকেন যাঁরা তাঁদের বিশ্বাস আর ধর্মবুদ্ধি দিয়ে প্রেতচর্চা করেন। এবং অশুভ আত্মাকে খুবই ভয় করেন। আর এই অশুভ আত্মার হাত থেকে বাঁচার জন্যে নানা পুঁথিপত্র পড়েন, মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করেন। বুঝতে পারলাম অম্বুজবরণ লাহিড়ি সেই কারণেই রংপোর মতো জায়গায় থেকে লামাদের কাছে ঐসব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেন।

প্রণবেশ ফট করে আমাকে জিজ্ঞেস না করেই অম্বুজবাবুকে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা ফাঁস করে দিয়েছে এটা জেনে আমার মোটেই ভালো লাগেনি। কেননা আমি ভেবে রেখেছিলাম—ঐসব ঘটনা নিয়ে আমিই বই লিখব। এখন যদি অম্বুজবাবু সব জেনে নিয়ে নিজেই আগেভাগে লিখে ফেলেন তাহলে আমার লেখার কোনো দাম থাকবে না।

আশ্চর্য! অম্বুজবাবু আমার মনের কথাটা কেমন করে যেন টের পেয়ে গেলেন। বললেন—সুশান্তবাবু,

ঘটনাগুলো আমাকে সবিস্তারে বললে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা আমার কাজ গোপনে গবেষণা করা। বই ছাপা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার খ্যাতিরও দরকার নেই, টাকারও দরকার নেই।

তাঁর এই কথা শুনে আমি শুধু অবাকই হইনি, লজ্জিতও হয়েছিলাম।

তাঁকে বসতে বলে স্ত্রীকে চা করতে বললাম। ইতিমধ্যে আমি গত জুলাই মাসে কাঠমাণ্ডুতে আর আমার দেশের বাড়িতে যা যা ঘটেছিল তা বলে গেলাম। দেখলাম তার অনেকটাই তিনি প্রণবেশের কাছে শুনেছেন।

চা আর সুজি নিয়ে আমার স্ত্রী হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন। প্রণবেশ আলাপ করিয়ে দিল।

অম্বুজবাবু হঠাৎ আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, দেশের বাড়িতে আপনাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা আপনার কিরকম মনে হয়?

স্ত্রী বললেন, সাংঘাতিক। বাড়িতে কাজের জন্যে নেপাল থেকে উনি একটি দুর্ভিক্ষপীড়িতর মতো ছেলেকে নিয়ে এলেন আর সেই ছেলেই ভেল্কি দেখাল। আমি অবশ্য কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম, সেই সময়ে খালি বাড়িতে নাকি নানারকম ভয়ের কাণ্ড ঘটেছিল।

ছেলেটার কি যেন নাম ছিল?

আমার স্ত্রী বললেন, রাজু সুব্বা।

আচ্ছা, তার গায়ে কখনো হাত দিয়েছিলেন?

গায়ে হাত দেওয়া মানে মারা বলছেন?

না-না, কখনো ছুঁয়েছিলেন?

ম্যাগো! যা ডিগডিগে চেহারা, ছুঁতে ঘেন্না করত। মনে হতো যেন একটা জ্যান্ত কংকাল।

ধন্যবাদ। আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।

আমার স্ত্রী ভেতরে চলে গেলেন।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে অম্বুজবাবু বললেন, সুশান্তবাবু, ব্যাপারটার ওপর আমার যথেষ্ট কৌতূহল আছে বলেই আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, করুন না। তবে ঐ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা আর মনে আনতেও ইচ্ছে করে না।

অম্বুজবাবু জামার পকেট থেকে মোষের শিঙের তৈরি নস্যির ডিবে বার করে এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, কাঠমাণ্ডুতে বিষ্ণুমতির তীরে এক তান্ত্রিক একটি ছেলেকে বলি দিতে যাচ্ছিল, আপনি আর আপনার বন্ধু দুজনে মিলে ছেলেটিকে বাঁচান। বলি দিচ্ছিল ঘণ্টাকর্ণের সামনে। আপনারা কি জানতেন নেপালীদের কাছে ঘণ্টাকর্ণ কী ভয়ংকর দেবতা?

হ্যাঁ, শুনেছিলাম জুলাই-আগস্ট মাসে নেপালের পাহাড়ে পাহাড়ে অশুভ শক্তিরা ঘুরে বেড়ায় দানবের মূর্তি ধরে। তাদের সামনে পড়লে মানুষ, জীবজন্তু কারো রক্ষে থাকে না। তাই সেই দানব-দেবতাদের ভয়ংকর মূর্তি গড়ে তাদের পুজো দিয়ে সন্তুষ্ট করে সসম্মানে বিদেয় করা হয়।

ঠিকই জানেন দেখছি। তাহলে সেই দেবতার কাছ থেকে ছেলেটাকে বাঁচানো মানে দেবতার মুখ থেকে গ্রাস কেড়ে নেওয়া?

বিরক্ত হয়ে বললাম, ওসব আমি জানি না। দেবতার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়াই হোক আর যাই হোক এ যুগে একটা ছেলেকে বলি দেবে তা আমরা দেখেও এড়িয়ে যাব তা হতে পারে না।

অম্বুজবাবু মৃদু হেসে বললেন, আমায় ভুল বুঝবেন না। আমি বলছি না ছেলেটাকে বাঁচিয়ে আপনারা অন্যায় করেছেন। আমি বলতে চাইছি ছেলেটাকে বাঁচাতে গিয়ে আপনারা তান্ত্রিকের কোপ-দৃষ্টিতে পড়েছিলেন। তাই কিনা?

হ্যাঁ। সে তো স্বাভাবিক। বলল প্রণবেশ।

সেই ক্রোধটা আপনাদের ওপর কিভাবে এল?

যে হোটেলে আমরা উঠেছিলাম সেই হোটেলে জং বাহাদুর নামে একটা 'বয়' ছিল। সে বলেছিল অনেক নেপালী গরিব ছেলে ইন্ডিয়ায় চলে যায় সামান্য চাকরির লোভে। আমি তখন আমাদের বাড়ির কাজের জন্যে একটি ছেলে চেয়েছিলাম। জংবাহাদুর যে সত্যিই একটা ছেলে এনে দেবে ভাবতে পারিনি। কিন্তু তার কংকালসার চেহারা দেখে মনে হয়েছিল সে কোনো কাজই করতে পারবে না। একথা শুনে ছেলেটা তখনই এমন সব কাজ করতে লাগল যা দেখে আমরা তাজ্জব।

যেমন? জিজ্ঞেস করলেন অম্বুজবাবু।

যেমন হঠাৎ ভল্ট খেতে লাগল, মাথা নিচু করে দু'হাতে ভর দিয়ে দু'পা তুলে খানিকটা হেঁটে গেল। এক দৌড়ে নিচে নেমে গিয়ে মস্ত এক বালতি ভর্তি জল নিয়ে এক দৌড়ে একতলা থেকে তিনতলায় উঠে এল। তারপর দেশের বাড়িতে এসে আরও অনেক ম্যাজিক দেখিয়েছিল।

আমার স্ত্রী ফিরে এসে বললেন, ছাদে সরু পাঁচিলের ওপর দিয়ে হাঁটা, পাঁচিল থেকে লাফিয়ে গাছের ডাল ধরে ঝোলা সেগুলোর কথা বলো।

কত আর বলব? বলে একটু হাসলাম। কিন্তু অম্বুজবাবু হাসলেন না।

তখনও কি জানতাম মশাই, ওটা একটা শয়তানের বাচ্চা! আর জং বাহাদুরই সেই তান্ত্রিকের কাছ থেকে ওটাকে নিয়ে এসেছিল আমাদের সর্বনাশ করার জন্যে?

আচ্ছা, ছেলেটা কি কখনো হাসত? জোরে না হোক, মুচকে?

হাসি? আমার স্ত্রী বলে উঠলেন, ঐ মুখে হাসি ফুটবে? মুখ তো নয় একটুকরো লম্বা পোড়া কাঠ।

আচ্ছা, দৌড়-ঝাঁপ করার পর ওকে কখনও হাঁপাতে দেখেছেন?

না মশাই। ওকে যা মনে হয়েছে তা হচ্ছে ও যেন মান্ধাতার আমলের জংধরা একটা যন্ত্র।

মান্ধাতার আমলের জংধরা একটা যন্ত্র! অম্বুজবাবু নিজের মনেই কথাটা উচ্চারণ করলেন।

আচ্ছা, এর আগে আপনি বলেছিলেন ছেলেটা যেন একটা জীবন্ত কংকাল! তাই না?

আমার স্ত্রী হেসে বললেন, হ্যাঁ।

আচ্ছা, ছেলেটা কিভাবে ভয়

দেখাত?

ভয় দেখাত কী! আমার স্ত্রী বলে উঠলেন, একদিন সন্ধ্যেবেলায় ও তো পেছন থেকে এসে ওঁর গলা টিপে ধরতে গিয়েছিল। তারপর—

অম্বুজবাবু বাধা দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, সেসব প্রণবেশবাবুর কাছ থেকে শুনেছি। এছাড়া—

সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে সুদূর নেপাল থেকে আমাদের গ্রামে এসে আস্তানা গেড়েছিল সেই তান্ত্রিকটা। আর ঐ ছোঁড়াটা রোজ রাত্রে চুপিচুপি তার কাছে যেত। তারপর তান্ত্রিকটা কী ফুসমন্তর দিত আর ও একটা—ঐ যে বললাম জীবন্ত কংকালের মতো সমস্ত বাড়ি ঘুরে বেড়াত আমার স্বামীকে একা পাবার জন্যে। তখন আবার বাড়িতে কেউ ছিল না। উঃ সে যা দিন গিয়েছে ওঁর!

আমার স্ত্রীর কথায় বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে অম্বুজ লাহিড়ি আমাকে বললেন, আচ্ছা, কাঠমাণ্ডুতে ঐ তান্ত্রিকের ওখানে একটা কংকাল ঝুলিয়ে রাখা হতো বলেছিলেন। তাই না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, কংকালটা একটা বয়স্ক মানুষের না চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলের?

বললাম, দূর থেকে দেখা। তবে মনে হয় অল্পবয়সী ছেলের। তাই না প্রণবেশ?

প্রণবেশ চোখ বুজিয়ে ভেবে বলল, তাই তো মনে হচ্ছে।

এরপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, শেষের দিনের ব্যাপারটা একটু বলুন তো।

বললাম, রোজই দেখতাম তান্ত্রিকটা একটু একটু করে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে এসে ধুনী জ্বেলে বসছে। আর রাজু রোজই ছুটে ছুটে ওর কাছে গিয়ে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ছে। তান্ত্রিক ওকে বোধ হয় কিছু নির্দেশ দিত। আর ও সেটা করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠত। সেই করাটা সে আমাকে খুন করা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আপনি শেষের দিনের কথাটা বলুন।

হ্যাঁ, বলি। আমার স্ত্রী যেদিন বাপের

বাড়ি থেকে ফিরে এলেন সেইদিন সব শুনে বললেন, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। কাল ভোরেই কলকাতায় ফিরে চলো।

পরের দিন ভোরের ট্রেন ধরলাম। কিন্তু দেখি রাজু সুব্বা আমাকে তাড়া করে স্টেশন পর্যন্ত ছুটে এসেছে। একটু দেরি করলেই ধরে ফেলত। খুব বেঁচে গেছি মশাই।

প্রণবেশ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না মিস্টার লাহিড়ি, ঐ কংকালটার সঙ্গে সুব্বার কি কোনো সম্পর্ক ছিল?

অম্বুজ লাহিড়ি আর এক টিপ নস্যি নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, এক সময়ে আমাদের দেশের শক্তিমান কাপালিক, তান্ত্রিকরা একের মৃতদেহের মধ্যে অন্যের আত্মা চালনা করতে পারতেন একটা বিশেষ সময়ের জন্যে। আবার এমন তথ্যও পেয়েছি, কেউ কেউ কংকালে একটা বিশেষ সময়ের জন্যে মাংস চামড়া সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে পারতেন। এই কৃত্রিম চামড়া, মাংস কংকালটাকে কোনোরকমে ঢেকে রাখতে পারত কিন্তু শরীরের যে স্বাভাবিক রূপ, লাবণ্য তা দান করতে পারত না।

এই রকম ব্যাপার আমাদের দেশের রূপকথার কোনো কোনো গল্পে আমরা পাই। এইরকম একটা গল্প ছিল, এক ডাকিনী একটা মরা বাঘের হাড়গোড় জড়ো করে মন্ত্র পড়ে প্রথমে বাঘের পূর্ণাঙ্গ কংকাল তৈরি করল। তারপর মন্ত্র পড়ে তার ওপর মাংস, তার ওপর চামড়া বসিয়ে দিল। তারপর করল প্রাণসঞ্চার। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা ভয়ংকর রূপ ধরে উঠে দাঁড়াল।

রূপকথার গল্প হলেও এর মধ্যে মন্ত্র-তন্ত্র সাধনার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এইরকমই কাণ্ড ঘটিয়েছিল কাঠমাণ্ডুর সেই মহাশক্তিধর তান্ত্রিক। সেই ঝুলনো কংকালটায় প্রাণসঞ্চার করে তাকে—ম্যাজিসিয়ান যেমন কাউকে হিপ্নোটাইজ করে যেখানে খুশি পাঠাতে পারে, তাকে দিয়ে যা খুশি তাই করাতে পারে, এই তান্ত্রিকও তেমনি ঐ কংকালটাকে জীবন্ত করে দূরে পাঠিয়ে তার অভীষ্ট কাজ সম্পন্ন করে। আপনাকে মারার জন্যে তাই সেই তান্ত্রিক কংকালটাকে—যার নাম দেওয়া হয়েছিল রাজু সুব্বা—পাঠিয়েছিল। কংকালের ওপর কৃত্রিম রক্ত, মাংস, চামড়া বসানো হয়েছিল বলে তার মুখটাকে আপনাদের পোড়া কাঠের মতো মনে হতো। কৃত্রিম সৃষ্টি বলেই তার মুখে হাসি ফুটত না। একই কারণে আপনার ওকে মনে হয়েছিল একটা 'মান্ধাতার আমলের জংধরা যন্ত্র' বলে।

অম্বুজ লাহিড়ি একটু থামলেন। তারপর চশমাটা খুলে হাতে নিয়ে বললেন, তবে এইরকম জীবন্ত কংকালের শক্তিরও সীমা থাকে। একটা দূরত্ব পর্যন্ত যেতে পারে। তারপর আর পারে না। তাই সেই তান্ত্রিককে দেখা গেছে আপনাকে মারার জন্যে সুদূর নেপাল থেকে আপনাদের বাড়ির বাগান পর্যন্ত ধাওয়া করে আসতে। সে এখানে না এলে অত দূর থেকে ছেলেটাকে চালনা

করা সম্ভব হতো না।

কিন্তু সুব্বা যে এতদিন আমাদের বাড়ি ছিল, তখন তো তান্ত্রিক আসেনি।

নিশ্চয় এসেছিল। আপনারা জানতে পারেননি।

প্রণবেশ বলল, এই জীবন্ত কংকাল কি যেখানে খুশি, যখন খুশি যেতে পারে?

অম্বুজ লাহিড়ি মাথা নাড়লেন। বললেন, না। সবসময়ে সব জায়গায় যেতে পারে না। তা যদি পারত তা হলে তো ঐ তান্ত্রিক অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে উঠত। কংকালটাকে দিয়ে যা খুশি তাই করতে পারত। ঈশ্বর এইখানেই নিরীহ মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এই বলে একটু থামলেন। তারপর হেসে বললেন, আজ উঠি। কাল দার্জিলিঙ চলে যাব। একটু কাজ আছে। বলে উঠে পড়লেন।

আমরা ওঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। আমার স্ত্রী হেসে বললেন, যাক ঐ আপদটার হাত থেকে যে আমরা ঠিক সময়ে রেহাই পেয়েছি এই আমাদের ভাগ্য। যদি ট্রেনে উঠে কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করে আসত তাহলে কী হতো বলুন তো!

অম্বুজ লাহিড়ি দরজার বাইরে পা রেখেছিলেন, আমার স্ত্রীর এই শেষ কথা শুনে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি আমার স্ত্রীকে বোধ হয় কিছু বলার জন্যে মুখটা ফেরালেন। কিন্তু বললেন না। তবে মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাল। মনে হলো যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

।। দুই ।।

চাঞ্চল্যকর খবর

দু'দিন পরে।

সকাল বেলায় প্রণবেশ এসেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছেই। আমার স্ত্রী দু' স্লাইস করে এগটোস্ট আর চা দিয়ে নিজেও বসেছে। আমার ছেলে নোটন পড়ছে পাশের ঘরে।

প্রণবেশ অনেকক্ষণ ধরে অম্বুজ লাহিড়ির গুণকীর্তন করে গেল। উনিও নাকি যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন একজন সাধক। আমি অবশ্য এই প্রথম দেখে ততটা মুগ্ধ হতে পারিনি। একটু যেন অহংকারী বলে মনে হয়েছিল। আর খুব সাদাসিধে নয়।

বললাম, চলে যাবার সময় হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও না বলে অমন গম্ভীর মুখ করে কেন গেলেন সেটাই বুঝতে পারছি না। তোমায় কিছু বলেছেন?

প্রণবেশ মাথা নাড়ল। বলল, না। অবশ্য আমারও খটকা রয়েছে। মনে হলো বৌদি ঐ যে বললেন, সুব্বা যদি ট্রেনে উঠে কলকাতা পর্যন্ত আমাদের ধাওয়া করত তাহলে কী হতো বলুন তো? যাক খুব বেঁচে গেছি।—এই কথার উত্তর দিতে গিয়েও উনি কেন চেপে গেলেন!

একথা শুনে আমার স্ত্রীর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বললেন, সুব্বা সত্যিই এখানে এসে পড়বে না তো?

আমি জোরে হেসে বললাম, অত সহজ নয়। এটা কলকাতা শহর। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটছে। লোকের ভিড়। এটা কাঠমাণ্ডুর সেই নির্বান্ধব পাহাড়তলী নয়, নির্জন দেশের গ্রাম হরদেবপুরও নয়। কেউ ওটাকে কোলে করে নিয়ে এসে হাওড়া বা শেয়ালদা স্টেশনে তুলে দিয়েও সল্টলেক পর্যন্ত রাস্তা খুঁজে খুঁজে আসা সুব্বা কেন ওর প্রভু সেই তান্ত্রিকটার পক্ষেও সম্ভব নয়। তার ওপর তোমার স্বামী একজন পুলিশ অফিসার মনে রেখো। হাতের কাছে দুটো টেলিফোন। হেড কোয়ার্টারে একটা ফোন করলেই—কি বল প্রণবেশ?

প্রণবেশ আজকের কাগজটা পড়ছিল। একটু হাসল। তারপরই হঠাৎ কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, আরে! এ আবার কী?

বললাম, কী? রহস্যজনক খুন?

লক্ষ্য করলাম প্রণবেশের দু'চোখ যেন বিস্ময়ে বড়ো হয়ে উঠছে।

খবরটা কি ছাই বলো না।

প্রণবেশ তার উত্তর না দিয়ে শুধু একটা খবরের দিকে আঙুল দেখিয়ে কাগজটা আমার হাতে দিল।

ছোট্ট খবরটা এইরকম, **গতকাল গভীর রাত্রে চিৎপুর রোড (রবীন্দ্র সরণী) আর বিবেকানন্দ রোডের ক্রসিং-এর মুখে প্রহরারত পুলিশ এক অদ্ভুতদর্শন ছেলেকে একা একা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে দেখে তার কাছে এগিয়ে যায়। তাকে বার বার ডাকলেও সে সাড়া দেয় না। কাছে যেতেই সে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।**

পড়তে পড়তে আমার শরীর হিম হয়ে এল। আর আমার স্ত্রী ফ্যাকাশে মুখে শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

মিনিট পাঁচেক আমাদের মুখে কোনো কথা সরল না। প্রণবেশ আর আমি নিঃশব্দে সিগারেট খেতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে প্রণবেশ আমাকে বলল, কি মনে হয়?

বললাম, কনস্টেবলটি যদি বাড়িয়ে কিছু বলে না থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে অদ্ভুত ঘটনা। অবশ্য আমার মনে হয় গুরুত্ব দেবার কিছু নেই যতক্ষণ না ঐ 'অদ্ভুতদর্শন' কথাটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে। 'অদ্ভুতদর্শন' বলতে পুলিশটি কী বলতে চাইছে? যদি ওটা নিছক কথার কথা হয় তাহলে nothing serious—মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কেননা হয়তো বাইরে থেকে আসা কোনো নতুন ছেলে পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরছিল।

কিন্তু ঐ যে বারে বারে ডাকলেও সাড়া দেয়নি। কাছে যেতেই অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়—কথাগুলোর মানে কি?

বললাম, ওর মানে সোজা। সম্ভবত গ্রামের ছেলে। গভীর রাত। পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরছিল। হঠাৎ পুলিশের হাঁকড়ানি শুনে এক দৌড়ে কোনো অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আর সাড়া দেয়নি? হয়তো ছেলেটা কালা। এছাড়া আর কি হতে পারে?

আমার স্ত্রী ভয়ার্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ গো, সুব্বা নয় তো?

আমি জোরে হেসে বললাম, মাথা খারাপ নাকি? সুব্বা আসবে আমাদের গ্রাম থেকে এত দূরে কলকাতায় ট্রেনে চেপে?

সেই সন্ন্যাসীটা ওকে নিয়ে ট্রেনে করে আসতে পারে তো।

তা আসতে পারে। কিন্তু আশা করি সল্টলেকে এসে পৌঁছতে পারবে না। কেননা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমি ঠিকানা দিয়ে নেমন্তন্ন করে আসিনি।

আমার কথা শুনে গৃহিণী অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

গৃহিণী নিশ্চিন্ত হলেও প্রণবেশকে দেখে মনে হলো ও যেন তখনও কী ভাবছে।

বললাম, কী হে! কী এত ভাবছ?

ও তার উত্তর না দিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। তারপর ডায়াল করতে লাগল।

হ্যালো, জোড়াসাঁকো থানা? কমলেশবাবু নাকি? আমি প্রণবেশ কথা বলছি।

হ্যাঁ, ভালো আছি। না, খুন-খারাপির ব্যাপার কিছু নয়। অন্য একটি ব্যাপার। আজকের কাগজে একটা খবর দেখলাম—

হ্যাঁ। আমাদের জগদীশ ঘোষ ঐরকম কিছু একটা দেখেছিল। ও তো ভয়ে মরে যাচ্ছে। বলছে ভূত ছাড়া কিছু নয়।

ওর কথা বিশ্বাস করেই কাগজে খবর পাঠিয়ে দিলেন?

কী করব ভাই? এখানে আর-সবাই ওর কথা শুনে খুব ভয় পেয়ে গেছে। ওদের ধারণা অলৌকিক কিছু। শেষে ওদেরই চাপে খবরটা বার করতে হলো।

আপনার কী ধারণা?

নিজে চোখে তো দেখিনি। তবে ও যে ভাবে বর্ণনা দিচ্ছে তাতে কিছু যে একটা দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। এতদিন ও এত জায়গায় গভীর রাতে ডিউটি দিয়েছে, কখনও তো এরকম ভয় পায়নি। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি বলুন।

তোমার মনে আছে কিনা জানি না বেশ কয়েক বছর আগে রেড রোডে এক পুলিশ অফিসার গভীর রাতে জিপ চালিয়ে যেতে যেতে রাস্তার মাঝখানে কিছু একটা দেখেছিলেন। সে খবর কাগজে ছাপা হয়েছিল। পুলিশের ব্যাপার বলেই ওটা আমি ফাইল করে রেখেছি। ইচ্ছে করলে একদিন দেখে যেও।

তা না হয় দেখব। আপনি একবার জগদীশকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন?

তা পারি। কিন্তু তুমি হঠাৎ এ নিয়ে এত ভাবছ কেন? তুমিও কি ঐরকম কিছু দেখেছ?

না। তা নয়। এ নিয়ে পরে কথা বলব।

প্রণবেশ ফোন ছেড়ে দিল।

বললাম, একেবারে জোড়াসাঁকোয় ফোন করে বসলে?

হ্যাঁ। যে দেখেছে সে ঠিক কী দেখেছে তা স্পষ্ট করে জানা দরকার।

মনে হচ্ছে তুমি ব্যাপারটায় খুব গুরুত্ব দিচ্ছ?

এতক্ষণে প্রণবেশ একটু হাসল। বলল, দেখাই যাক না শ্রীমান জগদীশ কি বলে।

কি জানি বাবা, আমার কিরকম ভয় করছে। বলে আমার স্ত্রী উঠে গেলেন।

॥ তিন ॥

জগদীশের কথা

পরের দিন সকালেই জগদীশ ঘোষ এসে হাজির হলো।

আমাদের দুজনকে অ্যাটেনশান হয়ে লম্বা স্যালুট ঠুকে বেচারি বেচারি মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

ভেবেছিলাম এইরকম নিরীহ কনস্টেবলদের চেহারা যেমন হয় অর্থাৎ কালোকোলো মোটাসোটা হেঁড়ে মাথা বয়স্ক—এরও সেরকম চেহারা হবে। কিন্তু দেখলাম তা নয়, বেশ স্বাস্থ্যবান, স্মার্ট চেহারা, বয়েসও অল্প।

প্রণবেশ বলল, তুমিই তো জগদীশ ঘোষ?

ইয়েস স্যার।

বোসো। কত দিন পুলিশের চাকরি করছ?

ন' বছর পূর্ণ হয়ে পাঁচ মাস।

এখন জোড়াসাঁকোয় পোস্টেড?

ইয়েস স্যার।

এখানে কত দিন এসেছ?

দু' বছর তিন মাস।

এর আগে রাতে টহল দিয়েছ কখনো?

অনেক বার।

পরশুদিন রাতে কোথায় তোমার ডিউটি ছিল?

গণেশ টকীজের কাছে—নতুন বাজার এলাকায়।

সেদিন তুমি কিছু দেখেছিলে?

ইয়েস স্যার।

একটু গুছিয়ে বলো তো শুনি।

জগদীশ একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঐ দিন রাত্রে আমি আর রাম সিং ডিউটি দিচ্ছিলাম। রাম সিং অন্য দিকে গিয়েছিল। আমি একাই বিবেকানন্দ রোডের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সব দোকানপাট বন্ধ। লোডশেডিং কিনা জানি না, রাস্তায় আলো জ্বলছিল না। কাছেপিঠে জনপ্রাণী ছিল না। আমার কিরকম ভয় ভয় করল। অথচ বিশ্বাস করুন স্যার, এরকম নির্জন রাতে কতবার তো ডিউটি দিয়েছি, কোনোদিন ভয় পাইনি। ভয় তো একমাত্র ডাকাতদের। তা সঙ্গে বন্দুক আছে, রাম সিং আছে। তবু কেন যেন ভয় পেলাম। মনে হলো খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখছি ঠিক তখনই দেখলাম একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে তরতর করে বিবেকানন্দ রোড ধরে যাচ্ছে। সে দৌড়চ্ছিল না, হাঁটছিল। কিন্তু এত জোর হাঁটা যেন মনে হচ্ছিল দৌড়চ্ছিল।

প্রণবেশ বাধা দিয়ে বলল, কোন দিক দিয়ে এল?

সেটা স্যার লক্ষ্য করিনি। টেরও পাইনি। তবে যখন বিবেকানন্দ রোড ধরে বিধান সরণী মানিকতলার দিকে এগোচ্ছিল তখন অনুমান করি সে স্ট্র্যান্ড রোডের দিক থেকেই আসছিল।

স্ট্র্যান্ড রোড শুনেই প্রণবেশ আমার দিকে তাকাল। ও বোঝাতে চাইল বোধ হয় স্ট্র্যান্ড রোড মানেই হাওড়ার দিক থেকে। আমি কোনো মন্তব্য করলাম না।

তারপর?

আমি স্যার, প্রথমে ভেবেছিলাম ভিখিরিদের ছেলেটেলে হবে—যারা ফুটপাথে শোয়। কিন্তু সে যেভাবে জোরে জোরে হাঁটছিল তাতে মনে হলো সে

কিছু চুরি করে পালাচ্ছে। তখনই আমি হাঁক দিয়ে দাঁড়াতে বললাম। কিন্তু সে শুনল না। ফের হাঁকড়ে উঠলাম। তবু সে ফিরেও তাকাল না। তখন—

ফের বাধা দিয়ে প্রণবেশ বলল, কিরকম চেহারা ছেলেটার?

কী বলব স্যার, বললে বিশ্বাস করবেন না স্রেফ একটা নড়বড়ে কংকালের ওপর যেন চামড়া ঢাকা।

প্রণবেশ আবার আমার দিকে তাকাল।

পরনে কী ছিল?

অন্ধকারে ঠিক দেখতে পাইনি। তবে মস্ত লম্বা ঢিলে একটা ফতুয়া মতো। ড্রেসটাও স্যার অদ্ভুত।

বেশ তারপর?

দু'দুবার দাঁড়াতে বললাম। কিন্তু দাঁড়াল না দেখে রেগে ছুটে গেলাম ওর কাছে। বোধ হয় আমার জুতোর শব্দ পেয়ে ও একবারই শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। স্যার, বলতে গিয়ে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—তার দু'চোখ যেন টর্চের বাল্বের মতো জ্বলছিল। কোনো মানুষের দৃষ্টি ওরকম হতে পারে না। আর মুখ? স্রেফ একটা ছোট্ট মাথার খুলির ওপর চামড়া বসানো। গাল বলে কিছু নেই। যেন গালের মাংস কেউ চেঁচে তুলে নিয়েছে। কপালটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

তারপর?

যদিও আমার হাত ভয়ে কাঁপছিল তবু আমি বন্দুক তুলে ধরে তেড়ে গেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ও দৌড় লাগাল। সে দৌড়নো মানুষের মতো দৌড়নো নয়, বাতাসে সাঁতার কাটা। দু' মিনিটের মধ্যে সে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

এই পর্যন্ত বলে জগদীশ তার বক্তব্য শেষ করল।

মিনিট পাঁচেক আমরা কেউ কোনো কথা বলতে পারলাম না।

একটু পরে প্রণবেশ বলল, আর কিছু লক্ষ্য করেছিল?

জগদীশ একটু ভেবে বলল, ও যখন দৌড়ে দৌড়ে হাঁটছিল তখন আকাশের দিকে মুখ করে যেন স্যার বাতাস শুঁকতে শুঁকতে এগোচ্ছিল।

আর কিছু?

না স্যার।

আবার যদি ঐরকম কিছু দ্যাখো আমাদের জানাবে।

নিশ্চয় জানাব স্যার। তবে আর যেন ওকে দেখতে না হয়।

প্রণবেশ মুচকে একটু হেসে বলল, ঠিক আছে জগদীশ। তুমি এখন যেতে পার।

জগদীশ আবার আমাদের স্যালুট দিয়ে চলে গেল।

জগদীশ চলে গেলে আমরা দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম।

তারপর প্রণবেশই প্রথম কথা বলল, কী বুঝলে?

রহস্যময়।

যতই রহস্যময় হোক উনি যে রাজু সুব্বাই সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

কিন্তু ও কী করে কলকাতায় আসবে?

প্রণবেশ হেসে বলল, যেমন করে সুদূর নেপাল থেকে তোমাদের দেশের বাড়ি হরদেবপুরে এসেছিল।

এখানে আসার উদ্দেশ্য কি?

তাও বুঝতে পারছ না? যে কাজটা ও শেষ করবার আগেই কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলে, সেই কাজটি শেষ করার জন্যে।

অর্থাৎ আমাকে মারবার জন্যে?

সে তো আমার চেয়ে তুমিই ভালো করে জান।

কিন্তু রাস্তা খুঁজে খুঁজে এই সল্টলেকে এসে আমায় মারতে পারবে? একটা রোগা-পটকা কংকালের এতখানি ক্ষমতা? না প্রণবেশ, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না জগদীশ যাকে দেখেছিল সে সুব্বাই। অনেক কিছু ও বাড়িয়ে বলেছে। আসলে ও একটা রাস্তার ভিখিরির ছেলে ছাড়া আর কিছু নয়।

তাই যদি হয় তাহলে মঙ্গল। ঠিক আছে, এখন আমাদের চোখ রাখতে হবে খবরের কাগজে। গভীর রাতে আর কেউ ওকে অন্য কোথাও দেখতে পায় কিনা।

।। চার ।।

আবার জবর খবর

প্রায় প্রত্যেক দিন ভোরে বেড়ানো আমার অভ্যেস। বিশেষ করে এই সল্টলেকের ফাঁকা এ. জে. এলাকায় বেড়িয়ে খুব আনন্দ পাই।

আমি পুলিশে কাজ করলেও মনটা কবিত্বপূর্ণ। খোলা মাঠ, নীল আকাশ, ঘন মেঘ, ফুলের বাগান আমার খুবই প্রিয়।

যদিও বাসাটা আমার নিজের নয় তবুও আমার স্ত্রী বাড়ির সামনে সামান্য একটু জায়গা ঘিরে ছোট্ট একটি বাগান করেছেন। আর আমি ছাদের কার্নিসে সার দিয়ে সাজিয়ে রেখেছি নানা জাতের বাহারি ফুলের টব। যেমন—জারবেরা, বোগেনভেলিয়া, ফার্ন, গ্রাউন্ড অর্কিড—যার ছোটো ছোটো ভায়োলেট রঙের ফুল।

প্রতিদিন মর্নিং ওয়াক সেরে বাড়ি ঢোকার মুখে একবার করে আলসের ওপর রাখা সার সার টবগুলোকে দেখি। ভারি ভালো লাগে।

ফেরার পথে এক প্রতিবেশী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় গল্প করতে করতে দেরি হয়ে গেল। তবু বাড়ির গেটে এসে অভ্যাসমতো আলসের দিকে তাকালাম। দেখি একটা টব লাইন ছেড়ে

যেন সামনের দিকে সরে এসেছে। একটু অবাক হলাম। ভারী টবটা সরে এল কি করে? এর মধ্যে ঝড়বৃষ্টিও হয়নি যে ঝড়ের ধাক্কায় নড়েচড়ে যাবে।

যাই হোক ঐ সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। ঢুকেই অবাক—এই সাত সকালে প্রণবেশ এসে হাজির হয়েছে।

প্রণবেশ আমার সত্যিকার বন্ধু। আগে দেখাসাক্ষাৎ কম হতো। আমরা যে যার কাজ নিয়ে হিমশিম খাই। অন্য চাকুরেবাবুদের চেয়ে পুলিশ চাকুরেদের অনেক হ্যাপা। কিন্তু জুলাই মাসে দুজনেই এক মাসের ছুটি নিয়ে নেপাল বেড়াতে যাবার পর—আর ঐ রাজু সুব্বার হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে এখন আমাদের সম্পর্ক আরও নিকট হয়েছে। অফ-ডে থাকলে ও প্রায়ই সকালে আমার এখানে চলে আসে। আমিও মাঝে মাঝে ওর বাসায় যাই। কিন্তু এত সকালে ও কখনও আসে না।

কী হে! ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছ দেখছি! হেসে বন্ধুকে স্বাগত জানাই।

কিন্তু প্রণবেশ হাসল না। বেশ আদেশের সুরেই বলল, চুপটি করে এখানে বোসো। কথা আছে। তারপর আমার স্ত্রীকে বলল, বৌদি, এবার আমাদের চা দিন।

আমি মজা করে বন্ধুর অনুমতি নিয়ে বাইরের প্যান্ট-জামা ছাড়তে কয়েক মিনিটের জন্যে ভেতরে চলে গেলাম। পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরে, মুখ ধুয়ে যখন বাইরে ঘরে এসে বসলাম তখন দেখি গৃহিণী টোস্ট আর চা নিয়ে হাজির।

সবেমাত্র টোস্টে আরাম করে কামড় দিয়েছি অমনি প্রণবেশ ওর ব্রিফকেস থেকে সেদিনের কাগজখানা বের করে মাঝের পাতায় একটা খবরে দাগ দিয়ে গম্ভীর মুখে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

কাগজটা নিয়ে ঝুঁকে পড়লাম খবরটার দিকে। খবরটা এইরকম—

জীবন্ত কংকালের পুনরাবির্ভাব

গতকাল রাত দুটোর সময়ে দুজন সাংবাদিক খবরের কাগজের অফিসের ডিউটি সেরে গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলেন। নিঝুম রাত। জনশূন্য রাজপথ। শেয়ালদা ফ্লাইওভারের কাছে আসতেই তাঁদের চোখে পড়ে একটা তেরো-চোদ্দ বছরের কংকালসার ছেলে আকাশের দিকে মুখ করে বেলেঘাটা মেন রোডের দিকে জোরে হেঁটে চলেছে। সে হাঁটা সাধারণ মানুষের হাঁটার মতো নয়—যেন শূন্যে পা ফেলে দৌড়নো। গায়ে ছিল কালো রঙের হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা ফতুয়া। তার মাথাটা ছোটো। নারকেলের মতো। খাড়া খাড়া পাতলা চুল। কৌতূহলী সাংবাদিকরা তখনই সোজা না গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে বেলেঘাটা মেন রোডের দিকে চালান। গাড়ি যতই ছেলেটার কাছাকাছি হচ্ছিল, আশ্চর্যজনকভাবে ছেলেটা ততই দূরে সরে যাচ্ছিল। তারপরই ছেলেটা অন্ধকারে যেন মিলিয়ে গেল। ইতিমধ্যে তাঁরা ফ্ল্যাশে ছেলেটার অনেকগুলো ছবি তুলেছিলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড—একটা ছবিও ওঠেনি।...

খবরটা পড়ে আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না ঐ 'জীবন্ত কংকালটি' আর কেউ নয়—নেপালের সেই রাজু সুব্বাই, যে আমার দেশের বাড়িতে বার বার আমাকে মারবার চেষ্টা করেছিল। এখন সে আমাকে মারবার জন্যেই কলকাতায় এসে পড়েছে।

এখন বুঝতে পারছ কী সাংঘাতিক বিপদ এগিয়ে আসছে? প্রণবেশ আমার ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

আমার বেশি কথা বলার শক্তি ছিল না। শুধু মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম।

কিন্তু—

প্রায় ধমক দিয়ে প্রণবেশ বলল, এখনও 'কিন্তু'? এখনও সন্দেহ আছে নাকি?

আমি কোনোরকমে জুড়নো চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, সে কথা বলছি না। বলতে চাইছি—যে হাওড়ার দিক থেকে স্ট্র্যান্ড রোড, পোস্তা হয়ে চিৎপুর ক্রস করে বিবেকানন্দ রোড ধরে এগোচ্ছিল, সে হঠাৎ শেয়ালদা ফ্লাইওভারের কাছে এল কেন?

প্রণবেশ বলল, আমার ধারণা ও সল্টলেকে পৌঁছুবার ঠিক পথটা ধরতে পারছে না। একটা জিনিস লক্ষ্য কোরো, জগদীশ ঘোষও বলেছিল আকাশের দিকে মুখ করে ছুটছিল। তার মানে কি? নিশ্চয় আকাশের শোভা দেখতে দেখতে যাচ্ছিল না।

আমি বললাম, তা অবশ্যই নয়।

তাহলে?

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, বুঝতে পারছি না।

প্রণবেশ বলল, আমার ধারণা ও বাতাসে তোমার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে যাচ্ছিল।

কিন্তু দেশের বাড়িতে তো ও বেশ কিছুদিন ছিল। কই তখন তো ওরকম করে চলেনি?

প্রণবেশ বলল, ভুলে যাচ্ছ বন্ধু, তখন তোমায় খোঁজার দরকার হয়নি। তুমি ছিলে ওর নাগালের মধ্যে।

আমি চুপ করে রইলাম। ভাবছিলাম প্রণবেশের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আমরা কি সত্যিই কলকাতা শহরে আছি, না কোনো অলৌকিক জগতের বাসিন্দা হয় গেছি?

প্রণবেশ স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে বলল, হাওড়ার দিক থেকে সল্টলেকে আসার অনেকগুলো পথ আছে। তার মধ্যে বিবেকানন্দ রোড, মানিকতলা হয়ে ভি. আই. পি. রোড ধরেও যেমন আসা যায় তেমনি শেয়ালদা উড়ালপোলের ক্রসিং থেকে শেয়ালদার পাশ দিয়ে বেলেঘাটা রোড দিয়ে ভি. আই. পি. রোড ধরেও আসা যায়। মনে করে দ্যাখো এই ক'দিনের মধ্যে তুমি নিশ্চয় ঐ দুটো পথ দিয়েই যাতায়াত করেছ।

বললাম, তা করেছি। অনেক বারই করেছি।

ব্যস। তা হলে তো অংক মিলেই গেল।

আমি খানিকটা হতাশার সুরে বললাম, এ কথাটাই তাহলে তুমি আমায় বোঝাতে চাচ্ছ—সেই তান্ত্রিক আমাকে এখনও ছাড়েনি। রাজু সুব্বাকে লেলিয়ে দিয়েছে কলকাতাতেও। সে পথ না চিনলেও শিকারী কুকুরের মতো বাতাসে আমার যেটুকু গন্ধ এখনও মিশে আছে তাই

শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে আসছে।
প্রণবেশ গম্ভীরভাবে বলল, হ্যাঁ।
আমি অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরালাম।
কিন্তু—একটা কথা—
বলো।
হরদেবপুর থেকে ও কলকাতায় এল কি করে? ট্রেনে?
প্রণবেশ হেসে বলল, ট্রেনে যদি আসতে পারতো তাহলে সেদিনই ছুটে এসে ট্রেনে উঠে পড়তো। তোমার মনে আছে কি অম্বুজ লাহিড়ি একটা কথা বলেছিলেন, আমরা যাদের অলৌকিক জীব বা ভূতজাতীয় কিছু বলি তারা অনেক কিছু করতে পারলেও সব কাজ তারা করতে পারে না বা সব জায়গায় তারা যেতে পারে না। কিছু বাধা থাকেই। এটাই রক্ষে। তাই অন্তত ট্রেনে, বাসে, ট্যাক্সিতে সাধারণ মানুষের মতো এরা উঠতে পারে না। এরা পথ ধরেই আসে। অবশ্যই সে পথ নির্জন হওয়া চাই। আর চাই অন্ধকার রাত।
এইখানে আমার একটা পয়েন্ট জানার আছে।
প্রণবেশ বলল, কি তোমার পয়েন্ট বলো।
শুধু রাত্রেই যদি ও হেঁটে আসে তা হলে দিনে কোথায় থাকে?
প্রণবেশ চমকে উঠে বলল, দারুণ পয়েন্টটা তো তুমি তুলেছ! এটা তো আমার মাথায় আসেনি!
বললাম, বুঝতেই পারছি একটা অদ্ভুত ধরনের বিপদ এসে পড়েছে। এখন দেখতে হবে সুব্বা দিনের বেলায় কোথায় থাকে। নিশ্চয় ভি. আই. পি. রোড দিয়ে বেলেঘাটা মেন রোডে ভালো করে খুঁজলে তার সন্ধান পেয়ে যাব। কাজেই চলো এখুনি আমরা জিপটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।
প্রণবেশ বলল, খুব ভালো কথা বলেছ। কিন্তু তার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে। লোকে গাঁজাখুরি ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেবে এই ভয়ে এখন আর মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকলে চলবে না। দু'দিন কাগজে তো খবর বেরিয়েই গেছে। এবার সব থানায় পুলিশদের হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। সব আগে লালবাজারকে জানাতে হবে। আর যে কাগজে এই খবরগুলো ছাপা হয়েছে তাদের কাছ থেকে জানতে হবে লোকে খবরটা পড়ে কিছু বলছে কিনা। অর্থাৎ সারা কলকাতা শহরে একটা হৈচৈ তুলতে হবে। আর সেটা করতে হবে আজ দুপুরের মধ্যেই। কেননা আর সময় নেই। এই বলে প্রণবেশ উঠে পড়ল।
বললাম, কখন আসছ তাহলে?
প্রণবেশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, বেলা একটায়।
ঠিক আছে। আমি রেডি হয়ে থাকব।
প্রণবেশকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসছি, ছাদের কার্নিসের দিকে লক্ষ্য পড়ল। চমকে উঠলাম—সেই টবটা লাইন থেকে আরও খানিকটা বেরিয়ে এসেছে।

॥ পাঁচ ॥

জীবন্ত কংকালের সন্ধানে

কাঁটায় কাঁটায় বেলা একটার সময়ে প্রণবেশ জিপ নিয়ে হাজির হলো। আমিও রেডি হয়ে ছিলাম। বেরোতে যাচ্ছি, প্রণবেশ বলল, দাঁড়াও একটা ফোন করে নিই।
বলে যে দুটো কাগজে দু'দিন খবরটা বেরিয়েছিল তার একটাতে ফোন করল। রিং হাতেই প্রণবেশ নিউজ এডিটার পরিতোষ শীলকে চাইল।
পরিতোষ প্রণবেশের অনেক দিনের চেনা। প্রণবেশের গলা পেয়ে পরিতোষ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।
কি খবর ও.সি. সাহেব? হঠাৎ খবরের কাগজে হামলা? বেয়াড়া কোনো খবর ছেপেছি নাকি?
ঠিক ধরেছ। হেসে বলল প্রণবেশ, আজকাল গাঁজায় দম দিয়ে খবর ছাপছ নাকি?
না, এখনও গাঁজার তেমন আমদানি হয়নি। তবে শীগগির হবে।
কিরকম?
সামনের সপ্তাহে বারাণসীতে কি এক মহাযোগে পুণ্যস্নান আছে। দলে দলে সাধু-সন্ন্যাসী আসতে শুরু করবে। আর তখনই তাঁদের গাঁজার ধোঁওয়ায় সারা কলকাতা অন্ধকার হয়ে যাবে।
পরিতোষের রসিকতায় গুরুত্ব না দিয়ে প্রণবেশ বলল, দু'দিন ধরে হঠাৎ ঐসব ভুতুড়ে ব্যাপার ছাপতে আরম্ভ করলে কেন? বেশি কাগজ বিক্রির লোভে?
ভুতুড়ে ব্যাপার! ও জীবন্ত কংকালের কথা বলছ তো?
হ্যাঁ।
কি জানি যে খবর আমরা পেয়েছি তা শুধু অবিশ্বাস্য নয়, অকল্পনীয়। আমাদের স্টাফ রিপোর্টার নিজে চোখে দেখেছে। তাও একজন নয় দুজন। আর অবাক কাণ্ড—এতগুলো ছবি তুলল কিন্তু একটা ছবিও উঠল না।
প্রণবেশ হেসে বলল, কেন বলো তো?
পরিতোষ চাপা গলায় বলল, স্টাফ রিপোর্টারদের মতে চামড়া ঢাকা কংকালটার নাকি শরীর বলে কিছু ছিল না। নইলে একটি ছবিও উঠত না?
প্রণবেশ বলল, তা খবরটা দেখে পাবলিক কি বলছে?
উঃ! আর বোলো না। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসছে ঘটনাটা কতখানি সত্যি তা জানতে।
উত্তর কী দিচ্ছ?
বলছি প্রত্যক্ষদর্শীরা যা দেখেছে তাই খবর করে দিয়েছি। ওরা জানতে চায় জীবন্ত কংকালটা কোন দিকে যাচ্ছে। সেটা আর আমি কি করে বলব বলো। আমার সঙ্গে তো কংকালটার কথাবার্তা হয়নি। চোখে দেখারও সুযোগ হয়নি।
কোথায় যাচ্ছে সে খবরটা হয়তো তোমাকে দিতে পারব।
অ্যাঁ! বল কী! ঠাট্টা করছ না তো?
না। ঠাট্টা করলে তোমায় ফোন করে প্রসঙ্গটা তুলতে যাব কেন? দিন দুই অপেক্ষা করো। চমকে ওঠার মতো খবরটা তোমাকেই আগে দেব।
বলে প্রণবেশ রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।
কী ব্যাপার? হঠাৎ খবরের কাগজে ফোন?
জেনে নিলাম কলকাতার মানুষ খবরটা জেনেছে। এটাই চাইছিলাম।
প্রণবেশ আর আমি জিপ নিয়ে

বেরিয়ে গেলাম। প্রথমে লালবাজার। সেখানে পুলিশের বড়ো কর্তারা আমাদের মুখে নেপাল থেকে হরদেবপুর পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা শুনে অবাক। তাঁরা কখনোই এ সব ঘটনা বিশ্বাস করতেন না। গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু যেহেতু আমরা দুজনেই পুলিশে গুরুত্বপূর্ণ পদে আছি, যেহেতু আমরা দুজনেই প্রত্যক্ষদর্শী আর দু'দিন দু'দুটো নামী কাগজে তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর খবর ছাপা হয়েছে সেজন্যে তাঁরা ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। এটা যে সত্যিসত্যিই ভৌতিক বা অলৌকিক ব্যাপার তা পুরোপুরি না মানলেও জীবন্ত কংকালটাকে খুঁজে বের করবেনই সে আশ্বাস দিলেন। এবং আমাদের সামনেই কলকাতার সমস্ত থানাকে—বিশেষ করে বেলেঘাটা আর উল্টোডিঙ্গি থানাকে জানিয়ে দিলেন রাস্তায় সতর্ক দৃষ্টিতে যেন লক্ষ্য করা হয় ঐরকম কংকাল জাতীয় কিছু দেখতে পাওয়া যায় কিনা।

আমরা দুজনেই খুশি হলাম। অলৌকিক হোক বা না হোক দায়িত্বটা এখন শুধু আমাদের দুজনের রইল না। পুলিশ টেক-আপ করেছে। কাজেই আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত।

এছাড়া পাবলিকও কাগজ-মারফৎ জেনে গেছে ব্যাপারটা। কাজেই কোথাও যদি জীবন্ত কংকালটাকে কেউ দেখতে পায় তাহলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা জনসাধারণই নেবে কিংবা থানায় জানিয়ে দেবে। আমাদের আর ভাবতে হবে না।

পাবলিক যে এই ব্যাপার নিয়ে কতটা মেতে উঠেছে, বেলেঘাটা মেন রোডে ঢুকতেই তা বুঝতে পারলাম।

যদিও তখন বেলা প্রায় তিনটে—রাস্তায় লোকজন কম তবু দু'ধারের ফুটপাথে লোকের জটলা। বোঝা গেল আজকের কাগজেই খবরটা পড়ে তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একজন বলছে, সব গাঁজা। খবরের কাগজগুলো পর্যন্ত আজগুবি খবর ছড়াচ্ছে।

আর একজন প্রতিবাদ করে বলছে, এর আগেও অন্য কাগজে এইরকম খবর বেরিয়েছে। বাজে কথা হলে দু'দুটো বড়ো কাগজে এরকম খবর ছাপা হয়?

আমরা জিপটা থামিয়ে নেমে পড়লাম।

পুলিশ দেখে ওদের কথাবার্তা থেমে গেল। প্রণবেশ এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনারা যা নিয়ে আলোচনা করছেন, আমরাও সে বিষয়ে খোঁজ নিতে বেরিয়েছি। লালবাজার সমস্ত থানাকে জানিয়ে দিয়েছে রাতে হোক দিনে হোক এইরকম কাউকে দেখলে তখনই যেন ধরবার চেষ্টা করে।

পুলিশের মুখ থেকে এই কথা শুনে ওরা খুব উৎসাহ পেল। বলল, আমরা স্যার, ঠিক করছি রাতের বেলা রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দেব।

ইতিমধ্যে পুলিশ দেখে আরও লোক জড়ো হয়ে গেছে।

প্রণবেশ বলল, একটা জিনিস মনে রাখবেন—ঐ যার কথা বলা হচ্ছে সে আপনাদের বেলেঘাটায় থাকতে আসেনি। আমরা জেনেছি তার লক্ষ্য সল্টলেক। বেলেঘাটা রোড ধরে ভি. আই. পি. রোডের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু গভীর রাত ছাড়া সে এগোতে পারে না। কাল রাতে এই রাস্তা দিয়ে পাস করেছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, আমরা দুটো মোটরবাইক নিয়ে ভি. আই. পি. রোডটা দেখে আসতে পারি।

বললাম, সে তো আমরাও জিপে করে যেতে পারি। তা নয়। দিনের বেলায় সে এগোয় না। কাজেই এখন এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

এ কথা শুনে সবাই যেন চনমন করে উঠল।

তা হলে স্যার, আমরা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি?

এমন সময় ভিড়ের ভেতর থেকে একটা অল্পবয়সী ছেলে বলে উঠল, একটু আগে একজনকে একটা ভাঙা পুরনো বাড়ির কার্নিসের ওপর শুয়ে থাকতে দেখেছি।

প্রণবেশ চমকে উঠে বলল, কিরকম দেখতে?

ছেলেটা বলল, ভালো করে দেখতে পাইনি। শুধু দুটো সরু সরু কালো পা দেখতে পেয়েছি। ভাবলাম নিশ্চয় কোনো পাগল।

প্রণবেশ ব্যস্ত হয়ে বলল, কতক্ষণ আগে দেখেছ?

আধঘণ্টা আগে।

জায়গাটা কোথায়?

আর একটু আগে। শেতলা মন্দিরের কাছে।

তুমি আমাদের সঙ্গে জিপে উঠে এসো।

ছেলেটাকে জিপে তুলে নিয়ে আমরা শেতলা মন্দিরের দিকে চললাম। আর একদল ছেলে-ছোকরা লাঠি, টাঙ্গি হাতে নিয়ে হৈ হৈ করে আমাদের পিছনে ছুটে আসতে লাগল।

শেতলাতলা ওখান থেকে বেশি দূরে নয়। আলোছায়া সিনেমা হলের পরেই। তার একটু দূরেই ভি. আই. পি. রোড চলে গেছে উল্টোডিঙ্গি। আর বাইপাস পার হলেই সল্টলেক। ইস্টার্ন বাইপাসকে ডান দিকে ফেলে যে রাস্তাটা সেটাই হলো সল্টলেকে ঢোকার প্রধান পথ।

ছেলেটাই বলেছিল, এখানেই নামুন। সেইমতো আমরা নেমেছিলাম। জায়গাটা আলোছায়া সিনেমা হল আর শেতলা-তলার মাঝখানে। এখানে মেন রোড থেকে বাঁ দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। আর সেই রাস্তার সামনেই একটা বিরাট তিনতলা বাড়ির জীর্ণ কংকাল দাঁড়িয়ে। ছেলেটার পিছু পিছু আমরা এগিয়ে চললাম। ছেলেটা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। ভাঙা পাঁচিলঘেরা কম্পাউন্ডের মধ্যে বাড়িটা। একতলার জানলা-দরজা সব উধাও। দোতলার বিবর্ণ জানলা যে-কটা সামনে থেকে দেখা গেল সবই বন্ধ। তিনতলার ওপর বিরাট লম্বা ছাদ। ছাদের আলসেতে ছোটো ছোটো গাছ, ঘাস গজিয়েছে। বাড়ির পিছনে মস্ত একটা বটগাছ। বোঝা যায় বাড়িটার সামনে-পিছনে যতই আধুনিকতার প্রলেপ দেওয়া হোক না কেন জায়গাটা আসলে খুবই পুরনো।

ছেলেটার সাহস আছে বলতে হবে। কিংবা জীবন্ত কংকাল সম্বন্ধে কোনো খবর রাখে না। সে জানে শুধু একটি পাগলই বোধ হয় ঐ পাঁচিলের ওপর শুয়ে আছে। পাগল না হলে কেউ সরু

পাঁচিলের ওপর শুতে পারে?

ছেলেটা দিব্যি কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে ছাদের দিকে তাকাল। তারপর হতাশ হয়ে বলল, নাঃ, নেই। চলে গেছে। একটু আগেও ছিল।

চলে গেছে? প্রণবেশ যেন চুপসে গেল।

ছেলেটা বলল, তাই তো মনে হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি না। তবে কাছেই কোথাও আছে—নিশ্চয় আছে। একটা চিমসে গন্ধ পাচ্ছেন না? গন্ধটা আমি তখনও পেয়েছিলাম।

সত্যিই একটা চিমসে গন্ধ গলিতে ঢোকার পর থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল।

প্রণবেশ বলল, ছাদে ওঠা যাবে না?

ছেলেটা মাথা দুলিয়ে বলল, যাবে। তবে চলো।

এই সময়ে পেছনে যারা লাঠিসোটা নিয়ে আসছিল তারা হল্লা করতে করতে এসে পড়ল। সত্যি কথা বলতে কি বাড়িটার ভেতরে ঢুকতে অন্তত আমার খুব ভয় করছিল। এখন এত লোক দেখে সাহস হলো।

পেছনের লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠল, আমরাও ওপরে উঠব।

আমরা ওদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে সবে মাত্র ভেতরের দিকে পা বাড়িয়েছি এমনি সময় তেতলার ছাদ থেকে কি যেন লাফিয়ে পড়ল বটগাছের ওপর।

এক মুহূর্তের জন্যেই দেখতে পেয়েছিলাম বস্তুটাকে। কোনো কিশোরও নয়, জীবন্ত কংকাল নয়, শুধু লম্বা কালো মতো একটা কিছু—যা মানুষ নয়, বাঁদর বা অন্য কোনো জীবের সঙ্গেও কিছু মাত্র সাদৃশ্য নেই। সেই বস্তুটা গাছের ওপর লাফিয়ে পড়া মাত্র—সমস্ত গাছটা ঝাঁকানি খেল। কতখানি ভারী বস্তুর ধাক্কা খেলে অত বড়ো গাছটা অমন নড়ে উঠতে পারে ভেবে অবাক হলাম। তবু কী বিশ্বাস করতেই হবে বস্তুটা আমাদের সেই চেনা তেরো-চোদ্দ বছরের রাজু সুব্বারই জীবন্ত কংকাল? অসম্ভব।

এদিকে বস্তুটাকে যারা গাছে লাফ দিতে দেখেছে তারা হৈ হৈ করে

বটগাছের নিচে ছুটে গেল। কিন্তু ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে সবাই মিলে খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না—চোখের দেখাও নয়।

।। ছয় ।।

দুর্ভেদ্য দুর্গ

বাড়িতে ভয়ের একটা কালো পর্দা নেমে এসেছে। নোটনের মা সব শুনেছেন। তিনি শুধুই বলেন, কি হবে গো? রাজু শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেও ধাওয়া করে এল? তাহলে কি আমাদের বাড়িও খুঁজে পাবে?

এর উত্তর আমি আর কি দেব? যে ভি. আই. পি. রোড পর্যন্ত আসতে পেরেছে সে যে এখানেও আসবে না তা কি করে বলি? তাই চুপ করে থাকি।

মনে মনে এও বুঝেছি, যে আসছে সে এখন আর আমাদের আগের রাজু সুব্বা নয়, যেন অন্য কেউ—আরও হিংস্র—আরও ভয়ানক।

সকালবেলাতেই প্রণবেশ চলে এসেছে আমাদের বাড়ি। লক্ষ্য করছি ক্রমশই দুর্ভাবনায় ওর মুখের ভাব বদলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার চেয়ে যেন ওরই ভয় বেশি। ওই যেন আমাকে বাঁচাবার সব দায়িত্ব নিয়েছে। আর আমি? আমি যে কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। বন্ধুর ওপরই সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।

প্রণবেশ সকালে এসেই দার্জিলিঙে অম্বুজ লাহিড়িকে ফোন করেছিল। উনি এখন দার্জিলিঙে রয়েছেন। কিন্তু উনি কোথায় বেরিয়েছেন। ঘণ্টাখানেক পরে আবার ফোন করা হবে।

অম্বুজবাবুকে যে এই পরিস্থিতিটা এখনই জানানো উচিত এটাও আমার মাথায় আসেনি। আমি পুলিশ অফিসার। তাই বোধ হয় ভেবে নিয়েছি, লালবাজার যখন দায়িত্ব নিয়েছে তখন আর ভাবনা নেই। ওরাই আমাকে বাঁচাবে। একটা অতি সত্য ব্যাপার যেন বুঝেও বুঝছি না যে, এটা খুনে-ডাকাতের ব্যাপার নয় যে পুলিশ ব্যবস্থা করবে। এ যে কী বিস্ময়কর ব্যাপার তা তো কালকেই স্বচক্ষে দেখলাম। ভাঙা বাড়ির তিন তলার পাঁচিলে শুয়ে থাকতে না দেখলেও ছাদ থেকে বটগাছে লাফিয়ে পড়তে যাকে দেখলাম সে কী আমাদের গ্রামের বাড়ির সেই রাজু সুব্বাই! রাজুও ছাদের পাঁচিলের ওপর দিয়ে হাঁটত। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আমগাছের ডাল ধরে ঝুলত ঠিকই কিন্তু সে যেন আমার ছেলে নোটনেরই বন্ধু। কিন্তু কাল যাকে মুহূর্তের জন্যে দেখলাম? তার তো মানুষের আকৃতিও নয়। চার ফুট লম্বা কালো একটা বস্তু। অথচ তারই ভারে অত বড়ো বটগাছটা কেঁপে উঠেছিল।

আবার গত দু'দিন ধরে গভীর রাতে রাস্তায় যাকে দেখা গিয়েছিল তার মানুষের আকৃতি ছিল। তার বর্ণনা শুনে মনে হয়েছিল সে রাজু সুব্বাই।

তাহলে কাল দুপুরে যাকে দেখা গেল সে কি অন্য কিছু? আর অন্য কিছুই যদি হয় তাহলে সেটা কী?

আশ্চর্য! এই সব প্রশ্ন যখন প্রণবেশকে করেছি ও কোনো উত্তরই দেয়নি। শুধু ওর কপালে দুশ্চিন্তার একটার পর একটা রেখা ফুটে উঠেছিল।

প্রণবেশ এতক্ষণ টেলিফোনের সামনে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে

যাচ্ছিল। এবার ঘড়িটা দেখল। বোধহয় এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। ও টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল আর তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে নিয়ে সাড়া দিল, হ্যালো! হ্যাঁ, আমি প্রণবেশ। এক ঘণ্টা আগে আপনাকে ফোন করেছিলাম। তারপর ও সমস্ত ঘটনা বলে গেল।

টেলিফোনের শব্দ শুনে আমার স্ত্রীও এসে দাঁড়িয়েছেন, মুখে-চোখে এক রাশ উদ্বেগ নিয়ে।

দার্জিলিঙ থেকে অম্বুজবাবু সব শুনে কিছু বলে যাচ্ছেন আর প্রণবেশ আমার প্যাডে খসখস করে তা লিখে নিচ্ছে।

প্রায় দশ মিনিট পর প্রণবেশ টেলিফোন রেখে আমার দিকে তাকাল। বলল, নষ্ট করার মতো আর একটা মিনিটও সময় নেই। শীগগির একজন ছুতোর ডাকো।

ছুতোর!

হ্যাঁ। অম্বুজবাবু বলছেন ভয়ংকর বিপদ। জীবন্ত কংকালটা এখানে এসে পড়বেই। আর তা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। বাঁচার একমাত্র পথ—এর মধ্যে বাড়ির সমস্ত জানলা-দরজায় কাচ বসাতে হবে। অর্থাৎ কাচের দরজা-জানলা। আর জানলা- দরজার ফ্রেমও বদলাতে বলছে। নতুন করে যে কাঠ দিতে বলছে তা শুধু তিব্বতেই পাওয়া যায়। সে কাঠ এখানে পাওয়া সম্ভব নয়। তার বদলে নিমকাঠের ফ্রেম করা চলবে। কিন্তু সব জানলা-দরজার ফ্রেম এত তাড়াতাড়ি বদলানো যাবে না। তাই উনি বলছেন প্রত্যেক দরজা-জানলায় এক টুকরো নিমকাঠ লাগিয়ে দিতে। আর দরজা-জানলা রাত্তিরে কোনো কারণেই খোলা রাখা যাবে না।

আমি হাঁ করে ওর কথা শুনছিলাম। ও আমার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, আর বসে থাকলে চলবে না। চলো ছুতোরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি।

বেলা দশটার মধ্যেই একসঙ্গে পাঁচ জন ছুতোর এসে কাজে লেগে পড়ল। সারা দিন-রাত কাজ করবে। ডবলেরও বেশি মজুরি দিতে হবে। আমি তাতেই রাজী হয়েছি। সারা দুপুর কাঠ কাটা, হাতুড়ি ঠোকার খটাখট শব্দ। এদিকে পাড়ার লোকেও সন্ত্রস্ত। তারাও কাগজে জীবন্ত কংকালের খবর পড়েছে। তিনি সল্টলেকের দিকে আসছেন এটা জেনেই ভয়ে কাঁটা। তারপর যখন শুনল কংকালটার টার্গেট আমাদের এই বাড়িটা তখন তাদের মুখের কথাও বন্ধ হয়ে গেল। কংকালটা তাহলে একেবারে তাদের বাড়ির পাশে এসে পড়বে! ভুল করে যদি অন্য কারও বাড়ি ঢুকে পড়ে? তারপর যখন তারা দেখল আমার বাড়ির দরজা-জানলা কাচের করা হচ্ছে তখন তাদের ভয় আরও বেড়ে গেল। আত্মরক্ষার জন্যে যদি একজন পুলিশ অফিসারের বাড়ির দরজা-জানলা হঠাৎ কাচ দিয়ে মুড়তে হয় তাহলে কী ভয়াবহ ঘটনা আজ কালের মধ্যে ঘটতে চলেছে!

বিকেল চারটে।

আজ ছুটি নিয়ে জানলা-দরজায় কাচ লাগানোর তদারকি করছি—পাড়ার প্রৌঢ় উমেশ সান্যাল এসে দাঁড়ালেন। ভাবলাম আর-সবাইয়ের মতো উনিও বুঝি কাচ লাগানো দেখতে এসেছেন। কিন্তু না—তিনি ভারী গলায় বললেন, বিপদের ওপর বিপদ ডেকে আনতে চান?

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

শখ করে না হয় ছাদের আলসেতে ফুলগাছের টব বসিয়েছেন। কিন্তু একটা টব যে আলসে থেকে ঝুলছে সে খেয়াল রেখেছেন? কারো মাথায় পড়লে কি?

টবের কথায় চমকে উঠলাম। টবের সারি থেকে একটা টব যে খানিকটা বেরিয়ে এসেছিল, ক'দিন আগে তা দেখেছিলাম। তারপর আর খেয়াল করিনি। উমেশবাবুর কথায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে যা দেখলাম তাতে চক্ষুস্থির! সেই টবটা লাইন ছেড়ে বেরিয়ে এসে একেবারে কার্নিসের ধারে পৌঁছেছে। আমি এতই ঘাবড়ে গেলাম যে উমেশবাবুর সামনেই চিৎকার করে উঠলাম—কেমন করে এটা সম্ভব?

।। সাত ।।

ঘোরের মধ্যে সারাদিন

পরের দিন সকাল সাতটা।

একটা জিপ এসে দাঁড়াল। বুঝলাম প্রণবেশ এসেছে। ও এত সকালে এলে আমার কেমন ভয় করে। না জানি কী দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে।

খুব ব্যস্তভাবে ঢুকল প্রণবেশ। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম।

ও কোনো ভূমিকা না করে বলল, শীগগির আমার জিপে ওঠো।

ভয়-উদ্বেগ মেশানো গলায় বললাম, কেন?

কথা বাড়িও না। উঠে পড়ো।

তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে জিপে উঠে পড়লাম। পনেরো মিনিটের মধ্যে জিপ এসে থামল ইস্টার্ন বাইপাসের মুখে। নেমে পড়লাম জিপ থেকে। রাস্তার মাঝখানে বেশ ভিড় জমে আছে। সশস্ত্র পুলিশও রয়েছে। খবরের কাগজের লোকেরাও এরই মধ্যে ছুটে এসেছে।

ভিড় ঠেলে প্রণবেশ আমাকে নিয়ে গেল জায়গাটায়। ভেবেছিলাম না জানি কী বড়োরকম দুর্ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু সেরকম কিছু নয়। একটা কুকুর পড়ে আছে। মাথাটা তার থ্যাঁতলানো।

এ আর আশ্চর্য কী! রাত্তির বেলায় রাস্তার একটা কুকুর গাড়ি চাপা পড়েছে।

কিন্তু একটু পরেই ভুল ভাঙল যখন প্রণবেশ একটা লাঠি দিয়ে মরা কুকুরটাকে চিৎ করে দিল। দেখলাম তার পেটটা কেউ যেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে চিরে ফেলেছে। নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে এসেছে।

বুঝতে পারলে কিছু? প্রণবেশ আমার দিকে তাকাল।

বললাম, এ তো গাড়ি চাপা পড়ে মরা নয়। কুকুরটার পেট চিরে কেউ মেরেছে। তারপর আক্রোশে মাথাটা থেঁৎলে দিয়েছে।

বুঝতে আর অসুবিধে হলো না। শুধু বললাম, তাহলে সুব্বা সল্টলেকের মুখে ঢুকে পড়েছে।

. হ্যাঁ। কুকুরটা বোধহয় অদ্ভুত কিছু দেখে তাকে বিরক্ত করছিল—তারই প্রতিফল।

কেমন একটা আচ্ছন্নের মতো বাড়ি এসে ঢুকলাম। তাহলে সত্যিই আর

রেহাই নেই। এখন তাহলে দিন-রাত দরজা-জানলা বন্ধ করে বাড়িতে বসে থাকা। কিন্তু তাই বা সম্ভব কি করে? ডিউটি আছে। ভূতের ভয়ে ছুটি নিয়ে বাড়ি বসে থাকা তো যাবে না।

আশ্চর্য! সারা দিনটা যেন কেমন ঘোরের মধ্যে রইলাম। নোটন ইস্কুলে গেছে। আমার স্ত্রী গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে রান্নাবান্না করে চুপচাপ বিছানায় গিয়ে শুলেন। সারা দুপুর একটা কাক বাড়ির ছাদে বসে কা-কা করে ডেকেই চলল। সামনের বাড়ির দেওয়াল থেকে একটা চাঙর আচমকা ভেঙে পড়ল। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে এসবই আমি দেখে যাচ্ছি। কিন্তু যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা।

হঠাৎ আমার মনে হলো আমি যেন নেপালের কাঠমাণ্ডু থেকে জিপে করে চলেছি সেই পাহাড়তলীতে যেখানে সেই নিষ্ঠুর তান্ত্রিককে দেখেছিলাম। সেই পাইনগাছে ঘেরা উঁচু উঁচু পাহাড়। জিপ কখনো উঠছে—কখনো নামছে... তারপরই দেখলাম সেই ছেলেটাকে কয়েকজন পাহাড়ী বিষ্ণুমতি নদীতে স্নান করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলি দেবার জন্যে। পাহাড়ের গুহা থেকে খাঁড়া হাতে বেরিয়ে এল সেই নিষ্ঠুর তান্ত্রিক—পেছনে গুহার গায়ে বাঁশের খুঁটোয় ঝুলছে চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলের সেই কংকালটা...তান্ত্রিক বলি দেবার জন্য খাঁড়া তুলল...আমি বলে উঠলাম, প্রণবেশ—ফায়ার—

চমকে উঠলাম। কোথায় চলে গিয়েছিলাম আমি? এ তো শুধু ভাবা বা মনে করা নয়, সত্যিই যেন কেউ আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে নিয়ে গিয়েছিল কাঠমাণ্ডুতে। না, ভুল। এই তো আমি আমার ঘরেই বসে রয়েছি ইজিচেয়ারে। তাহলে এমন হলো কেন?

হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে দেখি এই বেলা চারটেতেই চারিদিকে যেন ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে। আশেপাশের বাড়িগুলো যেন আর নেই। অদৃশ্য। তার জায়গায় শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। একটা কোনো মানুষ-জন নেই—ছেলেদের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে না...কি হলো? কোথায় গেল সব? আমি কেমন ভয় পেয়ে ডেকে উঠলাম, নোটন!

নোটনের মা ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ওরকম করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

আমি অপ্রস্তত হয়ে বললাম, না। ওকে দেখছি না যে?

ও তো এই মাত্র খেলতে গেল।

বললাম, চারিদিকে ধোঁয়া। এর মধ্যে ও বেরোল কেন?

নোটনের মা বললেন, ধোঁয়া! ধোঁওয়া কোথায়? স্বপ্ন দেখছ নাকি?

স্বপ্ন! যাক নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু এরকম দেখলাম কেন?

আমার স্ত্রী তখনও দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ টেবিলের ওপর নজর পড়ল। চমকে উঠে বললাম, আচ্ছা, টেবিলে ওটা কি?

কোনটে?

ঐ যে!

ওটা তো সিগারেটের প্যাকেট।

সিগারেটের প্যাকেট! ও আচ্ছা।

কি হয়েছে তোমার?

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম। বললাম, না, কিছু হয়নি। আমি একটু ঘুরে আসি।

দাঁড়াও। চা করে দিই।

আমি চা খাইনি?

এই তো সাড়ে চারটে। এখনই তো চা খাও।

তবে দাও। বলে ফের ইজিচেয়ারে বসে পড়লাম।

চা খেয়ে বেরোতে যাচ্ছি স্ত্রী বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু। সন্ধ্যে হয়ে না যায়।

বললাম, এখুনি ফিরব।

বেরোতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সারা দুপুর যে ঘোরের মধ্যে ছিলাম সেই ঘোরটাকে কাটাবার জন্যেই জোর করে বেরোলাম। বুঝতে পারছিলাম না আজ আমার মনটা কেন ওরকম হচ্ছিল।

একে সল্টলেক জায়গাটাই ফাঁকা। তার ওপর আমাদের এ. জে. ব্লকটা আরও ফাঁকা। কে বলবে এটা কলকাতা শহর! এখন এই পড়ন্ত বেলায় রাস্তাগুলো যেন বড়োই নির্জন বলে মনে হচ্ছে। অথচ অন্যদিন তেমন মনে হতো না। তবে কি জীবন্ত কংকালের ভয়ে সবাই এরই মধ্যে বাড়ি ঢুকে গেছে? আশ্চর্য! এমন সাজানো-গোছানো সল্টলেক সিটি—এত সুন্দর সুন্দর বাড়ি—কল্পনা করা যায় গভীর রাতে এই পথেই হবে ভয়ংকর জীবন্ত কংকালের আবির্ভাব?

অবশ্য—অবশ্য সল্টলেক না হয় আজই সুন্দরী সিটি হয়েছে কিন্তু আজ থেকে মাত্র ছত্রিশ বছর আগে এই জায়গাটা ছিল বিস্তীর্ণ জলাজমি। মাছ চাষের ভেড়ি। তখনকার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় ১৯৬২ সালে শুরু হলো গঙ্গার পলিমাটি দিয়ে সল্টলেক ভরাট করার কাজ। ১৯৬৪ সালে বালি দিয়ে ভরাট করে গড়ে ওঠে লবণহ্রদ। জোব চার্নকের পর এই প্রথম কলকাতা তার পূর্ববর্তী জলাভূমির নাগপাশ ভেদ করে নতুন রূপ নিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠল। তারপর আর চার বছরের মধ্যে সেই পরিত্যক্ত জলাভূমির জায়গায় দেখা দিল এক আদিগন্ত সমতলভূমি। চাঁদের পিঠের মতো রুক্ষ—প্রাণীশূন্য। লবণহ্রদের পাঁচ বর্গমাইল প্রান্তরে কোথাও এতটুকু ছায়া নেই—শুধু এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছেটানো কন্ট্রাকটারদের টিনের চালা। এক ফোঁটা পানীয় জল নেই কোথাও—না আছে পাখি, না প্রজাপতি—না একটা ফড়িং। সেদিন তখনও রাস্তাঘাট তৈরি হয়নি, যানবাহনের প্রশ্নই নেই। স্থানীয় থানার এক দারোগা খুন হয়েছিল এখানে। কাঁকুড়গাছি ছাড়িয়ে কেউ এদিকে আসতে সাহস পেত না। রাত্তিরে চাঁদের আলোয় ধু ধু সাদা বালি দেখে মনে হতো এক বিচিত্র মরুভূমি।

হঠাৎ—হঠাৎই যেন গোঁ গোঁ করে কোথা থেকে ছুটে এল ধুলোর ঝড়। না, ধুলো নয়—বালি—শুধু বালি—বালির ঝড়। চমকে উঠলাম—এত বালি এল কোথা থেকে? তারপরেই দেখি ধু ধু সাদা বালির সমুদ্রে দিশেহারা পথিকের মতো আমি একা দাঁড়িয়ে। ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম—কে আছ বাঁচাও।...

যখন জ্ঞান ফিরল দেখি একজনদের বাড়ির সিঁড়ির ওপর বসে আছি। দু'চারজন ভদ্রলোক আমায় ঘিরে

রয়েছেন। একজন বললেন, কেমন আছেন এখন?

অস্ফুট স্বরে বললাম, আমার কি হয়েছিল?

বোধহয় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। আপনি কোথায় থাকেন?

আমি ঠিকানা বললাম। ওঁরা চমকে উঠলেন। বললেন, হেঁটে হেঁটে এত দূর চলে এসেছিলেন!

তাঁরা যখন আমায় সাইকেল রিকশা করে বাড়ি পৌঁছে দিলেন তখন সন্ধ্যে উৎরে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলাম। সাবধানের মার নেই—তাই ভালো করে ঘরের কোণ, খাটের তলা দেখে নিলাম। কেউ ঘরে ঢুকে লুকিয়ে নেই তো?

সমস্ত বাড়িটা যেন থমথম করছে। নোটন পর্যন্ত যেন কেমন বোবা হয়ে গেছে। সে পরিষ্কারভাবে কিছু বুঝতে না পারলেও বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছে। আমার স্ত্রীর মুখে হাসি তো নেইই, কথাটুকুও নেই। রাত নটার সময়ে শুধু বললেন, আমার মনে হয় তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া উচিত। অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়লেই যেন নিশ্চিন্ত।

তাই হলো। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা যখন শুলাম তখন ঘড়িতে দশটা বেজেছে।

ওপাশের ঘরে নোটন আর নোটনের মা শোয়। পাশের ঘরে আমি একা। অন্যদিন আমরা আলো নিভিয়ে দিই। কিন্তু নোটনের মা আজ নাইট-ল্যাম্প জ্বেলে রাখলেন। আমি নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আজ এত ভয় পাচ্ছি কেন? নোটনের মাও তো দেখছি ভয় পেয়েছে। কিন্তু কিসের ভয়? ও-ও কি মনে করছে আজ রাত্তিরেই সুব্বা আমাদের বাড়ি হানা দেবে?

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হলো খুব গরম লাগছে। পাখা কি বন্ধ হয়ে গেছে?

টর্চ জ্বাললাম। না। পাখা তো দিব্যি চলছে। তখন মনে হলো জানলাগুলো সব বন্ধ। তাই—

জানলা খুলতে যাচ্ছিলাম, তখনই মনে হলো—জানলা খোলা তো নিষেধ। কাজেই মশারির মধ্যে নিজেকে আবার গুটিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সবে চোখ বুজিয়েছি অমনি দুম করে একটা শব্দ—আমাদের বাড়ির মধ্যে। আমি চমকে উঠে বসলাম। পাশের ঘর থেকে আমার স্ত্রী চিৎকার করে উঠলেন, ওগো, শুনছ!

আমি তাড়াতাড়ি উঠে ও ঘরে গেলাম। তারপরে দুজনে মিলে ঘর-বারান্দা খুঁজলাম। কোথাও কিছু নেই।

একবার বাইরেটা দেখে আসব?

স্ত্রী কঠিন স্বরে বললেন, না। দরজা খুলবে না।

অগত্যা আবার বিছানায় গিয়ে ঢুকলাম। এবার রিভলভারটা নিয়ে রাখলাম বালিশের নিচে। ঘড়িতে তখন রাত আড়াইটে বেজেছে।

ভোরে উঠেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম সেই ফুলগাছের টবটা ছাদ থেকে পড়ে চুরমার হয়ে গেছে।

।। আট ।।

গভীর রাতে পড়া মুখস্থ?

সকালবেলায় পাড়ার উমেশ সান্যাল এলেন। বললেন, খুব বেঁচে গেলেন মশাই। টবটা যদি কারো মাথায় পড়ত তাহলে আর রক্ষে থাকত না। বড়ো-লোকদের যে কী ফ্যাশান হয়েছে ছাদের আলসেতে, বারান্দায় ফুলের টব ঝুলিয়ে রাখা। কারো মাথায় পড়তে পারে এ কাণ্ডজ্ঞান নেই।

একটু থেমে বললেন, আজকের কাগজ দেখেছেন?

বললাম, দেখেছি। তবে ভালো করে পড়া হয়নি। বললাম না যে ভয়ে এখন কাগজ পড়ি না।

সুখবর আছে। বলে ঝুলি থেকে সেদিনের কাগজটা বের করে দেখালেন।

'জীবন্ত কংকাল অদৃশ্য' হেডিং দিয়ে—যে খবরটা ছাপা হয়েছে তা এইরকম—**ইস্টার্ন বাইপাসের মুখ থেকে সল্টলেকের প্রায় প্রতিটি পথে পুলিশ সারা রাত্রি টহল দিয়েও জীবন্ত কংকালটিকে দেখতে পায়নি। বোধ হয় ওটি অদৃশ্য হয়েছে।**

দেখলেন তো? বাঁচলাম মশাই। বাড়িতে সবাইকে রেখে কাশীতে যে মহাযোগ হতে যাচ্ছে সেখানে এবার নিশ্চিন্তে যেতে পারব। দেশ-বিদেশ থেকে কত সাধু-সন্ন্যেসী কলকাতা হয়ে যাবেন। সে এক দেখার জিনিস মশাই। একবার যদি তেমন কোনো সাধুর দর্শন পাই তাহলে তাঁর পা দুটো আঁকড়ে ধরব। বুঝলেন না ওখানে যেসব সাধু-সন্ন্যেসীরা যান তাঁরা হেঁজিপেঁজি ভণ্ড সাধু নন। কি বলেন?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আমার মনে তখন শুধু একটা কথাই ঘুরছিল, সত্যিই কি রাজু ফিরে গেছে?

সেদিন বিকেল পর্যন্ত প্রণবেশ দুবার ফোন করেছিল। বিশেষ কাজে আটকে গেছে বলে আসতে পারছে না। জানতে চেয়েছিল ভয় পাচ্ছি না তো?

বলেছিলাম, না। তবে টবটা পড়ে গেছে।

ও যেন সে কথায় কোনো গুরুত্বই দিল না।

ক্রমে গোটা সল্টলেকের ওপর সন্ধ্যের অন্ধকার পায়ে পায়ে নেমে এল। আজ আর বিকেলে বেরোতে ইচ্ছে করেনি। তাড়াতাড়ি সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দিলাম। ব্যস্! রাতের মতো ঘরে বন্দী হয়ে রইলাম।

আজও রাত নটার মধ্যে খেয়ে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়লাম। এত সকাল সকাল শোওয়া আমাদের অভ্যেস নয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্যরকম।

ভাবতে ভাবতে কখন এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমটা ভেঙে গেল আচমকাই। ঘরের মধ্যে অসহ্য গুমোট। চারিদিকের বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছে। আর তখনই শুনতে পেলাম জনমানবশূন্য নিস্তব্ধ পথের ওপর একটা অস্পষ্ট শব্দ খট—খট—খট।

কেউ যেন রক্তমাংসশূন্য হাড়ের পা ফেলে হাঁটছে। শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এল আমাদের বাড়ির কাছে। আমি বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা বের করে উঠে বসলাম।

শব্দটা থেমে গেল।

কোনো সন্দেহ নেই কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির কাছে। আমি

বিছানায় বসেই কাচের শার্সির মধ্যে দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না।

তার একটু পরেই আমি আঁৎকে উঠলাম। দেখলাম আমার মাথার কাছে জানলার ওপাশে একটা ভয়ংকর মূর্তি—যেন কাঠের তৈরি খসখসে একটা মুখ—নারকেলের মতো ছোট্ট মাথা—খাড়াখাড়া চুল—দুটো চোখ—হ্যাঁ, চোখই। তবে টর্চের বাল্বের মতো নয়, চোখ দুটো ওল্টানো। শুধু চোখের সাদাটা দেখা যাচ্ছে। এইভাবেই এক-এক সময়ে সুব্বা হরিদেবপুরের বাড়িতে তাকাতো।

সেই মুহূর্তে আমি কি করব ভেবে পেলাম না। দেখলাম ক্ষীণ কংকালসার দেহটা জানলাটা খোলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কাচের শার্সি কিছুতেই ছুঁতে পারছে না।

আমি হঠাৎ লাফিয়ে হুংকার দিয়ে জানলার দিকে ছুটে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবার আমি আলো জ্বেলে পাশের ঘরে গেলাম। দেখি মশারির মধ্যে আমার স্ত্রী নোটনকে বুকে আঁকড়ে ধরে গোঙাচ্ছেন। আমাকে দেখে সাহসে ভর করে বিছানায় উঠে বসলেন। কোনোরকমে বললেন, সুব্বা ওঁদের জানলার কাছেও এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

ভোরবেলায় ফোন পেয়েই প্রণবেশ জিপ নিয়ে চলে এল। সব কথা শুনে ওর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। তখনই দার্জিলিঙে ফোন করল। কিন্তু অম্বুজ লাহিড়িকে পাওয়া গেল না। তিনি দার্জিলিঙের বাইরে কোথায় গেছেন কয়েক দিনের জন্যে।

প্রণবেশ বলল, ঘাবড়িও না। রাত্রে আমিও এখানে থাকব।

শুনে বাঁচলাম। বিপদের সময়ে সঙ্গে একজন সাহসী সঙ্গী থাকা দরকার। দরকার পরামর্শ করবার।

সন্ধ্যের আগেই প্রণবেশ চলে এল। সঙ্গে কিছু ওষুধ-পত্তর এনেছে। বলা যায় না রাত্তিরে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন কাজে লাগবে। কোনোরকমেই দরজা খুলে বাইরে বেরোনো তো চলবে না।

রাত দশটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া গেল। যে প্রণবেশ এত ফুর্তিবাজ—এত গল্প করে সেইই আজ কেন বোবা হয়ে গেছে। সব সময়েই কি যেন চিন্তা করছে।

ও আর আমি এক বিছানায় শুয়েছি।

কোনো বাড়ির দেওয়ালঘড়িতে ঠং-ঠং করে দুটো বাজল। সেই শব্দটুকু থেমে যেতে-না-যেতেই নিস্তব্ধ রাস্তায় কোথায় যেন শব্দ হলো খট-খট-খট—

প্রণবেশকে ঠেলা দিতেই ও গম্ভীর গলায় বলল, শুনছি।

ক্রমে শব্দটা আগের দিনের মতোই বাড়ির কাছে এসে থামল। কিন্তু আজ আরও একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে আসছিল। মানুষের গলা। কোনো বয়স্ক লোক যেন পড়া মুখস্থ করছে। এত রাত্রে কে কোথায় কী পড়ছে ভেবে ওঠার আগেই পাশের ঘর থেকে নোটনের মা চিৎকার করে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনে ছুটে গেলাম ওদের ঘরে। আমাদের দেখেই আমার স্ত্রী আঙুল তুলে জানলাটা দেখিয়ে উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ঐ-ঐ—ঐদিকে।

সেই নিস্প্রাণ কালো মুখটাকে মুহূর্তের জন্যে দেখলাম সরে যেতে। তারপর আমার স্ত্রী যা বললেন তা এই—

একটা কেমন ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজে ঘুম ভাঙতেই দেখেন মূর্তিটা বাইরে দাঁড়িয়ে জানলাটা ধরবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। যতই পারছে না ততই রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। কিন্তু এ যেন হরিদেবপুরের সে রাজু নয়। তার চেয়ে ঢের ভয়ংকর—ঢের বেশি হিংস্র।

আমরা ঠিক করলাম বাকি রাতটুকু মশার কামড় সহ্য করেও এ ঘরে বসে কাটিয়ে দেব। সেইমতো দুটো চেয়ার নিয়ে এসে গায়ে চাদর জড়িয়ে আমরা বসলাম।

প্রণবেশ সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে হঠাৎ মনে হলো বাড়িটা যেন কাঁপছে। তারপরেই ছাদের ওপর কে যেন ভারী পায়ে চলে বেড়াচ্ছে। এইরকম চলল ঘণ্টাখানেক। অথচ আমাদের কারুর কিছু করার নেই। বেরোনো চলবে না।

ভোরের দিকে শব্দটা থেমে গেল।

সকালে ছাদে উঠে দেখলাম টবগুলো কে ভেঙেচুরে সারা ছাদে ছড়িয়ে রেখে গেছে।

চা খাবার পর আমরা আলোচনায় বসলাম। যে ভুলটা আমাদের হয়েছিল সেটা বললাম। লালবাজারে একটা ফোন করে দিলেই হতো। আমাদের না হয় ঘর থেকে বেরোবার উপায় ছিল না। কিন্তু পুলিশ তো ছাদে উঠতে পারত।

এটা যে মস্ত ভুল প্রণবেশও তা স্বীকার করল। সেই সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার—ঐ সময়ে কাছাকাছি কোথাও কে পড়া মুখস্থ করছিল? না, তারও উত্তর তখনই খুঁজে পাওয়া গেল না।

॥ নয় ॥

ভয়ংকর রাত

পরের দিন প্রণবেশ সোজা লালবাজারে গিয়ে গত দু'দিনের ঘটনা জানিয়ে সন্ধ্যের পর থেকে সারা রাত্তিরের জন্যে বাড়িতে পুলিশ পাহারা চাইল। লালবাজারের বড়ো কর্তারা কিন্তু এবার খুব গুরুত্ব দিলেন না। তাঁদের বক্তব্য—গত কয়েক দিন সারারাত পুলিশ সল্টলেকের সমস্ত রাস্তা টহল দিয়েছে। জীবন্ত কংকালের দর্শন পায়নি। হয় সবটাই এতদিন চোখের ভুল ছিল কিংবা সেটি অদৃশ্য হয়েছে।

প্রণবেশ সে কথা মানতে চায়নি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে ফের যদি রাত্তিরে ঐরকম হাঙ্গামা হয়, ফোন পেলেই সশস্ত্র পুলিশ-ভ্যান যাবে।

আজও সন্ধ্যের আগেই প্রণবেশ চলে এল আমাদের বাড়ি। ও যেন বুঝেই নিয়েছে আমার ঘরে যতদিন না সুব্বা ঢুকতে পারছে ততদিন ও হাঙ্গামা চালিয়ে যাবে।

আজও রাত দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা শুয়ে পড়লাম। নামেই শোওয়া—কারো চোখে ঘুম নেই।

রাত দুটো।

নিস্তব্ধ এ.জে. ব্লকের রাস্তাগুলো। দিনের বেলার ব্যস্ত কোলাহলমুখর বাস টার্মিনাসটা এখন শ্মশানের মতো

পরিত্যক্ত। জনশূন্য রাস্তার বুকে লাইটপোস্টের আলোগুলো যেন পাহারা দিচ্ছে।

হঠাৎ কানে এল কাছেই কোনো বাড়িতে কোনো বয়স্ক মানুষ যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কিছু পড়ছে। আজ যেন গলার স্বরটা গতকালের চেয়ে স্পষ্ট। কিন্তু কি পড়ছে ভালো করে বোঝা গেল না। তার পরেই দেখলাম রাস্তার আলোগুলো কাঁপছে। তারপরেই ধীরে ধীরে ভোল্টেজ ডাউন হয়ে এল। সেই সঙ্গে সেই গম্ভীর গলার পড়াটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

না, বই পড়া নয়। রীতিমতো মন্ত্র উচ্চারণ। —গচ্ছ—গচ্ছ—সংহারো —গচ্ছ—গচ্ছ—সংহারো—

মানেটা পরিষ্কার। কেউ যেন কাউকে আদেশ করছে—যাও—যাও বিনাশ করো—মেরে ফেলো।

তারপরেই শুনতে পেলাম সেই শব্দ খট-খট-খট—

জল্লাদ এগিয়ে আসছে আমাকে মারার জন্যে।

শব্দটা আগের মতোই আমাদের বাড়ির কাছে এসে থেমে গেল। আর তখনই কোথাও কিছু নেই আকাশটা ঘন মেঘে ছেয়ে গেল। কয়েকবার চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ চমকানি। তারপরেই উঠল প্রচণ্ড ঝড়। সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন, আবার এসেছে—

ছুটে গেলাম পাশের ঘরে। সেই একই দৃশ্য। তবে আরও ভয়ংকর। চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলছে—মুখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। আজ যেন সে ঘরে ঢুকবেই। আশ্চর্য এই ঝড়েও সে কাবু নয়।

এদিকে ঝড়ের দাপট ক্রমশই বাড়ছে। জানলা-দরজার শার্সিগুলো ঝনঝন করে উঠছে। প্রণবেশ চেঁচিয়ে উঠল, শীগগির টেবিল-চেয়ারগুলো দরজার কাছে নিয়ে চলো।

দরজাটা ঝড়ের ধাক্কায় তখন কাঁপছে। আমরা টেবিল-চেয়ার-আলনা যা পেলাম তাই নিয়ে এসে দরজার গায়ে ঠেসে দিলাম। ওদিকে জানলাগুলোরও একই অবস্থা। সেখানেও ডেস্ক, ট্রাঙ্ক যেখানে যা ছিল এনে চেপে ধরলাম। তার পরেই শুরু হলো ছাদের ওপর দাপাদাপি।

প্রণবেশ ছুটে গেল ফোন করতে। কিন্তু—হায় কপাল! লাইন ডেড।

ক্রমে রাত পুইয়ে গেল। ঝড় থেমে গেল। যাক আজও বেঁচে গেলাম। প্রণবেশ আবার ফোন করার চেষ্টা করল। লাইন বেঁচে উঠেছে। লালবাজার জানাল এখুনি ফোর্স যাচ্ছে।

প্রণবেশকে বললাম, এখন আর এসে কী হবে?

ভোর পাঁচটা।

লালবাজারের দুজন বড়ো কর্তাকে নিয়ে আমরা আলোচনায় বসেছি। এভাবে তো দিনের পর দিন পারা যায় না। কিন্তু উপায় কি?

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে হলো। বললাম, আমরা গ্রামেও দেখেছি কংকালটাকে চালনা করে নেপালের সেই তান্ত্রিক। তার কাজ অনেকটা remote control-এর মতো। সুদূর হরিদেবপুরে নেপাল থেকে সে চলে এসেছিল। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে সে কংকালটাকে জীবন্ত করে ছেড়ে দেয়। কাজেই সেই তান্ত্রিক কলকাতাতেও যে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। আর সে আছে আমাদের খুব কাছেই।

প্রণবেশ চমকে উঠে বলল, তুমি তো দারুণ পয়েন্ট বলেছ।

মনে করে দ্যাখো প্রণবেশ, গত রাত্রে মোটা গলায় সেই সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ—গচ্ছ—গচ্ছ—সংহারো।

এ সেই তান্ত্রিকেরই কাজ এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

প্রণবেশ বলল, কিন্তু তাকে খুঁজে পাব কোথায়?

বললাম, মাঠে পথে সে বসে থাকবে না। নিশ্চয় কারো বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে। এই সেক্টরের প্রত্যেক বাড়ি খোঁজ করলে এখনও তাকে পাওয়া যাবে।

প্রণবেশ তখনই পুলিশ কর্তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বেশি খুঁজতে হলো না। উমেশ সান্যালের বাড়ির কাছে আসতেই ঘিয়ের গন্ধ পাওয়া গেল। যেন কেউ হোম করেছে। পুলিশ ঢুকে পড়ল। উমেশবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, হ্যাঁ, একজন বড়ো সাধু পেয়ে তিনদিন হলো তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। ঠিক ছিল আজ তাঁর সঙ্গে বেনারসে মহাযোগে যাবেন। কিন্তু—

কিন্তু কি? কোথায় সেই সাধু?

ভোরবেলা উঠে তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছি না।

প্রণবেশ বললে, তা হলে সে নিশ্চয় পালিয়েছে।

তখনই সব থানায় ফোন করে দেওয়া হলো—পথে, স্টেশনে, গঙ্গার ঘাটে কোনো সাধুকে একলা দেখলেই তাকে যেন ধরা হয়।

বেলা দশটা।

তান্ত্রিক ধরা পড়েনি। হয়তো সে ট্রেনে চড়ে নেপালের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে। অথবা অন্য সাধুদের দলে মিশে কাশী চলে গিয়েছে।

গত রাতের ঝড়ে একটা লাইট-পোস্টের তার ছিঁড়ে গিয়েছিল। ইলেকট্রিক মিস্ত্রিদের একজন পোস্টে উঠে সারাচ্ছিল। হঠাৎ আমাদের বাড়ির ছাদের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল।—আরে! ওটা কি?

ছাদে উঠে দেখা গেল—একটা ছোটো খাটো কংকাল পড়ে আছে। এটা যে নেপালে সেই তান্ত্রিকের গুহায় আমরা দেখেছিলাম সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তান্ত্রিক অনেক দূরে চলে গেছে। রিমোট কন্ট্রোল আর চলবে না। এখন এটা শুধুই কংকাল। এটাকে নিয়ে কি হবে?

পুলিশ বলল, দায়িত্ব আমাদের। ওটাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়াই ভালো।

তাই হলো। আমাদের উপস্থিতিতে কংকালটাকে পুড়িয়ে তার ভস্ম গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হলো।

আশা করা যায় এতকাল পর তার গতি হবে। তান্ত্রিকও আর রিমোট কন্ট্রোল থেকে কংকালকে চালনা করে কারো ক্ষতি করতে পারবে না।

ছবিঃ অমিত চক্রবর্তী

সভ্যায়ন

রেবতী ভূষণ ঘোষ

হুড়মুড় দুদ্দাড় বন তোলপাড়
কচাকচি চেঁচামেচি বিকট হাঁকাড়!
দুপদাপ তুড়িলাফ হুঙ্কার হুপ্
ক্রমে ক্রমে কোলাহল হয়ে গেল চুপ।
কবে গেছে ল্যাজ খসে, কীই বা করে গাছে বসে
লাফ দিয়ে নেমে আসে সব ঝুপ ঝুপ!
থুপথাপ হাঁটি-হাঁটি টাটাল-মাটাল
মাটিতে হাঁটন শেখা হাল বেসামাল।
কাঠে কাঠে ঘষাঘষি ঠোকাঠুকি চকমকি
হঠাৎ ফুলকি থেকে জ্বলল আগুন
ক্রমে ক্রমে জানা হলো তার গুণাগুণ।
পাথরের হাতিয়ার মুগুর লগুড়
ছড়িয়ে পড়ল তারা দূর থেকে দূর।
কাঠ কেটে বক্র, গোলাকার চক্র
বানিয়ে ফেলল ক্রমে গড়গড়ে গাড়ি
আরো কাঠ কেটে কেটে ডানপিটে বোম্বেটে
ভেলা কি জাহাজে দিল সাগরেতে পাড়ি।
মাঠেতে কেউ বা খাটে চাষ করে শস্য
সেয়ানা সওয়ার হলো বশ করে অশ্ব।
ক্রমে এল যন্ত্র, তন্ত্র ও মন্ত্র
মারণের হাতিয়ার সহজ সুলভ্য
তারপর হানাহানি প্রাণ নিয়ে টানাটানি
এতোদিনে রীতিমতো হয়ে ওঠে 'সভ্য'।
ঘর্ঘর ছুটে চলে সভ্যতা রথটা
চাকার তলায় কাঁদে খুনে ভেজা পথটা।
এলেন সন্ত সাধু খৃস্ট ও বুদ্ধ
ঠেকানো গেল না তবু দুটো মহাযুদ্ধ।
হিরোশিমা নাগাসাকি আর কি রইল বাকি
এক লহমায় সব পুড়ে হলো ছাইরে
তবু সভ্য বলে থামে না বড়াই এ।
মিটলো না লেনাদেনা হানাহানি থামবে না
সাথেই হিসাব চলে লাভ করে কত কে
ছুটে চলে তাড়াতাড়ি মরুভূমি দিয়ে পাড়ি
মরূদ্যানের খোঁজে একুশের শতকে।

ছবিঃ লেখক

হ্যাপি বার্থ ডে

বসন্ত ভট্টাচার্য

ভূতের রাজার জন্মদিন
কেউ কখনো শুনেছো কি!
খাবারদাবার জবর বেজায়
সাধ্য কি তার গুনেছে কি।
মণ্ডা মিঠাই সরপুরিয়া
কাঁচাগোল্লা রাবড়ি পুরি
চপ বেগুনী নিম্কি সিঙাড়া
পেঁয়াজী ফুলুরী হিং-কচুরি।
কালিয়া কোর্মা কাবাব বন্ধ
ওদিন ওসব চলবে না
কন্ধকাটার আইন ভেঙে কেউ
টুঁ-শব্দটিও করবে না।
তালের রস, খেজুর রস
পিপে পিপে নিমেষে উধাও
শাঁকচুন্নির গান শোনো আর
যতই খুশি গলা ভেজাও।
প্রশ্ন করি গুপী-বাঘায়
ব্যাপার কেমন গোলমেলে
তোমরা দুজন পেটুক জানি
জন্মদিনে কেমন খেলে?
গুগা বাবা গানের সুরেই
জানায় রাজার ভালবাসা
একদিনের ওই "ভেজ্ দিবসেই"
মোদের পাতে মাছের আশা।

ছবি : সুফি

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

এখন কী ভালো না থাকার জো আছে—পুজো এসে গেল যে! এবার পুজো বেশ আগে আগে তাই না। তা হোক, পুজো পুজোই। ভয় শুধু ঐ বৃষ্টির। এবার আবহাওয়ার যা খামখেয়ালি মেজাজ, পুজো না ভাসিয়ে দেয়। নীল আকাশের বুকে সাদাটে মেঘের পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়ানোর বদলে হয়তো কালো মেঘে ঢেকে যাবে গোটা আকাশ। পুজোর দিনগুলো যদি শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি হয় তাহলে কী বিচ্ছিরি ব্যাপারই না হবে। পুজোর কটা দিন ভালোয় ভালোয় কাটলেই বাঁচা যায়, কী বলো।

তা পুজো সংখ্যা শুকতারা কেমন লাগলো বলো। কার লেখা কেমন লেগেছে, নতুন আর কিছু চাও কিনা জানিও।

এবার এসো একটা গল্প শোনা যাক। সেবার দেশে খুব খরা। বৃষ্টি ধরতে গেলে হয়ইনি। জমিজমা ফেটে চৌচির। জল নেই ফসল হবে কোথা থেকে। চাষীদের মাথায় হাত। সেই গ্রামের দূর দিয়ে বয়ে চলেছে একটা নদী। জল টলটল করছে সেখানে। দুজন চাষী ঠিক করল নদী থেকে নালা কেটে তাদের ক্ষেতে জল আনবে। সকালবেলায় মাঠে গিয়ে তারা নালা কাটতে শুরু করল। দেখতে দেখতে বেলা অনেক হলো। সূর্য মাথার ওপরে। ঘেমে নেয়ে দুই চাষী কাজ করেই যাচ্ছে। দুপুরবেলায় বাড়ি ফিরে স্নান করে খাবে—সে সব কথা তাদের মনেই পড়ল না। তাই এক চাষী-বৌ এসে হাজির। সে চাষীকে বলল, অনেক হয়েছে। বেলা পড়ে এল। এবার চলো খাবেদাবে।

চাষী তার কোদাল সরিয়ে রেখে বলল, তা তুই যখন বলছিস বাড়িই যাই তাহলে।

সে বৌ-এর সঙ্গে বাড়ি ফিরে এল। তার ক্ষেতে আর জল আনা হলো না।

অন্য চাষী কিন্তু দেখেও দেখল না। সে নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগল। তার পণ যতক্ষণ না সে নদী থেকে তার জমিতে জল আনতে পারছে সে কাজ বন্ধ করবে না।

দুপুর গড়িয়ে যায় দেখে সেই চাষীর বৌ তার মেয়েকে বাবাকে মাঠ থেকে ডেকে আনার জন্য পাঠাল। মেয়ে ক্ষেতে এসে হাজির হলো। বলল, বাবা, নদীতে নেয়ে নিয়ে খেতে এস। মা তোমার জন্যে বসে আছে।

চাষী বলল, আমি এখন নাইতে যাব না। অনেক কাজ বাকি। তুই ঘরে যা।

দুপুর গড়িয়ে গেল। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই চাষী নালা কেটেই চলেছে। সে ঘেমে নেয়ে একশেষ।

এমন সময় চাষী-বৌ এসে দাঁড়াল, এখনো তোমার কাজ হয়নি? ভাত তো শুকিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে কাজ করো নাহলে কাল কোর।

চাষী তাকে ধমক দিয়ে বলল, তোমার কোনো আক্কেল নেই। বৃষ্টি হচ্ছে না। জল না পেলে চাষ হবে না। সারা বছর তখন খাওয়া জুটবে কোথা থেকে? যাও যাও বাড়ি যাও। আমার কাজ আমায় করতে দাও।

চাষীর অগ্নিমূর্তি দেখে তার বৌ বাড়ি ফিরে গেল। চাষীও নালা কেটে চলল। সন্ধ্যেবেলায় তার কাজ শেষ হলো। নদী থেকে কুলকুল করে জল বয়ে এল তার ক্ষেতে। আর চিন্তা নেই। এবার সে চাষ করতে পারবে।

আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ি এসে সে তেল মেখে চান করে খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল।

এই গল্পটি বলে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, এইরকম একরোখা হতে হয়। দুর্জয় পণ ছাড়া কিছুই হয় না।

তোমরাই ভেবে দেখো কথাটা। পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে, ভালো খেলোয়াড় হতে হলে এই দুর্জয় পণটাই তো সবার আগে চাই। জীবনে সফল হতে হলে তোমাদেরও ঐ চাষীর মতো হতে হবে। সৌরভ গাঙ্গুলির কথাই ধরো না। ১৯৯২ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের পর বদনাম দিয়ে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হলো। সকলেই ধরে নিলেন, সৌরভের খেলোয়াড় জীবন শেষ। প্রথমটায় সৌরভ যেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল তেমনি কষ্ট পেয়েছিল। আর তা থেকেই তার মনে এল জেদ। সকলের অলক্ষ্যে ও নিজেকে তৈরি করতে লাগল। তখন ওর বাবা চণ্ডী গাঙ্গুলিকে বলেছিল, দেখো আমি ভারতীয় দলে খেলবোই। শেষ পর্যন্ত তার একরোখা মনোভাব আর দুর্জয় পণ তাকে আজ কোথায় তুলে দিয়েছে তা তো তোমরা জানোই। শুকতারার বন্ধুরাও যেন কোনো কিছুতে হার মেনো না। ঐ চাষীর মতো, সৌরভ গাঙ্গুলির জেদ আর পণ তোমাদেরও সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দেবে। এসো এবারের পুজোয় এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

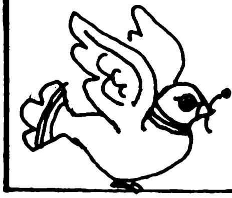

সংযুক্তা মণ্ডল,
বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী,
রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়,
বারুইপুর

পুজোর গন্ধ

আসছে পুজো আনন্দে তাই মনটা কেমন করে,
দুর্গামায়ের মুখখানা যে শুধুই মনে পড়ে।
নতুন জামা, নতুন জুতো কেনা-কাটা শুরু,
চেঁচামেচি হৈ-হুল্লোড় পড়ার মনটা উড়ু।
আসছে দাদা, আসছে দিদি, আরও কত জন,
তাই তো মা করছে কত খাবারের আয়োজন।
ষষ্ঠী থেকে নবমী এই চারটি দিনের খেলা,
দশমীর দিন মনটা খারাপ মায়ের যাবার বেলা।
আসছে বছর মা তো আবার আসবে নতুন সাজে,
ভালবাসা, আনন্দ তাই থাকবে সবার মাঝে।

পত্রলেখা নাথ,
বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী,
সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বিদ্যামন্দির

ভাদ্র মাসের শেষে

ভাদ্র মাসের শেষে আশ্বিন আসে,
সাদা সাদা মেঘ ওই নীলাকাশে ভাসে;
সন্ধ্যা প্রভাত ভরে শিউলি সুবাসে।
মন যেন হয়ে যায় আকাশের বাজ,
উড়ে উড়ে শুধু ঘোরে, নেই তার কাজ।
দেখে ঘুরে গোটা দেশে পুজো পুজো সাজ।
নেমে এসে এ জগতে ভাবতেও ভাল লাগে,
পুজোর এ মাসে মনে মায়েরই যে কথা জাগে,
মায়ের বার্তা নিয়ে মহালয়া আসে আগে।
খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান ফুর্তির হাওয়াতে,
বন্ধুরা ভালবাসে খেতে আর খাওয়াতে,
জোট বেঁধে ভোগ নেয় পুজোর ওই দাওয়াতে।
প্রকৃতিও এ সময় মন খুলে চলে,
আকাশটা যেন নদী, ভরা শতদলে
মায়ের মুকুট হয়ে 'শুকতারা' জ্বলে।

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী,
বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী,
সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল,
কলিকাতা

স্মিতা ভট্টাচার্য,
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী,
হরিমতী দেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
কলিকাতা

রাজকুমার মাঝি,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস হোম,
বাঁকুড়া

পুজো পুজো

কি মজা ভাই, কি মজা
বাজছে পুজোর ঢাক,
পুজোর ছুটি এসে গেছে
দু'হাত তুলে নাচ।

প্যান্ডেলেতে আলোর মালা
রংবেরংয়ের সাজ
নতুন জামা পরে আমি
দেখতে যাব আজ।

মা এসেছে মোদের ঘরে
চারটি দিনের তরে
দশমীর দিন বিদায় নিলে
বিষাদে মন ভরে।

মৌমিতা ঘোষ,
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী,
ডাঃ এম. সি. ব্যানার্জী রোড,
কলিকাতা

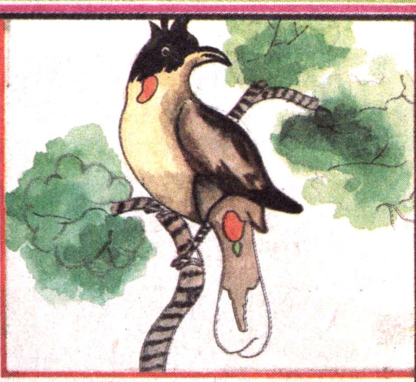

সমালী মণ্ডল,
বয়স দশ, চতুর্থ শ্রেণী,
আনন্দনিকেতন নার্সারী অ্যান্ড কে. জি. স্কুল,
শান্তিপুর

মা দুগগা

মা দুগগা কেন মাগো
সিংহ চেপে আসে?
দামী দামী মটর গাড়ি
নেই কি মায়ের কাছে?

কার্তিক আসে ময়ূর চড়ে,
গণেশ চড়ে ইঁদুর,
এরোপ্লেনে চড়ে না তো
আসতে এত দূর!

প্যাঁচার উপর লক্ষ্মী বসে,
সরস্বতী হাঁসে,
দুই বোনেতে আসতে পারে
স্কুটারেতে বসে!

বুড়ো শিব কি এতই গরিব
নেইকো টাকা মোটে?
ছেলে মেয়ে বউকে চাপায়
জানোয়ারের পিঠে!

অমৃতা মিত্র,
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী,
বাগনান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
হাওড়া

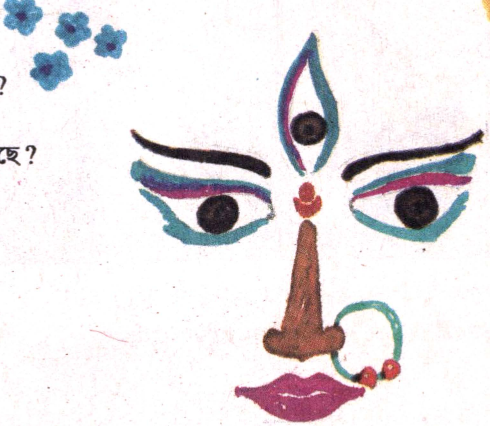

বাংলার বারোমাস

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে,
দিন কাটে কষ্টে।
আষাঢ়-শ্রাবণে,
গ্রাম ভাসে প্লাবনে।
ভাদ্র-আশ্বিনে,
পুজো হয় রাত-দিনে।
কার্তিক-অঘ্রানে
মাঠ ভরে ধানে ধানে।
পৌষ আর মাঘেতে,
ঝরে পাতা মাটিতে।
ফাল্গুন-চৈত্রে,
গাছ ভরে মুকুলে।
বারোমাস এইভাবে,
কেটে যায় দ্রুতবেগে॥

পূজা দত্ত,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
যোধপুর পার্ক গার্লস হাই স্কুল, কলিকাতা

সুশান্ত রজক,
বয়স চোদ্দ
প্রতাপবাগান, বাঁকুড়া

মার্টিনা দে, বয়স ছয়,
প্রথম শ্রেণী, লরেটো ডে স্কুল, বৌবাজার

ফেলুদাকে নিয়ে আরো ছবি করব : সন্দীপ রায়

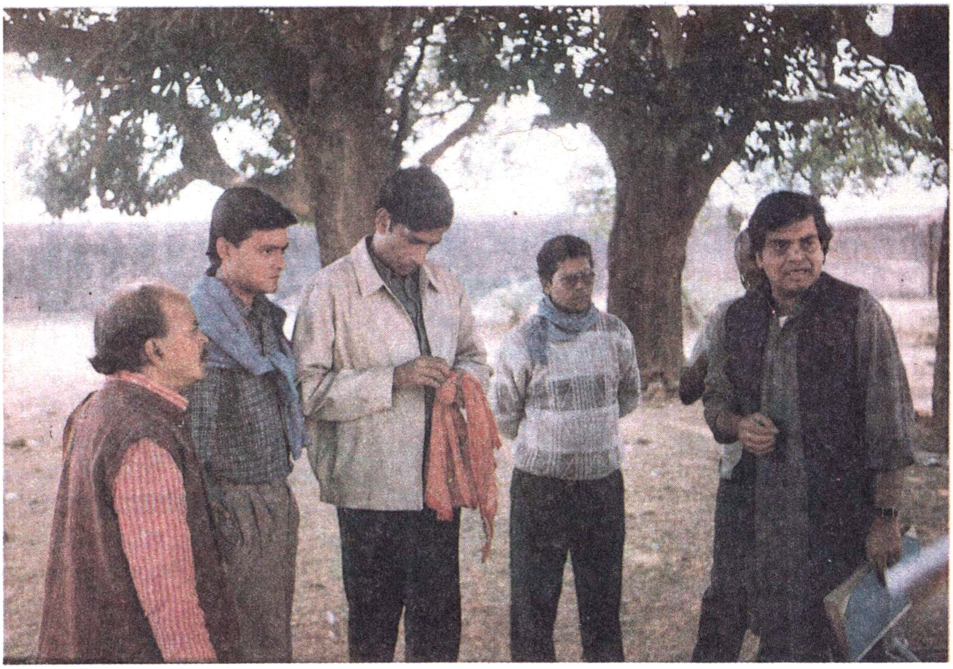

শুটিংয়ের অবসরে রবি ঘোষ (জটায়ু), শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় (তপসে), সব্যসাচী চক্রবর্তী (ফেলুদা), সন্দীপ রায় ও আরো অনেকে।

ফেলুদাকে নিয়ে সিরিয়াল বানাতে গিয়ে প্রথমেই আমি একটা সমস্যার মধ্যে পড়লাম। কারণ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে ফেলুদা করা আর সম্ভব নয়। সৌমিত্রকাকুর বয়স ৬০ পেরিয়ে গেছে। মেকআপ দিয়েও আর করা যাবে না। তপসের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ব্যাপার। সন্তোষকাকু নেই। সুতরাং নতুন টিম তৈরি করতে হবে। অথচ সৌমিত্রকাকুকে বাদ দিয়ে ছবি করতে হবে, এটাই বা তাঁকে বলি কি করে?

প্রথম সমস্যার মোকাবিলার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হলো। অবশেষে তাঁকে মুখ ফুটে বিষয়টি বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু দেখলাম আমি মিছেই চিন্তা করছিলাম।

দৃশ্যগ্রহণের আগে ফেলুদা ও তপসেকে নির্দেশ দিচ্ছেন সন্দীপ রায়।

সৌমিত্রকাকু ভীষণ সহজভাবে বিষয়টি গ্রহণ করলেন। এবং তিনিও জানালেন, ফেলুদার চরিত্রে তাঁকে বেমানান লাগবে। তিনি এখন ছবি করলে সেটা হয়ে যাবে 'ফেলুদা জেঠু'।

সৌমিত্রকাকুর আশ্বাসে বুক থেকে ভারটা নেমে গেল। এরপরের সমস্যা দেখা গেল রবি ঘোষকে নিয়ে। রবিকাকুকে জটায়ুর চরিত্রে অভিনয় করার অনুরোধ জানালে তিনি কিছুটা দোটানায় পড়ে গেলেন। কেমন হবে তাঁর অভিনয়। জটায়ুর সঙ্গে মানাবে কিনা? ইত্যাদি সাতপাঁচ ভেবে অবশেষে তিনি রাজী হলেন। ফেলুদার চরিত্রে সব্যসাচী চক্রবর্তী আগে থেকেই উৎসাহী ছিলেন। পাশাপাশি তাঁর বাচনভঙ্গি, উচ্চতা, সিগারেট ধরাবার মেজাজ, চাউনি এমনকি চেহারার ভীষণ একটা মার্জিত ছাপ আমার মনে ধরে গেল। ফলে সব্যসাচীবাবুই ফেলুদা করবেন স্থির করে ফেললাম। তপসের ভূমিকায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

মানে অপুকে আমি আগেই ভেবেছিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, সত্যজিৎ রায়ের তৈরি ফেলুদা ও তপসের জ্যাকেট ও জামা, সব্যসাচীবাবু এবং অপুর গায়ে দিব্যি মানিয়ে গেল, যা অন্য আর্টিস্টের বেলায় হয়নি। এটা একটা নজির বলা যায়।

এবার তৃতীয় সমস্যা দেখা দিল। আমি বড় বাজেটে ফিচার ফিল্ম করতে চাইনি। কারণ খরচ বেশি। তাছাড়া নতুন জুটি নিয়ে ছবি করতে গিয়ে প্রধানত যে সমস্যা দেখা দেয়, তা হচ্ছে নতুন জুটিদের দর্শক, বিশেষত শিশুদর্শকরা কিভাবে নেবেন? তাঁরা সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সৌমিত্রকাকু, সন্তোষকাকুকে দেখে অভ্যস্ত। হঠাৎ করে এই ব্রেক। তাই বড় ছবিতে না গিয়ে সিরিয়ালের ঝুঁকি নিলাম। দেখা যাক কি হয়। না হয় একটা পরীক্ষামূলক চিত্র তৈরি করা যাক!

দর্শকরা হয়তো আমাকে প্রশ্ন করবেন, কেন আমি ফেলুদাকে নিয়ে ছবি বানাতে গেলাম। আসলে আমাদের দেশে ছোটদের উপযোগী ছবি খুব একটা হয় না। এটা অন্যায়। তাই ছোটদের জন্যই সিরিয়াল বানাবো ঠিক করলাম। এক্ষেত্রে ফেলুদাই হবে সঠিক ছবি। যা দেখে ছোটরা আনন্দ পাবে।

'বাক্সরহস্য' এবং 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' শূটিংয়ের কিছু দৃশ্য ছিল কলকাতায়, বাকিটা মানালি এবং নেপালে সারতে হয়েছে। শূটিং নিয়ে কৌতূহলী ক্ষুদে দর্শক এবং পাঠকেরা প্রায়ই আমার কাছে জানতে চায়, ছবি তোলার সময়ে কোনো মজার ঘটনা ঘটেছে কিনা বা সেরকম কোনো অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা। এক্ষেত্রে আমি বলব, শূটিং করতে গিয়ে তেমন কোনো মজার ঘটনা সেভাবে ঘটেনি। আসলে ছবি তৈরি করার আগেই আমি ছবির আনুষঙ্গিক কাজ সেরে রাখি। প্ল্যানিং করেই আমার কাজ হয়। তবে

ফেলুদাকে (সব্যসাচী চক্রবর্তী) নির্দেশ দিচ্ছেন সন্দীপ রায়।

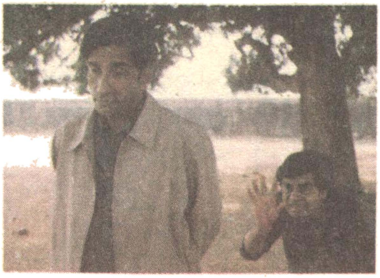

সামান্য কিছু সমস্যা যে দেখা দেয় না, তা নয়। সেগুলি অবশ্য সামলে উঠি। যেমন নেপালে আমরা শূটিং করার জন্য একটা হোটেল চেয়েছিলাম। বিদেশ বলে সরকারি তরফের এক নেপালী অফিসার প্রতিনিধি হিসাবে সারাক্ষণই আমাদের গ্রুপটাকে সহযোগিতা করছিলেন। হোটেলের প্রয়োজন শুনে তিনি আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কয়েকটি হোটেল দেখালেন। তার মধ্যে একটা হোটেল আমাদের পছন্দ হলো। তো আমরা মাত্র দু'দিনের জন্য হোটেলের দুটো রুম বুক করলাম। যথাসময়ে শূটিং শুরু হলো। মাত্র দু'ঘণ্টা শূটিং করতে না করতেই হোটেলের ম্যানেজার এসে জানালেন,' আপনাদের এখন ঘর ছাড়তে হবে।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। সে কী! দু'দিনের জন্য বুক করা ঘর, মাত্র দু'ঘণ্টা পরেই ছাড়তে হবে কেন?

প্রশ্নের জবাব খানিকক্ষণের ভেতরই আমি পেয়ে গেলাম। পরে বুঝলাম, হোটেলের রিসেপশনিস্ট দু'দিনের জায়গায় ভুল শুনে ভেবেছেন আমরা দু'ঘণ্টা সময় চেয়েছি। এদিকে হোটেলের ঐ ঘরের নতুন অতিথিরা এসে হাজির।

ফেলুদা ৩০ ধারাবাহিকের একটি এপিসোডের দৃশ্যগ্রহণের সময়।

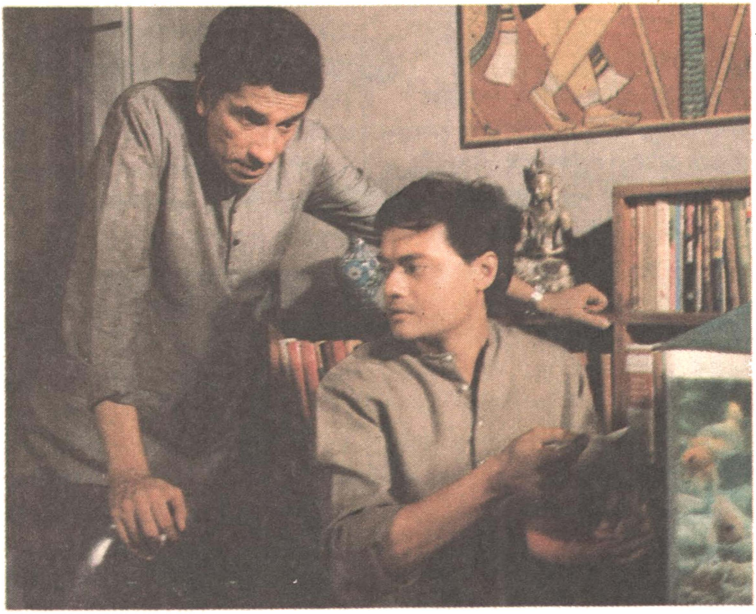

ফেলুদার গোপন নির্দেশ তপসেকে।

ফলে আমাদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে এই হোটেল ছেড়ে অন্য হোটেলে উঠতে হলো। আগের হোটেলের দু'ঘণ্টার শূটিংটাই পুরো জলে গেল আমাদের।

দ্বিতীয় সমস্যাটাও সামান্য ছিল। 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডু'তে বরফ ঢাকা পাহাড়ের কিছু নিসর্গ দৃশ্য তোলার প্রয়োজন ছিল। সেই দৃশ্যে অবশ্য কোনো চরিত্র থাকবে না। এদিকে নেপালে বেশির ভাগ প্লেনই ভ্রমণার্থীদের জন্য বুকড্। বিশেষত সাহেব-মেমরা প্লেনগুলিকে ভাড়া করায় আমাদের একটু অসুবিধা দেখা দিল। তারা বেশি টাকাপয়সা দেওয়ায় প্লেনের টিকিটের দাম যেমন চড়া, তেমনি যাত্রীর সংখ্যা বেশি থাকায় প্লেন ভাড়াও পাচ্ছিলাম না। আর ভাড়া পাওয়া গেলেও তাতে শূটিং করা যাবে কিনা, তা নিয়ে বিস্তর সংশয় দেখা দিল। তবে নেপালপ্রবাসী আমাদের এক বাঙালী বন্ধু অমিয় দাশগুপ্ত এ ব্যাপারে মুশকিল আসান করে দেন। তিনি একদিন আমাকে দুটো কমপ্লিমেন্টারি দিয়ে বললেন, আপনি আর ক্যামেরাম্যান চট করে শূটিংটা সেরে আসুন। বিমানবন্দর থেকে বিমানের ওঠানামার দৃশ্য তোলার অনুমতি আপনাকে দেওয়া হয়েছে। এমনকী বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আপনার জন্য অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সময় বরাদ্দ করেছে। ব্যস, কেল্লাফতে।

শুকতারার পক্ষ থেকে আমাকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে যে, শার্লক হোমসের জন্য লন্ডনের ২২১ বি বেকার স্ট্রীটে একটি মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে। এমনকি সমস্ত বেকার স্ট্রীটেই চায়ের স্টল, কফি হাউস, জামাকাপড়ের শোরুম খুলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। ফেলুদার আবাসগৃহ রজনীকান্ত সেন রোডের ব্যবসায়ীরা সেটা করেননি কেন? তো আমি সেই প্রশ্নের উত্তরে আমার পাঠক এবং দর্শকদের বলতে চাই, ২৭ নাম্বার রজনীকান্ত সেন রোডের ব্যবসায়ীরা কেন ফেলুদাকে নিয়ে ব্যবসার মতলব ভাঁজতে পারলেন না, সেটা আমার কাছে অজ্ঞাত। লন্ডনে আমি আগেও গেছি। তখন বেকার স্ট্রীটে এত রমরমা ছিল না। ইদানীং শার্লক হোমসকে ঘিরে ব্যবসা বেড়েছে। মানুষজন করে কম্মে খাচ্ছে। তা ফেলুদার নামেও মিউজিয়াম হতেই পারে। আজ না হোক ১০০ বছর পরে হয়তো হবে। আমার বিশ্বাস রজনীকান্ত সেন রোডে ফেলুদার নাম ভাঙিয়ে ব্যবসা করলে ভিড় বাড়বে। কারণ নন্দনে ৬ সপ্তাহব্যাপী ফেলুদার ছবি প্রদর্শনীতে ব্যাপক ভিড় হয়েছিল। স্টলগুলিতে বিক্রিবাট্টা হয়েছিল প্রচুর। ফেলুদাও একদিন ইতিহাস হয়ে জাদুঘরে স্থান পেতে পারেন। কারণ সব্যসাচী বা অপুর বয়স অনুসারে তাঁরা আগামী আরও দশ বছর ফেলুদা এবং তপসের ছবিতে অভিনয় চালিয়ে যেতে পারবেন। এই সামগ্রিক দশ বছরে ফেলুদার ছবির রেশ আগামী দিনে পড়বে। অর্থাৎ ফেলুদা সম্পর্কে যে আগ্রহ তৈরি হবে, তাতে পরবর্তী ইতিহাসে চাহিদা থাকবে, ফেলুদা সম্পর্কে জানা বা বোঝার। তখন প্রয়োজন পড়বে ফেলুদার জাদুঘরের। সেখানে জানা-বোঝার জন্য সব মজুত থাকবে। উপন্যাস, স্ক্রিপ্ট, পাণ্ডুলিপি, শূটিংয়ের পোশাক-আসাক, মানে সমগ্র ফেলুদা।

সবশেষে আমি বলব, খুব তাড়াতাড়ি আমি ফেলুদাকে নিয়ে অনেক বেশি বেশি ছবি করব। তবে ফেলুদার অনেকগুলো উপন্যাসের মধ্যে কোনটা আগে করব, কোনটা পরে, সেটা এখনই বলা ঠিক হবে না। তাছাড়া গল্প, উপন্যাসে অনেক কিছু লেখা যায়। কিন্তু ছবি করতে গেলে বাস্তবে যে তা সম্ভব হয় না সেটা টের পাওয়া যায়। যেমন 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' বা 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার রহস্য' উপন্যাস নিয়ে ছবি করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। কারণ বাঘ পাওয়া এখন ভীষণ ঝকমারির ব্যাপার। বাঘ এখন প্রায় পাওয়াই যায় না। তাছাড়া অনেক বিধি-নিষেধও থাকে। তাই এই উপন্যাসগুলি নিয়ে ছবি করার ইচ্ছে থাকলেও এই মুহূর্তে উপায় নেই। আমাদের দেশে বিমান, হেলিকপ্টার নিয়ে শূটিং করার অনেক বিধিনিষেধ আছে। তাই চিন্তা-ভাবনা করছি। তবে খুব শীঘ্র বড় পর্দায় যে ফেলুদার ছবি নিয়ে ছোটদের সামনে আমি হাজির হচ্ছি, এটা বলতে পারি। এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক ফেলুদা করব। এটা আমার প্রতিশ্রুতি। জয় বাবা ফেলুনাথ!

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে

ছবিঃ হীরক সেন

বাহাদুর বেড়াল

তলোয়ারমাছটা নিয়ে ঠিক ভাবে দাঁড়াও, ভাইসব!
যাদুঘর
এবার ভেড়ির মালিক একটা তলোয়ারমাছ দিয়ে কি করতে চায়?
মাছধরা নিষেধ
কি সর্বনাশ! এতো একটা খুনী বলে মালুম হচ্ছে!
এবার বাহাদুর কিছু মাছ চুরির চেষ্টা করে দেখুক!
পেঁচুদা, তোমার যাদুঘর থেকে আমি কিছু একটা ধার নিতে চাইছি!
নিশ্চয় বাহাদুর!
এটা ব্লাণ্ডারবাস!
যাদুঘর
আর আমি ঐ তলোয়ার মাছটাকে কিছু দেবো!
পেয়েছি ওকে!
হাঃ হাঃ হাঃ!
ও এখন আর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না!
যতই ঢুঁসো মারো, তুমি এখন একটা ভুষো মাল ছাড়া আর কিছু নও! হেঃ হেঃ!

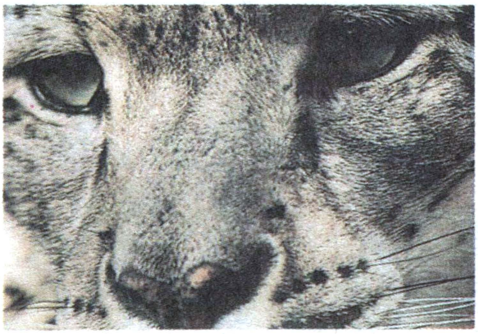

তুষারচিতার রাজ্যে কয়েকটি বছর

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গভীর রাত। হিমেল বাতাস বইছে ঝড়ের মতো। সময়টা হেমন্তের শুরু। তবে হিমালয়ের এই গিরি-সঙ্কটটিতে সারা বছরই প্রচণ্ড শীত। তুষারপাত হয় না শুধু গ্রীষ্মের দুটি মাস।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে জায়গাটির উচ্চতা প্রায় ষোলো হাজার ফিট। চারিদিকে রুক্ষ আর কঠিন পাথর। গাছপালা এই উচ্চতায় জন্মায় না। তাই সবুজের চিহ্ন নেই।

গিরিসঙ্কটের একদিকে গভীর খাদ। অপরদিকে বড় বড় ঝুলন্ত কয়েকটি পাথর। এমনই একটি পাথরের খাঁজে ওত পেতে বসে আছেন একজন মানুষ। কনকনে শীত তাঁকে অসাড় করে দিয়েছে। অপরিসর জায়গায় নিজেকে তিনি লুকিয়ে রেখেছেন সূর্যাস্তের পর থেকে। ফলে তাঁর শরীরময় ব্যথা। তবু তিনি চেয়ে আছেন অপলক। এখন কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে চাঁদ না থাকলেও ফুটে আছে অজস্র নক্ষত্র। ওদের ঝিকিমিকি আলোতেই দেখা যাচ্ছে গিরিসঙ্কটের অপরিসর পথ। মানুষটি চেয়ে আছেন ঐ পথের দিকেই।

আজ তাঁর চতুর্থ নিশি জাগরণ। শারীরিক কষ্ট ছাড়া আর কোনও

☞ ছবিটি তুষারচিতা নিজেই তুলেছে।

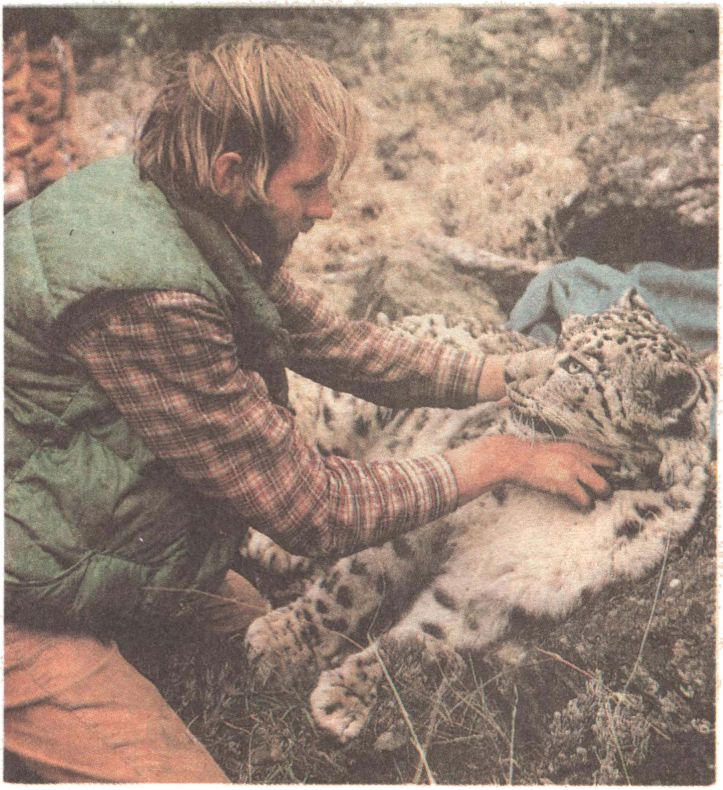

একের গলায় রেডিও কলার পরাচ্ছেন রডনি।

অভিজ্ঞতা হয়নি। মানুষটি তাই বিষণ্ন বোধ করছিলেন সামান্য। সুদূর আমেরিকা থেকে নেপাল-তিব্বত সীমানা বরাবর হিমালয়ের এই দুর্গম জায়গাটিতে তিনি এসেছেন। কত পরিশ্রম! কত অর্থব্যয়! তবু আশা পূর্ণ হলো না তাঁর! শৈশবের ইচ্ছেটুকু বুঝি অধরাই রয়ে গেল জীবনে। গভীর রাতের ঝোড়ো বাতাস বওয়ার শব্দ শুনতে শুনতে সে কথাই ভাবছিলেন নিঃসঙ্গ মানুষটি।

রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়ি দেখে ভদ্রলোক তাঁবুতে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন। গায়ের জ্যাকেট, মাথার টুপি একটু ঠিকঠাক করে নিতে যাচ্ছেন এমন সময় ব্যাপারটা নজরে পড়ল তাঁর। কি যেন নড়ছে-চড়ছে সামনে? একটা চতুষ্পদ প্রাণী না? হ্যাঁ, তাই তো। ধীরপায়ে দুলকি চালে জন্তুটি এগিয়ে আসছে ওঁরই দিকে। আরও একটু এগোতেই ভয়ানক চমকে উঠলো সে। তারপর খুব মনোযোগ দিয়ে শুঁকতে থাকলো আশপাশের পাথর আর রাস্তার ধারে গজানো লতাগুল্ম। ততক্ষণে 'GOT IT'

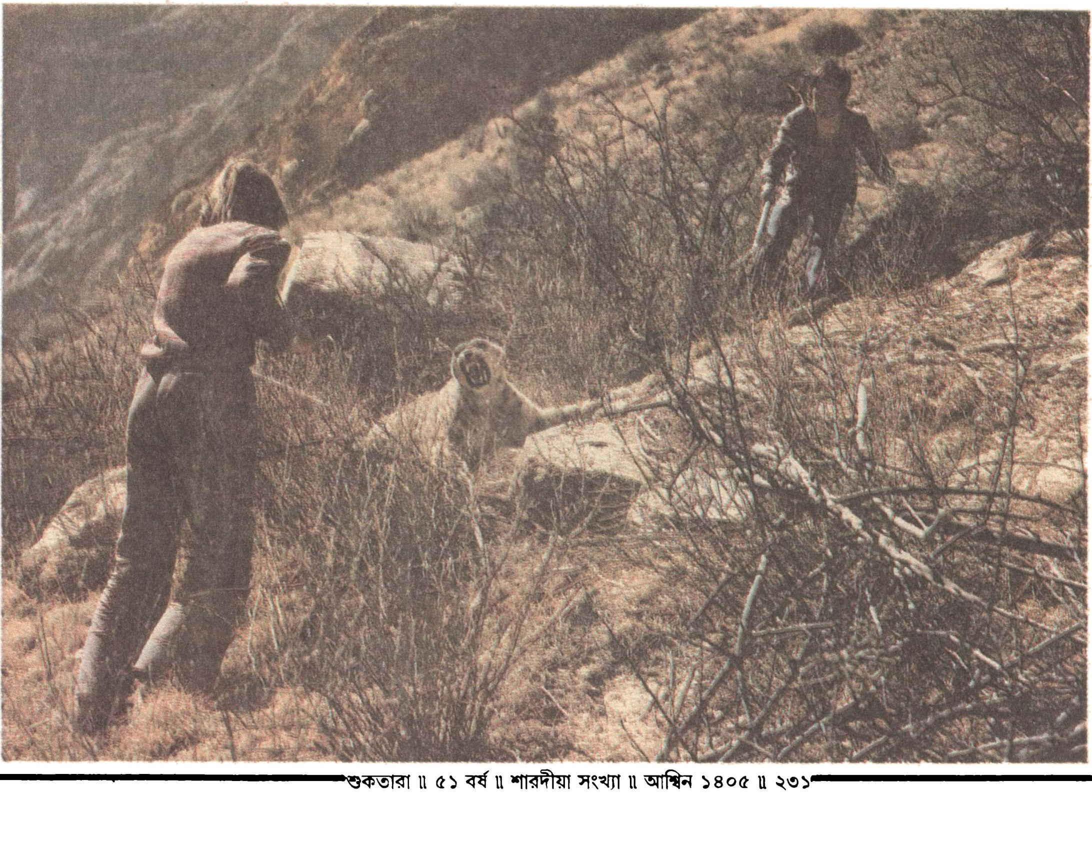

ফাঁদে পড়েছে এক।

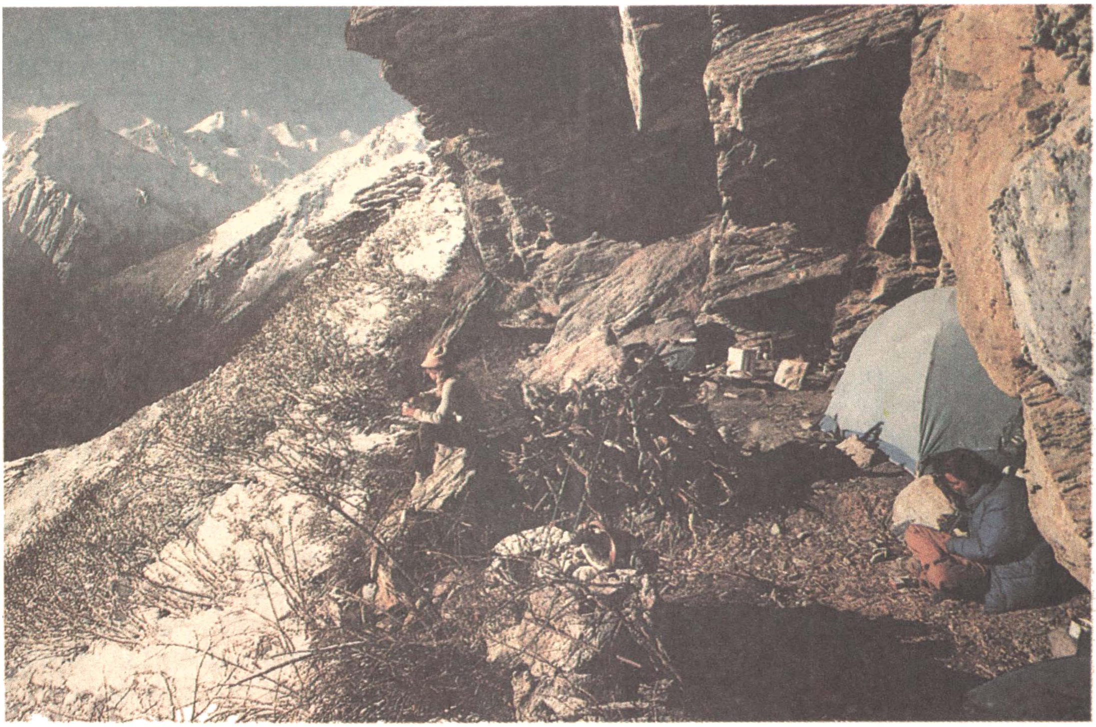

তাঁবুর ভেতর রডনি। দূরে বসে আছেন ডারলা।

বলে চেঁচিয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক। ফ্লাশ বাল্বের আলোর ঝলকানিতেই তাঁর ইচ্ছেপূরণ হয়ে গিয়েছে। দেখেছেন তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষাকে একেবারে সামনা-সামনি। একটি মস্ত তুষারচিতা। তার চলার পথে বাঁধা ছিল একটি লম্বা সুতো। সুতোর অপর প্রান্তটি বাঁধা লুকিয়ে রাখা একটি ক্যামেরার শাটারে। তুষারচিতার পায়ের চাপে দড়ি ছিঁড়তেই পড়ে গিয়েছে শাটার। অমনি জ্বলে উঠেছে ফ্ল্যাশ। পরদিন তাঁবুর ডার্করুমে 'ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন মানুষটি। তুষারচিতাটির ছবি উঠেছে চমৎকার। আর সে ছবি তুলেছে কোনও মানুষ নয়। ঐ প্রাণীটি নিজেই। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোনও তুষারচিতা এ কাজে বাহাদুরি দেখাতে পারেনি।

ছবিটির সঙ্গে বিখ্যাত হলেন সেই রাতজাগা মানুষটিও, যাঁর নাম রডনি জ্যাকসন। রডনিই তুষারচিতাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর। আমেরিকা তাঁর দেশ। তবু তুষারচিতার টানে বারে বারে তিনি ছুটে গেছেন সুদূর নেপালে।

দার্জিলিংয়ের চিড়িয়াখানায় দেখা যাবে এই চিতাটিকে।

সেখান থেকে পায়ে হেঁটে হিমালয়ের বহু উঁচু গিরিসঙ্কটে। যে পথে আগে কোনও মানুষ হাঁটেনি কোনও তুষারচিতার সন্ধানে। পথের দুর্গমতা তাঁকে বহুবার ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর মুখে। বহুবার অভিযান পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন তাঁরই দলের লোকজন। তবু রডনি ছিলেন অটল অনড়। সেই কোন শৈশবে প্রাণীটির সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ জন্মায়। কি ভাবে একটি তুষারচিতাকে স্বচক্ষে দেখা যায় এই চিন্তাই তাঁকে তাড়া করে বেড়াত সবসময়। ঐ প্রাণীটির সম্বন্ধে বিশদ জানতেই তিনি পরবর্তীকালে হলেন জীববিজ্ঞানী। সেই সঙ্গে ছবি তোলাতেও হাত পাকালেন। ছবি তুলতেন জঙ্গলের হিংস্র সব প্রাণীদের। উনিশশো ছিয়াত্তর সালে তিনি একা আসেন নেপালে। ইচ্ছে ছিল সে বারই চলে যাবেন উত্তুঙ্গ হিমালয়ের সেই অংশে যেখানে তুষারচিতাদের চারণভূমি। প্রথমবার ভিসা ফুরিয়েছিল। তা ছাড়া লোকবলও ছিল না, যা কিনা খুবই প্রয়োজন এমন ধরনের অভিযানে। তাই উনিশশো একাশি সালে তিনি তৈরি হয়েই শুরু করেন অভিযান। সে অভিযানই রাতারাতি

বিখ্যাত করে দেয় রডনিকে। সাধারণ মানুষেরও লাভ হয়। অনেক অজানা তথ্য জানা যায় বিরল হয়ে আসা এই আশ্চর্য সুন্দর প্রাণীটি সম্পর্কে।

তুষারচিতা। ইংরেজিতে এদের নাম SNOW LEOPARD এবং OUNCE। তবে অভিযান শেষে রডনি বদলে দিতে চেয়েছিলেন ওদের নাম। SNOW LEOPARD-এর বদলে CRAG LEOPARD। CRAG মানে বন্ধুর ও দুরারোহ পাহাড়। বাস্তবে ওদের এমন জায়গাতেই দেখা যায় বলে রডনির ঐ নামটির কথা মনে হয়েছিল। উত্তুঙ্গ হিমালয়ের ছয় থেকে উনিশ হাজার ফিট উচ্চতায় ওদের বাস। গরমে ওরা উঠে যায় আরও ওপরে, আবার শীতের প্রাবল্যে নেমে আসে ছয় হাজার ফিট পর্যন্ত। দৈর্ঘ্যে এরা কমবেশি সাত ফিট। অবশ্য তিন ফিট লম্বা ঘন লোমে ভরা ল্যাজটি ধরে। ওদের ওজন তেইশ থেকে একচল্লিশ কিলোগ্রাম।

পাহাড়ে বাস বলেই ওরা নির্জনতাপ্রিয়। প্রতিটি তুষারচিতার নিজস্ব এলাকা আছে। সেই এলাকাটি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তুষারচিতা দেখা যায় উত্তর-পশ্চিম ভারত, সিকিম, হিমাচল প্রদেশ, ভুটান, নেপাল, তিব্বত এবং চীনের কিছু কিছু অংশে। ঘোরাফেরার মাঝে বিশ্রামের জন্য এরা বেছে নেয় নিরাপদ এবং গোপন আশ্রয়, যেখানে বসে ওরা রোদ পোয়াতে পারে। কিংবা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। পাহাড়ের আশ্রয় বলতে হয় গুহা কিংবা কোনও ঝুলন্ত পাথরের আড়াল। এরকম জায়গা থেকেই ওরা শিকার ধরতে বেরোয়। শিকারের সময় মূলত সূর্যাস্তের পর। তবে ক্ষিদের জ্বালায় ওরা দিনের বেলাতেও বেরোয়। ওদের খাদ্য তালিকায় আছে বুনো ভেড়া, ছাগল, খরগোশ, বড় কাঠবেড়ালি এমনকি কিছু কিছু পাখিও। বরফ এবং পাথরের রাজ্যে খাবার সব সময় সহজলভ্য নয়। তাই পাহাড়ি লোকালয়গুলিতে ওরা খাবারের জন্য হানা দেয়। না, মানুষের সঙ্গে কোনওরকম সঙ্ঘাতে যায় না এরা।

কেতাবী শিক্ষাকে স্বচক্ষে মিলিয়ে নিতেই রডনি এসে পৌঁছালেন লাংগুতে। সেটা ছিল উনিশশো ছিয়াত্তর সাল। অনেক চড়াই আর উতরাই ভেঙে তবেই পৌঁছানো যায় লাংগু। জায়গাটি পশ্চিম নেপালের একটি মস্ত উপত্যকা। সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল আরো ওপরে দুর্গমতম জায়গায় একটি গ্রাম আছে। হিমালয়ের বুকে সেই শেষ গ্রাম। নাম ডলফু। সেখানে পৌঁছাতে রডনির আরও কয়েকটি দিন গেল। পৌঁছে তিনি দেখলেন প্রকৃতি সেখানে আরও নির্মম। তাই জীবনধারণ করতে ওখানকার কয়েক ঘর মানুষকে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়। তবে রডনিকে ওরা সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানালো। ভিন্‌দেশী কোনও মানুষ হঠাৎ করে তাদের কাছে এলে ওদের নিস্তরঙ্গ জীবনে আনন্দের ঢেউ ওঠে।

আনন্দ রডনিরও হলো। মানুষগুলি যেন চারপাশের প্রকৃতির মতোই সহজ সরল। ওঁর আগমনের উদ্দেশ্য জেনে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল একটি যুবক। তারপর দৌড়ে চলে গেল তার ঘরে। কথা হচ্ছিল বেশির ভাগই ইশারায় এবং সামান্য ইংরেজিতে। তুষারচিতা দেখতে পাওয়া যে কত কঠিন তাই নিজের মতো করে বোঝাচ্ছিলেন গ্রামের মোড়ল মশাই। তাঁর কথার মাঝে ফিরে এল যুবকটি। তবে খালি হাতে নয়, একটি চটের বস্তা নিয়ে। বস্তা থেকে বেরোচ্ছে বিশ্রী পচা গন্ধ। উত্তেজনায় টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সাহেব।

ওঁর আশঙ্কাই সত্য হলো। বস্তা খুলতেই দেখা গেল সদ্য মারা একটি তুষারচিতার চামড়া। ভাল করে শুকনো হয়নি বলে জায়গায় জায়গায় কাঁচা মাংস লেগে ছিল। যুবকটি রডনির পায়ের কাছে চামড়াটি রেখে বলল, মাত্র দশ ডলারের বিনিময়ে সে এটি বিক্রি করতে রাজী আছে। রডনি জানতেন আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়াটির দাম ষাট হাজার ডলার (১৯৭৬ সালের হিসেবে)। চোরা-শিকারীদের বরাবরের নজর এই প্রাণীটির উপর। কারণ বিদেশী অভিনেত্রীরা এদের চামড়া থেকে তৈরি কোট পেলে আর কিছু চান না। বেশ কয়েকজনের সংগ্রহে এমন কোট একাধিক আছে। আঠেরোটি তুষারচিতা মারতে হয় একটি লংকোট তৈরি করতে। প্রচুর অর্থের লোভে নির্বিচারে মারা হয়েছে তুষারচিতা বহু বছর ধরে। ফলে ওদের সংখ্যা কমতে কমতে দাঁড়িয়েছিল হাজার খানেক (১৯৭৬ সালের হিসেব। বর্তমানে ওদের সংখ্যা মাত্র পাঁচশো)। রডনি এও বুঝলেন স্থানীয় মানুষদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিতে এইসব চামড়া-ব্যবসায়ীরা সব সময়ই সচেষ্ট।

রডনির প্রশ্নের উত্তরে যুবকটি

জানালো সে বিষাক্ত তীরের সাহায্যে মেরেছে প্রাণীটিকে। মাঝে-মধ্যেই এমন কাজ তাদের করতে হয় শুধুমাত্র অর্থের জন্য। সেই মুহূর্তে রডনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তুষারচিতা অভিযানে প্রথম সঙ্গী করবেন এই যুবকটিকে। একে সঙ্গে নিলে গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে তাড়াতাড়ি। আর তুষারচিতা নিয়ে কাজ করতে করতে ওর মধ্যে তিনি জাগিয়ে তুলবেন জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ। সেই বোধ যুবকটি আবার জাগিয়ে তুলবে তার গ্রামবাসীদের মনে। এভাবেই তুষারচিতাদের সংরক্ষণ শুরু করেন রডনি।

ডলফু গ্রামে রডনিকে আবার দেখা গেল উনিশশো একাশি সালে। এবার আর সাহেব একা নন। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী ডারলা, একজন নেপালী জীববিজ্ঞানী, স্থানীয় সেই যুবকটি ছাড়াও আরও একজন পথপ্রদর্শক এবং জনা চারেক মালবাহক। সুদীর্ঘ সময় কাটাতে হবে পাহাড়ে। তাই মালপত্রও ছিল পর্বতপ্রমাণ। খাবার-দাবার ছাড়াও ওঁদের সঙ্গে ছিল তাঁবু, প্রচুর শীতবস্ত্র, ফটো তোলার নানারকম সাজসরঞ্জাম, রেডিও রিসিভার, দরকারি ওষুধপত্র এবং আরও নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। কাঠমাণ্ডু শহর থেকে যাত্রা শুরু করার পর হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন ডারলা, আরে সর্বনাশ! সাবান টুথপেস্ট আর মোমবাতিই যে নেওয়া হয়নি। ভাগ্যিস শেষমুহূর্তে ব্যাপারটা নজরে এসেছিল ডারলার।

ডলফু ছেড়ে আরো ওপরে ওঠা শুরু হতেই বোঝা গেল দুর্গম শব্দের অর্থ। হিমালয় প্রতিমুহূর্তে যেন দুর্গমতম হয়ে উঠছে। পথ চলার সময় সমস্ত চেতনাকে নামিয়ে আনতে হবে নিজের পায়ে। মৃত্যু সেখানে অনুসরণ করে প্রতিনিয়ত। একটু অসতর্ক হলেই দেহাবশেষ মিলবে না কোথাও। পথে কোথাও গভীর গিরিখাদ, কোথাও পাথরের দেওয়াল। দড়ি বেঁধে পেরোতে হচ্ছিল খাদ কিংবা গাঁইতি দিয়ে পাথর কেটে পথ করে নিতে হচ্ছিল ওঁদের। এইভাবে হপ্তাদুয়েক হেঁটে পৌঁছানো গেল লাঙ্গু গর্জ। গর্জ কথাটি আসলে ইংরেজি। যার অর্থ গিরিসঙ্কট। এই পথটুকু পেরোতে গিয়ে রডনির মনে হচ্ছিল এমন অভিযানে না বেরোলেই হতো। হিমালয় যেন চরম অসহযোগিতা শুরু করেছে। পথঘাটের দুরগম্যতা তো ছিলোই। এর সঙ্গে যোগ হলো খারাপ আবহাওয়া। বহু কষ্টে প্রায় প্রাণ হাতে করে সেই জায়গাটুকু অতিক্রম করার পর সঙ্গী যুবকটি একদিন বলল, ব্যস। এসে গেছি। ওরা এইখানেই থাকে।

ওরা যে থাকে তার প্রমাণ সর্বত্র। নরম বরফের ওপর একাধিক পায়ের ছাপ। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ায় তারা এ জায়গাটিতে। একটা গোটা ফিল্ম শেষ করে রডনি ব্যস্ত হলেন পায়ের ছাপগুলিকে প্লাস্টার অব প্যারিসে তুলে নিতে। সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন এখানেই হবে প্রথম ক্যাম্প। একটি জায়গায় লুকিয়ে বসানো হলো ক্যামেরা। আর বেশ কিছু দূরে পাতা হলো একটি ফাঁদ।

চারদিনের দিন তুষারচিতার ছবি উঠলো। পঞ্চম দিনে ফাঁদে ধরা পড়লো একজন। রডনি তাঁর সহকারীকে নিয়ে কাছে যেতেই আক্রমণের জন্য তৈরি হলো বিশাল আকারের পুরুষ চিতাটি। রডনি তৈরি ছিলেন। ব্লোপাইপের সাহায্যে ঘুমপাড়ানি ওষুধ ছুঁড়তেই চিতা ঢলে পড়লো জ্ঞান হারিয়ে।

রডনি তখন উত্তেজনায় টান টান। এই তাহলে তুষারচিতা? কল্পনায় যাকে অহরহ দেখেছেন সেই ছেলেবেলা থেকে? চেতনাশূন্য চিতাটির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁর যেন আশ মিটছিল না। সঙ্গী যুবকটি তাড়া দিল। বেশি দেরি হলে চিতার জ্ঞান ফিরে আসবে। তাতে বিপদ হতে পারে ওঁদের দুজনেরই। রডনি দ্রুত হাতে চিতার গলায় বেঁধে দিলেন রেডিও কলার। প্রথম স্পর্শ করা তুষারচিতা। তাই ওর নাম দেওয়া হলো এক। ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় জ্ঞান ফিরে এলো একের। তারপর টলোমলো পায়ে সে হারিয়ে গেল পর্বতের আড়ালে। রডনি খুব খুশি তখন। যাক না এক যেখানে তার ইচ্ছে। গলায় বাঁধা রেডিওর সঙ্কেত ওঁদের চব্বিশ ঘণ্টাই খবর দিয়ে যাবে ওর সম্পর্কে।

রডনির ইচ্ছে আরও কয়েকটি তুষারচিতার গলায় রেডিও কলার বাঁধার। যত বেশি সংখ্যক প্রাণীর গতিবিধি এভাবে জানা যায় আর কি। পরিকল্পনা মতো আরও তিনটি দল হলো। ঠিক হলো আরও ওপরে তিনটি তাঁবু ফেলা হবে। তারপর একই উপায়ে বাঁধা হবে রেডিও কলার। ডারলা রয়ে গেলেন মূল ক্যাম্পে একেবারে একা। রেডিও সঙ্কেতগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য।

রডনি সেই সময়কার অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখেছিলেন ডায়েরিতে। পরে যা বই আকারে বাজারে বেরোয়। তুষারচিতার খোঁজে চলতে চলতে রডনির মনে হয়েছিল তাঁরা বুঝি পাহাড়েরই কোনও প্রাণী। বহুদিন সভ্য সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। শরীর-স্বাস্থ্য সকলের খারাপ হচ্ছিল দিনকে দিন। ছিল ছোট-বড় চোট-আঘাতের সমস্যাও। উপরন্তু শেষের কয়েক মাস তাঁদের আহার বলতে ছিল ভাত আর আলু সেদ্ধ। প্রচণ্ড কৃচ্ছ্রসাধনের ফল অবশ্য ফলেছিল। রডনি আরও তিনটি তুষারচিতার গলায় বাঁধতে পেরেছিলেন রেডিও কলার। তাদের তিনি নাম দিয়েছিলেন, দুই, তিন আর চার। রডনির দলের লোকেরা আরও চারটি তুষারচিতার গলায় যন্ত্রটি বাঁধতে পেরেছিলেন।

রেডিও কলার বাঁধার পর কোনও তুষারচিতাকেই আর দ্বিতীয় বার দেখা যায়নি। তবে রেডিওর মাধ্যমে সঙ্কেত আসত নিরবচ্ছিন্নভাবে। আর তাতেই বোঝা যেত কোন চিতাটি কোথায় কি ভাবে আছে।

উনিশশো একাশির পর উনিশশো বিরাশি এবং তিরাশি। পরপর দুটি বছর রডনি আবার গিয়েছিলেন তুষারচিতাদের পাড়ায়। সৌভাগ্যবশত প্রতিটি রেডিও কলার তখনও দিব্যি কাজ করছিল। তুষারচিতাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছিলো না বটে তবে চারদিকে ওদের টাটকা পায়ের ছাপ। ওরা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে বলে ওদের পেছনের পায়ের ছাপ পড়ে অত্যন্ত স্পষ্ট। পায়ের ছাপ ছাড়াও প্রতিটি চিতাকে আলাদা ভাবে চিনতে রডনি নির্ভর করতেন ওদের

মূত্রের গন্ধের ওপর। যার সাহায্যে তুষারচিতারা তাদের নিজস্ব সীমানা ঠিক করে নেয়। রডনি এই অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন একটি নদীর পাঁচ হাজার মিটার লম্বা খাত বরাবর।

গভীর রাতে তুষারচিতার ডাক শোনার অভিজ্ঞতাও লিখে রেখেছেন রডনি। কেমন সে ডাক? রডনি লিখেছেন, 'ধরুন বাইরে তুষারপাত হচ্ছে। আপনারা কয়েকজন তাঁবুতে বসে গল্প করছেন। ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ হচ্ছে বাইরে অবিরল। হঠাৎই কোনো তুষারচিতা হাঁক পাড়লো কাছাকাছি কোথাও। সে শব্দ শুনে খুব অল্প লোকেরই সাহস হবে বাইরে বেরোবার। তুষারচিতার ডাক খুব তীক্ষ্ণ এবং তীব্র। মনে হয় হঠাৎ কোনও মানুষ ভীষণ বিপদে পড়ে যেন আর্তনাদ করছে প্রাণপণে। সেই ডাক যখন গভীর অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হয় চারপাশের পর্বতে, তা বড় ভয়ঙ্কর লাগে।'

এক সময় সন্দেহ হয়েছিল চারের বুঝি বাচ্চা হবে। এ ব্যাপারে রেডিও টেলিমেট্রির সাহায্য তেমন পাওয়া যাচ্ছিলো না। কিন্তু বিরাশির জুন মাসে বোঝা গেল চারের প্রসব হয়েছে নির্বিঘ্নেই। কেননা তখন নানা জায়গা থেকে রেডিও সঙ্কেত না এসে আসছিল একটি বিশেষ সংকীর্ণ গিরিখাদের দিক থেকে।

তবে চারের বাচ্চা হওয়ার পরেই ভেসে এল একটি দুঃসংবাদ। দুঃসংবাদ না বলে অবশ্য তাকে দুঃসংকেত বলাই ভাল। দেখা গেল দুইয়ের গলায় যে রেডিও কলারটি বাঁধা ছিল সেটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সঙ্কেত পাঠিয়ে চলেছে। এর অর্থ একটিই হতে পারে। দুইয়ের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর কারণ জানতে রডনি তৎপর হলেন।

রেডিও সংকেতটি আসছিল অত্যন্ত দুর্গম জায়গা থেকে। সেখানে পৌঁছানো প্রায় অসাধ্য। প্রথম কারণ পুরু বরফ। দ্বিতীয়টি অসম্ভব খাড়াই জায়গাটি। বহু পরিশ্রম করে পথ বানিয়ে সেখানে তো পৌঁছানো গেল। কিন্তু দুইকে পাওয়া গেল না। তার বদলে পড়ে আছে গলা থেকে ছিঁড়ে ফেলা রেডিও কলারটি। সেই অবস্থাতেই সেটি কাজ করে যাচ্ছে। রডনি কলারটি তুলে নিলেন। দেখা গেল কলারের বেল্টে অনেকগুলি আঁচড়ের দাগ পড়েছে। তবে কি অন্য কোনও তুষারচিতার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বসেছিল সে? প্রায় গোয়েন্দার মতো অনুসন্ধান চালালেন রডনি। বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করার পর রডনি দেখলেন দেড়শ ফিট নিচে একটি বুনো ভেড়ার হাড়গোড় পড়ে রয়েছে। আর তা দেখেই সমাধান হলো রহস্যের। দুইয়ের গলায় বাঁধা বেল্টে ভেড়ার শিংটি ঢুকে গেছিল হঠাৎ। তাতে অস্বস্তিতে পড়েছিল দুই। প্রবল টানাটানিতে সে ছিঁড়ে ফেলে কলার বেল্ট। কলার বেল্টের ওপর আঁচড়ের দাগের কারণটিও বোঝা গেল।

কদিন পর রডনি তাঁর রেডিও রিসিভারটি সবে চালু করেছেন, অমনি ভেসে এল সংকেত। সে সংকেত অতি স্পষ্ট এবং জোরালো। রডনির কি মনে হলো, যন্ত্রের সামনে না বসে তিনি দৌড়ে এলেন বাইরে। বেরোবার সময় কাঁধে দূরবীনটি নিতে অবশ্য ভোলেননি। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে দূরবীন হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। রডনি শিহরিত হলেন দৃশ্যটি দেখে। তখন ভোর হচ্ছে সবে। পুব দিকের পর্বতশৃঙ্গগুলিতে লাগছে সোনালি রঙ। সেই অপরূপ মুহূর্তটিকে চাক্ষুষ করতেই বোধহয় বেরিয়ে পড়েছে চার। দৃপ্তভঙ্গিতে সে চলেছে একটি খাড়া পাহাড়ের ধার দিয়ে। পেছনে গড়িয়ে চলেছে দুটি উলের বল। বল দুটি মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠছে। কখনও বা তারা ছুটে চলে আসছে চারের পেটের নিচে। চার সামান্য পেছন ফিরে একটু নাক ঘষে দিল বল দুটির গায়ে। তারপর পা ছড়িয়ে বসল একটি পাথরের খাঁজে। অমনি লাফিয়ে চলে এল বল দুটি। চারের সদ্যোজাত দুটি বাচ্চা। মহা আনন্দে তারা দুধ খেতে শুরু করে দিল। রডনির মনে হলো ঠিক এই মুহূর্তটিতেই যেন পূর্ণ হলো তাঁর শৈশবের স্বপ্ন। এই দৃশ্যটি ছাড়া যেন তাঁর অভিযানের সুখসমাপ্তি ঘটতো না।

(কৃতজ্ঞতাঃ স্যাংগ্রিলা জুলাই—সেপ্টেম্বর ১৯৯০।)

মিষ্টি লাগে

পবিত্র সরকার

ষাঁড় যদি ভাই যায় রে খেপে,
এই পৃথিবী ওঠেন কেঁপে।
ভিড় হয়ে যায় হাওয়া, লোকে
'বাপ্ রে!' বলে পালিয়ে ভাগে।—

দেখতে ভারী মিষ্টি লাগে।

পিছল পথে ভীষণ কাবু,
পা-টিপে ওই চলেন বাবু।
হঠাৎ ধপাস আছাড় খেয়ে
তাঁর মাথাতে ঘূর্ণি জাগে।—

দেখতে ভারী মিষ্টি লাগে।

ভিড়ে কে নেয় পকেট কেটে,
সাহেব ফেরেন রাস্তা হেঁটে,
চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করেন
সবার ওপর দারুণ রাগে।—

দেখতে ভারী মিষ্টি লাগে।

মস্ত কুকুর করলে তাড়া,
ছিটকে সরাই ছন্নছাড়া;
পেটমোটা লোক দৌড়ে ছোটে
রোগা লোকের অনেক আগে।—

দেখতে ভারী মিষ্টি লাগে॥

ছবি : সুফি

সভার পাতা

নতুন ধাঁধা

১. আগে Mat পরে Mat
মাঝখানে সে
তার ডিগ্রী ICS
বলো তো সে কে?

অরিত্র সরকার
উদয়পুর/দঃ ত্রিপুরা

২. জানি তুমি পাবে না
তবুও তো কেউ ছাড়বে না।

মিলটন খাঁ
মনোহর/বাঁকুড়া

৩. রাত গেলে বাস পাবে
জেলা সদর হয়ে যাবে।

অরুণ দাস
ফরাক্কা ব্যারেজ/মুর্শিদাবাদ

৪. পাখির ডাকে কুঁড়ি আছে
আছে আরো পাখি,
আগাগোড়া দিয়ে ধাঁধা
শুকতারাতে লিখি।

শংকর দাশ
লোকপুর/বাঁকুড়া

ফুটকি থেকে ফুটকি

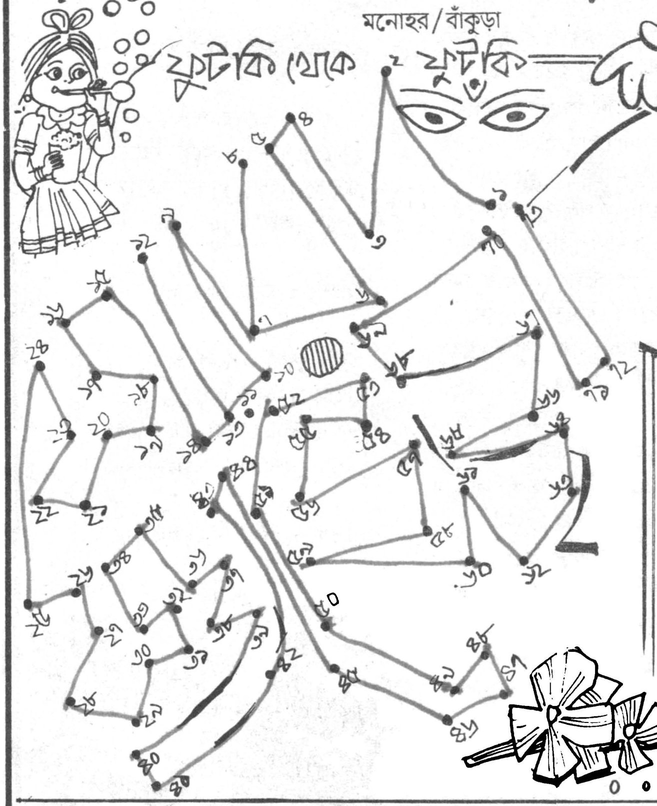

এই ম্যাসকটটি তোমাদের কাছে নতুন নয়, কিন্তু বলতে পারো কি—

- এর ডাক নামটি কি?
- এটি তৈরী করেন কে?

•উত্তর: •ডাক নাম 'ফুটিক্স'
•• তৈরী করেন 'ফেব্রিস পাইলট'

আশ্বিন সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তরঃ ১. Mathematics ২. পাওনা ৩. বারাসত ৪. কাকলি

জলের মতো কঠিন

অনীশ দেব

এ গল্প কখনও লিখব বলে ভাবিনি।

আসলে ব্যাপারটা ঠিক গল্প নয়—ঘটনা। ঘটনাটা প্রায় বিশ বছর আগের, কিন্তু মনে হয় যেন গতকালের। আজ থেকে বিশ বছর আগে সন্ধ্যের আঁধারে ডুবপুকুরের পাড়ে ঠিক কী যে হয়েছিল, সেটা ভাবতে গেলেই কেমন সব গুলিয়ে যায়। মনে হয়, আমি কি সেদিন ঠিক দেখেছিলাম!

পুকুরটার নাম ছিল ডুবপুকুর। গাঁয়ের সবাই বলত, ওটায় ডুব দিলে আর কেউ ওঠে না। তাই বেশ বদনাম ছিল পুকুরটার। সেইজন্যেই কি আমার মনটা সেদিন অন্যরকম ছিল, কেমন যেন গুলিয়ে গিয়েছিল! ফলে সহজ-স্বাভাবিক যা দেখেছি তাকেই কল্পনার রঙ চড়িয়ে উলটোপালটা অবাস্তব করে নিয়েছি! কিন্তু ব্যাপারটা আমি তো একা দেখিনি।

আজকের খবরের কাগজে দেখলাম 'চিঠিপত্র' বিভাগে কল্পনা আর বাস্তব নিয়ে পাঠকদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের আসর বসে গেছে। প্রায় সকলেই লিখেছেন, অলৌকিক বলে কোনও ব্যাপার নেই। যাঁরা অলৌকিকের কথা বলেন তাঁরা হয় মিথ্যে কথা বলেন, অথবা, নিজেদের কল্পনাকে অলীক-দর্শন কিংবা অলৌকিক বাস্তব বলে চালিয়ে দেন। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা নাকি নিছকই 'সোনার পাথরবাটি'।

নিজেকে মিথ্যেবাদী বলে ভাবতে আমার কষ্ট হয়। আর সেরকম কিছু কল্পনাবিলাসীও আমি নই। তাই কাগজের চিঠিপত্রগুলো পড়ে মনে-মনে বেশ রাগই হলো। তখন ঠিক করলাম, ছোটবেলায় দেখা বিচিত্র ঘটনাটার কথা সবাইকে জানাব।

আমার এ-গল্প পবনকে নিয়ে।

পবন ছিল আমাদের বিজয়ী সঙ্ঘের একনম্বর ফুটবলার। ওর শটে যা জোর, তাতে উড়ন্ত কাক-চিলও অতি সহজে ঘায়েল হয়ে যেতে পারে। একবার মনসাডাঙা নেতাজী সুভাষ সঙ্ঘের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ হয়েছিল। খেলা শেষের মিনিট দশেক আগে একটা পাস

পেয়ে পবন বল পায়ে বুলেটের মতো ছুটতে শুরু করল। ওর পেছনে ধাওয়া করল নেতাজী সঙ্ঘের তিনজন খেলোয়াড়। কিন্তু বলটা পবনের পায়ে আঠার মতো লেগে রইল, আর পবন শরীরটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে দিব্যি পৌঁছে গেল পেনাল্টি বক্সের মাথায়। তারপর সামান্য কাত হয়ে ডান পায়ে প্রচণ্ড এক শট নিল। বলটা ওদের গোলকিপার রমাপদ কোলকুঁজো হয়ে সরাসরি রুখে দিল। সংঘর্ষের কেমন একটা ভোঁতা শব্দ হলো এবং পরক্ষণেই ঘটে গেল সেই আশ্চর্য ঘটনা।

রমাপদকে পেছনে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেল বলটা। 'গোল...গোল...' চিৎকারে গোটা মাঠ হইহই করে উঠল।

নেটের ভেতরে রমাপদ চিৎপাত হয়ে পড়ে ছিল। ওর কোনও হুঁশ ছিল না। সুতরাং খেলা সেখানেই বন্ধ হয়ে গেল। তারপর রমাপদকে নিয়ে ডাক্তার-হাসপাতাল ছোটাছুটি। খবর পেয়েছিলাম, পুরোপুরি ভালো হয়ে উঠতে রমাপদর চার মাস সময় লেগেছিল।

আমাদের গাঁয়ের ভালো নাম নসীপুর, আর ডাকনাম ডাকাতে-গাঁ। কারণ, আমাদের গাঁয়ে বারোমাসে তেরোবার ডাকাতি হয়। এত ঘন-ঘন ডাকাতি হওয়ার ফলে ডাকাতির ব্যাপারটা আমাদের একেবারে গা-সওয়া হয়ে গেছে। কতবার যে আমরা ডাকাত দেখেছি তারও কোনও হিসেব নেই। তবে সেইসব ডাকাতের চেহারা মোটেই '...হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল/কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল...'-এর মতো বা রঘু ডাকাতের মতো নয়। অতি সাধারণ কালোকোলো চেহারা—দেখে এমনিতে ডাকাত বলে মনেই হয় না। তবে তাদের হাতে লাঠির বদলে থাকে ছুরি, বোমা আর পাইপগান।

আমাদের গাঁয়ে চারটে ধানকল আর তিনটে কোল্ড স্টোরেজ আছে। ডাকাতি যা হওয়ার বেশির ভাগ ওখানেই হয়। আর কখনও-সখনও দু'-পাঁচ ঘর বড়লোকের বাড়িতে।

আমাদের গাঁয়ের শেষে বট-অশথ-শাল-শিশুর জঙ্গল। সেখান থেকে জ্বালানী কাঠ কেটে এনে অনেকেই দিন গুজরান করে। সেই জঙ্গলে বাঘ না থাকলেও শেয়াল, বনবেড়াল আর দু'চারটে ভাম আছে।

ডাকাতরা ডাকাতি করে সবসময় ওই জঙ্গল দিয়েই পালায়।

একদিন সন্ধ্যের মুখে, তখন আমরা সবে খেলা শেষ করেছি, আমাদেরই এক বন্ধু পিলু এসে খবর দিল যে, শেখ সাহাবুদ্দিনের কোল্ড স্টোরেজে নাকি ডাকাতি হয়েছে। এ-কথা শুনেই পবন আমাকে বলল, 'চল তো, আনু, ডাকাতগুলোকে ফলো করে দেখি ওরা পালিয়ে কোথায় যায়—'

পবন আমাদের পাশের গ্রাম মাড়াইকুঁড়ায় থাকে। কিন্তু পড়ে আমাদের গাঁয়ের হাই-ইস্কুলে। তাই আমাদের বন্ধু হয়ে গেছে। ওর চেহারা কালো, খানিকটা ঢ্যাঙার দিকে। তবে গায়ে জোর আছে, আর পেশিগুলো সবসময় চকচক করে। ওর শটে যেমন জোর, মনের জোরও বোধহয় তেমনই। নইলে কেউ ডাকাতদের পিছু-পিছু যাওয়ার কথা বলে! অবশ্য ও সবসময় বলে, 'তোদের লজ্জা করে না! তোদের গাঁয়ের নাম ডাকাতে-গাঁ হয়ে গেছে!'

আমি রাজী হচ্ছি না দেখে পবন আমার হাত ধরে রীতিমতো টানাটানি শুরু করে দিল। শেষ পর্যন্ত আমি, পিলু, মিলন আর পবন চারজন মিলে রওনা হলাম।

সময়টা ছিল বর্ষাকাল। আমরা মাঠে ফুটবল খেলছিলাম। তাই সকলেরই পরনে হাফ প্যান্ট আর সারা গায়ে-পায়ে কাদা। ফুটবলটা বগলদাবা করে ওই অবস্থাতেই আমরা জঙ্গলের দিকে এগোলাম।

লোকের মুখে শুনে-শুনে আমরা মোটামুটি জানতাম ডাকাতরা কোন্ পথ ধরে পালায়। তাই গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম, পবন আমাদের সকলের আগে-আগে।

তখনও পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসেনি। তার আগেই যাতে আমাদের 'অভিযান' শেষ হয় তার জন্যে আমরা পবনকে তাড়া দিচ্ছিলাম।

জল-কাদা-আগাছার মধ্যে মিনিট পাঁচেকের পথ পেরোতেই আমরা ডুবপুকুরে পৌঁছে গেলাম।

জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎই বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারই মাঝে বেশ বড়সড় একটা পুকুর। অন্যসময় জল তেমন না থাকলেও এখন বর্ষার জলে ঢলঢল। পুকুরপাড়ে দু'-চারটে বড়-বড় গাছ। অন্ধকার নামার আগেই ব্যাঙের দল ডাকাডাকির কাজ শুরু করে দিয়েছে।

বাবা-কাকাদের মুখে শুনেছি, এই পুকুরটা নাকি প্রায় একশো বছরের পুরনো। পুকুর থেকে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ভাঙা পোড়ো বাড়ি। তার কোনও দেওয়ালই অক্ষত নেই—কোথাও অর্ধেক, কোথাও বা সিকিভাগ কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ছাদও সেই কোনকালে ধসে পড়ে গেছে। সুতরাং বর্ষায় ও-বাড়িতে মাথা গোঁজার ঠাঁইও খুঁজে পাওয়া দায়। গাঁয়ের গরিব লোকেরা, যার যখন দরকার, এ-বাড়ির গাঁথুনির ইট খসিয়ে নিয়ে যায়। ইটগুলোর চেহারা কেমন পাতলা ছোট মাপের—দেখেই বোঝা যায় বহুকালের পুরনো।

শুনেছি, এ-বাড়িটা নাকি এককালে রাজবাড়ি ছিল। ভিনদেশিরা হানা দেওয়ার সময় বাড়ির মা-বোনেরা নিজেদের মান বাঁচাতে গলায় কলসী বেঁধে এই পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিল। তারপর থেকেই এই পুকুরটার নাম ডুবপুকুর। সবাই বলে, এই পুকুরে ডুব দিলে কেউ আর ওঠে না।

এখন ডুবপুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা মনে পড়ছিল, আর আমার কেমন গা-ছমছম করছিল। মনের ভেতরে ডাকাতের ভয় চাপা পড়ে গিয়ে ভূতের ভয় মাথাচাড়া দিচ্ছিল।

পবনের ঠেলায় পড়ে ডাকাতদের খোঁজে এদিক-ওদিক খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম আমরা। পবন সাহস করে এক ছুটে পোড়ো বাড়িটাও একবার চক্কর মেরে এল।

সন্ধ্যের ঘোলাটে আঁধার পা টিপে-টিপে নেমে আসছিল। আমাদের দেখতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। তারই মধ্যে মিলন হঠাৎ 'সাপ! সাপ!' বলে

চেঁচিয়ে উঠল। ওর ইশারা মতো তাকিয়ে দেখি কালচে রঙের একটা মোটা সাপ সড়সড় করে ডুবপুকুরের জলে নেমে যাচ্ছে।

আমি বললাম, 'পবন, চল্, ঢের হয়েছে—পরে দিনের আলোয় এসে খোঁজ করা যাবে।'

পবন হেসে বলল, 'কার খোঁজ করবি? ডাকাতরা কি তোর হাতে ধরা দেওয়ার জন্যে দিনের বেলা এসে পুকুরপাড়ে বসে থাকবে!' তারপর আমার পিঠ চাপড়ে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই রে। বর্ষার সময় এ-পুকুরটায় সাপ কিলবিল করে। বর্ষায় ওদের গর্তে জল ঢুকে পড়ে বলে ওরা বাইরে বেরিয়ে আসে। তা ছাড়া এ সময়টায় ব্যাঙের লোভ তো আছেই।'

পিলু বলল, 'কাল দিনের বেলা এলেও ডাকাতদের কিছু খোঁজখবর পাওয়া যেত।'

আমি বললাম, 'তার মানে?'

পবনও অবাক হয়ে পিলুর দিকে তাকিয়েছে।

পিলু হেসে বলল, 'এ তো জলের মতো সহজ! কাল মর্নিং-এ এলে ডাকাতদের পায়ের ছাপ দেখতে পাবি। তারপর থানায় খবর দিলেই দারোগাবাবু সব ক'টাকে অ্যারেস্ট করে ফেলবে।'

পবন বিরক্তির একটা শব্দ করে বলল, 'দারোগাবাবু কিছুই করবে না। সে ডাকাতির বখ্‌রা পায়। ইস্, ডাকাতগুলো যদি আমাদের মাঠের ওপর দিয়ে পালাত তা হলে খুব ভালো হতো।'

মিলন বোকার মতো জিগ্যেস করল, 'কেন?'

'বোকার মতো' বললাম এই কারণে যে, ডাকাতদের ওপরে পবনের প্রচণ্ড রাগের কথা আমাদের ক্লাবের সবাই জানে।

মিলনের প্রশ্নের উত্তরে পবন বলল, 'ওরকম মওকা পেলে ডাকাতগুলোকে একবার দেখে নিতাম।'

আমরা তিনজনে এক অদ্ভুত সমীহের চোখে পবনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর আর দেরি না করে ফিরে চললাম বাড়ির দিকে।

আমি মনে-মনে ভগবানকে ডাকছিলাম আর বলছিলাম, 'ডাকাতরা যেন কখ্‌খনও আমাদের খেলার মাঠের ওপর দিয়ে না পালায়।'

ভগবান যে আমার প্রার্থনা শোনেননি সেটা দিন কুড়ি পরেই টের পেলাম।

ডাকাতির কাজ সেরে ডাকাতরা সাধারণত জঙ্গলে ঢুকে ডুবপুকুরের পাশ দিয়ে পালায়। জঙ্গল এলাকার শেষে সরসী নামে একটা নদী আছে। নদীটা সরু মাপের হওয়ায় তার ওপরে নানা জায়গায় কাঠের সাঁকো বাঁধা সহজ হয়েছে। ডাকাতরা এই নদী পেরিয়ে বিটুলা গাঁয়ে ঢুকে পড়ে। তারপর সেখান থেকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে যায়।

একদিন বিকেলে আমরা মাঠে ফুটবল ম্যাচ খেলছি। পবন এর মধ্যেই দু'দুটো অবিশ্বাস্য গোল করে ফেলেছে। হঠাৎই শুনতে পেলাম বোমার শব্দ।

আমরা বেশ অবাক হয়ে খেলা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। দূরে তাকিয়ে দেখি, সাদা ধোঁয়ার তাল মেঘের মতো ভেসে উঠছে শূন্যে। কয়েকজন লোক সেদিক থেকে তীরবেগে ছুটে আসছে আমাদের মাঠের দিকে। আর তাদের খানিকটা পেছনে তাড়া করে আসছে একদল লোক। তারা 'ডাকাত! ডাকাত!' বলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

ব্যাপারটা বুঝতে কোনওরকম অসুবিধে হলো না। ডাকাতি করে পালানোর সময় আমাদের গাঁয়ের লোকেরা টের পেয়ে দল বেঁধে ডাকাতদের তাড়া করেছে। বোমার ভয়েও তারা পুরোপুরি পিছিয়ে যায়নি।

কিন্তু এরপরই তারা ভয়ে পিছিয়ে গেল।

কারণ, ডাকাতদলের একজন হঠাৎই ঘুরে দাঁড়িয়ে পাইপগানের মতো কী একটা থেকে গুলি ছুঁড়ল। আর-একজন হাত ঘুরিয়ে বলের মতো একটা বোমা ছুঁড়ে দিল।

কানফাটানো শব্দ আর ধোঁয়ায় কিছুক্ষণ ভালো করে দেখতে পেলাম না।

তারপরই দেখি তাড়া-করে-আসা দঙ্গলের একজন লুটিয়ে পড়েছে, আর তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করছে।

প্রথম বোমা পড়ার পর গাঁয়ের লোকজনের ভিড় ফিকে হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর দ্বিতীয় বোমা এবং গুলির ঘটনা ঘটতেই তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পেছন ফিরে দৌড়তে শুরু করল।

ডাকাতদলের চারজন তখন ছুটতে-ছুটতে আমাদের মাঠের ওপরে চলে এসেছে। মাঠটা পেরিয়ে আরও একশো গজ মতন এগোলেই জঙ্গল। সেখানে একবার ঢুকে পড়তে পারলেই ডাকাতদের আর কোনও চিন্তা নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক সেরকম হলো না। কারণ, ওদের সমস্ত ছক ওলটপালট করে দিল পবন।

ফুটবলটা মাঠের মাঝে চুপচাপ পড়ে ছিল। পবন হঠাৎই বুলেটের মতো ছুটে এসে বলটায় প্রচণ্ড এক শট মারল।

পালিয়ে যাওয়া ডাকাতদলকে লক্ষ্য করেই শটটা মেরেছিল পবন। ওরা চারজন তখন মাঠের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ছুটে যাচ্ছে। পবনের শট তিন নম্বর ডাকাতটার মাথায় মুগুরের মতো আছড়ে পড়ল। লোকটা হাই ভোল্টেজ শক খাওয়া খরগোশের মতো ছিটকে পড়ে গেল মাঠের জল-কাদার মধ্যে।

এক সঙ্গী পড়ে যেতেই বাকি তিনজন ডাকাত ঘুরে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে কী হলো, আমরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে পালাতে শুরু করলাম। অথচ পবনটা কেন জানি না বোকার মতো মাঠে দাঁড়িয়ে রইল—যেন ছু-মন্তর দিয়ে কেউ ওকে পাথরের মূর্তি করে দিয়েছে।

অনেকটা দূরে ছুটে পালানোর পর ঘুরে তাকিয়ে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলাম।

পাইপগান আর বোমা উঁচিয়ে তিনজন ডাকাত পবনের কাছে এগিয়ে এসেছে। তারপর ওরা পবনকে ধরে টানতে-টানতে জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেল। অবশ্য যাওয়ার আগে মাঠে পড়ে থাকা সঙ্গীকেও তুলে নিয়ে গেল ওরা।

আমরা ভেবে উঠতে পারছিলাম না এখন কী করা উচিত। কেউ-কেউ বলতে লাগল, 'চল্, দৌড়ে গিয়ে থানায় খবর

দিই—’ আবার অন্য কেউ বলল, ‘চিন্তার কিছু নেই। ওরা পবনকে দু’-চার ঘা দিয়ে ছেড়ে দেবে।’

‘কিন্তু ডাকাতটা যদি পবনের শটে ঘায়েল হয়ে মরে গিয়ে থাকে?’ মিলন কাঁদো-কাঁদো স্বরে প্রশ্ন করল।

আমি বললাম, ‘ডাকাতটা বোধহয় মরেনি। যেভাবে ওকে ধরে-ধরে নিয়ে গেল তাতে মনে হলো, মাথা-টাথা ঘুরে খানিকক্ষণের জন্যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।’

পিলু বলল, ‘ওরা পবনকে সেরকম কিছু করবে না।’

মিলন বলল, ‘কেন? দেখলি তো, কীভাবে পাইপগান বুকে ঠেকিয়ে ওকে নিয়ে গেল!’

পিলু বলল, ‘এ তো জলের মতো সহজ! ওরা এইমাত্র একজনকে হাফ-মার্ডার করেছে। সেকেন্ড টাইম আর রিস্ক নেবে না।’

পিলুর কথায় আমি, মিলন আর অন্য বন্ধুরা সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চাইলাম। আর আমি গোপনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম।

মাঠের ধারে তখন গাঁয়ের লোকজন জড়ো হয়ে প্রচণ্ড হইচই চলছে। আমাদের চেঁচামেচিতে থানায় খবর দিতে লোক ছুটল। আমরাও দল বেঁধে টর্চ নিয়ে ঢুকে পড়লাম জঙ্গলে। দুরু দুরু বুকে পবনের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। ডাকতে-ডাকতে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।

জল-কাদার মধ্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করেও আমরা পবনের হদিস পেলাম না। তখন বেজায় মন খারাপ করে আমরা আবার ফিরে চললাম গাঁয়ের দিকে। মাড়াইকুঁড়ায় পবনের মা-বাবাকে কেউ খবর দিতে গেছে কি না কে জানে! আমাদের সঙ্গের লোকজন ডাকাতদের অত্যাচার নিয়ে নানান কথা বলছিল, কিন্তু সেসব আমার মাথায় ঢুকছিল না। আমি শুধু পবনের কথা ভাবছিলাম, ওর দুঃসাহসের কথা ভাবছিলাম। আর একই সঙ্গে একরাশ দুঃখ বুকের ভেতরে জমাট বেঁধে যাচ্ছিল।

কিন্তু অন্ধকার খেলার মাঠটা পেরোনোর সময় টর্চের আলোয় আমরা পবনকে দেখতে পেলাম। আচমকা ওকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম।

‘পবন! তুই!’

ও হেসে বলল, ‘হ্যাঁ রে। এবারেও হেরে গেলাম। ওরা পালিয়ে গেল—’

পবনের মুখে-হাতে কালশিটের দাগ। বাঁ চোখের ওপরটা ফুলে রয়েছে, সামান্য রক্তও বেরোচ্ছে সেখান থেকে। বুঝলাম, ডাকাতরা ওকে বেধড়ক মার মেরেছে—শুধু প্রাণে মারেনি এই যা। পিলুর কথা সত্যি হয়েছে দেখে আমার ভালো লাগল। আর ভগবান এবারে অন্তত আমার প্রার্থনা শুনেছেন।

আমি পবনের হাত চেপে ধরে কেঁদে ফেললাম। ও সামান্য যন্ত্রণার শব্দ করে ওই অবস্থাতেও আমাকে সান্ত্বনা দিল: ‘কাঁদিস না, আনু। এক মাঘে শীত যায় না। ডাকাতগুলোকে আমি দেখে নেব—কিছুতেই ছাড়ব না। যখন-তখন ডাকাতি করে বেড়াবে—এটা কি মগের মুলুক নাকি!’

সবাই পবনকে ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আমরা দু’তিনজন বললাম, ‘ওকে আগে ডাক্তারখানায় নিয়ে চলুন...দেখছেন না ওর কী অবস্থা!’

পবন সে-কথা শুনে বলল, ‘না, না—আমি এখন বাড়ি যাব। নইলে মা-বাবা চিন্তা করবে। আমার জেঠু অনেক টোটকা জানে—ওষুধ দিয়ে দেবে।’

‘চল্, আমরা তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।’

আমাদের এই প্রস্তাবটাও খারিজ করে দিল পবন। বলল, ‘কোনও দরকার নেই। আমি একাই চলে যাব। এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট মেরে দেব। আর শোন, আমি ক’টা দিন বাড়ি ছেড়ে বেরোব না। ইস্কুলেও যাব না, খেলতেও আসব না। ভাবছি একটু রেস্ট নেব। ব্যাটারা আমাকে খুব মার মেরেছে—’

মিলন মিনমিন করে বলল, ‘এর মধ্যে যদি ডাকাতরা আবার অ্যাটাক করে!’

পবন ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, ‘অ্যাটাক করলে তোরাও দল বেঁধে অ্যাটাক করবি। দেখলি তো, এক শটে কেমন একটাকে কাত করে দিয়েছিলাম। তোরা সবাই মিলে ডাকাতগুলোকে তাড়া করতে পারবি না! তারপর তো আমি আছি—’

পবনের তেজ আর সাহস আমাদের মধ্যে কেমন যেন বীরের ভাব জাগিয়ে তুলছিল। মনে হচ্ছিল, খুব সহজেই আমরা দল বেঁধে ডাকাতদের তাড়া করতে পারি।

আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে সাহস জুগিয়ে পবন চলে গেল। সামান্য খুঁড়িয়ে হেঁটে ওর শরীরটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সবাই পবনের সাহস নিয়ে নানা আলোচনা করতে লাগল। পবন আমাদের বন্ধু এ-কথা ভেবে গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠল। বারবারই মনে হতে লাগল, পবন একা যে কাজ করতে পারে, আমরা সবাই মিলে সেই কাজ করতে পারব না! আমরা ডাকাতে-গাঁয়ে থাকি—এটা কি কম অপমান! অথচ অন্য গাঁয়ের ছেলে হয়ে পবন সেই অপমানের বিরুদ্ধে একা রুখে দাঁড়াচ্ছে!

সেই রাতেই আমরা, বিজয়ী সঙ্ঘের ছেলেরা, শপথ নিলাম, ডাকাতদের আমরা সহজে ছেড়ে দেব না। দেখা যাক, কত ধানে কত চাল।

তার ওপর পবন তো আছেই!

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। ঠিক বারোদিনের মাথাতেই পাঁচ ডাকাতের মুখোমুখি হলাম আমরা।

না, ব্যাপারটাকে ‘মুখোমুখি’ ঠিক বলা যায় না। কারণ, ওরা মাঠের ওপর দিয়ে খুব জোরে পা চালিয়ে সটকে পড়ছিল জঙ্গলের দিকে। আর আমরা তখন খেলা-টেলা সেরে গল্পগুজব মাঝপথে থামিয়ে চটপট পা চালিয়েছি বাড়ির দিকে।

খেলাধুলো শেষ হওয়ার পর আমরা রোজই মাঠে বসে কিছুক্ষণ গল্প করি। তারপর অন্ধকার নেমে এলে বাড়ির পথ ধরি। আজ সেরকমই গল্প করছিলাম, কিন্তু মাঝপথে বৃষ্টি এসে বাদ সাধল। তখন ছ’-সাত জন ‘চলি রে’ বলে তড়াক করে উঠে পড়েই দৌড় লাগাল।

পবন হঠাৎই বুলেটের মতো ছুটে এসে...

আমরা পাঁচজন ধীরে-ধীরে উঠলাম। পাঁচজন, কারণ, আমি পিলু আর মিলন ছাড়া সঙ্গে ছিল নগেন আর সাধু।

সাধুর বগলে ফুটবলটা ধরা ছিল। ওর চেহারা বেঁটেখাটো, গাট্টাগোট্টা। সাহসও খুব একটা কম নয়।

তাড়াতাড়ি পা ফেলতে-ফেলতে ও আমাকে জিগ্যেস করল, 'আনু, পবন কবে থেকে আসবে রে?'

আমি বললাম, 'সেদিন যা মার খেয়েছে! মনে হয় না হপ্তাতিনেকের আগে আসতে পারবে।'

'ওর কথাগুলো সেদিন আমার খুব আঁতে লেগেছে। আমাদের গাঁয়ের কি প্রেস্টিজ বলে কিচ্ছু নেই!'

পিলু বলল, 'আমি তো সেদিন থেকে শুধু ডাকাতের জন্যে ওয়েট করছি। জানিস, এর মধ্যে একদিন ঘুমের মধ্যে আমি "ডাকাত-ডাকাত!" বলে চেঁচিয়ে উঠেছি!'

মিলন তখন হেসে বলল, 'বুঝেছি। তুই স্বপ্নে সব ইয়া-ইয়া ডাকাত ধরবি, রিয়েল লাইফে ছুট্টে পালাবি—'

পিলু রেগে গিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা আর বলতে পারল না। কারণ, ঠিক সেই মুহূর্তে সাধু চাপা গলায় বলে উঠেছে, 'শ্স্স্স্—ডাকাত!'

সাধুর নজরের তারিফ করতেই হয়। ওই ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাত দূরে আবছা অন্ধকারে পাঁচটা কালো-কালো ছায়াকে ও ঠিক লক্ষ্য করেছে!

লক্ষ্য করার দুটো কারণ খুঁজে পেলাম। প্রথমত, একটা ছায়ার হাতে সাদা রঙের বড়সড় একটা পোঁটলা ছিল। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, তিন নম্বর ছায়াটা খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলছিল।

সাধু চাপা গলায় বলল, 'সেদিনও একটা ডাকাত একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছিল—আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

পিলু বলল, 'কারেক্ট!'

সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের রক্তে যেন দেশাত্মবোধের আগুন জ্বলে উঠল। ফুটবল ছুঁড়ে ফেলে যে যেমন পারলাম বড়-বড় ইট-পাথর কুড়িয়ে নিলাম। সাধু কোথা থেকে একটা শুকনো গাছের ডাল যোগাড় করে নিল। তারপর আমরা পাগলের মতো 'ডাকাত-ডাকাত!' বলে হইহই চিৎকার জুড়ে দিলাম, আর একইসঙ্গে ইট-পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারতে লাগলাম ডাকাতদের দিকে।

আমাদের আচমকা এই পাগলামিতে পাঁচ-পাঁচটা জোয়ান লোক কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। তারপর একটুও দেরি না করে ছুট লাগাল জঙ্গলের দিকে। আমরা 'লড়াইক্ষ্যাপা' হয়ে লোকগুলোকে তাড়া করলাম। সাধু বাতাসে ওর 'লাঠি' ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করে বলল, 'সাহস থাকে তো আয়, সিঙ্গল-সিঙ্গল লড়ে যা—'

সিঙ্গল-সিঙ্গল লড়াই হলে তার রেজাল্ট কী হতো জানি না, কিন্তু সে-লড়াই আমাদের লড়তে হলো না। কারণ ওই পাঁচ-পাঁচটা ডাকাতের সঙ্গে সিঙ্গল লড়ে গেল পবন।

তবে যে-পবনকে আমরা চিনতাম সে-পবন নয়—অন্য এক অচেনা পবন।

ছুটতে-ছুটতে আমরা জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিলাম। গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ, ব্যাঙের ডাক আর অন্ধকার আমাদের ঘিরে ধরল। তারই মধ্যে হোঁচট খেয়ে, পা পিছলে, গাছের গায়ে গুঁতো খেয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। ভেতরের একটা অদ্ভুত শক্তি আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

একটু পরেই আমরা ডুবপুকুরের কাছে চলে এলাম। আর সেখানে পৌঁছনোমাত্রই যে-দৃশ্য দেখলাম তাতে পাথর হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।

পুকুরপাড়ে পাঁচজন ডাকাতের মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়েছে পবন। ওর লম্বা শরীর থেকে এক বিচিত্র নীল আভা ঠিকরে বেরোচ্ছে। সেই আলো ডাকাতগুলোর শরীরের নানা জায়গায় পড়ে চকচক করছে। পবনের গায়ে কোনও পোশাক নেই। তবে বরফকুচির মতো একরাশ মিহি গুঁড়ো ওর চোখে-মুখে-গায়ে লেপটে রয়েছে। তারই মধ্যে ওর চোখ দুটো তীব্রভাবে জ্বলজ্বল করছে।

ভিনগ্রহের এক অপচ্ছায়ার মতো

ডুবপুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পবন।

ডাকাতগুলো পবনকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু অবাক হওয়ার প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ওরা আত্মরক্ষা অথবা আক্রমণের কাজে নেমে পড়ল।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমরা পাঁচজন হতবুদ্ধি হয়ে সব দেখতে লাগলাম। অন্যান্য ইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে গিয়ে শুধু আমাদের চোখ কাজ করে চলল।

একজন ডাকাত কোথা থেকে যেন একটা লম্বা ছুরি বের করল। তারপর বিশ্রী গালাগাল দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পবনের ওপরে।

পবনের হাত দুটো পেছনে লুকিয়ে রাখা ছিল বলে এতক্ষণ কিছু দেখতে পাইনি। কিন্তু ছুরি-হাতে ডাকাতটা ওর দিকে এক-পা এগোতেই পবন অদ্ভুতভাবে শরীরটাকে নাচিয়ের ঢঙে দুলিয়ে চোখের পলকে ওর হাত দুটো উঁচিয়ে ধরল ডাকাতটার মুখের সামনে—যেন এক্ষুণি আক্রোশের থাবায় সব ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

ওর হাত দুটো দেখামাত্রই আমাদের বুকের ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

পবনের দু'হাতের দশ আঙুলের জায়গায় হিলহিল করছে দশটা লিকলিকে কালো সাপ। ওদের শরীর নীল আলোর আভায় চকচক করছে।

ডাকাতটা নিতান্তই প্রাণের দায়ে ছুরি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে পবনের পেট আড়াআড়ি চিরে গেল। কিন্তু এক ফোঁটাও রক্ত বেরোল না। শুধু বরফকুচির ওপর একটা কালো দাগ আঁকা হয়ে রইল।

পবন ঠোঁট ছুঁচলো করে এক তীব্র শিস দিয়ে উঠল। তারপর নাচের ভঙ্গিতে হাত দুটো ছুঁড়ে দিল ডাকাতটার মুখ লক্ষ্য করে।

ক'টা সাপ একসঙ্গে ছোবল দিল কে জানে! ডাকাতটা 'উঃ' শব্দ করেই খসে পড়ল জল-কাদার ওপরে।

ব্যাঙের ডাক ছাপিয়ে দশটা সাপের ফোঁস-ফোঁস শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। শিকার করার নেশায় সাপগুলো যেন উল্লাসে পাগল হয়ে গেছে।

পবন তখন বিচিত্র মুদ্রায় হাত ঘোরাচ্ছিল, আর এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল তীব্র চোখে।

দ্বিতীয় একটা ডাকাত ওকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ল। ও নিমেষে সাপের আঙুল দিয়ে লুফে নিল বোমাটাকে। তারপর হাত ঘুরিয়ে ওটা ছুঁড়ে দিল ডুবপুকুরের জলে। 'ঝপাং' করে একটা শব্দ হলো। আর সে শব্দের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই পবন আবার তীব্র শিস দিয়ে উঠল। একইসঙ্গে ওর বাঁ হাত ছোবল বসিয়ে দিল দ্বিতীয় ডাকাতটার গলায়।

একজন ডাকাত পাইপগান চালাল পবনকে তাক করে।

পবনের বরফের পাউডার মাখা শরীরে একটা কালো ফুটো তৈরি হলো। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপরই আবার শিসের শব্দ, আঙুলের ছোবল, এবং তৃতীয় ডাকাতের গল্প শেষ।

আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শিস দিয়ে নাচের মুদ্রায় হাত নেড়ে বাকি দুজন ডাকাতকেও খতম করল পবন। তারপর হাত দুটো খুব ধীরে শূন্যে নাড়াতে লাগল। ওর আঙুলের ডগার সাপগুলো শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে হিসহিস শব্দে বাতাসে সাঁতার কাটতে লাগল।

এক অদ্ভুত উত্তেজনা আর আতঙ্কে আমি ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে আমি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম।

পিলু আমার হাত ধরে পেছন থেকে টানছিল, কিন্তু আমি এক ঝটকায় ওর হাত ছাড়িয়ে নিলাম।

পবনের বেশ কাছে গিয়ে আমি ডেকে উঠলাম, 'পবন—'

হাত দুটো শূন্যে তোলা অবস্থাতেই ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকাল পবন। ওর চোখে কেমন এক কাতর ভাব ফুটে উঠল। বিষণ্ণ গলায় ও বলল, 'সেদিন ডাকাতরা আমাকে মেরে ডুবপুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল। তারপর থেকে ওখানেই আমি থাকি। আজ শুধু ডাকাত ধরতে উঠে এসেছিলাম...।'

ওর কথাগুলো প্রতিধ্বনির মতো বারবার আমার কানে বাজতে লাগল। '...তারপর থেকে ওখানেই আমি থাকি...ওখানেই আমি থাকি...আমি থাকি...থাকি...।'

কথাগুলো বলেই আচমকা পুকুরের দিকে দু'পা ছুটে গেল পবন। অদ্ভুত ভঙ্গিতে শূন্যে লাফ দিল। একটা তীব্র শিসের শব্দ শোনা গেল। ওর শরীরটা শূন্যে বাঁক নিয়ে আবার তীরের মতো সোজা হয়ে গেল। তারপর সেই তীর নিখুঁতভাবে বিঁধে গেল ডুবপুকুরের জলে।

জলে কোনও শব্দ হলো না, কোনও ঢেউ উঠল না—শুধু পবনের নীলাভ জ্যোতির্ময় শরীরটা জল ভেদ করে ঢুকে গেল ভেতরে।

অন্ধকার বৃষ্টিভেজা রাতে সে এক অলৌকিক ট্র্যাপিজের খেলা!

বেশ কিছুক্ষণ পর ঘোর কাটলে আমরা ডাকাতদের ফেলে যাওয়া পোঁটলাটা নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এলাম।

ফেরার পথে শপথ নিয়েছিলাম, এই বিচিত্র ঘটনার কথা কাউকে বলব না।

অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভিজে পথ চলতে-চলতে সাধু মিনমিন করে যেন আপনমনেই বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক কী হলো বল্ তো!'

পিলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'পুরোপুরি বুঝিনি। তবে এটুকু বুঝেছি, জলের মতো সহজ নয়...বরং একটু অন্যরকম...।'

ছবিঃ বিজন কর্মকার

রোগ জয়ের অভিযান

অমিয় কুমার হাটি

ছোট্ট থেকেই অমর ছিল ছটফটে, চনমনে। মুখে-ভাতের পর আর পাঁচটা শিশুর মতো হামা দিতে শিখল, তারপর হাঁটতে। কী সুন্দর তার সে টলটলিয়ে হাঁটা! বেশ ছিল, হঠাৎ কী যে হলো! বয়স তখন তার বড়জোর চার বছর। অত যে তড়বড় করে ছুটে বেড়াতো—তা সে আর পারছে না। এমনকি নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতেও পারছে না ঠিকমতো। তাকে উঠে দাঁড় করিয়ে দিলে তবে সে চলে। নিজের হাত দুটো দিয়ে পা দুটোকে তুলে ধরে তবে সে উঠে দাঁড়াতে পারছে! দুটো উরু শুকিয়ে গেছে, অথচ দু'পায়ের ডিম মোটা হয়ে উঠেছে। কোনো চিকিৎসাতেই কিছু সুবিধা হলো না। হুইল চেয়ার ছাড়া এখন আর চলতেই পারে না সে।

এটা মাংসপেশীর এক ধরনের অসুখ—নাম ডুসেন মাসকুলার ডিসট্রফি। ক্রোমোজোমের জিন-এর খুঁত থেকে এসেছে। বংশধারায় হয়। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের শরীরের কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম থাকে ৪৬টা, মেয়েদের বেলায় শেষ দুটো হলো 'XX', ছেলেদের বেলায় 'XY'। এই যে মাসকুলার ডিসট্রফি—এটা ক্রোমোজোমের X অংশের জিনের খুঁত। ছেলেরা এই রোগে ভোগে। বাহিকা হলো মেয়েরা। মানে, মেয়েদের রোগটা হয় না, তবে ছড়াতে পারে। যে ছেলের হয়েছে, তার বোনের X ক্রোমোজোমে খুঁত থাকার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ। এরা বাহিকা। এরা বিয়ে করলে তাদের ছেলে হলে ৫০ শতাংশের বেলায় রোগটা হয়। রোগ হলে সাধারণত ২০ বছরের বেশি কেউ বাঁচে না। প্রতি তিন হাজার শিশুর ভিতর রোগটা হতে পারে একজনের। এই রোগের আর একটা ধরন আছে—তার নাম বেকারস মাসকুলার ডিসট্রফি। এটা হলে রোগীর আয়ু একটু বেশি হয়—৪০ বছরের মতো।

বেকারস মাসকুলার ডিসট্রফিতে ভুগছেন এমন একজন রোগীর নাম সঞ্জয় ভাটনগর। হুইল চেয়ার ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না। তাই বলে তিনি কিন্তু একদম দমে যাননি। লেখাপড়া শিখেছেন, সরকারী বড় চাকরি করছেন, বিদেশ দপ্তরে বড় অফিসার ছিলেন আমেরিকাতে, এখন ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি। ভারতে তিনিই প্রথম গঠন করেছেন মাসকুলার ডিসট্রফি ফাউন্ডেশন—দিল্লীতে।

আমেরিকাতে মাসকুলার ডিসট্রফিতে ভুগছে এমন কয়েকজন রোগীকে নতুন একটি উপায়ে সারিয়ে তোলা হয়েছে। তাই আশার আলো জেগেছে। নতুন দিশা পাওয়া গেছে। শুধু মাসকুলার ডিসট্রফি কেন—খুঁতওয়ালা জিন থেকে যে সব রোগ এতদিন অবধি সারাতে পারা যায়নি—সে সব কঠিন রোগ আগামী দিনে সেরে উঠবে এমন আশা জেগেছে।

ডুসেন বা বেকারস মাসকুলার ডিসট্রফি রোগীকে কীভাবে নিরাময় করা হয়েছে, সে কথায় পরে আসছি। তার আগে কেন এই অসুখ সারানো এত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা দেখা যাক।

মানুষের যতরকম অসুখ-বিসুখ হয়, তাদের ভাগ করার আলাদা

অথচ খুব সোজা একটা উপায় আছে। এক ধরনের অসুখ হয় শুধু একটা কারণ থেকে—মানুষের শরীরে ক্রোমোজোমের ভিতর যে জিন থাকে, তার কোনো রকমের খুঁত থাকলে। রোগ সৃষ্টিতে মাত্র একটা খুঁতওয়ালা জিনই যথেষ্ট। জিনজনিত এই ধরনের অসুখ প্রায় ৪০০০-এর বেশি হয়ে থাকে। সবগুলোই বংশধারায় হয়। আর একবার হলে তাকে ভালো করার কোনো চিকিৎসা এখনো অবধি বেরোয়নি। যেমন ধবল, বিটা থ্যালাসিমিয়া, নিউরোফাইব্রোমা প্রভৃতি।

আর কতকগুলি অসুখ আছে, যাদের কারণ একটি নয়, অনেক। যেমন সংক্রামক রোগ টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির বেলায় পরিবেশ ও অপুষ্টিকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়, তেমনি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, করোনারী হার্টের অসুখ প্রভৃতির জন্য অংশত জিন ও অংশত পরিবেশ দায়ী।

তৃতীয় কারণ ক্রোমোজোমের খুঁত। ২০০ শিশু জন্মালে তাদের একজনের ভিতর ক্রোমোজোমের কোনো না কোনো খুঁত দেখা যায়।

মাসকুলার ডিসট্রফি বা এই যে জিন বা ক্রোমোজোমের খুঁত থেকে নানা অসুখ, এসব সারাবার কোনো ওষুধ বা উপায় এখনো অবধি নেই বললেই চলে। তবে দিন এগিয়ে চলেছে। অনেক নতুন উপায়ের কথা মানুষ ভাবছে। নতুন নতুন আশা জাগছে। সেই কারণে মাসকুলার ডিসট্রফি রোগীর সেরে ওঠা গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে এই দুরারোগ্য অসুখ সারানোর সঠিক চিকিৎসাপদ্ধতি জানা যাবে।

আশার দিশা খুঁজতে নব নব পদ্ধতির অনুসন্ধান চলছে। যেমন ডি এন এ পুনর্গঠন করার পদ্ধতি অনুসরণ করে জিনকে কাজে লাগিয়ে শরীরের বাইরেই যতখুশি ইনসুলিন তৈরি করা যায়। আগামী দিনে ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় এটা খুব কাজে লাগবে, এরকম ইনসুলিন মানুষের ইনসুলিনের মতো যা অবিকল একরকম পাওয়াও যায় কোনো কোনো দেশে। এটাও জিন থেকে তৈরি রোগকে দূর করার বেলায় আশার কথা।

অথবা প্যানক্রিয়াসের যে কোষ থেকে ইনসুলিন বের হয় (আইলেট কোষ), সেই কোষ মানুষের শরীরে গেঁথে দেওয়া যাবে এবং তার থেকেই দরকার মতো ইনসুলিন বের হবে। ফলে ডায়াবেটিস রোগটি বিদায় নেবে। বিদেশে কয়েকজন রোগীর বেলায় এই চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসরণ করে সফল হওয়া গেছে। আশার আর একটা দিক।

জিন দিয়েও চিকিৎসা করা হবে আগামী দিনে। থ্যালাসিমিয়া হয় জিনের খুঁত থেকে। এমন দিন আসবে যেদিন থ্যালাসিমিয়া রোগীর মজ্জা সব বাইরে বের করে এনে কোনো রাসায়নিকে সেগুলির সংখ্যা যাতে বাড়ে তেমনভাবে কালচার করা হবে। তারপর এদের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হবে এক ধরনের ভাইরাস যারা বহন করছে স্বাভাবিক বিটাগ্লোবিন-এর জিন যা সুস্থ মানুষের থাকে। তারপর স্বাভাবিক বিটাগ্লোবিনওয়ালা মজ্জা কোষগুলো আবার রোগীর শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। ঐ মজ্জা তখন স্বাভাবিক লোকের মতো কাজ করবে—নতুন মজ্জা তৈরি করবে, থ্যালাসিমিয়া ভাল হয়ে যাবে।

মাসকুলার ডিসট্রফিও 'X' ক্রোমোজোমের জিনের খুঁত থেকে হয়। এই রোগ সারাবার বেলায় কিছু কিছু আশার আলো এখনই দেখা দিয়েছে। একটা নতুন পথ নিয়েছেন চিকিৎসকরা। মাংসপেশীর জিন-এ থাকে খুঁত। এর ফলে একটা বিশেষ প্রোটিন তৈরি হয় না। তাই মাংসপেশী শুকিয়ে যায়। প্রোটিনটির নাম ডিসট্রফিন।

এ ধরনের অসুখে ভুগছে এমন কয়েকজন রোগী কী করে ভাল হয়ে উঠেছে সেই কথাই এবার বলছি। একজনের বয়স দশ। ভুগছিল ডুসেন মাসকুলার ডিসট্রফিতে। ওর বাবার হাত থেকে এক টুকরো ভাল মাংসপেশী কেটে নিলেন চিকিৎসকরা। ওটিকে গবেষণাগারে কিছু রাসায়নিকে ডুবিয়ে রাখা হলো। ঐ মাংসপেশীর কোষ থেকে বেড়ে জন্ম নিল কয়েক কোটি মাংসপেশীর কোষ। তখন ৫ মিলিমিটার পরিমাণ মতো ঐ স্বাভাবিক কোষ ইঞ্জেকশন দেওয়া হলো ছেলেটির শরীরে। মাংসপেশীর কোষগুলো কার্যকর হয়ে উঠল, নতুন ভালো সুস্থ স্বাভাবিক কোষও তৈরি করতে শুরু করল—খুঁতওয়ালা কোষ আর তখন তৈরি হচ্ছে না। তাদের হটিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক কোষগুলি বাড়তে শুরু করল। ছেলেটি সেরে উঠল।

এটি বেশ কয়েকবছর আগের ঘটনা। শুকতারাতে লিখেওছি। কিছুদিন আগে এরকম আরেকটি রোগীকে সারানো গেছে একইভাবে। একটি ন'বছরের ছেলের পায়ের বুড়ো আঙুলের ভিতর সংস্থাপন করা হয়েছিল স্বাভাবিক মাংসপেশীর কোষগুলো। এই ছেলেটিও ভালো হয়ে যায়। এই যে পদ্ধতি এতে স্বাভাবিক মায়োব্লাস্ট বা মাংসপেশীর কোষ জুড়ে দেওয়া হয় রোগীর শরীরে। তখন তারা বেড়ে ওঠে—স্বাভাবিক মাংসপেশী কোষের মতোই হারিয়ে যাওয়া ডিসট্রোফিন প্রোটিনটি তৈরি করতে থাকে, মাংসপেশী তার নিজের শক্তি ফিরে পায়—অসুস্থ ক্ষয়ে যাওয়া খুঁতওয়ালা কোষগুলিকেও সরিয়ে দেয়, সারিয়েও দেয়। একে বলে মায়োব্লাস্ট ট্রান্সফার থেরাপি।

বেকারস মাসকুলার ডিসট্রফিতে ভোগা আর একজন নিজে হাঁটতেই পারত না—হুইল চেয়ার নিয়ে চলাফেরা করত। এইভাবে মায়োব্লাস্ট জুড়ে দিয়ে চিকিৎসা করার ফলে সেও ভাল হয়ে উঠল—নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল দু'মাস পরে। হুইল চেয়ার দূরে ঠেলল।

অমর এবং সঞ্জয়রা বাঁচার নতুন আশায় তাই সঞ্জীবিত হয়ে তো উঠবেই। এই পদ্ধতি আছে ফেজ-২ (Phase II) পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে। এই স্তরে মানুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে সফলতা এসেছে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে।

এই ধরনের খবরাখবর ইন্টারনেটে পাওয়া যেতে পারে (htt: // w w w. mdausa. org–) ; অথবা Cell Therapy, 1770, Moriah Wood Boulevard Memphis Tennessee, USA। অথবা সঞ্জয় ভাটনগর, ডেপুটি সেক্রেটারি, শিক্ষাদপ্তর, ভারত সরকার, দিল্লী। যারা এই বিষয়ে আরও খবরাখবর পেতে চাও তারা ঐ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারো।

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

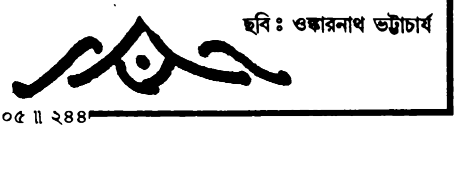

সম্পূর্ণ উপন্যাস

চন্দন-দস্যু

চিত্তরঞ্জন মাইতি

কুচি কুচি রঙিন কাগজ কেউ যেন হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে। ভেসে চলে যাচ্ছে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে। হলুদ সাদা লাল নীল, কত রঙবাহার।

আমি আর অভীকাকু বসে আছি সেট্টিহাল্লি ফরেস্টের ছোট্ট হিলটপের ওপর। মানুষের প্ল্যান মাফিক তৈরি জঙ্গল। নিখুঁত ছবির মতো। সামনে সুইমিং পুল, হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। নন্দন কানন কি এরকম?

না না, ওগুলো আদপেই রঙিন কাগজের টুকরো নয়, ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি। পাশেই ঘন সবুজ জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

অভীকাকু কয়েকটা ছবি তুলল ওদের, তারপর চুপচাপ বসে বসে দেখতে লাগল, শেষ প্রজাপতির ছোট্ট হলুদ টুকরোটাও হারিয়ে গেল বনের মধ্যে।

একসময় আপন মনে বলে উঠল, পথ চেনার কি আশ্চর্য ক্ষমতা এই পতঙ্গগুলোর!

আমি ব্যাপারটা জানার জন্য উৎসুক হয়ে তাকাতেই মুচকি হেসে অভীকাকু বলল, এখন নয়, সন্ধ্যের মজলিশে শোনাব।

একটুখানি উস্‌কে দিয়ে চুপ করে যাওয়াই অভীকাকুর স্বভাব। শ্রোতার কৌতূহল বাড়ুক, তারপর খোলা হবে অভিজ্ঞতার ঝাঁপি। বায়না, খোঁচাখুঁচি যতই কর কিছুই বেরোবে না। অভীকাকুর মর্জির দিকে তাকিয়েই বসে থাকতে হবে।

সংসার-টংসার নেই অভীকাকুর, একদম ঝাড়া হাতপা। সঙ্গী একটিমাত্র ক্যামেরা। ঘুরে বেড়ায় বনজঙ্গল নদীনালা সাগর পাহাড় টহল দিয়ে।

একটা চাকরি করে বনবিভাগে। ঐ নামে মাত্র চাকরি। কবেই চলে যেত, কিন্তু এই আত্মভোলা মানুষটাকে আড়াল দিয়ে রেখেছে কেশরী সোম। কনজারভেটার অব ফরেস্ট, কর্ণাটক। আমার বাবা বলে বলছি না, মানুষটি বড়ই দয়ালু।

বাবার অফিসের এক কোণায় পড়ে থাকে অভীকাকুর চেয়ার-টেবিল। দু'দিন মুখ গুঁজে কাজ তো পাঁচদিন হাওয়া। বাবাকেই সামলাতে হয় অভীকাকুর বে-নিয়ম। বাবা সফরে বেরোলে তো কথাই নেই, অভীকাকু এক পায়ে খাড়া। হাতব্যাগে নিতান্ত প্রয়োজনের দু'একটা টুকিটাকি, আর কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা।

রক্তসম্পর্কের কেউ নয় অভীকাকু তবু আমাদের কত আপনজন। কাকু বলে, থাক্ না বয়সের ফারাক, তোরা সবাই আমার বন্ধু।

আমার বাড়িতে একটা ক্লাব আছে। আমরা তিন বন্ধু তার মেম্বার। অভীকাকু ক্লাবের নামকরণ করেছে 'তিন কন্যে'। ক্লাবের মেম্বার ইচ্ছে করেই আমরা বাড়াই না, কিন্তু রোববার দুপুর থেকে পাড়ার বন্ধুরা ভিড় জমায়। শ্রোতা অনেক কিন্তু বক্তা একজন—সেই অভীকাকু।

সেদিন আমরা জমিয়ে বসেছি ক্লাব-ঘরে। ঢং ঢং ঢং তিনটের ঘণ্টা বাজল। অমনি একটা সাদা পায়রা ভয় পেয়ে পাখায় চটপট আওয়াজ তুলে কার্নিস ছেড়ে উড়ে গেল আকাশে। আমরা জানালা দিয়ে দেখলাম, পাখিটা ওলটপালট খেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়ে পাখা গুটিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে খানিকটা নিচে পাকা আমের মতো খসে পড়ল। পরক্ষণেই মাটি ছুঁতে না ছুঁতে পাখায় শব্দ তুলে উড়ে গেল পুব-মুখো।

আমরা ওর খেলা দেখে হাততালি দিয়ে উঠলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লাবঘরে এসে ঢুকল অভীকাকু।

এত হাততালি কিসের?

বললাম, একটা পায়রা ভারি সুন্দর ডিগবাজি খেল আকাশে।

অমনি অভীকাকু বলল, ওটা নিশ্চয়ই গ্রহবাজ পায়রা।

বললাম, তুমি কি করে জানলে কাকু?

গ্রহবাজ পায়রাগুলো উঠতে-নামতে ডিগবাজি খায়।

নিমৃকি জানতে চাইল, পায়রা বুঝি নানা রকমের হয়?

অভীকাকু বলল, সারা দুনিয়ায় পায়রার জাত আছে তিনশোর ওপর। আমরা ওদের আকার, গুণ আর কাজকর্ম দেখে দু'ভাগে ভাগ করি। অবশ্য এই দু'রকমের ভাগ কোনো পক্ষীবিশারদের নয়, স্রেফ যারা খেয়ালে পায়রা পোষে অথবা পায়রা নিয়ে ব্যবসা করে তারাই দু'রকম ভাগ করেছে।

তিয়া বলল, একটা তো জানলাম গ্রহবাজ, অন্যটা কি?

অভীকাকু বলল, অন্য জাতটাকে বলে গোলা। এই গোলা আর গ্রহবাজ আবার কয়েক রকমের আছে।

কনি বলল, যেমন?

এই ধর, গোলার ভেতর গোটা কতক নাম করছি। তার আগে গোলা আর গ্রহবাজের সামান্য তফাৎটা একটু জেনে নে। গোলার ঠোঁটের থেকে গ্রহবাজের ঠোঁট একটু খাটো। গ্রহবাজের চোখ সর্বদাই চঞ্চল, আর গোলা পায়রার দৃষ্টি একেবারে শান্ত। দেখলেই দুটো জাতকে চিনতে পারবি।

এখন শোন, গোলা-কাহিনী। গোলা পায়রাদের ভেতর নক্‌শা, লক্কা, সিরাজু, মুক্ষি, কড়িয়াল, লোটন, আরও অনেক। আর গ্রহবাজদের ভেতর কটা নাম বলছি শোন। কট্‌কী, সবুজ, নীলা, কাল, লাল, আবলুক, ভুরা, নাচরা, দোবাজ, তাদুম, মহাদুম।

যেসব গ্রহবাজ পায়রা বেশি ডিগ্‌বাজি খায় তাদের লোকে সাবাস দিয়ে নাম রেখেছে 'বাজেন্দার'।

আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, কাকু, পায়রাদের জাত যদি দুটো হয় তাহলে এত নাম কেন?

ওদের প্রত্যেকটা নামের সঙ্গে যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।—এইটুকু বলে থামল অভীকাকু।

রোমি বলল, বল না কাকু বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

হা হা করে হাসি ছড়িয়ে অভীকাকু বলল, সব বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে যে রে। আচ্ছা, দু'একটা নামের বৈশিষ্ট্য বলছি শোন। গোলা পায়রার ভেতরে রয়েছে 'লক্কা'। লক্কার বৈশিষ্ট্য হলো, ওদের পুচ্ছের পালকগুলো ময়ূরের পেখমের মতো সবসময় ছত্রাকার হয়ে থাকে। এদের 'ফুল লক্কা'ও বলে। ফুল লক্কার রঙ

একেবারে সাদা। এদের পুরুষগুলো যখন বসে থাকে কিংবা চলতে থাকে তখন অপূর্ব একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। গলাটাকে ঈষৎ বেঁকিয়ে কাঁপাতে থাকে। কারু কারুর মাথায় ঝোটন থাকে,আবার কারুর থাকে না।

রিয়া ইতিমধ্যেই নোট নিতে শুরু করে দিয়েছিল। সে বলে উঠল, মুক্ষি পায়রার বৈশিষ্ট্য কি কাকু?

ওদের ঠোঁটের ওপর দিয়ে ঝুঁটির কোল পর্যন্ত সমস্ত মাথাটা ধবধবে সাদা। দুটি ডানা এবং শরীরের বাকি অংশ ভিন্ন রঙের।

আবার প্রশ্ন, লোটন পায়রার কথা একটু জানতে চাই।

মাটিতে ওলোটপালট করতে পারে বলে এর নাম লোটন পায়রা। লোটনকে মাটিতে লোটাবার একটা কায়দা আছে। ডানহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরতে হয় একটা পাখা, অনামিকা আর কনিষ্ঠা দিয়ে চাপতে হয় দ্বিতীয় পাখাটা। তারপর মধ্যমা আর তর্জনী পাখিটার গলার দু'দিক দিয়ে বুক অব্দি চালিয়ে দিতে হয়। এবার ডাইনে-বাঁয়ে সাবধানে পাখিটার ঘাড় ধরে এমনভাবে নাড়তে হবে যাতে টক্‌টক্ আওয়াজ ওঠে। কিছু পরে মাটিতে ছেড়ে দিলেই ও ডিগবাজি খেতে থাকবে।

রিয়া বলল, গ্রহবাজ পায়রাদের অনেকগুলো নাম তুমি করেছ, তার ভেতর দুটো নামের বেশ মিল আছে, তাদুম আর মহাদুম। এখন ওদের ভেতর পার্থক্য কি, তা যদি ধরিয়ে দাও।

অভীকাকু বলে উঠল, বেশ একখানা প্রশ্ন তুই তুলে ধরলি রিয়া। কালে ভাল রিপোর্টার অথবা সেমিনারে সেরা একজন সংযোগরক্ষাকারী হতে পারবি।

রিয়া সংকুচিত হয়ে একটু সলজ্জ হাসি হাসল। হাতের কলমটা কিন্তু মুখিয়ে রইল ডায়েরির পাতায়।

এবার অভীকাকু পার্থক্যটা বুঝিয়ে দিল, মহাদুম আর তাদুমের পার্থক্য খুব বেশি নয়। দুটির বর্ণই কালো। পার্থক্য কেবল পুচ্ছে। মহাদুমের পুচ্ছের পালক সবগুলো না হলেও অধিকাংশ সাদা। আর তাদুমের পুচ্ছের পালক একটিমাত্র সাদা।

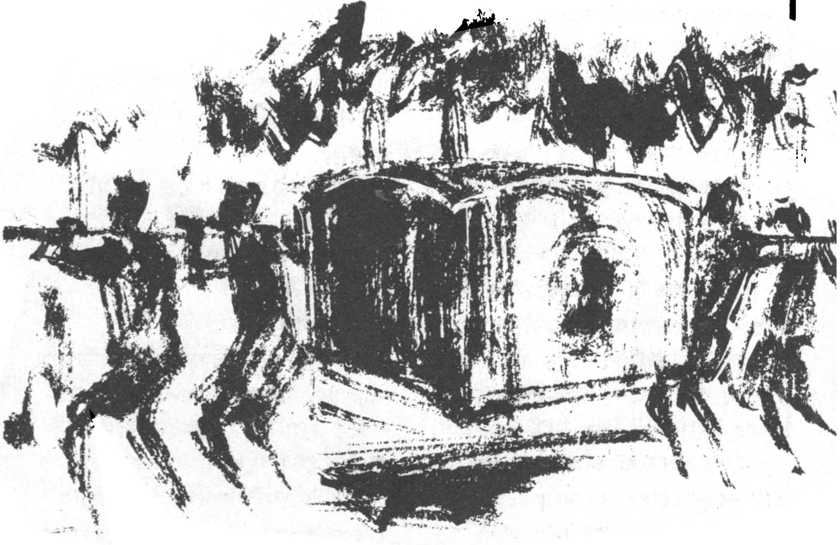

গাছগাছালির ভেতর দিয়ে চলল পাল্‌কি।

এবার আমি মোক্ষম প্রশ্নটা করে বসলাম, শুনেছি আগেকার দিনে পায়রার মাধ্যমে অনেক গোপন খবর দেওয়া-নেওয়া হতো,—সেটা কতদূর সত্যি? আর এইসব পায়রাগুলো কি সে কাজ করত?

এই প্রশ্ন করতে গিয়ে আমি উত্তর তো পেলামই, তার সঙ্গে উপহার পেলাম ছোট্ট একটি গল্প।

অভীকাকু একটু নড়েচড়ে বসল। তারপর বলে উঠল, কথাটা সত্যি। আজকাল না হলেও কয়েক শো বছর আগে পত্রবাহক পারাবতের রেওয়াজ ছিল। শোনা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো সময়ে বাগদাদের সম্রাট নুরুদ্দীন মুহম্মদ পত্রবাহক পারাবত-প্রথার প্রচলন করেন। কিছুকাল আগে যুদ্ধের সময়েও পারাবত সংবাদ বয়ে নিয়ে গেছে।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে সব পায়রাকে আমরা সচরাচর দেখি তারা পত্র আদান-প্রদানের কাজ করে কিনা?

না, সব পায়রা একাজ পারে না। এর জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর পায়রা চাই। আর এ কাজের জন্য দক্ষ একদল শিক্ষকও চাই।

এ ধরনের পায়রার আকার বেশ বড়, পাখা ও শরীর বেশ সবল। ঠোঁট থেকে পুচ্ছ পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ ইঞ্চি লম্বা হয়। এরা বাঁচেও বেশিদিন।

রোমি বলল, এদের কোথায় দেখা যায় কাকু?

সাধারণত অসম, নেপাল, দার্জিলিং আর নীলগিরি পাহাড়ে। নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলে ওদের বলে 'রাজকপোত'। এরা দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন। শেখালে এদের ভেতর অসাধারণ গুণের বিকাশ ঘটে।

বললাম, এদের কিভাবে চিঠি বইতে শেখায় তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে কি?

অভীকাকু বলল, ওরা যে অঞ্চলে বা বাড়িতে থাকে, সে জায়গাটাকে ওরা ভীষণ ভালবাসে। তার ওপর যদি কপোত-কপোতী জোড়ায় থাকে তাহলে সে জায়গাকে ওরা কোনোভাবেই ভুলতে পারে না।

এরপর যে স্থানের সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান হবে, সে জায়গাটা চিনিয়ে দিতে হবে ওদের। খোলা খাঁচার ভেতরে থেকে ওরা পথ দেখতে দেখতে যায়, একবার পথ চিনে নিলে বার বার সে পথে যেতে ওদের কোনো অসুবিধেই হবে না। তা সে যত দূরের পথই হোক।

চিঠি কি করে নিয়ে যায় ওরা?

একটা পাতলা অথচ শক্ত লেখার

কাগজকে বার্তাবাহক পাখিটার পালকের আকারে কেটে, তাতে সংক্ষেপে খবরাখবর লিখে পাখির পাখায় সেঁটে দিতে হয়। এবার ওকে উড়িয়ে দিলেই ও চলে যাবে নির্দিষ্ট জায়গায়। অবশ্য পাখিটাকে আকাশে ছাড়ার আগে কিছুটা কষ্ট দিতে হয়।

কি রকম?

চার-পাঁচ ঘণ্টা কিছু খেতে না দিয়ে একটা অন্ধকার জায়গায় বন্দী করে রাখতে হয়। তারপর ছেড়ে দিলে পাখিটা খিদের জ্বালায় এবং আপন আস্তানা ও সঙ্গীর টানে অতি দ্রুত উড়ে চলে যায়।

এবার জিজ্ঞেস করলাম, পত্রবাহক পায়রার কৃতিত্বের কোনো কাহিনী তোমার জানা আছে কি অভীকাকু?

সজোরে মাথা নেড়ে কাকু জানাল, কোনো কাহিনী-টাহিনী তার জানা নেই।

রিয়া অমনি বলে উঠল, আজ তুমি আসর মাৎ করে দিয়েছ অভীকাকু, আর কিছু না শোনালেও চলবে।

ক্লাবঘরের সকলেই রিয়ার কথায় সম্মতি জানিয়ে হৈ হৈ করে উঠল।

অভীকাকু আমার দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে বলল, ক্লাবের মক্ষীরানী তিন্নি দেবীর কিন্তু মন ভরেনি এখনও। ঠিক আছে, আমার শোনা একটা ছোট্ট কাহিনী তাহলে শোনাই।

ঘোষণামাত্র আবার সবাই হৈ হৈ করে ঘিরে বসল অভীকাকুকে।

শুরু হলো গল্প—

মেয়ে আর বাপ, দুজনেই খেলা দেখায় পায়রার। বাপ আফসারের চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে তাই ভাল ভাল খেলাগুলো আজকাল মনিরাই দেখায়। চিরকাল বেহিসেবী আফসার, সারা জীবন চলেছে আবেগের বশে। যত রোজগার তত ব্যয়। উৎসব, মেলাতে কি কম কামিয়েছে আফসার আলি, কিন্তু নিজের সংসারের জন্য যতটুকু রেখেছে, তার অনেক বেশি বিলিয়েছে ইয়ার-দোস্তের খানাপিনায়, দীন-দুঃখীকে ভিক্ষা দিতে। বদখেয়াল নেই একটুও। বিবি মারা যেতে সাদি করেনি আর। ছোট্ট মেয়ে মনিরাকেই বুকে-পিঠে ধরে এত বড়টি করে তুলেছে। এখন মনিরাই তার অন্ধের যষ্টি। মনিরা বয়সে কিশোরী কিন্তু ভারি বুদ্ধিমতী, এই যেমন তোমরা।

রোমি বলল, অবজেকশন কাকু, বয়সে কিশোরী হলে কি বুদ্ধি কম হয় নাকি?

তা কেন, তোদের তো বুদ্ধিমতী বললাম।

রিয়া বলল, গল্পে বাধা পড়ছে, তুমি বলে যাও কাকু।

অভীকাকু আবার শুরু করল, যৌবনকালে সারা ভারত চষে বেড়িয়েছে আফসার। নদীনালা, খালবিল, পাহাড়-পর্বত, প্রাসাদ-দুর্গ, কোনো কিছু বাকি রাখেনি সে। সঙ্গে খাঁচায় করে নিয়ে চলেছে কয়েকটা রাজকপোত। তারাও মালিকের সঙ্গে সারা দেশটা দেখে আর চিনে বেড়াচ্ছে।

এদিকে রাজায় রাজায়, জমিদারে জমিদারে লড়াই লেগেই আছে। সৈন্যরা চলে গেছে প্রাসাদ ছেড়ে অনেক দূরে। দ্রুত খবর চাই। ঘোড়ার পিঠে পাহাড় মরু নদী জঙ্গল পেরিয়ে রাজপুরীতে ঘন ঘন খবর বয়ে আনা এক সমস্যা।

একবার আফসারকে টুঁড়ে নিয়ে গেল কোনো এক রাজার সেপাই। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর চালাচালি করবে আফসারের কবুতর।

পাখি চলে গেল অশ্বারোহীর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে। রাজবাড়িতে কবুতরের সঙ্গিনীকে নিয়ে রইল আফসার।

এরপর যুদ্ধের খবর আসতে লাগল আকাশপথে অতি দ্রুত।

আসলে এই যুদ্ধটা কোনো রাজ্য-জয়ের জন্য হচ্ছিল না। নারী-হরণকে ঘিরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

রোমি বলল, সীতা হরণ, তাই না কাকু?

নারে, ওটা ছিল রাজকন্যে-হরণ। রাজার মা গিয়েছিলেন পুষ্করে তীর্থভ্রমণে। ঠাকুরমা অন্তপ্রাণ ষোড়শী রাজকন্যা আঁচল ধরে রইল পিতামহীর। তাকে নাকি কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না। অগত্যা সম্মতি দিতে হলো রাজাকে।

তীর্থদর্শন শেষে ফেরার পথে বিপর্যয়। জঙ্গল চিরে গুটি কয়েক সশস্ত্র রক্ষী সঙ্গে নিয়ে ফিরছিল রাজমাতার শিবিকা। একসময় গাছের ফাঁক দিয়ে রাজমাতা দেখলেন, কারা যেন ঘোড়ায় চড়ে অনুসরণ করছে তাঁদের।

কিছু পরে শিবিকা দুটি যখন এসে পড়ল একটা ফাঁকা জায়গায় তখন প্রকাশ পেল ঘোড়সওয়ারদের স্বরূপ। তারা দূর থেকে শিবিকা থামাতে বলে কাছে এগিয়ে এল। রূঢ় গলায় বলল, নামাও শিবিকা।

রক্ষীরা তখন শক্ত হাতে বল্লম ধরেছে।

অশ্বারোহীদের ভেতর একজনকে দেখে মনে হলো, সে দলপতি। পূর্ণ-বয়স্ক যুবাপুরুষ। দৃষ্টিতে আগুন ধিক্‌ধিক্‌ করছে।

এবার জানতে চাইল দলপতি, কে কে রয়েছে শিবিকায়?

রক্ষীদের একজন বলল, সাদা রঙের ঘেরাটোপ দেওয়া শিবিকায় রয়েছেন পিলাহাণ্ডির রাজমাতা, আর ঐ লাল ঘেরাটোপের ভেতরে রয়েছেন রাজকন্যা, আমাদের রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

সঙ্গে সঙ্গে দলপতি ইঙ্গিতে রাজমাতার শিবিকাটি তুলে নিয়ে সবাইকে চলে যেতে বলল। কেবল আটকালো শিবিকাসহ রাজকন্যাকে। মুখে বলল, রাজকন্যা আমার সঙ্গে যাবে ধৌলিগড়।

রক্ষীরা তেড়ে এল বল্লম উঁচিয়ে, অমনি হুঙ্কার দিয়ে উঠল অশ্বারোহী দলপতি, আর এক পাও যদি এগিয়েছিস তাহলে তোদের সবকটার ধড় থেকেই মুণ্ডু খসে যাবে।

দলপতির ইঙ্গিতে একজন কোমরে ঝোলানো ভেঁপুতে ফুঁ দিল। আর দেখতে না দেখতে একদল অস্ত্রধারী শিকারী বেরিয়ে এলো বন চিরে। তাদের পেছনে রক্তলিপ্ত পোশাকে আট-দশটি মৃত হরিণ ও বরাহকে টানতে টানতে নিয়ে এল দলপতির শিকার-সঙ্গীরা।

রাজকুমারী বুঝল, ভয়ঙ্কর একটি মৃগয়ার শিকার হতে হলো তাকে। রক্তপাত এড়ানোর জন্য বুদ্ধিমতী রাজকন্যা সমস্ত দলটাকে নিঃশব্দে পিলাহাণ্ডি চলে যেতে বলল।

ওরা কিছুদূর চলে গেলে রাজকন্যা দলপতির দিকে ফিরে বলল, কোথায় যেতে হবে চলুন।

বলেই শিবিকার ভেতর ঢুকে বসল। দলপতির লোকেরা পাল্কি কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটে চলল রাজবাড়ির দিকে। রাজকন্যা মণিকুটি ঘেরাটোপের ভেতর থেকে দেখতে পেল, ঘন বনের পাশ দিয়ে পাল্কি চলেছে। একসময় বন শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ পাশাপাশি দুটো লম্বা পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেল পাল্কিটা। আবছা অন্ধকারের ভেতর আর কিছুই দেখা গেল না। বেশ কিছুক্ষণ এমনি চলার পর আবার আলোয় ভরে উঠল চারদিক। মণিকুটি দেখল, বিরাট একটা সমতলক্ষেত্রের চারদিক ঘিরে পাহাড়। ঐ সমতলের একদিকে দুর্গের মতো রাজপ্রাসাদ। সেপাই-সান্ত্রী, লোকলস্কর ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। গোটা চারেক হাতিকে পরিচর্যা করছে মাহুত।

রাজবাড়িতে কিন্তু নামানো হলো না শিবিকা। প্রাসাদের পাশ কাটিয়ে পেছনের দিকে গাছগাছালির ভেতর দিয়ে চলল পাল্কি। অদূরে ঘন জঙ্গলের আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু পাল্কি নামানো হলো একটি চওড়া, গভীর, গড়খাইয়ের ধারে।

একসময় নৌকোয় চাপানো হলো পাল্কি। গড়খাই পার হয়ে পাল্কি গিয়ে ঢুকল জঙ্গলের ভেতর। এখানে মহারাজের বিনোদনের জন্য একটি বনগৃহ আছে। মণিকুটিকে সেই বনগৃহে এনে তোলা হলো।

ধৌলিগড়ের মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র এখন সিংহাসনের অধিকারী হয়েছে। পিতা যতখানি মহাপ্রাণ ও প্রজাপালক ছিলেন, পুত্রটি হয়েছে ঠিক তার বিপরীত। অত্যাচারে জর্জরিত দরিদ্র প্রজারা। অত্যন্ত অসৎ সঙ্গীদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সারাক্ষণ। কোন দিক থেকে কিভাবে কখন তার আক্রমণ আসবে সেই ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে নারীপুরুষ নির্বিশেষে।

রাজমাতা পিলাহাণ্ডিতে ফিরে যাবার পর মহারাজ কন্যাহরণের খবর শুনে কতক্ষণ হতচেতনপ্রায় হয়ে রইলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন।

স্থির হলো, অবিলম্বে আক্রমণ করতে হবে।

এটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

এবার আক্রমণের কৌশল নিয়ে আলোচনা চলল। একজন বললেন, ধৌলিগড় অরণ্য ও পর্বতসংকুল রাজ্য। শুনেছি, প্রাসাদটিও পর্বত আর অরণ্যবেষ্টিত। অত্যন্ত সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য।

মহারাজ পেরুমল উত্তেজিতভাবে বললেন, প্রাসাদ দুর্ভেদ্য বলে কি আমরা আক্রমণে বিরত থাকব বলে আপনি মনে করেন!

বিনীতভাবে পরামর্শদাতা বললেন, আমি কেবল মহারাজকে শত্রুপক্ষের অবস্থান সম্পর্কে একটি সত্য সমাচার দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র। যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর যেখানে আমাদের রাজকন্যার উদ্ধারই একমাত্র লক্ষ্য সেখানে কোনো বাধাই আমাদের কাছে বাধা নয়।

মহারাজ বললেন, সত্যই আমি কন্যাকে হারিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, এখন স্থির মস্তিষ্কে সবকিছু বিচার করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

পদাতিক অশ্বারোহী গজারোহী সৈন্যদের নিয়ে সেনাপতি অগ্রসর হলেন। পিলাহাণ্ডি থেকে কম নয় ধৌলিগড়ের দূরত্ব। তিন দিনের পথ।

সেনাপতি সসৈন্যে ধৌলিগড়ের জঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। অদূরে দুটি পর্বতের সংযোগস্থলে দুর্গ-প্রাসাদে প্রবেশের পথটি দেখা গেলেও প্রাসাদে সসৈন্যে প্রবেশ করা যে সহজসাধ্য নয় তা দূর থেকেই অনুমান করা যাচ্ছিল। এ অবস্থায় সংকীর্ণ গিরিপথে প্রবেশের চেষ্টা করার অর্থই হলো মরণ-কূপে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দেওয়া। এ বিষয়ে মহারাজ ও মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ চাই।

অশ্বারোহী সেপাইকে পাঠানো হলো সমস্ত পরিস্থিতির সমাচার দিয়ে। কিন্তু দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের প্রয়োজন। যত বেগবান অশ্বই হোক, প্রতিকূল পথে যাওয়া-আসা নিয়ে প্রায় চারদিনের পথ অতিক্রম করতে হবে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য এক মন্ত্রীর পরামর্শে ডেকে আনা হলো পারাবতবিশারদ আফসারকে। রাজবাড়িতে আফসার বসে রইল কপোতীটিকে নিয়ে, কপোত যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেল সেপাইয়ের সঙ্গে। এরপর কপোতের পাখায় সংবাদ আসতে লাগল অতিদ্রুত।

একবার দু'দিনের পথ অতিক্রম করে রণক্ষেত্রে নিয়ে গেলে কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে সে ফিরে আসতে পারত। এরপর আফসারের ইঙ্গিতে সে নিজেই যাতায়াত করতে লাগল।

এখন প্রাসাদের কোথায় আছে রাজকুমারী সেটি জানা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে রাজকুমারীর কাছ থেকে ভেতরের খবর পাওয়া যেতে পারে।

আফসার মহারাজের সঙ্গে একান্তে কথা বলল।

মহারাজ, রাজকুমারীর বয়সী একটি মেয়েকে রাজকুমারী যে সব পোশাক নিয়ে তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন সেইসব পোশাকে দু'তিন দিন সাজাতে হবে। হাতে যে রঙের চুড়ি পরেন রাজকুমারী তাই পরাতে হবে মেয়েটিকে। তারপর ঐসব পোশাক পরে অন্তত তিনদিন ও খাওয়াবে পায়রাটিকে। দিনের ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দিতে হবে। খাবারের সঙ্গে সামান্য আফিং মেশানো থাকলে ভাল হয়।

এরপর আমার সঙ্গে ঐ মেয়েটিকে লড়াইয়ের জায়গায় পাঠাতে হবে। আমি এবার নিজেই সঙ্গে নিয়ে যাব পায়রা। তারপর যা করার আমি তা করব হুজুর।

আফসারের কথা মতো সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। মেয়েটি রাজকুমারীর পোশাক আর চুড়ি পরে পায়রাকে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়াতে লাগল। খাবার দেবার সময় মেয়েটি আফসারের নির্দেশ মতো অর্ধেক মুখ ঢেকে রাখত। যাতে পায়রার দৃষ্টি শুধু পোশাকের ওপর পড়ে।

এরপর পায়রা আর মেয়েটিকে নিয়ে আফসার পথপ্রদর্শক সৈনিকটির সঙ্গে চলে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে।

যুদ্ধ পুরোদমে না হলেও শুরু হয়ে গিয়েছিল। দুর্গে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেই ঝাঁক ঝাঁক তীর ছুটে আসত। কোনো মানুষজনকে কিন্তু দেখা যেত না। পাহাড়ের মাথা বরাবর বহুদূর পর্যন্ত ছিদ্র করা ছিল। সেইসব ছিদ্রপথে তীরচালনা করত ধৌলিগড়ের সৈন্যরা। এইভাবে তারা ঠেকিয়ে রেখেছিল শত্রুপক্ষকে।

অন্যদিকে পিলাহাণ্ডির সৈন্যরা দুর্গে প্রবেশ করতে না পেরে সম্মুখে বহুদূর পর্যন্ত পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। এতে দুর্গের ভেতর স্বাভাবিক রসদ সরবরাহের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছিল। অবশ্য কাঁচা সব্জি ছাড়া মূল রসদের সঞ্চয় ছিল প্রায় চার মাসের মতো।

এদিকে প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব কোণে গড়খাইয়ের ধার ঘেঁষে বিশাল বিশাল কয়েকটা গাছের আড়ালে ছিল পাথরে গাঁথা সুউচ্চ একটি 'পর্যবেক্ষণ-গৃহ', যাকে আমরা বলি, 'ওয়াচ টাওয়ার'।

প্রতি রাত্রে ধৌলিগড়ের রাজা উঠত ঐ পর্যবেক্ষণ-গৃহে। শত্রুপক্ষের মশালের আলোয় দেখত পিলাহাণ্ডির সৈন্যদের গতিবিধি। নেমে এসে নিজের সৈন্যদের নির্দেশ দিত, তীরের মুখ কোনদিকে ফেরালে বেশি সংখ্যায় ঘায়েল করা যাবে শত্রুসৈন্য।

এদিকে কয়েকদিনের ভেতরেই শুরু হয়ে গেল আফসারের কাজ। যে মেয়েটি প্রতিদিন রাজকুমারীর সাজে সেজে নির্দিষ্ট সময়ে পায়রাকে খেতে দিত তাকে একদিন লুকিয়ে ফেলা হলো পায়রাটার চোখের আড়ালে।

যথাসময়ে খাঁচা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে খাবার জন্য মেয়েটিকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু আজ সে তার দেখা পেল না। এদিকে আগের দিন সন্ধ্যায় রাজকুমারীকে একটি চিঠি লিখে পাখিটার পাখায় আটকে দেওয়া হয়েছিল। তার গলায় একটা পট্টি বেঁধে রেখে দেওয়া হয়েছিল আফিংয়ের গুঁড়ো। এরপর রাজকপোতটা যখন খাবার জন্য অধীর হয়ে উঠল তখন আফসার তাকে পাহাড়ের ওপারে রাজপ্রাসাদের দিকে উড়িয়ে দিল।

উড়ছে। কপোতটা উড়ে উড়ে মনে হলো, প্রাসাদের চারদিকে চক্কর মারছে। সে নিশ্চয়ই খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই মেয়েটিকে যে প্রতিদিন তাকে ঠিক এই সময়ে বড় মুখরোচক খাবার ধরে দেয়।

মাঝে মাঝে ওপরের আকাশে দেখা যাচ্ছে পাখিটাকে, আবার যখন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না।

এবার সে আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেল, কিছুক্ষণ ওপরের আকাশে পাক দিয়ে সাঁ সাঁ করে নেমে গেল পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে। বহুক্ষণ তাকে আর দেখা গেল না।

বনেঘেরা প্রমোদভবনের আঙিনায় বসেছিল রাজকুমারী। ধৌলিগড়ের দুটি দাসী গল্প করছিল নবাগতার সঙ্গে। তারা রাজবাড়ি থেকে নিযুক্ত ছিল রাজকুমারীর পরিচর্যায়। তাদেরও রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হয়েছিল এমনি পথ থেকে বলপ্রয়োগ করে। তারা কেউ রাজকুমারী ছিল না, তাই তাদের বহাল করা হয়েছিল রাজবাড়ির দাসীর পদে।

ভীষণ মনের কষ্টে আত্মসম্মান খুইয়ে তারা প্রাণের দায়ে এ অবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তারা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল পিলাহাণ্ডির রাজকুমারীর ব্যবহারে। রাজকুমারী তাদের সঙ্গে দাসীর মতো ব্যবহার না করে করত আপন বোনের মতো। তাই তারা রাজবাড়ির খবর উজাড় করে দিত রাজকুমারীর কাছে।

তাদের মুখ থেকেই রাজকুমারী জানতে পেরেছে, আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় তাকে এই বনভবনে সাদি করে দুর্বৃত্ত রাজা নিয়ে যাবে রাজপুরীতে।

কপোত কিন্তু আকাশ থেকে দেখতে পেয়েছিল রাজকুমারীকে। ঠিক তেমনি পোশাকে সেজে হাতে লাল চুড়ি পরে ঐ তো বসে আছে তার চেনা মেয়েটি। সে নিঃসংকোচে নেমে এসে বসল রাজকুমারীর কোলে।

আশ্চর্য! পাখির পাখার পালকে গাঁথা হয়ে আছে পালকের আকারে কাটা একটি কাগজ। ভাল করে তাকিয়ে দেখল রাজকুমারী, ওটি নিছক একটি কাগজ নয়, ওতে কলমের আঁচড়ে চিঠি লেখা হয়েছে।

রাজকুমারী কাগজ খুলে নিয়ে দেখল, চিঠি তাকেই উদ্দেশ করে লেখা।

এরপর ঐ দাসীদের সাহায্যে প্রাসাদ থেকে লেখনী নিয়ে এসে পত্রের যথাযথ উত্তর দেওয়া হলো। তার আগে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা হলো কবুতরকে। তার কণ্ঠে সংলগ্ন আফিংয়ের সামান্য গুঁড়ো ভোজ্য বস্তুতে মিশিয়ে দিতে ভুল করল না রাজকুমারী। অবশ্য এ নির্দেশ পত্রের মধ্যেই ছিল।

চিঠি চালাচালি চলল কয়েকদিন। পিলাহাণ্ডির সেনাপতি রাজকুমারীর অবস্থান সম্বন্ধে বুঝতে পারলেন। দুর্গ-প্রাসাদের ভেতরের কিছু মূল্যবান খবরও তাঁর হস্তগত হলো।

শেষ চিঠি এল রাজকুমারীর কাছ থেকে,—আজ পূর্ণিমা। সতর্ক থাকবেন সবাই। প্রতিটি সৈন্য যেন প্রস্তুত থাকে। রাত্রি মধ্যযামের পর দুর্গের ভেতর থেকে যদি কোনো কোলাহল ওঠে তাহলে হস্তী ও শালকাণ্ডের সাহায্যে দুর্গদ্বার ভেঙে ফেলে ভেতরে প্রবেশ করবেন। আমাকে উদ্ধারের জন্য কোনো সৈন্য যেন পারাপারের নৌকো না পেয়ে অতি উৎসাহে গড়খাইয়ের জলে ঝাঁপ না দেয়। সমস্ত গড়খাই কুমিরে পূর্ণ। দুটি পারাপারের নৌকো বেঁধে রাখা হবে আমার বন-ভবনের দিকে। ওরা পালানোর চেষ্টা করলেও গড়খাই পেরিয়ে এপারে আসতে পারবে না।

রাজা প্রতি রাতের মতো আজ পূর্ণিমায় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠল পর্যবেক্ষণ-গৃহে। বিশাল বিশাল পাদপের শাখা-প্রশাখায় আচ্ছাদিত গুপ্ত গৃহটি কোনোভাবেই দেখা যেত না বাইরে থেকে। রাজা পর্যবেক্ষণের সময় কাউকে সঙ্গে নিতে একেবারেই পছন্দ করত না। নিঃশব্দে একাই উঠত সিঁড়ি বেয়ে আবার একাই নেমে আসত অন্ধকারে সিঁড়ির হাতল ধরে ধরে।

পর্যবেক্ষণ শেষে রাজা নেমে আসছিল। চারদিক পূর্ণিমার আলোয় উদ্ভাসিত। হঠাৎ ছুটে এল একটা তীর। ধৌলিগড়ের রাজার কণ্ঠনালী বিদীর্ণ করে সে তীর গেঁথে গেল গভীরে। তীরবিদ্ধ

আকাশচারী বিশালকায় পাখির মতো শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে দুর্বৃত্ত রাজা পড়ল এসে গড়খাইয়ের কিনারে। পরক্ষণেই গড়িয়ে গেল গড়খাইয়ের জলে। যে গড়খাই হতভাগ্য বন্দীদের শাস্তির জন্য তৈরি করেছিল এই নিষ্ঠুর রাজা।

শব্দ শুনে ছুটে এলো নৈশ প্রহরীরা। ততক্ষণে ক্ষুধার্ত, হিংস্র একটা কুমির রাজাকে তুলে নিয়েছে মুখে।

ভয়ংকর সেই দৃশ্য দেখে চিৎকার করতে লাগল রক্ষীর দল। দুর্গ ছেড়ে সৈন্যরা এসে ভিড় জমাল গড়খাইয়ের তীরে। প্রবল কোলাহল ও আতঙ্কের মধ্যে সবার চোখের সামনে ফুটে উঠল এক বীভৎস দৃশ্য—কুমিরগুলো মৃত রাজার শরীরটাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি করছে।

একসময় সকলের প্রাণফাটা আর্ত চিৎকারের মধ্যে নিজের তৈরি শাস্তির কূপে নিজেই তলিয়ে গেল রাজা।

ততক্ষণে রাজকুমারীর নির্দেশ মতো অরক্ষিত প্রাসাদের সিংহদ্বার ভেঙে ঢুকে পড়েছে পিলাহাণ্ডির সৈন্যেরা। ধৌলিগড়ের সৈন্যদের সজাগ হবার আগেই দুর্গ-প্রাসাদ চলে গেল পিলাহাণ্ডির রাজার অধিকারে।

আপন রাজ্যে ফিরে আসার পর রাজকুমারী তার বুদ্ধিমত্তা ও লক্ষ্যভেদের জন্য মহারাজের দ্বারা সংবর্ধিত ও পুরস্কৃত হলো। তীরধনু সংগোপনে সংগ্রহ করে দেবার জন্য রাজকুমারীর দুই মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী, সখীর মর্যাদা লাভ করল। পারাবতের পায়ে পরিয়ে দেওয়া হলো রূপার নূপুর, কারণ সে-ই করেছে যথার্থ সংবাদবাহকের কাজ।

অভীকাকু চুপ করে গেলে আমি বললাম, তবে যে তুমি বলেছিলে পায়রার কাহিনী-টাহিনী তোমার জানা নেই?

রোমি বলল, সত্যি কাকু, গল্পটা দারুণ।

রিয়া বলল, গল্পটায় একটুখানি খুঁত থেকে গেছে।

অভীকাকু রিয়ার দিকে তাকাল। ভাবখানা এই, বলে ফেল খুঁতটা কোথায়।

রিয়া বলল, সবাই পুরস্কার পেল,

সে নিঃসংকোচে নেমে এসে বসল রাজকুমারীর কোলে।

কিন্তু যার দৌলতে পুরো যুদ্ধজয়টা হলো, সে কিছু পেল না।

অভীকাকু হেসে বলল, আফসার কোনো পুরস্কারই নিতে চায়নি পিলাহাণ্ডির মহারাজের কাছ থেকে। মহারাজ আফসারকে বলেছিলেন, বল, কত অর্থ পেলে সারা জীবন তোমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে? তোমাকে আর কষ্ট করে পায়রার খেলা দেখিয়ে বেড়াতে হবে না।

আফসার চোখ কপালে তুলে বলেছিল, মহারাজ একি বলছেন! পায়রাই আমার প্রাণ। ওদের নাড়াচাড়া করতে না পারলে আমিই যে মারা পড়ব মহারাজ। ওরা বকম্ বকম্ আওয়াজ তুলে আমাকে ঘুম পাড়ায় আবার ঘুম ভাঙায়। ওরা খেলা দেখিয়ে আমার অন্নের যোগাড় করে দেয়। ঐ অন্নের সঙ্গে আমার আনন্দ মিশে থাকে মহারাজ। অতিরিক্ত দান দিয়ে আমাকে অলস আর লোভী করে তুলবেন না।

একটু থেমে আবার বলল আফসার, আপনি আমাকে সামান্য পারিশ্রমিক দিলেই আমি খুশি হব।

মহারাজ আফসারকে মূল্যবান কিছু কবুতর কেনা আর 'ব্যোম' বাঁধার জন্য এক থলে তন্‌খা দিলেন। তাই নিয়ে, আর রাজকপোতকে পিঞ্জরে ঝুলিয়ে আফসার বাড়ি ফিরে গেল মহানন্দে।

রিয়া বলল, ব্যোম বাঁধাটা কি রকম কাকু?

ওটা পায়রার খেলা দেখানোর জন্য তৈরি হয়।

এখানেই থামলে আমি আবার খোঁচালাম, আর একটুখানি বুঝিয়ে বল কাকু।

ধর, মেলার মাঠে পায়রার খেলা দেখানো হবে। প্রথমে মাঠে পোঁতা হবে একটা লম্বা বাঁশ। তারপর ঐ বাঁশের মাথায় বাঁধা হবে একটা চতুরস্র ছতরি।

রোমি বলল, তোমার ঐ নামগুলো বেশ। এখন বুঝিয়ে বল, চতুরস্র ছতরিটা কি।

কাকু বলল, ছোট ছোট বাখারি দিয়ে তৈরি একটা মাচা। এই সমস্ত ব্যাপারটাকেই বলে 'ব্যোম' বাঁধা। এবার

ওর ওপরে বসবে সাদা-কালো আর ইঁট রঙের পায়রা।
আমি বললাম, পায়রাগুলো আকাশে ওড়ার খেলা দেখাবে বলে কি ঐ ব্যাপারটার নাম 'ব্যোম' বাঁধা?
কাকু বলল, তোর দেখছি মাথাটা একদম সাফ্, অনেক কিছু খেলে বেড়ায়। তোর অনুমানটাই সঠিক হওয়া সম্ভব। আর কিই বা হতে পারে!
খেলাটা কি রকম?
ব্যোম বাঁধা হয়ে গেলে ওস্তাদ নিচ থেকে পায়রা ছাড়তে থাকবে। সাদা-কালো আর পোড়া ইঁট রঙের। সব কটা পায়রা উড়ে গিয়ে বসবে চতুরস্র ছতরির ওপর।
এরপর শুরু হবে আসল খেলা। সরু তলতা বাঁশের সঙ্গে বাঁশ জুড়ে তৈরি একটা লম্বা লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়াবে ওস্তাদ। সে লাঠি তুলে চতুরস্র ছতরির তলায় প্রথমে একটা খোঁচা লাগাবে। সঙ্গে সঙ্গে ছতরি ছেড়ে আকাশে উড়ে যাবে এক ঝাঁক সাদা পায়রা। তারা আকাশে উঠেই একটা বৃত্ত তৈরি করে উড়তে থাকবে।
কিছু পরে ছতরিতে দুটো খোঁচা লাগালেই আকাশে উড়ে যাবে ইঁট রঙের পায়রাগুলো। তারা সাদা চক্রের বাইরে আরও বড় একটা গেরুয়া চক্র তৈরি করে ঘুরতে থাকবে। একটা বলয়কে ঘিরে আর একটা বলয়।
শেষে তিনটে খোঁচা দিলেই ছতরি শূন্য করে নীলের আভালাগা কালো পায়রাগুলো উড়ে যাবে আকাশে। শেষ বৃত্তটি তারাই রচনা করবে।
সূর্যের আলোর ছোঁয়ায় উড়ন্ত পায়রার ঝাঁক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।
এরপর নিচ থেকে ওস্তাদ ফাটা বাঁশ ঠুকে একটা আওয়াজ করলেই প্রথমে মালা থেকে খসে পড়া ফুলের মতো সাদা পায়রাগুলো ঝরে পড়বে মাটিতে। ক্রমে দুটো আর তিনটে শব্দে গেরুয়া আর কালো পায়রাগুলো নেমে আসবে মাটিতে ওস্তাদের কাছে।
অবাক হয়ে এসব খেলা দেখে মেলার লোকজন।
এরপর 'খড়কে' লোটন আর 'বেদম' লোটনকে যেন দম দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো মাটিতে। ওরা ভারি সুন্দর ডিগবাজি আর লুটোপুটি খেত।
হাততালি দিয়ে উঠত দর্শকেরা।
শ্রেয়া বলল, ঐ যে লোটন পায়রার দুটো নাম বললে, 'খড়কে' আর 'বেদম', এদের ভেতর তফাৎটা কোথায়?
দুটোই লোটন, তবে কিছুটা পার্থক্য আছে উভয়ের ভেতর। 'খড়কে' লোটন খুব তাড়াতাড়ি লুটোপুটি খেতে পারে, আর 'বেদম' লোটন একদমে বেশিবার লুটোপুটি খেতে পারে।
বললাম, পায়রা এত খেলাও জানে!
আরও অনেক। তবে সব কটা তো আর বলা যাবে না, শেষ খেলাটার কথা বলি।
কি রকম?
একটা উঁচু বাঁধানো বেদীর ওপর এ খেলাটা দেখানো হতো। গোটা দশেক লক্কা পায়রা ঘুরে ঘুরে নাচ দেখাতো বেদীর ওপর। ঠিক ময়ূর নাচের ভঙ্গিতে।
রেশমের মতো উজ্জ্বল সাদা রঙের 'রেশমী লক্কা' পেখম মেলে ধরত ঠিক ময়ূরের মতো। ঝোটন বাঁধা মাথাটি ঈষৎ কাৎ করে যখন ওরা গলায় কাঁপন জাগাতো তখন মনে হতো, সমবেত দর্শকদের ওরা অভিবাদন জানাচ্ছে।

॥ দুই ॥

সেট্রিহাল্লির ফরেস্ট হাউসে সন্ধ্যা নেমেছে। শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ রুপোর বড় একটা ঝকঝকে বাটির মতো ভেসে আছে আকাশের নীলজলে।
ফুলেভরা ফরেস্ট হাউসের লনে চারখানা সাদা কুর্সি পাতা। আমি, বাসব আর অভীকাকু বসে আছি, বাবা অফিস ঘরে বসে কি সব কাজ সারছে। আমি আর অভীকাকু একদিন আগে এসেছি এখানে। আজ বিকেলের দিকে বাবার সঙ্গে এলো বাসব। কর্ণাটকের বিদ্যুৎ বিভাগের সুপারিনটেন্ডিং ইন্‌জিনিয়ার বিপ্লব গাঙ্গুলির ছেলে। বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিপ্লব কাকু। বাসব আমার থেকে বছর দুয়েকের বড় হলে কি হবে, আমি ওকে নাম ধরেই ডাকি। ও আমাকে সাইকেল চালানো আর বন্দুক ছোঁড়া শিখিয়েছে। আমি ওকে শিখিয়েছি বাংলা গান, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত। ওর শেখার আগ্রহ যত বেশি, গলায় সুর তত কম। তবু আগ্রহ আর উৎসাহের জয় হয়েছে। নিজে এখন খালি গলায় অথবা হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইতে পারে। সভাতে না হোক বন্ধুবান্ধবের ভেতর। এজন্যে ও দারুণ কৃতজ্ঞ আমার কাছে। ঘরে-বাইরে ও তার কৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে বেড়ায়।
আমি একদিন ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললাম, তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমার কোনো বন্ধুত্ব নেই বাসব।
ও অবাক হয়ে বলল, তার মানে?
আমার ক্ষোভ তখনও মেটেনি। ওর কথার উত্তর না দিয়ে বলে চললাম, আমি আজ থেকে সাইকেলে চড়ব না, আর প্রতিজ্ঞা করছি, কোনোদিন কাউকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়ব না।
ও কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল।
ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার রাগ পড়ে গেল। বললাম, তুমি শ্রেয়ার কাছে আমার একরাশ প্রশংসা করে বলেছ, আমিই তোমার গানবাজনার গুরু।
ও সাধারণত কোনো বিষয়েই তেমন উত্তেজিত হয় না। কিন্তু সেদিন বেশ জোরের সঙ্গে বলল, বলেইছি তো। আমি তো কোনো মিথ্যে কথা বলিনি।
তার পরের ঘটনাটা কি তুমি জান?
ও মাথা নেড়ে জানাল, ও কিছুই জানে না।
শ্রেয়া সব জায়গায় বলে বেড়িয়েছে, আমি নাকি ভুল সুরে গান করি, আমার শিষ্যটিও তেমনি ভুলের স্বর্গে বাস করছে। এ পর্যন্ত ওর দৌড় হলে আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম, কিন্তু...
আমি একটুখানি থামতেই ও বলল, কিন্তু কি?
আমার গানের গুরু তানিবাবুকে নিয়েও ও বেফাঁস সব কথা বলেছে। ওদের সুরপীঠে যিনি গান শেখান তিনি নাকি বলেছেন, 'তানি আমার সঙ্গে গান শিখতে সংগীত-ভবনে ঢুকেছিল। বছরখানেক যেতে না যেতেই শান্তিনিকেতন থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে

পালিয়েছে।'
আমি তানিবাবুকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, উনি সঙ্গীতভবনের পুরো কোর্সই শেষ করেছেন। একদিন উনি বিশ্বভারতীর কনভোকেশানের ফটো আমাকে দেখিয়েছিলেন। উনি যে ওঁর অভিজ্ঞানপত্র গ্রহণ করছেন সে ছবি আমি দেখেছি।

আমি ওঁকে শ্রেয়ার মন্তব্যের কথা বলিনি, শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি ভবদেববাবুকে চেনেন, যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখান?

তানিবাবু বললেন, উনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখান বলে শুনেছি, ওঁর সঙ্গে আমার কোনো আলাপ নেই। কেন বলত?

আমি বললাম, এমনি স্যার।

উনি এতো ভালমানুষ যে শ্রেয়ার কথাটা বলতে আমার লজ্জা হলো।

বাসব বলল, শ্রেয়াকে আমার আনন্দের কথাটা সহজভাবে বলেছি, কিন্তু এই সামান্য কথা নিয়ে সে যে এতখানি ঝঞ্ঝাট পাকাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমি ওর হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলাম, ওসব যেতে দাও, আমাদের বন্ধুত্ব অটুট রইল।

বাবা বলে, বাসব যেমন সহজ-সরল তেমনি লেখাপড়ার বিষয়ে প্রতিভাবান।

ওর কলেজে ছুটি পড়েছে তাই বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছে আমার বাবার সঙ্গে। ওরও ঘোরার নেশা আছে।

সন্ধ্যায় খোলা আকাশের তলায় বসে আমি অভীকাকুকে মনে করিয়ে দিলাম সকালের কথা, তুমি প্রজাপতিদের পথ চেনার আশ্চর্য ক্ষমতার কথা বলবে বলেছিলে না?

অভীকাকু মজা করে বলল, সে কথাটি দেখছি ভোলনি কন্যে। ঠিক আছে, গল্প শুরু করছি। পরক্ষণেই ভুল শুধরে নিয়ে বলল অভীকাকু, না না, এটা আদপেই গল্প নয়, একেবারে ষোল আনা সত্যি।

বাসব অমনি বলে উঠল, কাকু এখন তোমাদের আমলের সিকি আনা পাই ভ্যানিশ হয়ে গেছে। বলতে পার, একশোপয়সা সত্যি, ষোল আনা নয়।

দারুণ শুধরে দিলি ভুলটা। ঐ প্রয়োগটা এমন চালু হয়ে গেছে যে ভেতরের ভুল চোখেই পড়ে না। এ যুগের এবং পরবর্তী যুগের ছেলেরা এ কথার তাৎপর্য একেবারেই ধরতে পারবে না।

আমি বললাম, এ আলোচনা আপাতত তোলা থাক। এখন প্রজাপতি উড়ে চলুক পথ চিনে চিনে।

অভীকাকু শুরু করল, আমেরিকা মহাদেশের লেক অঞ্চলে অথবা কানাডায় এক ধরনের প্রজাপতি আছে, তাদের বিস্ময়কর ক্ষমতার কথাই বলছি। অবশ্য আফ্রিকার অন্য এক জাতের প্রজাপতিও এ ক্ষমতা রাখে।

বাসব বলল, কি ক্ষমতা অভীকাকু?

যাতায়াত মিলিয়ে ওরা বছরে প্রায় পাঁচ-ছ'হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। আমেরিকার সম্রাট (মনার্ক) প্রজাপতি আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে যাত্রা করে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে উপস্থিত হয়। ওখানে ওরা বিশেষ এক ধরনের গাছে বসে শীতকালটা কাটায়। তারপর বসন্তের হাওয়া দিতে শুরু করলে ওরা কানাডা অথবা নায়েগ্রার দিকে ওদের গ্রীষ্মাবাসে চলে যায়। সেখানে ওরা বরফ ঢাকা লেকের হাওয়া খেয়ে গ্রীষ্মকালটা দিব্যি কাটায়। আবার যখন শীতের হাওয়ায় গাছের পাতায় কাঁপন লাগে তখন আসন্ন কড়া শীতের আশঙ্কায় ওদের বুকও দুরু দুরু করে। ওরা তখন আর লেক ডিস্ট্রিক্টের অথবা কানাডার বনাঞ্চলকে আশ্রয়ের উপযুক্ত জায়গা বলে মনে করে না। তখন হাওয়ায় চিত্রিত ডানা মেলে ওরা হাজারে হাজারে লাখে লাখে উড়ে চলে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ওদের বিশেষ বিশেষ শীতাবাসে।

বাসব বলল, এই হালকা সামান্য পতঙ্গগুলোর কি আশ্চর্য ক্ষমতা!

অভীকাকু বলল, আরও আশ্চর্য অপেক্ষা করছে বৎস। তবে আমি একটি ছোট্ট গল্পের ভেতর দিয়ে ঐ প্রজাপতির যাত্রা কাহিনীটি শোনাব।

আমরা চেয়ার টেনে নিয়ে আরও ঘন হয়ে বসলাম।

কাকু শুরু করল,

রাজার নাম মনোহর, রানী সুচিত্রিতা। ওরা সারা রাজ্যে পাতা ঝরতে দেখে টের পেয়ে গেল শীতের দৈত্যটা এগিয়ে আসছে। দূর থেকে তার ভয়ঙ্কর নিঃশ্বাসের আঁচ পেয়ে থর থর করে কাঁপছে সারা বনরাজ্য। ভয়ে প্রত্যেকটা গাছের অঙ্গ থেকে খসে পড়ছে পাতার পোশাক। দৈত্যটা আসামাত্রই জমে যাবে হ্রদের জল। সাদা বরফের আলখাল্লা পরে ফাঁসির আসামীর মতো দাঁড়িয়ে থাকবে হাজার হাজার গাছ।

রাজা মনোহর আর রানী সুচিত্রিতা প্রজাদের ভেতর ঘোষণা করে দিল, অচিরেই শুরু হবে মৃত্যুর তাণ্ডব, আর দেরি নাই, সবে মিলে পাখা মেলে চল চল দক্ষিণে উড়ে যাই।

লাখে লাখে প্রজাপতি বাতাসে মেলে দিল তাদের চিত্রিত ডানা, সে এক সমারোহপূর্ণ দর্শনীয় যাত্রা।

বাসব জানতে চাইল, ওদের ভেতর কি সত্যিকারের রাজারানী রয়েছে?

অভীকাকু বলল, যাদের আমি রাজারানী বলছি তাদের দুজনের পাখায় পতঙ্গ-বিশারদরা নম্বর বসিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছে।

আমি জানতে চাইলাম, কেন কাকু?

ওদের যাত্রাপথে যেসব অরণ্যনিবাসে ওরা বিশ্রাম নেবে সেখানকার গবেষকরা ওদের আচার-আচরণ, গতিবিধির খবর রাখবে। এমনকি কোন গাছে ঐ নম্বর দেওয়া পতঙ্গযুগল গিয়ে বসল তাও লক্ষ্য রাখবে ওরা। তাছাড়া রানী কোথায় ডিম পাড়ল, সেই রুপোলী, সোনালী ঝলক দেওয়া ডিম থেকে লারভা, পিউপার অবস্থান্তর, শেষে তার থেকে শিশু-প্রজাপতির আবির্ভাব। ঐ যুবরাজ অথবা রাজকন্যাকেও চিহ্নিত করবে পতঙ্গ-বিশারদরা। লক্ষ্য রাখবে তাদের গতিপ্রকৃতি আর অবস্থানের ওপর।

বাসব বলল, এত কাণ্ড!

আমি বললাম, এবার আসল গল্পটা বল কাকু।

অভীকাকু বলল, হাওয়ার সমুদ্রে পাখা টানতে টানতে ওরা একসময় এসে পৌঁছল ওদের শীতাবাসে। এখানে শীত

সহ্যের বাইরে নয়। তবু ওরা এই শীতকালটা গুটিসুটি মেরে গাছের ডালে ডালে পাখা বন্ধ করে বসে রইল। গাছে গাছে আর পাতাই দেখা যায় না, এত প্রজাপতির ঠাসাঠাসি। এখন ওড়াউড়িটা কম। আটলান্টিকের হাওয়া ওদের ঠেলে দিয়েছে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে। দু'দশ কিলোমিটার পথ তো নয়, পাক্কা হাজার তিনেক কিলোমিটার। তাই পথশ্রান্ত, শীতে কাতর প্রজাপতিদের চলছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় হাওয়ায় আমেজী ঘুম।

জানতে চাইলাম, ওরা আর ফিরবে না ওদের দেশে?

কাকু বলল, স্বদেশকে কি ভোলা যায়? জন্মমাটির টান বলে কথা। ওরা ফেরে, যখন হাওয়ায় লাগে ফাল্গুনী কাঁপন, তখন নিজের রাজ্যে ফেরার আকুলতা জাগে।

ওরা আবার হাওয়ার সাগরে ভাসতে ভাসতে, ফুলের মধু খেতে খেতে, বনের ভেতর নাচের আসরে নাচতে নাচতে এগোতে থাকে জন্মভূমির দিকে।

পথের ধারে বনের ভেতর কোনো একটি গাছে ডিম পাড়ে রানী সুচিত্রিতা। কেবল রানীই নয়, তার হাজার হাজার সঙ্গিনীরাও গাছে গাছে ডিম পড়ে। কিন্তু কি ভাগ্যহীন তারা, পুত্র-কন্যার চাঁদ-মুখগুলি দেখার আগেই হাজার হাজার জননীকে বিদায় নিতে হয় এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ থেকে। তাদের দেশে ফেরার কামনা অপূর্ণই থেকে যায়। রাশি রাশি শবদেহ পাতার মতো বিছিয়ে থাকে। গাছের তলায়। কখনো ঝড়ো হাওয়ায় উড়তে থাকে। একসময় রেণু রেণু হয়ে মিশে যায় পথের ধুলোর সঙ্গে।

সুচিত্রিতার ডিম থেকে রূপান্তরের ভেতর দিয়ে জন্ম নেয় যে প্রজাপতি, একদিন সেই শিশুকে জালে বদ্ধ করে পতঙ্গ-বিশারদ। তারপর তার কোমল তরুণ পাখায় হাত বুলিয়ে তাতে নম্বর বসিয়ে দেয়।

এবার ওরা তরুণ প্রজন্মের দল উড়ে চলে ওদের অদেখা অচেনা মাতৃভূমির উদ্দেশে। ঠিক একদিন পৌঁছে যায় ওদের পূর্বপুরুষের বাসস্থান লেক ডিস্ট্রিক্টের অথবা উত্তরে কানাডার বনাঞ্চলে। অথবা আরও উত্তরে আলাস্কায়।

আবার শীতের লহর শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা দেশছাড়া হয়।

পিতৃ-পিতামহের অচিহ্নিত পথ ধরে উড়ে চলে সেই সুদূর দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বনভূমিতে।

বাসব এবার প্রশ্ন করল, ওদের বাবা-মা কিংবা পূর্বপুরুষেরা যে বনভূমিতে আশ্রয় নিত, সেখানেই কি?

ঠিক সেই বনাঞ্চল, সেই সেই বিশেষ বৃক্ষগুলি যেখানে তাদের বাবা-মায়েরা একদিন আশ্রয় নিয়েছিল।

বললাম, সত্যি, বড় অদ্ভুত ব্যাপার!

অভীকাকু বলল, তাহলে শোন, রানী সুচিত্রিতা মারা যাবার আগে রাজা মনোহরকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিল, পুত্র হলে নাম রেখ, 'জাতিস্মর', আর কন্যা হলে, 'অনুস্মৃতি'।

হেসে বললাম, রানী কিন্তু পুত্রকন্যার বেশ লাগসই নামকরণ দুটি করেছে। একজন জন্মজন্মান্তরের কথা স্মরণ করতে পারে, অন্যজন পেছনের স্মৃতি।

অভীকাকু বলল, কি বিস্ময় দেখ, কোনোদিন যে পথে ওরা চলেনি, সেই পূর্বপুরুষের চিহ্নহীন পথ ধরে ওরা হাজার হাজার কিলোমিটার উড়ে এসে বসল সেই বিশেষ বনভূমির সেই সেই বৃক্ষে যেখানে ওদের বাবা-মা গত বছরে আশ্রয় নিয়েছিল।

পতঙ্গ-বিশারদেরা খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখল, রাজা মনোহর আর রানী সুচিত্রিতার পুত্র 'জাতিস্মর' বিজ্ঞানীদের চিহ্ন গায়ে সেঁটে বসে আছে সেই নির্দিষ্ট চিহ্নিত ডালে যেখানে তার বাবা-মা এসে বসেছিল গত বছর ঠিক এমন সময়টিতে।

আমি অভিভূত হয়ে বললাম, কি এমন অদৃশ্য শক্তি যা ওদের হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে নিয়ে এসে বিশেষ চিহ্নিত বিন্দুটিতে বসিয়ে দিল!

অভীকাকু বলল, আমার মনে হয় ওটা বাইরের কোনো শক্তি নয়, নিজের ভেতর থেকেই জেগে ওঠে ঐ শক্তি, যা ওরা পায় ওদের বংশধারা থেকে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা এখনও এই বিস্ময়ের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেননি। পাখিদের ক্ষেত্রেও তাই।

বললাম, ওদের সম্বন্ধে কিছু বল কাকু। পায়রা দিয়ে একদিন শুরু করেছিলে পক্ষী-তত্ত্ব, এবার পাখি দিয়েই শেষ হোক।

গান গেয়ে উঠল অভীকাকু। একেবারে রবীন্দ্রসংগীত। 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।'

ঐ একটি ছত্রেই গান শেষ। তাহলেও অভীকাকুর গলায় সুর আছে।

অভীকাকু বলল, তোমার আর্জি জানা রইল কন্যে, তবে আজ রাতে আর নয়, কাল রঙ্গনটিট্টু পাখিরালয়ে যাবার প্রোগ্রাম ছকা আছে, সুযোগ পেলে ওখানেই পাখি নিয়ে গল্পের আসর বসবে।

পরের দিন রঙ্গনটিট্টুর বিখ্যাত পাখিরালয়ে হাজির হলাম।

বিরাট ঝিল। তীর জুড়ে অজস্র ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাজার রকম গাছগাছালি। জলচর, স্থলচর পাখিদের কলরবে সারাক্ষণ ভরে আছে রঙ্গনটিট্টুর পক্ষী-নিবাস। পাখিরা ঝিলের জলে ডুবসাঁতার দিচ্ছে। টুবটুব করে ডুব দিয়ে ভুস ভুস করে ভেসে উঠছে ঝিলের জলে।

একদল পাখায় মুক্তোর দানা উড়িয়ে ক্ষিপ্রবেগে তাড়া করছে অন্য দলকে। কিছুপথ দৌড়ে তাড়া খাওয়া হাঁসগুলো মুহূর্তে অদৃশ্য হচ্ছে জলের তলায়। আক্রমণকারীরা হতচকিত হয়ে যেন খুঁজে ফিরছে তাড়াখাওয়া পলাতকদের। তারপর জলের ভেতরও কতক্ষণ ধরে উভয়পক্ষের চলল চোর-পুলিশ খেলা। এরপর খেলার শেষে সবাই মিলে গতর ফুলিয়ে ঢেউ দিতে দিতে এগিয়ে চলল পাড়ের দিকে। পাড়ে উঠে পাখা ঝাড়ার সে কি সমারোহ। তারপর কেউ কেউ পালকের ভেতর মুখ গুঁজে রোদ্দুর পোহাতে লাগল।

আমরা তিনজনে বোট-বিহার করছি ঝিলের জলে। অভীকাকুর ক্যামেরা ক্লিক্ শব্দে ক্রমাগত কথা বলে চলেছে। হাঁসেদের জীবনযাত্রার এক টুকরো ছবি ধরা পড়ল অভীকাকুর ক্যামেরার ভেতর।

ঝিলের দিকে এগিয়ে এসেছে গাছের

একটা সরু ডাল। তার শেষপ্রান্তে চুপটি করে বসে আছে ঝকঝকে লাল নীল সাদা রঙে চিত্রিত অপরূপ এক মাছরাঙা। ছোট চকচকে একটি মাছ জলের ওপরে ভেসে ওঠার অপেক্ষায় চোখ, ঠোঁট আর পাখা ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

কাকু একটু দূর থেকে ছবি নিল।

উল্টো তীরে বোট যেই ফিরল অমনি দেখা গেল ঝিলের লাগোয়া চরে দুটো কুমির দিব্যি শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। তাদের সামনে দুটো বাচ্চা পরস্পরকে তাড়া করে খেলা করছে। মা-বাবা পেট চেপে শুয়ে পিট পিট করে দেখছে বাচ্চা দুটোর কেরামতি।

অভীকাকু কখনো হাঁটু মুড়ে বসে, কখনো বা দাঁড়িয়ে শিকারের ভঙ্গিতে কুমির পরিবারের কয়েকটা ছবি নিল।

বোট কুমিরপাড়ার কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই ওরা সুট সুট করে ছানাপোনাকে ডেকে নিয়ে জলের তলায় গা ঢাকা দিলে।

ফেরার পথে একটা ঝাঁকড়া গাছের ডালে দেখা গেল শয়ে শয়ে বাদুড় ঝুলে আছে। কাকু ঝুলন্ত বাদুড়েরও ছবি নিতে ভুলল না।

ছবি নেওয়া শেষ হলে বলল, বাদুড় এক বিস্ময়!

বাসব বলল, কি রকম?

ঠিক র‍্যাডার যন্ত্রটির মতো ক্ষমতা আছে ওদের ভেতর।

বললাম, আর একটুখানি ব্যাখ্যা করে বল কাকু।

র‍্যাডার যন্ত্রের কাজ হলো, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। ঐ তরঙ্গ যখন কোনোকিছুতে প্রতিহত হয়ে যন্ত্রে ফিরে আসে তখন আমরা জানতে পারি বাইরের বস্তুটা কত দূরে রয়েছে। যুদ্ধের সময় শত্রুর প্লেনটা কত কাছে এগিয়ে আসছে সেটা জানতে পেরে আমরা সাবধান হই অথবা সেইমতো দ্রুত ব্যবস্থা নিই। বাদুড়ের ব্যাপারটাও ঠিক তাই।

বললাম, এ ব্যাপারটাও তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে।

কাকু বলল, একটা বদ্ধ অন্ধকার ঘরে পাখা চালিয়ে একটা বাদুড়কে যদি উড়িয়ে দাও তাহলে সে দেখতে না পেলেও পাখাতে ধাক্কা খাবে না। এমনকি অন্ধকারে খাতা-পেন্সিল ছুঁড়ে মারলেও সে ঠিক ঐ ছুটে আসা বিপদজনক জিনিসগুলোর পাশ কেটে বেরিয়ে যাবে।

এটা সত্যি অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার। বাদুড়ের ভেতরেও কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আছে নাকি?

না, সেটি নেই তবে আর একটি ক্ষমতা আছে।

কি সে ক্ষমতা?

মুখ দিয়ে অতি সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ প্রেরণের ক্ষমতা, আর প্রতিহত সেই শব্দতরঙ্গকে কানে শুনে তার দূরত্ব বিচার করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতার বলেই সে বুঝতে পারে বিপদজনক বস্তুটি তার থেকে কত দূরে রয়েছে। অমনি সে দ্রুত তার পাশ কাটিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। চোখ বন্ধ করে দিয়েও দেখা গেছে শুধু মুখ আর কানের সাহায্যে সে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় আত্মরক্ষা করতে পারে।

বাসব বলল, কাকু তুমি মহাশক্তিমান বাদুড়ের যেসব ছবি তুলেছ, তার একটা অন্তত এনলার্জ করে আমাকে দিও। আমি কাজকরা সোনালী ফ্রেমে ওটিকে বাঁধিয়ে রাখব।

আমি বললাম, তারপর?

তারপর আবার কি?

বললাম, ওটাকে শুধু বাঁধালেই তো চলবে না, ঝোলাতে হবে তো।

বাসব বলল, ও আমি আমার পড়ার ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখব।

মাথা নেড়ে বললাম, ওটা ওর ঝুলে থাকার পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়।

তবে?

বাড়ির আশপাশে যদি কোনো আম, জাম, পেয়ারা গাছ থাকে তাহলে তাদের একটা ডালে ছবিটা ঝুলিয়ে রেখো।

বাসব ক্ষুব্ধ গলায় বলল, কেন?

বললাম, যার যেথা স্থান। বাদুড় ফল খেতে ভালবাসে তো, তাই বললাম।

অভীকাকু হো হো করে হেসে উঠতেই বাসবের ঘোর কাটল। অত্যন্ত সহজ-সরল মনের ছেলে বাসব। যা ভাবে তাই বলে ফেলে, ওর ভেতর কোনো ঘোর-প্যাঁচ নেই।

রঙ্গনটিট্টুর সান্ধ্য আসরে অভীকাকু বলল, আজকের আসরে বল কি নিয়ে কথা হবে?

বললাম, অবশ্যই পাখি নিয়ে, আমরা যখন পাখিরালয়েই রয়েছি।

প্রজাপতির বাইরের আর ভেতরের শক্তির কথা তোমরা জান। এখন শোন পাখিদের শক্তির কথা। প্রজাপতিরা যে আশ্চর্য ক্ষমতার বলে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা পথ ধরে হাজার হাজার কিলোমিটার উড়ে গিয়ে এক বিশেষ অঞ্চল আবিষ্কার করে, এমনকি সেই বিশেষ গাছটি, যেখানে তার মা-বাবা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের জীবিত অবস্থায়, সেই পরমাশ্চর্য ক্ষমতা পাখিদের ভেতর আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে প্রজাপতির চেয়েও অনেক অনেক দীর্ঘ পথ ওরা অতিক্রম করে যায়। আর প্রথম-বারের চেনা গাছটিকে দ্বিতীয়বার চিনে নিতে তাদের একেবারেই ভুল হয় না। পাখির পায়ে রিং পরিয়ে বিজ্ঞানীরা এ সত্যটি জেনেছেন।

বাসব বলল, এক ঝাঁক বিশেষ জাতের প্রজাপতি যদি প্রতিবছর যাতায়াতে প্রায় ছ'হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে তাহলে পরিযায়ী পাখিরা কত পথ প্রতিবছর যাতায়াত করতে পারে?

বিভিন্ন পাখির ক্ষেত্রে পথ অতিক্রমের ক্ষমতা বিভিন্ন রকমের। আমেরিকার গোল্ডেন প্লোভার পাখি উত্তরে আলাস্কা থেকে দক্ষিণে হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার পথ প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে সঠিক দিক নির্ণয়ের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে তাদের। তাছাড়া এত দূর পথের যাত্রায় পা রেখে বিশ্রাম নেবার কোনো জায়গাই নেই।

জানতে চাইলাম, ওরা কি দিন-রাত উড়ে চলে?

না উড়ে উপায় কি! ওরা তো হাঁস জাতীয় জলচর পাখি নয় যে কিছুসময় জলে গা ভাসিয়ে বিশ্রাম করে নেবে।

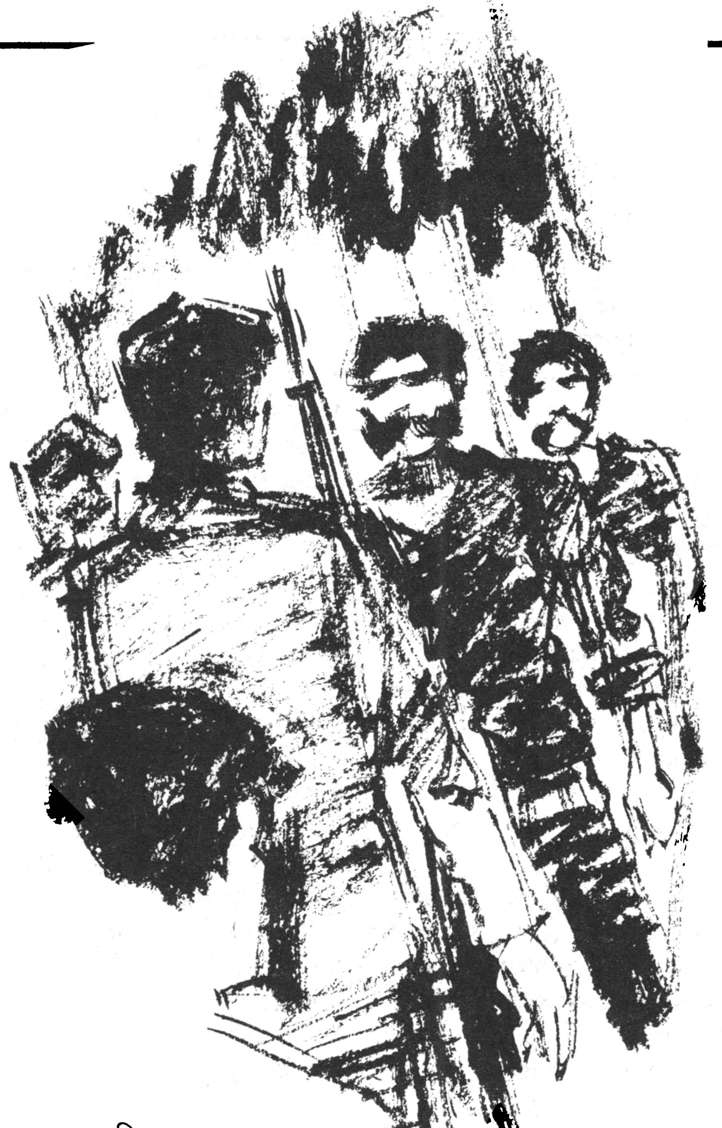

চন্দন-দস্যু কি যেন প্রশ্ন করে চলেছে

বাসব বলল, ওরা চন্দ্র, সূর্য, তারা দেখে হয়তো দিক নির্ণয় করে নেয়।

অভীকাকু বলল, অবশ্যই। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে অভিজ্ঞ নাবিকেরা চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রের অবস্থান দেখে দিক নির্ণয় করত।

বাসব আবার বলল, শুনেছি মেঘলা দিনে অথবা কুয়াশার ভেতর নাবিকরা চন্দ্র, সূর্য, তারার অবস্থান জানতে না পেরে দিগভ্রষ্ট হতো। জলযান ভেসে চলে যেত সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশের পথে। কিন্তু এমন অবস্থায় পাখিরা কিভাবে দিক নির্ণয় করবে?

ওদের অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে। ওরা মেঘাচ্ছন্ন আকাশেও 'বেগনিপারের আলোয়' সবকিছু দেখতে পায়। সূর্যের সঠিক অবস্থান ওরা জানতে পারে।

আর একটা কথা জেনে রেখো, দীর্ঘ পথযাত্রায় ওরা রাতকেই দ্রুত পাখা টেনে চলার উপযুক্ত সময় বলে মনে করে।

আচ্ছা কাকু, সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এক রাতে ওরা পাখা টেনে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে?

চারশো কিলোমিটারেরও বেশি।

বাসব জানতে চাইল, মেঘ ছেয়ে এলে ওরা কি মেঘের বুক চিরে উড়ে যায়?

না, তখন অনেক নিচ দিয়ে ওড়ে। প্রকৃতিতে সে সময় আঁধার ঘনিয়ে ওঠে। কেউ যদি ওদের যাত্রাপথের নিচে থাকে তাহলে সে শুনতে পাবে ওদের ডাক। যেন অভিজ্ঞরা নতুনদের ডেকে বলছে, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, ভয় কি। আমরা সবাই সঠিক পথে একসঙ্গে চলেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, কোন কোন দূরপাল্লার পাখি কতদূর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে?

এক জাতের বক আর সোয়ালো পাখি উত্তর ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত প্রায় ন'হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়।

বললাম, আশ্চর্য ক্ষমতা!

অভীকাকু বলল, এতেই অবাক হচ্ছ কন্যে। পরিযায়ী পাখিদের সর্বশ্রেষ্ঠ দৌড়বাজদের কথা তো এখনও শোননি, সেটি সত্যিই এক বিস্ময়!

আমরা ঘনিয়ে বসলাম, বল, বল কাকু।

তার আগে এক সোয়ালো পাখির টুকরো কাহিনী শোন।

অভীকাকু শুরু করল,

পক্ষীতত্ত্ববিদ্ মিঃ কলিন তাঁর স্ত্রী নোরা আর বছর বারো বয়সের একটি ছেলে ক্যারলকে নিয়ে আফ্রিকা ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখানে সমুদ্রতীরবর্তী এক অরণ্যের ধার দিয়ে যাবার সময় তাঁরা একটি সোয়ালোকে ঘাসের জমিনে পড়ে থাকতে দেখেন। পাখিটা পায়ে চোট পেয়েছিল।

ক্যারল হুমড়ি খেয়ে বুকে তুলে নিল পাখিটাকে। সঙ্গে করে নিয়ে গেল হোটেলের স্যুইটে। পরিচর্যা চলল সেখানে। পরের দিন পাখিটাকে খানিক চনমনে দেখাল। সবে ওড়াউড়ি শেখার স্টেজ পেরিয়ে তারুণ্যের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে পাখিটা। ইস্পাত-নীল পাখার ওপরে ফুটে উঠছে চকচকে চমক। পেটে হালকা গোলাপী আভা। চেরা লেজটা উল্টো 'ভি'-এর আকারে ফাঁক হয়ে আছে। পায়ের চোটটা আর দু'চার দিনের সেবায় সম্পূর্ণ সেরে যাবে বলে মনে

হলো। কিন্তু মস্ত এক সমস্যা দেখা দিল পাখিটাকে নিয়ে। জাহাজে মিঃ কলিনকে লস্ অ্যাঞ্জেলেস ফিরতে হবে ঠিক দু'দিন পরে। টিকিট কাটা রয়েছে আগেভাগে। এই দু'দিনের ভেতরেই পাখিটা সেরে উঠবে, এমন নিশ্চয়তা নেই।

মিঃ কলিন বললেন, মায়া বাড়িয়ে আর কি হবে, যেখান থেকে এনেছি সেখানেই ছেড়ে দিয়ে আসি।

নোরা বললেন, এখনও সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে। কিছুটা উড়ে গিয়ে টাল সামলে ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না। ঐ বনের ধারে ওকে ফেলে এলে বনবেড়াল অথবা শেয়ালে ওর দফা রফা করে দেবে।

ক্যারল পাখিটাকে হাতে তুলে নিয়ে হাউমাউ করে উঠল।

শেষে বলল, পাখি আমাদের সঙ্গে যাবে, আজই একটা খাঁচা আনব ওর জন্যে।

নোরা বললেন, অবশ্য ওকে খাঁচায় ভরে তদারক করতে করতে নিয়ে যাওয়া একটা ঝামেলার ব্যাপার, তার চেয়ে হোটেলের বয়কে কয়েকটা টাকা সমেত পাখিটা দিলে ও ওকে বাড়ি নিয়ে যাবে। আমরাও ঝামেলার হাত থেকে মুক্তি পাব।

এ প্রস্তাবও ক্যারলের মনঃপূত হলো না। সে বয়সে ছোট হলে কি হবে, যেমন হৃদয়বান তেমনি বুদ্ধিমান।

সে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি আমার একটা কথার ঠিক ঠিক জবাব যদি দাও তাহলে পাখিটাকে আমি হোটেল-বয়ের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারি।

বল, কি বলতে চাও।

আমি যদি পায়ে চোট পেতাম তাহলে তুমি কি আমাকে অন্য কারু হাতে তুলে দিয়ে চলে যেতে পারতে?

নোরা আর একটিও কথা না বলে উঠে চলে গেলেন।

নির্দিষ্ট দিনে পাখিটাকে খাঁচায় ভরে নিয়ে জাহাজে তোলা হলো। শ্রীমতী সোয়ালো সুন্দরী এক মহাদেশ থেকে চলল আর এক মহাদেশে।

ভালবাসা এক আশ্চর্য বস্তু। একটি কিশোরের ভালবাসায় বাঁধা পড়ে গেল একটি পরিযায়ী পাখি।

মিঃ কলিন সম্পন্ন মানুষ। সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলে তাঁর মাঝারি ধরনের একটি বাগান রয়েছে। সোয়ালো পাখিরা সারি দিয়ে লম্বা তারের ওপর বসতে ভালবাসে, তাই গাছ থেকে গাছে একটি তার টাঙানো হয়েছে। সকালে বাগানে রোদ এসে পড়লেই ক্যারল পাখিটাকে খাঁচা থেকে বের করে উড়িয়ে দেয়। সে আকাশে খানিকটা চক্কর দিয়ে টাঙানো তারের ওপর এসে বসে। তারপর ওখানে বসেই খপখপ উড়ন্ত পতঙ্গ ধরে ধরে প্রাতরাশ সারে। পাখিটার মর্জি বুঝে ক্যারল তাকে নানারকম খাবার খাওয়ায়। সোয়ালো একমাত্র ক্যারলকেই তার ইস্পাত চকচকে গায়ে হাত বুলোতে দেয়।

এরপর পাখিটাকে একা বাগানে রেখে পড়তে চলে যায় ক্যারল। পাখিটা আকাশে উড়ে উড়ে কিন্তু ক্যারলের চলাফেরা লক্ষ্য করে। সে একদিন স্কুল বাসের সঙ্গে উড়ে গিয়ে ক্যারলের পাঠভবনটি দেখে এসেছে। ক্যারলও দেখেছে তাকে স্কুলের জানালা দিয়ে। সে টেলিগ্রাফের তারের ওপর বসে পতঙ্গ ধরে খাচ্ছে। এক একবার তাকাচ্ছে ক্যারলের দিকে। কখন তার প্রিয় বন্ধুটি স্কুল থেকে বেরোয় সেই প্রতীক্ষায় বসে আছে।

কখন কি অ্যাকসিডেন্ট ঘটে এই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে ক্যারল। সে মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে হাত নেড়ে পাখিটাকে তার বাগানের দিকে উড়ে যেতে ইঙ্গিত করে, কিন্তু কে শোনে কার কথা।

রাতে ক্যারলের বেডরুমেই খাঁচায় ঝুলে থাকে পাখিটা। যতক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ সে পাখিটার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে শুয়েই বকবক করে যায়। বুঝুক আর না বুঝুক পাখিটা খাঁচার ভেতর নড়েচড়ে জানিয়ে দেয়, সে জেগে আছে এবং ক্যারলের কথা শুনছে।

পাখি নিয়ে ক্যারল মত্ত থাকলেও মিঃ কলিন কিন্তু পক্ষীতত্ত্ববিদ হিসেবে অন্য কথা ভাবছিলেন। তিনি যথাস্থানে পাখিটিকে মুক্তি দিতে চান। সে সঙ্গীছাড়া হয়ে রয়েছে এতগুলো দিন। পরিযায়ী পাখি, সামান্য গণ্ডির ভেতরে সে কতদিনই বা এমনভাবে নিঃসঙ্গ থাকতে পারবে। এদিকে ক্যারল পাখিটাকে নিয়েই মত্ত, সে ভুলে গেছে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো। লেখাপড়াতেও তেমন মন নেই।

মিঃ কলিন স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে পাখিটিকে আফ্রিকার ঐ বিশেষ স্থানটিতে ছেড়ে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। একজন মালবাহী জাহাজের পরিচিত নাবিক এ ভারটা সানন্দে গ্রহণ করল।

কিন্তু ক্যারল পরিকল্পনাটা জানতে পারলে বিপর্যয় ঘটে যাবে, তাই তার কাছ থেকে সমস্ত ব্যবস্থাটাই গোপন রাখা হলো।

আফ্রিকায় শীতঋতু শুরু হয়েছে। এবার উত্তর ইউরোপের হিমশীতল অঞ্চল থেকে সোয়ালোরা ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসবে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে। পাখিটিকে যথাস্থানে রেখে আসার এই উপযুক্ত সময়। দলের পাখিদের সঙ্গে সে এখন দিব্যি উড়ে যেতে পারবে।

পরিকল্পনা মতো কাজ হলো। পাখি খাঁচার বাঁধন খুলে উড়ে গেল আমেরিকা থেকে আফ্রিকায়।

তিন-চার দিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো পাখি খুঁজে বেড়াল ক্যারল। যেদিন পাখি খোয়া যায় সেদিন সে রোজকার মতো স্কুলে গিয়েছিল, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েও ছিল কিন্তু পাখিকে দেখতে পায়নি। ইদানিং পাখি রোজ ক্যারলের স্কুলে উড়ে যেত। ঐ জানালার ধারের গাছটিতে সে বসে থাকত। যতক্ষণ না ছুটি হয় ততক্ষণ এডাল-ওডাল লাফিয়ে বেড়াতো। উড়ন্ত পোকা ধরে ধরে মহানন্দে খেত।

পাখিটা যে কোনো কারণেই হোক ভোরবেলা খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে বাগানে ওড়াউড়ি করতে করতে হয়তো ঘাসের জমিনে নেমেছিল, আর ঠিক তখনই ঝোপের আড়াল থেকে কোনো বেড়াল ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে ধরে নিয়ে চলে গেছে।

এই যুক্তিটাই শেষ পর্যন্ত সত্য বলে মেনে নিতে হলো ক্যারলকে। বেশ কিছু দিন মনমরা হয়ে থাকার পর আবার বিষণ্ন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলো।

তবে অভ্যেস বশে ভোরবেলা ক্যারল একবার করে বাগানে যেত আর চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখত তার হারানো মানিককে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

মিঃ কলিন পাখিটার একটি পায়ে অ্যালুমিনিয়ামের রিং পরিয়ে দিয়েছিলেন। হারিয়ে গেলে যাতে তাকে সহজে খোঁজ করে আনা যায়, সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু যেভাবে ওকে প্ল্যানমাফিক সরিয়ে দেওয়া হলো তাতে খোঁজাখুঁজির আর প্রশ্নই ওঠে না।

পাখিটির স্মৃতি ক্যারলের মন থেকেও কিছু পরিমাণে মুছে গেল।

প্রায় এক বছর পরে একটি ঘটনা ঘটল।

আফ্রিকা থেকে আমেরিকা যাবার পথে একটি যাত্রীবাহী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখা গেল, আকাশপথে এক ঝাঁক সোয়ালো মধ্য আটলান্টিক পর্যন্ত কয়েক হাজার মাইল উড়ে এসেছে। তারা এখন বাঁক নিয়েছে আমেরিকার দিকে।

প্রতিদিন যাত্রীরা ডেকে দাঁড়িয়ে দেখত, বিরাট ঝাঁকের থেকে কিছু কিছু পাখি আর পাখা টানতে না পেরে উত্তাল আটলান্টিকের বুকে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে।

এমনিভাবে দিনে দিনে পাখির সংখ্যা কমে আসতে আসতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন বললেন, তাঁর এত বছরের নাবিক জীবনে তিনি কখনও সোয়ালোদের এই পথে যেতে দেখেননি। এটি তাঁর কাছে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। উত্তর ইউরোপ থেকে ওরা আফ্রিকায় উড়ে আসে নির্দিষ্ট পথে, আবার গরম পড়লে সেই পুরাতন পথরেখা ধরেই তারা উড়ে চলে যায়। এ যে একেবারে ছন্দপতন। এ কোন খেয়ালীর খেলা কে জানে। এমন অঘটন ঘটে না সচরাচর।

কি বিস্ময়! কি বিস্ময়! এক ভোরে চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল মিঃ কলিন আর মিসেস নোরার। ক্যারল বাড়ির ভেতর আর্লি রাইজার। সে উঠেই ছুটোছুটি করে বাগানের ভেতর। এ যে তারই গলার আওয়াজ।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছুটে গেলেন বাগানে। ততক্ষণে পায়ে অ্যালুমিনিয়ামের রিং পরানো সেই সোয়ালো পাখিটা ঝাঁপিয়ে এসে ধরা দিয়েছে ক্যারলের হাতে। ক্যারল তো আনন্দে আবেগে শুধু চিৎকার করে চলেছে।

হারানিধি পাওয়ার আনন্দে যেন বাড়িতে ধুম পড়ে গেল।

সন্ধ্যায় অফিস থেকে ঘরে ফিরে মিঃ কলিন জানালেন, সেই দিগভ্রষ্ট হতভাগ্য সোয়ালোদের কথা। কোনো একটি বিশেষ সংবাদপত্রে নাকি এ খবর বেরিয়েছিল। তিনি ঐ সংবাদপত্রটি রাখেন না বলে খবরটি জানতে পারেননি।

সান্ধ্য চায়ের আসরে আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত হলো, তাদের এই মলপরা সোয়ালো সুন্দরী নিশ্চয়ই ঐ পরিযায়ী পাখির দলটিতে ছিল, যারা অসাধ্য সাধন করতে গিয়ে সমুদ্রে আত্মবিসর্জন দিয়েছে। তবে একমাত্র এই পাখিটির সিদ্ধি লাভের কারণ, তার ভালবাসা, ক্যারলের ওপর তার ঐকান্তিক টান। এই জন্যেই সে মৃত্যু-গহ্বরের ওপর দিয়ে তার অক্লান্ত দুটি পাখা টেনে জীবনের কূলে উড়ে আসতে পেরেছে।

কিন্তু যুগ যুগ ধরে যে চিহ্নিত পথে বার্ন সোয়ালোরা যাতায়াত করে, যার ছন্দপতন কখনো হয়নি, তাদের জীবনে এই কল্পনাতীত ব্যতিক্রমটি ঘটল কি করে? একি এই সোয়ালো সুন্দরীর প্রেরণায় আর পরিচালনায়?

এ প্রশ্নের সমাধান কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

॥ তিন ॥

ব্রেকফাস্ট সারা হলো মাইসোরে। বাঙালী যেখানেই থাক, একটা দুর্গোৎসবে মায়ের প্রতিমাকে কেন্দ্র করে সবাই সমবেত হবে। সপ্তমী পুজোর বাজনা বাজছে। নবমীর প্রসাদ পাবার জন্য বাবা এবং আমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন উদ্যোক্তারা।

বাবা বলল, মায়ের কৃপা হলে আমরা অবশ্যই আসব।

কৃপাময়ী কিন্তু হাসলেন মনে মনে।

আমরা ড্রাইভার সহ পাঁচজন একটা অ্যামবাসেডারে চলেছি বান্দীপুর টাইগার রিজার্ভে। আমি, বাসব আর অভীকাকু বসেছি পেছনে, বাবা সামনে ড্রাইভারের পাশে।

পিছলে পেছু হটছে গাছপালা, ঘরবাড়ি, মাঠঘাট। শহর ছাড়ালেই পল্লী। মাঠভরা ফসল আর ঝকঝকে সবুজ প্রকৃতির মাঝখানে পল্লীবাসীদের শান্তির কুটীরগুলি। বাচ্চাগুলো উঠোনে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ শুরু করল কুস্তি লড়তে। নিষ্পত্তি হবার আগেই গাড়িটা এগিয়ে গেল ওদের ফেলে।

মাথা পেছন দিকে ঘুরিয়ে গ্লাসের ভেতর দিয়ে শেষ দৃশ্যটা দেখতে লাগল বাসব। গাড়ি হঠাৎ বাঁক নিতেই উল্টে পড়ল সে অভীকাকুর ওপর। টাল রাখতে ওর বাঁ হাতখানা খামচে ধরল আমার মোটা বিনুনিটা। ভীষণ লাগল, তবু ওকে টাল সামলাতে দিলাম দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার না করে।

ও কাঁচুমাচু মুখ করে বসে পড়ে বলল, সরি, ভেরি সরি।

অভীকাকু হেসে উঠে ওর মাথা চাপড়ে দিল।

আমি বললাম, দেখ তো তোমার বাঁ হাতে কটা চুল উপড়েছে?

ও হাত নেড়েচেড়ে বলল, কই দেখছি না তো।

এখন বল, কুস্তির রেজাল্টটা কি?

ও বলল, হলুদ জামা পরেছিল যে ছেলেটা সে লাল ফতুয়া পরা ছেলেটার ওপর চেপে বসেছে।

আমি বললাম, যুদ্ধ শেষ।

অভীকাকু বলল, তা কেন, যুদ্ধটা অন্যদিকে টার্ন নিতে পারে।

কি রকম? কুস্তিতে একজন হারলে তো জয়-পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেল।

বাচ্চাদের ভেতর ওসব আইন-কানুনের বালাই নেই। ওরা দু'দলে ভাগ হয়ে গিয়ে লড়াই লাগিয়ে দিতে পারে। ওদের এই দলাদলি তো এই গলাগলি।

জোর হর্ন বাজিয়ে ব্রেক কষল গাড়ি। সামনে তাকিয়ে দেখি, 'টাগ অব ওয়ার' চলছে। গড়িটাকে দ্রুত আসতে দেখে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি গরুর গলার দড়ি ধরে টান মারছে। গরুটা কিন্তু গোঁয়ারের মতো শিং বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে পথের ওপারে। গাড়ি হর্ন দেওয়া মাত্রই সে ভয় পেয়ে হিড়হিড় করে টানতে শুরু করেছে মেয়েটিকে।

গাড়ি থেমে গেল। 'টাগ অব ওয়ারে' জিতে গেল গরুটি।

বাসবের মগজ থেকে এখনও পাখি উড়ে বেরিয়ে যায়নি। পথের ওপর বসে থাকা এক ঝাঁক চড়াই গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ছুঁড়ে দেওয়া মটর দানার মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল ফসল ক্ষেতের দিকে। অমনি প্রশ্ন জেগে উঠল বাসবের মগজে, কাকু, সোয়ালো পাখিরাই কি সব থেকে দূর পথ যাতায়াত করে?

কাকু মাথা নেড়ে জানাল, বাসবের ধারণা একেবারেই ঠিক নয়।

আমি সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, তবে?

আর্কটিক টার্ন। এ এক অসাধারণ দূরগামী পাখি। এরা থাকে উত্তর মেরুবলয় অঞ্চলে, প্রতি বছর প্রায় পনেরো হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে চলে যায়। আবার ফিরে আসে ঐ পনেরো হাজার কিলোমিটার পথ পার হয়ে নিজের জন্মভূমির টানে। বছরে তিরিশ হাজার কিলোমিটার পথ পার হওয়া কি সোজা কথা!

বললাম, কাকু, এ যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

অভীকাকু বলল, গল্পের মতো মনে হলেও এ একেবারে নির্ভেজাল সত্য। ওরা বাঁচেও বেশ কয়েক বছর। তাহলে একবার অঙ্ক কষে দেখ, জীবদ্দশায় ওরা কত লক্ষ কিলোমিটার পথ যাতায়াত করে।

বাবা মন্তব্য করল, মনুষ্যেতর প্রাণীসমাজের ক্রিয়াকলাপ আমাদের কাছে চিরদিনই এক বিরাট বিস্ময় আর বিপুল রহস্যে ভরা।

আমরা খুশি হলাম এই ভেবে যে বাবাও আমাদের আলোচনার এক নিবিষ্ট শ্রোতা। অবশ্য আমরা যখন আমাদের ক্লাবঘরে বসে আলোচনায় মাতি, অথবা অভীকাকুকে ঘিরে বসে ওর অভিজ্ঞতার বিচিত্র সব কথা শুনি তখন বাবাকে অনেক সময় পাশের হলঘরে পায়চারি করতে দেখেছি।

অবশেষে একসময় বান্দীপুরে এসে গেল গাড়ি। দুখানা বড় ঘর বুক করা ছিল, আমরা ঢুকে পড়লাম।

বাবা বলল, তোরা সব ঘুরে ঘুরে দেখ, আমি লাঞ্চের পর একবার মধুমালাইতে চিফ্ কনজারভেটার মিঃ নাইডুর সঙ্গে দেখা করতে যাব। আজ আর ফিরব না, কাল সেই দুপুরের পর। বলে, 'টাইগার রিজার্ভ', কিন্তু সেই ব্যাঘ্রমশায়ের টিকির দেখা পাওয়া শক্ত। তবে একটু ঘোরাঘুরি করলেই হাতি, ময়ূর, বাইসন, বাঁদর, এসব দেখতে পাবে। বান্দীপুর থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। কপাল ভাল থাকলে রবিনহুডের আখড়াটাও নজরে পড়ে যেতে পারে। এই রে ভুলে যাচ্ছিলাম। আমার সুটকেসের ভেতর বায়নাকুলারটা আছে। ওটা সেই যে জার্মানি থেকে ফেরার সময় এনেছিলাম। শুধু দামী নয়, বহু দূর অবধি নিখুঁত দেখা যায়।

তুমি তো ওটা কোনোদিন ব্যবহার করতেই দাওনি।

বাবা হেসে বলল, আজ তোকে একেবারে দিয়ে দিলাম।

আমি উৎসাহে আবেগে গদগদ হয়ে বললাম, সত্যি বাবা তুমি কি ভাল।

দুপুরের পর বাবা বেরিয়ে গেল। একই মাটি, একই অরণ্য তবু দু'ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে কর্ণাটক গভর্নমেন্টের এলাকা বান্দীপুর টাইগার রিজার্ভ, অন্যদিকে তামিলনাড়ু গভর্নমেন্টের মধুমালাই ফরেস্ট।

আমরা সারা বিকেল একটা জিপে করে কাছেপিঠে ঘুরতে লাগলাম। বনমোরগ আর ময়ূরের বেশ কয়েকটা ছবি তোলা হলো। দূরে বনের মাথায় জেগে আছে অস্পষ্ট নীলাভ পাহাড়। নির্মেঘ আকাশে থমকে আছে জলহীন একটুকরো ধবধবে সাদা মেঘ। শরতের চিরদিনের মন ভরানো ছবি।

বাসব বলল, ঐ দেখ, একটা গাছের ডালে আমাদের পূর্বপুরুষরা শেষ বেলার রোদে গা সেঁকছে।

আমি দেখলাম, বিরাট এক দঙ্গল গাছের ডালে ডালে বসে আছে। এখন মনে হয় ভরা পেট, তাই দাপাদাপি নেই। মায়েরা যে যার বাচ্চাকে কোলের কাছে আগলে ধরে উকুন বাছছে। গাছটা মস্ত বড় আর ডালগুলো বেশ মোটা, তাই বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মায়েদের বসতে কোনো অসুবিধে নেই। বাচ্চাগুলো একটু নড়ে উঠলেই চাঁটি খাচ্ছে মায়ের। কি মানুষ কি বাঁদর সবার ঘরে একই ছবি।

জিপ থামিয়ে অভীকাকু কয়েকটা ছবি নিল। হঠাৎ একটা পালের গোদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠে দাঁড়াল। তাকেও মর্যাদা দিয়ে ক্যামেরাবন্দী করল অভীকাকু।

এবার জিপ ঘুরতে লাগল এদিক-ওদিক। ফেরার সময় আবার দেখলাম, বানরের সেই বৃহৎ পরিবারটিকে। ছবি এখন বদলে গেছে। বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়েছে মায়েরা। ওরা শেষ বেলার আলোয় ছাড়া পেয়ে মেতেছে নতুন খেলায়। এ ওকে ধরার জন্য লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটছে সরু-মোটা ডালের ওপর দিয়ে।

ওদিকে আর একটা ছবি। শুরু হয়েছে সার্কাসের খেলা। গাছের ডালে পাকে পাকে লেজ জড়িয়ে শূন্যে ঝুলে আছে মা বানরটা। খানিক দূরের আর একটা ডাল থেকে পুঁচকে একটা বাঁদর-ছানা সাগর ডিঙোবার মতো লাফ মারল। অমনি মা বাঁদরটা যেন শূন্য থেকে তাকে লুফে নিল।

ক্লিক্ ক্লিক্—অনেকগুলো ছবি উঠল এই পর্বে।

আমরা জিপ ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পয়ে হেঁটে বেড়ালাম। সন্ধ্যা নামছে। ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ে আসছে সারাদিনের কাজ শেষ করে। কে কি করেছে তার হিসেব দাখিল হচ্ছে উচ্চরবে।

দূর পাহাড়ের অস্পষ্ট যে ছবি গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল তা এখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

ছোট ছেলের গায়ের গন্ধের মতো বনের একটা আলাদা গন্ধ আছে। হাজার রকমের গাছগাছালি, লতাপাতা, মাটি, জল, রোদ্দুরের মিশ্রিত এক বিশেষ গন্ধ। সূর্যের কিরণে, জ্যোৎস্নার প্লাবনে বাতাস সে গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। অরণ্যের আলপনা

আঁকা আলো-আঁধরি পথে যেতে যেতে পথিক সে গন্ধ পায়।

বাসব অনুচ্চে বলল, বেশ ভাবুক ভাবুক লাগছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, আমাকে?

না, ঐ গাছের ওপর যারা বসে আছে তাদের।

আমি আনুনাসিক সুরে প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, আমি ঐ গাছের ডালে বসা বাঁদরী?

অভীকাকু কিছুটা আগে আগে চলছিলেন, তিনি 'বাঁদরী' শব্দটুকু শুনতে পেয়েই বলে উঠলেন, কোথায় বাঁদরী?

বাসব বলল, কাকু, বাঁদরীটা তোমার ক্যামেরার ভেতরেই বন্দী হয়ে আছে।

এ কথার একটা অর্থ আছে। কিছুক্ষণ আগে একটা গাছের ডালে কেবল একটা বানরী বসেছিল গালে হাত ঠেকিয়ে। তাকে বেশ চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছিল।

কাকু তার ছবি নেবার পর গাছের তলায় আমাকে গালে হাত দিয়ে দাঁড়াতে বলে একটা ছবি তুলল। তাই মজা করে বাঁদর বাসবটা বলল, বাঁদরী ক্যামেরার ভেতর বন্দী হয়ে আছে।

সে রাতে আমি গান গাইলাম, অনেকগুলো রবীন্দ্রসংগীত আর একটা অতুলপ্রসাদ। আমার সঙ্গে এবং একা একা মোট চারখানা গান গাইল বাসব। হারমোনিয়ম ছাড়া ওর গান একটুখানি সুরের বাইরে চলে যাচ্ছিল, আমি মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে গলা মেলালাম।

ঘরের ভেতর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে গান শুনছে কাকু, ভাল লাগলে তারিফ করছে।

গান থামিয়ে একসময় কাকুকে কিছু বলতে বললাম।

দারুণ স্পিডে হাত নেড়ে কাকু জানাল, গানের পর কথা জমে না, গানই শেষ কথা।

আরও দুখানা গানের পর সান্ধ্য-আসর শেষ হলো।

কাকু বলল, তোরা দুজনে আজ সংগীত-সন্ধ্যাটা মাতিয়ে দিলি। কেবল গুচ্চের জ্ঞানের কথা কি ভাল লাগে!

আমি কাকুর শেষ কথাটায় দুঃখ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, কাকু, ও কথা বল না, আমরা শুধু শিখিনি, দারুণ এনজয় করেছি।

পরদিন হেভি ব্রেকফাস্ট সেরে, আমরা অল্প কয়েকজন ট্যুরিস্টের সঙ্গে কন্ডাক্‌টেড ট্যুরে বন-ভ্রমণে বেরিয়ে গেলাম।

বনের ভেতর কিছু পথ এগিয়েই হস্তী-দর্শন হলো। কয়েকটা হাতি গজেন্দ্র-গমনে চলেছে। মায়ের লেজটাকে কচি শুঁড়ে পাকিয়ে ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলেছে গুট্‌লে একটা হাতি। তাদের পাশ দিয়ে গাড়ি বেরিয়ে গেল, কোনো ভ্রূক্ষেপই করল না গজরাজ-বাহিনী।

একদল হরিণ রাস্তার এপারের বন থেকে ওপারের বনে হাই জাম্প দিতে দিতে উড়ে চলে গেল।

আমরা একটা জায়গায় এসে গাড়িটাকে থামালাম। সামনে গাছের ডালে কয়েকটা ময়ূর লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে। মনে হলো তারা দর্শক। বাঁদিকের জমিনে ঘাসের সবুজ গালচের ওপর আসল রঙ্গমঞ্চ। সেখানে সম্পূর্ণ পেখম মেলে দিয়ে নাচছে একটি ময়ূর। মাঝে মাঝে মেলে দেওয়া পাখাটাকে গুটিয়ে নিচ্ছে, আবার ঝুঁটিসহ সারা দেহটাকে কাঁপাতে কাঁপাতে পেখম মেলে ধরছে। সেই পেখম মেলা অবস্থায় ডাইনে-বাঁয়ে ঈষৎ কাৎ হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছে।

পটভূমি, ঘন সবুজ অরণ্য। তার ফাঁক দিয়ে অপূর্ব এক চিলতে আলো এসে পড়েছে নর্তকের ওপর। কেউ যেন আড়ালে থেকে দৃশ্যের ওপর আলো ফেলছে। ময়ূরের বিচিত্র রঙ ঝলসে উঠছে সেই আলোয়। যেন সাতরঙা ইন্দ্রধনুর চোখ জুড়োনো বাহার।

নর্তকের সামনে সবচেয়ে আকর্ষণীয় আর একটা ছবি। নৃত্যশিল্পী যখন পেখম মেলে নাচছে তখন তার সামনে দিয়ে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে আসা-যাওয়া করছে ময়ূরী। তার ছোট লেজটি মাটি ছুঁয়ে আছে। কিন্তু তাকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে অবাক করা একটি দৃশ্য! ময়ূরীর পিঠে চুপটি করে সারি দিয়ে বসে আছে অতি ক্ষুদে তিনটে বাচ্চা। তারা মায়ের পিঠে চেপে বাবার কেরামতি দেখছে।

আর দেরি নয়, গাড়ি স্টার্ট দিতেই কিন্তু খেলা ভেঙে গেল। যে যার পেখম গুটিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে সরে পড়ল বনের গাছগাছালির ভেতর।

কাকু মন্তব্য করল, সাধে কি আর জাতীয় পাখি!

একজোড়া বাইসনকে দেখা যাচ্ছে বনের মধ্যে। ইয়া শিং। ওদের দল কাছে-পিঠে কোথায় চরছে কে জানে। ওরা ঘাস খেতে খেতে গাড়ির শব্দ শুনে তাকাল। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে শান্তি বিঘ্নকারীর দিকে। হয়তো গাড়ির আকারটা ওদের চেয়ে বড় বলে গোঁয়ার দুটো জীব আমাদের দিকে তেড়ে আসছে না।

আরও খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভার ঘোষণা করল, গাড়ি সামনে বাঁক নিয়ে ফেরার পথ ধরবে। এখানে দশ-পনেরো মিনিটের বেশি থাকা চলবে না। ঐ সামনের বনটাই রবিনহুডের আখড়া। খবর আছে, ওরা এখন কাছে-পিঠে রয়েছে।

বাসব বলল, ওরা কখন কোথায় থাকে তা আপনি জানলেন কি করে?

সোর্স আছে, পুলিশি সোর্স।

পুলিশ যদি জানে চন্দন-দস্যু কোথায় আছে, তাহলে পাকড়াও করে না কেন?

হয়তো করতে চায় না বলে।

আর কিছু বলল না। কথাটা রহস্যাবৃত থেকে গেল।

কয়েকজন গাড়ি থেকে নেমে কাছে-পিঠে পায়চারি করতে লাগল। তারা ড্রাইভারের কথা শুনে মনে হলো, ভয় পেয়েছে। তবু কৌতূহলের তাড়ায় তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক।

কাকু আমার ব্যাগ থেকে বায়না-কুলারটা বের করে নিয়ে গাড়ির ছাদে উঠে দূরের দৃশ্য দেখতে লাগল।

হঠাৎ একসময় হুড়মুড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বলল, অদ্ভুত দৃশ্য! তাড়াতাড়ি আমার ঝোলার ভেতর থেকে ক্যামেরাটা বের করে আন।

আমি গাড়ির ভেতর ঢুকতে ঢুকতেই বললাম, কি এমন দেখলে কাকু?

আরে, একদল হিংস্র কুকুর প্রায় দেড়শ' কিলো একটা শম্বরকে তাড়া

করেছে। শম্বরটা দেখলাম, এই মুহূর্তে পাশের একটা জলায় বুকজল অবধি নেমে গেল।

কুকুরগুলো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না?

ওরা জলকে ভয় পায়, তাই জলার ধারে ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে পড়েছে। যখন শম্বরটা জল থেকে উঠবে তখন ওকে জ্যান্ত অবস্থায় মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। ওরা বাঘ-সিংহের মতো শিকারের গলার নলিটা আগে কেটে দেয় না। ওরা ওদের ছুটন্ত শিকারের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাংস খুবলে খুবলে তুলে নেয়। কই রে ক্যামেরা কই? বার বার এ দৃশ্য মিলবে না।

আমি কাকুর হাতে ক্যামেরাটা দিতেই কাকু দৌড় লাগাল। বাসব অমনি 'আমি যাব, আমি যাব' বলে দৌড়ে কাকুর পেছু নিল।

অভীকাকু নিশ্চয় একটু দূর থেকে টেলিফটোতে শেষ দৃশ্যটা তুলবে।

ড্রাইভার ঘোষণা করল, মিনিট দশেকের বেশি দাঁড়াতে পারব না, তার ভেতর সবাই গাড়িতে এসে উঠবেন।

কে শোনে কার কথা, ততক্ষণে খুড়ো ভাইপো সামনের বন চিরে উধাও।

আমি বোকার মতো হাতে বায়না-কুলারটা ঝুলিয়ে নিয়ে সামনের বনের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। একবার ফিরে দেখলাম, বাকি পর্যটকেরা ডান দিকের বনে ঢুকল। সেদিকটা অপেক্ষাকৃত পাতলা। ওদের ভেতর একজোড়া বিদেশী মেয়েপুরুষ ছিল। বিদেশিনীটি ফিরে ফিরে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। সম্ভবত ওর ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে এদিকে আসে।

আমি দু'চার পা বনের ভেতর ঢুকে ওদের দেখতে পেলাম না। একবার বাসব, একবার অভীকাকুর নাম ধরে ডাক দিলাম। কোনো সাড়া নেই।

ঘন বনের বাঁ দিকে হঠাৎ একটা পাতলা ফাঁক আবিষ্কার করলাম। মানুষ ঐটুকু ফাঁকের ভেতর দিয়ে ওপারে যেতে পারবে না ঠিক তবে বাইরের অনেকখানি অংশই চোখ পাতলে দেখতে পাবে।

আমি বায়নাকুলার চোখে তুলে নিয়ে ঐ ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলাম।

জীবন্ত একটা ছবি মুহূর্তে ফুটে উঠল আমার বায়নাকুলারের পাওয়ারফুল লেন্সে।

শম্বরটা ইতিমধ্যে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে পড়েছে। সে সামনের দিকে শুরু করেছে চলতে। এদিক-ওদিক সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে সোজা বিপুল দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছে। ঘরে ফিরতে হবে, তার ফেরার পথের দিকে হয়তো চেয়ে বসে আছে বাচ্চাগুলো।

ঐ তো, আত্মগোপনকারী নৃশংস খুনীগুলো বেরিয়ে আসছে ঝোপঝাড় থেকে। তীব্র বেগে ছুটে চলেছে শম্বরটার দিকে। পেছনে ধাওয়া করেছে শত্রু, গন্ধ পেয়ে গেছে শম্বরটা। সমস্ত শক্তি জড়ো করেও সে যেন ছুটতে পারছে না ইচ্ছে মতো। মৃত্যুভয় তার স্বাভাবিক গতিকে হরণ করে নিচ্ছে।

এবার ঘিরে ধরেছে কুকুরগুলো, কামড়ে ধরেছে তার মাংসল দাবনায়। সে প্রাণপণে ওদের পা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে, কিন্তু কায়দামতো শত্রুকে আঘাত করতে পারছে না।

হঠাৎ কেউ ফায়ার করল। একটা নয়, পর পর কয়েকটা। শম্বরকে কামড়ে ধরেছিল যে কটা কুকুর, তারা পর পর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বাকিগুলো দৌড়ে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে উধাও হয়ে গেল।

দলের সঙ্গে তিনটে বাচ্চা কুকুরকে দেখলাম। ওরা মনে হয় শিক্ষানবীশ।

শম্বরটা দাঁড়িয়ে গেছে। যেদিক থেকে গুলি ছুটে আসছিল সেদিকেই সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সম্ভবত কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছিল তার চাহনিতে। এই হিংস্র খুনীগুলোর হাত থেকে যে তার প্রাণ বাঁচালো, তাকে চোখের দেখা না দেখে সে নড়বে না।

কট করে একটা শব্দ হলো, কেউ ফায়ার করল। এতখানি শরীরটাকে নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল শম্বরটা। তারপর মাটিতে পড়ে সামান্য সময় ধড়ফড় করে স্থির হয়ে গেল। সে হয়তো মৃত্যু-যন্ত্রণার ভেতরেও ভাবছিল, তার আক্রমণকারী খুনীগুলোর চেয়েও নৃশংসতম খুনী এই জীব-জগতে রয়েছে।

পেছনে হর্ন বাজল কিছুক্ষণ ধরে। আমি ছুটে চললাম গাড়ির দিকে। মুখে বলতে লাগলাম, এখুনি গাড়ি ছেড়ে দিও না, ওরা ফেরেনি।

কে শোনে কার কথা। ড্রাইভার হাতছানি দিয়ে দ্রুত আমাকে গাড়ির ভেতর ঢুকে পড়তে ইঙ্গিত করল। মুখে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, বীরাপ্পন্, বীরাপ্পন্।

আমি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বনের দিকে ছুটলাম। গাড়ি গর্জন তুলে ছুটে চলল নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে।

আমি বনের ঐ বিশেষ ফাঁকটিতে গিয়ে চোখের সামনে বায়নাকুলার তুলে ধরলাম।

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না! বন্দুকধারী কয়েকটি মানুষ ঘিরে দাঁড়িয়েছে মৃত শম্বরটাকে। শুধু শম্বর নয়, ঐ বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অভীকাকু আর বাসব।

ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে বিরাট গোঁফ-ওয়ালা বীরাপ্পন্।

চন্দন-দস্যু কি যেন প্রশ্ন করে চলেছে, আর অভীকাকু তার জবাব দিচ্ছে হাত নেড়ে নেড়ে।

ক্যামেরাটি অভীকাকুর কাছে নেই, একজন বন্দুকবাজ ওটাকে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

কিছুক্ষণের ভেতরে শম্বরটাকে দুটো বাঁশের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চারজন চলতে লাগল, তাদের সঙ্গে চলল বাসব, অভীকাকুসহ পুরো দলটি।

ওরা আমার দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে বাঁদিকের গভীর বনটায় ঢুকতে যাচ্ছিল, আমি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকু আমি এখানে।

আমার চেঁচানিতে দাঁড়িয়ে গেল পুরো দলটা।

আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, ওরা বাংলাভাষা একদম বোঝে না, আমরা কিন্তু এ তল্লাটের কথা বুঝি, বলতেও পারি।

ওরা আমার কথার অর্থ না বুঝেই দাঁড়িয়ে গেছে। একটি অল্পবয়স্কা কন্যার

কণ্ঠস্বরে ওরা বিস্মিত। আমার সঠিক অবস্থান ধরতে পারছে না ওরা। শব্দের উৎস অনুসন্ধানে চোখ চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার কাকুর গলা শোনা গেল, তুমি যেখানেই থাক, পালাও তিন্নি, আমরা চন্দন-দস্যুর হাতে পড়ে গেছি।

আমি বললাম, গাড়ি আমাদের ফেলে চলে গেছে, এখন আমার ফেরার উপায় নেই, আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকব।

অভীকাকু বোধহয় ভাবল, আমি একাই বা এই বন্যজন্তুতে ভরা বন পেরিয়ে কিভাবে ডাকবাংলোতে গিয়ে পৌঁছব। তাই কাকু হেঁকে বলল, তুমি যেখানেই থাক ট্যুরিস্ট বাসস্টপের কাছে চলে যাও। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখছি, কি করা যায়।

বললাম, আমি এখুনি যাচ্ছি।

বাসস্টপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। সূর্য সবে মাঝ-গগন পার হয়েছে। এখন ডাকবাংলোতে লাঞ্চের সময়। আমার এইমুহূর্তে ক্ষিদে-তেষ্টা নেই, সমস্ত শরীরটা কাঁপছে উত্তেজনায়।

ঘরে বসে অনেক গল্প শুনেছি বীরাপ্পন্ সম্বন্ধে। খবরের কাগজে ছবি দেখেছি তার, কিন্তু এ যে একেবারে মুখোমুখি মোলাকাৎ। অবশ্য ব্যবধান যতটুকু ছিল, তা নিতান্তই নগণ্য। আমি বায়নাকুলারের ভেতর দিয়ে যেন দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই গোঁফওয়ালা মানুষটিকে দেখছি।

পেছনে পায়ের সাড়া পেয়ে চমকে ফিরে তাকালাম। আরে, কাকুর সঙ্গে এই তো বীরাপ্পন্ আমার দিকে এগিয়ে আসছে! খালি গা, কাঁধে ধরে আছে একটা রাইফেল।

মানুষটির মুখ দেখে আমার একটুও ভয় করল না। আশ্চর্য! এই মানুষই নাকি অঢেল হাতি, শম্বর মেরেছে। মানুষের মুণ্ডু উড়িয়ে দিয়েছে খাঁড়ার ঘায়ে। বুলেট চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে ফুসফুস।

আমি নমস্কার জানালাম মাথা নিচু করে।

মাথা তুলে দেখি, একটু দূরে বীরাপ্পন্ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে লক্ষ্য করছিল। আমার মুখে ভয়ের কোনো চিহ্ন ছিল না, বরং কৌতূহল ছিল চোখের দৃষ্টিতে।

একটি বছর পনেরো বয়সের মেয়ের কাছে সে এতটা নির্ভীক আচরণ আশা করেনি।

বীরাপ্পন্ বলল, এ এলাকাটা আমার রাজ্য, মানুষ আমাকে না জানিয়ে এ তল্লাটে এলে বিপদে পড়ে যায়। যেমন তোমরা পড়ে গেলে।

বললাম, বিপদে পড়েছি কিনা জানি না, তবে তোমাকে দেখে দারুণ লাগছে।

আমি কে, তুমি সঠিক জান?

হাসি মুখে বললাম, তোমাকে কে না জানে, তুমি তো বিশ্বত্রাস বীরাপ্পন্।

আমার কথা শোনামাত্র গগন বিদীর্ণ করে হাসল বীরাপ্পন্। মনে হলো, ঠা ঠা শব্দে আকাশে ফেটে গেল কয়েকটা বুলেট।

আমি বিশ্বত্রাস? দারুণ বলেছ কথাটা। এখন এখানে আর নয়, চল আমার ডেরায়, খানাপিনার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

অনেকটা পথ গভীর বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললাম। আমরা সংখ্যায় মোট পনেরো জন। বন্দুকধারী ছ'জন আগে, ছ'জন পিছে। আমরা তিনটি বন্দী মাঝখানে।

ওদের অনুসরণ করে পথ চলছিলাম আমরা, তাই এমন নিবিড় বনেও গায়ে আঁচড়টি লাগল না।

নানারকম গাছপালা, লতাগুল্মের সঙ্গে অনেক চন্দনগাছও চোখে পড়ল।

আমি কাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাতে অনেকখানি উদ্বেগের ছায়া পড়েছে। পড়াটাই স্বাভাবিক। কাকু একা ধরা পড়লে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, তার মুখে-চোখে এতখানি ছায়া থাকত না। আমাদের দুজনের ভাবনায় এই ঘণ্টাখানিকের ভেতর আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে অভীকাকুর। মনে হচ্ছে, একটি আধমরা প্রাণীকে যেন ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সামনের দিকে।

আমি নিশ্চয় জানি, কাকু একবারও নিজের ছাড়া পাওয়ার কথা ভাবছে না। শুধু আমাদের জন্যেই তার যত অস্থিরতা, যত ভাবনা।

বাসব চলেছে মুখ নিচু করে, তার মনের অবস্থা ঠিক আঁচ করা যাচ্ছে না।

হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজে চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। পরক্ষণেই বন চিরে দেখা গেল আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছি। অবশ্য জায়গাটার চারদিকে সবুজ বন। লতাগুল্মে স্থানটি সত্যই মনোরম, ডাকাতের ডেরা বলে মনে হয় না।

প্রায় তিরিশ, পঁয়ত্রিশ জন লোক নানা কাজে ব্যস্ত রয়েছে বীরাপ্পনের আস্তানায়।

শম্বরবাহকেরা শিকারটাকে ফেলে দিল খোলা জায়গার একধারে। তার একটু দূরেই হাঁড়া চাপানো আছে উনুনের ওপর।

দলের ভেতর দুটি বয়স্কা মহিলাকে দেখা গেল। তারা অতি সরল ও নিরীহ দেহাতী মানুষ। চোখে-মুখে তাদের সেই ছাপ। তারা বসেছিল বড় দুটো সব্জি ঝুড়ির পাশে।

একবার আমাদের দিকে তাকিয়েই সারা আস্তানার লোকে যে যার কাজে মগ্ন হয়ে গেল। একটি মাঝবয়সী মেয়ে আমাদের দিকে পেছন ফিরে কি যেন করে যাচ্ছিল।

এক জায়গায় মনে হলো কতকগুলো লোক চন্দন কাঠকে ছিলে-ছুলে সাইজ করে সাজিয়ে রাখছে। অন্যদিকে মনে হলো কয়েক জোড়া হাতির দাঁত ডাঁই করে সাজানো রয়েছে। তার সামনে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক। কথাবার্তা চলছে তাদের ভেতর কিন্তু এমন চুপি চুপি যে একটু দূরের লোকও জানতে পারছে না।

মনে হলো, একদল ব্যবসায়ী হাতির দাঁতগুলো কিনতে এসে দরদাম করছে।

সব কাজ কেমন নিঃশব্দে চলছে।

কাকুর মুখোমুখি হলো বীরাপ্পন্। বলল, তোমাদের দুজনকে এক জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমাদের সঙ্গী মেয়েটি থাকবে আলাদা।

একটু থেমে আবার বলল, এখানে কারো মর্যাদাহানি হয় না, বিশেষ করে কোনো মহিলার। পুরুষরা পালাবার চেষ্টা করলে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয় এ

দুনিয়ার বাইরে।

চন্দন-দস্যু হাতে তালি বাজাল। একজন রাইফেলধারী সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে বন চিরে ঢুকে এলো ভেতরে। বীরাপ্পনের কাছে এসে স্যালুট ঠুকল মিলিটারি কায়দায়।

কি একটা শব্দ উচ্চারণ করতেই লোকটি তড়িঘড়ি কাকু আর বাসবকে প্রায় গরু তাড়ানোর মতো তাড়িয়ে নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ আমার চোখের সামনে থাকায় আমি উদ্বিগ্ন হইনি, কিন্তু ওরা চোখের আড়ালে চলে যেতেই আমি কেমন উদ্বেগ বোধ করতে লাগলাম।

আমার মুখের ভাব দেখে মনের ছবির আঁচ পেয়ে গেল বীরাপ্পন্।

খুব নরম গলায় বলল, আমি খুনী কিন্তু অকারণে কাউকে খুন করি না। তুমি তোমার সঙ্গীদের বিষয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পার। আর তোমার ব্যবস্থা এখুনি করছি।

আবার সেই হাততালি শোনা গেল। অমনি কাজ ফেলে এগিয়ে এল পেছন ফিরে দাঁড়ানো সেই মেয়েটি। চন্দন-দস্যু আমাকে যথাস্থানে নিয়ে যাবার জন্য মেয়েটিকে ইঙ্গিত করল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে কিন্তু গাছতলাতেই থাকতে হবে। আমরা এই প্রকৃতির ভেতরেই থাকি।

বললাম, একটা প্রশ্ন করব?

যতগুলো খুশি করতে পার।

বললাম, ছেলেরা তোমার ডেরা থেকে পালানোর চেষ্টা করলে তাদের শাস্তি মৃত্যু, আর আমরা যদি পালাবার চেষ্টা করি?

গোঁফের তলায় প্রায় সবকটা দাঁত বের করে হাসল বীরাপ্পন্। বলল, তুমি পালাবে, কখ্খনো না।

কি করে জানলে?

আমি মুখ দেখলেই বুঝতে পারি।

এবার আমিও হাসলাম।

ও ভয় দেখাবার ভঙ্গি করে বলল, আশ্চর্য! আমাকে দেখে ভয় পায় না এমন কেউ আছে নাকি!

বললাম, তোমাকে খামোকা ভয় করতে যাব কেন?

তহশীলদার ঘোড়া থামিয়ে বলল

বীরাপ্পন্ বলল, এই নামের মানুষটাকে ভয় করতে না পার কিন্তু কাঁধে বন্দুক, একজোড়া ইয়া গোঁফওয়ালা মানুষকে দেখে ভয় পাবে না?

ফুঃ, তোমার ঐ গোঁফের তারিফ তুমি ছাড়া কেউ করবে না। একটি রাজস্থানী লোকের ছবি পত্রিকায় বেরিয়েছিল। বিরাট গোঁফজোড়া তার। কতখানি হবে বলতো?

বলতে পারব না।

আন্দাজ কর।

দু'কান থেকে আরও দু'ইঞ্চি করে বেশি হতে পারে।

বললাম, তোমার কোনো আইডিয়াই নেই।

তবে, আর কতবড় হতে পারে?

এবার আমি ওর দুটো হাত তুলে কানের দু'দিকে সরল রেখায় রাখতে বললাম। ও তাই করল।

বললাম, তার দু'দিকের গোঁফ বেড়ে বেড়ে হয়েছে প্রায় এত্তো বড়। সে দু'দিকে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে গোঁফ চোমরাচ্ছে।

ও বলল, ওরেব্বাস, দারুণ খবর তো! গোঁফ নিয়ে মনে মনে আমার বেশ গর্ব ছিল, সেটা আজ ভেঙে গেল।

বললাম, চীনেদের গোঁফের বাড়বাড়ন্ত কোনদিকে, তুমি জান?

কি করে জানব,—মাথা নাড়ল বীরাপ্পন্।

নিচের দিকে।

নিচের দিকে! সে কি রকম?

আসলে আমাদের দেশের লোকের মতো ওদের অত গোঁফদাড়ি গজাতে দেখা যায় না। তবে আমি একটা আঁকা ছবিতে দেখেছি, এক চীনেম্যানের গোঁফ প্রায় বুক অবধি ঝুলে আছে।

বীরাপ্পন্ একগাল হেসে বলল,

ওগুলো স্পেশাল কেস, আকচার দেখা যায় না।
একটুখানি থেমে বেশ একটা পরিতৃপ্তির হাসি হেসে এবার বলল, অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে কথা বলে বেশ ভাল লাগছেরে বেটী। খালি ঝুটঝামেলা কি সব সময় ভাল লাগে! তুই এখন বাসাম্মার সঙ্গে গিয়ে স্নানটান সেরে নে। পরে আবার কথা হবে।
আমি মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে ঐ জঙ্গলের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আর একটি জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম।
যেতে যেতে ভাবলাম, লোকে মানুষটিকে এত ভয়ঙ্কর আর খুনী বলে কেন? এইটুকু সময়ের ভেতর আমার সঙ্গে কেমন মিষ্টি করে কথা বলল। শেষে নিজের মেয়ের মতো তুই, তুকারি করে আমাকে স্নানে পাঠাল। মনে হলো, ভয়ঙ্করের ভেতরেও সুন্দর থাকে, তাকে খুঁজে নিতে হয়।
খাবার সময় দেখলাম, ঐ এক জায়গায় সবাই ঘিরে বসে। গুনে দেখলাম, প্রায় পঞ্চাশ জন। জনা তিনেক মেয়ে পরিবেশনের জন্য তৈরি হয়েছে দেখে আমিও আসন ছেড়ে উঠে ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম। বীরাপ্পন্ ওর আসনে বসে হেসে হাত নাড়ল। বাধা দিল না।
আমি দেখলাম, পাশাপাশি অভীকাকু আর বাসব বসেছে। তারা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল।
পরিবেশনের ভেতর আমি বীরাপ্পন্‌কে বললাম, তোমার আর কি চাই বল?
আমি চাই, তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস, খেতে বসে যা। বেলা গড়িয়ে গেল।
পরিবেশনের সময় অভীকাকু বলল, কি ব্যাপার রে? দস্যুর সঙ্গে দেখছি দস্তি করে ফেলেছিস।
বললাম, মানুষটা দস্যু, তবে মনে হচ্ছে ওর ভেতর রত্নাকর লুকিয়ে আছে।
কাকু বল, দেখ, ওর ভেতর সেই ভাল মানুষটাকে জাগিয়ে তুলতে পারিস কি না?
সন্ধ্যায় চাঁদ উঠল। রাতের খাবার তৈরি করাই রয়েছে। কেউ খেতে বসবে না ন'টার আগে। আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে একটা গাছতলায়। বেশ কিছু খড়ের ওপর বেডকভারের মতো সেলাই করা চট পেতে দেওয়া হয়েছে। আমি আর বাসাম্মা পাশাপাশি বসেছি। এখন আমরা সারাক্ষণের সঙ্গী।
রাতে খাবার পরে আমি আর বাসাম্মা শুয়েছি গাছতলায়, পাশাপাশি। ঘুম নেই কারো চোখে। কিছুক্ষণ আগে বাবার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আমি কাঁদছিলাম।
বাসাম্মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কাঁদছিস কেন মা, মায়ের কথা মনে পড়ছে?
আমার কান্না বুক ছাপিয়ে উঠল, কান্নাভেজা গলাতেই বললাম, আমার মা নেই। ডাকবাংলাতে বসে এখন আমার বাবা বুক চাপড়াচ্ছে। আমি ছাড়া বাবার আর কেউ নেই।
বাসাম্মা আমাকে গাছতলায় একা রেখে কোথায় যেন উঠে চলে গেল, ফিরল ঘন্টাখানিক পরে।
আমি তখনও বসে আছি দেখে ও আমার পাশে বসে পিঠে হাত রাখল।
একসময় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কোনো ভাবনা নেই, তোর বাবা খবর পেয়ে গেছে।
আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর?
জানানো হয়েছে তুই বহাল তবিয়তে আছিস।
কি করে বাবা জানতে পারল?
কেন, আমার বর গিয়ে পুলিশকে, কে কেমন আছে, সব খবর দিয়ে এসেছে। পুলিশের কাছ থেকে তোর বাবা অনেক আগেই খবর পেয়ে গেছে।
আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, পুলিশ কি জানে, আমরা কোথায় আছি?
সব জানে।
সব জানে! তবে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে না কেন?
এ কেনর উত্তর আমার কাছে জানতে চাসনি মা। সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে একটা কুয়াশার চাদরের ভেতর। বাইরে থেকে আন্দাজ করা যায় কিছু ঘটছে, কিন্তু স্পষ্ট কোনোকিছু বোঝা যায় না।
আমি বাসাম্মার সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, সে দারুণ বুদ্ধিমতী।
আমি এবার বললাম, তোমার বর কি করে বাসাম্মা?
কেন, তুই তাকে দেখিসনি?
আমি তাকে দেখব কি করে? আর দেখলেও চিনব কি করে?
তুই তাকে দেখেছিস।
বললাম, তোমার মানুষটি কি খাবার সারিতে বসেছিল? এত মানুষের ভেতর বিশেষ একটি মুখ কি মনে রাখা সম্ভব?
বাসাম্মা বলল, খাবার শেষে আমরা যখন বন চিরে এপারে বেরিয়ে আসি তখন একজন পাহারাদার চোখে পড়েছে কি?
বন্দুক কাঁধে যে লোকটি আমাদের দিকে তাকিয়েছিল?
ওরই কথাই তো বলছি। ঐ তো পুলিশকে বলে এসেছে তোর বাবাকে খবর দিতে। অবশ্য সর্দারই ওকে পাঠিয়েছে।
ওই তোমার বর?
ওটাই আমার মরদ, সর্দারের ডান হাত।
আমি বললাম, আচ্ছা তোমাদের মতো মেয়েরাও কি বীরাপ্পনের দলের সঙ্গে থাকে?
একেবারেই না।
তবে তুমি রয়েছ কি করে?
বাসাম্মা বলল, রয়েছি তোর দেখভাল করার জন্য।
সকালে আরও যে দুজন ছিল?
বাসাম্মা বলল, আমরা তিনজন গাঁও থেকে এসেছিলাম সবজি নিয়ে। ওরা চলে গেছে। আমি কেবল তোর জন্যে রয়ে গেছি। মেয়েদের তো ধরে আনা হয় না। তুই নিজে এসে ধরা দিয়েছিস, তাই নতুনরকম ব্যবস্থা নিতে হয়েছে সর্দারকে।
তোমাদের গাঁ কোথায় বাসাম্মা?
দূরে, বনের শেষে ছোট ছোট পাহাড়ের যে সারি দেখা যায়, ওখানেই আমাদের গাঁও।
আমাকে একবার নিয়ে যাবে?
আমাদের গাঁওতে তুই যাবি? কিন্তু

মা, খোদ সর্দারের হুকুম ছাড়া এক পাও নড়া যাবে না।

আমি সর্দারকে বলব?

বলে দেখ না। লক্ষ্য করেছি, তোর ব্যাপারে সর্দার বেশ নরম।

বললাম, সর্দারকে কখন কোথায় একা পাওয়া যাবে বল তো?

এখনই পেতে পারিস।

এতখানি রাতে! কোথায়?

এখন তো সর্দারের সবে সন্ধ্যে রে। মাঝরাতের আগে ও ঘুমোয় না।

সর্দারকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?

বাসাম্মা আমার মাথাটা ওর বুকের কাছে টেনে নিয়ে ডানদিকে আঙুল তুলে বলল, ঐ যে একটা টিবি দেখছিস, ওর ওপর ঝাঁকড়া মতো একটা গাছ, তারই তলায় বসে আছে।

সেখানে বসে সর্দার কি করছে?

এ এলাকা ছেড়ে হাতিগুলো অন্য এলাকায় পালাবার তাল করছে, তাই দু'দিন ধরে ওদের আটকাচ্ছে সর্দার আর তার নিযুক্ত লোকেরা।

ওদের আটকে কি করবে? ওরা বনের পশু, যেখানে খুশি যাক্ না।

ওদের ভেতর দুটো দাঁতাল হাতি আছে যে। একটার দাঁত জোড়া এত বড় যে হাজার হাজার টাকা তার দাম।

হাতির থেকে তার দাঁত কেটে নেবে কি করে?

বাসাম্মা বলল, আমি সঠিক জানি না মা। শেকল দিয়ে কৌশলে বেঁধে ফেলে করাত চালিয়ে হয়তো কাটা যায়। তবে শুনেছি, এত হাঙ্গামা পোহাতে চায় না ওরা। খাবারের সঙ্গে কড়া বিষ মিশিয়ে দেয় অথবা গুলি করে মারে।

এ তো দারুণ নিষ্ঠুর কাজ।

টাকার জন্যে মানুষ পারে না, এমন কাজ নেই।

আচ্ছা, এরা তো থাকে বনে-জঙ্গলে এতো কষ্ট করে, এদের এতো টাকার কি দরকার?

চন্দন কাঠ আর হাতির দাঁত বেচে ওরা লাখ লাখ টাকা কামায়। সর্দারের ঐ টাকা দু'দিক দিয়ে খরচ হয়ে যায়।

কি ভাবে?

ঐ পাহাড়ের কোলের গাঁগুলোতে যেসব মানুষ থাকে তাদের মতো দুঃখী বড় একটা দেখা যায় না। ওরা বীরাপ্পনকে ভগবান বলে মনে করে মা।

ভগবান বলে!

হ্যাঁ মা তারা যখন বিপদ-আপদে পড়ে, দুঃখ-কষ্টে কাতর হয় তখন চোখের জল ফেলে বীরাপ্পনকেই ডাকে। সর্দার যেখান থেকেই হোক ঠিক খবর পেয়ে যায় মা। নিজে হাজির হয়ে অথবা লোক পাঠিয়ে তার সব দুঃখ দূর করে দেয়। বিয়ে-সাদির টাকা, অসুখবিসুখের দাওয়াই সর্দারের লোক পৌঁছে দেয় ঠিক মানুষটির কাছে।

গরীব, অসহায় মানুষগুলির কাছে এ তো ভগবানেরই দানের মতো।

বুড়োবুড়ি মানুষেরা তীর্থভ্রমণ করতে চাইলে সর্দার তাদের সব বন্দোবস্ত করে দেয়। নিজের দলের শক্তপোক্ত, বুঝদার দু'তিনটি লোককে সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। যেন বুড়ো মানুষগুলোর কোথাও এতটুকু অসুবিধে না হয়। ফিরে এসে তারা সর্দারকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে।

বললাম, সর্দারের কথা যত শুনছি ততই অবাক হচ্ছি মাসি। হ্যাঁ, তুমি যে বললে সর্দারের টাকা দু'ভাবে খরচ হয়, একরকম তো বুঝলাম, অন্য রকমটা কি?

যারা এই বনটাকে ঘিরে রেখেছে, তাদের রক্ষা করতে হয় সর্দারকে।

সে কি রকম?

মা, বেশি না জানাই ভাল। ঐ কুয়াশার পর্দার বাইরে থেকে যতটুকু দেখা যায় বা জানা যায়।

তুমি তো ভারী সুন্দর করে কথা বলতে পার মাসি!

আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে ছিলাম মা। কিছু লেখাপড়াও শিখেছিলাম। বিয়ের অল্পদিনের ভেতরেই স্বামীকে হারাই। এই দুঃখের ভেতর একদিন গাঁওবালাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি তীর্থভ্রমণে। তীর্থ থেকে ফেরার পথে সমস্ত দলটা প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ে যায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে কে কোথায় যে ছিটকে পড়ে তার হদিস কেউ পায় না। পাহাড়ের ধার দিয়ে খরস্রোতা যে পাহাড়ি নদীটা বইছিল, সেটার জলের ঢল নেমে পথ প্রায় ডুবিয়ে দিল। আমি পথের ওপর একসময় আছাড় খেয়ে পড়ে গেলাম। বিজলি ঘন ঘন চমকাচ্ছিল। হঠাৎ একটা শক্ত হাত আমাকে পথ থেকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল। আমি সেই বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম, একটা জোয়ান মানুষ ডান হাতে আমাকে শক্ত করে ধরে আছে। তার কাঁধে চড়ে জাপ্টে ধরে আছে একটা বুড়ো মানুষ।

আমি সে যাত্রায় সঙ্গীদের হারিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই মানুষটির সঙ্গে চলে এলাম পাহাড়ের কোলে ওদের গাঁওতে। পাঁচদিন একসঙ্গে ছিলাম পথে আর চটিতে। এমন সৎ আর পরোপকারী মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। ওর বাবার বন্ধু তীর্থে যেতে চেয়েছিল, সেই অথর্ব বৃদ্ধকে কাঁধে-পিঠে বসিয়ে দুর্গম তীর্থক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছিল মানুষটি।

আমি বললাম, তুমি আর তোমার নিজের বাড়ি ফিরে যাওনি?

না, সেদিনের সেই হৃদয়বান মানুষটির আকর্ষণে আমি তার গাঁওতেই থেকে যাই। আজকের এই সর্দার আমাকে আমার মুল্লুকে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি যেতে চাইনি। তখন সর্দার আমাকে তার সবসেরা শাগরেদটির সঙ্গে নতুন করে বিয়ে দিয়ে তাদের দলের একজন করে নেয়।

তীর্থে এই সর্দারের সঙ্গেই তো তোমার দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ, এই সেই মানুষ।

আচ্ছা, আমি তোমাকে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই।

বাসাম্মা প্রশ্ন শোনার জন্য আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বললাম, পাহাড়ের কোলের গাঁওটি ছেড়ে কবে থেকে এমন বনবাসে কাটাচ্ছে তোমাদের সর্দার? আর কেনই বা সরকারের সঙ্গে বার বার এমন দর কষাকষি চলছে!

তুমি শুধু জেনে রেখ মা, লোকটি প্রতিমুহূর্তে এ জীবন থেকে মুক্তি চায়। তোমাদের এখানে ধরে আনে শুধু সরকারকে তার নিজের মুক্তির ব্যাপারে

আলোচনায় বসাতে।
সে তো নিজে গিয়েও ধরা দিতে পারে, সরকার তার সঙ্গে তাহলে সহজেই আলোচনায় বসতে পারবে।
বাসাম্মা মৃদু হেসে বলল, যার বিরুদ্ধে শতাধিক খুনের অভিযোগ, হাতি হত্যা আর চন্দনকাঠ কাটার অভিযোগ, তাকে দেখামাত্রেই সারা জীবনের মতো ফাটকে পুরে দেবে সরকার। সবাই মনে করে, বিচারক ওর মতো অপরাধীকে ফাঁসির হুকুমই দিয়ে দেবেন। কিন্তু বনকে ঘিরে রেখেছে যে পাহারাদাররা তারা নিজেদের স্বার্থেই ওকে আটকে রেখেছে। তারা চায় না এমন একটি শাঁসালো রসদদারের অকালমৃত্যু।
বললাম, টাস্ক ফোর্সদের কীর্তিকলাপ নিয়ে এমন অনেক কথাই শোনা যায় বাইরে। কিন্তু তার কতটা সত্যি, আর কতটা মিথ্যে তা বোঝার ক্ষমতা নেই আমার। তবে একটি কথার সমাধান আমি কিছুতেই করতে পারি না। এত শক্তিশালী একটি সরকার এতদিন ধরে এত ফোর্স নিয়োগ করেও একটি দস্যুকে বন থেকে কেন তুলে নিয়ে যেতে পারছে না।
আবার হাসল বাসাম্মা। বলল, এর ইঙ্গিত আমি আগেই তোমাকে দিয়েছি মা। তবে তোমার ঐ যে প্রশ্ন, সর্দার কেন গাঁও ছেড়ে এ জীবনে এলো, তার উত্তর তোমাকে যেদিন গাঁওতে নিয়ে যাব সেদিনই বলব। এখন তুমি সর্দারের কাছে গিয়ে গাঁওতে যাবার অনুমতিটা আদায় করে আন।
আমি ঐ রাতেই সর্দারের কাছে গিয়ে হাজির হলাম।
প্রথমে পেছন থেকে শুকনো পাতায় পায়ের সাড়া পেয়ে চমকে উঠেছিল সর্দার। ওর হাতের রাইফেল ঘুরে গিয়েছিল আমার দিকে।
আমি রাইফেলের মুখটা ডান হাতে ধরে নিয়ে বললাম, তুমি আমাকে মারতে পারবে সর্দার?
বীরাপ্পন্ ততক্ষণে তার ভুলটা বুঝতে পেরে ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল, বেটী তুই এসেছিস! আমি ভাবলাম বুঝিবা কোনও বাঘ-টাঘ হবে। এটা টাইগার-রিজার্ভের এলাকা তো। এখন বল এত রাতে কেন এসেছিস?
একটা আর্জি আছে সর্দার।
তোর কোনও আর্জিই অপূর্ণ থাকবে না। বল কি চাই?
তোমার গাঁওতে একবার যাবার অনুমতি দিতে হবে।
কেন রে? সেখানে গিয়ে কি করবি?
তোমার অত জানার দরকার কী বাপু? শুধু বল, যেতে দেবে কি দেবে না?
তুই যখন ইচ্ছে করেছিস তখন চলে যা, আমার অনুমতির দরকার কী!
আমি ওর কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে বললাম, রাগ করে নয়, বল না ঠিক ঠিক আমি যাব কিনা?
নিশ্চয়ই যাবে, আর বাসাম্মা তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। বাসাম্মা গেলে আর রক্ষীর দরকার হবে না।
আমি যদি ওখান থেকে বাবার কাছে চলে যাই?
আমি জানি, তুই আমাকে না বলে কোথাও যাবি না। একদিন তো তোকে ছেড়ে দিতেই হবে মা। কটা দিন শুধু এখানে থেকে যা। তোকে ধরে রেখেছি, তাই ইতিমধ্যেই সরকারি মহলে বেশ হৈচৈ পড়ে গেছে। আমিও বলে পাঠিয়েছি, বন্দীদের ছেড়ে দিতে পারি একটি শর্তে। দু' বছরের বেশি আমাকে জেলে আটকে রাখা চলবে না। দেখি কি উত্তর আসে।
যদি ওরা তোমার শর্ত না মানে তাহলে কি চিরকাল তুমি আমাকে এখানে বন্দী করে রেখে দেবে?
তুই চাইলে আমি এখুনি নিজে তোকে তোর বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। কিরে যাবি?
আমি বুঝি তোমাকে তাই বললাম!
ঠিক আছে তুই বাসাম্মাকে নিয়ে আমার গাঁও-তে চলে যা। আমার ডেরায় কেউ নেই। ঘর হাট করে খোলা আছে। তালাচাবিও নেই। গাঁয়ের লোকেরা ঝাঁট দিয়ে ঘর নিকিয়ে পরিষ্কার করে রাখে। ওখানেই বাসাম্মা তোকে রান্না করে খাইয়ে দেবে। একদিনের বনভোজন হবে আর কী।
আমি হেসে বললাম, কেন রোজই তো তোমার এখানে বনভোজন চলছে।
কিন্তু চেষ্টা করবি বিকেলের আগে ফিরে আসতে।
কেন, সন্ধ্যায় ফিরলে ক্ষতি কী?
তুই দেখছি ভারী ডানপিটে মেয়ে। জানিস তো, এটা টাইগার রিজার্ভের ভেতরের এলাকা। শুধু টাইগার নয়, বাইসন, হাতি, সব রকম জানোয়ারই এ বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
তাহলে তো তোমার বন্দুকটা নিয়ে যেতে হয়।
তুই বন্দুক চালাবি!
কেন বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?
মনে হয়, তুই সব পারিস।
কাল ফিরে এসে দেখিয়ে দেব রাইফেলে আমার হাতের টিপ কতখানি। তাহলে ভোরবেলা আমি বাসাম্মাকে নিয়ে ঘুরে আসছি।
সর্দার বলল, তুই গাছতলায় গিয়ে একবার বাসাম্মাকে এখানে পাঠিয়ে দে।

পাহাড়ের কোলে সারি সারি বাড়ি। সাধারণ গরীব মানুষদের বাস। নতুন মানুষ দেখে কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করল। কয়েকজন চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল কিন্তু কোনওরকম কৌতূহল প্রকাশ করল না। কোনওরকম ঔৎসুক্য প্রকাশ করার ব্যাপারে বীরাপ্পনের নিষেধ আছে। তাছাড়া বাসাম্মাকে ওরা বীরাপ্পনের প্রতিনিধি বলেই জানে।
বাসাম্মা বলল, জায়গাটাতে বহু বহুবার পুলিশের আনাগোনা হয়েছে। বড় বড় অফিসাররা রাতেভিতেও এসেছে বীরাপ্পনের খোঁজে।
আমি বসতির শেষ প্রান্তে একটা বড় দোতলা জীর্ণ বাড়ি দেখলাম। তার মাথার ফাটলে বেশ বড় অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে গেছে।
আমি বাসাম্মাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওই বাড়িটা কার এবং তার এ দশা কেন?
বাসাম্মা বলল, ওটা এখানকার তহশীলদারের বাড়ি ছিল, বলতে পার, এক জমিদারের বাড়ি। তহশীলদার বীরাপ্পনের কোপে পড়ে প্রাণ

হারিয়েছে। ভয়ে গাঁ ছেড়ে তাদের শহরের বাড়িতে পালিয়ে গেছে তার পরিবারের সব লোকজন। বহুবছর ভয়ে এ তল্লাট মাড়ায় না।

কেন, কী দোষ তার? এ খুবই অন্যায়।

ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক আমরা নই মা।

তা বলে যা খুশি তাই করা যায়? নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া যায়? আদালত আছে, বিচারব্যবস্থা আছে, আইনকানুন আছে।

বাসাম্মা বলল, সর্দার বলে ওসব গরীব লোকদের জন্য নয়। আইন-আদালত বড়লোকের টাকায় চলে। পয়সা ছাড়া ওখানে কিছুই হয় না। তুমি যদি কেস কর, তার ফল জানতে পারবে তোমার নাতি। এত কেস জমে আছে বিচারকদের এজলাসে।

বললাম, আমি শুনেছি, শুধু জন্তু-জানোয়ার নয়, তোমাদের সর্দার একশরও বেশি মানুষ মেরেছে।

বাসাম্মা উত্তেজিত হয়ে বলল, তুমি জান না মা, সর্দার যাদের মেরেছে, তারা জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও ভয়ংকর।

আমি কিন্তু বাসাম্মার কথায় সম্পূর্ণ সায় দিতে পারলাম না। একজন মানুষ তার বিচারে যাকে দোষী মনে করবে তাকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে, এ হতে পারে না। আইনের ফাঁক থাকতে পারে, দোষী তার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, তবু সমাজ-সংসারকে আইনের শেকল দিয়ে অনেকখানি সংযত করে রেখেছে আমাদের বিচারব্যবস্থা।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে বাসাম্মা বলল, আমরা খাওয়া-দাওয়ার পর ওই পাহাড়টার ওপরে উঠব। ওখানে যে পাকুড় গাছটা ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারই তলায় বসে তোমাকে ছোট্ট একটি কাহিনী শোনাব। তাতেই তুমি বুঝতে পারবে, কেন আমাদের সর্দার বনের নির্বাসন-যন্ত্রণাকে বিশ বছর ধরে মেনে নিয়েছে।

মাথার ওপরে সূর্য জ্বলছে। কিন্তু উত্তাপ বেশি নেই। এ অঞ্চলে শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ বেশি নয়। আমরা দুজনে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম। আঁকাবাঁকা পথে কিছু ওপরে ওঠার পর লোকালয় আড়ালে পড়ে গেল। আমি বাসাম্মাকে অনুসরণ করে অনেকখানি ওপরে উঠে এলাম। পাকুড় গাছের তলায়, পাহাড়ের যেদিকে বসতি আছে, তার উলটো দিকে দুজনে বসে পড়লাম। বেশ খানিক নিচে একটা উপত্যকা। বড় বড় পাথরের স্তূপ পাহাড়ের তলায় জমে আছে।

বাসাম্মা বলল, ওই পাথরের চাঁইটার দিকে তাকালে তোমার বয়সী সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে যায়।

কে সে?

পনেরো-ষোল বছরের বেশি হবে না মেয়েটার বয়স। ঠিক তোমার মতো তরতাজা একটি মেয়ে মা। ছোটবেলা থেকেই একা। লোকে বলে, মা নেই যার, বড় দুঃখ তার। মা না থাকলেও ওর বাবা ছিল। মানুষটা নিজের সুখের জন্যে কোনওদিন কোনও কিছু করেনি। এই গাঁয়ের লোকজনকে দূর দূর তীর্থভ্রমণে নিয়ে গেছে। আশীর্বাদ কুড়িয়েছে অজস্র। নিজের জন্য কিন্তু কিছু সঞ্চয় করেনি।

মেয়েটি ভারী সাহসী। একা ঘরে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। বাবা বাইরে থাকলে সে এক পাল ছাগল নিয়ে পাহাড়ের ওপারে চরাতে যেত। তাতে সংসার চলে যেত তার। মনটা ছিল বাবার মতোই দরাজ। কারুর দুঃখ দেখলেই নিজের কাছে যা কিছু আছে, সব উজাড় করে দিয়ে দিত। কিন্তু তাকে কেউ কোনওভাবে সাহায্য করতে এলে সে তা কিছুতেই নিতে চাইত না।

একদিন বেলাশেষে মেয়েটি ঘড়ায় জল ভরে নিয়ে কুঠিতে ফিরছিল। হঠাৎ সে পেছনে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। ফিরে তাকিয়ে দেখে তহশীলদার ঘোড়ায় চড়ে তার পেছন পেছন আসছে। ও রাস্তার ধারে থেমে দাঁড়াল।

তহশীলদার ঘোড়া থামিয়ে বলল, কবে ফিরবে তোর বাপ?

কে জানে।

তুই জানিস না?—বলতে বলতে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল লোকটা। চোখ গোল গোল করে বলল, সরকারি খাজনা বাকি পড়ে গেছে তিন বছরের মতো। শুধু ফাঁকি দিয়ে ঘুরছে। তুই তোর ছাগল বিক্রি করে টাকা দিয়ে আসবি।

মেয়েটি বলল, বাবা এলে যা করার করবে। আমি টাকা কোথায় পাব?

এরপর প্রায় প্রতিদিন গরীব মেয়েটির একটি করে ছাগল টেনে নিয়ে যেতে লাগল তহশীলদারের লোক। মেয়েটি চেঁচাল, কাঁদল কিন্তু ভয়ে মহল্লার কেউ প্রতিবাদ করল না।

একে একে সবকটা ছাগলই চলে গেল তহশীলদারের বাড়ি।

একদিন তহশীলদারের পেয়ারের একটি লোক এসে বলল, ওই ছাগল বিক্রির টাকায় কি আর সব খাজনা শোধ হয়? এখন তুই আমার সঙ্গে চল, গতরে খেটে বাকিটা শোধ করে দিবি।

সাহসী মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে লোকটার দিকে তুলে ধরেছিল ধারালো একটা দা। তাই দেখে ভয়ে লোকটা পিছু হটে পালিয়েছিল।

মেয়েটা বুঝতে পারল, এই ভয়ংকর মানুষগুলো হয়তো আজ রাতেই তার ঘরে এসে হামলা করতে পারে। তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে পারে তহশীলদারের বাড়ি।

সে সেই রাতের অন্ধকারেই সবার চোখের আড়ালে এই পাহাড়ের ওপর উঠে এল।

যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। ও পাকুড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দেখল, বসতি এলাকার এপার থেকে ওপারে দুটো মশাল ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করছে। ওরা নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে দুটো মশালই তহশীলদারের বাড়ির দিকে চলে গেল।

আমরা এখন যেখানে বসে আছি, মেয়েটা সেখানে এসে বসল। তাকে যেন কেউ না দেখতে পায়। শেষরাতে ম্লান একটা চাঁদের আলো এসে পড়ল পাহাড়ের ওপর। দীর্ঘক্ষণ আতঙ্কে, উত্তেজনায় সিঁটিয়ে ছিল মেয়েটা। একসময় পাকুড় গাছের তলায় তার চোখ বন্ধ হয়ে এল। সে শুয়ে পড়ল এই

পাহাড়ের ওপর।
মাঝরাতে হঠাৎ একটা নুড়ি নিচে গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনে সে চমকে জেগে উঠল। পাশেই যমদূতের মতো দুটো লোক এসে দাঁড়িয়েছে। হাসিতে ঝলসে উঠেছে তাদের দাঁতগুলো। হাসি যে এত ভয়ংকর হয়, তা সে জানত না।
ও চিনতে পারল, একটা তহশীলদারের সেই শাগরেদ। অন্যটা কতোয়ালির একটা সেপাই। দুটোই ষড়্‌ করে ওকে তুলে নিয়ে যেতে এসেছে। তহশীলদার পাহাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।
তহশীলদারের লোকটা যেই নিচু হয়ে ওর দিকে হাত বাড়াতে গেছে অমনি কেউটের ছোবলের মতো তার কাঁধের ওপর এসে পড়ল একটা রামদার কোপ। লোকটা প্রাণফাটা চিৎকার করে আছড়ে পড়ল নুড়ি পাথরের ওপর।
ততক্ষণে অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে সেপাইটা বাগিয়ে ধরেছে তার বন্দুক। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, এখুনি ফেলে দে তোর দা, নইলে ফুটো করে দেব মুণ্ডুটা।
ও কিন্তু হাতের দা ছাড়ল না, সাপের মতো এদিক-ওদিক ফণা দোলাতে লাগল। চোখের দৃষ্টি আটকে রইল সেপাইটার ঐ রাইফেলের ওপর।
মেয়েটা তার হাতের দা যেমন ফেলল না, সেপাইটাও নামাল না তার বন্দুক।
যখন এই অবস্থা চলেছে তখন হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল।
বক্তা খানিক সময় চুপ করে রইল দেখে আমি প্রশ্ন করলাম, কি এমন অঘটন মাসি?
ঐ পাথরের ওপর পড়ে থাকা লোকটা ততক্ষণে একটু সামলে নিয়েছে। সে ডান হাতে একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারল মেয়েটার হাত লক্ষ্য করে। পাথরটা কিন্তু হাতে লাগার পরিবর্তে লাগল গিয়ে মেয়েটার কপালে। সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়ল হাতের দা। সে পাক খেয়ে ঘুরে গেল পেছন দিকে। তখন সে চলে গেছে একেবারে পাহাড়ের কিনারে। মাথায় তীব্র আঘাত নিয়ে আর টাল সামলাতে পারল না। গুলি খাওয়া পাখির মতো ঝুপ করে খসে পড়ে গেল খাদের পাথুরে চাঁইগুলোর ওপর।
নিচ থেকে একটা চিৎকার শুনে জ্বলন্ত মশালটা হাতে নিয়ে অতি কষ্টে পাহাড়ের ওপর উঠে এল তহশীলদার। সে হাঁপাচ্ছিল।
এসে, সব কথা শুনে গাল পেড়ে বলল, বেকুব, আমি তোদের ফাঁদ পেতে পাখি ধরতে পাঠালাম আর তোরা একটা মরা পাখির খবর দিলি!
হঠাৎ একটা প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় মশালের আলো নিভে গেল। চারদিক থেকে ঝড়ের একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।
ভয়ংকর কিছু একটা ঘটতে চলেছে ভেবে তহশীলদার দুটো শাগরেদকে নিয়ে পাহাড়ের মাথা থেকে পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পালাতে পারল না।
অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য একটা গ্রহের যোগ হয়েছিল সে রাতে। যখন পাহাড়ের ওপর এই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটছিল তখন মাঝরাত পার হয়ে গেছে। আর ঠিক সেই অসময়ে কয়েকজন তীর্থযাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এল সর্দার। আর আসতে না আসতে গাঁওবালাদের মুখে শুনল, তহশীলদারের কীর্তিকাহিনী। শেষে যখন শুনল, পাহাড়ের ওপর থেকে তার মেয়েকে ধরে আনার জন্য অনেক আগেই উঠে গেছে তিন-তিনটে লোক তখন ঘর থেকে একটা সড়্‌কি বের করে নিয়ে সে ছুটে গেল পাকদণ্ডির পথের দিকে।
মাঝামাঝি পথ উঠে গিয়েই সে দেখা পেয়ে গেল তিনজনের। দুজন ধরে ধরে আনছিল আহত শাগরেদটাকে। বিদ্যুতের চমকে তাদের দেখতে পেল সর্দার। কিন্তু ওকে দেখতে পেল না তহশীলদারের দল। তারা আহত মানুষটাকে নিয়ে অতি সাবধানে ঝড়ের ধাক্কা কাটাতে কাটাতে নিচে নামছিল।
এবার বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই ওরা দেখতে পেল, সড়্‌কি হাতে তাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে ভয়ংকর মূর্তির এক যমদূত।
তহশীলদার কাঁপা কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, তুই এখানে?
আর একটা গলা ঘন অন্ধকারে বাজের মতো বেজে উঠল, আমার মেয়ে কই? কোথায় রেখে এলি তাকে?
যা, খুঁজে নে পাহাড়ের ওপরে।
আবার দপদপ করে জ্বলে উঠল বিদ্যুৎ। ঠিক যেন ঝকঝক করছে ত্রিশূলের তিনটে ফলা।
সেপাইটা কাঁধের থেকে ততক্ষণে হাতে নামিয়ে নিয়েছে বন্দুক।
বিদ্যুতের আলো নিভে গেল, কিন্তু ঐ অন্ধকারের ভেতরেও গুলি ছুটে এলো শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষাক্ত সাপের মতো হিস্ হিস্ আওয়াজ তুলে ভেসে গেল সর্দারের হাতের সড়্‌কি।
প্রাণফাটা একটা চিৎকার তুলে কেউ যেন পড়ে গেল মাটিতে।
এবার বেশ কিছুক্ষণ পরে চমকে উঠল বিদ্যুৎ। দেখা গেল, পাহাড়ী উৎরাই-পথে তিনটি প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ভেতর দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছে।
সর্দার বাঘের মতো গর্জন করে বলল, ওঠ ওপরে, আমার মেয়ের মুখে সবকিছু শোনার পর তোদের শাস্তি ঠিক করা যাবে।
অগত্যা ওপরে উঠতে হলো। উঠেই তহশীলদারের শাগরেদটা পা জড়িয়ে ধরল সর্দারের।
আমি সবকিছু বলছি বীরাপ্পন, তুমি সব শুনে যে শাস্তি দেবে তাই আমি মেনে নেব।
তহশীলদারের শাগরেদটি তার গুরুর সব বদ মতলবের কথা প্রথমেই ফাঁস করে দিলে। তারপর পাহাড়ের ওপর সেপাই আর সে সর্দারের হতভাগ্য মেয়েটিকে ধরতে এসে কিভাবে তার 'দা'-এর আঘাতে আহত হলো, কিভাবে বন্দুক তুলে সেপাইটা তাকে ভয় দেখাতে গেল, শেষে সেই সাহসী মেয়েটি তারই ছোঁড়া নুড়ির আঘাতে কিভাবে টাল সামলাতে না পেরে পাহাড়ের তলায় পড়ে গেল, তার খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে গেল সেই শাগরেদ।
উপত্যকার দিকে ছুটে গিয়ে আকাশে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে হাহাকার করে কাঁদতে লাগল সর্দার আর পাগলের মতো

ডাকতে লাগল মেয়ের নাম ধরে।

একসময় ঘুরে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের আলোয় দেখল, তহশীলদার হামাগুড়ি দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। আহত মানুষটা কিন্তু বসে আছে এক জায়গায়।

সর্দার ভীতু পলাতক তহশীলদারটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে এসে ছুঁড়ে ফেলে দিল পাহাড়ের তলায়।

ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তুই সব সত্যি কথা বলেছিস, তোকে আর মারব না। শুধু তুই একটা কাজ করিস, গাঁয়ের লোকজনকে ডেকে নিয়ে এসে মৃতদেহগুলোর সৎকার করিস।

সেপাইয়ের বন্দুকখানা ফেরার পথে কুড়িয়ে নিয়ে সে ঢুকে পড়ল বান্দীপুরের এই বনে। সেই থেকে মানুষটা বনবাসী।

তারপর কত ঝড় বয়ে গেল সর্দারের জীবনের ওপর দিয়ে। এখন ও বড় ক্লান্ত। নিজের গাঁয়ে ছোট্ট কুঠরিটির ভেতরে ও নিশ্চিন্তে একটু বিশ্রাম চায়। কিন্তু কে ওকে বিশ্রাম দেবে? সবাই ওর দিকে চেয়ে আছে মোটা কিছু পাওয়ার আশায়। অদৃশ্য কাঁটার জালে ও ঘেরা পড়ে গেছে। বন্দীদশা থেকে বেরিয়ে আসার পথ বা শক্তি কোনোটাই ওর নেই।

তবু এক একবার পাগলের মতো চেষ্টা করতে থাকে বনের বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য। নামী-দামী মানুষজনকে সুযোগ পেলেই ধরে আনে। তাদের মুক্তির পণ হিসেবে নিজের মুক্তি চায়। সরকারের কাছে ধরা দেবার ব্যাপারে দর কষাকষি করে।

ও বাঁচতে চায় মা, ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নয়, সারা জীবন জেলের অন্ধকার সেলে পচেও নয়। ও সংসারের আর পাঁচটা মানুষের মতো বাঁচতে চায়। হাটে হাটে ঘুরে ঘুরে বাজার করতে চায়। বন্দুক ফেলে দিয়ে লাঙল চষতে চায়। ছেলের দলের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে চায় নীল আকাশের বুকে।

এসব কথা ও বলে। বলতে বলতে আবেগে অস্থির হয়। দীর্ঘশ্বাস চাপে। আমরা ঠিক শুনতে পাই সে শব্দ। যাকে বাইরের লোকে ভয়ংকর খুনী বলে জানে, তার চোখও জলে ভরে ওঠে মেয়ে বিদায়ের সময়ে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ বনের ভেতর কি করে মেয়ে বিদায় হয়?

বাসাম্মা বলল, এ তল্লাটে বিয়ে-সাদি হলেই বর-বউকে বনের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সর্দারের কাছে। সর্দার তাদের আশীর্বাদ করে একটি চন্দন কাঠের টুকরো দিয়ে।

এ অঞ্চলের মানুষের ধারণা, বীরাপ্পন্ হাত তুলে আশীর্বাদ জানালে নতুন সংসারে কোনো বিপদ আসবে না। সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধিতে সংসার ভরে উঠবে।

এ তো দারুণ সুসংবাদ মাসি।

কয়েকদিন দেখছি মধ্যাহ্নভোজের পর সর্দার চলে আসে আমার ডেরায়। ঘণ্টাখানেক গল্প করার পর চলে যায় নিজের কাজে।

গল্পের ভেতর দিয়ে আমি যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয়েছে, সর্দারের ভেতর একটি শিশু বাস করছে, যে মাতৃস্নেহের জন্য কাঙাল।

একদিন কথায় কথায় বলল, তোর এখানে খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না রে মা?

একটুও না। আমি খুব খুশিতে আছি। তবে বাবার দুশ্চিন্তার কথা ভেবে মনটা অস্থির হয়।

হঠাৎ অন্যমনে কি যেন ভাবতে লাগল সর্দার। একসময় বলল, মেয়েরা বাপকে বড় ভালবাসে, তাই না রে?

আমি বললাম, খু-উ-ব।

ও কেমন কাঙালের মতো আমার দিকে চেয়ে রইল।

নিশ্চয় সেদিন ওর ভারি কষ্ট হয়েছিল নিজের মেয়ের কথা ভেবে।

আমি ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। সর্দার কিছুক্ষণ আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অন্য দিকে চোখ ফেরাল।

আমি জানি, ও তখন আমার কাছ থেকে মনের ভাবটুকু গোপন করার চেষ্টা করছিল। ওর চোখ শুকনো ছিল না।

সপ্তম দিনে মধ্যাহ্নভোজের পর আমরা গল্প শুরু করেছিলাম। হঠাৎ দুটো গুলির শব্দ শোনা গেল। মনে হলো, কেউ ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করছে।

বাঁ হাতের কনুই মাটিতে ঠেকিয়ে হাতের পাতায় মাথা রেখে কাৎ হয়ে শুয়ে ও আমার কথা শুনছিল। হঠাৎ গুলির শব্দে ছিলে থেকে ছিটকে যাওয়া তীরের মতো ও লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, কি হলো?

ততক্ষণে সর্দারের বাঁশি দু'বার বেজে উঠেছে।

বীরাপ্পন্ বেশ উদ্বেগের গলায় বলল, এখুনি আমাদের আরও গভীর বনের ভেতর চলে যাবার নির্দেশ এসেছে।

ঐ গুলির শব্দে জানতে পারলে?

হ্যাঁ, টাস্ক ফোর্সের লোক আমাকে জানিয়ে দিল, পাশাপাশি দুই প্রাদেশিক সরকারের মিলিত ফোর্স আসছে আমাদের ধরতে, আমরা যেন নিরাপদ কোনো জায়গায় আশ্রয় নিই।

এখন কি করবে?

বলতে বলতেই একজন রাইফেলধারী অভীকাকু আর বাসবকে নিয়ে হাজির হলো।

সর্দার তাদের ডাকবাংলোর দিকে এগিয়ে দিয়ে আসতে নির্দেশ দিল।

লোকটি অতি দ্রুত ওদের নিয়ে চলে গেল।

এদিকে দেখলাম, সর্দারের লোকজন উল্টো দিকে যেন উড়ে চলে যাচ্ছে।

যেতে যেতে বাসাম্মা একবার মুখ ফিরিয়েছিল। আমি পতাকার মতো হাত নেড়ে নেড়ে ওকে বিদায় জানালাম।

এবার সর্দারের দিকে ফিরে বললাম, তুমি আর একটুও দেরি না করে তাড়াতাড়ি চলে যাও ওদের সঙ্গে। আমি ঠিক পথ চিনে বনের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারব।

বীরাপ্পনের চোখ ছলছল করে উঠল। সে কান্নাভেজা গলায় বলল, বিদায় দেবার সময় মেয়েকে কিছুটা পথ যে এগিয়ে দিতে হয় মা।

আমি চন্দন-দস্যুর হাত ধরে জোরে জোরে বনের পথে এগিয়ে চললাম। মনে হলো, সারা বন চন্দনের গন্ধে 'ম-ম' করছে।

ছবি: বিজন কর্মকার

সময়ের গোলক ধাঁধায়
ববি ক্লার্কের বাড়িতে...
ওঃ, জেসমিন বাঁচালে। তোমার সাহায্য চাই।
রোজ দুপুরবেলায় এই আলমারির মধ্যে থেকে কথাবার্তা ভেসে আসে।
সে কী!
এটা আমাদের পারিবারিক বাড়ি।১৬০০ সালে তৈরি। তবে কী ঐ সব কথাবার্তা আমাদের পূর্বপুরুষের!
জেসমিন ভুতুড়ে আলমারিটা খুলল...
এখন তো দুপুর। ববি, মনে হচ্ছে আমি যেন অনেকের খুব চাপা গলার কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি।
জেসমিন, এর মধ্যে গোপন রহস্য আছে।
পিউরিটানদের সময়ে আমাদের এক আত্মীয়াকে ডাইনি সন্দেহে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।
এই!
এ কী, মনে হচ্ছে আমায় কে যেন টেনে নিচ্ছে।
!
জেসমিন অচেনা একটা জায়গায় যেন উড়ে এল...
তুমি কে? আমাদের বাড়িতে ঢুকলে কি করে?
আমি জেসমিন! জানি না এখানে কী করে এলাম!
আলমারির মধ্যে দিয়ে জেসমিন নতুন জগতে এসে হাজির হয়েছে।
এই মেয়েটা নিশ্চয়ই একজন ডাইনি!
মোটেই না!
তুমি ডাইনি না হলে পাথরের ফায়ার প্লেসের মধ্যে দিয়ে আসতে পারতে না।
তা ছাড়া তুমি ভারী অদ্ভুত পোশাক পরে আছো।
তোমরাও তো!
এখানে আমাদের একরকমই পোশাক।
১৯৯৮ সালে এই রকম পোশাক কেউ পরে না।
১৯৯৮! কী বলছো তুমি! এটা তো ১৬৯২।

এখন যদি ১৬৯২ সাল হয় তাহলে বুঝতে হবে আমি নির্ঘাৎ সময়ের গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছি!
আর এখন আমি ৩০০ বছর পিছিয়ে গেছি!
আমি আমার বন্ধু ববি ক্লার্কের বাড়িতে একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম একটু আগে...
আমি রবার্ট ক্লার্ক, আমার স্ত্রী মেরি, ছেলে জুনিয়র আর মেয়ে মলি।
তুমি যে ববির কথা বললে ও তাহলে আমার নাতির নাতি!
কয়েক সেকেন্ড আগেও আমি ওর সঙ্গে ছিলাম। তখন তো ১৯৯৮ সাল।
সময়ের গোলকধাঁধা জেসমিনকে ১৬৯২ সালে পৌঁছে দিয়েছে...
তুমি কিছুতেই ৩০০ বছর পরের মেয়ে হতে পারো না।
আপনাকে এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি।
এই দেখুন...এটা একটা পেনলাইট!
আ...!
আগুন নেই অথচ আলো জ্বলছে!
এই দেখুন একটা ছোট্ট টেপ রেকর্ডার। গান শুনবেন? এই যে শুনুন!
এ নির্ঘাৎ ভূতের গলা!
মোটেই না, আমার গলা!
ওরা জেসমিনকে বিচারকের সামনে টেনে আনল।
তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুমি ডাকিনী বিদ্যা জানো। তোমার কিছু বলার আছে?
আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।
তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানে এখন কোন সাল?
১৯৯৮!
সে কী!
তুমি এখানে এলে কি করে?
মনে হচ্ছে আমি সময়ের গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছি।
কী অবাস্তব কথা! ভয়ঙ্কর কথা!
১৬৯২ সালে জেসমিনের বিচার চলছে
তোমার বুকে ঐ দাগগুলো কিসের?
এটা মিকি মাউসের সিম্বল। পৃথিবীর সব থেকে জনপ্রিয় চরিত্র। আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে মিকিকে ভীষণ ভালোবাসে।
বুঝেছি! তুমি বড় ধারালো দাঁতঅলা ভ্যাম্পায়ারদের দলের
না, না! ও কী কথা! মিকি মাউস একটা কার্টুন-চরিত্র। সিনেমা, টিভিতে খুব দেখায়।
সিনেমা, টিভি এ সব কী অদ্ভুত কথা শুনছি!
এ নির্ঘাৎ ডাইনিদের ভাষা!
ও একটা ডাইনি। ওকে ফাঁসি দাও!

১৬৯২ সালে জেসমিনের বিচার চলছে...
হ্যাঁ! এখন মানুষের মনের কথা বলতে কোনো বাধা নেই। যে কেউ স্বাধীন ভাবে তার ধর্মচর্চা করতে পারে।
এর পরেও কী কোনো সন্দেহ আছে যে এই অদ্ভুত পোশাক পরা, বিচিত্র সব কথা বলা মেয়েটা ডাইনি ছাড়া আর কিছু নয়!
তুমি বলছো, এখন তোমাদের ওখানে সব ধর্মের নারী-পুরুষ এক সঙ্গে বাস করছে। তাদের সমান অধিকার?
জেসমিনের বিচারসভা
এই বোকা মেয়ে, এটা তোমার শেষ সুযোগ, শীগগির বলো তুমি যা বলেছো তা সবই রূপকথার গল্প।
তা না হলে কিন্তু তোমার ফাঁসি হবে!
না, এরা সত্যি কথা শুনতে চায় না। মিথ্যেই বলি...
মাননীয় মহাশয়, আমি এতক্ষণ যা বললাম সবই রূপকথার গল্প।
এর বিরুদ্ধে ডাকিনীতন্ত্রের কোনো প্রমাণ নেই। তবে জনগণকে বিব্রত করার জন্যে ওকে শাস্তি পেতে হবে।
চারঘণ্টা ধরে প্রকাশ্যে তোমায় ফল ছুঁড়ে মারার শাস্তি দেওয়া হলো।
জেসমিন শাস্তি ভোগ করছে
কী অবিচার! এদের আমি ঘেন্না করি!
মনে হয় এই শাস্তি থেকে তুমি কিছু শিক্ষা পেয়েছো।
হ্যাঁ, তোমরা পিউরিটান... হাতের টিপ খুব ভালো।
মনের দরজা অবশ্য বন্ধ!
প্রহরী...ওকে ছেড়ে দাও!
এখন আমি বাড়ি ফিরে যাই কী করে!
ক্লার্কদের ঘরে ফিরে এল জেসমিন
এইটা সেই ফায়ারপ্লেস। সময়ের গোলাকধাঁধা এখানেই। বেরুবার পথটা খুঁজে বের করতেই হবে।
হ্যাঁ...হ্যাঁ...এই তো... আমি ফিরে যাচ্ছি!
জেসমিন কোথায় গিয়েছিলে তুমি?
এমন একটা জায়গায় যেখানে আমি আর কখনো যেতে চাই না!
(শেষ)

গণেশ দাদার আরেক কীর্তি

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গণেশ দাদা পেটটি নাদা
মাথাটি হাতির, উঁচিয়ে শির
আছেন থির, শান্ত বড় ধীর।

ছেলেবেলায় এমন ছড়া কাটে অনেকেই। কিন্তু জানে কজন, অমন ধীর যে গণেশ দাদা তিনিও রাগলে একেবারে দুর্বাসা। শক্তিতে তাঁর সঙ্গে পারে এমন কেউ নেই ত্রিভুবনে। দৈত্য-দানবই হোক আর দেবতাই হোক, গণেশের কাছে হার মানতে হয় সবাইকেই। শক্তিই বলো আর বুদ্ধিই বলো সব যেন জমা থাকে দাদার ওই নাদা পেটে।

ও, পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা! শোন তবে দাদার কিত্তিকাহিনী। কথাটা কি জানো, দাদাই হলেন সব শক্তির মূল। একদম প্রথম সেই দিনটাতে, যেদিন সৃষ্টি হয়েছিল এই পৃথিবী, এই গ্রহ-নক্ষত্রের, সেই দিনটাতেই চারিদিক গমগম করে উঠেছিল একটা আওয়াজে। চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছিল শুধুই একটা কথা ওঁম্। এই ওঁমই হলো গণেশ। এসব লেখা আছে পুরাণে।

ওসব পুরনো কথা থাক। বলি বরং গণেশ দাদার কথা। দাঁতাল হাতির মাথা, বিরাট ভুঁড়ি—এটা দাদার প্রথম থেকেই। সব সময় দাদা কিন্তু অমনভাবেই দেখা দেন না। তিনি পৃথিবীতে মাঝে মাঝেই আসেন অন্য নানা রূপে। এসে ঘটান নানা কাণ্ডকারখানা। শোনো তেমনই এক কাণ্ড, যাতে লণ্ডভণ্ড হয়েছিল এই ব্রহ্মাণ্ড।

কশ্যপ মুনির নাম তোমরা অনেকেই হয়তো জান। দৈত্য-দানব, মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, কীট-পতঙ্গ থেকে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন তিনি। এই কশ্যপ মুনিরই এক বউয়ের নাম অদিতি। তাঁর ছেলেরা হলো দেবতা।

সেদিন কশ্যপ মুনি পুজোয় বসবেন এমন সময় অদিতি তাঁর কাছে গিয়ে হাজির। তাঁকে দেখে কশ্যপ বলেন, কি ব্যাপার, রান্না ছেড়ে অসময়ে এখানে?

অদিতি বলেন, দেখ, মনটা আমার ভাল লাগছে না। সবসময় যেন মনে হচ্ছে কি একটা নেই।

সে কী কথা! ইন্দ্র, বরুণ, বায়ুর মতো সব বীর, বুদ্ধিমান ছেলে তোমার। সবাই তাদের পুজো করে। আর তাদের মা হয়ে মন তোমার ফাঁকা ফাঁকা লাগছে?

অদিতি বলেন, দেখ, সবই হয়েছে। ওরা মা বলে ডাকলেই মনটা ভরে যায়. একথাও ঠিক। তবুও মনে হয়, সর্বশক্তিমান যে গজানন, ওর মা হতে পারলে বেশ হতো। আমি ওই গণেশের মা হতে চাই।

কশ্যপ মুনি বলেন, তা চাইলেই তো হবে না। তার জন্য কঠিন তপস্যা করতে হবে তোমাকে। তৈরি করতে হবে নিজেকে।

আমি সব কষ্ট করতে রাজী। যত কঠিনই হোক সে তপস্যা, আমি করব। তুমি শুধু বলে দাও পথটা

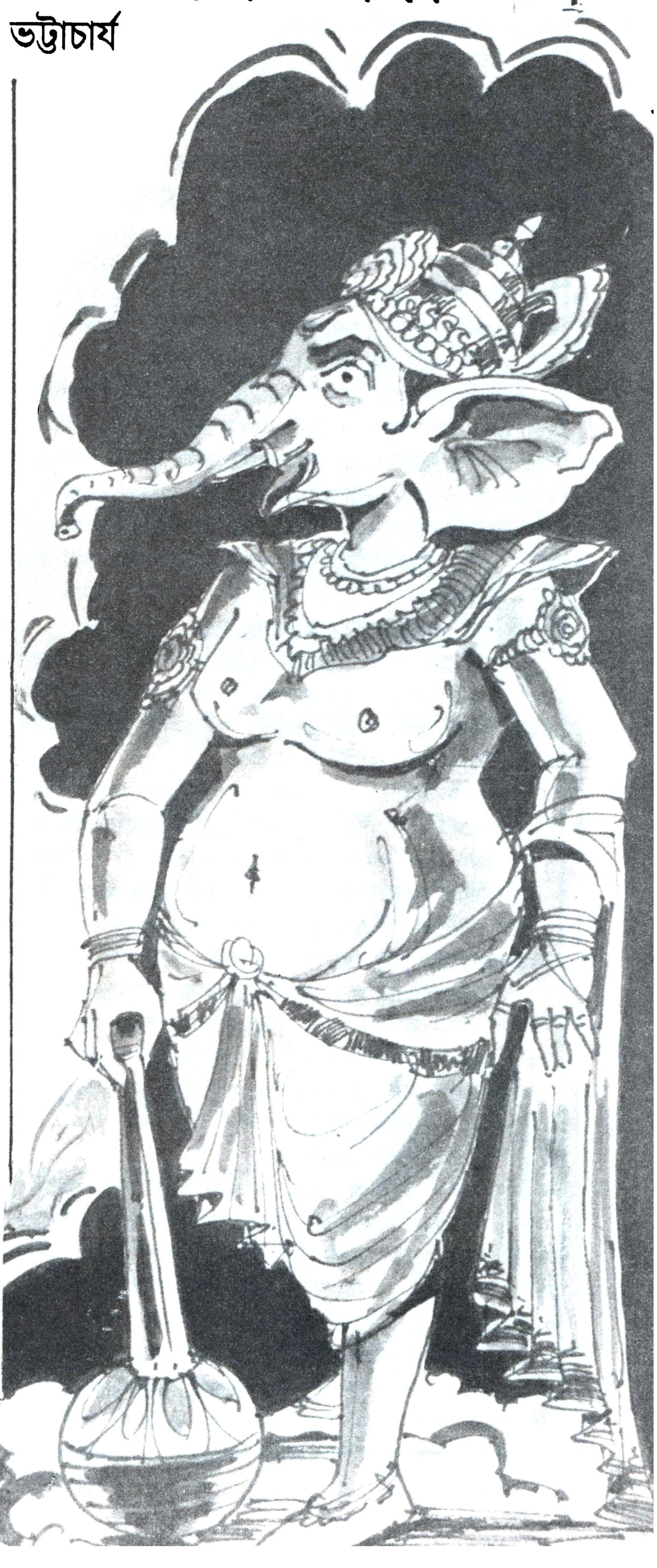

অদিতির তীব্র বাসনা দেখেই কশ্যপ বোঝেন, নিশ্চয়ই কোথাও একটা কিছু হয়েছে। তাই অদিতি এমন আকুল-ব্যাকুল। ব্যাপারটা জানতে কশ্যপ বসেন ধ্যানে। দেখেন, যা ভেবেছিলেন তাই। গণেশেরই এই পৃথিবীতে আসার ইচ্ছে হয়েছে। সেই ইচ্ছের বীজটা তিনি পুঁতে দিয়েছেন অদিতির মনে।

সব জানতে পেরে আর কথা বাড়ান না কশ্যপ। অদিতিকে তিনি বলে দেন কেমন করে করতে হবে তপস্যা। সেইমতো অদিতি শুরু করেন তপস্যা। বড় কঠিন। বড় কষ্টের। কিন্তু সব কিছু অগ্রাহ্য করে অদিতি রাতদিন শুধু ডেকে যান গণেশকে। সব সময় ভাবেন তাঁর কথা।

গণেশও তো এটাই চাইছিলেন। তাই অনেক অনেক দিন পরে গণেশ হাজির হলেন অদিতির সামনে। বললেন, আর তপস্যার দরকার নেই। কথা দিলাম, খুব শীগগির আমি তোমার ছেলে হয়ে জন্মাব। তবে এমন হাতির মাথা নিয়ে নয়।

এরই কিছুদিন পরে অদিতির একটি ছেলে হলো। সে ছেলের রূপে জগৎ যেন আলো ঝলমল। যেমন তাকে দেখতে, তেমনই শক্তি। ছেলের শক্তির বহর দেখে কশ্যপ তার নাম রাখেন মহোৎকট। মা অদিতি দিনরাত মেতে থাকেন মহোৎকটকে নিয়ে।

এদিকে আমাদের এই বাংলাদেশে আবার হয়েছে আরেক কাণ্ড। গঙ্গার তীরে কুটির বেঁধে থাকতেন এক ঋষি আর তাঁর বউ। রুদ্রকেতু আর সারদা। ঋষি ছিলেন ভারি ভালোমানুষ। ধার্মিক। সব সময় থাকতেন পুজোপাঠ নিয়ে।

রুদ্রকেতু আর সারদার ছিল দুটি ছেলে। দেবান্তক আর নরান্তক। তারা আবার বাবা, মা'র একবারে উল্টো। সবসময় একটা না একটা খারাপ কাজ করেই চলেছে। কাউকে মানে না। যাকে যা খুশি বলে দেয়। এইসব আর কী!

ছেলেদের হাবভাব দেখে ভাবনায় পড়েন রুদ্রকেতু। অনেক বুঝিয়ে তাদের বসান শিবের তপস্যায়। তেমন ইচ্ছে না থাকলেও বাবার কথায় তারা শিবের তপস্যা শুরু করে।

ভোলাবাবা শিবও তুষ্ট হয়ে বর দিলেন, যুদ্ধে অজেয় হবে তোমরা। সহজে মৃত্যু হবে না তোমাদের।

শিবের কাছে এই বর পেয়ে দু ভাই তো ধরাকে একবারে সরা জ্ঞান করতে থাকল। এমনিতেই দুর্দান্ত, শিবের বর পেয়ে ক্ষমতার লোভ জাঁকিয়ে বসল মনে। ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে। দেবতাদের হঠিয়ে দিয়ে দেবান্তক হলো স্বর্গের রাজা। আর পৃথিবী এবং পাতালের রাজা হলো নরান্তক।

রাজা হয়েই শুরু করল অত্যাচার। ভয়ে সবাই থাকত জুজু হয়ে। পৃথিবী কাঁপত থরথর করে।

কথায় বলে 'অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে'। দেবান্তক আর নরান্তকের দিনও ঘনিয়ে আসে। আসলে অনেক জানলেও তাদের বধ করতেই গজানন যে অদিতির ছেলে হয়েছেন এটাই জানত না তারা। জানত না বলেই সবাইকে অগ্রাহ্য করে— অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল তারা।

দেবান্তক আর নরান্তক অত্যাচারের যেন বান ডাকায়। ভেসে যায় ত্রিভুবন। ওদিকে কশ্যপ মুনির আশ্রমে মহোৎকট কিন্তু তখন পড়াশোনা আর তপস্যা নিয়ে ব্যস্ত। বাবার কথামতো সবকিছু করে মহোৎকট তখন সত্যিই উৎকট ক্ষমতার অধিকারী।

এমনই একটা সময় কশ্যপ মুনির আশ্রমে এলেন কাশীর রাজা। একটা যজ্ঞ করবেন তিনি। পুরোহিত হতে হবে কশ্যপকে।

সব শুনে কশ্যপ বলেন, সবই তো বুঝলুম। কিন্তু আমার পক্ষে তো এখন কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে না।

কেন?

একটা ব্রত নিয়েছি আমি। সত্যি কথা বলতে কি তপস্যায় যাবার জন্য বেরিয়েও পড়েছিলাম। এমন সময়ই আপনি এলেন।

কাশীর রাজা আকুলভাবে বলেন, তাহলে আমার যজ্ঞটা সেরে না হয় তপস্যায় যাবেন!

কশ্যপ হেসে বলেন, তা হয় না। সংকল্প যখন একবার করেছি, তখন তা ত্যাগ করতে পারি না কোনও মতে।

তাহলে?

তাহলে একটা কাজ করতে পারেন। আমার বদলে আমার ছেলে মহোৎকটকে নিয়ে যান। মাত্র ষোল বছর ওর বয়স। কিন্তু জানবেন, ও আমার চেয়েও জ্ঞানী। আমার চেয়েও তপস্বী।

কশ্যপ মুনির কথাই মেনে নেন কাশীরাজ। পুরোহিত হিসেবে বরণ করেন মহোৎকটকে। তাকে রথে চড়িয়ে মিছিল করে কাশীরাজ চলেন নিজের রাজ্যের দিকে।

পথে ঘটল এক অঘটন। আর সেটা দেখেই কাশীরাজের চোখ একবারে ছানাবড়া। ওইসঙ্গে মহোৎকটের ওপর তাঁর ভক্তিটাও গেল বেড়ে। বুঝলেন, কশ্যপ মুনি তাঁর ছেলে সম্পর্কে এতটুকু বাড়িয়ে বলেননি। সত্যিই মহোৎকট মহাশক্তির অধিকারী।

কাশীরাজদের যাওয়ার পথে পড়েছিল একটা বিরাট বন। হঠাৎই বনটা যেন আলোয় আলোয় ভরে গেল। মনে হলো একসঙ্গে যেন অনেকগুলো সূর্য উঠেছে। আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায় সবার। ভয়ও পেয়ে যায়।

রথে বসে মহোৎকট দেখল ওই আলো। সে কিন্তু সবার মতো ভয় পেল না। বরং রথ থেকে নেমে ছুটতে থাকে আলো যেখান থেকে আসছে ঠিক সেইখানে।

ঠিক সময়ই হাজির হয় মহোৎকট। আরেকটু দেরি হলেই যা হতো, তাতে ধ্বংস হয়ে যেত এই সৃষ্টিই। এক দানব, নাম তার ধূম্রাক্ষ। তপস্যায় তুষ্ট করে সূর্যের কাছ থেকে বর পাচ্ছিল সে। যে সে বর নয়, মহাস্ত্র। সেই অস্ত্রের জ্যোতিতেই ঝলমল করছিল চারিদিক। ভয়ঙ্কর এ অস্ত্র। যাতে ঠেকানো হবে ধ্বংস হবে তা।

সূর্য অস্ত্র দিচ্ছেন। হাত বাড়িয়ে দানব নিচ্ছে তা। এমন সময় প্রচণ্ড বেগে দানবকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে মহোৎকট সূর্যের হাত থেকে একরকম ছিনিয়ে নেয় অস্ত্র। আর কেউ বোঝার আগেই সে অস্ত্র ছোঁড়ে ধূম্রাক্ষের দিকে। মুহূর্তে দানব পুড়ে ছাই। পৃথিবী বেঁচে যায় ধ্বংসের হাত থেকে।

এতক্ষণ অবাক হয়ে সবকিছু দেখছিলেন কাশীরাজ আর তাঁর সৈন্যরা। সব দেখে তাঁদের ভক্তি আর ভরসা দুই-ই গেল বেড়ে। মহোৎকটকে নিয়ে মহাউৎসাহেই তাঁরা এলেন রাজধানী কাশীতে।

মহোৎকটের কীর্তির কথা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। রাজা থেকে শুরু করে সবাই হলো মহোৎকটের ভক্ত। তাকে না দেখে একটা

দিনও কাটাতে পারত না কেউ। মহোৎকটই হয়ে গেল সবার দেবতা, গুরু, কিংবা তার চেয়েও বেশি।

দেবান্তকদের গুপ্তচর ছড়ানো ছিল ত্রিভুবনের সর্ব জায়গায়। কাশীতেও। তারা গিয়ে দেবান্তক আর নরান্তককে জানায় সব। শুনেই জ্বলে ওঠে দুই ভাই। কী! সামান্য এক বামুনের ছেলের এত খাতির!

নরান্তকই বলে দাদাকে, তুমি ভেব না কিছু, আমি এখনই শায়েস্তা করে আসছি কাশীর রাজাকে আর সেইসঙ্গে ওই বামুনের বেটাকেও।

নরান্তক কাশী রাজ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই মহোৎকটের নেতৃত্বে কাশীরাজার সেনারাও দিল পাল্টা জবাব। মহোৎকট নিজে নরান্তককে মুহূর্তে দু' টুকরো করে দিল।

নরান্তক নিহত। খবরটা আসতেই রাগে আর দুঃখে যেন হাজারটা উনুন জ্বলে উঠল দেবান্তকের মাথায়। প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল সে। প্রতিশোধ নিতে সঙ্গে সঙ্গে পাঠাল বাছাই করা আট সেনাপতিকে।

বিধি বাম। সমস্ত সেনা সমেত আট সেনাপতিই মারা পড়ল মহোৎকটের হাতে।

দেবান্তক এবার নিজেই আসে লড়াই করতে। ভয়ঙ্কর সে লড়াই। অসুর-দৈত্য-দানব-দেবতা যে দেখে সেই ভয়ে কাঁপে। কেউ হারাতে পারছে না কাউকে। দুজনেই যেন সমান। মহোৎকট এবার তার স্বরূপ প্রকাশ করে। গণেশের মূর্তিতে লড়াই করতে থাকে সে।

সেই ঢুল ঢুলু করুণা মাখানো দুটি চোখ, সেই হাতির মাথা, ছুঁচলো দাঁত, নাদা পেট, সেই থপথপ করে চলা। গজানন মূর্তির দিকে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে যায় দেবান্তক। শুরু হয় আরও প্রচণ্ড লড়াই। একসময় গণেশের লম্বা দাঁত দুটোকে জাপটে ধরে দেবান্তক। গণেশও দেয় এক ঝটকা। মাটিতে পড়ে যায় দেবান্তক। কিন্তু এত জোরে সে চেপে ধরেছিল গণেশের দাঁত দুটো যে একটার মাথাটা ভেঙে থেকে যায় তার হাতেই।

তখনও মাটি থেকে উঠতে পারেনি দেবান্তক। গণেশ তার অন্য দাঁতটা দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবান্তককে। মাথাটাকেও দেয় গুঁড়িয়ে। মারা পড়ে দেবান্তক। ত্রিভুবন রক্ষা পায় তাদের অত্যাচার থেকে।

মহোৎকট ফিরে আসে কশ্যপ মুনির আশ্রমে। বাবা-মাকে বলে, যে কাজের জন্য আমার এবারের আসা তা শেষ হয়েছে। এবার তোমরা আমায় বিদায় দাও।

কত কাঁদলেন মা অদিতি। কিন্তু ধরে রাখতে পারলেন না মহোৎকটকে। বিদায় তাকে দিতেই হলো।

গণেশ আবার ফিরে গেলেন তাঁর জায়গায়। সেই ওঁমের মধ্যে। তবে যখনই দরকার পড়ে তখনই আবির্ভূত হন তিনি। নানা রূপে আসেন। ঘটান নানা কাণ্ড। আর তাই এত দেবতা থাকতেও গণেশই মানুষের সবচেয়ে কাছের। বিশেষ করে ছোটদের। আসলে গণেশ দাদার বয়স যাই হোক না কেন—তিনি চিরকালের শিশু। ছোটদের সঙ্গেই তাঁর সবচেয়ে ভাব। তাই না?

ছবি : অমিত চক্রবর্তী

শরৎ ডাকে

দিলীপ রায়

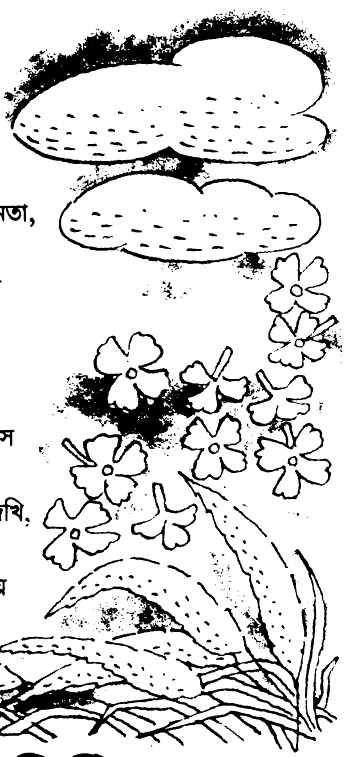

ভুলভুলাইয়া আকাশে
কেমনতরো গন্ধ যেন
ভেসে বেড়ায় বাতাসে।
খাবার নাকি—ঝাল নোনতা,
অচিন ফুলের গন্ধ?
শুঁকছি আমি নাক উঁচিয়ে
গন্ধটা নয় মন্দ।
জুঁই চামেলি শিউলি
চিনি ওদের গন্ধে
শরৎ ভোরে কিসের সুবাস
ফেলছে আমায় ধন্দে।
আকাশ-পাতাল ভেবে দেখি,
যা করেছি সন্দ
এ যে ভাই আর কিছু নয়
পুজো পুজো গন্ধ।

পুজোর চিঠি

শিবায়ন ঘোষ

জলবাতাসের মাসিপিসি
ফলবাতাসের মেসো,
এবার কিন্তু দুর্গোপুজোয়
আমাদের বাড়ি এসো

বনপলাশের কাকাকাকী
আর দিয়ো না পুজোয় ফাঁকি
সারাবছর মন-উসখুস
আমরা যে পথ তাকিয়ে থাকি

নীল আকাশের ছোটমামা
মেঘের জামা গায়ে
দাদুদিদার সঙ্গে এসো
এবার পাড়াগাঁয়ে

দূর প্রবাসের বন্ধু রে সব
ভোলা হরি কানাই কেশব
কত কথা যে জমে আছে
পুজোয় এলে বলবো সেসব

টিংকানাদিং টিংকানাদিং
ইরখুশি বীরখুশি
চার দেয়ালের মধ্যে এখন
মার দেয়ালে ঘুঁষি।

ছবি : সুফি

খুকুর কুকুর

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

টালিগঞ্জের ঘোষপাড়ায় শীতলা মন্দিরের কাছে এই ভাড়াটে বাড়িতে উঠে এসে মন্দ লাগছে না। আমরা দোতলায়, নিচে বাড়িওলার আত্মীয়রা থাকেন। বাড়িওলা বিজনবাবু পাশেই আলাদা বাড়ি করে আছেন। মানুষটি খুবই ভদ্র। বাড়ির সামনে একটা ছোট মাঠ, মাঠে দুটো ছোট হল ঘর। একটা আমাদের বাড়ির দিকে, অন্যটা ওধারে।

এখানে আগে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর মিউজিক ডিপার্টমেন্ট ছিল। আমাদের দিকের হলটায় স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী পঙ্কজ মল্লিক আর ওধারেরটায় ভারতবিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল বসতেন।

দেখে কষ্ট হয় এখন রাইচাঁদবাবুর ঘরে কোনো এক ডেকরেটারের ফার্নিচার থাকে, আর পঙ্কজবাবুর ঘরটায় পাড়ার ছেলেরা ক্লাব করেছে। মাঝে-মধ্যে বিয়ে, জন্মদিনে ভাড়াও দেয়। তখন মাঠটায় ম্যারাপ বাঁধা হয়। এমনিতে মাঠটাতে পাড়ার ছেলেরা ফুটবল-ক্রিকেট খেলে। দুর্গাপুজোর সময় ভারতমাতা পুজো হয়। কখনও কখনও রাত্রে ফাংশানও হয়। দোতলার বারান্দায় বসে পুরনো দিনের কত কথাই না মনে আসছে।

আমিও এককালে এই নিউ থিয়েটার্সের সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছিলাম। তখন এই মিউজিক ডিপার্টমেন্টের কত রমরমা। বড় বড় গায়ক-গায়িকা, মিউজিশিয়ানরা আসতেন। ঘরটা সব সময় জমজমাট থাকত। একবার ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ করিম খাঁ রাইবাবুর ঘরে বসে গান গেয়েছিলেন। সেই গান এখান থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও রিলে করে ব্রডকাস্ট করেছিল। রাস্তার লোক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সেই গান শুনেছিল। সমস্ত শীতলা তলাটা সেই গানের সুরের মূর্ছনায় মাত হয়ে গিয়েছিল। আর এখন? সকালবেলায় মাঠটার দিকে তাকিয়ে দেখি গরু চরছে। ওধারে ডেকরেটারের লোকজন কোনো ছবির শূটিং-এর জন্যে রাইচাঁদবাবুর ঘর থেকে আলমারি, সোফাসেট বার করে ঠেলায় তুলছে।

এমন সময় আমার ঘরের বাইরে থেকে ডাক এলো, মিস্টার মুখার্জী বাড়ি আছেন নাকি?

বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দেখি লম্বাটে চেহারার এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে সাদা চোস্ত পায়জামা আর হাঁটুর নিচে অবধি ঝোলা ছিটের পাঞ্জাবি। পায়ে কিন্তু দামী চপ্পল। চোখে চশমা, মুখে সিগারেট। আমাকে দেখে ভদ্রলোক সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে কথা বললেন, আমায় ঠিক চিনবেন না। আমি এ পাড়াতেই থাকি। আমার নাম নারায়ণ ঘটক। আপনার নাম শুনেছি, আলাপ করতে এলাম।

—আসুন আসুন, বলে ভেতরে নিয়ে এলাম। চা খেতে খেতে আলাপ আলোচনা করার সময় মনে হলো, ভদ্রলোক সাহিত্য, শিল্প, সিনেমা, রাজনীতি, সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল। নিজস্ব একটা মতও আছে। মাসখানেকের মধ্যে নারায়ণবাবুর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। পরে জানলাম ওঁরা এ পাড়ার তিন পুরুষের বাসিন্দা। নারায়ণবাবুর ডাকনাম ন্যাড়া। আমার বাড়ির

পেছনে ছোট্ট গলির ভেতর ওঁদের পুরনো আমলের বিরাট বাড়ি। ভদ্রলোকের একটা পুরনো মডেলের ফিয়েট গাড়িও আছে দেখলাম। তবে উনি কি করেন জানি না।

সেদিন রবিবার। ন্যাড়াবাবু এসেছেন। আমার এক পুরনো বন্ধু নির্মল এসেছে। সেও আমার সঙ্গে এই নিউ থিয়েটার্সেই এক সময় কাজ করত। একথা সেকথার পর নির্মল বললে, মনে আছে একবার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পঙ্কজদার ঘরে এসেছিলেন গান শুনতে।

কি গান? ন্যাড়াবাবু প্রশ্ন করেন। আমি বললাম, যতদূর মনে পড়ছে সেটা ১৯৪৫ সালের কথা। নেতাজীর জন্মদিন ঘটা করে পালন করা হবে। ব্রিগেড গ্রাউন্ডে। জওহরলাল নিজে উদ্যোগ নিয়ে করাচ্ছেন। পঙ্কজ মল্লিকের ওপর ভার পড়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই বিখ্যাত 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' গানটির সুর দেবার। সুভাষবাবুর ভাইঝিদের শিখিয়ে ঐ মিটিং-এ গাওয়ানো হবে। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর আর্ট ডিরেকটার সৌরেন সেন নেতাজীর বিশাল ছবি এবং কাট-আউট করছে। জওহরলাল সেগুলো দেখে পঙ্কজদার ঘরে এলেন, কদম কদম বাড়ায়ে যা গানটায় পঙ্কজদা কেমন সুর দিয়েছেন শুনতে। আপনি তো পাড়ার লোক, জানেন না এসব কথা?

ন্যাড়াবাবু বললেন, আমি তখন বালক। তাছাড়া সেই সময়ে আমি কার্শিয়াং-এ ডাউভিল স্কুলে পড়তাম। তা পণ্ডিত নেহরু গান শুনে কি বলেছিলেন?

খুব ভালো। পঙ্কজদা আরও কয়েকটা গান শুনিয়েছিলেন।

নির্মল পঙ্কজবাবুর ঘরের পাশের কাঁঠাল গাছটা দেখিয়ে বললে, পণ্ডিত নেহরু গান শুনে পঙ্কজদার ঘর থেকে বেরিয়ে এই কাঁঠাল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে পঙ্কজদাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সারে যাঁহাসে আচ্ছা' আর 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' কোনটি আগে লেখা? পঙ্কজদা উত্তর দিয়েছিলেন, ধনধান্যে অনেক আগে লেখা। জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, ধনধান্যে আগেও শুনেছি—তবে তোমার কণ্ঠে যেন নতুন করে আরও ভালো লেগে গেল।

আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছে এমন সময় বাড়ির বাইরে 'গেল গেল' চিৎকার, সেই সঙ্গে একটা কুকুরের কেঁউ কেঁউ করে আর্তনাদ। আমরা বারান্দায় বেরিয়ে দেখি একটা ট্যাক্সি রাস্তার একটা কুকুরকে চাপা দিয়ে চলে গেছে। দু' একটা লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। আমার মেয়ে খুকুও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে আতঙ্কিত হয়ে বলে, বাবা পাটালিকে চাপা দিয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

পাটালি কে? ন্যাড়াবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

আমি হেসে বললাম, কুকুরটার গায়ের রং অনেকটা পাটালি গুড়ের মতন তাই আমি ওর নাম দিয়েছি পাটালি। এখানেই জন্ম। কয়েক বছর আগে মা'টা মারা গেছে। ঐ শীতলা মন্দিরের আশেপাশে কোথাও থাকে।

দোতলার বারান্দা থেকে দেখলাম, আমার কিশোরী কন্যা পাটালির দিকে ছুটে যাচ্ছে। একটু পরে সবিস্ময়ে দেখি খুকু পাটালিকে কোলে করে বাড়ির দিকে আসছে। আমরাও নেমে গেলাম। পাটালির সামনের ডান পায়ের ওপর দিয়ে চাকা চলে গেছে। খুকু বললে, এক্ষুণি ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে চলো।

পেছন থেকে ন্যাড়াবাবু মন্তব্য করলেন, ওকে ভেটেরিন্যারি ডাক্তার দেখাতে হবে। এ পাড়ায় সে রকম ডাক্তার নেই।

খুকু বললে, আমাদের ডাক্তারবাবুর কাছেই নিয়ে চলো।

আমার বাড়ির ডাক্তার অমর ব্যানার্জী একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ। বয়স হয়েছে। সর্বদাই রুক্ষ ভাব। ভিজিটের টাকা বার বার বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে ঘষে ঘষে দেখে নেন। রুগী ওঁর নির্দেশ মতন না চললে দ্বিতীয়বার দেখেন না। তবে চিকিৎসা করেন ভালো। সকাল দশটায় এসে চেম্বারে বসেন। যান রাত্রি আটটার পর।

নিঝুম দুপুর। কোনো পেশেন্ট নেই। ডাক্তার ব্যানার্জী তখন একমনে গল্পের বই পড়ছেন। আমার সঙ্গে বইয়ের সূত্র ধরে ঘনিষ্ঠতা। খুকু হওয়ার পর ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও নিবিড় হয়ে উঠল। সে এক ইতিহাস। ওঁর একমাত্র কন্যা মাত্র কুড়ি বছর বয়সে যেদিন মারা যায়, সেদিনই খুকুর জন্ম। শ্মশানে পাড়ার একটি লোকের কাছে শুনলেন আমার মেয়ে হয়েছে। সৎকার শেষ করে আমার মেয়েকে নার্সিংহোমে দেখতে এলেন। আমরা জানিও না ওঁর মেয়ে গত হয়েছে। উনিও কিছু বললেন না। আমার একদিনের মেয়েকে সস্নেহে হাসিমুখে দেখে, নার্সিংহোমের ডাক্তার ও নার্সকে কন্যা ও তার মায়ের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে চলে গেলেন। ওঁর নার্সিংহোমে আসাটা আমাদের খুব অবাক করেছিল। পরে সব জানলাম। কল দিলে, বাড়ির অন্য সবাই-এর বেলায় ফিজটা গুনে গুনে নেন। কিন্তু খুকুর অসুখ হলে তখুনি ছুটে চলে আসেন। ফিজ নেন না। একদিন আমি জোর করে দিতে গেছিলাম, উনি আমার হাত দুটো ধরে মিনতি করে বললেন, প্লিজ। দেখলাম ওঁর চোখ দুটো ছল ছল করছে। আমরা তাঁকে আপনি বলি। খুকু কিন্তু তুমিই বলে। ডাক্তারবাবু হাসেন।

আমরা আহত কুকুরটাকে নিয়ে যেতেই, আমি কি পশুর ডাক্তার? বলে ডাক্তার ব্যানার্জী ক্ষেপে উঠলেন। খুকুও গলা চড়িয়ে বললে, ওসব জানি না। মানুষের পা ভাঙলে যা করো একেও তাই করে দাও।

ডাঃ ব্যানার্জীর রাগ নিমেষে উধাও। হাঁক দেন, পাণ্ডে।

কম্পাউন্ডিং রুমের পর্দা সরিয়ে কম্পাউন্ডার বেরিয়ে আসেন। ডাঃ ব্যানার্জী কি একটা ইনজেকশনের নাম করেন, পাণ্ডে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলেন। ডাঃ ব্যানার্জী পাটালির ভাঙা পায়ের দাবনায় ইনজেকশনটা দিয়ে দুটো প্যাকিং কাঠের তক্তা ওর পায়ের সাইজ মতো কেটে লাগিয়ে দিয়ে বেঁধে দিলেন। বললেন, ঠিক ঠিক জোড়া লাগবে না, তবে হাঁটাচলা করতে পারবে।

খুকু জিজ্ঞেস করে, কত দিতে হবে?

ডাক্তারবাবু হেসে বলেন, তোর কুকুরের জন্যে আর কি ফিজ নেব রে?

আমি বললাম, ইনজেকশনের দামটা অন্তত নিন।

ডাক্তারবাবু বললেন, ওটা পাণ্ডেকে দিয়ে দেবেন। তারপর কতকগুলো ট্যাবলেট খুকুর হাতে দিয়ে বলেন, দিনে দুবার করে খাওয়াবি। সাবধানে খাওয়াবি, কামড়ে দিলে আবার তোকে ইনজেকশন দিতে হবে।

পাটালিকে এনে সিঁড়ির নিচে একটা চট বিছিয়ে খুকু থাকার ব্যবস্থা করল। নিচে যাঁরা থাকেন তাঁরা আপত্তি করলে সঙ্গে সঙ্গে খুকু আর খুকুর মায়ের সঙ্গে তাঁদের লেগে গেল ঝগড়া। পাটালি বেচারী অপরাধীর মতন সভয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। শেষে বাড়িওলা বিজনবাবু এসে খুকুর দিকে রায় দিলেন।

খুকু রাতদিন ওর সেবা করতে লাগল। খুকুর মাও পাটালিকে দুধ রুটি এনে দিত। কয়েকদিন পর ন্যাড়াবাবু এসে হাসতে হাসতে বললেন, আকুল হয়েছে সকলের মন। খুকুর কুকুর আছে কেমন? খুকু গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, ভালো।

বাবা কোথায়?

স্নান করছেন। বসুন।

খুকু চলে গেল! আমি স্নান সেরে এসে ওঁর সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ নিয়ে আলোচনায় মেতে গেলাম। একথা সেকথার পর ন্যাড়াবাবু আস্তে আস্তে বললেন, শ' পাঁচেক টাকা দিতে পারেন মিঃ মুখার্জী, নেকস্ট উইকে দিয়ে দেব।

—নিশ্চয়ই। আমি উঠে ভেতরের ঘরে গিয়ে খুকুর মায়ের কাছ থেকে পাঁচশ টাকা এনে ন্যাড়াবাবুর হাতে দিলাম।

এক সপ্তাহের মধ্যেই পাটালি উঠে দাঁড়িয়ে লেংচে লেংচে হাঁটতে লাগল। অবশ্য খুকু ডাঃ ব্যানার্জীকে এনে দুবার ভালো করে দেখিয়েছে।

আরও কয়েক দিন পর 'খুকুর কুকুর দেখছি বেশ ভালো হয়ে গেছে'— বলতে বলতে ন্যাড়াবাবু ঢুকলেন। আমার হাতে পাঁচশ টাকা ফেরত দিয়ে বললেন, মেনি থ্যাঙ্কস। আজকে চা খাব না তাড়াতাড়ি আছে।

মাসখানেকের মধ্যে পাটালি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেল। ডাঃ ব্যানার্জী ঠিকই বলেছিলেন, ডান পাটা আগের মতো হলো না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। এখন সে আমার বাড়ির একজন হয়ে গেছে। খুকু বা খুকুর মা ওকে দু'বেলা খেতে দেয়। দোতলার সিঁড়ির মুখে সামনের দুটো থাবার ওপর চিবুক রেখে অপেক্ষা করে পাটালি। খাবার নিয়ে এলে উঠে ল্যাজ নাড়ে। চোখের দৃষ্টিতে যেন কৃতজ্ঞতা উপচে পড়ে।

এক একটা মানুষ কেন এমন হৃদয়হীন হয় বুঝতে পারি না। পাটালি ভালো হয়ে যাবার পর নিচে যাঁরা আছেন, তাঁরা আর সিঁড়ির তলায় ওকে থাকতে দিলেন না। অথচ রাত্রে পাটালি পুরো বাড়িটা পাহারা দিত।

পাহারা না হাতি! অকারণ ঘেউ ঘেউ চিৎকার করে ঘুমের দফা নিকেশ করে দিচ্ছে—নিচের তলার ফরেন ফেরতা ভদ্রলোক মন্তব্য করেন।

একদিন কনকনে ঠাণ্ডা। রাতের বেলায় ভদ্রলোক লাঠি মেরে সিঁড়ির তলা থেকে পাটালিকে বার করে দিলেন। পাটালির কেঁউ কেঁউ চিৎকারে খুকু নিচে নেমে গিয়ে প্রতিবাদ করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওঁরা পাটালিকে বার করে দিলেন। রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে দেখি খুকু কাঁদছে। শেষে আমি একটা ছেঁড়া কম্বল নিয়ে পাশের ভাঙা গ্যারেজে পাটালির থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম।

দিনের বেলায় পাটালি শীতলাতলার পাশে বসে থাকে। সাদা ও কালো রঙের আরও দুটো কুকুর থাকে সেখানে। খুকুকে আসতে দেখলেই পাটালি ছুটে এসে খুকুর হাঁটুর ওপর দুটো পা তুলে দাঁড়াবে। জোরে জোরে ল্যাজ নাড়বে আর মুখটা হাঁ করে চোখ কুঁচকে তাকাবে। দেখে মনে হয় পাটালি সত্যিই বুঝি হাসছে। খুকু আদর করে ওর মাথায় বেশ কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিলে তবেই হাঁটু থেকে পা দুটো নামাবে। তারপর খুকুর পিছু পিছু বাড়ি পর্যন্ত আসবে। একদিন এই দৃশ্য দেখে ন্যাড়াবাবু হাসতে হাসতে মন্তব্য করেন, খুকু তুমি ফিল্ম ডাইরেকটারের মেয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা রাস্তার নেড়ি কুত্তা পুষলে। কোথায় অ্যালসেশিয়ান, পুডল্ কিংবা বুলডগ পুষবে! তা তোমার বাবা কেমন আছেন?

খুকু গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়, জানি না। পাটালিও ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ন্যাড়াবাবুর মন্তব্যে ওর বোধহয় আত্মসম্মানে লেগেছে।

আমি তখন বাড়িতেই ছিলাম। ন্যাড়াবাবু এসে একটি রঙিন কার্ড দিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? ন্যাড়াবাবু বললেন, কাল আমার বড় মেয়ের বার্থ ডে। আপনার খুকুকে নিয়ে যাবেন।

তার পরদিন আমি ও খুকু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা' আর রবীন্দ্রনাথের 'গল্পস্বল্প' কিনে তাতে ন্যাড়াবাবুর বড় মেয়ে গুড়িয়ার নাম লিখে নিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি ন্যাড়াবাবু বাইরের ঘরটি বেশ লাল নীল হলুদ বেগুনে কাগজ দিয়ে সাজিয়েছেন। মেয়ে গুড়িয়া খুকুরই বয়সী। খুব দামী একটা ফ্রক পরেছে। চুল বব করে কাটা। খুকুর হাত থেকে বই দুটো নিয়ে, 'মেনি থ্যাঙ্কস' বলে পাশের টেবিলে রাখে। সেখানে আরও নানা ধরনের প্রেজেন্টেশন রয়েছে। ন্যাড়াবাবু খুব খাতির করে বসালেন। তাঁর ছোট মেয়ে টুম্পার বয়স সাত-আট। কিন্তু চোখে-মুখে কথা। খুকুর দেওয়া বইয়ের প্যাকেটটা খুলে বইদুটো দেখে বলে, এ মা বাংলা বই!

খুকু অবাক হয়ে বলে, কেন?

গুড়িয়া বলল, আমরা বাংলা ভালো পড়তে পারি না। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ি কিনা। তুমি কোথায় পড়?

খুকু উত্তর দেয়, নৃপেন্দ্রনাথ গার্লস হাই স্কুলে।

ও আই সি। গুড়িয়া অকারণে লাল লিপস্টিক দেওয়া ঠোঁট চেপে হাসল।

খুকু জিজ্ঞেস করে, তোমাদের স্কুলে বাংলা পড়ানো হয় না?

হ্যাঁ, ঠিক তোমাদের স্কুলের ইংলিশের মতন।

ইতিমধ্যে আরও অনেক নিমন্ত্রিতরা এসে গেছে। ওদের মধ্যে একটি বেশ মিশুকে মেয়ে খুকুকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কোন ক্লাসে পড়ছ?

খুকু বলে, এবার হায়ার সেকেন্ডারি দেব।

সো আরলি!

খুকু একটা জিনিস লক্ষ্য করল, গুড়িয়া তার বান্ধবীদের সঙ্গে সর্বদা ইংরিজিতে কথাবার্তা বলছে।

মোমবাতি জ্বেলে বার্থ ডে কেক কাটল গুড়িয়া। সবাই গাইল হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ। গুড়িয়ার মা একটা কেকের টুকরো গুড়িয়াকে খাইয়ে দিলেন। সবাই হাততালি দিল। ন্যাড়াবাবু একটা কেকের টুকরো চিবুতে চিবুতে খুকুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বার্থ ডে কবে?

খুকু বলে, চব্বিশে কার্তিক।

ইংরিজি ডেটটা বল। ওসব বাংলা তারিখের হিসেব আমরা রাখি না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন তো আমরা ২৫শে বৈশাখটাই জানি।

ও আলাদা ব্যাপার।

আমার জন্মদিন ১০ই নভেম্বর। কিন্তু আমাদের ওসব জন্মদিন-টন্মদিন হয় না।

হোয়াট আ সারপ্রাইজ ড্যাড! গুড়িয়া ন্যাড়াবাবুকে বলে, খুকুরা বার্থ ডে সেলিব্রেট করে না।

আমি বলি, ঠিক করি না বললে ভুল হয়। আমার ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে ওর মা পায়েস করেন আর পাঁচরকম ভাজা হয়। এই নিয়ে তো খুকুর ছোটবেলায় ভারি একটা দুশ্চিন্তা ছিল।

কি রকম? সবাই কৌতূহল প্রকাশ করে।

আমি বলি, প্রতি বছর ২৩শে জানুয়ারি খুকু ওর মাকে প্রশ্ন করত, মা নেতাজীকে আজ পায়েস রান্না করে কে খাওয়াবে? জন্মদিনে তো পায়েস খেতে হয়। সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। খুকু লজ্জা পায়।

আগেই বলেছি, পাটালি আমাদের বাড়ির একজন হয়ে গেছে। খুকু যখন স্কুলে যায়, তার সঙ্গে কিছুটা পথ সে যাবে। খুকুর স্কুল কাছেই, চণ্ডী ঘোষ রোডে। শীতলা মন্দিরের পাশে পুরনো শিব মন্দিরের গা ঘেঁষে ছোট একটা গলি ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক খেয়ে চণ্ডী ঘোষ রোডে পড়েছে। খুকু প্রতিদিন এই গলি দিয়ে শর্টকাট করে স্কুলে যায়। পাটালি ওর পিছু পিছু এই গলিটা ডাইনে বেঁকে আবার যেখানে বাঁদিকে বেঁকেছে, সেই পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। ওখান থেকে চণ্ডী ঘোষ রোড দেখা যায়। কিন্তু ওই দিকটা অন্য কুকুরদের এলাকা। সেখানে গেলেই তারা তেড়ে আসবে। ঐ গলির বাঁদিকের বাঁক থেকে চণ্ডী ঘোষ রোডের মোড় পর্যন্ত নো ম্যানস ল্যান্ড বা নো ডগস জোন। পাটালি বাঁদিকের বাঁকে চুপ করে বসে থাকবে যতক্ষণ না খুকু চণ্ডী ঘোষ রোডে পড়ে বাঁয়ে ঘুরে স্কুলের দিকে চলে যায়। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার—ঠিক পৌনে চারটে থেকে আবার ও ওই বাঁকটার কাছে এসে চুপ করে থাবার ওপর মুখ দিয়ে বসে থাকবে। ছুটির পর খুকু আবার চণ্ডী ঘোষ রোড ধরে এগিয়ে এলেই পাটালি ওর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে। তার যে কী আনন্দ তখন না দেখলে বোঝা যায় না। অনেক আদর-টাদরের পর খুকুর পিছু পিছু এসে তাকে বাড়ির দোতলার সিঁড়িতে উঠিয়ে কর্তব্য শেষ করে আবার শীতলাতলায় ফিরে যাবে। খুকু কোনো কোনো দিন তার টিফিনের বাক্স থেকে খানিকটা কেক বা আধখানা পরোটা পাটালিকে দেয়।

আচ্ছা বলুন তো, পাটালি কি করে রোজ ঠিক চারটে বাজার আগে ওখানে গিয়ে বসে থাকে? ন্যাড়াবাবুকে জিজ্ঞেস করি। ন্যাড়াবাবু রসিকতা করে বলেন, বোধহয় ওর হাতে অদৃশ্য রিস্টওয়াচ আছে। তারপর এটা-সেটা কথার পর ন্যাড়াবাবু আবার বলেন, মুখার্জীবাবু, আমায় হাজার খানেক টাকা দিতে পারেন, কয়েকদিনের

তুমি কোথায় পড়?

মধ্যেই দিয়ে দেব।

খুকুর মা ছিল না, আমি ঘরের ভেতর গিয়ে আলমারি খুলে হাজার টাকা এনে দিলাম। 'মেনি থ্যাঙ্কস' বলে ন্যাড়াবাবু টাকাটা নিয়ে চলে গেলেন।

সোয়া চারটে বেজে গেছে, গলির বাঁকে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছে পাটালি। খুকু এখনো আসছে না। একটু এগিয়ে গেল। আবার পিছিয়ে এলো। সাড়ে চারটে নাগাদ খুকুকে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা গেল। একজন বন্ধু সোজা চণ্ডী ঘোষ রোড ধরে কুঁদঘাটের দিকে যাবে, খুকু তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে বোধহয় ক্লাসের কোনো পড়া নিয়ে আলোচনা করছে তাই দেরি হচ্ছে আসতে। পাটালির আর তর সইল না, সে ছুটে চলে যায় খুকুর কাছে। চণ্ডীতলার একটা কালো-সাদা বড় কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এলো। এন. টি. স্টুডিওর গেটের কাছ থেকে এক পাঁশুটে রঙের বেঁটে কুকুর তাকে সমর্থন করতে ছুটে গেল। পাটালি ল্যাজ গুটিয়ে খুকুর পায়ের তলায় কুঁকড়ে ঢুকে পড়ে। খুকু মহাবিপদে পড়ল। সে কুকুর দুটোকে হ্যাট হ্যাট করে তাড়াবার চেষ্টা করে। কাণ্ড দেখে বান্ধবীরা ঠাট্টা জুড়ে দেয়, খুকু তোর বাহন তো খুব সাহসী। পাশেই রিকশাস্ট্যান্ড। একটা রিকশাওয়ালা এসে কুকুর দুটোকে তাড়িয়ে পাটালিকে রক্ষা করে। খুকু পাটালির কান ধরে বকতে বকতে বাড়ি নিয়ে এসে বলে, আবার কখনো চণ্ডীতলায় যাবি? পাটালি খোঁচা খোঁচা কান দুটো কুঁচকে যেন লজ্জায় মাথা হেঁট করে ল্যাজ নাড়তে থাকে।

দিন যায়। আমাদের এই পাড়ার করুণাময়ীর ওধারে কোনাকুনি সি. এম. ডি. এ. নতুন ব্রিজ আর চওড়া রাস্তা করছে, যার দরুন আমাদের পুরনো বাড়ি ভেঙে দেবে। সেখান থেকে আর একটু এগিয়ে আমাদের জায়গা দিয়েছে। সেখানে আমরা নতুন বাড়ি করেছি। বাড়িটা শেষ হয়ে এসেছে। ন্যাড়াবাবু প্রায়ই আসেন। ঐ হাজার টাকা এখনো দেননি। বোধহয় আটকে গেছে। আমাদের

মতো মধ্যবিত্তদের টাকা ইলেকট্রিক কারেন্টের মতন জমানো যায় না। আসে যায়। সুপুরি গাছে শেষ তিন হাত উঁচুতে ওঠার মতো। বাড়ি করার শেষের দিকে আর্থিক অবস্থা কাহিল। একদিন আকারে ইঙ্গিতে বললাম। ন্যাড়াবাবু 'দেখছি' বলে চলে গেলেন।

এদিকে আমরা যে বাড়িটায় ভাড়া আছি উপস্থিত সে বাড়িতে খুব জলকষ্ট। পাইপ ফেটে গেছে। অনেক বলে কয়ে পাইপ ঠিক হলো কিন্তু জল সুতোর মতন আসতে লাগল, উড়ে ভারীর দ্বারস্থ হতে হলো। মাসে হাজার থেকে দেড় হাজার টাকার জল কিনতে হচ্ছে। ইলেকট্রিক কারেন্ট নিচের সঙ্গে এক মিটার। সেখানে প্রতি মাসে হাজারের ওপর দিতে হয়। সুতরাং নতুন বাড়িতে তাড়াতাড়ি উঠে যাবার চেষ্টা করছি।

অবশেষে সেই শুভদিন এসে গেল। যেদিন নতুন বাড়িতে উঠে যাচ্ছি, পাটালিও আমাদের সঙ্গে এলো। কিন্তু নতুন পাড়ার বলিষ্ঠ দুটো সাদা আর লালচে কুকুর তেড়ে এলো বাঘের মতো। পাটালি এ-গলি ও-গলি ছুটে শেষ পর্যন্ত শীতলাতলায় এসে হাঁফ ছাড়ল।

খুকুর খুব দুঃখ। সে আমায় বলল, বাবা, পাটালিকে এ-বাড়িতে এনে বেঁধে রাখলে হয় না?

আমার ছেলে বুড়ো বলল, ওরা রাস্তার কুকুর, বেঁধে রাখলে চিৎকার করবে। তবুও খুকু চেষ্টার ত্রুটি করেনি, কিন্তু বিফল হলো।

খুকু যতদিন নৃপেন্দ্রনাথ স্কুলে পড়ত, যাওয়া-আসার সময় দেখা হতো। খুকুকে দেখলে পাটালি আনন্দে দিশেহারা হয়ে যেত। তারপর খুকু যখন নতুন বাড়ির দিকে চলে যেত, তার পিছু পিছু কিছুটা গিয়ে, বর্ডার লাইনে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্রের 'ভুলো'র মতো উদাস চোখে খুকুর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতো। মনে হতো ওর চোখ দুটো ছলছল করছে। খুকুরও দু'চোখ জলে ভরে যেত। দু'একবার আমিও ওই শীতলাতলায় গেছি। পাটালি আমার কাছেও ওইভাবে ছুটে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। ন্যাড়াবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন? ন্যাড়াবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, এই চলে যাচ্ছে। বলে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে গেলেন।

দেখতে দেখতে দু'বছর হয়ে গেল। আমরাও নতুন পাড়ায় বেশ মানিয়ে নিয়েছি, খুকুও কলেজে ভরতি হয়েছে। সে ট্রামে করে বাসন্তী দেবী কলেজে যায়। হঠাৎ সেদিন আমার আগের বাড়িওলা এসে তাঁর ছেলের বিয়েতে আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। ঐ নিউ থিয়েটার্সের মিউজিক ডিপার্টমেন্টের মাঠে বিয়ের প্যান্ডেল হয়েছে। এলাহি ব্যাপার করেছেন বিজনবাবু। নহবত বসেছে। সারা প্রাঙ্গণটা নীলচে আলোয় ভেসে যাচ্ছে। ঢুকেই বাঁদিকে কফির ব্যবস্থা। তার আগে একটা পান, সিগ্রেটের স্টল। ডানদিকের ওধারে বুফে। সামনে ঢাকা দেওয়া জায়গাটায় টেবিল-চেয়ারে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা। পঙ্কজ মল্লিকের ঘরে নববধূ ফুলে-মালায় সাজানো সিংহাসনে বসে। ভিডিওতে ছবি তোলা হচ্ছে। ক্যামেরার ফ্লাশগুলো চমকে চমকে জ্বলে উঠছে। বাতাসে লুচি, ফিশফ্রাই ভাজার গন্ধ।

গেটে ঢুকে আমি, খুকু, খুকুর মা এধার-ওধার তাকাচ্ছি, হঠাৎ দেখি কাছেই একটা ইঁট দিয়ে ঘেরা ডাস্টবিনে বালতি করে নিমন্ত্রিতদের খাওয়া খাবারের উচ্ছিষ্টগুলো ফেলে দিচ্ছে। সেখানে পাটালি অনেকগুলো কুকুরের সঙ্গে খাবারের দখল নিয়ে কামড়া-কামড়ি ঝগড়া জুড়েছে। খুকুও দৃশ্যটা দেখেছে। খুকুর মা বলল, আহা, পাটালিটা বড্ড রোগা হয়ে গেছে।

পাটালি মাংস সমেত একটা বড় মুরগির ঠ্যাং পেয়েছিল। সেটা মুখে করে অন্যদিকে যাচ্ছিল খাবে বলে। হঠাৎ আমাদের দেখে সেটা ফেলে দিয়ে খুকুর কাছে ছুটে এসে তার হাঁটুর ওপর দু'পা তুলে দিল। ওর তখন কী আনন্দ! আমি বললাম, খুকু তোর পোশাক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 'যাক' বলে খুকু ঐ মাঠেই বসে পড়ে পাটালির গায়-মাথায় হাত বোলাতে লাগল। পাটালি খুকুর সাজগোজ করা মুখখানা চেটে দিল। খুকুর ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরা তিনজনেই ওর মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

হঠাৎ পেছন দিক থেকে কে বলে উঠলো, বাঃ! ঘুরে দেখি ডাঃ ব্যানার্জী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্যামেরা হাতে একটি ছেলেকে ডেকে ডাক্তারবাবু বললেন, এদের একটা ছবি তোল। ছেলেটি চট করে ক্যামেরার শাটার টিপল।

বাড়িওলা বিজনবাবু আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে অভ্যর্থনা করলেন। খুকু অনুরোধ করল, মেসোমশাই, আমাদের যখন খেতে ডাকবেন তখন কিন্তু পাটালিকে আলাদা করে এক ডিশ খাবার দিতে হবে। বিজনবাবু বললেন, নিশ্চয়ই। বলেই সিল্কের পাঞ্জাবি ও ধুতি পরা স্বয়ং পাত্রকেই হুকুম করলেন, খুকুর পাটালির জন্য এক ডিশ বিরিয়ানি ও মাংসের ব্যবস্থা করো।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে ন্যাড়াবাবু সপরিবারে এসে হাজির। ন্যাড়াবাবুকে প্রথমে আমি চিনতে পারিনি। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছেন। বিজনবাবুকে বললেন, ভেরি গুড অ্যারেঞ্জমেন্ট।

বিজনবাবু সবিনয়ে উত্তর দিলেন, কি আর এমন করেছি! তা, এই ব্যাচে বসবেন না কফি খাবেন? ন্যাড়াবাবু বললেন, দেখি—

এমন সময় পাত্র বড় একটা বাক্স খুকুর হাতে দিয়ে বললে, তোর পাটালিকে খাওয়া। খুকু বাক্সটা নিয়ে পাটালির মুখের সামনে ধরে। ন্যাড়াবাবু 'নুইসেন্স', ওনার স্ত্রী 'আদিখ্যেতা', মেয়ে 'ন্যাস্টি' বলে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল। ন্যাড়াবাবু আমায় চিনতেও পারলেন না। আমি অবাক হয়ে ডাক্তারবাবু আর বিজনবাবুকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা, ন্যাড়াবাবু আমার সঙ্গে কেন কথা বললেন না বলুন তো?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, আপনি কি ওঁকে টাকা ধার দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, বছর দুয়েক আগে এক হাজার টাকা দিয়েছিলাম।

ফেরৎ দেননি?

না।

সেইজন্যে দেখলেন না আমার সঙ্গেও কথা বললেন না। আমিও ওষুধের দাম বাবদ প্রায় সাত-আটশ টাকা পাই।

খুকুর পাটালিকে মাংস-বিরিয়ানি খাওয়ানো দেখে হেসে বললেন, মোর আই সি ম্যান, মোর আই লাভ মাই ডগ।

ছবি : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

নীলার আংটি

সঙ্কর্ষণ রায়

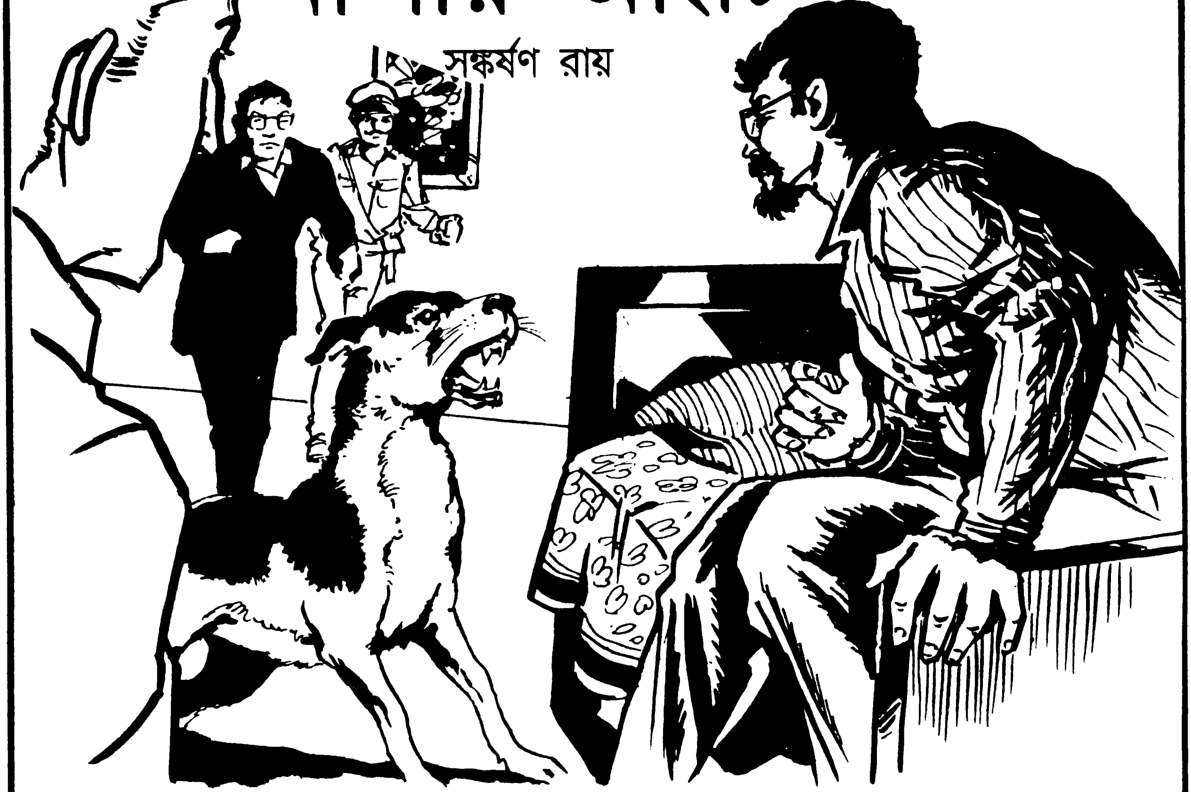

লোকটাকে অফিসে যাওয়ার পথে রোজই দেখতাম। যাদুঘরের পেছনে লাল বাড়িতে জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সদর দপ্তরে আমার অফিস। যাদুঘরের সামনে চৌরঙ্গি রোড, উত্তর দিকে সদর স্ট্রিট চৌরঙ্গি থেকে বেরিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে চলে গিয়েছে। সদর স্ট্রিটের ওপরে যাদুঘরের অফিস এবং আমাদের অফিসের প্রবেশপথ। এই প্রবেশপথের লোহার গেটের বাইরে ফুটপাথের ওপরে লোকটি তার পোষা কুকুরকে নিয়ে থাকত। চটের স্তূপের ওপরে তার ও তার কুকুরের ছেঁড়া ময়লা বিছানা, বিছানার পাশে দুটি ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের থালা ও গেলাশের পাশ কাটিয়ে যেতাম রোজ।

শাম্মিকে নিয়ে এই আমার সংসার, লোকটি একদিন আমাকে বললে। শাম্মি ও আমি দুজনে এখানেই থাকি। শাম্মি ছাড়া এ দুনিয়ায় কেউ নেই আমার।

রান্না-বান্না করতে তো দেখি না তোমাকে, আমি বললাম। খাও কি?

সাহেব-বাড়ির খাবার। সামনের ঐ তিনতলা বাড়িতে তিনটি সাহেব-পরিবার থাকে, তা ছাড়া আশেপাশে অনেক সাহেব-মেম আছে, ওপাশের ডাস্টবিনের মধ্যে ওরা যা ফেলে দেয়, তা থেকে যা পাই তা দিয়ে আমাদের দুজনের পেট ভরে যায়। মাঝে মাঝে খুব ভাল খাবারও পাই। সামনের বাড়ির নিচের তলায় যে বুড়ি-মেমসাহেব থাকেন, তিনি মাঝে মাঝে তাঁর রান্নাঘরের বাড়তি খাবার আমাদের এনে দেন। তখন রীতিমতো ভোজ হয় আমাদের...

সেদিন এই বুড়ি লরা অরচার্ডকে দেখলাম সসপ্যানে করে চাওমিন ও মাংস নিয়ে এসে লোকটার অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ঢেলে দিতে।

একা তুমি খেও না। লোকটার থালায় খাবার ঢালতে ঢালতে লরা বললেন, শাম্মিকে খাইয়ে তবে খাবে তুমি। বুঝলে সামাদ আলি?

হ্যাঁ মেমসাহেব, সামাদ জবাব দিল। ওকে খাইয়ে তবে আমি খাই। আচ্ছা মেমসাহেব, এত সব খাবার আমাদের দিয়ে দিচ্ছ, তোমরা খাবে না?

আমি আর কত খাব বল? ভাই সিরিল আমাকে বলেনি যে তার বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল, রাত্রে বাড়ি ফিরে কিছুই খায়নি। ভাল কথা, কাল রাত্রে জোর বৃষ্টি হয়েছিল, তোমরা আমাদের বিল্ডিংয়ের গাড়ি-বারান্দার নিচে তো যাওনি! এখানে বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজছিলে বুঝি! দেখ সামাদ আলি, তোমার বৃষ্টিতে ভিজতে ভাল লাগে তো ভেজো যত খুশি, কিন্তু শাম্মিকে কষ্ট দেওয়া চলবে না।

শাম্মিকে কষ্ট দেব কি, সে তো বৃষ্টি শুরু হতেই যাদুঘরের অফিসের বারান্দার তলায় গিয়ে হাজির হলো। ওর পেছনে পেছনে আমিও গেলাম ওখানে।

লরা চলে যেতে সামাদ বললে, বড় ভালোমানুষ এই বুড়ি মেমসাহেব, গরিবদের ওপরে বড় দয়া ওনার। তবে আমার চেয়ে আমার কুকুরের ওপরেই ওনার দরদ বেশি। ওনার ভাই কিন্তু আমাদের একদম সহ্য করতে পারে না। লোকটা অবশ্য মেমসাহেবের নিজের ভাই নয়, তিনকুলে কেউ নেই বলে বুড়ি নিজের কাছে এনে রেখেছেন।

সেদিন দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে সামাদ ও শাম্মির পাশ কাটিয়ে তড়িঘড়ি অফিসের দিকে যাচ্ছি, উত্তেজিত পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ করে ছুটতে ছুটতে এল সামাদ আলি।

সাহেব, ও সাহেব! উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকল সামাদ, একটু দাঁড়ান...

ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সামাদ আলি বললে, এই দেখুন স্যার, ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁজে বের করতে গিয়ে কি পেয়ে গিয়েছি...

বলে ডান হাতের মুঠো খুলে সামাদ আমাকে যা দেখাল তা আমার চোখ দুটি ধাঁধিয়ে দেয়। সোনার আংটিতে বসানো বিরল শ্রেণীর রক্তমুখী নীলা।

কোথায় পেলে এটা? আমি প্রশ্ন করি।

ডাস্টবিনের মধ্যে। সামাদ আলি জবাব দিল। খুবই দামী পাথর, তাই না স্যার?

দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ডাস্টবিনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া জিনিসকে খাঁটি বলে মেনে নেওয়া শক্ত।

তার মানে আপনি বলতে চান এই সোনা ও পাথর দুইই ঝুটো?

আমি কিছুই বলতে চাই নে, আমাদের টেস্টিং ল্যাবোরেটারিতে আছেন ডক্টর পরাঞ্জপে, যা বলার তিনিই বলবেন পরীক্ষা করে। চল আমার সঙ্গে...

সামাদ আলির সঙ্গে শাম্মিও চলল।

এই সেই আংটি! আংটিটা দেখামাত্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন ডক্টর পরাঞ্জপে। পরশুদিন এটা নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন মিস লরা অরচার্ড। খাঁটি নীলা। কিন্তু এটা আপনার হাতে এল কি করে?

আমার হাতে নয়, এসেছে সামাদ আলির হাতে, আমি জবাব দিলাম। সামাদ আলি ডাস্টবিন থেকে এটা কুড়িয়ে পেয়েছে।

না, সামাদ আলি মিস লরা অরচার্ডকে খুন করে এই আংটিটা তাঁর আঙুল থেকে খুলে নিয়েছে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁর ভাই সিরিল তাঁকে বিছানায় মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। ও পুলিশে খবর দেয়। লরার ফ্ল্যাটে থানার ওসি তাঁর দলবল ও ফোরেনসিক এক্সপার্টকে নিয়ে তদন্ত করছেন, খবর দিচ্ছি তাঁকে...

খবর পেয়েই এলেন থানার ওসি তিনজন সশস্ত্র পুলিস কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে। যাকে বলে 'বমালসুদ্ধ গ্রেপ্তার' তা-ই করলেন তিনি।

দু'হাতে হাতকড়া পরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকে সামাদ আলি। কাঁদতে কাঁদতে বলে, বিশ্বাস করুন দারোগাসাহেব, খুন আমি করিনি। মাকে আমি খুব ছোটবেলায় হারিয়েছি, তাঁকে আমার মনেও পড়ে না, লরা মেমসাহেব আমার মায়ের মতো ছিলেন। মায়ের মতো কি, মায়ের চেয়েও বেশি। আমি ও শাম্মি রোজ তাঁর দেওয়া ভাল ভাল খাবার খেয়েছি, কাল রীতিমতো বিরিয়ানি খাইয়েছেন আমাদের। এই আংটি আমি ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। এই সাহেব সাক্ষী। বলে সে আমার দিকে তাকাল।

ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পেয়েই ছুটতে ছুটতে এসেছিল সামাদ আলি আমার কাছে, আমি বললাম। তার ডান হাতের মুঠো খুলে দেখিয়েছিল আমাকে।

আপনি কি ওকে ওটা ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে নিতে দেখেছেন? আমার মুখের ওপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে পুলিশ ওসি ইদ্রিস খাঁ প্রশ্ন করেন।

না। আমি জবাব দিলাম।

রীতিমতো চালাক লোক এই সামাদ আলি। দেখ সামাদ, ঐ সাহেবের চোখে ধুলো দিতে পারলেও, আমার মতো দুঁদে দারোগাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। মেমসাহেবকে খুন করে তাঁর নীলা-বসানো আংটিটা ডাস্টবিনে লুকিয়ে রেখে ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁজে বের করার ভান করে আংটিটা বের করে এই সাহেবকে দেখিয়েছিলে।

একটা কথা মিস্টার খাঁ, ডক্টর পরাঞ্জপে বললেন। আংটির জন্যই মিস অরচার্ডকে খুন করা হয়েছে একথা ধরে নিচ্ছেন কেন! সামান্য একটা আংটির জন্য খুন একথা কি ভাবা যায়! আংটি-চোরের পক্ষে ঘুমন্ত মিস অরচার্ডের হাতের আঙুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া এমন কোনো কঠিন কাজ নয়।

আংটির জন্য খুনের কথা সিরিল বলেছিল আমাকে, ইদ্রিস খাঁ বললেন। আংটি-চোর মিস অরচার্ডের শোবার ঘরে ঢুকতেই তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন। তাঁর চিৎকার শুনে ঘরে ঢুকে সিরিল দেখল তার দিদি মরে পড়ে আছেন এবং তাঁর আঙুলে নীলার আংটিটা নেই। সে মনে করে যে মিস অরচার্ডের চিৎকার থামাতেই চোর তাঁর গলা টিপে ধরেছিল। এই খুনী চোরকে হাতেনাতে ধরতে পেরে আমি খুশি।

হুজুর আমি চোর নই, খুনী নই, ফোঁপাতে ফোঁপাতে সামাদ আলি বললে। বিশ্বাস করুন হুজুর, ডাস্টবিনে আংটিটা খাবার খুঁজতে গিয়ে পেয়েছি।

আংটিসুদ্ধ ধরা পড়ে গিয়ে তুমি যে চোর তার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। তুমি খুনী কিনা তার প্রমাণও হয়ে যাবে এখনই। চল আমাদের সঙ্গে।

সামাদ আলিকে ধরে বেঁধে মিস অরচার্ডের ফ্ল্যাটে নিয়ে যান ইদ্রিস খাঁ ও তাঁর পুলিশ বাহিনী। ইদ্রিস খাঁয়ের নির্দেশমতো আমিও যাই তাঁদের সঙ্গে।

মিস অরচার্ডের মৃতদেহের ওপরে ঝুঁকে পড়ে তাঁর গলায় খুনীর আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করছিলেন ডক্টর কল্যাণ বসুর

ফরেনসিক ল্যাবোরেটারির বিজ্ঞানী সুবীর সিংহ। সামাদ আলিকে তাঁর দিকে এগিয়ে ইদ্রিশ খাঁ বললেন, খুনীকে ধরে নিয়ে এসেছি ডক্টর সিন্‌হা। মিস অরচার্ডের গলায় এরই হাতের আঙুলের ছাপ আছে বলে সন্দেহ করি। পরীক্ষা করে দেখুন।

আমাদের অনুসরণ করে মিস অরচার্ডের শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছিল শাম্মিও। মিস অরচার্ডের মৃতদেহের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে তাঁর শিয়রে বসে কাঁদতে থাকা সিরিলের গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুরু করে।

সামাদের এই নোংরা কুকুরটা এখানে কেন? সিরিল বিরক্তি মাখানো কণ্ঠে বললে, ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিন মিস্টার খান।

পুলিশ বাহিনীর তাড়া খেয়েও সিরিলের গায়ের গন্ধ শুঁকতে থাকে শাম্মি এবং উত্তেজিতভাবে ঘেউ ঘেউ করে যায়।

মিস্টার খান! উঠে দাঁড়িয়ে সুবীর সিংহ বললেন, আমি এই লোকটির হাতের ছাপ নেব, দয়া করে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।

সিরিল স্মিথ তো মিস অরচার্ডের ভাই! ইদ্রিস খাঁ অবাক হয়ে তাকালেন সুবীরের মুখের দিকে। তাঁর হাতের ছাপ নেবেন কি মশাই!

মিস অরচার্ডের মৃতদেহে এই কুকুরটি ঐ লোকটার গায়ের গন্ধের হদিস পাচ্ছে। ভাই হলেই কি সন্দেহের বাইরে হবে!

পলায়মান সিরিলকে চেপে ধরে পুলিশ বাহিনীর দু'জন, সুবীর সিংহ তার হাতের ছাপ নিয়ে যা করণীয় করতে থাকেন।

পেয়েছি! খানিকক্ষণ বাদে সুবীর সিংহ বলে উঠলেন।

কি পেয়েছেন? ইদ্রিস খাঁয়ের প্রশ্ন।

খুনীর হদিস। সিরিল স্মিথই খুনী।

নীলার আংটি নয়, লরার টাকার লোভে সিরিল তাঁকে খুন করেছিল। লরার উইল অনুযায়ী তাঁর যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি তাঁর মৃত্যুর পর সিরিলের পাওয়ার কথা।

আচ্ছা সিরিল, কেন তুমি নীলার আংটিটা ফেলে দিলে? ইদ্রিস খাঁ সিরিলকে গ্রেপ্তার করতে করতে প্রশ্ন করলেন। এমন একটা চোখ ঝলসানো পাথর! ডক্টর পরাঞ্জপে বলছিলেন, হীরের চেয়েও দামি...

অপয়া পাথর, সিরিল বললে। খুন হওয়ার আগের দিনই দিদিকে ওটা উপহার দিয়েছিলেন মিয়ানমার থেকে আসা তাঁর এক বন্ধু। ওটা পরেছিলেন বলেই খুন হলেন। কাজেই দিদি খুন হতেই আমার প্রথম কাজ হলো ওটাকে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দেওয়া।

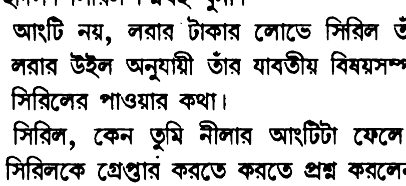

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

মেসোর বাড়ি

অভীক বসু

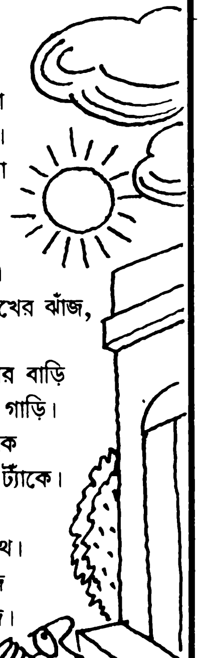

কলকাতাতে দুই কাঠাতে করেন বাড়ি মেসো
বাড়ি তো নয় স্বপ্নপুরী পারলে দেখে এসো।
ঘরে শুয়ে দেখতে পাবে সাদা মেঘের ভেলা
সূর্য ওঠা সূর্য ডোবা এবেলা ওবেলা।
পূর্ণিমাতে পূর্ণ শশী, অমানিশার তারা,
কল্পলোকের স্পর্শ পাবে সেথায় যাবে যারা।
শীতকালেতে রোদের আমেজ, চোত-বোশেখের ঝাঁজ,
বর্ষাকালে ঘরে বসেই দেখবে মেঘের সাজ।
সকাল-বিকাল আসছে মানুষ দেখতে মেসোর বাড়ি
কেউ বা আসে পায়ে হেঁটে কেউ বা চেপে গাড়ি।
টিকিট কেটে বাড়ির ভিতর ঢুকছে একে একে
খোশমেজাজে আছেন মেসো, জমছে টাকা ট্যাঁকে।
এমন বাড়ি সবার করা উচিত মেসোর মতে
ফলকে তাই আছে লেখা বাড়ির প্রবেশ পথে।
বাঁচতে গেলে দেয় না যাওয়া প্রকৃতিকে বাদ
সেই কারণে হয়নি গড়া মেসোর বাড়ির ছাদ।

সার কথা

তমাল চট্টোপাধ্যায়

এই ভুতো যাস কোথা? আয় বস পাশে,
ভালো কথা বলি দু'টো, এই অবকাশে।
অসার এ জগতের ব্যাখ্যাটা আজই
জলবৎ করে দেবো, বলিস তো রাজী।

শোন তবে মন দিয়ে বলি সোজাসুজি,
ভুবনে অনিত্য সবই—এই আমি বুঝি।
তাই দ্যাখ বোকা ছাড়া সংসার পাঁকে
লোভ আর লালসায় কে রে বাঁধা থাকে?
কিছুই থাকে না ভুতো, জেনে রাখ খাঁটি
সুশোভন তনু তোর সেও হবে মাটি।
ভাবিস কি সব কিছু সাথে সাথে যাবে?
ভবলীলা পার হলে পাঁচ ভূতে খাবে।
তাছাড়াও থাক যত সঞ্চয় ভাই
পরহিতে না লাগে তো, কোনো দাম নাই।

শাক দিয়ে মাছটাকে যায় নাকো ঢাকা—
অনেক তো আছে ভুতো, দেনা দু'টো টাকা।

ছবি: সুফি

ব্রহ্মদৈত্যদাদার গল্প

হিমানীশ গোস্বামী

আমাদের রতনদিয়ার বাড়ির বড় বেলগাছের ব্রহ্মদৈত্যদাদা আজকাল কথা বিশেষ বলেন না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও উদাসীন। আমার ঠাকুর্দার সময় থেকেই উনি আছেন, আর প্রতি শনিবার আমাদের বাড়িতে থাকত তাঁর বিশেষ নিমন্ত্রণ। আমার মা ওঁর জন্য সাত্ত্বিক রান্না করে খাওয়াতেন। আলু ভাজা, কচুর দম, ঘিয়ে ভাজা লুচি, ক্ষীর, দই, সন্দেশ এসব ব্রহ্মদৈত্যদাদার বিশেষ প্রিয় খাদ্য ছিল। সাধারণ এবং নিচুশ্রেণীর ভূত-পেত্নি-শাঁকচুন্নিরা খেত যা আমাদের কাছে একেবারেই অখাদ্য, যেমন মাকড়সার কালো কালো রস, আলু-কাদার চচ্চড়ি—এটা শাঁকচুন্নিদের কাছে ভারি প্রিয়। আলু পচা হলে ভাল হয়। না হলেও চলে, কিন্তু কাদা পচা হওয়া চাইই। আজকাল শুনি কিছু কিছু আধুনিক ভূত পুরনো খাদ্য বাদ দিয়ে মানুষদের প্রিয় খাদ্য রসগোল্লা কাঁচাগোল্লা জিলিপি ঘি দেওয়া খিচুড়ি খায়। কিন্তু আমি যখনকার কথা বলছি তখন ভূতেরা তাদের বড়দের কথা শুনে চলত, নিয়ম-কানুন মানত। ব্রহ্মদৈত্যরা ছিলেন সত্যি সত্যিই আদর্শস্থানীয়। বয়স্করা ছাড়া ব্রহ্মদৈত্য হওয়া সম্ভবই ছিল না। সব ব্রহ্মদৈত্যদেরই দাড়ি থাকত। সকলেরই বয়স বেশি থাকায় দাড়ি হতো সাদা। চুলও সাদাই থাকত। দেখার সৌভাগ্য যাদের হতো তারা বলত চমৎকার চেহারা! ব্রহ্মদৈত্যরা সাধারণত বিয়ে করতেন না, বিয়ের ব্যাপারে নানারকম বাধা-নিষেধ ছিল। ব্রহ্মদৈত্যদের জন্য ব্রহ্মদেশ থেকে কনে ভূত আনা হতো। একটা ব্রহ্মদৈত্যর বিয়ে হলে ভূত সমাজে শোরগোল পড়ে যেত, উল্লাসের বন্যা বইত। পোনের দিন ধরে ভূতদের খাওয়া-দাওয়া চলত। ঐ পোনের দিন কোনও রকম বাধা-নিষেধ থাকত না, যে যা-খুশি খেত, পান করত। নিয়ম-কানুন সব শিকেয় তোলা হতো। এ জন্য ভূতেরা যে কোনও ব্রহ্মদৈত্যের বিয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত, ভূত-কনে খুঁজতেও তাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। অনেক ভূত আবার খিদিরপুরে গিয়ে জাহাজে উঠে পড়ত আর প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিনে দিব্যি আনন্দে রেঙ্গুন পর্যন্ত চলে যেত! আমি যখনকার কথা বলছি তখন পাসপোর্ট দরকার হতো না ব্রহ্মদেশে যেতে। এখন অবশ্য ব্রহ্মদেশের নাম বদলে গেছে—নাম হয়েছে মায়ানমার। তখনকার দিনে ভূতেদেরও পাসপোর্ট দরকার হতো না। ব্রিটিশ ভূতেরা গোপনে ভূতদের জন্য ভুতুড়ে জাহাজ চালাত।

এবারে বলি প্রথমে যা বলছিলাম সেটা। ব্রহ্মদৈত্যদাদা আগে যেমন মাঝে মাঝে গল্প-গাছা করতেন রাত্তির বেলা হঠাৎ কী হলো তিনি আর আসেন না। শনিবার শনিবার মা খাবার তৈরি করে বেলগাছের কাছে রেখে আসতেন, পরদিন দেখা যেত খাদ্য নেই। কিন্তু এখন বেশ কয়েক শনিবার খাবার রাখার পর রবিবার দেখা যেত ঢাকনা দেওয়া খাবার সব যে-রকম ছিল সেই রকমই রয়েছে, কেউ খায়নি।

আমাদের বাড়ির বারান্দায় রাতের বেলায় ব্রহ্মদৈত্যদাদা এসে বসতেন আর কত কথা যে বলে যেতেন তার ঠিক নেই। আমরা সকলেই ব্রহ্মদৈত্যদাদা এলে মজা পেতাম। আমরাও ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি। গলাটা ছিল একটু মিহি গোছের। অন্ধকারে বসে থাকতে ভালবাসতেন, তাঁকে দেখাই যেত না। অনেক সময়

জানালা দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু সাদা চুল-দাড়ি আর ধবধবে সাদা পোশাক পরা অবস্থায় দেখেছি। মুখের আদল কেমন ছিল ঠিকমতো বোঝা যেত না। হঠাৎই আসতেন আর হঠাৎই মিলিয়ে যেতেন। খুব জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। জীবিত অবস্থায় তিনি ঢাকার একটি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, নামটি এখন ভুলে গেছি।

এমনই এক সময়ে, অর্থাৎ ব্রহ্মদৈত্যদাদার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই এমন চলছে দু'মাসের উপর, একদিন তিনি এসে হাজির। তিনি বললেন তিনি জীবিতাবস্থায় ইংরেজি জানতেন খুব ভাল, কিন্তু মৃত্যুর পর ব্রহ্মদৈত্য হবার জন্য তাঁর দু'বার শোধন হয়। এ শোধনের সময় তাঁর ইংরেজি ভাষাকে পদ্মার জলে বিসর্জন দিতে হয়। ব্রহ্মদৈত্যদের সমাজে ইংরেজি ভাষা সম্পূর্ণ অচল। বাংলা কিংবা সংস্কৃত এ দুটির যে কোনও একটি ভাষা হলো খাঁটি ব্রহ্মদৈত্যদের ভাষা। তবে আজকাল সংস্কৃত প্রায় উঠেই গেছে। ব্রহ্মদৈত্যদেরও অনেকে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে অসুবিধে বোধ করেন।

আগে বলা হয়নি, আমার মা ভালই ইংরেজি জানতেন। ছোট বয়সে তিনি একটি ইংরেজ মেমসাহেবের কাছে ইংরেজি শিখেছিলেন। হঠাৎ এক রাতে ব্রহ্মদৈত্যদাদা এসে বললেন, পুল্টু ক্ষমা করিস রে—এতদিন নানা ব্যাপারে বিব্রত ছিলাম। এখনও অনেক ঝামেলা বাকি আছে। ঝামেলার মধ্যে একটি হলো...। বলে ব্রহ্মদৈত্যদাদা একটু থামলেন, তারপর বললেন, মানে একটা ঝামেলা থেকে তুই উদ্ধার করে দিতে পারবি? —আমি? আমার মা অবাক হন। আমি আপনার ঝামেলা থেকে উদ্ধার করব কি-রকম? ব্রহ্মদৈত্যদাদা বললেন, আমাকে একটি ইংরেজি শিখিয়ে দিবি? একজনের কাছে আমি এ বি সি ডি-টা শিখেছি মোটামুটি, কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলাটা শেখা দরকার। মা লজ্জা পেলেন। বললেন, কী যে বলেন দাদা, আমি ইংরেজির কি জানি! সে কুড়ি বছরেরও আগের কথা, আমার বয়স তখন চার কি পাঁচ। তখন মিস এমিলি বলে এক গরিব মেমসাহেবকে বাবা মাসে চল্লিশ টাকা দিতেন, তিনি সপ্তাহে একদিন আসতেন আর আমাকে ঘণ্টাখানেক ইংরেজিতে কথা বলা শেখাতেন। মিস এমিলি দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতেন, ডাঁটা চিবোতেন আর পান্তাভাত খেয়ে বলতেন চমটকার! ওঁর কাছ থেকে যা শিখেছিলাম, চর্চার অভাবে সে-সবের কিচ্ছু মনে নেই। কিছু মনে করবেন না দাদা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্রহ্মদৈত্যদাদা। বললেন, ভাল কাউকে পাওয়া না গেলে আমার ইংরেজি শেখাই হবে না।

মা বললেন, দাদা আপনি কলকাতা চলে যান না কেন, সেখানে অনেক ভাল ভাল ইংরেজি জানা ভূত পেয়ে যাবেন।

—উহুঁ, সে হবে না। ব্রহ্মদৈত্যদাদা দুঃখের সঙ্গে বললেন, ওদের উচ্চারণ ঠিকমতো হয় না। দেশি ভূতেরা ইংরেজি জানে অনেকেই, কিন্তু উচ্চারণ করতে গেলে নাক দিয়ে সুর বার করে।

মা বললেন, তা বটে, ভূতদের তো নাকী সুরই হয়। আপনি না হয় ঐরকমই একটু শিখে নিলেন।

—একটু শিখলে তো হবে না। আমাকে ভাল করে ইংরেজি শিখতে হবে।

—কী ব্যাপার দাদা? মা বললেন।

দাদা বললেন, একটা ব্যাপার আছে বৌমা। সব কথা এখন বলা যাবে না, বলা ঠিকও হবে না, পরে একদিন বলব। বলেই তিনি হাওয়া হয়ে গেলেন।

আমরা সব অবাক হয়ে রইলাম। আবার এ-সব কথা আমরা অন্য কাউকে যে বলব তারও উপায় নেই। এমনিতেই আমাদের বাড়ির বেশ নিন্দে আছে। এ বাড়ির সঙ্গে ভূতদের সম্পর্ক আছে এটা সকলেই জেনে গেছে। এর প্রতিবাদ করাও যায় না। কথাটা তো মিথ্যে নয়, ব্রহ্মদৈত্যও তো ভূতই।

কয়েকদিন পর আমাদের বাড়িতে হঠাৎ একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে গেল। আমাদের বেলগাছটার কাছে একটা বড় জামগাছ ছিল, হঠাৎ সকালে উঠে দেখি সেখানে জামগাছ নেই, তার জায়গায় আর একটা বেল গাছ। একদিন আমি মাকে বললাম, মা দেখো আমাদের জামগাছটা নেই, তার জায়গায় একটা বেলগাছ! মা বললেন, সেও কি সম্ভব? বলে নিজে দেখে মাথায় হাত দিয়ে কান্নাকাটি শুরু করলেন। পাড়ার লোক এসে জামগাছের জায়গায় বেলগাছ দেখে কীরকম যেন ভয় পেয়ে গেলেন। সকলেই চুপচাপ কিছু না বলে চলে গেলেন। হঠাৎ সেদিনই বাবাও চলে এলেন। তিনি ঢাকায় সরকারী কাজ করতেন। তা ভালই হলো। বাবা তো সব দেখে শুনে খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, বাবার দোষেই এই সব ব্যাপার ঘটছে। তিনি ভাল মনে একজন সৎ বন্ধুকে ডেকে এনেছিলেন, কিন্তু এ কি অন্যায়! না বলে কয়ে এ-সব করা ব্রহ্মদৈত্যদাদার ভারি অন্যায় হয়েছে। আমরা মানুষ, আমরা ভূতও নই ব্রহ্মদৈত্যও নই। এ অসহ্য—আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করবই। বাবা ভীষণ রাগী ছিলেন। ব্রহ্মদৈত্য আমাদের বেলগাছে থাকার প্রথম থেকেই তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি দু'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু সেদিনই আরও দশদিনের ছুটি প্রার্থনা করে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন। তারপর কাকাকে ডেকে পাঠালেন। কাকা কুষ্টিয়ায় কাপড়ের কলে কাজ করতেন, তাঁকেও ডেকে আনা হলো। বাবা গোয়ালন্দর বিখ্যাত ওঝা ফকিরলাল ভটচাজকে খবর দিলেন। অনেক পরামর্শ হলো। ফকিরলাল ওঝা বললেন এ বড় শক্ত কেস—তিনি নানারকম ভূত নিয়ে কারবার করেছেন ঠিকই, কিন্তু কখনও ব্রহ্মদৈত্য নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। হবেই বা কেন, ব্রহ্মদৈত্যরা পারলে মানুষদের সমস্যার সমাধানই করেন—সাত্ত্বিক ব্রহ্মদৈত্যরা পাজি বদমায়েশ ভূতদের দৌরাত্ম্যকে ঠেকিয়েও রাখেন। ফকিরলাল ওঝা বললেন, এ রকম অলক্ষুণে কথা তিনি জীবনে শোনেনওনি দেখেনওনি। তারপর যখন শুনলেন আমাদের ব্রহ্মদৈত্যদাদা ইংরেজি শেখার চেষ্টা করছেন তখন তিনি আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বললেন, মনে হচ্ছে এই ব্রহ্মদৈত্যর মাথাটি গেছে। যাই হোক ফকিরলাল ওঝা একটা সাংকেতিক ভাষায় চিঠি লিখে ব্রহ্মদৈত্যদাদার পালকির সঙ্গে রেখে দিলেন। আমার ঠাকুর্দার আমল থেকেই বেলগাছে একটা পালকি এনে ব্রহ্মদৈত্যদাদাকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। চিঠিতে বলা হয়েছিল ব্রহ্মদৈত্যদাদা এলেই যেন একবার দেখা করেন ফকিরলালের সঙ্গে।

অনেকেই বাড়িতে রাত জেগে কাটালেন। ব্রহ্মদৈত্য এলেন না। রাত্রে বেলগাছে কিসের আওয়াজ হলো। পরদিন সকালে দেখা গেল সেই পুরনো পালকিটা উধাও, তার জায়গায় বেশ বড়সড় পালকি! তার সারা গায়ে রুপোর কাজ করা। ঝকঝকে তকতকে ব্যাপার। আর নতুন বেলগাছের উপর রীতিমতো একটা বড়সড় ঘর। বর্মার সেগুন কাঠ দিয়ে তৈরি। এক রাতের মধ্যে অমন দু'দুটো ঘটনা নিঃশব্দেই ঘটে গেল।

একদিন দু'দিন করে পাঁচ দিন পার হয়ে গেল কিন্তু ব্রহ্মদৈত্যদাদা ফকিরলালের সঙ্গে দেখা করলেন না। তিনি চিঠিটা পেলেন কিনা সেটাও বোঝা গেল না। বাবা-কাকা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ফকিরলাল ওঝা মন্ত্রের সাহায্যে তাঁর দুই ওস্তাদ বেগার ভূতকে আনিয়ে ব্রহ্মদৈত্যদাদার খোঁজখবর নিতে বললেন। দু'দিন পর তারা মুখ শুকনো করে এসে জানাল কোনও খবর নেই। সম্ভবত ব্রহ্মদৈত্যদাদা এ দেশেই নেই।

তাহলে? তাহলে কি ব্রহ্মদৈত্যদাদাকে অন্য কোনও ব্রহ্মদৈত্য কিংবা অপদেবতা নিশ্চিহ্ন করে দিল? নইলে ওস্তাদ দুই বেগার ভূত ব্রহ্মদৈত্যদাদাকে খুঁজে পাবে না কেন? ফকিরলাল ভটচাজ নামকরা ওঝা, উনি সমস্ত খবর সংগ্রহ করতে পারেন, তাঁর শক্তি অসীম। তাঁর তাঁবে ভূতেরা বেগার খাটার জন্য কত সাধাসাধি করে, কত উমেদারি করে। ফকিরলালের কাছে বেগার খাটে যে সব ভূত তাদেরও কত খাতির! অথচ ব্রহ্মদৈত্যদাদা কোথায় গেলেন, তাঁর কী হলো তা ফকিরলাল ওঝা বলতেই পারলেন না, আন্দাজও করতে পারলেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন, আমি হার স্বীকার করলাম, আমি কালই চলে যাব। আমরা খুবই মনমরা হয়ে পড়লাম। গ্রামের মধ্যে আর থাকা যায় না। আমার বয়সের বন্ধুরা আর আমার সঙ্গে খেলে না। আমাদের বাড়িতে কেউ বেড়াতেও আসে না। একঘরে হয়ে থাকার মতো অবস্থা। বাবা বললেন, এ রকম অবস্থায় এ গ্রামে আর থাকা চলে না। উনি বললেন, ঢাকায় একটা বাড়ি ভাড়া করে গ্রাম ছেড়ে আমরা চলে যাব। শুনে আমাদের সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল। শেষ চেষ্টা হিসেবে ফকিরলাল একটা ছোট যজ্ঞ করলেন। সেই যজ্ঞের আগুনে যে কত রকম জিনিস পুড়িয়ে শেষ করা হলো তার হিসেব করা অসম্ভব। আসশ্যাওড়া পাতা, তল্লা বাঁশের সরু আর লম্বা কঞ্চি, আদা গাছের শুকনো পাতা, গাঁজা গাছের শেকড়, নিমগাছের ছাল, হরতকি শুকনো, রুদ্রাক্ষ গাছের ছাল—আমাদের বাড়িতে একটা প্রকাণ্ড রুদ্রাক্ষ গাছ ছিল—এ ছাড়া পুঁটি মাছের ষোলটা মাথা, মৌরালা মাছের একুশটা লেজ—এই সব। এ ছাড়া আরও দু'চার ডজন জিনিস। তার সঙ্গে কত সুরে মন্ত্রপাঠ। তার মানে আমার জানা নেই। ধূপের তীব্র গন্ধ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছিল—আমরা বাড়িতে ছিলাম বলে আমাদের সকলেরই উপবাস করে থাকতে হয়েছিল। আমি একেবারে উপোস করে থাকতে পারি না বলে রান্নাঘরে গিয়ে পোড়া ছোলার ডাল আর পান্তা ভাত খানিকটা গবগব করে খেয়ে তবে উপোস করতে পেরেছিলাম—তাও বিকেলে আর সন্ধ্যেবেলা ভীষণ খিদে পেলেও আর খাওয়ার চেষ্টা করিনি। যাই হোক আমার মনে হচ্ছিল হয়ত আমার ঐ পান্তা ভাত আর ছোলার পোড়া ডাল খাওয়াতেই ব্রহ্মদৈত্যদাদাকে যজ্ঞ করেও আনা যাচ্ছে না। আমি রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত জেগেছিলাম কিন্তু তারপর ক্লান্তিতে আর অবসাদে ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর কি হয়েছে জানতাম না। পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে খাইয়ে দেওয়া হলো।

যা শোনা গেল তা যেমন অদ্ভুত তেমনই অভাবনীয়। ব্রহ্মদৈত্যদাদা কাল রাত্রে এসেছিলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি। ফকিরলাল ভটচাজ সকালের ট্রেনে চলে গেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি—তবে তিনি আমাদের ভারি উপকার করেছিলেন সেবার। ব্রহ্মদৈত্যদাদাকে কয়েকজন বাজে প্রকৃতির ভূত ভুলিয়ে-ভালিয়ে একটা বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল। ব্রহ্মদৈত্যদাদা কিছুতেই রাজী হননি প্রথমে, কিন্তু শেষে বদ ভূতদের কথায় ভুলে কথা দিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মদৈত্যদাদা কলকাতায় গিয়ে ভুতুড়ে জাহাজে করে দু'বার রেঙ্গুনে গিয়ে মেয়েও দেখে এসেছেন। বেশ চমৎকার কালো কুচকুচে পেত্নি। ব্যবহারে চমৎকার, কিন্তু অসুবিধে হলো সেটা ছিল একটা মেম ভূত! খাঁটি ব্রিটিশ সাহেব ছিলেন তাঁর স্বামী। ওঁকে রেঙ্গুনে ফেলে তাঁর স্বামী কোথায় পালিয়ে যান, তারপর থেকে শোকে দুঃখে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর সদগতি না হওয়ায় তিনি পেত্নি হয়ে রেঙ্গুনের একটি পুরনো বাড়িতে একাই ছিলেন। কাউকে ভয় দেখাতেন না, চরিত্র ভারি চমৎকার ছিল। ব্রহ্মদৈত্যদাদার কয়েকজন শিষ্য একবার ভুতুড়ে জাহাজে করে ব্রহ্মদেশে যান। ব্রহ্মদৈত্য ছাড়া ব্রহ্মদেশে অন্য কোনও রকম ভূতের যাওয়া ছিল নিষেধ। কিন্তু আগেই বলেছি ব্রহ্মদেশে বেআইনি ভাবে যাতায়াত করার মতো ভূতের অভাব ছিল না। ব্রহ্মদেশ ছিল চ্যাংড়া ভূতেদের ভারি আমোদের স্থান। তারা সেখানে ফূর্তি করতে যেত। রাশি রাশি দুধ আর শুঁটকি মাছের সমারোহ ছিল ব্রহ্মদেশে। ব্রহ্মদেশের ব্রহ্মদৈত্যরা সকলেই একটু প্রগতিশীল বলে খ্যাত ছিল। ওদের মধ্যে এটা খাবে না ওটা খাবে না এমন বাধা-নিষেধ ছিল না। এমনকি যে ইলিশ শুঁটকি সমস্ত পৃথিবীর ব্রহ্মদৈত্যদের কাছে অগ্রহণীয় ছিল, সেই ইলিশ শুঁটকি ব্রহ্মদেশের ভূতাঞ্চলে ঢেলে বিক্রি হতো। সেগুলো সব চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বড় বড় নৌকোয় গোপনে চালান যেত। তা আমাদের ব্রহ্মদৈত্যদাদার দুই ভক্ত ভূত ব্রহ্মদেশে গিয়েছিল ফূর্তি করতে। তা সেই সময়ে তাদের সঙ্গে সেই মেম ভূতের এক ভাইয়ের দেখা হয়। মেমসাহেবের নাম ছিল ম্যাটিল্ডা, তার ভাইয়ের নাম ছিল হ্যারিস—সে ইংল্যান্ডের একটা হানাবাড়িতে থাকত।, বছরে একবার আসত দিদিকে দেখতে। তা এক দুধের দোকানে যখন দুধ খেয়ে খেয়ে সকলে প্রায় বেহুঁশ তখন হ্যারিসের সঙ্গে ব্রহ্মদৈত্যর দুই ভক্তর খুব ভাবসাব হয়ে গেল। সায়েব ভূত হ্যারিস জীবনে প্রথম ইলিশ শুঁটকি খেয়ে এমন মুগ্ধ হলো যে ঐ ভূতদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে বসল। হ্যারিস ছিল ব্যবসাদার ভূত—সঙ্গে সঙ্গে সে স্থির করল ইলিশ শুঁটকি নিয়ে সে ইংল্যান্ডে চালান দেবে। ওখানে ইলিশ শুঁটকির চাহিদা বাড়লে লাখ লাখ পাউন্ড লাভ হবে।

সাহেব ভূত ইলিশ চালানের বন্দোবস্ত করে ফেলল। বিরাট কারবার ফেঁদে বসল। এই সময় হ্যারিস একটা সৎ এবং বিশ্বাসী

ভূতকে ভারতে এজেন্ট নিয়োগ করতে চাইল। তখন ব্রহ্মদৈত্যদাদার ভক্তরা দুটো কাজ করল, এক ব্রহ্মদৈত্যদাদাকে ভারত আর ব্রহ্মদেশের এজেন্ট নিয়োগ করল আর প্রস্তাব করল ম্যাটিল্ডাকে ব্রহ্মদৈত্যদাদার সঙ্গে বিয়ে দিতে।

প্রথম প্রস্তাবে রাজী হলেও ব্রহ্মদৈত্যদাদা কিছুতেই বিয়ে করতে চাইলেন না ম্যাটিল্ডাকে। এমনিতে তাঁর বিয়েতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু মেমসায়েবকে বিয়ের কথা শুনে ব্রহ্মদৈত্যদাদা খুব ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, ওরে বাবা সে যে ভয়ানক কথা। মেমেরা যে ইংরেজিতে কথা কয়। আর ব্রহ্মদৈত্য হবার পর থেকে ইংরেজি তিনি ভুলে গেছেন বেমালুম! ম্যাটিল্ডার সঙ্গে একবার রেঙ্গুনে দেখাও করিয়ে দেওয়া হলো। ভক্তরা দোভাষীর ব্যবস্থা করল—দু'জনের মধ্যে মনের মিল হলো। কিন্তু আর যাই হোক দোভাষীর মাধ্যমে তো আর ঘরকন্না করা যায় না। সে কারণে ব্রহ্মদৈত্যদাদা আমার মায়ের কাছে ইংরেজি শিখবেন বলেছিলেন।

মেম বৌকে নিয়ে কোথায় তুলবেন? এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল তাঁর দুই ভক্ত ভূত আর ম্যাটিল্ডার ভাই হ্যারিস। তারা রাতারাতি আমাদের জামগাছটিকে উপড়ে তুলে কোত্থেকে একটা বেলগাছ এনে লাগিয়ে দিয়েছিল, আর তার উপর বানিয়ে দিয়েছিল বার্মার ভাল সেগুন গাছ দিয়ে তৈরি দু'কামরার আধুনিক ফ্ল্যাট। তারা ভুলে গিয়েছিল যে এর ফলে আমাদের কত সমস্যার সৃষ্টি হবে।

এই হলো ব্যাপার। ব্রহ্মদৈত্যদাদার বিয়ে হয় এর মাস দুয়েক পর এক অমাবস্যার রাত্রে। পোনের দিন ধরে নানা রকম ফুর্তি হয়, হৈহল্লা হয়। ঐ সময় আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাই পাশের গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ি। পোনের দিন পর ফিরে দেখি আমাদের বাড়িটাকে চমৎকার ভাবে তৈরি করে দিয়েছে কারা। ভাল ভাল সেগুন কাঠের দেয়াল—আগে ছিল মাটির মেঝে, এখন দেখলাম সিমেন্টের মেঝে। বেলগাছ থেকে পালকি উধাও। যে নতুন বেলগাছে দু'কামরার ফ্ল্যাট বানানো হয়েছিল সে বেলগাছটা আর নেই। তার জায়গায় সেই পুরনো জামগাছটা এসে গেছে। এরপর ব্রহ্মদৈত্যর দেখা আমরা মাত্র একবারই পেয়েছিলাম এর বছরখানেক পর। তিনি ইংরেজিতে চমৎকার কথা বলা শিখে ফেলেছেন। বললেন বেশ সুখেই আছেন তিনি! তিনি এসে বললেন, এখন তিনি স্থায়ীভাবে রেঙ্গুনে রয়েছেন। ভারি মজায় আছেন। আমাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে গেলেন, আর আমাদের জন্য নানা উপহার নিয়ে এসেছিলেন। খুব ভাল ইলিশ শুঁটকি তো ছিলই, আর ছিল নানা রকম শৌখিন জিনিস। আর বাবার জন্য এনেছিলেন দু'হাজার টাকা।

এরপর আর ব্রহ্মদৈত্যদাদার দেখা পাইনি অনেক বছর। সত্যি এককালের ব্রহ্মদৈত্যরা অনেক অনেক মহত চরিত্রের ছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও তিনি শেষের দিকে একটু লোভী হয়ে পড়েছিলেন, ইলিশ শুঁটকির প্রতি দুর্বলতা হয়েছিল, অর্থলোভও প্রকট হচ্ছিল, কিন্তু তিনি আমাদের কোনও ক্ষতি করেননি, করতে চানওনি। ঐ ঘটনার পর থেকে আমাদের বাড়ি সম্পর্কে যে ভুতুড়ে বলে বদনাম ছিল সেটাও চলে গিয়েছিল।

ছবি : রাজা সরকার

ভৌতিক

শ্যামলকান্তি দাশ

গুন গুন গুন গুন গুন গুন গুন,
কে গায় কে গায়? শানু, নয় তো মিঠুন।

তেরে কিটি তেরে কিটি তবলায় চাঁটি,
কে বাজায় কে বাজায়? ঘুমটাই মাটি।

পিঁক পিঁক পিঁক পিঁক পিঁক পিঁক পিঁক,
বাজায় পাতার বাঁশি পাগলা ফটিক।

একটাও কথা নয়, চুপ চুপ, শোনো,
আকাশে এখন কটা তারা আছে গোনো।

শনশন হাওয়া বয়, ঝনঝন মাথা,
এ কী গেরো! সারা ঘরে কাঁকরোল পাতা!

ছায়া কালো-কালো রাত, ডাইনে ও বাঁয়ে,
কে যেন দৌড়ে গেল বেড়ালের পায়ে!

ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ তাল পড়ে ছাদে,
দেখবে বাঘের খেলা দু'মিনিট বাদে।

বাঘ কই? বাঘ কই? বাঘ কই?—ধুত,
আকাশে সাঁতার কাটে সাতখানা ভূত।

লিমেরিক

রূপক চট্টরাজ

রিমঝিমঝিম তালে তালে বইছে বাদলা হাওয়া রে
রুম্পা ভিজে জবুথবু, মা ধমকান, "শাওয়ারে
স্নান সেরে নে মাথা মুছে
নইলে ফ্যাশান যাবে ঘুচে
খেতে বসে মাছ চাইবি হয়তো জিরো আওয়ারে!"

ছবি : সুফি

একা একজন আর এভারেস্ট

রাহুল মজুমদার

ঘুম আসছে না অ্যালিসনের, আসার কথাও নয়। এভারেস্টে ২৭২৩০ ফুট উঁচুতে, এবড়োখেবড়ো এক ঢালে কোনোমতে খাড়া করা তাঁবুতে এই হিমশীতল রাতে সম্পূর্ণ একা অভুক্ত অবস্থায় ঘুম না আসাটাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এমনকি অ্যালিসনের মতো দক্ষ পর্বতারোহীর পক্ষেও। যদি সব ঠিকঠাক চলে, যদি আবহাওয়া প্রতিকূল না হয়, তবে আগামীকাল, মানে, ১৩.৫.৯৫-তে ইতিহাস লেখা হতে চলেছে—অ্যালিসন হবে প্রথম মহিলা, যে অক্সিজেন ছাড়া সম্পূর্ণ একা এভারেস্ট জয় করবে, তাও কঠিন নর্থ ফেস দিয়ে!

একটা বড় দলের সঙ্গে এলেও অ্যালিসনের সমস্ত ব্যবস্থা আর পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব, সম্পূর্ণ আলাদা—তাই আরোহণের সময় অ্যালিসন ছিল পুরোপুরি একা। অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প (২০৯৯৭ ফুট) থেকে নর্থ কলের (২২৯৬৬ ফুট) শিবির পর্যন্ত নিজের সমস্ত মালপত্র তুলতে অ্যালিসনের লেগেছিল তিন-তিনটে দিন। তিনটে রাত অ্যালিসনকে নর্থ কলে কাটাতে হয়েছে। এরপর আবার একটা তাঁবু ২৫২৬৩ ফুটের দু'নম্বর শিবিরে রেখে অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে আসা, পরদিন নর্থ কলের এক নম্বর শিবির থেকে একটা 'ইনার টেন্ট' নিয়ে দু'নম্বর শিবিরে উঠে আসা; সবটাই এভারেস্টের দুর্গম বিপদসংকুল নর্থ ফেস বেয়ে এবং সম্পূর্ণ একা।

পরদিন অর্থাৎ আজ ক্যামেরা, ক্যারিম্যাট, স্টোভ, কিছু খাবার আর সেই ইনার টেন্টটা নিয়ে সারাদিনের পরিশ্রমে ২৭২৩০ ফুটের এই তিন নম্বর শিবিরে উঠে এসেছে অ্যালিসন। বহু কষ্টে মৃত্যুশীতল এই ঢালের এবড়োখেবড়ো জমিতে টেন্ট পেতেছে। সবই হয়েছে, শুধু রাতে ও আবিষ্কার করল এই ঠাণ্ডায় কোনো খাবার নামানো যাচ্ছে না গলা দিয়ে—! শেষে বহুকষ্টে বরফ গলিয়ে কিছুটা তরল খাদ্য পেটে চালান করা গেল। নিশ্ছিদ্র রাতের আঁধারে এভারেস্ট যেন থম মেরে গেছে একটা একা মেয়ের দুঃসাহসিকতায়!

গত বছর এভারেস্ট অ্যালিসনকে ফেরৎ পাঠিয়েছে খালি হাতে—২৭৫৬০ ফুট পর্যন্ত লড়াই করে হার মানতে হয়েছিল তুষারক্ষতের আশঙ্কায়। তাই এবছর অদম্য জেদ নিয়ে একাই লড়াইয়ে নেমেছে—দেখা যাক কে জেতে—এভারেস্ট না অ্যালিসন।

ভেবেছিল, তিনটে বাজলেই বেরিয়ে পড়বে শৃঙ্গজয়ের উদ্দেশে। কিন্তু তাঁবুর বাইরে এত ঠাণ্ডা যে সে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হলো। উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় সময়কে যেন অনন্ত মনে হতে লাগল! বসে বসে একবার আবার সঙ্গের জিনিসগুলো পরখ

করে নিল অ্যালিসন—জলের পাত্র, ক্যামেরা, রেডিও আর বিদ্যুৎ-উত্তপ্ত মোজার জন্য বাড়তি ব্যাটারি। প্রায় পৌনে পাঁচটায় অবস্থাটা বেরোবার অনুকূল মনে হলো। বাইরে পা রাখতে শূন্যের অনেক নিচের ঠাণ্ডা এসে সমস্ত জামাকাপড়ের মধ্যে দিয়ে কাঁপিয়ে দিলো ওকে। তবে শীতবোধ আর এখন কাবু করতে পারছে না অ্যালিসনকে ; এভারেস্ট জয়ের অদম্য আবেগে চাপা পড়ে গেছে সব প্রতিকূলতা।

এরপর শুধু লড়াই—এভারেস্ট তার সমস্ত প্রতিরোধশক্তি নিয়ে বাধা দিতে থাকল আর সেই প্রতিরোধের বিরুদ্ধে লড়তে থাকল একা অ্যালিসন। অক্সিজেন ছাড়া এই উচ্চতায় লড়াইটা এমনিতেই কঠিন, তার ওপর পেটে শক্ত কোনো খাবার নেই। গতবার অন্তত সাউথ কল পর্যন্ত কয়েকজন সঙ্গী ছিল, বেস ক্যাম্প পর্যন্ত তো বাচ্চারাই এসেছিল, এবছর ওরা নেই। না, নেই বলা বোধহয় ভুল হলো, বুকের ভেতর ওরা অ্যালিসনের সর্বক্ষণের সঙ্গী। নরম তুষার, প্রস্তর-কঠিন বরফ, অসম্ভব খাড়া ঢাল, তুষার ধস—এভারেস্ট এক একটা করে মৃত্যুদূতকে এগিয়ে দিচ্ছে আর অকুতোভয়ে তাদের মোকাবিলা করে চলেছে অ্যালিসন। দেখতে দেখতে সূর্য মাথার ওপর উঠে এলো। কতদূর? আর কতক্ষণ উঠতে হবে, যুঝতে হবে অ্যালিসনকে? শরীর অনেকক্ষণই জবাব দিয়েছে, শুধুমাত্র মনের জোরে এগিয়ে চলেছে ও।

হঠাৎই ও থমকে দাঁড়াল। একী? এগোবার যে আর পথ নেই! আর ওঠার উপায় নেই। কেন! তবে কি...

ঘড়িব দিকে চোখ গেল ওর—দুপুর বারোটা বেজে আট মিনিট। সময়টা খুবই অর্থপূর্ণ অ্যালিসনের কাছে—এই মুহূর্তে ও পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের মাথায়! একা—একেবারে একা, সম্পূর্ণ নিজেব চেষ্টায় অক্সিজেন ছাড়াও যে একজন মহিলা দুনিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গকে পদানত করতে পারে, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে অ্যালিসন জেন হারগ্রিভস।

পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল অ্যালিসন, 'আমার বাচ্চারা শোনো—আমি, তোমাদের মা এই মুহূর্তে পৃথিবীর মাথায় দাঁড়িয়ে বলছি, আমি তোমাদের ভীষণ ভালবাসি।'

তারপর মনে মনে বলল, 'এবার আমি ফিরব তোমাদের কাছে, তোমাদের বাবার কাছে—যে না থাকলে কোনোদিনই বোধহয় আমি এ স্বপ্ন দেখতে পারতাম না। ওরই প্রেরণায় আজ আমি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে কেউ আমার মাথা ছাড়িয়ে উঠতে পারবে না। তোমাদের ভালোবাসার জোরেই আজ আমি জীবনের সেরা মুহূর্তটাকে স্বপ্ন থেকে সত্যি করতে পেরেছি।'

বীরাঙ্গনা অ্যালিসনের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে মহান এভারেস্ট চুপটি করে পড়ে রইল তার পায়ের তলায়।

ছবি : লেখক

ডাকছে আমায়

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

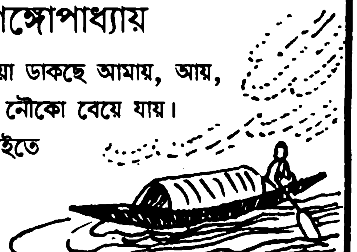

আগল-ছাড়া পাগল হাওয়া ডাকছে আমায়, আয়,
ছলাৎ ছলাৎ নদীর জলে নৌকো বেয়ে যায়।
বাইতে বাইতে যাইতে যাইতে
ডাকতে থাকে, ডাকে,
খুঁজছি আমি মাকে!

ফরাসডাঙার মাঠ পেরুলে শাল-পিয়ালের বন,
কাঠবেড়ালি ঘুরছে কেমন, স্পর্শ করে মন।
ঘুরতে ঘুরতে উড়তে উড়তে
ডাকতে থাকে, ডাকে,
সঙ্গে নেবো কাকে?

খানিক দূরে দোয়েল-কোয়েল, জলসা বসে গানের,
একটি-দু'টি ফুড়ুৎ পালায়, খুশির তুফান প্রাণে।
গাইতে গাইতে যাইতে যাইতে
ডাকতে থাকে, ডাকে,
পাই না খুঁজে মাকে!

মোরাম পথে ফুল ফুটেছে, কৃষ্ণচূড়ার থোকা,
পথটি আমায় বললে হেসে, এদিকে আয় বোকা।
হাসতে হাসতে আস্তে আস্তে
ডাকতে থাকে, ডাকে,
যাই বেরিয়ে এই ফাঁকে!

আমতা চলো

তপন সেন

আম পেতে চাই আতার ভিতরে,
আতা পেতে চাই আমটায়।
খোকন বলল দাদুকে, যখন
উঠল দুজনে ট্রামটায়,—
দাদু বললেন, এখানে নয় গো,
যাও সিধে সেই গ্রামটায়,—
আম আর আতা জড়াজড়ি করে,
দুটোই রয়েছে আমতায়।

ছবি : সুফি

ডক্টর করঞ্জাক্ষ কাঞ্জিলাল তাঁর দানবিক ছাতি চিতিয়ে বললেন, আমি বাজে কথা বলার মানুষ নই। দু'হাজার আটাশ সালের ছাব্বিশে অক্টোবর এই পৃথিবী সাংঘাতিকভাবে জখম হবেই—খুনে গ্রহাণু আসছে তেড়ে।

সুসংবাদটা যেদিন ঘোষণা করলেন ডক্টর করঞ্জাক্ষ কাঞ্জিলাল, সেদিনটা ছিল দুটো কারণে গুরুত্বপূর্ণ। দু'দুটো জন্মদিন একই দিনে পড়ে গেছে। ডক্টর কাঞ্জিলাল বাহাত্তর বছরে পা দিলেন, জন্ম নিল ১৯৯৮ সালটাও।

সেই সুবাদে অনেককেই নেমন্তন্ন করেছেন তাঁর দার্জিলিঙের অট্টালিকায়। ছেলে আর ছেলের বউ, মেয়ে আর মেয়ের বরকে আনিয়েছেন আমেরিকা থেকে—নিজের খরচে। যমজ ছেলেমেয়ে জন্ম মাত্র তিরিশ মিনিটের ব্যবধানে—আগে ছেলে, তারপর মেয়ে। দুজনকেই দেখতে এক রকম। তাদের বিয়েও দেওয়া হয়েছে যমজ ভাইবোনের সঙ্গে একই দিনে। সেই দিনটাও আজকের দিন। তিনি নিজেও বিয়ে করেছিলেন এই একই দিনে—মানে, পয়লা জানুয়ারি। কাজেই, ইংরেজি নতুন বছরের জন্মদিন মানেই তাঁর কাছে উৎসবের দিন।

ডক্টর কাঞ্জিলালের খুব কাছের বন্ধু ত্রিলোচন সমাদ্দার বলে উঠলেন, এ যে দেখছি ত্র্যহস্পর্শ যোগ। আজকের দিনে কি সুসমাচারই দিলে, করঞ্জাক্ষ।

করঞ্জাক্ষ বললেন, দোব না কেন? আমি তো দু'হাজার আটাশ সাল পর্যন্ত বেঁচে থাকব না। থাকবে এই অপোগণ্ড দুটো—ছেলে আর মেয়েকে দেখিয়ে, ভাগ্যিস ছেলের নাম বিগ্রহ আর মেয়ের নাম গ্রহাণু রেখেছিলাম। ওরাই দেখবে গ্রহাণু নামক বিগ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর কলিশনের লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।

ত্রিলোচন বললেন করঞ্জাক্ষের পঁয়ষট্টি বছরের স্ত্রী ত্রিনয়না কাঞ্জিলালকে, বউদি, ছেলেমেয়ের নামটি দিয়েছিলেন খাসা। বিগ্রহ আর গ্রহাণু। এইমাত্র যে সন্দেশটি পরিবেশন করে গেল আপনার স্বামীদেবতা, সেটাও কি আপনার ত্রিনয়ন দিয়ে দেখা?

চওড়া বুক চিতিয়ে গুরু গুরু নিনাদে বললেন করঞ্জাক্ষ, ফুল ক্রেডিট আমার, আমার ভার্যার নয়। আমার কমপিউটেশন হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট। ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাসট্রনমিক্যাল সোসাইটি এখনও তো আন্দাজে বুলেটিন ছাড়ছে। আর হ্যাঁ, ত্রিনয়ন যদি থাকে তো আমার আছে। অনেক ভেবেচিন্তেই ছেলের নাম বিগ্রহ আর মেয়ের নাম গ্রহাণু রেখেছিলাম।

বিগ্রহ প্রহেলিকা

অদ্রীশ বর্ধন

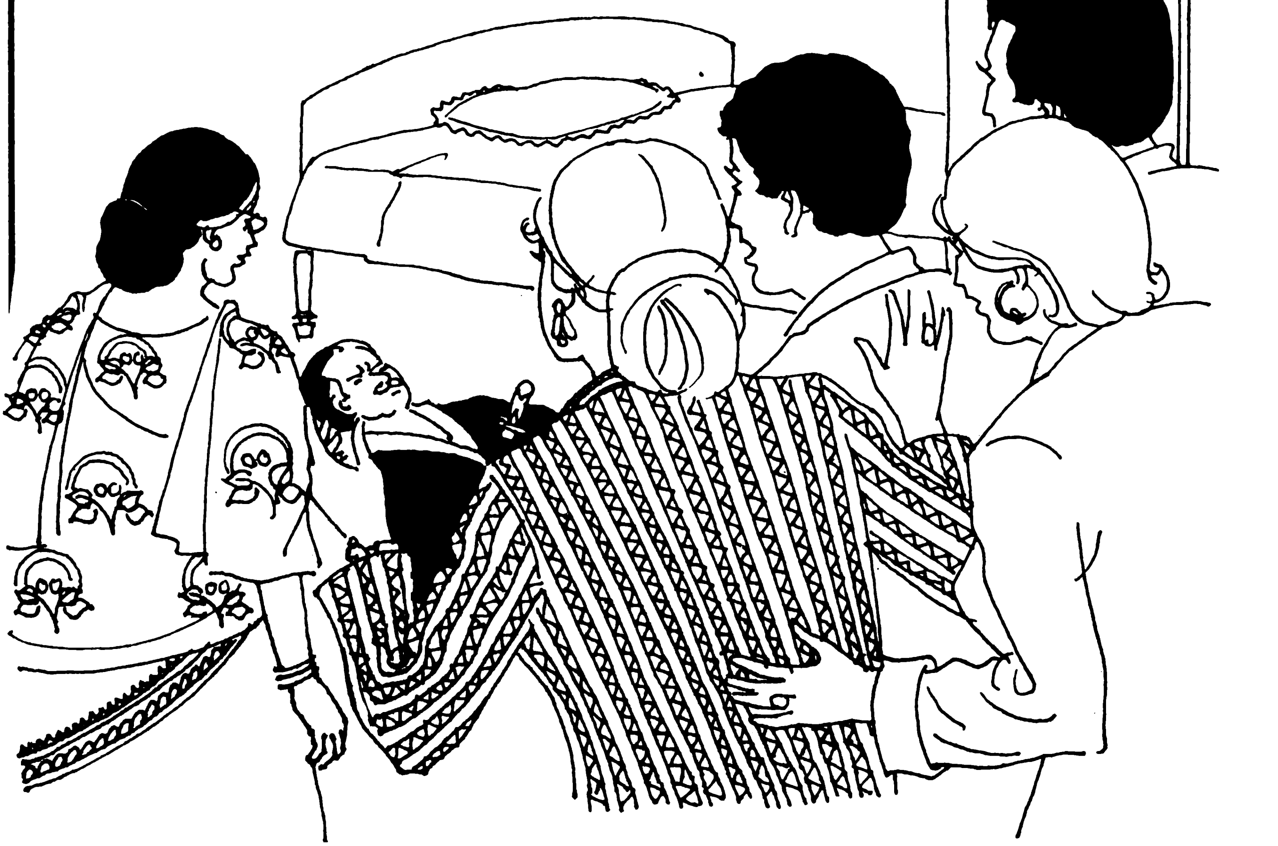

গ্রহাণুপুঞ্জ নিয়ে গবেষণা করছি তো তখন থেকেই। বিগ্রহ জাদুঘর প্রতিষ্ঠাও করেছিলাম তো ওই বছরেই। মনে পড়ে? খুঁজেপেতে তোমাকেও এনে ওখানকার কিউরেটর বানিয়ে দিয়েছি। দুনিয়া ঢুঁড়ে কত বিগ্রহ যোগাড় করেছি সে হিসেব তো তুমি জানো। পৃথিবীতে এমন জাদুঘর আর আছে? নেই।

ত্রিলোচন তাঁর পাকাচুলো মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, বিগ্রহ সংগ্রহের ব্যায়রামও তো কারও নেই।

কটমট করে ত্রিলোচনের দিকে তাকিয়ে রইলেন করঞ্জাক্ষ। দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, খুনে-গ্রহাণুটা তোমার মাথায় আছড়ে পড়লে খুব খুশি হতাম। কিন্তু তুমি তো তার আগেই টিকিট কাটবে।

গ্রহ থেকে বিগ্রহ যার নাম দেওয়া হয়েছে, সুদর্শন সেই পুত্র এবার বললে, ওর চাইতেও বড় গ্রহাণু সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে পৃথিবীকে ধাক্কা মেরেছিল, এক ধাক্কাতেই ডাইনোসরদের বংশলোপ করেছিল, অন্য সব প্রাণীদেরও বারো আনা খতম হয়েছিল কিন্তু পৃথিবী পটল তোলেনি। একটু দম নিয়ে, সেই গ্রহাণুটা ছিল দশ থেকে ষোল কিলোমিটার ব্যাসের। দু'হাজার আটাশ সালের গ্রহাণুটার ব্যাস মোটে এক মাইল। মিষ্টি মিষ্টি করে বিদ্বান বাপের সঙ্গে কথার লড়াই চালিয়ে গেল মিষ্টি চেহারার ছেলে বিগ্রহ।

খেপে গেলেন করঞ্জাক্ষ। গরিলার মতন বুক চাপড়ে বললেন, বড্ড কম জানিস। ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাসট্রনমিক্যাল সোসাইটির বুলেটিন পড়ে কপচাচ্ছিস। ওরা তো আন্দাজি হিসেবে বলেছে, ধাক্কা লাগতেও পারে—নাও লাগতে পারে। আমার কমপিউটেশন বলছে, ধাক্কা লাগবেই। কোথায় লাগবে জানিস? খাস কলকাতায় অথবা বঙ্গোপসাগরে। জল উঠে এসে ডুবিয়ে দেবে হিমালয়ের সানুদেশ।

ত্রিনয়না বললেন, আর বোকো না। খাবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মেয়ে গ্রহাণু বললে, দারুণ খোশবাই ছেড়েছে, মা। তবে নটা তো এখনও বাজেনি। বাবার গালগল্প একটু শুনতে দাও।

গনগনে চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে করঞ্জাক্ষ বললেন, আমেরিকায় থেকে তুই খুব ডেঁপো হয়ে গেছিস। থাক, আমেরিকাতেই থাক। বাবা বিগ্রহ, তুমিও থাকো আমেরিকায়। আমি অক্কা পেলে বুড়ি মা-টাকে নিয়ে গিয়ে কাছে রেখো। কারণ আছে, কারণ আছে, কারণ আছে।

শেষ শব্দ-যুগল তিন-তিনবার এমন নাটকীয় ছন্দে উচ্চারণ করে গেলেন করঞ্জাক্ষ যে, ঘরসুদ্ধু লোক প্যাট প্যাট করে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

একমাত্র তিনিই হিরো-হিরো কায়দায় দাঁড়িয়েছিলেন দেওয়ালের দিকে পিঠ করে, যে দেওয়ালে ঝুলছে মস্ত একটা মোনালিসার ছবি। বাকি সবাই বসে রয়েছে তাঁর সামনে। আজ যে করঞ্জাক্ষ কাঞ্জিলালের বাহাত্তরতম জন্মদিন—হিরো তো হবেনই।

শুধু ত্রিলোচন বললেন, তোমাকে বাহাত্তরে পেয়েছে করঞ্জাক্ষ। এসটেট ফেলে রেখে বউদি আমেরিকায় পগাড়পার হবে কোন দুঃখে? দেখাশুনো করতে হবে না?

এসটেটের কিছু থাকলে তো দেখাশুনো করবে, বেশ হেঁয়ালি-হেঁয়ালি গলায় সপেটা বললেন করঞ্জাক্ষ।

তার মানে? এবার দেখা গেল পুত্র বিগ্রহের মেরুদণ্ড সিধে হয়ে গেছে। চোখ দুটোতেও আর আয়েসী আয়েসী ভাব নেই।

করঞ্জাক্ষ তাঁর আজানুলম্বিত (গেরিলাদের হাতের মতন) দুই হাত বুকের ওপর আড়আড়ি করে রেখে বললেন দ্রিমি-দ্রিমি স্বরে, মানে অতি সরল। বিগ্রহ-জাদুঘরের বিগ্রহ যোগাড় করতে কোটি কোটি টাকা উড়িয়েছি, গ্রহ-গ্রহাণু নিয়ে আমেরিকার তাবড় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের খরচে গবেষণা চালাতে গিয়ে কোটি কোটি টাকা ড্রেন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। লক্ষ কোটি টাকার মালিকদের কাছে আমার রয়াল এসটেট বাঁধা পড়ে আছে একটাই শর্তে—আমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পর তারা সব দখল করবে, তার আগে কিসসু বলবে না—।

ও মাই গড! করুণ কান্নার গলায় বললেন ত্রিলোচন।

সরি, মাই ফ্রেন্ড। করঞ্জাক্ষ তিল-মাত্র 'সরি' হয়েছেন বলে মনে হলো না। তোমার আফ্রিকা অভিযানের জন্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সরিয়ে রেখেছিলাম, তাও আর দেওয়া যাবে না। তবে বিগ্রহ-জাদুঘরের সবেতন কিউরেটর থাকবে আমৃত্যু—কেউ তোমাকে ঘাঁটাবে না।

ঘরে ছুঁচ পড়লেও টুং করে আওয়াজ শোনা যাবে, এমনি নৈঃশব্দ।

খুশি হলেন করঞ্জাক্ষ। বিশাল বপুতে একটা হিল্লোল তুললেন। ভোক্যাল কর্ডে যেন দামামা বাজিয়ে বললেন, তবে হ্যাঁ, একেবারে পথে বসিয়ে যাচ্ছি না কাউকেই। সেবার চায়না গিয়ে প্রাচীন রাজবংশের একটা হীরের পেনড্যান্ট পেয়েছিলাম। চোরাই পেনড্যান্ট। সতেরোটা দুর্লভ হলুদ হীরে দিয়ে গড়া পেনড্যান্ট। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না তাই হীরের পেনড্যান্টের গপ্পো আমার বউকেও শোনাইনি। কিনে এনে এই বাড়িতেই রেখে দিয়েছি। দর যাচাইও করেছি। বর্তমান দাম শুনলে চক্ষু চড়কগাছ হতে পারে। মাত্র তিরিশ কোটি রজতমুদ্রা।

শুনেই দম আটকে এল ঘরসুদ্ধ লোকের। হৃষ্টচিত্তে তা অবলোকন করলেন করঞ্জাক্ষ।

বললেন, আমি পটল তুললে পেনড্যান্ট বেচে কে কত টাকা নেবে, তার ফর্দ করে রেখে দিয়েছি পেনড্যান্টের পাশে। এইবার দেখাচ্ছি পেনড্যান্ট।

বলে, অ্যাবাউট টার্ন করলেন করঞ্জাক্ষ। এখন তিনি মোনালিসার ছবির দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছেন। পেরেক থেকে মোনালিসা না খুলেই বাঁ হাতে টেনে উঠিয়ে ধরলেন। মোনালিসার আড়ালে দেওয়ালে রয়েছে ইস্পাতের সিন্দুক। উনি বিশাল বুক-পিঠ দিয়ে তা আড়াল করে দাঁড়িয়ে, ডান হাতে খুটুর খুটুর করলেন। সিন্দুকের ডালা কব্জার ওপর ঘুরিয়ে খুললেন। ভেতর থেকে

একটা বস্তু বের করে ঝাড়বাতির তলায় আঙুলে ঝুলিয়ে রেখে বললেন, চীনের রাজবাড়ি থেকে লুঠ হওয়া ঐতিহাসিক পেনড্যান্ট।

লক্ষ রোশনাই ঠিকরে গেল সতেরোটা হলুদ হীরের গা থেকে। সবাই এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। সবারই চোখে হীরে জ্বলছে। মিন মিন করে বিগ্রহ বললে, ব্যাঙ্ক লকারে রাখলে ভাল হতো।

জবাব না দিয়ে, ঘুরে গিয়ে পেনড্যান্ট সিন্দুকের ভেতর রেখে ডালা বন্ধ করে দিয়ে খুটখাট করলেন করঞ্জাক্ষ। চওড়া বুক-পিঠ দিয়ে আড়াল করে রাখলেন সিন্দুক। মোনালিসাকে যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিয়ে ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় বললেন, নম্বরি লক। কম্বিনেশন আমি ছাড়া কেউ জানে না।

খেয়েদেয়ে একতলার ডাইনিং হল থেকে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ করে করে দোতলার চাতালে উঠে ডানদিকের শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন করঞ্জাক্ষ। বাকি সবাই রইল ডাইনিং হলেই—চুপচাপ। গুলতানির মুডও নেই কারুর।

একটু পরেই একই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যে-যার ঘরে চলে গেল একজন ছাড়া সব্বাই। সবশেষে উঠলেন ত্রিনয়না। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলেই তো হলো না, বাড়ির গিন্নির তারপরেও অনেক কাজ থাকে। তিনি আস্তে আস্তে দোতলার চাতালে উঠে ডানদিকের শোবার ঘরে ঢুকলেন। পরমুহূর্তেই ছিটকে বেরিয়ে এসে চিল-চিৎকারে বাড়ি মাথায় করলেন।

তুড়ি মারতে যেটুকু সময় যায়, তার মধ্যেই সবাই বেরিয়ে এল যে-যার ঘর ছেড়ে। বেশ বোঝা গেল, কারোর চোখেই ঘুম ছিল না।

ত্রিনয়না তখন আস্তে আস্তে চাতালে লুটিয়ে পড়তে পড়তে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, মরে গেছে।

জ্যা মুক্ত তীরের মতন ঘরের মধ্যে ছিটকে গেল শুধু বিগ্রহ। দেখল, ডক্টর করঞ্জাক্ষ কাঞ্জিলাল বিছানায় নেই—মেঝেতে চিৎ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। একটা রুপোর বাঁটওলা ছোরার পুরো ফলা বুকের বাঁ দিকে ঢুকে রয়েছে, মিশর থেকে এই ছোরা এনেছিলেন করঞ্জাক্ষ, রাখতেন শোবার ঘরের ছোট টেবিলে।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে ডাইনিং হলের নিচু টেবিলে রাখা টেলিফোন রিসিভার তুলে নিয়ে সটাসট বোতাম টিপে গেলেন ত্রিলোচন। বললেন, পুলিশ? এখানে একটা খুন হয়েছে। ডাক্তার নিয়ে চলে আসুন।

পুলিশ ইন্সপেক্টরের সামনে বসেছিল ধুতি-পাঞ্জাবি পরা গায়ে শাল জড়ানো এক সুদর্শন পুরুষ। ইন্সপেক্টর মণিচন্দ্র মোহান্ত তার দিকে তাকিয়ে রেগেমেগে বললে, কী আশ্চর্য! তুমি কি ল্যাজে বেঁধে উৎপাত টেনে আনো?

উৎপাতটা কি ধরনের? প্রশ্ন করল সুদর্শন পুরুষ।

মার্ডার।

তুষারপাত শুরু হয়েছিল সন্ধ্যে থেকেই।

কাঞ্জিলাল অট্টালিকার সদর দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল দুটি মূর্তি। গ্রহাণু আর তার বর চঞ্চলকুমার। গায়ক। আমেরিকায় সেটেলড।

তুষারপাত সাদা করে দিয়েছে বাগান ফটক পর্যন্ত। দুজনে দরজা থেকে একটু এগিয়ে দাঁড়াল বাগানের রাস্তায়।

চঞ্চকুমার বললে, একি গেরোয় পড়লাম রে, বাবা!

গ্রহাণু সামনের দিকে তাকিয়ে বললে, দেখেছো?

কী?

ফটক থেকে দরজা পর্যন্ত বরফে কারও পায়ের ছাপ নেই।

সে তো দেখাই যাচ্ছে।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি বলে শুধু আমাদের দুজনের পায়ের ছাপ পড়েছে বরফে।

তাতে কি হলো?

খুনী বাইরে থেকে আসেনি, বাড়িতেই আছে।

ওরে বাবা!

চলো, বাড়িটায় একপাক মেরে আসি।

দুজনে পাক দিয়ে এল গোটা বাড়ি। বরফে শুধু ওদের দুজনের পায়ের ছাপ পড়ল। ওরা ঢুকে গেল বাড়িতে।

পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়ালো ফটকের সামনে। হেডলাইটের আলোয় ঝকঝক করছে তুষারপাতে সাদা বাগানের পথ।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সুদর্শন পুরুষ সাদা শালটা গায়ে বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে বললে, খুনী বাইরে থেকে আসেনি। বাগানে পায়ের ছাপ পড়েনি।

খেঁকিয়ে বললে ইন্সপেক্টর, কুইক মার্চ।

সদর দরজার সামনে এসে দেখা গেল, দুজনের পদচিহ্ন দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে গেছে, আবার ওপাশ দিয়ে এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে।

পদচিহ্ন অনুসরণ করে, গোটা বাড়ি পরিক্রমা করে, সদর দরজার সামনে ফিরে এল দুজনে।

বললে সুদর্শন পুরুষ, খুনী বাড়ির ভেতরেই আছে।

দোতলার বেডরুমে ঢুকে চিৎপটাং করঞ্জাক্ষের বুকে বেঁধা ছোরার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুদর্শন পুরুষ বললে, ছোরা মারা হয়েছিল বিছানায়। মরার আগে যেটুকু জ্ঞান ছিল তার মধ্যেই বিছানা ছেড়ে নেমে এসেছিলেন। কেন? ইতিউতি তাকিয়ে মেঝে থেকে একটা রাইটিং প্যাড তুলে নিয়ে বললে, এইজন্যে।

সাদা কাগজে অতি কষ্টে লেখা শুধু একটা শব্দ—বিগ্রহ।

বললে সুদর্শন পুরুষ, মরবার আগে খুনীর নাম লিখে দিয়ে গেছেন। বিগ্রহ কার নাম?

একতলার ডাইনিং হলে টেবিলে বসে আছে সবাই।

বাঘের চোখে বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে বললে ইন্সপেক্টর মণিকান্ত মোহান্ত, আপনি খুন করেছেন নিজের বাবাকে?

না, শক্ত ঠোঁটে ছোট্ট জবাব বিগ্রহর।

মণিকান্ত হাঁ করেছিল ফেটে পড়বার

তুমি ল্যাজে বেঁধে উৎপাত টেনে আনো?

জন্যে, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে সুদর্শন পুরুষ, গোড়া থেকে সব শোনা যাক।

সব শোনবার পর সুদর্শন পুরুষ বললে চঞ্চলকুমারকে, শ্বশুর খুন হয়েছে জেনেও সস্ত্রীক বেড়ানোর শখ হলো?

চঞ্চলকুমার নিরুত্তর। ঠোঁট কাঁপছে। গ্রহাণু শক্ত গলায় বললে, খুনী বাইরে থেকে এসেছে কিনা দেখতে বেরিয়ে ছিলাম।

আপনার কাকে খুনী বলে মনে হয়?

তিনি তো এই ঘরেই আছেন।

গ্রহাণু নীরব।

কে আবার, খেঁকিয়ে উঠল ইন্সপেক্টর, রাইটিং প্যাডে যার নাম লেখা হয়েছে—সে।

মণিকান্ত, নরম গলায় বললে সুদর্শন পুরুষ, বিগ্রহ নিজেই বলেছিল পেনড্যান্ট যেন ব্যাঙ্ক লকারে থাকে। সে তো নম্বর কম্বিনেশন জানতে চায়নি। ডক্টর কাঞ্জিলালের কিন্তু ইচ্ছা ছিল, পেনড্যান্ট বেচে সবাই শেয়ার নিক। হঠাৎ মৃত্যু এসে যাওয়ায় উনি নম্বর কম্বিনেশন জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—এখন আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।

অ্যাবসার্ড! উনি লিখেছেন খুনীর নাম—বিগ্রহ।

উনি বলতে চেয়েছেন, বিগ্রহ জানে নম্বর কম্বিনেশন।

হকচকিয়ে গেল বিগ্রহ, আমাকে তো বলে যাননি।

ধমকেছিলেন ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাসট্রনমিক্যাল সোসাইটির বুলেটিন পড়ে কপচানোর জন্যে।

মুখ লম্বা হয়ে গেল বিগ্রহর।

বলে গেল সুদর্শন পুরুষ, বুলেটিনে কোনও নম্বর ছিল?

চোখ ছোট হলো বিগ্রহর—বড় হয়ে গেল পরক্ষণেই, হ্যাঁ, ছিল। খুনে গ্রহাণুর নম্বরি নাম।

কি নম্বর?

1997 × F11.

নাকের নিচে সরু গোঁফে তর্জনী বুলিয়ে নিয়ে সুদর্শন পুরুষ বললে, ইংরেজি বর্ণমালায় ×-এর জায়গা কত নম্বর? আমিই বলছি—24. F-এর জায়গা কত নম্বরে? 6। তাহলে, 1997 ⊗F11 শুধু সংখ্যায় লিখলে হয়, 199724611। মণিকান্ত, অ্যাম আই কারেক্ট?

গোমড়া মুখে বললে ইন্সপেক্টর, গড নোজ।

লেট আস ট্রাই, বলেই মোনালিসার ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুদর্শন পুরুষ। পেরেক থেকে ছবি নামিয়ে রাখল মেঝেতে। দেখা গেল, ইস্পাতের সিন্দুক। করঞ্জাক্ষ চওড়া বুক-পিঠ দিয়ে আড়াল করে রাখায় এতক্ষণ যা দেখা যায়নি এখন তা দেখা যাচ্ছে। ঠিক মাঝখানে ইঞ্চি ছয়েক ব্যাসের বেশ উঁচু মোটা চাকতি। তাকে ঘিরে আরও দুটো চাকতি। প্রথমটার কিনারায় 1 থেকে 0 পর্যন্ত সংখ্যা লেখা। দ্বিতীয় চাকতির মাথায় একটা খাঁজ। সংখ্যার চাকতি ঘুরিয়ে ওই খাঁজে মিলোতে হবে।

তাই করে গেল সুদর্শন পুরুষ। সংখ্যা- চাকতি ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। 199724611 মেলাল বাইরের চাকতির খাঁজের সঙ্গে। মাঝের মোটা উঁচু 'নব' ধরে মারল টান।

পাল্লা খুলল না।

বিগ্রহকে বললে সুদর্শন পুরুষ, বুলেটিনে আর কোনও সংখ্যা ছিল?

বলবার জন্যেই তৈরি হয়ে ছিল বিগ্রহ, 108—

কিসের সংখ্যা?

108টা গ্রহাণুর লিস্ট বানানো হয়েছে—তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেও পড়তে পারে পৃথিবীর ওপর। নজর রাখা হয়েছে

তাদের ওপর।

108 সংখ্যাটা বুলেটিনের কোন জায়গায় ছিল? মানে, 1997 (X) F11-এর আগে, না, পরে?

আগে।

তাহলে আগে 108, তারপরে 199724611, বলতে বলতে সিন্দুকের দিকে ফিরে সংখ্যা-চাকতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খাঁজের সঙ্গে মিলিয়ে গেল সুদর্শন পুরুষ। খচ-খচ-খচ করে তিনটে শব্দ ভেসে এল সিন্দুকের ভেতর থেকে।

মোটা 'নব' ধরে টান মারতেই ঘুরে গেল পাল্লা কব্জার ওপর।

ভেতরে একটা কুঠরি। শূন্য। পেনড্যান্ট নেই।

কপালের ঘাম মুছে পাল্লা বন্ধ করে দিল সুদর্শন পুরুষ। ফের টানলেও আর খুলল না।

'নব'-এর নিচে নজর গেল এতক্ষণে। সিন্দুক-নির্মাতার নাম-ধাম লেখা প্লেট লাগানো রয়েছে সেখানে। দামও লেখা রয়েছে তলায়—

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল সুদর্শন পুরুষ। তারপর ঘুরে দাঁড়াল ত্রিনয়না কাঞ্জিলালের দিকে। বললে, ডবল দাম দিয়ে কিনেছেন দেখছি।

ত্রিনয়না বললেন, আমিও তাই বলেছিলাম। এই সিন্দুক-এর অর্ধেক দামে পাওয়া যায়। শুনে উনি হেসেছিলেন।

ডবল দামটা তাহলে জেনেশুনেই দিয়েছেন ডবল চেম্বারের জন্যে। বহু সিন্দুকে তাই থাকে—চেম্বারের মধ্যে চেম্বার। দেখা যাক।

বলে চেয়ে রইল বিগ্রহর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলতে লাগল, একমাত্র পুত্র। তার নাম লিখে গেলেন মরবার আগে। উনি পেনড্যান্ট দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ছেলেকে। সব বাবা তাই চায়। বিগ্রহ...বিগ্রহ...বিগ্রহ। ইংরেজি বানান কী?

BIGRAHA—

আবার সরু গোঁফে তর্জনী বুলিয়ে নিয়ে থেমে থেমে বলে গেল সুদর্শন পুরুষ, ইংরেজি বর্ণমালায় এদের স্থানের সংখ্যা যথাক্রমে 29718181...। ঘুরে গেল সিন্দুকের দিকে, সংখ্যা-চাকতি ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 29718181-কে মেলাল বাইরের চাকতির খাঁজের সঙ্গে। টান মারল 'নব' ধরে...গোটা নব-টাই খুলে এল হাতে।

'নবে'র তলায়, পাল্লার পেছন-পিঠে একটা চৌকোনা খুপরি। তার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে সতেরোটা হলুদ হীরের 'পেনড্যান্ট'। তলায় একটা লিস্ট—শেয়ার পাবে যারা তাদের নাম।

পেনড্যান্টের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ত্রিলোচনের দিকে হীরক-কঠিন চাহনি নিক্ষেপ করল সুদর্শন পুরুষ, ত্রিলোচনবাবু, আমি জানি আপনিই বন্ধুহত্যা করেছেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা থেকে বঞ্চিত হওয়ায়।

আপনি বাতুল, চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন বৃদ্ধ ত্রিলোচন।

সুদর্শন পুরুষের চোখে এখন বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে, কণ্ঠে ডম্বরু বাজছে, আপনিই ডেডবডি না দেখেই টেলিফোনে বলেছিলেন, এখানে একটা খুন হয়েছে। যিনি খুন হয়েছেন, তাঁর স্ত্রী কিন্তু ডেডবডি দেখে শুধু বলেছিলেন, মরে গেছে। দু'নম্বর ক্লু—একই সঙ্গে খুনীর নাম আর পেনড্যান্টের হদিস বলে গেছেন নিহত ব্যক্তি।

নিষ্ঠুর হেসে বললেন ত্রিলোচন, উনি শুধু লিখে গেছেন, বিগ্রহ—

মুখের কথা ছিনিয়ে বললে সুদর্শন পুরুষ, বিগ্রহ-জাদুঘরের প্রথম শব্দটা বিগ্রহ, যেখানকার কিউরেটর আপনি।

এবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ত্রিলোচনের।

কণ্ঠের দুন্দুভি-ধ্বনি অব্যাহত রেখে বলে গেল সুদর্শন পুরুষ, পুলিশ জানে কি করে স্বীকারোক্তি বের করতে হয়। তখন বলবেন, না, এখন বলবেন?

হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি, শুষ্ক জবাব ত্রিলোচনের, কিন্তু আপনি কে?

ইন্দ্রনাথ রুদ্র—প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

ছবি: মদন সরকার

নাচানাচি

সঞ্জীব কুমার দে

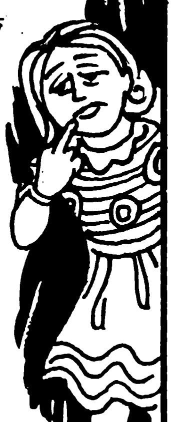

নাচ জানো? কচুপোড়া!
নাচো কুচিপুরি তো—!
যেই বলা দেখি তার
চোখ দু'টি স্ফুরিত!

বেশ ওটা বাদ দাও,
নাচো কথাকলি তো—!
ওরে বাবা, শুনে তার
চোখ ছল-ছলিত!

বেশ বেশ তাও থাক,
নাচো তবে কথক-ই!
শুনে তার আওড়ানো
অজুহাত কত্তো কি—!

তবে নাচো ওই যে কী
ওড়িশি না ওডিসি—!
যেই বলা সেই ছুট
নেই আর হদিস-ই!

খাই খাই

হান্নান আহসান

শরীরটা ভাল নয়, পেট ফুলে ঢোল
—এগরোল।

পরিপাক নিষ্ক্রিয়, তবু ঠিক চাই চাই
—ফিশফ্রাই।

লোভে লোভে গিললেও, মুখে করি হেট
—কাটলেট।

সারাদিন উহু আহা, কেন যে খেলাম ছাই
—মোগলাই।

পারছি না পারছি না, নাগাড়েই কিন্‌কিন্‌
—চাউমিন।

এত খাই তত খাই, তবু করি খাই খাই
—বালুসাই।

ছবি: সৃষ্টি

আমার প্রথম মক্কেল

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আমার নাম উদ্দালক প্রধান। পরিচিত মহলে সবাই আমাকে ইউ পি বলে ডাকে। আমার বয়স এখন ত্রিশ। গত পাঁচ বছর ধরে বহু চেষ্টা করেও যখন মনের মতো চাকরি যোগাড় করতে পারলাম না, তখন আমি 'ইনভেস্টিগেশন গ্রুপ' নামে এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিটি খুলে বসলাম।

প্রশ্ন করতে পারেন এত কাজ থাকতে ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলতে গেলাম কেন? আমি ছোটবেলা থেকে একটু ডাকাবুকো প্রকৃতির। নিয়মিত ব্যায়াম করি। ক্যারাটে জানি। ভালো ফুটবল খেলি। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় স্পোর্টসে অনেক প্রাইজ পেয়েছি। সরকারি চাকরি করবো না ঠিক করেছিলাম। কিন্তু বেসরকারি চাকরি পেলাম না। শেষে ঠিক করলাম স্বাধীনভাবে কিছু করবো। যাতে যথেষ্ট বুদ্ধি লাগে। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিল। শেষে আমার বোন ঋতু বলল, দাদা, একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলবি?

আমার তখনও পর্যন্ত খুব একটা আত্মবিশ্বাস ছিল না। গোয়েন্দা উপন্যাসে পড়ি শখের গোয়েন্দাদের নানা কথা: তারা কত সহজে স্রেফ বুদ্ধি খাটিয়ে কত রহস্যের জট ছাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বাস্তব জগতে কি সত্যি এমন ঘটে! আমি শুনেছি প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি যারা চালায় তারা সবাই পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। আমার তো কোনো ট্রেনিংই নেই। কে আমায় কাজ দেবে?

কিন্তু ঋতু বলল, একবার লাক ট্রাই কর না দাদা। কাজ করতে করতেই অভিজ্ঞতা হবে। বাবাকে বলে বাইরের ঘরটা সাজিয়ে নে। ফোন তো রয়েছেই।

কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে পিস্তলের লাইসেন্স নিতে হবে। একটা পিস্তলের দাম কত জানিস? পনের-বিশ হাজার টাকা—

ঋতু ছাড়ার পাত্রী নয়। সে বলল, পিস্তল ছাড়াও গোয়েন্দাগিরি হয় দাদা। পিস্তলের চেয়ে যেটি আরও দরকারী সেটি সাহস ও বুদ্ধি; সেটা তোর আছে তুই দুর্গা বলে নেমে পড় তো।

আমি বললাম, তোকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে হবে কিন্তু।

ঋতু বলল, ওরে বাবা, ওসব আমি পারব না। আমি বাড়ি বসে তোকে বড়জোর বুদ্ধি দিতে পারি।

এর দিন কয়েক পরেই আমি আনন্দবাজার ও স্টেটসম্যানে একটি বিজ্ঞাপন দিলাম। আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপনটি এই:

আপনার যে কোনো সঙ্কটে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করুন :

দ্য ইনভেস্টিগেশন গ্রুপ
উদ্দালক প্রধান (ইউ.পি.)
প্রাইভেট ডিটেকটিভ।
১৯, বালিগঞ্জ টেরাস
কলকাতা ৭০০ ০১৯।
নিচে টেলিফোন নম্বর।

বিজ্ঞাপনটি বেরুল এক রবিবার। তারপর থেকে আমি ও ঋতু উত্তেজনায় টান টান হয়ে টেলিফোনের সামনে বসে আছি। রবিবার সারাদিন গেল, সোমবার গেল, মঙ্গলবার গেল, একটা ফোনও এল না।

বাবা ঠাট্টা করে বললেন, ঘাবড়াস না, যখন কলকাতা পুলিশ হাল ছেড়ে দেবে তখন মক্কেলরা তোর কাছে আসবে।

সত্যি সত্যি বোধহয় তাই হলো। বুধবার সকাল আটটা নাগাদ বিছানায় শুয়ে শুয়ে যোগব্যায়াম করছি, ঋতু কর্ডলেস ফোনটা আমার কাছে নিয়ে এসে বলল, দাদা ফোন—

কে? কে ফোন করেছে? আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

ঋতু ফোনের স্পিকারটা এক হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, বোধ হয় তোর প্রথম মক্কেল।

॥ দুই ॥

আমি হ্যালো বলতেই ওপার থেকে আওয়াজ ভেসে এল, আমি কি মিঃ ইউ পি-র সঙ্গে কথা বলতে পারি?

আমি ইউ পি বলছি।

সুপ্রভাত। আমার নাম হোসেনুর রহমান।

আমি বেশ অবাক হয়ে বললাম, আপনি কি গোয়েন্দা প্রধান মিঃ হোসেনুর রহমান?

উত্তর হলো, ঠিক ধরেছেন, আমিই সেই—

আমি একটু থতোমতো খেয়ে বললাম, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি স্যর—আমার নির্ঘাৎ ধারণা হলো পুলিশের অনুমতি না নিয়ে দুম করে একটা গোয়েন্দা এজেন্সি খুলে বসে আমি একটা বেআইনি কাজ করে বসেছি। হয়তো সেই অপরাধেই—

হোসেনুর রহমান বললেন, আপনি কি এখন বাড়িতে আছেন? আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আমার মুখ দিয়ে ভাল করে কথা সরল না। বললাম, আসুন।

টেলিফোনের সুইচ বন্ধ করে ঋতুকে বললাম, আমার প্রথম মক্কেল গোয়েন্দা প্রধান হোসেনুর রহমান স্বয়ং। আর তিনি আসছেন আমায় গ্রেফতার করতে।

ঋতু বলল, ধেৎ, হতেই পারে না। ইচ্ছে মতো পেশা বেছে নেবার অধিকার সবারই আছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার ঋতু পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়ে। সুতরাং এসব ব্যাপার সে ভালো বোঝে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, হোসেনুর সাহেব এলে ঋতুকেই সামনে এগিয়ে দেব।

হোসেনুর সাহেবের জিপ কিছুক্ষণ পরে আমাদের বাড়ির সামনে এসে থামল। আমি দরজা খুলে তাঁকে স্বাগত জানালাম। তাঁকে আমি সামনাসামনি কখনও দেখিনি। তবে টিভিতে প্রায়ই তাঁকে দেখি। সুতরাং তাঁর চেহারা, গলার স্বর আমার মুখস্থ।

আমার অপিস ঘরে সোফায় তাঁকে বসালাম। ঋতুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, আমার বোন ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ঋতু প্রধান।

হোসেনুর করমর্দন করে বললেন, তরুণ গোয়েন্দা ও তাঁর তরুণী অ্যাসিস্ট্যান্টকে দেখে আমি খুব প্রীত হলাম মিঃ ইউ পি। গোয়েন্দাগিরি শুধু আমাদের মতো উর্দিধারী পুলিশ অফিসারদের জন্যই নয়। প্রতিদিন কত ঘটনা ঘটছে, পুলিশ সব তদন্ত করতে পারে না। অনেক কেস আইনত পুলিশের এক্তিয়ারে আসে না। আমরা চাই, আপনাদের মতো আরও তরুণ ইনভেস্টিগেশনের কাজে এগিয়ে আসুন।

আমি একটু হাল্কা বোধ করতে লাগলাম। না, হোসেনুর আমায় গ্রেফতার করতে আসেননি। বরং আমার মক্কেল হতেই এসেছেন।

তিনি একটি বিচিত্র মামলা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন।

মামলাটি হলো খুনের। খুনের ওই কেসটি আমার ভাল করে জানা আছে। আজ থেকে মাস ছয়েক আগে খবরটি খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। হোসেনুর আমাকে পেপার ক্লিপিং দেওয়ায় আমার মনে করতে সুবিধে হলো।

চামেলী হত্যাকাণ্ডের নায়ক গ্রেফতার

১/১ রমেশ মিত্র রোডে গঙ্গা-যমুনা অ্যাপার্টমেন্টের আবাসিক মিঃ আয়েঙ্গারের পত্নী চামেলী দেবীকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ ওই পরিবারের প্রাক্তন গৃহভৃত্য হীরুকে রবিবার ভোরে বাগুইহাটির একটি বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের কাছে হীরু স্বীকার করেছে সে চামেলী দেবীর গহনা চুরি করার উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল। সে ভেবেছিল ঘুমন্ত অবস্থায় চামেলী দেবীর গলা থেকে সে পাঁচভরির হারটি খুলে নিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু চামেলী দেবীর ঘুম ভেঙে যায়। সে সময় দুজনে ধস্তাধস্তি হয়। ওই সময় হীরুর পিস্তল থেকে একটি গুলি ছিটকে চামেলী দেবীর বুকে লাগে। তিনি ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যান।

আমি ক্লিপিংটি পড়ে বললাম, এই খবরটি আমি সেসময়ই পড়েছিলাম। পুলিশ তো অপরাধীকে গ্রেফতারই করে ফেলেছে। অপরাধীও স্বীকার করেছে। ব্যস, এরপর তো চার্জশিট দেওয়া শুধু বাকি থাকে। সেটাও পুলিশের কাজ।

হোসেনুর বললেন, ভবানীপুর থানা কেসটি করছে। আপনারা জানেন, থানা যদি কোনো কেস তদন্ত করার দায়িত্ব নেয়, আমরা আর তখন তাতে ইন্টারফেয়ার করি না। আমাদের ডিডির

হাতে এমনিতেই প্রচুর কেস। কলকাতায় এখন মার্ডার তো লেগেই আছে। তাই থানার হাত থেকে স্বেচ্ছায় আমরা কোনো কেস নিই না। কিন্তু আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বলছে, মামলাটি অত সহজ নয়। হীরু যা বলছে তা সত্যি নাও হতে পারে।

তার মানে আপনি সন্দেহ করছেন হীরু আসল খুনী নয়? আমি বললাম।

খুনী হতে পারে। কিন্তু হীরু অনেক সত্য গোপন করছে।

কি করে আপনার মনে হলো?

মিঃ ইউ পি, আপনি একজন ঝকঝকে বুদ্ধিমান গোয়েন্দা। বলুন তো একজন খুনী কনফেস করে কেন?

অনেক কারণে। এক নম্বর—পুলিশি অত্যাচারের শিকার হয়ে, দুই—বিবেকের তাড়নায়, তিন—আরও বড় কোনো সত্য গোপন করার জন্য।

কারেক্ট। হোসেনুর টিভি ক্যুইজ-মাস্টারের ঢঙে বলে উঠলেন। এক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে আপনার শেষের অনুমানটাই সত্যি। খুনটা কীভাবে হয়েছিল আপনার মনে আছে তো? চামেলী দেবীর বয়স পঞ্চাশ। তাঁর স্বামী মিঃ আয়েঙ্গারের বয়স পঞ্চান্ন। তিনি রবার্টসন ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন পদস্থ অফিসার। দুজনে ওই ফ্ল্যাটে থাকতেন। ওঁদের একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে রৌরকেল্লায়।

হীরু ছিল ওঁদের বিশ্বস্ত পুরনো চাকর। দশ বছর ওঁদের পরিবারে কাজ করার পর একদিন স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেয়। বলে সে এখন ব্যবসা করতে চায়। আর কারও বাড়ি কাজ করবে না।

কতদিন আগে সে চাকরি ছাড়ে?

তিন বছর আগে। এই তিন বছরের মধ্যে আয়েঙ্গার পরিবার হীরুর খবর পায়নি। তিন বছর পরে এক দুপুরে চামেলী দেবী যখন তাঁর ফ্ল্যাটে একা ছিলেন তখন তিনি খুন হন। হত্যাকারী তাঁকে রিভলবার দিয়ে গুলি করে।

রিভলবার হীরু কোথা থেকে পেল?

ওটি মিঃ আয়েঙ্গারের রিভলবার। অফকোর্স তাঁর লাইসেন্স ছিল। রিভলবারটি কোথায় থাকত তা হীরু জানত।

কিন্তু হীরু তো রিভলবার চালাতে জানত না।

অনুমান করা যায় সে তিন বছর বন্দুকবাজিতে দড় হয়েছে। এটি কি করে হলো? সে ব্যবসা করত, কিসের ব্যবসা? ভবানীপুর থানার আই. ও-র খবর জমি কেনাবেচার দালালি করত হীরু। তাতে রিভলবার লাগে না। তাছাড়া হীরু তার স্বীকারোক্তিতে বলেছে, সে নাকি চামেলী দেবীর কাছে চাবি ফেরৎ দিতে গিয়েছিল। প্রথমে সে বেল বাজায়। লোডশেডিং ছিল বলে বেল কাজ করছিল না। তাই সে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। দেখে চামেলী দেবী ঘুমোচ্ছেন। তাঁর গলায় পাঁচ-ছ' ভরি একটা হার। হারটা দেখে সে লোভ সামলাতে পারে না। তাই আলতো করে খুলে নিতে যায়। এমন সময় চামেলী দেবী ঘুম থেকে উঠে হীরুকে দেখে চেঁচাতে যান। হীরু তাঁর মুখ চেপে ধরতে গেলে চামেলী দেবী দেওয়ালে দেরাজের মধ্য থেকে রিভলবার বার করেন। হীরু সেটি কেড়ে নিতে যায়। তখনই গুলি ছটকে বেরিয়ে যায়। হীরু তখন ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

যাবার সময় হারটা কি নিয়ে গিয়েছিল?

থ্যাঙ্ক ইয়ু ইউ পি। এই প্রশ্নটি করে আপনি প্রমাণ করে দিলেন আপনার ইনার আই অর্থাৎ রহস্যভেদী দৃষ্টি আছে। হ্যাঁ, আমার খটকা এখানেই। হীরু হারটা নিয়ে যায়নি।

হারটা চুরি করার উদ্দেশ্যেই যদি সে এসে থাকে তাহলে হারটা না নিয়ে সে চলে গেল কেন?

হোসেনুর বলে চললেন, এখানেই আমার মনে হচ্ছে হীরু আরও কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। এই মার্ডার সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। তিন বছর পরে হঠাৎ হীরুর চাবি ফেরৎ দেবার ইচ্ছে জাগল কেন? সৎ উদ্দেশ্য থাকলে সে সন্ধ্যার পর মিঃ আয়েঙ্গার অফিস থেকে আসার পর আসতে পারত।

ভবানীপুর থানা কিন্তু এত সব প্রশ্নের মধ্যে যায়নি। তারা এটাকে খুব সাধারণ ক্রাইম বলে মনে করছে, যা গৃহভৃত্যরা আকছার করে থাকে। কিন্তু সিপি চান না আমি ভবানীপুরের ওসিকে চটাই। তাই তিনি আমায় স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, তুমি চামেলী মার্ডার কেস নিয়ে মাথা গলিও না হোসেনুর। ওই কেস সলভ হয়েই গেছে। কিছুদিনের মধ্যেই আই.ও চার্জশিট দেবে। তাই কাগজে বিজ্ঞাপনটি দেখে আমি আপনার সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিলাম। দেখলাম আপনি জেনুইন প্রফেসনাল গোয়েন্দা এজেন্সি। আমার সবচেয়ে বড় সুবিধে আপনাকে কেউ চেনে না। আপনি গোপনে এই মামলার একটা সমান্তরাল তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবেন। আপনাকে তদন্ত করে দেখতে হবে এই মার্ডারের পিছনে কোনো গোপন রহস্য আছে কিনা। এর জন্য আপনার যোগ্য ফিজ আমি আপনাকে দেব। বাই দি বাই, আপনার ফিজ কত ইউ পি?

আপনি আমার প্রথম মক্কেল, আপনি যা ফিজ দেবেন তাই নেব।

তাহলে দু' হাজার টাকা ক্যাশ আপনি এখনই রাখুন। আর তিন হাজার ফাইন্যাল রিপোর্ট পেলে দেব। টাকাটা পরিশ্রমের তুলনায় খুব কম হয়ে গেল ইউ পি, আমাদের সোর্স মানি থেকে এর চেয়ে বেশি টাকা আমরা দিতে পারি না। ডোন্ট মাইন্ড। টেলিফোনে যোগাযোগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গোয়েন্দা প্রধান হোসেনুর রহমান চলে গেলেন।

।। তিন ।।

আমি ও ঋতু মিলে মোটামুটি একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিলাম।

তদনুযায়ী ঠিক হলো, আমরা দুজন হীরুর ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেব।

হীরু বাগুইহাটিতে একটি একতলা বাড়ি করেছে বলে হোসেনুরের কাছে শুনেছিলাম। তিনি আমায় ঠিকানাও দিয়েছিলেন। সেই ঠিকানা অনুযায়ী আমি ও ঋতু গিয়ে হাজির হলাম হীরুর বাড়ি।

হীরু তখনও জেল হাজতে এটা আমরা জানতাম। কিন্তু ভান করলাম যেন কিছুই জানি না।

বাড়িটি নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার পর এক অল্পবয়সী বিবাহিতা মহিলা বেরিয়ে এল।

কাকে চাই?

এখানে হীরুবাবু থাকেন?

মহিলা আমাদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, কোথা থেকে আসছেন?

আমার নাম উদ্দালক প্রধান। আমার বোন ঋতু। গত বছর হীরুবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। উনি আমাদের অফিসে এসেছিলেন একটা বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারে। তা আমার নিজের এখন বাড়ির দরকার।

আপনি ওর সম্পর্কে কিছু শোনেননি?

না তো, কি হয়েছে ওঁর? আমি অবশ্য গত তিন মাস দিল্লি ছিলাম।

ওঁকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

কেন, কি করেছেন উনি?

কিছুই করেননি। শত্রুতা করে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে।

কারা?

ওসব কথা বলতে পারব না, আপনারা পরে আসবেন।

দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি ও ঋতু হীরুর বাড়ির সামনে একটি চায়ের দোকানে চা খেতে ঢুকলাম। দোকানে তিন-চারটি যুবক বসেছিল। আমরা ঢুকতেই তারা আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। প্রত্যেকের চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। সামনের চেয়ারে ঝাঁকড়া চুল, মুখে একমুখ দাড়ি, পাজামা-পাঞ্জাবি পরা একটি তরুণ এসে বসল।

আমি বললাম, দাদা কি এখানেই থাকেন?

কেন বলুন তো?

আমরা এসেছিলাম হীরুবাবুর কাছে একটি ফ্ল্যাট ভাড়ার জন্য। তা ওঁর বাড়ি থেকে বলল উনি নাকি—

আপনি জানতেন না, কোথায় থাকেন আপনারা?

বালিগঞ্জ। আমি প্রায়ই বাইরে বাইরে কাটাই। শুনে তো একদম থ। হীরুবাবুর কি কোনো শত্রুটত্রু ছিল, যারা ওঁকে জড়িয়ে দিয়েছে?

তা বলতে পারব না দাদা।

আপনি তো চিনতেন ওঁকে?

এক পাড়ায় বাড়ি, সবাই যেমন চেনে আমিও তেমন চিনতাম।

এমন সময় হীরুদের বাড়ি থেকে একটি বাচ্চা ছেলে বেরিয়ে এসে তরুণটিকে বলল, ফ্যালা কাকা, বউদি তোমায় এখনই ডাকছে।

লোকটির নাম যে ফ্যালা তা তখনই বুঝতে পারলাম।

রাত্রিবেলা ফোন করলেন হোসেনুর রহমান।

হীরুর বাড়ি গিয়েছিলেন শুনলাম।

আপনি কি করে জানলেন?

আমার চর আছে ওদিকে। আপনি চায়ের দোকানে বসে খবরাখবর নিচ্ছিলেন তাও বলেছে। কিছু ক্লু পেলেন?

পেয়েছি। হীরু দু'বছরের মধ্যে হঠাৎ বড়লোক হয়েছিল কীভাবে? সেটা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে। এদিকে তার প্রচুর টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল যার জন্য ওই বাড়িটা সে মর্টগেজ দেয় মানুভাই প্রপার্টিজের কাছে।

মানুভাই প্রপার্টিজ? আরে তারাই তো গঙ্গা-যমুনা ফ্ল্যাটের প্রমোটার।

হ্যাঁ, হীরুর নিয়মিত যাতায়াত ছিল মানুভাই-এর অপিসে।

কিন্তু চামেলী দেবী খুন হলেন কেন?

সেটা এখনও বুঝতে পারছি না। আমি মিঃ আয়েঙ্গারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দিলেন। খুন হবার আগে কদিন ধরেই মিসেস আয়েঙ্গার খুব উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। স্বামীকে কিছু একটা কথা বলি বলি করেও যেন বলতে পারছিলেন না। তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমার রিভলবারটার কার্তিজ ঠিকঠাক আছে তো? চামেলী দেবী নিজেও রিভলবার ছোঁড়া শিখেছিলেন। কলকাতায় যখন নকশাল হাঙ্গামা হয় তখনই মিঃ আয়েঙ্গার আত্মরক্ষার জন্য রিভলবারটি কেনেন। সেই সঙ্গে স্ত্রীকেও চালানো শিখিয়ে দেন। কিন্তু এতদিন পরে স্ত্রী রিভলবারের কথা জিজ্ঞাসা করছে জেনে তিনি একটু ঘাবড়ে যান।

চামেলী দেবী বলেন, ভয় পেও না। একলা একলা থাকি। তাই রিভলবারটির হদিস জেনে নিচ্ছি।

হোসেনুর বললেন, গুড পয়েন্ট। এটা আমি জানতাম না।

আমি বললাম, ডুপ্লিকেট চাবির ব্যাপারটিও ভালো করে জেনে নিলাম। হীরুর কাছে ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি থাকত। চাকরি ছেড়ে দেবার সময় চাবিটা ফেরৎ নিতে আর মনে ছিল না কারো। তারপর থেকে হীরুর আর হদিসও তাঁরা পাননি। হীরু পুলিশের কাছে বলেছে দিচ্ছি দিচ্ছি করে চাবিটা সে ফেরৎ দিতে পারেনি। তারপর নেহাৎ বিবেকের তাড়নাতেই সে চাবিটা ফেরৎ দিতে গিয়েছিল।

হোসেনুর বললেন, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কি ইউ পি! আমি চাইছি খুনের আসল মোটিভটা কী? চামেলী দেবী ভয় পেয়েছিলেন কেন? কে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিল? কিসের ভয়?

আমি বললাম, আমি মিঃ আয়েঙ্গারের ফ্ল্যাটটি আগামীকাল দেখতে যাচ্ছি। আপনি একবার আসুন না। দুজনে মিলে তাহলে পরামর্শ করা যাবে।

হোসেনুর বললেন, বেশ, আমি যেতে পারি, তবে আপনার বন্ধু হিসাবে—ডিসি ডিডি বলে আমার পরিচয় দেবেন না।

কিন্তু আপনাকে কে না চেনে?

আমি এমনভাবে যাবো যাতে কেউ না চেনে।

॥ চার ॥

মিঃ আয়েঙ্গারের ফ্ল্যাট। তাঁর ড্রইংরুমে বসে আমি, ঋতু ও ফিনফিনে আর্দ্দি'র পাঞ্জাবি আর শান্তিপুরী ধুতি পরে হোসেনুর রহমান।

চামেলী দেবীর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর একমাত্র মেয়ে সুমিতা রৌরকেল্লা থেকে এসে আছে। সুমিতা রান্নাঘর থেকে আমাদের জন্য চা আর দক্ষিণ ভারতীয় চানাচুর নিয়ে এল।

আয়েঙ্গার বলছিলেন, আমার স্ত্রী মার্ডার হওয়ার পর আমার আর এই ফ্ল্যাটে থাকতে একদম ভালো লাগছে না। ভাবছি এই ফ্ল্যাট বেচে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে দেশে যাবো। আমার বাড়ি মাদুরাহ

জেলায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা আপনার কি মনে হয় মিঃ আয়েঙ্গার, আপনার স্ত্রী নিহত হওয়ার পিছনে নেহাৎ ছিনতাই-এর উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে? আততায়ী তো কিছুই নিয়ে যায়নি।

হ্যাঁ, হীরুকে পুলিশ এটি জিজ্ঞাসা করেছিল। সে বলল, খুন করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। রিভলবারের গুলি ছটকে চামেলী দেবীকে নিহত করলে সে এমন ঘাবড়ে যায় যে চুরি করার কথা তার আর মনেই থাকে না। সে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আপনাদের ফ্ল্যাটে সিকিওরিটি নেই?

না, কো-অপারেটিভের কর্তাদের মধ্যে নানা গোলমাল চলছে। এখন একটি কোম্পানি সিকিওরিটির দায়িত্বে আছে। তারা রাত নটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত ডিউটি দেয়।

আমরা যখন কথা বলছি তখন ঋতু টয়লেটে যাবার জন্য পাশের বেডরুমে ঢুকেছে। সেখান থেকে দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এসে আমাকে বলল, দাদা, শীগ্রি দেখবি আয়। আপনারাও আসুন।

তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে আমরা গেলাম। ঘরটি অন্ধকার। দেওয়ালে টাঙানো একটি বড় লাইফ সাইজ আয়না। সেই আয়নায় গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্টের সমান্তরাল একটি ফ্ল্যাটের প্রতিচ্ছবি আয়নায় ফুটে উঠেছে। ঘরের মধ্যে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক একটি প্যাকেট তুলে দিল আর একটি কমবয়সী ছেলের হাতে। ছেলেটি প্যাকেটটা নিয়ে তার অ্যাটাচি কেসে ভরে ফেলল।

ঋতু অস্ফুট স্বরে বলল, দাদা, ছেলেটিকে চিনতে পাচ্ছিস?

হ্যাঁ, ফ্যালা। বাগুইহাটিতে হীরুর বাড়ির সামনে চায়ের দোকানে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

হোসেনুর বললেন, ইউ পি, ওকে ধরো। যেন পালাতে না পারে।

হুড়মুড় করে আমরা নেমে পড়লাম।

ফ্যালা একটা ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছিল, আমি ও হোসেনুর দুজনেই ওকে জাপটে ধরলাম। ঋতু ওর হাত থেকে অ্যাটাচি

কেসটা নিয়ে এক দৌড় দিল।

গুড়ুম করে একটি শব্দ হলো।

কে যেন পিস্তল ছুঁড়ল ঋতুকে লক্ষ্য করে। ঋতুর গায়ে না লেগে গুলিটি একটি প্রাচীরের গায়ে লাগল। ঋতু ততক্ষণে আয়েঙ্গারের ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে পড়েছে। পিস্তল থেকে আর একটি গুলি ছুঁড়বার আগেই কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ এসে ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওয়ালা লোকটিকে গ্রেফতার করল।

হোসেনুর রহমান বললেন, আমি তৈরি হয়েই এসেছিলাম। তবে জানতাম না, এমন ঘটনা ঘটবে।

ফ্যালার অ্যাটাচি কেস থেকে বেরিয়ে পড়ল, সোনার চেয়ে দামী হেরোইনের প্যাকেট।

।। পাঁচ ।।

এই গল্পের শেষ দৃশ্য আমার বালিগঞ্জ টেরাসের বাড়ি। চামেলী হত্যারহস্য আমরা ভেদ করতে পেরেছি বলে আমার বাবা খুশি হয়ে আজ একটা ডিনার দিচ্ছেন। ডিনারে প্রধান অতিথি হোসেনুর রহমান, মিঃ আয়েঙ্গার ও তাঁর মেয়ে সুমিতা। এছাড়া আছেন সরকারপক্ষের কৌঁসুলি পাবলিক প্রসিকিউটার বিষ্ণু বাগচি। আমি বললাম, বন্ধুগণ, চামেলী দেবীর হত্যার আসল রহস্য এখন হীরু স্বীকার করেছে। তার আগে মিঃ আয়েঙ্গারের বেডরুমে ওই আয়নাটি সম্পর্কে একটু বলা দরকার। ওই আয়নাই চামেলী দেবীর হত্যার কারণ। আর ওই আয়নাই এই হত্যারহস্যের জট ছাড়াবার প্রধান সহায়ক।

এখানে হীরু সম্পর্কে একটু বলা দরকার।

গঙ্গা-যমুনা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক মানুভাই প্রপার্টিজের মালিকের সঙ্গে হীরুর যোগাযোগ হয়। তারা হীরুকে তাদের ফ্ল্যাট বেচা-কেনার দালালিতে নিয়োগ করে। চাকরি ছেড়ে বছর দুয়েকের মধ্যে হীরু দালালি করে প্রচুর পয়সা কামায়। কিন্তু সে নানা বদনেশায় সব টাকা উড়িয়ে দেয়। এমনকি মানুভাই প্রপার্টিজের কাছে তার বাড়িটিও বাঁধা দেয়। প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে সে যখন কি করে আরও টাকা রোজগার করার কথা ভাবছে তখন তাদের পাড়ার ফ্যালা তাকে ড্রাগ পাচারের ব্যবসায়ে নামায়। ওই যমুনা অ্যাপার্টমেন্টে ঠিক আয়েঙ্গারের ফ্ল্যাটের সমান্তরাল ফ্ল্যাটটির মালিক মিঃ আর সি গুপ্তা। ভদ্রলোকের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মুখে ইংরাজির খই ফোটে। লোকে জানে তাঁর সারা পৃথিবী জুড়ে এক্সপোর্টের ব্যবসা। আসলে তাঁর ব্যবসা ড্রাগ পাচারের।

ফ্যালা হীরুকে নিয়ে আসে গুপ্তার কাছে। আর একদিন দুপুরে ওই আয়নার মধ্য দিয়ে মিসেস আয়েঙ্গার হীরুকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিচে নেমে হীরুর জন্য অপেক্ষা করেন। হীরুকে তিনি বলেন, তাঁর সন্দেহ হীরু কোনো বদ মতলবে এখানে এসেছে। তাঁর ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি ফেরৎ না দিলে তিনি কিন্তু পুলিশে খবর দেবেন। হীরু এরপর টেলিফোনে তাঁকে ভয় দেখায়, হীরুকে তিনি যে দেখেছেন, একথা কাউকে জানালে সে চামেলী দেবীকে খুন করবে।

হীরুর এরপর সন্দেহ হয় সত্যিই হয়তো চামেলী দেবী তাকে ধরিয়ে দেবেন। তাই চামেলীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য সে ফন্দি আঁটে। ঠিক করে দুপুরবেলা চামেলী দেবীর ফ্ল্যাটে ঢুকে গলায় ফাঁস দিয়ে চামেলীকে সে খুন করবে। এই উদ্দেশ্যেই সে চামেলী দেবীর ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল। কিন্তু চামেলী দেবী রিভলবার বার করতেই সমস্ত পূর্ব

পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। চামেলীকে মরতে হলো। সে পালাল।

কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেফতার করল। তখন উকিলের পরামর্শে নিজেই কেসটা অন্যরকম করে সাজাল হীরু। উদ্দেশ্য, অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটানো প্রমাণিত হলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে না, কয়েক বছরের জেল হবে মাত্র। সবচেয়ে বড় কথা সে যে ড্রাগ-পাচারের সঙ্গে জড়িত একথাও চাপা থাকবে। কারণ তার মুখ থেকে একথা একবার বেরিয়ে গেলে ড্রাগ-পাচার চক্র তাকে আর বেঁচে থাকতে দেবে না।

সেদিন যদি ফ্যালাকে ঋতু দেখে না ফেলত, আমরা কোনোদিন ভাবতেই পারতাম না চামেলী দেবীর হত্যার পিছনে আর একটা বড় রহস্য লুকিয়ে আছে।

হোসেনুর রহমান বললেন, এই সন্দেহটা প্রথম থেকেই আমার হয়েছিল, তাই আমি ইউ পি আর ঋতুকে কাজে লাগিয়েছিলাম। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা এটা ভাবতেও পারিনি। একেবারে মিঃ আয়েঙ্গারের সমান্তরাল ফ্ল্যাটে এই কাণ্ড চলছে। দুটো ফ্ল্যাটের ব্যবধান চল্লিশ ফুটের মতো। আয়নাটা এমনভাবে ফিট করা ছিল যে হীরুরা কখনও বুঝতে পারেনি সামনের জানালা দিয়ে কেউ তাদের লক্ষ্য করছে। একেই বলে ভবিতব্য। তবে লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, এই রহস্য উদ্ধারের জন্য আমাদের এন্টায়ার পুলিশ ফোর্স উদ্দালক ও ঋতু প্রধানের কাছে কৃতজ্ঞ।

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ঋতু গিয়ে ধরল। তারপর কিছুক্ষণ পরে রিসিভারটা নিয়ে এসে ঋতু বলল, তোর ফোন।

আমি বললাম, কে?

ঋতু বলল, সম্ভবত তোর দ্বিতীয় মক্কেল।

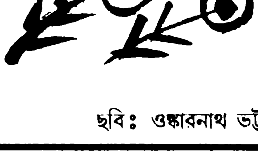

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

দামাল

ইন্দ্রজিৎ গুহ

দলমা পাহাড়ে
সীমিত আহারে
দামালের ছোটাছুটি,
নিঃশেষ হলো
মুলি বাঁশগুলো
নেই ধান একমুঠি।

সমতলে এসে
সদলবলে সে
পাকা ধানে দেবে মই!
খাবারের টানে
কলার বাগানে
জড়ো হলো তারা ওই।

বনবিভাগের
ঘুম গেল ফের
পটকা ফাটায় রাতে,
মশাল জ্বালিয়ে
তীর-ধনু নিয়ে
মানুষেরা একসাথে—

চেষ্টা চালায়
যদি ফিরে যায়
নিজেদের দেশে ওরা,
দু-একটা তবু
যেন জবুথবু
দেহে ক্ষত নিয়ে ঘোরা।

শেষে সরকারী
আসে যে শিকারী—
ঘুম পাড়ানোর টোটা
ছুঁড়ে কাত করে
কেউ যায় মরে—
ধানে রক্তের ফোঁটা।

কী-বা তার দোষ
হয় আফসোস
আহা রে অবুঝ প্রাণী,
মুখে ধরা ধান
তবু গেল প্রাণ
ক্ষুধার জ্বালায় জানি!

আঁকন নদী বাঁকন নদী

সলিল মিত্র

আঁকন নদী বাঁকন নদী ছবির মতন আঁকা
রোদ-ঝিলমিল জলের ধারায় সবুজ-সোহাগ মাখা!
কোল ছুঁয়ে তার জল-কলমি; আলোর খুশি ঝরে,
নীল-সোনালী মেঘের ছায়া একটু নড়ে-চড়ে।

গাঁ-শহরের মাঠ-বসতি পিছন পানে রেখে
আঁকন নদী কোথায় যাবে পাহাড়তলী থেকে?
সন্ধ্যাতারার ঝিকির-মিকির কাজল-কালো জলে,
ঢেউ তুলে জল ছলকে ওঠে চলকে ঘাটের কোলে!

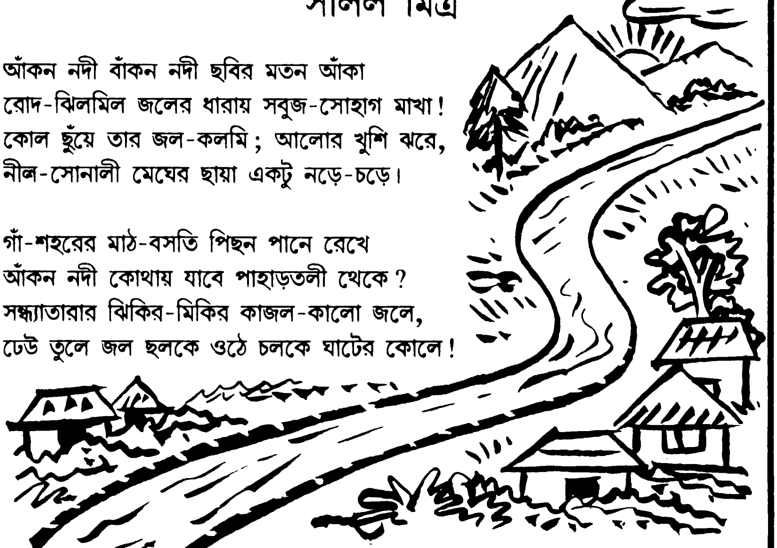

আঁকন নদী সুয্যি দেখে, রাত্তিরে চাঁদ-তারা
দেখতে দেখতে দিন চলে যায়, যায় চলে নীল ধারা!
আঁকন নদী বাঁকন নদী-নদীর কলতান—
আকাশ-মাটি-মানুষ শোনে আঁকন-বাঁকন গান।।

ছবি ঃ সুফি

ম্যাজিকের আসর

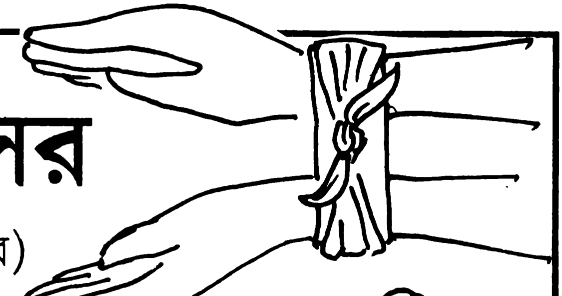

1

জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, হঠাৎ করে চারদিকে ম্যাজিকের একটা কেমন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ যেন একসঙ্গে জেগে উঠে ম্যাজিক-ম্যানিয়াতে ভুগে যে যার নিজের মতো করে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করেছে। টেলিভিশনের প্রতিটি চ্যানেলে ম্যাজিক, ম্যাগাজিনে ম্যাজিক, পত্র-পত্রিকায় ম্যাজিক। রাস্তাঘাটে, রথের মেলা থেকে শুরু করে খেলনার দোকানে পর্যন্ত সর্বত্র বিক্রি হচ্ছে ম্যাজিকের সাজ-সরঞ্জাম! ছোট-বড় বিভিন্ন শহরে ম্যাজিকের সেমিনার, কমপিটিশান, গেট টুগেদার...কতো হচ্ছে তো হচ্ছেই। সব্বাই ভাল, সব্বাই যে যার মতো করে 'শ্রেষ্ঠ'। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি। 'আমাদের মরা গাঙে বান এসেছে...।' সুতরাং 'এবার জয় মা বলে ভাসা তরী', ভাসাতেই হবে। তোমরা কেন বাদ যাবে! চলো আমরা জাদুর জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিই।

আমাদের বাড়িতে সব্বাই ম্যাজিশিয়ান। আমার বাবার কথা তো বলাই বাহুল্য। তিনি তো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকর। আমার মা ম্যাজিশিয়ান, আমার দিদি, দাদা, ভাই, স্ত্রী, বাচ্চারা সবাই ম্যাজিশিয়ান। আমাদের বাড়ির কাজের লোকগুলোও ম্যাজিশিয়ান, আমাদের দারোয়ান ম্যাজিশিয়ান, আমার সিংহটাও ম্যাজিশিয়ান, আমার হাতি ম্যাজিশিয়ান ...এমন কি আমাদের বাড়িতে যাঁরা বেড়াতে আসেন, তাঁরাও ম্যাজিশিয়ান। সবাই যে যার নিজের মতো করে ম্যাজিক দেখাই। এবং কেউ তা দেখে বাহবা দিলেন কিনা, তার তোয়াক্কা করি না। ম্যাজিক সবসময় চলছে চলবে।

আমার মার কথা বলি। উনি হলেন আমাদের পরিবারের বেস্ট ম্যাজিশিয়ান। বাবা পর্যন্ত সমীহ করে চলতেন। মা কোনও সাতেপাঁচে থাকেন না তবে যুক্তভাবে সাত আর পাঁচ, বারোতে থাকেন। তিনি মানসিক ম্যাজিকে ওস্তাদ। আমাদের কার মনে কখন দুঃখ হলো; কার মনে কি অভিমান জমলো—ওমা! না বললেও তিনি ঠিক যেন ম্যাজিক করেই বুঝতে পারেন। আর শুধু তা নয় সেটা ভ্যানিশ করতেও উনি ওস্তাদ। কারুর মনে যদি দুঃখ জমে থাকে, ব্যস, পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেই সে দুঃখ 'ভ্যানিশ'। দুর্দান্ত জাদুর ক্ষমতা, তাই নয় কি?

আমার বড়দিদির সাম্প্রতিককালীন ম্যাজিকটা সত্যিই দুর্দান্ত। বড়দি সাংখ্য দর্শনের এম-এ। ও বরাবরই লেখাপড়ায় ভীষণ সিরিয়াস। সেজন্য ওর ম্যাজিক-গুলোও ভীষণ সিরিয়াস। সেদিন হঠাৎ দেখি, ও সব্বার অজান্তে একটা থিসিস লিখে জমা দিয়ে ডক্টরেট হয়ে গেল। আমরা সব্বাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছি। কি দুর্দান্ত ব্যাপার, ঘরকন্নার ফাঁকে ফাঁকে ডক্টরেটের প্রস্তুতি! এরকম টুক্-টাক্ ম্যাজিক আমাদের পরিবারে সবসময় হয়। ছোটদির কাটুম-কুটুম একজিবিশান, জামাইবাবুর কবিতা, দাদার আঁকা কার্টুন, মেয়েদের গাওয়া গান, আমার তিন কন্যের ম্যাজিক...ইত্যাদি ইত্যাদি তো লেগেই আছে। সব কিছুই ম্যাজিক। স্বপ্নকে বাস্তব করে দেখাবার সত্যিকারের জাদু। শুধু আমাদের বাড়িতে কেন, আমি জানি, তোমাদের মধ্যেও অনেক দুর্ধর্ষ জাদু লুকিয়ে আছে। ঠেলে

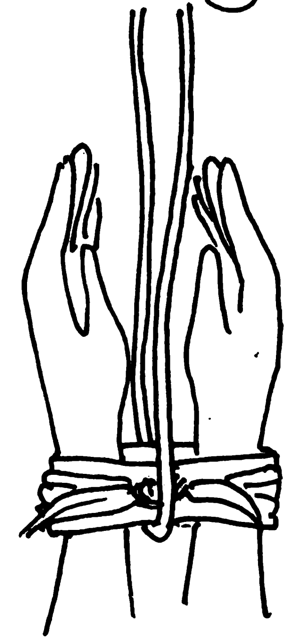

2

3

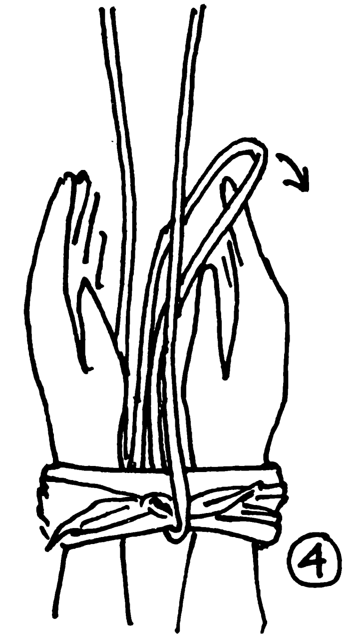

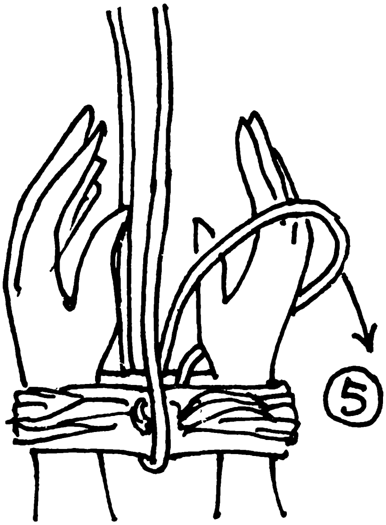

সেগুলো তুলে আনো। প্রকাশ করো। দেখবে পৃথিবী চমকে যাচ্ছে। সব্বাই স্বীকার করে নেবে, ভারতবর্ষ খাঁটি জাদুর দেশ।

এবারের পুজো সংখ্যায় আমি তোমাদের দুটো দুর্দান্ত ম্যাজিক শেখাবো। এগুলো অভ্যাস করে দেখালে তোমাদের বন্ধুরা খুব চমকে যাবে। অন্য কেউ হলে হয়তো শেখাতাম না, কিন্তু তোমাদের আগ্রহ আর বন্ধুত্ব মিলে আমায় তোমরা জিতে নিয়েছো। তোমরা দেখাতে পারলে আমি খুব আনন্দ পাবো।

প্রথম ম্যাজিকটা হলো হ্যান্ডকাফ থেকে মুক্তি পাওয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকাতে হ্যান্ডকাফ থেকে মুক্তি পাওয়ার খেলা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। হ্যান্ডকাফ তোমরা নিশ্চয়ই চেন। অপরাধীদের আটকে রাখতে যে হাতকড়ার ব্যবহার করা হয়, সেই হাতের বালারূপী তালা। কিন্তু সেটা তুমি পাবে কোথায়? হ্যান্ডকাফ তো বাজারে পাবার জিনিস নয়। ও তো পুলিশের কাজের জিনিস। তাঁরা ম্যাজিক দেখাতে সে জিনিসটা দেবেন কেন? সমস্যা, তাই নয় কি? ঠিক আছে, হ্যান্ডকাফ নেই তো হ্যান্ডকাফ বানিয়ে নিতে কি আছে! একটা রুমাল বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে হাতদুটোকে হাতকড়ার মতো করে বেঁধে নেওয়া যাক! দর্শকদের বলা যাক, তাঁরা যেন ধরে নেন, এটা একটা হ্যান্ডকাফ। সবাই মেনে নেবেন, কারণ গিঁটটা না খুলে মুক্তি পাবার উপায় নেই। জাদুকরের হাত এই রুমালের হ্যান্ডকাফেই বাঁধা রইলো—ছবি (১)। এবার একটা দড়ি নিয়ে ঐ রুমাল হ্যান্ডকাফকে ঘিরে ('U'-এর মতো করে) সে দড়ির প্রান্তদুটো দর্শকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলো। অর্থাৎ দর্শক মুক্তি না দিলে, রুমালের গিঁট না খুলে ঐ বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার কোনও উপায় নেই। ছবি (২) দেখলে বুঝতে পারবে। এবার কৌশলের গোপনীয়তা রক্ষা করতে জাদুকরের ঐ আটক করা হাত একটা বড় রুমাল বা কাপড় দিয়ে চাপা দেওয়া হলো। চাপার তলায় তিনি যেন কি একটা করে ঝট্‌কা মারলেন। ও মা! দড়িটা ঐ রুমাল হ্যান্ডকাফ থেকে মুক্ত হয়ে গেল। চাপা সরাতে দেখা গেল রুমালের বাঁধন আগের মতোই রয়েছে, গিঁট খোলা নেই, তাহলে দড়িটা খুলে গেল কিভাবে?

সহজ। খুব সহজ এর কৌশল। জটপাকানো প্যাঁচ কিস্যু নেই এতে। জানা থাকলে এবং আগের থেকে অভ্যাস করা থাকলে, যতই কঠিন আর চমকদার মনে হোক না কেন, খুব সহজেই তোমরা দেখাতে পারবে।

রুমালের বাঁধনে কোনও কারসাজী ছিল না। দড়িটাও ছিল সাধারণ। শুধু একটা কৌশলের ওপর নির্ভর করেই এই ম্যাজিকটা ঘটল। প্রথমে দর্শককে বলো দড়িটা বেশি টান টান নয়, একটু ঢিলে করেই ধরতে। তারপর দড়ির ফাঁসের 'U' অংশটাকে রুমালের বাঁধনের মাঝখান দিয়ে গলিয়ে এনে দড়িটাকে 'W'-এর মতো করো—ছবি (৩)। তারপর সেই W-এর মাঝের অংশটাকে টেনে তার মধ্য দিয়ে যে কোনও একটা হাতের পাতা গলিয়ে দাও। (৪) নং এবং (৫) নং ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। এবার দর্শককে বলো দড়িটাকে টান টান করে ধরে রাখতে। এবার তুমি একটা ঝট্‌কা দাও। দেখবে অবাক ব্যাপার, ঐ দড়ির ফাঁস থেকে তুমি মুক্ত হয়ে গেছ! পুরো কাজটাই বড় রুমাল বা কাপড়ের আড়ালে করা হয়েছে বলে দর্শকেরা ঐ কৌশলটা জানতে পারবেন না। কি সহজ নয় কি?

এবার দ্বিতীয় ম্যাজিক। তোমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি গাঁট্টাগোট্টা, এবং বেশ ব্যায়াম-ট্যায়াম করে তার ওপর এই ম্যাজিকটা করলে খুব জমবে। তাকে বলো যে তুমি আমার শূন্যে ভেসে থাকার ম্যাজিকটা আয়ত্ত করতে চলেছ—এবং এখনই তার একটা আংশিক প্রদর্শনী করে দেখাতে পারো। আংশিক প্রদর্শনী মানে পুরো দেহটাকে শূন্যে ভাসিয়ে ফেলা নয়, শরীরের একটা অংশ বা অঙ্গকে শূন্যে ভাসিয়ে ফেলা। এর পুরোটাই মনের ম্যাজিক; মানে জাদুকরের মনের একাগ্রতা এবং দর্শকের শারীরিকভাবে সহযোগিতার ফল।

তাকে বলো দেওয়ালের কাছে পাশ ফিরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, ডান হাতটাকে টান টান করে ঝুলিয়ে, মুঠো টাইট করে কব্জীটা দিয়ে দেওয়ালে চাপ দিয়ে থাকতে। ঝট্‌কা মেরে মেরে চাপ নয়। হাতের কব্জী দিয়ে। একটানা অনেকক্ষণ ঐ দেওয়ালকে চাপ দিয়ে থাকতে হবে। এভাবে বেশ খানিকক্ষণ জোরে ঠেসে চেপে থেকে যখন তার হাতে ব্যথা শুরু হবে, তখন তাকে পাশে সরিয়ে এনে হাতটাকে একদম হালকা, ঢিলে করে

ঝুলিয়ে রাখতে বলো। এতক্ষণ ব্যথা পাবার পর সে মুক্ত হয়ে আনন্দ পাবে—কিন্তু হাত ঝুলিয়ে রেখে রিল্যাক্স করতে গিয়েই নিজে যাবে চমকে। একি! হাতটা তো তার নিজের কন্ট্রোলে নেই! কেমন যেন হালকা হয়ে নিজের থেকেই হাওয়ায় উঠে যেতে চাইছে। তুমি তার হাতটাকে একটু তুলে ওপর দিকে যাবার সাহায্য করে দিও, তাতে দেখবে তার সেই অনুভূতিটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। বাইরের থেকে সে 'অনুভূতি' অন্যেরা পাবেন না, কিন্তু তাঁরা অবাক হয়ে দেখবেন ঐ পালোয়ান বন্ধু কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে অসহায়ের মতো তার নিজের ভাসমান হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। একটু পরে সেই 'অনুভূতি'টা কমে যাবে। আবার ফিরিয়ে আনতে আবার ওভাবে চাপ দিয়ে দাঁড়াতে হবে। ছবি দেখলেই দাঁড়াবার কায়দাটা বুঝতে পারবে।

এটা একটা শারীরিক ম্যাজিক।

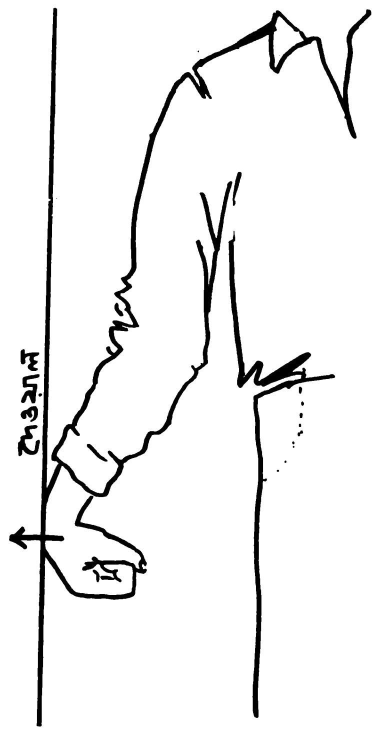

শরীরের সঙ্কুচিত পেশীর মুক্ত হবার রেজাল্ট। এতে কোনও কৌশল নেই, পুরোপুরিই প্রাকৃতিক এবং সবার ক্ষেত্রেই কম-বেশি ঘটে। লোকের জানা নেই বলেই—অনুভূতিটা ম্যাজিকের মতো মনে হয়। তুমি যদি এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে ম্যাজিকের ভঙ্গিমায় হাত নাড়ো এবং অভিনয় করো তাহলে খুব জমে যাবে। ম্যাজিকের সবকিছুই তো বিজ্ঞানভিত্তিক, এবং তাতে দেখাবার কায়দাটাই আসল। তুমি যতো মজাদার গল্প জুড়ে—যতো বেশি আনন্দ-পরিবেশ রচনা করতে পারবে, তত ভাল 'জাদুকর' বলে তুমি পরিচিত হবে। কৌশলটা আমি শিখিয়ে দিলাম, দেখাবার কায়দা বা প্রদর্শন-ভঙ্গিটা ছেড়ে দিলাম তোমার ওপর। দেখি তোমরা কেমন জমাতে পারো। আজ এই পর্যন্ত থাক। পরের সংখ্যায় আরও ম্যাজিক শেখাবো।

ছবি: লেখক

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত পূজাবার্ষিকী [redacted] পাঠককুল সাদরে গ্রহণ করেছেন। এবার পুজোয় প্রকাশিত হল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সম্পূর্ণ নতুন গল্প, গোয়েন্দা গল্প, ভূতের গল্প, অ্যাডভেঞ্চার, ভ্রমণ, হাসির গল্প, কল্পবিজ্ঞান, কবিতা, কার্টুন, ছড়া, নানা স্বাদের ফিচার ও কমিকস্-এর সংকলন

মেঘমল্লার

দাম: ১০০ টাকা

এতে লিখেছেন :

অন্নদাশঙ্কর রায়	কবিতা সিংহ	নটরাজন	মানবেন্দ্র পাল	সরল দে
অমিতাভ চৌধুরী	চণ্ডী লাহিড়ী	নারায়ণ সান্যাল	মুস্তাফা নাশাদ	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	চিত্তরঞ্জন মাইতি	নিরঞ্জন সিংহ	রূপক চট্টরাজ	সুকুমার ভট্টাচার্য
অদ্রীশ বর্ধন	চিত্রা দেব	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	রাধারমণ রায়	সুনির্মল বসু
অনিল ভৌমিক	দেবল দেববর্মা	নীরেন্দ্র গুপ্ত	রবিদাস সাহারায়	সুনীল জানা
অনীশ দেব	দিব্যেন্দু পালিত	প্রফুল্ল রায়	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়
অরুণিমা রায়চৌধুরী	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পরেশ ভট্টাচার্য	শক্তিপদ রাজগুরু	হিমানীশ গোস্বামী
অশোককুমার মিত্র	দীপাঞ্জন বসু	বলরাম বসাক	শৈলেন ঘোষ	ও
অরুণ দে	দুলেন্দ্র ভৌমিক	বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	আরও
অজেয় রায়	ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	ভবানীপ্রসাদ মজুমদার	সঙ্কর্ষণ রায়	অনেকে
আবুল বাশার	ডঃ দীপক চন্দ্র	মঞ্জিল সেন	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০৭৩ ☎ ২৪১[redacted]২২৪৩

প্রেতাত্মার কবলে

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজ আমলে আমার দাদু একজন নামকরা ডাক্তার ছিলেন। রোগীদের চাপে সময়মতো স্নান-খাওয়া হয়ে উঠতো না। দাদু কিন্তু এই সেবার মধ্যেই আনন্দ পেতেন। রোগী দেখতে যাওয়া-আসার জন্যে মাসিক ভাড়ায় দাদুর একটা ঘোড়ার গাড়ি ছিল। মায়ের মুখে শুনেছি, সেই সময় বরানগর বা চিৎপুর রোড ছিল ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। লোকবসতি ছিল না বললেই চলে। মাঝে মাঝে একটা-দুটো পাকা কিংবা মাটির বাড়ি নজরে আসতো। পুকুর, ডোবা, ভাগাড়, কুয়ো, ইঁদারার প্রচলন ছিল। গাড়ি বলতে একমাত্র ঘোড়ার গাড়ি। রাস্তাও তেমন ভাল ছিল না।

সেদিনের কথা মনে পড়তেই মায়ের মুখ থেকে শোনা একটা গল্প মনে পড়ে গেল। ঘটনাটা সত্যি। বর্তমান বরানগরের তাঁতিপাড়ায়, দাদুর এক মুমূর্ষু রোগী ছিল, তাকে দেখতে তিনি প্রায়ই চলে যেতেন তাঁতিপাড়ায়। সেদিন সকাল থেকে শুরু হয়েছিল বৃষ্টি, সেই বৃষ্টির মধ্যেই বেলা দশটা-এগারোটার সময়, তাঁতিপাড়া থেকে একজন লোক এসে খবর দিয়ে যায় যে, রোগীটির অবস্থা খুবই খারাপ, ডাক্তারবাবু যেন একবার যান। দাদু তখন বাড়ি ছিলেন না। দুপুরে ফিরে খবরটা শুনে তিনি বিকেল তিনটের সময় সেই রোগীকে দেখতে বেরিয়ে পড়েন।

তাঁতিপাড়ার রোগী দেখে, ওখান থেকে বরানগর বাজারের কাছে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। ঘোড়ার গাড়িটা ঠিক চলছিল কিন্তু বাজারটা ছাড়িয়েই ঘোড়াটা হঠাৎ সামনের দু'পা তুলে, একটা চিৎকার করে দাঁড়িয়ে পড়লো। সেদিন আবার গাড়ির সহিস ছিল না। কোচোয়ান দু'চারবার চাবুক মেরে, তারপর গাড়ির ওপর থেকে নেমে ঘোড়াটাকে সামলাবার চেষ্টা করলো। তাতে ঘোড়াটা আরও ক্ষেপে গেল। জল খাইয়ে, আদর করেও তাকে এক পা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না কোচোয়ান। দাদু গাড়ি থেকে নেমে কোচোয়ানকে একটা ধমক দিয়ে বললেন, ঘোড়াটাকে নিশ্চয়ই আজ ভালভাবে খেতে দিসনি? কোচোয়ান দুই কানে হাত দিয়ে উত্তর দিল, খোদা কসম হুজুর, আমি ওকে কোনোদিন কম খাবার দিই

না। আজ কেন যে এমন করছে বুঝতে পারছি না।

দাদু রাস্তার ওপরে দু'চারবার পায়চারি করে কোচোয়ানকে বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখো অন্য কোনো গাড়ির কোচোয়ান বা সহিসকে পাওয়া যায় কিনা। তাড়াতাড়ি করবে, আর এক জায়গায় রোগী দেখতে যেতে হবে।

দাদুর নির্দেশমতো কোচোয়ান চলে গেল। সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসছে, জায়গাটা খুবই নির্জন, একটা দোকানও দাদুর নজরে আসছে না। দাদু গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঘোড়াটা হঠাৎ আবার চঞ্চল হয়ে, পা তুলে চিৎকার করে উঠল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দাদু শুনতে পেলেন কে যেন ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু বলে ডাকছে। দাদু পকেট থেকে ছোট একটা টর্চ বের করে জ্বাললেন। আবছা অন্ধকারে তাঁর মনে হলো, জীর্ণ পোশাক পরা একটি লোক তাঁকে ডাকছে। দাদু তার একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, কি ব্যাপার, আপনি আমায় ডাকছেন?

লোকটা একটু পেছিয়ে গিয়ে, বিনয়ের সঙ্গে বললো, হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আপনাকে একজন রোগী দেখতে হবে, এই কাছেই।

দাদু গাড়ি থেকে ডাক্তারি ব্যাগটা হাতে নিয়ে টর্চ জ্বেলে লোকটাকে বললেন, চলুন।

কিছুটা গিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে একটা ভাঙা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই দালান পড়লো। দালানের ওপাশে একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে লোকটা বললো, রোগী ঐ ঘরেই আছে, আপনি ভেতরে যান, আমি এখুনি আসছি।

দাদু লোকটিকে বললেন, তাড়াতাড়ি আসবেন আর রাস্তায় গিয়ে দেখবেন আমার গাড়ির কোচোয়ান ফিরে এসেছে কিনা। যদি ওকে দেখতে পান তাহলে বলবেন আমি এখানে আছি, সে যেন অপেক্ষা করে।

লোকটা কোনো উত্তর না দিয়ে মাথাটা নেড়ে নিমেষে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। সেই নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে টর্চের আলো ফেলে ভাল করে দেখে নিয়ে লোকটির নির্দেশ মতো এগিয়ে গেলেন সেই ঘরটার দিকে। ভেজানো দরজাটা খুলতেই বিশ্রী একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল। দাদু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, কই রুগী কোথায়?

ডাক্তারবাবু, এই যে, এদিকে আমি।

টর্চের আলোয় সামনে একটা খাট দেখতে পেলেন দাদু। ভাঙা খাটের ওপরে নোংরা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে, কে শুয়ে। বিছানা-বালিশ বলতে, চারদিকে শুধু তুলো ছড়িয়ে আছে আর কয়েকটা নেংটি ইঁদুর বিছানা জুড়ে ছোটাছুটি করছে। দাদু বুঝলেন লোকটাকে দেখার কেউ নেই। ঘরটা যে কতদিন পরিষ্কার হয়নি কে জানে।

সামনের চেয়ারটাতে বসুন ডাক্তারবাবু।

লোকটির কথায় চেয়ার টেনে বসতে বসতে দাদু বললেন, হ্যাঁ বসছি, কিন্তু ঘরের যা অবস্থা, তাতে তো মশাই সুস্থ লোকও অসুস্থ হয়ে পড়বে। আপনাকে দেখবার কি কেউ নেই?

আছে ডাক্তারবাবু আছে, কিন্তু কেউই এখানে থাকে না। সেই কথাই তো আপনাকে বলবো। আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি। আপনার বাড়িতেও অনেকদিন আগে আমার স্ত্রীকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম; আজ আর সে নেই।

যে লোকটি আমায় ডেকে নিয়ে এলো, সে কি আপনার কেউ হয়?

না-না। ও কদিন হলো আমার কাছে এসে জুটেছে। আসলে ও আমার নতুন বন্ধু। আজ দুপুরে ওই আমাকে খবর দিয়ে গেল যে, আপনি এদিক দিয়ে রোগী দেখতে গেছেন। আমি তখন ওকে বলেছিলাম যেকোনো উপায়ে হোক ডাক্তারবাবুকে আমার কাছে একবার নিয়ে এসো। তাঁকে আমার কিছু বলার আছে।

এখন অন্য কথা থাক, কি হয়েছে সেটাই আগে জানা দরকার। হাতটা বার করুন দিকি, নাড়িটা দেখবো। আর মুখের চাপাটাও খুলে ফেলুন।

তার আগে আমার কথাগুলো একটু ধৈর্য ধরে শুনতেই হবে আপনাকে।

দাদু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন, আমাকে আরও রোগী দেখতে যেতে হবে।

দাদুর কথায় কর্ণপাত না করে লোকটি ধীরে ধীরে বলল, আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন ওরই ঠিক পেছনে দেখুন একটা কাঠের বাক্স আছে। ওর মধ্যে কিছু মূল্যবান কাগজ ও দলিল আছে কিন্তু এই মূল্যবান কাগজ ও দলিল যাদের প্রাপ্য তাদের কাছে পৌঁছে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। ওর মধ্যেই পেয়ে যাবেন দুটো ঠিকানা। একটা আমার ছেলের আর অন্যটা মেয়ের। আপনাকে আমার একান্ত অনুরোধ, ছেলে ও মেয়েকে খবর দিয়ে আমার লেখামতো ওদের জিনিস যদি ওদের দিয়ে দেন তাহলে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকবো।

দাদু চেয়ারের পেছনে থাকা কাঠের বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে ধুলো ভর্তি ঢাকনাটা খুলে দেখলেন, বাক্সের মধ্যে দলিল ও কিছু কাগজ রয়েছে। সমস্ত কাগজগুলো বার করে দাদু তাঁর কোটের পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে বললেন, ঠিক আছে আমি আপনার ছেলে-মেয়ের সন্ধান পেলেই তাদের হাতে এগুলো তুলে দেবো। নিন এবারে হাতটা বার করুন, নাড়িটা দেখি, কতদিন ভুগছেন?

চাদরটা সরে গিয়ে বেরিয়ে এলো একটা মাংসহীন হাত আর মুখের চাদরটা খুলে যেতেই দাদু দেখলেন, একটা কংকালের মুখ। হাতটা ধরতে গিয়ে ওই দৃশ্য দেখে দাদু কোনোরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় ছুটে চলে এলেন রাস্তায়। টলতে টলতে যখন গাড়ির কাছে পৌঁছলেন, তখন কোচোয়ান এসে গেছে কিন্তু ঘোড়াটাকে ঠিক করার মতো লোক পায়নি বলে সে একাই ফিরে এসেছে।

দাদু গাড়িতে উঠে বসতেই ঘোড়াটাও এবারে এগোবার জন্যে পা বাড়ালো। তাই না দেখে কোচোয়ান তাড়াতাড়ি উঠে বসলো নিজের জায়গায়। গাড়িটাও চলতে লাগলো আগের মতো। দাদু গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে জায়গাটাকে আর একবার

ভাল করে দেখে নিলেন। তখনই তাঁর চোখে পড়লো অন্ধকারের মধ্যে সেই জীর্ণ পোশাক পরা লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে তাঁকে নমস্কার জানাচ্ছে।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরেই দাদু সবাইকে এই ঘটনার কথা বলেছিলেন। পরের দিন সকালে মামা ও আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িটা খুঁজে বার করে সেই ঘরটার ভেতরে ঢুকে দাদু দেখলেন কংকালটা তখনো খাটের ওপর পড়ে। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই আশপাশ থেকে দু'চারজন লোককে পাওয়া গেল।

তারা তো দাদুর মুখে রাতের ঘটনার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক। একজন জানালো, বাড়ির বুড়ো কর্তা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন বলে তারা শুনেছে। বাড়িটাও খালি পড়ে আছে বহুদিন ধরে। ভাঙা বাড়ি আর চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল দেখে দিনের বেলাতেও কেউ এদিকে আসে না। তাই কেউই এই মৃত্যুর খবর জানে না।

যাই হোক সকলের চেষ্টায় সেই কংকালটাকে দাহ করে দাদু ও অন্যরা বাড়ি ফিরে এলেন।

ঠিকানা দেখে ছেলে ও মেয়েকে খুঁজে বার করতে দেরি হলো না। দাদু তাদেরও সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়ে দলিল ও অন্য কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, ওই বাড়িতে গিয়ে শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থা করো। বাপ বেঁচে থাকতে তাঁকে দেখোনি। অথচ তোমাদের ওপর মানুষটার টান দেখো। মরে গিয়েও ঠিক তোমাদের পাওনাগণ্ডা দিয়ে গেলেন। সেটুকু মনে করে শেষ কাজটা করো যাতে ওনার আত্মা মুক্তি পায়। দাদুর কথামতো ছেলে ও মেয়ে তাদের বাবার শ্রাদ্ধ করেছিল। দাদুও শ্রাদ্ধের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

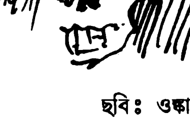

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

বুঝাইয়ের অঙ্ককষা

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কোঁকড়ানো চুল মাথায় কালো,
বুঝাই জানে অঙ্ক ভালো,
মিলিয়ে দেয় যোগ-বিয়োগের ফল।
শক্ত শক্ত গুণ-ভাগও সে
করতে পারে এক নিমেষে,
অঙ্ক যেন তার কাছে সব জল।
সেই বুঝাই-ই কষে যখন
লাভ ও ক্ষতির অঙ্ক, তখন
ভেবে ভেবে পায় না যেন দিশে।
দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে,
চালে কাঁকর মিশেল দিয়ে,
লাভ হচ্ছে কাদের কত কিসে।

অঙ্ক বইয়ে লাভ ও ক্ষতির
পেয়ে এমন দশটা নজির,
অবশেষে তার পেল খুব হাসি।
লিখল বইয়ের সে অধ্যায়ে
প্রতি পাতার ডাইনে-বাঁয়ে,
ভেজাল দেওয়ার শাস্তি হলো ফাঁসি।
লেখার পরই ভাবল বুঝাই,
মিলল বটে একটা উপায়,
পাওয়া গেল একটা যেন ফল।
ভেজাল দেওয়ার হিসেবনিকেশ
হতে পারে এইভাবে শেষ,
বাকি অঙ্ক তার কাছে তো জল।

স্বপ্ন শেষে

আশিস সান্যাল

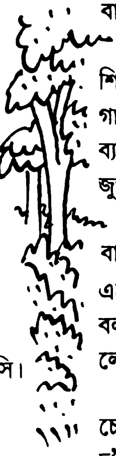

একটি বাঁদর তবলা বাজায়
একটি বাঁদর খোল,
কাশের বনে হুক্কা-হুয়া
বাজায় বসে ঢোল।

শিঙা বাজায় হুলো বেড়াল
গাধা বাজায় বাঁশি,
ব্যা-ব্যা-ব্যা ছাগলছানা
জুড়লো বেজায় হাসি।

বাঘের মামা ভীষণ রেগে
এলো সেথায় হেঁটে ;
বললো জোরে: 'গোল করলে
লেজটি দেবো কেটে।'

চোখ পিট পিট ছাগলছানা
দু'কান নেড়ে কয়ঃ
'মাপ করে দাও একটি বার
করছে বড় ভয়।'

এমন সময় উঠলো ডেকে
বাড়ির পোষা কুকুর,
মিষ্টি ভোরের স্বপ্ন শেষে
ঘুম ভেঙে যায় খুকুর।

জ্যান্ত মাছের বড়া

মনীষা মিত্র

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে
পয়লা আষাঢ় সাঁঝে
রান্নাঘরে বর্ষাবরণ
খুন্তি কড়াই বাজে।
চিংড়ি মাছের হচ্ছে বড়া
খিচুড়ি তার সাথে,
ছ'টা অংক করতে হবে
সময় যে নেই হাতে।
এক্ষুণি মা ডাকবে খেতে
রান্না সারা যেই
আনন্দেতে মনটা যে আজ
নাচছে তা-ধেই, ধেই।
খেতে বসে সবাই মিলে
লোডশেডিং-এ পড়ি,
জ্বলতে আলো সবাই মিলে
বলি, হরি-হরি।
বাবার পাতে গঙ্গাফড়িং
তিড়িংবিড়িং করে—
বাবা বলেন, জ্যান্ত মাছের
বড়া বোধহয় ওরে!

ছবিঃ সুফি

ভাল করে দেখে নিলেন। তখনই তাঁর চোখে পড়লো অন্ধকারের মধ্যে সেই জীর্ণ পোশাক পরা লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে তাঁকে নমস্কার জানাচ্ছে।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরেই দাদু সবাইকে এই ঘটনার কথা বলেছিলেন। পরের দিন সকালে মামা ও আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িটা খুঁজে বার করে সেই ঘরটার ভেতরে ঢুকে দাদু দেখলেন কংকালটা তখনো খাটের ওপর পড়ে। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই আশপাশ থেকে দু'চারজন লোককে পাওয়া গেল।

তারা তো দাদুর মুখে রাতের ঘটনার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক। একজন জানালো, বাড়ির বুড়ো কর্তা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন বলে তারা শুনেছে। বাড়িটাও খালি পড়ে আছে বহুদিন ধরে। ভাঙা বাড়ি আর চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল দেখে দিনের বেলাতেও কেউ এদিকে আসে না। তাই কেউই এই মৃত্যুর খবর জানে না।

যাই হোক সকলের চেষ্টায় সেই কংকালটাকে দাহ করে দাদু ও অন্যরা বাড়ি ফিরে এলেন।

ঠিকানা দেখে ছেলে ও মেয়েকে খুঁজে বার করতে দেরি হলো না। দাদু তাদেরও সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়ে দলিল ও অন্য কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, ওই বাড়িতে গিয়ে শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থা করো। বাপ বেঁচে থাকতে তাঁকে দেখোনি। অথচ তোমাদের ওপর মানুষটার টান দেখো। মরে গিয়েও ঠিক তোমাদের পাওনাগণ্ডা দিয়ে গেলেন। সেটুকু মনে করে শেষ কাজটা করো যাতে ওনার আত্মা মুক্তি পায়। দাদুর কথামতো ছেলে ও মেয়ে তাদের বাবার শ্রাদ্ধ করেছিল। দাদুও শ্রাদ্ধের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

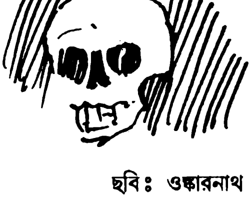

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

বুঝাইয়ের অঙ্ককষা

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কোঁকড়ানো চুল মাথায় কালো,
বুঝাই জানে অঙ্ক ভালো,
মিলিয়ে দেয় যোগ-বিয়োগের ফল।
শক্ত শক্ত গুণ-ভাগও সে
করতে পারে এক নিমেষে,
অঙ্ক যেন তার কাছে সব জল।
সেই বুঝাই-ই কষে যখন
লাভ ও ক্ষতির অঙ্ক, তখন
ভেবে ভেবে পায় না যেন দিশে।
দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে,
চালে কাঁকর মিশেল দিয়ে,
লাভ হচ্ছে কাদের কত কিসে।

অঙ্ক বইয়ে লাভ ও ক্ষতির
পেয়ে এমন দশটা নজির,
অবশেষে তার পেল খুব হাসি।
লিখল বইয়ের সে অধ্যায়ে
প্রতি পাতার ডাইনে-বাঁয়ে,
ভেজাল দেওয়ার শাস্তি হলো ফাঁসি।
লেখার পরই ভাবল বুঝাই,
মিলল বটে একটা উপায়,
পাওয়া গেল একটা যেন ফল।
ভেজাল দেওয়ার হিসেবনিকেশ
হতে পারে এইভাবে শেষ,
বাকি অঙ্ক তার কাছে তো জল।

স্বপ্ন শেষে

আশিস সান্যাল

একটি বাঁদর তবলা বাজায়
একটি বাঁদর খোল,
কাশের বনে হুক্কা-হুয়া
বাজায় বসে ঢোল।

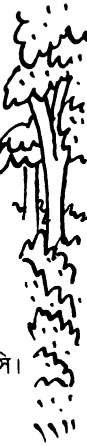

শিঙা বাজায় হুলো বেড়াল
গাধা বাজায় বাঁশি,
ব্যা-ব্যা-ব্যা ছাগলছানা
জুড়লো বেজায় হাসি।

বাঘের মামা ভীষণ রেগে
এলো সেথায় হেঁটে;
বললো জোরে: 'গোল করলে
লেজটি দেবো কেটে।'

চোখ পিট পিট ছাগলছানা
দু'কান নেড়ে কয়ঃ
'মাপ করে দাও একটি বার
করছে বড় ভয়।'

এমন সময় উঠলো ডেকে
বাড়ির পোষা কুকুর,
মিষ্টি ভোরের স্বপ্ন শেষে
ঘুম ভেঙে যায় খুকুর।

জ্যান্ত মাছের বড়া

মনীষা মিত্র

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে
পয়লা আষাঢ় সাঁঝে
রান্নাঘরে বর্ষাবরণ
খুন্তি কড়াই বাজে।
চিংড়ি মাছের হচ্ছে বড়া
খিচুড়ি তার সাথে,
ছ'টা অংক করতে হবে
সময় যে নেই হাতে।
এক্ষুণি মা ডাকবে খেতে
রান্না সারা যেই

আনন্দেতে মনটা যে আজ
নাচছে তা-ধেই, ধেই।
খেতে বসে সবাই মিলে
লোডশেডিং-এ পড়ি,
জ্বলতে আলো সবাই মিলে
বলি, হরি-হরি।
বাবার পাতে গঙ্গাফড়িং
তিড়িংবিড়িং করে—
বাবা বলেন, জ্যান্ত মাছের
বড়া বোধহয় ওরে!

ছবিঃ সুফি

ফুলদি

রমেন দাস

ফুলদিকে এখন কেউ চেনে না। এখন সে ফুলপিসি। আধপাকা চুল। বয়সের ভারে ক্লান্ত। চামড়ায় টান ধরেছে। তবে সেদিনের সেই হাসিখুশি ভাব এখনও চোখেমুখে উজ্জ্বল।

অথচ ফুলদি একদিন ছিল পাড়া-প্রতিবেশী ছোট-বড়ো সকলের আপন দিদির মতো। স্কুলের পাট চুকিয়ে কলেজে গেল। তখনকার দিনে মেয়েদের কলেজে পড়ার খুব একটা চল ছিল না। কিন্তু ফুলদির লেখাপড়ার উৎসাহ দেখে তার বাবা তাকে কলেজে দিলেন। ফুলদির তাতে আনন্দ-উৎসাহ হাজার গুণ বেড়ে গেল। কলেজে ভর্তি হলেও সে এতটুকু পাল্টাল না। লালপেড়ে মোটা তাঁতের শাড়ি। হাতে দু'গাছা চুড়ি। সাজগোজের বালাই নেই। নিজের রূপেই তার সুন্দর প্রকাশ—ফুলের মতো। বাবা তাই আদরের সুরে বলতেন, প্রতিবেশী মানুষের দেওয়া নাম তোর সার্থক হয়েছে। ফুলদি ডাকের মধ্যেই তোর স্বভাবের আঁচ মেলে।

ফুলদির বাবা ছিলেন সামান্য একজন স্কুলশিক্ষক। গ্রামের লোক তাঁকে শ্রদ্ধা করত, সমীহ করত। মাস্টারমশাই দিনে স্কুলে পড়াতেন। আর রাত্রে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বড়োদের সঙ্গে আলাপ জমাতেন। এবং সেই আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে স্বদেশসেবার মন্ত্র প্রচার করতেন। আসলে তিনি ছিলেন একজন দেশকর্মী।

আমরা তখন ছোট। এক সন্ধ্যায় মাস্টারমশাই আমাদের বাড়ি এলেন। দাদাকে বললেন, এ দেশ আমাদের। কিন্তু দেশের মালিক আমরা নই।

দাদা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, তার মানে?

মাস্টারমশাই দাদার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, তার মানে এ দেশের শাসনকর্তা আমরা নই, ইংরেজ সাহেবরা। আমরা তাদের অধীন। পরাধীন।

আমরা তখনও পর্যন্ত স্বাধীনতা-পরাধীনতার তারতম্য বুঝতাম না। দাদাও বুঝত না। দাদার সেই প্রথম মাস্টারমশাইয়ের কাছে স্বদেশসেবার হাতেখড়ি। দাদা আমাদের বোঝাত, ইংরেজরা বিদেশের মানুষ। এ দেশে এসে ওরা আমাদের উপর ছড়ি ঘোরায়, মাতব্বরি করে। দাদার কথা শুনতে শুনতে আমরাও যেন কেমন হয়ে গেলাম। বুঝতে শিখলাম, আমাদের দেশে আমরাই পরদেশী!

আমাদের পাড়ায় ঘন ঘন পুলিশ আসত। কেন আসত তা প্রথমটায় বুঝতাম না। পরে জানতে পারলাম, মাস্টারমশাইকে ওরা সন্দেহ করে। মাস্টারমশাই নাকি স্বদেশী করেন। স্বদেশী, অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেন। মাস্টারমশাই ছিলেন নিখাদ মানুষ। ছেলে ছিল না। তাঁর একমাত্র মেয়ে। দেখতে ছোটখাটো—ফর্সা রঙ। মাথাভর্তি চুল। ছোটবেলায় মাস্টারমশাই তাঁর একমাত্র আদুরে সন্তানকে 'ফুলটুসি' নামে ডাকতেন। পাড়ার আর কেউ ঐ নামে ডাকলে তিনি রাগ করতেন। তাই পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে তার পরিচয় ছিল ফুলদি।

বাবার পরামর্শ মতো ফুলদি তার জীবন গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠত। তারপর শুরু হতো ফুল তোলার পালা। ফুল তোলার নামে তার প্রাতঃভ্রমণের অভ্যেস। সেই ভোররাত্রে ফুল তোলার অভ্যেস থেকেই ফুলদি সাহসী ও স্বাস্থ্যবতী হয়ে উঠল।

একবার ভোররাতে ঘুম ভাঙতেই ফুলদি দেখল, তাদের বাড়ির চারদিক পুলিশে ঘিরে রেখেছে। কী ব্যাপার? জানতে পারল, তাদের বাড়ি সার্চ হবে। ফুলদির বাবা অর্থাৎ মাস্টারমশাই গান্ধীজি-নেতাজির ভক্ত এবং দেশের কাজ করেন। সেই প্রথম পাড়ার লোকও জানতে পারল। পুলিশ দেখে ফুলদি একটুও ঘাবড়াল না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশের কর্তাকে জানিয়ে দিল, ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত লাটসাহেব এলেও কারো বাড়িতে ঢুকতে পারেন না। সেটা বে-আইনী।

পুলিশকর্তা ফুলদির কথায় অবাক। অতটুকু মেয়ে, কি তার আইনজ্ঞান! তারা ঠায় বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। রাতের অন্ধকার কেটে গেল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ল। এবার তল্লাশি পরওয়ানা দেখিয়ে পুলিশের কর্তারা তাদের ঘরে ঢুকল। ফুলদি তাদের পাশে পাশে। কিন্তু পুলিশ যার খোঁজে হন্যে হয়ে বাড়ি ঘিরে রেখেছে, সেই মাস্টারমশাই কোথায়? ক্রুদ্ধ এক পুলিশ অফিসার ধমকের সুরে জানতে চাইল। ঠাণ্ডা মাথায় শান্তভাবে ফুলদি উত্তর দিল, বাবা গত দু'দিন বাড়ির কাজে বাইরে। এখনও ফেরেননি।

তার মানে? পুলিশকর্তা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। বললেন, আমাদের সঙ্গে রসিকতা হচ্ছে?

ফুলদি হেসে বলল, বারে, রসিকতা করব কেন? আপনারা বয়সে বড়, মাননীয়। আপনাদের সঙ্গে রসিকতা চলে?

ব্যর্থ পুলিশ বাহিনী মাস্টারমশাইয়ের খোঁজ না পেয়ে ফিরে গেল। তারপর

ঘরের দরজা বন্ধ করে ফুলদি হেসে লুটোপুটি। নিজের মনেই বলে চলল, দিলাম তো পুলিশকে বোকা বানিয়ে।...

আইনের প্রশ্ন তুলে ফুলদি দরজায় পুলিশদের যে সময়টা আটকে রাখে, সে সময়ের মধ্যেই মাস্টারমশাই জরুরি কাগজপত্র নিয়ে অন্যপথে আত্মগোপন করেন। ফুলদির এই কৌশল পুলিশ বুঝতে পারে না। বাবা পরে মেয়ের এই উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করেন এবং দেশের প্রতি তার কর্তব্যজ্ঞানে উচ্ছ্বসিত হন। তারপর একের পর এক গোপন কাজের মধ্য দিয়ে ফুলদি মাস্টারমশাইয়ের স্বদেশী কর্মকাণ্ডের সহায়ক হয়ে উঠল। বাবার গোপন গতিবিধি মেয়ে ফুলটুসি, অর্থাৎ পাড়ার ফুলদি ছাড়া আর কেউ জানত না। মাতৃহারা ফুলদি এভাবেই বাবার সেবাযত্ন আর দেখাশুনা করতে লাগল। স্কুলমাস্টার বাবাও একমাত্র মেয়েকে নিয়ে সংসার চালনার নামে নিজের ঘরে স্বদেশী বন্ধুদের একটি গোপন আখড়া গড়ে তুললেন। ফুলদির জীবন নতুন দিকে মোড় নিল।

ফুলদির এখন অনেক বয়েস হয়েছে। কিশোরী ফুলদির কালো চুল সাদা। দু'চোখের কোণে ক্লান্তির ছাপ। জীবনের অভিজ্ঞতাও তো কম হলো না। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমারু বিমানের আকাশ জুড়ে দাপাদাপি, গান্ধীজি-সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, দেশ-ভাগ, আরও কত কী। ইতিহাসের পর ইতিহাস। বয়েস এবং অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলদির মনের তো বটেই, পরিচয়েরও পরিবর্তন ঘটেছে। বাবার দেওয়া ফুলটুসি নাম পাড়া-পড়শীর কাছে একদিন ফুলদি নামে জনপ্রিয় হয়েছিল। ছোট বড়ো সকলেই ফুলদি বলে সম্বোধন করত। বৃদ্ধা বয়সে এখন দিদি বলতে সকলেরই দ্বিধা। ফুলদি এখন ফুলপিসি।

হলুদপুকুর ছোট্ট গ্রাম। শহর থেকে অনেক দূরে নির্জন-প্রায়। অনেক আগেই বাবা বিদায় নিয়েছেন। দেশভাগের সময় বাবা তিন রাত তিন দিন ঘর থেকে বেরোননি। দরজা বন্ধ করে তিনি উপোসে কাটান। দু'চোখে অঝোর ধারা। বলেছিলেন, বুঝলি ফুলটুসি, দেশভাগের আগে আমার কলজেটা কেটে ফেললে এই দুঃখের বোঝা বইতে হতো না। স্বদেশী করেছিলাম দেশের মুক্তির জন্য। দেশভাগের জন্য নয়। বাবার সেই কথা এখনও ফুলপিসির কানে বাজে।

দেশভাগের পর এপার বাংলায় চলে এসে হলুদপুকুরে একটা ছোট বাড়ি করেছিলেন মাস্টারমশাই। মেয়ে ফুলটুসিকে নিয়ে নতুন করে ঘর বেঁধেছিলেন ঠিকই। কিন্তু সে ঘরে তাঁর বেশিদিন ঠাঁই হয়নি। একমাত্র আদুরে সন্তানকে রেখে চিরকালের মতো বিদায় নিলেন। ফুলটুসির বারবার বাবার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে ফেলে আসা সেই গ্রাম ও বাড়ির কথা। পাড়া-প্রতিবেশী সকলের কথা। কিন্তু কোথায় আজ তারা! কোথায় সেই ছেড়ে আসা গ্রাম!

হলুদপুকুর গ্রামের নির্জন প্রান্তে তাদের কুঁড়েঘর। পাশে ছোট্ট একটি পুকুর। পুকুরের চারধারে সুপারি আর নারকেল চারা। এখনও ফল ধরেনি। প্রতিটি গাছই বাবার স্মৃতি জড়ানো। গাছগুলোর সবুজ শোভায় চোখ পড়লে ফুলপিসির দু'চোখের পাতা ভিজে আসে। বাবাই গাছগুলো নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন।

পড়ন্ত বিকেল। ফুলপিসি পুকুরের ঘাটে বসে তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবছিল। হঠাৎ তার চোখ গিয়ে পড়ল একগুচ্ছ ঝুমকো ফুলের উপর। কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে ফুলের রঙ। ঝুমকো ফুলের অনেকগুলোই বাসি। কেউ গাছ থেকে তোলেনি। এখানে কেউ ফুল তুলতে আসে না। ফুল তোলার অভ্যেস কারো নেই। নেই ভোরে বেড়ানোর পালাও। কেমন যেন প্রাণহীন গ্রাম। ফুলপিসির মন বসে না এ গ্রামে। বারবার মনে পড়ে সেই ছেড়ে আসা গ্রামের কথা। অস্বস্তিবোধ করে ফুলপিসি। ফুলটুসি থেকে ফুলদি। ফুলদির পর ফুলপিসি। ধাপে ধাপে কত পরিবর্তন। পরিবর্তন যেন প্রকৃতিতেও।

না, আর ভাল লাগছিল না ফুলপিসির। বিদায়ী সূর্যের গৈরিক আভায় পুকুরের জলের রঙ বদল হয়েছে। পুকুরের টলটলে জলে ঘোলাটে রঙ। তার চিন্তাভাবনাও কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। ফুলপিসির আর কিছু ভাল লাগছে না। পুকুরঘাট ছেড়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল। এমন সময় আচমকা এক পরিচিত পাখির ডাকে তার ঘোর কাটল। অদ্ভুত দেখতে পাখিটা তার খুব পরিচিত। বহু বছর পর হঠাৎ দেখা। অবাক চোখে দেখে, পাশের ডালিম গাছের ডালে দোয়েল পাখিটা আনন্দে দোল খাচ্ছে। আর মিষ্টি শিসে 'পিকপিক' গান গাইছে। ফুলপিসি অবাক। তার সব দুঃখ মুহূর্তে দূর হয় গেল। আনন্দ-আবেগে সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগল। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ পাখিটার দিকে চোখ রেখে বলে উঠল, এতদিন পর কোথা থেকে এলি দুষ্টু দোয়েল? এতদিন কোথায় লুকিয়েছিলি?

ফুলপিসির চোখের সামনে ছেড়ে আসা গ্রামের সেই পুকুরপাড়ের ছবি ভেসে উঠল। সকাল-সন্ধ্যায় পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসত। নির্জন সেই সময়ে দোয়েল পাখিটা রোজ আসত। পিকপিক সুর তুলে আনন্দে গান গাইত। কত কথা কইত। আর ফুরুৎ ফুরুৎ করে হিজল গাছের এডাল-ওডাল করত।

সেই দোয়েলটা বহু বছর পর আজ আবার এসেছে। ফুলটুসির খোঁজ পেয়েই হয়তো বহু ক্রোশ পথ পার হয়ে এখানে এসেছে। কোনও পরিবর্তন নেই দোয়েলটার। সেই সুর, সেই পিকপিক শিস। দোয়েলটা পিটপিট করে তাকাচ্ছিল। ওর চাউনি দেখে ফুলপিসি না হেসে পারল না। বলল, হ্যাঁ—আমিই তোমাদের সেই ফুলদি! চিনতে পারছ?

ফুলপিসি ডালিম গাছটার দিকে এগিয়ে যেতেই দোয়েল পাখিটা ফুরুৎ করে উধাও হলো। চোখের নিমেষে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। উদাস চোখে ফুলপিসি চারদিকে তাকাল। কিন্তু দোয়েল পাখিটার আর দেখা মিলল না। ফেলে আসা গ্রাম আর শৈশবের স্মৃতির ছবি এঁকে দিয়ে দুষ্টু দোয়েল কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

ছবি : সুফি

গজপতি

সুকুমার ভট্টাচার্য

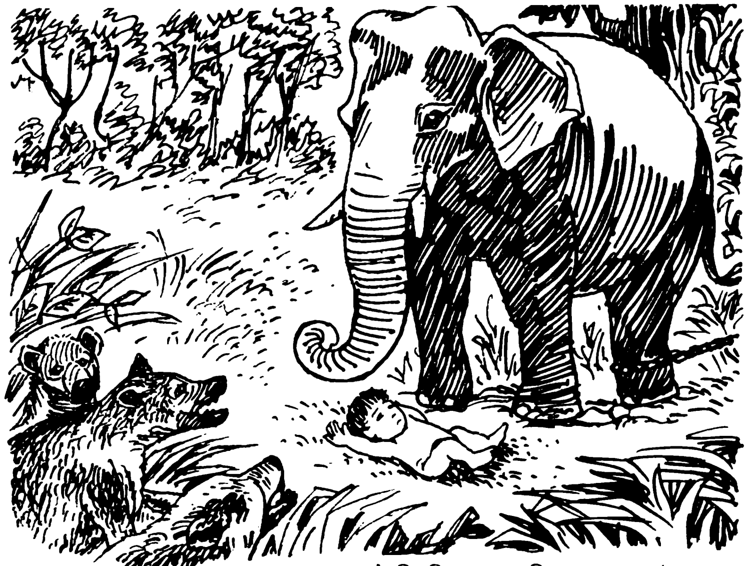

একটা সুন্দর শিকারি হাতি। নাম গজপতি। পাক্কা দশ ফুট লম্বা, দশাসই চেহারা। বন-দপ্তরের কর্তারা যখন বাঘ শিকার করতে বেরন, তখনি সঙ্গে নেন গজপতিকে। কিংবা প্রায়ই তাঁদের যেতে হয় বন-পরিদর্শনে, হয়তো বা হিমালয়ের গহন পাদদেশে। পথে পড়ে দারুণ সব খরস্রোতা পাহাড়ী নদী আর ঘন জঙ্গল। এসব রাস্তায় অন্য কোনো জীব বা টাট্টু ঘোড়া একেবারে অচল। অতএব তখনি ডাকো গজপতিকে। কিংবা বুক-উঁচু ঘাসের জঙ্গলে তল্লাশি চালাতে হবে, গরু-মোষ মারা বাঘকে মারার জন্য। তখনি ডাক পড়ে গজপতির। হ্যাঁ, আর একটা কাজেও লাগানো হয় গজপতিকে। তার যে মাহুত করিম, তার একেবারে কচি বাচ্চাটাকে সামলাবার দরকার হলে।

কিন্তু এই হাতিরা বড় একটা সহজ প্রাণী নয়। খুব সহজেই মানুষের প্রাণ নিতে পারে এবং নেয়ও কখনো-সখনো। অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে, এর নজির পাওয়া যায়। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত অপরাধীর প্রাণ নিতে হাতিদেরই ব্যবহার করা হতো। যত যাই হোক, তবু সাধারণত একটা ব্যাপার দেখা যায়,—সমস্ত প্রাণীই অন্য প্রজাতির শিশুদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমাশীল। কিন্তু হাতিরা,—তারা যেন আবার অতি মাত্রায় সদাশয়।

গজপতির মাহুত হলো করিম। এই করিমের ওপর গজপতির যেমন বিশ্বাস তেমনি ভালবাসা। কখনো কোনো কারণেই সে করিমের বিরুদ্ধাচরণ করেনি। আর করিম বা করিমের বউ, তাদেরও খুব বিশ্বাস গজপতির ওপর। বন-দপ্তরে যখন কোনো কাজ থাকে না, তখন গজপতি বসে দাঁড়িয়ে সময় কাটায়। করিমের বউ জ্বালানি আনতে কিংবা নদীতে জল আনতে যায়—তখন ভরসা ওই গজপতি। মাটির ধুলোর ওপর বড় একটা বৃত্ত এঁকে, নিজের একেবারে বাচ্চা শিশুটাকে মাঝখানে শুইয়ে দেয়। গজপতিকে বলে, 'ছেলেটা রইল—দেখিস! যেন এই দাগের বাইরে না যায়।'

গজপতি বোঝে। নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। আপন মনে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বাচ্চাটা যখনি দাগের বাইরে যায়—তখনি গজপতি তার শুঁড় দিয়ে টেনে মাঝখানে করে দেয়।

গজপতি আর নিজের ওই শিশু ছেলেটাকে নিয়ে করিমের গর্বের অন্ত নেই। এমন সুন্দর শিশু কি কারো বাড়িতে আছে? কই, কেউ দেখাক তো! যেমন ফর্সা তেমনি গোলগাল। টানা টানা চোখ। এক মাথা ঘন কালো চুল! আর গজপতি? তারই বা জুড়ি কোথায়? সারা এশিয়া ঘুরে এলেও এমন বিরাট বুদ্ধিমান ঐরাবত আর একটা মিলবে না।

তবে সেদিনকার কাজটা করিম খুব ভালো করেনি। অন্তত গজপতির মনোমতো নয়। কিছুদিন ধরে একটা বাঘ বড় উৎপাত করছিল জঙ্গলে। সুযোগ পেলেই গরু মারতো। তাই বন-দপ্তরের কর্তারা গেছিল তার বিহিত করতে। সঙ্গে নিয়ে গেছিল করিম আর গজপতিকে। গুলি করে মারার পর কর্তারা দেহটাকে জঙ্গলেই ফেলে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু করিম তা হতে দেয়নি। মরা বাঘটাকে গজপতির পিঠে তুলে, বেঁধে নিয়েছিল দড়ি দিয়ে। এনেছিল ক্যাম্পে। ইচ্ছে, ছালটা ছাড়িয়ে বাজারে বিক্রি করে কিছু রোজগার করবে। না। করিমের একাজে গজপতি মোটেই খুশি হয়নি। তবু, কোনোরকম বেচালি না করে নির্বিবাদে মরা বাঘটাকে বয়ে এনেছিল।

পিঠ থেকে নামাবার পরেই করিম দেখতে পেল, গজপতির পা দিয়ে অঝোরধারে রক্ত পড়ছে। বউকে বলল, 'তাই বলি, গজপতি অমন পা টেনে টেনে খুঁড়িয়ে হাঁটে কেন?'

তারপরই স্বামী-স্ত্রী দুজনে লেগে পড়েছিল গজপতির সেবায়। পশুটাকে মাটিতে ফেলে, তার পায়ের মাংস কেটে দেখে—ভেতরে একটা মস্ত পেরেক ঢুকে বসে আছে। তারা সেটাকে বার করে দিল।

এই ক্যাম্পের পাট উঠিয়ে আগামীকাল তারা অন্য জায়গায় চলে যাবে। কিন্তু গজপতি এখনো সুস্থ নয়। তাই বন-দপ্তরের কর্তা বললেন, 'করিম, এখন আর ওকে বিরক্ত করো না। কাল পর্যন্ত ওকে বিশ্রামে রাখ। পরশু কিংবা তার পরের দিন ওকে আমাদের প্রয়োজন হবে।

সুতরাং করিম, তার বউ-বাচ্চা আর গজপতিকে রেখে ক্যাম্পের সকলে পরদিন সকালেই রওনা হয়ে গেল। দু'দিন পরে গজপতির পায়ের ঘা মোটামুটি শুকিয়ে গেল। সে আবার উঠে দাঁড়াল। অতএব

করিম আর দেরি না করে বউ-বাচ্চা নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল।

হাতিরা সাধারণত জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ হাঁটতে ভালবাসে। কারণ পথের দু'পাশে নানা ধরনের গাছ-গাছালি। তার ডালপালা খেতে খেতে বেশ আয়েস করে যাওয়া যায়। আর যেহেতু রকমারি গাছ, তাই তাদের নানা রকম আস্বাদ। আর সকলেই জানে, হাতিতে যাওয়া মানেই বেশ ধীরে সুস্থে যাওয়া। কিন্তু সামনেই পড়ে রাপ্তা নদী। যেমন চওড়া তেমনি খরস্রোতা। হেঁটেই পার হতে হবে। অতএব করিম ঠিক করল, তারা যে অঞ্চলে আছে, ওই অঞ্চলেই নদী পারাপারের কাজটা সেরে নেবে। তা না হলে নদীর তীর ধরে নেমে যেতে হবে সেই বকরিঘাট পর্যন্ত। ওখানটায় রাস্তা একটু বেশি চওড়া হলেও জল কম। হলে হবে কি, এখান থেকে বকরিঘাট কিছু না হোক অন্তত পাঁচ মাইল দূর। একটা হাতি, দিনে দশ থেকে পনের মাইল হাঁটতে পারে। তার মানে, তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে আরো একটা দিন দেরি হবে। তাই বউকে ডেকে বলল, 'আমরা এখানেই নদী পার হব। আর ওপারে গিয়ে নদীর ধারেই তাঁবু গাড়ব।'

বউ আর কি বলবে! করিম তার আসন্ন করণীয় কাজগুলো পর পর বলে গেল, 'এর দরুন হাতে আমরা অনেকটা সময় পাব। কাজ তো কিছু কম নয়! যেমন প্রথমেই গজপতির খাবার জন্যে কিছু গাছপালা কেটে আনতে হবে। তারপর আছে তাঁবুর মেঝে ঢাকার জন্যে কিছু শুকনো ঘাস যোগাড় করা, আগুন জ্বালাবার জন্যে জ্বালানি আনা,—ঝামেলা কি কম?'

নদীর অবস্থা বড় মন্দ নয়। কুলু কুলু আওয়াজ করে খরস্রোতা বেশ খোশ মেজাজে বয়ে চলেছে। মানুষ বা ঘোড়া হলে তবু তাড়াতাড়ি হতো। কিন্তু গজপতি বেশ ধীর পায়ে—মাঝে মাঝে পড়ে থাকা পাথরের চাঙড় এড়িয়ে ওপারে পৌঁছতে একটু বেশি সময়ই নিল। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে, তাঁবুর জন্যে একটা জায়গা পছন্দ করল করিম।

করিম প্রথমেই কিছু ঘাস কেটে এনে, রাত কাটাবার মতো একটা কুঁড়ে তৈরি করল। বউ যোগাড় করে আনল কিছু জ্বালানি কাঠ আর তিনটে ছোট পাথরখণ্ড। উনুন তৈরির জন্যে। বাচ্চাটাকে খাওয়াল বন্যমধু আর দুধ। ইতিমধ্যে করিম কেটে আনল পাহাড়প্রমাণ গাছের ডালপালা। গজপতির জন্যে। হাত দশেক দূরে ছিল একটা ঝাঁকড়ামাকড়া গাছ। তার ছায়ায় গিয়ে রাখল সেগুলো। তারপর গজপতিকে নিয়ে গিয়ে সেই গাছের ছায়ায় বেঁধে দিল।

করিমের বউ বড় একটা মাটির কলসি নিয়ে জল আনতে যায় নদীতে। যাবার সময় করিমকে বলে যায়, 'ছেলেটা রইল। দেখো।'

সেই যে গেল, বউ আর ফেরে না। দেরি দেখে উঠে দাঁড়ায় করিম। বউ যেদিকে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়ে, 'কই কোথায় গেলে? তাড়াতাড়ি এসো। ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

কিন্তু কোথায় কে? শুধু তার ডাকার প্রতিধ্বনি, গাছপালা আর প্রান্তরের ওপর পাক খেয়ে ফিরে এল। তখন আর ধৈর্য রাখতে পারল না করিম। গজপতির পায়ের কাছের মাটিতে একটা গোলাকার বৃত্ত এঁকে, বাচ্চাটাকে তার মাঝখানে শুইয়ে দিল। গজপতিকে বলল, 'ভাল করে নজর রাখিস। ছেলেটা রইল।'

বলেই দৌড় দিল নদীর দিকে। মনে ভাবনা, না জানি কি বিপদ ঘটিয়ে বসেছে বউটা!

গজপতি কিন্তু নির্বিকার। সে জানে, কর্তা-গিন্নি যখন দুজনেই বাইরে, তখন ছেলেটার দেখাশোনা তাকেই করতে হবে। সে তার আহারপর্ব চালিয়ে যায় নিজের মতো করে।

ঠিক তার শুঁড়ের নিচে করিমের বাচ্চাটা শুয়ে থাকে। হাত-পা ছুঁড়ে খেলে,—কখনো বা গজপতির শুঁড় ধরে খিলখিলিয়ে হাসে। আলগা হাতে গজপতির মুখ থেকে বেরিয়ে আসা পাতা খাবলে ধরার চেষ্টা করে। এই করতে করতে বাচ্চাটা হয়তো চলে যায় বৃত্তের বাইরে। কিন্তু গজপতির চোখ এড়িয়ে যাওয়া অত সহজ নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে শুঁড় দিয়ে টেনে বৃত্তের মাঝখানে করে দেয় শিশুটাকে।

পাহাড়ের ওপর থেকে বয়ে আসে মৃদু-মন্দ বাতাস। ঝিরঝির আওয়াজ ওঠে গাছগাছালির পাতায়। রবির আলোও কমে আসে একটু একটু করে। যদিও সময় নিয়ে ওদের কারোরই কোনো মাথাব্যথা নেই। তবুও সময়টা প্রায় সন্ধ্যে। ওরা একে অন্যকে নিয়েই মশগুল পাশের সেই ঝাঁকড়ামাকড়া গাছটার নিচে, এ এক ভারি মজার দৃশ্য।

নিচু পাহাড়ি এলাকা। এখানকার জমিতে শুধু ঘন ঘাসের বুনন আর নানা ধরনের গাছপালা। সন্ধ্যে নামলেই এসব জায়গায় রাতচরা প্রাণীদের চলাচল শুরু হয়ে যায়। প্রহর ঘোষণা করে প্রথমেই শোরগোল তোলে শিবাকুল। আর যে সব প্রাণীরা মাটির নিচের গর্তে থাকে, তারা বেরিয়ে আসে এক এক করে। মাথা-উঁচু ঘাসের জঙ্গলে নেকড়েদের নড়াচড়া চোখে পড়ে। কর্কশ ডাক দিয়ে ওঠে পেচক। যদিও অতটুকু মানবশিশুর কাছে এরা কেউই তেমন মারাত্মক নয়।

আর হায়না? হায়নারাও এই সময় তাদের গর্ত থেকে বার হয়।

একটু দূরেই আছে ঘোষো মাঠ। ওখানকারই একটা গর্তে ওদের বাস।

একটা পুরুষ হায়না প্রথম বার হয় গর্ত থেকে। চারদিকে নজর করে আন্দাজ করার চেষ্টা করে আসন্ন রাত্তিরটা কেমন যাবে। ওরা সাধারণত অন্য পশুর মারা পচাগলা মাংস খেয়েই জীবনধারণ করে। এককথায় পর-উচ্ছিষ্ট ভোজী। কিন্তু তেমন তেমন সুযোগ পেলে, অসহায় ছোট্ট প্রাণীদের মারতে দ্বিধা করে না। আর ভারতবর্ষে প্রত্যেক বছরেই একটা না একটা মানবশিশুকে হায়নাদের হাতে মরতে শোনা যায়।

গর্ত থেকে বার হয়েই পুরুষ হায়নাটা তাকাল এদিক-সেদিক। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিল। কোথাও থেকে যদি পচা-গলা মাংসের গন্ধ পায়! কেননা ওটাই ওর খাদ্য। পিছু পিছু বার হয় তার সঙ্গিনীটা। বার হয় প্রায় সাবালক আর একটা হায়না। তিনটের চেহারাই বেশ বড়-সড়। উচ্চতায় তিন ফুট, লম্বাতে পাঁচ ফুট তো বটেই। নোংরা ছাই রঙের

লোমশ দেহ। চেহারায় সামনের দিকটা পেছনের থেকে অনেক চওড়া। কোনো রকম সাড়াশব্দ না করে তিনটেতে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শব্দ ও গন্ধ নেওয়ার কাজটা সারতে সারতে জিবটা কয়েকবার বুলিয়ে নিল ঠোঁটের ওপর। আর ঠিক ওই সময়েই করিমের বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। আর সে আওয়াজ কানে যেতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল হায়নাগুলো। আওয়াজটা যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে দৌড় শুরু করল তিনটেতে।

কিছু একটা ত্রুটি হয়েছে, আর তার জন্যেই যে বাচ্চাটা কাঁদছে, এটা বুঝতে পারে গজপতি। না হলে মিছিমিছি কাঁদবে কেন? কিন্তু ত্রুটিটা যে কি, সেটাই বুঝতে পারে না। বেশ কয়েকটা পাতা শুঁড় দিয়ে বাচ্চাটার মুখে দিল। কোনো কাজ হলো না। জলের অভাব, তাই ভু-ভু করে মুখের ভাপ দিল বাচ্চাটার মুখের ওপর। এ কাজটা তার নিজের খুব পছন্দসই। সেই কারণেই দিল। কিন্তু হলে হবে কি, ছেলের কান্না আর থামে না।

তখন বাধ্য হয়ে শুঁড় উঁচিয়ে তারস্বরে হাঁক পাড়ল করিমের উদ্দেশে। এ ডাকের বক্তব্য একটাই—'এখুনি এসো,—যা হোক একটা কিছু বিহিত করো।'

কিন্তু কোথায় করিম? কোথায়ই বা তার বউ? কারোরই দেখা নেই।

এরই মধ্যে হায়নার গায়ের গন্ধ নাকে এল গজপতির। উৎকণ্ঠা আরো বাড়ল তার। হায়না যাতে খুব কাছাকাছি না হতে পারে, তার জন্যে সজোরে নিঃশ্বাস নেওয়া-ছাড়া আরম্ভ করে দিল। যাতে ভয় পায় ওরা। মুখ ঘুরিয়ে দেখে এপাশ-ওপাশ। যদি দেখতে পায়!

ওরা যে সংখ্যায় একের বেশি, এটা সে বুঝতে পারে। যদিও শয়তানরা চোখের বাইরে, কিন্তু দূরে নয় মোটেই। আর তাদের মতলবও যে খারাপ, এটাও বুঝতে পারে গজপতি।

বুঝল, মাথার ওপর ঘোর বিপদ!

শুঁড় দিয়ে বাচ্চাটাকে একেবারে সামনের দু'পায়ের মাঝে টেনে এনে রাখল।

হায়না তিনটের চোখ তখন করিমের তৈরি ছোট কুঁড়েঘরটার দিকে। আন্দাজ করার চেষ্টা করে, কোনো মানুষ ওখানে আছে কিনা? যদি কেউ না থাকে, তাহলে ওরা ঝুঁকি নেবে। আক্রমণ করে ছিনিয়ে নেবে বাচ্চাটাকে।

রুখে উঠল গজপতি। প্রথমে গর্জন, তারপর শুরু হলো শুঁড় গুটানো আর খোলা। মাথার নাড়াচাড়াতে গলার ঘণ্টাটা রীতিমতো আওয়াজ তুলল বন কাঁপিয়ে। কুলোর মতো কান দুটো কিছু আগেও পাখার মতো এপাশ-ওপাশ করছিল, এ সময় সে দুটো একেবারে সেঁটে রইল ঘাড়ের দু'পাশে। ওর বিক্রম দেখে হায়না দুটো পিছু হটে গেল কয়েক পা। কিছু পরে সাহস করে আবার ফিরে এল।

হাতিদের মস্ত অসুবিধে হলো ওদের চোখ। দেহের তুলনায় সে দুটো খুব ছোট বলে, সবদিকে তেমন নজর করতে পারে না। কিন্তু ওদের ঘ্রাণশক্তি ভীষণ প্রখর। হায়নাদের উপস্থিতি সে টের পায় ঘ্রাণশক্তি দিয়ে। এবার সে তাদের দেখতে পেল। ফলে রাগ চড়ল ভীষণভাবে। চিৎকার করে তেড়ে যাবার উপক্রম করল। এক পা এগিয়ে, দু'পা পিছিয়ে পা ছুঁড়তে লাগল সজোরে। পাশের গাছের সঙ্গে বাঁধা চেনটায় টান পড়ল। মড়মড় আওয়াজ উঠল গাছটায়। একটু বুঝি বা হেলেও পড়ল।

অত কাণ্ড করলেও, তার জ্ঞান ছিল টনটনে। একটুওর জন্যে ভোলেনি, বাচ্চাটার অবস্থান।

ব্যাপার দেখে হায়নাগুলোর একেবারে হতবুদ্ধি অবস্থা। একটা হায়না গজপতির ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল বাচ্চাটার দিকে। অন্য দুটো গজপতির পেছন দিকে ঘুরঘুর করতে লাগল। গজপতি পিছু ফেরে সে দুটোকে তাড়া দেবার জন্যে। পরমুহূর্তেই ফিরে দাঁড়ায় সামনের হায়নাটার দিকে। ওটাই সব থেকে বিপজ্জনক। কারণ ওটাই সব থেকে কাছে।

হঠাৎ কি খেয়াল হলো, মাথা দিয়ে পাশের গাছটায় প্রচণ্ড জোরে ঢুঁ মারল। দেখে মনে হলো, সে যেন গাছটাকে ভেঙে ফেলতে চায় হায়নাগুলোর মাথার ওপর। কিন্তু তা হলো না। গাছটা ছিল একটা বুনো আমগাছ। তাকে পেড়ে ফেলা অত সহজ নয়। তবে শিকড়বাকড়গুলো মাটির বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

এই ফাঁকে সামনের হায়নাটা একটু এগিয়ে এসেছিল। মুহূর্তে মাথা ঘুরিয়ে তাকে তেড়ে গেল গজপতি। হায়নাটাও লাফিয়ে দূরে সরে গেল।

পিছনের শয়তানটা এই ফাঁকে বাচ্চাটাকে টেনে নিতে গেল। গজপতি আবার তার শুঁড় ঘোরাল। তৎক্ষণাৎ সেটা দূরে সরে গেল।

সে বুঝল, এভাবে হায়নাগুলোকে কায়দা করা যাবে না। অন্যভাবে লড়তে হবে। এই ভেবে সে একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল হেলে পড়া আমগাছটার গা ঘেঁষে, আর শুঁড়টাকে ঘন ঘন আছড়াতে লাগল মাটির ওপর। বিপদ বুঝলে হাতিরা যেমন সচরাচর করে থাকে।

হায়নাগুলোরও খিদেয় নাড়ি টনটন করছিল। সারারাত ধরে এমন খেলা খেলতে রাজী নয়। অতএব এবার তারা নিঃসাড়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল। কারণ, অতবড় একটা প্রাণী, সমীহ না করে উপায় নেই। কিন্তু গজপতির পা, বা তার মাংসপেশীর কি যে অসীম ক্ষমতা, সেটা তাদের জানা ছিল না।

যেই না তারা চড়াও হলো, গজপতি প্রচণ্ড জোরে পা চালাল। অতবড় ভারী পা-টা একবার চকিতের মতো উঠেই নেমে এল মাটিতে। সামনের হায়নাটা সরে যাবারও সময় পেল না। গিয়ে পড়ল পায়ের নিচে। যখন একেবারে আঁকুপাকু অবস্থা, তখন আরো চাপ দিয়ে সেটাকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করে ছাড়ল গজপতি। একটা হর্ষধ্বনি করে মড়া হায়নাটাকে পা দিয়েই একপাশে ঠেলে দিল।

ব্যাপার দেখে অন্য হায়না দুটো একেবারে দে চম্পট!

খিদেয়-তেষ্টায় বাচ্চাটার অবস্থা তখন আরো কাহিল। আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। চোখ বুজে চিত হয়ে পড়েছিল একরাশ পাতার ওপর। গজপতি ধুলোলাগা একটা ছোট্ট আখের টুকরো তার মুখে দিয়েছিল, সেটা তখনো তার মুখে। একটা শত্রু নিধন করে এবার গজপতি বাচ্চাটার দিকে মন দিল। ঠাণ্ডায় নেতিয়ে গিয়েছিল বাচ্চাটা। গজপতি মুখ দিয়ে ঘন ঘন গরম

হাওয়ার ভাপ দিয়ে, তার দেহটাকে গরম করল। আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেটা।

স্বস্তি পেল গজপতি। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও শান্তি পেল মনে। হাতিরা সাধারণত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। প্রথমটায় একটু ঝিমুনি, কিন্তু মাঝরাত্তির নাগাদ সে ঘুমিয়েই পড়ল।

এর মধ্যে কোন সময় বাচ্চাটার ঘুম ভেঙেছে। এপাশ-ওপাশ করতে করতে চলে গেছে বৃত্তের বাইরে। প্রায় নাগালের বাইরে। এমন সময় চোখ খুলল গজপতি।

তখন উষাকাল। খুব সামান্য আলোর আভাস আকাশে। কিসের একটা আওয়াজে মুখ ফেরাতেই দেখল, হায়না দুটো ফিরে আসছে। বাচ্চাটা তখনো তার থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে। চঞ্চল হয়ে উঠল সে। চেন বাঁধা, তবু যতটা পারল এগিয়ে গেল বাচ্চাটাকে টেনে আনার জন্যে। নাগাল পেল না। তখন প্রচণ্ড টান দিয়ে চেন কেটে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। পারল না। চেন বসে গেল মাংস কেটে। গলগলিয়ে রক্ত ঝরে পড়ল।

হায়না দুটো বুঝল, এটাই সুযোগ। তারা এবার এগিয়ে এল।

ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। গজপতির মাথার পর পর ধাক্কায় আমগাছের গোড়াটা এমনিতেই আলগা হয়ে গেছিল। চেনটার টানে আরো হেলে পড়েছিল গাছটা। এবার সেটা শাখা-প্রশাখা সমেত হুড়মুড়িয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে গজপতি আর বাচ্চাটার ওপর।

ব্যাপার বেগতিক দেখে হায়না দুটো সোজা চম্পট দিল। আর ফিরল না।

করিম আর তার বউ ফিরে এসে দেখল, গাছটা পড়ে আছে মাটিতে।

তাহলে! তাদের ছেলে! বাচ্চাটা কোথায়?

ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুজনেই। উঁকিঝুঁকি মারতে দেখল, গজপতি আর তাদের ছেলেটা সেখানেই আছে। গজপতির গোল করে পাকানো শুঁড়ের ওপর শুয়ে বাচ্চাটা বেশ আরাম করে ঘুমোচ্ছে। আশঙ্কায় এমনিতেই করিমের বউয়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।.এবার বাচ্চাটাকে দেখতে পেয়েই, তীরের মতো ছুটে গিয়ে প্রায় ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিল সে।

খিদে-তেষ্টা, ধুলো-কাদায় বাচ্চাটাও বিধ্বস্ত। কিন্তু অক্ষত।

আর গজপতি?

বাবু তখনো ঘুমোচ্ছে। ডালপালা চাপা অবস্থায়।

'হতভাগা, বেইমান, নেমকহারাম কোথাকার!' একটানা গালাগাল দিয়ে চলল করিম, 'বে-আক্কেলে! চেন টেনে গাছটাকে উপড়ে ফেলেছিস! যদি বাচ্চাটার মাথায় পড়ত? কি হতো তাহলে? বাঁচত?'

বলে করিম কুড়ুল দিয়ে গাছটার ডালপালা কাটতে শুরু করে দিল। গজপতিকে মুক্ত করার জন্যে। আর করিমের বউ, বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ঝরঝরিয়ে কেঁদেই চলল। সারারাত যে হুজ্জোতি তার মাথার ওপর দিয়ে গেছে, তারপর শরীরে আর শক্তি ছিল না।

কি কুক্ষণেই সে গেছল নদীতে জল আনতে! নদীতে নেমে হুড়োতাড়া করে কলসিতে জল ভরার মতো বিপজ্জনক কাজ আর নেই। কলসিটা ভরে যাবার পর, যেই সেটাকে কোমরে তুলতে যাবে, এমন সময় পা গেল পিছলে। কলসি গেল হাত থেকে ছেড়ে। নিজে পড়ল জলে। খরস্রোতা রাপ্তী। সজোরে তাকে টেনে নিয়ে চলল। মাইলের পর মাইল। কোনো রকমে গা ভাসিয়ে একসময় গিয়ে উঠল পাড়ে। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে চারদিকে। কি করে? বাধ্য হয়ে হাঁটা শুরু করল বকরিঘাটের দিকে। এদিকে করিম নদীতে গিয়ে দেখল, পরিষ্কার হাঁটুভর জলের নিচে কলসিটা পড়ে। করিম বুঝল, জল নেবার সময় বউ তার ভেসে গেছে। সে তখন নদীর পাড় ধরে ছুটতে লাগল। যদি বউকে দেখতে পায়! বেশ কয়েক মাইল যাবার পর পড়ল জঙ্গল। রাত্তিরে ওর ভেতরে যাওয়াটা ঠিক নয় ভেবে, ফেরার পথ ধরল। কারণ, ওদিকে বাচ্চাটা পড়ে আছে। সেটাকে সামলানো দরকার। অতএব ফেরার পথই ধরল। ভোর হয় হয় এমন সময় রাস্তাতেই বউয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আর ছেলেটার কথা ভেবে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির হয়েছে অকুস্থলে।

ডালপালা কেটে, কোনোক্রমে গজপতির কাছে পৌঁছল করিম। চেনটা খুলে দিল। হঠাৎ করিমের বউ বলল, 'দেখ দেখ, ওর পায়ে কত রক্ত? নিশ্চয় খুব লেগেছে। এবার মরবে হাতিটা!'

কিন্তু না। মুখ তুলল গজপতি। পিঠের ওপর জড় হয়ে থাকা একরাশ ডালপালা। সে সব ঠেলে ধীরে ধীরে চার পায়ে উঠে দাঁড়াল সে। যদিও একটা পা একেবারে ক্ষত-বিক্ষত। দেহটা কাঁপছে থরথর করে।

কটু ভাষায় একটানা গালাগাল দিয়ে চলল করিম, 'পেচকের বাচ্চা কোথাকার! অকর্মার ঢেঁকি! বিশ্বাসঘাতক! মাথায় একেবারে গোবর পোরা!'

যা মুখে এল, তাই বলে গেল একরাশ! গজপতি মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অন্যায় কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে ভেবে, শুধু শুঁড়টা হালকাভাবে দোলাতে লাগল। লজ্জায়। কিন্তু—

পরমুহূর্তেই করিমের বউ ব্যস্ত হয়ে দু'পা এগিয়ে এল। বলল, 'দেখ দেখ—!'

ইতিপূর্বেই উঠে দাঁড়িয়েছিল গজপতি। ডালপালা ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। ফলে পায়ের তলায় পিষে মারা হায়নার দেহটা দেখতে পেয়েছিল করিমের বউ। তারপর চারপাশের শুকনো জমির ওপর নজর করতেই করিম দেখল,—জমির ওপর হায়নাদের পায়ের ছাপ! আর তখনি, সারা রাত্তিরের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ছবির মতো ভেসে উঠল তার চোখে।

নিজের ভুল বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না করিমের। গজপতির শুঁড় চেপে ধরল দু'হাত দিয়ে। বলল, 'আমি অন্যায় করেছি। ভুল বুঝেছি তোকে।'

তারপর সারা রাতের ঘটনা সে শোনাতে বসল গজপতিকে। মাথা নিচু করে শুনল গজপতি। অনেক পরে মুখ তুলল। পিটপিট করে তাকিয়ে রইল করিমের দিকে।

বিদেশী গল্প অবলম্বনে

ছবি : সুফি

অঞ্জলি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

স্নান করে ঠাকুরঘরে ঢুকেই প্রভাত অবাক হয়ে গেল। গত পাঁচ বছরে এরকম ব্যতিক্রম তার কখনো চোখে পড়েনি। পুজোর সব আয়োজন ঠিক রয়েছে কিন্তু পুজোর ফুল কোথায়? ফুলের থালা গঙ্গাজলের ঘটির উপরে বসানো, কিন্তু থালা শূন্য। এক থালা ভর্তি লাল আর সাদা ফুল, সেই পরিচিত পবিত্র দৃশ্য আজ অনুপস্থিত। এই সময়টা তার খুব তাড়া থাকে। ৮.৫৫ ট্রেন ধরে তাকে কলকাতায় ছুটতে হবে। দশটায় অফিস। এক মিনিট এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। অথচ অফিস বেরোবার আগে কুল-দেবতার পুজো করতেই হবে। ঠাকুরঘর থেকে গলা বাড়িয়ে প্রভাত চিৎকার করতে লাগল—কল্যাণী, কল্যাণী, আমার পুজোর ফুল কই? কি যে কর বুঝি না। একে দেরি হয়ে যাচ্ছে! কল্যাণী আঁচলে রান্নার হাত মুছতে মুছতে দৌড়ে এল।—কি হয়েছে কি, চেঁচাচ্ছো কেন? ফুল নেই?

—থাকলে চেঁচাই, নেই বলেই তো চেঁচাচ্ছি।

—সে কি, পুতুল সেই সাতসকালেই ফুল তুলতে গেল! এখন বাজে কটা?

—কটা আর সাড়ে সাতটা হবে, রেডিওয় খবর হচ্ছে।

—সে কি গো, মেয়ে তো সেই ছয়টায় বাগানে গেল ফুল তুলতে। কোনো দিন তো এত দেরি করে না! দাঁড়াও দেখছি কি হলো!

—দেখতে দেখতেই বাজীমাৎ। বিনা ফুলেই পুজো করি।

প্রভাত খুঁত খুঁত করতে করতে পুজোর আসনে বসল। কল্যাণী তাড়াতাড়ি মেয়েকে খুঁজতে গেল। উনুনে ভাত ফুটছে। একটু পরেই প্রভাত খেতে বসবে। তার আবার সব সাত্ত্বিক ব্যাপার। নিরামিষ ভাতে ভাত খাওয়াই তার অভ্যাস। কোনো দিন একটু ঘি থাকে, কোনোদিন থাকে না। খাওয়ার ব্যাপারে প্রভাতের কোনো দৃকপাত নেই। কিন্তু পুজোর আয়োজনে সামান্য ত্রুটিও তার সহ্য হয় না।

আজ দশ বছর হলো কি তারও বেশী হবে পনের বছরও হতে পারে, কল্যাণীর ঠিক মনে পড়ছে না তাদের বিয়ে হয়েছে। সুখের সংসারই বলা চলে। কোনো ঝামেলা নেই, নির্ঝঞ্ঝাট। একটি মাত্র মেয়ে বারো তেরো বছর বয়স। ফুটফুটে সুন্দর। প্রভাতের বিয়ে করার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। জোর করে ধরে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় দু ভাই সন্ন্যাসী। পরিবারে অন্তত এক ভাইও যদি বিয়ে না করে বংশ রক্ষা হয় কি করে?

এঘর ওঘর পড়ার ঘর, সব ঘর খুঁজে দেখল কল্যাণী। না, সারা ঘরবাড়ির কোথাও পুতুল নেই। কি হলো মেয়েটার? সেই সাতসকালে বাড়ির পিছনের বাগানে ফুল তুলতে গিয়েছিল। রোজই সে যায়। ফুল তোলা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। ফুল তোলার মতো বয়স তার হয়েছে। সকাল থেকে কল্যাণীকে এত ব্যস্ত থাকতে হয়—চা, জলখাবার, খাবার! পুতুল তাই ইদানীং, মাকে ফুল তোলার কাজ থেকে ছুটি দিয়ে নিজেই সেকাজ করে। তার ভাল লাগে। ভোরের পাখি গাছে গাছে। ফুলে ফুলে চারিদিক সাদা হয়ে থাকে। গ্রীষ্মের সকাল, যেন এক অসাধারণ কিছু। ঠিক রোদ উঠার আগের মুহূর্তে, পৃথিবী আর আকাশের মাঝখানে

একটা হাল্কা কুয়াসার চাদর কাঁপতে থাকে। ফুল তোলার ফাঁকে ফাঁকে সে একটু আকাশ দেখে নেয়, কখনও নাম-না-জানা কোনো পাখির দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে।

বাড়িতে যখন কোথাও মেয়েকে পাওয়া গেল না, তখন কল্যাণী পিছনের দিকে দরজা খুলে বাগানে চলে গেল। একবার মনে হলো উনুনে ভাত ফুটছে, বোধহয় বেশি সিদ্ধ হয়ে গেল। প্রভাত আবার গলা ভাত খেতে পারে না। তারপর ভাবল একদিন না হয় খাবে, আগে দেখি মেয়েটা কোথায় গেল। কল্যাণী ভেবেছিল বাগানের কোথাও হয়তো দেখবে গাছের তলায় কি পুকুরঘাটে বসে আছে চুপ করে, কি ঘুমিয়েই পড়েছে হয়তো কিংবা কোনও বন্ধুর সঙ্গে গল্পে মত্ত।

খুব একটা বড় বাগান নয়, এ-কোণ ও-কোণ ঘুরে দেখতে বেশী সময় লাগল না। না কেউ কোথাও নেই। পুকুরঘাটেও কেউ নেই। টলটলে জলের উপর গাছের ছায়া দুলছে। পোষা মাছটা ঘাটের ধারে এসেছে খাবার আশায়। এসব দেখার সময় কল্যাণীর নেই। এইবার সে খুব ভেবে পড়ল। কোথায় গেল মেয়েটা? কখনো না বলে বাড়ির বাইরে যায় না। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রাখল—ফ্যান গালার কথা তার মনেই রইল না। হাত দুটো কোনো রকমে আঁচলে মুছেই ঠাকুরঘরে দৌড়ল। দরজার বাইরে থেকে দেখল প্রভাত আসনে স্থির হয়ে বসে আছে, দু'চোখের কোল বেয়ে জলের বিন্দু নেমেছে। খুব পরিচিত দৃশ্য। ওই দৃশ্য কল্যাণীর মনে কেমন একটা নির্ভরতার ভাব আনে। তার মনে হয় যার স্বামী এত ভক্ত, যে বাড়িতে এত পুজো আচ্চা, সে বাড়িতে কোনও অমঙ্গল আসতে পারে না। কল্যাণীর মন থেকে কিছুক্ষণের জন্যে পুতুলের চিন্তা চলে গেল।

প্রভাত আসন ছেড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে, কল্যাণী তাকে খবরটা জানাল। বাড়ির কোথাও পুতুলকে পাওয়া যাচ্ছে না। ধ্যানের পর প্রভাতকে কেমন প্রশান্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল! প্রভাতের মুখে কোনো বিকৃতি দেখা গেল না। শুধু জিজ্ঞেস করল'কটা বেজেছে। কল্যাণী বলল, ঘড়ি দেখিনি। প্রভাত অনুমানের উপর সময় ঠিক করে নিল। বলল, ঠিক আছে, আমি দেখছি, কোথায় আর যাবে, হয়তো আশেপাশে কোনো বাড়িতে গেছে।

—কিন্তু এমন তো কোনোদিন করে না।

—আহা ছেলেমানুষের খেয়াল। কি ভেবেছে, কোথায় কার বাড়িতে গিয়ে বসে আছে।

—বলে যাবে তো?

—ঠিক আছে, তুমি রান্নার কাজে যাও আমি দেখছি।

কল্যাণী রান্নাঘরে গেল। প্রভাত পুজোর চেলি ছেড়ে বাড়ির বাইরে বেরলো মেয়েকে খুঁজতে।

দূরে রেলের লাইন পাতা। সিগন্যাল পড়েছে। ডাউনের দিকে কোনো ট্রেন আসছে। প্রভাত বাড়ির বাইরে এসে একবার ভেবে নিল, এখন সে কি করবে! প্রথমে সে বিনোদবাবুর বাড়ি গিয়ে খোঁজ করল। সকালে প্রভাতকে দেখে সকলেই আশ্চর্য হলেন। বিনোদবাবুর মেয়ে ফুলা বলল—না পুতুল তো আসেনি। আজ কেন সে গত দু'দিন আসেনি। বিনোদবাবু প্রভাতকে বসতে বললেন।

—না এখন আর বসব না। বেরোতে হবে। তার আগে মেয়েটাকে খুঁজে দেখি!

—কোথায় আর যাবে? কাছাকাছি কোথাও আছে।

প্রভাত একে একে পাড়া প্রতিবেশী সকলের বাড়ি দেখল। না কোথাও পুতুল নেই এবং আসেওনি। সকাল থেকে তারা কেউ দেখেনি।

প্রভাতের মুখে বেশ ভাবনার রেখা পড়ল। মোক্ষদা পিসি বললেন—সে কি বাবা, দিনকাল বড় খারাপ। শুনছি, একটা করে ফুল শুঁকতে দিচ্ছে, তারপর ছেলে আর মেয়েগুলো সুড় সুড় করে ছেলেধরার পিছু পিছু গ্রামের বাইরে চলে যাচ্ছে।

প্রভাত এসব বিশ্বাস করে না। পিসি কেমন আছ? বলে পাশ কাটিয়ে চলে এল।

—কি হলো একবার খবরটা দিও প্রভাত? বড় চিন্তায় রইলুম।

প্রভাত 'আচ্ছা' বলে বাড়িমুখো হলো।

কল্যাণী মুখে একরাশ চিন্তা মেখে দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল, প্রভাতের খবরের আশায়। ভেবেছিল পুতুলের হাত ধরেই হয়তো এসে হাজির হবে আর কল্যাণী পুতুলকে খুব বকবে। এতক্ষণের উৎকণ্ঠা বকুনিতে ভেঙে পড়বে। স্বামীকে দেখে মাথায় ঘোমটা তুলে দিল।

—না পুতুল কোথাও নেই, কোনো বাড়িতেই সে যায়নি। সকাল থেকে তাকে কেউই দেখেনি।

—সে কি?

—এখন কি করা যাবে?

প্রভাতও জানে না, এরপর কি করার আছে। শুনেছে এরপর পুলিশে খবর দিতে হয়। খোঁজার পরিধি তখন আরো বেড়ে যায়। গ্রাম থেকে গ্রামে, জেলা থেকে জেলা শহরে, কলকাতায়। সারা বাংলা কিংবা সারা ভারতবর্ষে থানায় থানায় খোঁজপাত চলে। এসব তার শোনা আছে। নিজের জীবনে এইরকম একটা সমস্যা নেমে আসবে তার ধারণার অতীত।

—আজ আর অফিস যেও না।

—সে তো বটেই।

এরপর চুপচাপ দুজনে মুখোমুখি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কোনো কথা মুখে যোগাল না। সব কথা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে। প্রভাত হঠাৎ বলল—চলো তো আর একবার বাগানটা দেখি। কল্যাণী আর প্রভাত বাগানে এল। স্থলপদ্মের গাছে বড় বড় ফুল ফুটেছে! টগর গাছ সাদা হয়ে আছে ফুলে। ছোট ছোট গোটাকতক প্রজাপতি ছটফট করে উড়ে বেড়াচ্ছে। সব জায়গা তারা খুঁজল, আর একবার খুঁজল। যেন খুব ছোট একটা জিনিস হারিয়েছে। একবারের খোঁজায় হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে। হয়তো পুতুল দুষ্টুমি করে চোর চোর খেলছে, গাছের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। দু'জনে দুদিক থেকে খুঁজল। না পুতুল নেই।

প্রভাত এসে ঘাটের বাঁধানো রকে একটু বসল। জলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—এরপর কি করবে? সত্যি থানায় যেতে হবে? না হঠাৎ পুতুল এসে মা, মা করে ডাকবে। জলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রভাত একটা জিনিস লক্ষ্য করল,

পশ্চিম পাড়ে যেখানে জবাগাছের একটা ডাল জলের উপর ঝুঁকে এসেছে তার একটু দূরে এক রাশ ফুল জলের উপর ভাসছে। জবা গাছ থেকে একটা-দুটো ফুল জলে পড়া বিচিত্র নয় কিন্তু টগর এল কোথা থেকে? টগর গাছ তো জল থেকে অনেক দূরে। জলের উপর সাদা আর লাল একরাশ ফুলের অঞ্জলি কে ছড়িয়ে দিল?

স্বামীর পাশে এসে কল্যাণীও বসল।

প্রভাত শুধু বললে, দেখেছ। একটা জায়গাতেই কত লাল আর সাদা ফুল একসঙ্গে ভাসছে! কে যেন অঞ্জলি দিয়ে গেছে।

কল্যাণী অন্যমনস্ক জিজ্ঞেস করে বসল, কেন?

প্রভাত বললে, কেন? মনকে শক্ত কর কল্যাণী। এই কেন-র উত্তর বড় সাংঘাতিক। মাঝপুকুরে ওটা কি ভাসছে দেখেছ? একটা সাজি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুকুরে জাল নামান হলো। সামান্য অনুসন্ধানেই জালে জড়িয়ে উঠে এল পুতুলের দেহ। ফুল ছাপ ফ্রক পরা এক সুন্দরী কিশোরী। যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে, যে ঘুম আর ভাঙবে না কোনো দিন।

প্রভাত শুধু এই বলতে পারল, মা, এই কটা বছরের জন্যে মায়ার বাঁধনে কেন বাঁধতে এসেছিলিস! কার পুজো করছিলিস, বিরাটের? সে যে বড় নিষ্ঠুর!

তারপর, কত বছর গড়িয়ে গেল রেলগাড়িব মতো জন্ম, মৃত্যুর জোড়া লাইন ধরে। প্রভাতের ঠাকুরঘর এখন ওই দীঘির পাড়। রোজ সকালে সে নিজে ফুল তোলে, লাল আর সাদা। সাজি ভরে। প্রভাত আর কল্যাণীর বয়েস বেড়েছে। চুলে পাক ধরেছে, কপালে সময়ের রেখা পড়েছে। বয়েস বাড়েনি পুতুলের। সে এখনো সেই কিশোরী। প্রভাত যখন ফুল তোলে, গাছের আড়ালে আড়ালে সে ঘোরে। প্রভাত তার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, বাবা! এদিকে এসো, এদিকে। দেখ, এই ডালে কত ফুল! সাজি ভর্তি ফুল আর ঠাকুরঘরে যায় না। প্রভাত প্রণামের ভঙ্গিতে দীঘির পাড়ে বসে সেই সমস্ত ফুল অঞ্জলি দেয় জলে। ভাসতে থাকে লাল আর সাদা ফুল। এই তো তোমার পূজা! আছ অনল, অনিলে, চির নভো নীলে। ভূধর সলিল গহনে।

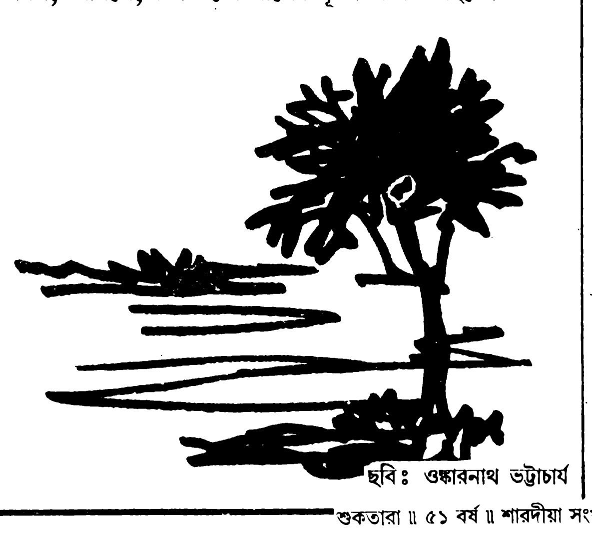

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

গেঁড়ি-গুগলি-শামুক খাই

মুস্তাফা নাশাদ

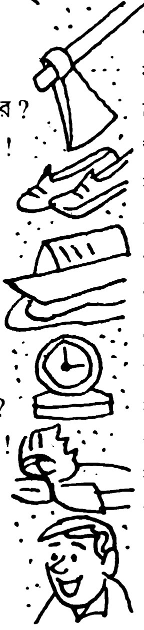

কোথায় যাস নাটুরে?
কী বললি কাঠুরে!
না শোনার ছুতো তোর?
তুই ব্যাটা জুতো চোর!
কোথায় যাস ভাইটি?
হারিয়েছে গাইটি!
কিনলি কী হাটেতে?
ডিঙি বাঁধা ঘাটেতে!
কটা বাজে ঘড়িতে?
ছাড়ে জ্বর বড়িতে!
হাতে তোর ওটা কি?
তোর চেয়ে মোটা কি!
ছেলেপুলে কয়টা?
বাড়ি ফিরি নয়টা।
চল যাই মেলাতে?
ঘুম ভাঙে বেলাতে!

খাবি কিছু ভাইরে?
কানা কড়িও নাই রে!
নোনতা না মিষ্টি?
আজ হবে বিষ্টি!
বল কেন খাবি না?
ধার কিছু পাবি না!
পাস না কি শুনতে?
খুব পারি গুণতে!
একেবারে কালা কী?
সবই তোর চালাকি!
কী খেলি ভাই কাল রে?
দিবি নে তুই গাল রে!
ছুটিছাটায় আয় না?
চিংড়ি কেনাও যায় না!
আজ তবে চলি ভাই?
গেঁড়ি-গুগলি-শামুক খাই!

হাতির খোঁজে

সরল দে

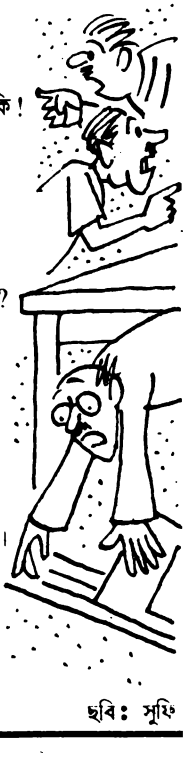

হাতি কোথায়? হাতড়ে খোঁজে হরিভজন,
সঙ্গে আছি ইয়ার-বন্ধু, আমরা ক'জন।
এই তো ছিল কোথায় গেল? ম্যাজিক নাকি!
হাতি নিয়ে ভাগল্‌বা কি উড়নচাকি?

হরিভজন চেঁচায় খালি—খোঁজো খোঁজো,
অন্যমনস্কতার ফল কি এবার বোঝো।
আমরা খুঁজি এদিক-ওদিক আঁতিপাঁতি,
কিন্তু হাতে ঠেকেছে না তো, কোথায় হাতি?

একটা হাতি গেল যে কোন চুলোয় ভেগে,
খুঁজতে চেয়ার উল্টে পড়ে কনুই লেগে।
হঠাৎ ঘরে ঢুকল বুড়ো হরেন গোঁসাই,
বলল, কেন গজ-কে হাতি বলেন মশাই?

কিন্তু বাপু কোথায় হাতি কোথায় বা গজ?
বলতে বলতে গোঁসাই তোলে খবর-কাগজ।
অমনি হরু চেঁচায়—আরে এই তো হাতি!
হাতি লুকোয় কাগজতলায়, কী বজ্জাতি!

হাতি না গজ যথাস্থানে ফেরে আবার,
হরিভজন চালতে থাকে ঘুঁটি দাবার।

ছবিঃ সুফি

ব্যায়ামবীরের ব্যবসা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর টুকানের মহা সমস্যা হলো। সময়ই কাটে না, সময়ই কাটে না। কেন যে এমন হয়? পরীক্ষার আগে দিনগুলোকে মনে হয় সুপারসনিক জেট। নিমেষে হাওয়া। আর পরীক্ষার পর? দিন নয়, যেন টিকু টিকু মালগাড়ি। চলেছে তো চলেছেই। সেই সকাল-বিকেল বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় একটু ক্রিকেট-ফুটবল, দুপুরে গল্পের বই, সপ্তাহে দু'দিন টেবিল টেনিস কোচিং, সন্ধ্যেবেলা অল্পস্বল্প টিভি, ব্যস। আর মাঝে মাঝে কোথাও বেড়াতে যাওয়া। তাও মা-বাবার সঙ্গে। ক্লাস সেভেনে উঠল টুকান, এখনও মা তাকে সেই ছোট্ট শিশুটি ভাবেন, একা একা কোথ্থাও ঘোরার অনুমতি নেই। কাঁহাতক ভাল লাগে!

তা এমন একটা সময়ে, টুকানের যখন কী করি কী করি ভাব, হঠাৎ এক সক্কালবেলা গলসী থেকে গদাইমামা এসে হাজির।

গদাইমামা টুকানের মা'র পিসতুতো ভাই। নামজাদা ব্যায়ামবীর। দু'দুবার মিস্টার গলসী হয়েছেন, পর পর তিন বার মিস্টার বর্ধমান। বলতে গেলে মিস্টার বর্ধমান হওয়ার পর থেকেই ক্রমশ আরও বেড়ে উঠেছেন তিনি। ইয়া তাগড়াই চেহারা। বুকে পিঠে হাতে পায়ে নানান সাইজের ঢেউখেলানো গুলি। বিশাল মাথাটি প্রায় ন্যাড়া। ফুলো ফুলো দু'গাল জোড়া ময়ূরপেখম গোঁফ। সম্প্রতি গদাই গড়গড়ি গলসীতে একটি ব্যায়ামের আখড়াও খুলেছেন। আরও অনেক হাট্টাকাট্টা জোয়ান তৈরি হচ্ছে সেখানে।

গদাইমামাকে দেখে টুকানের মা তো খুশিতে গদগদ,—কত দিন পর তোকে দেখলাম রে গদাই!

গদাইমামা মাথা দোলালেন,—হুম, তিন বছর সাত মাস আঠেরো দিন। সেই শেষ ছোড়দির বিয়েতে দেখা হয়েছিল।

—গলসী থেকে গড়িয়া কী এমন দূর রে? মাঝে মাঝে তো আসতেই পারিস।

—গলসী বলেই হয় না রাঙাদি। গয়া-গুমো হলে হয়তো হতো। জানই তো, স্টেশন কাছে হলেই মানুষ ট্রেন ধরতে পারে

না।

—তোর চেহারাটা কিন্তু আগের চেয়ে ভেঙে গেছে গদাই। মা বললেন।

ভাইবোনের কথা শুনে টুকানের বাবা ফিকফিক হাসছেন,—সাধে বলে স্নেহ অন্ধ! আরে বাবা, পাহাড় থেকে এক খাবলা মাটি খসে পড়লেও পাহাড় পাহাড়ই থাকে।

বাঁ হাতের কব্জি মুঠো করে ঘোরালেন গদাইমামা,—বলুন তো জামাইবাবু, রাঙাদিকে সেই কথাটাই বুঝিয়ে বলুন। আমি কি আর আপনাদের মতো ক্যাংলা-হ্যাংলা? নব্বই কেজি থেকে অষ্টআশি হলেই ওমনি লিকলিক? বলেই টুকানের দিকে তাকিয়েছেন,—কী টুকানবাবু, তোমার কী সমাচার? পরীক্ষা-টরীক্ষা সব খতম?

টুকান মৃদু হাসল,—হ্যাঁ, কবেই। রেজাল্ট বেরনোর সময় হয়ে এল।

—বেরোয়নি তো? তাহলে চলবে।

টুকান কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না। কী চলবে?

—মাথায় ঢুকল না তো? গদাইমামা জমিয়ে সোফায় বসলেন,—তোকে আমার খুব জরুরি দরকার। একটু হেল্প করতে হবে। পারবি?

টুকানের কৌতূহল বাড়ল,—কী দরকার মামা?

—ক্রমশ প্রকাশ্য। শুধু শুনে রাখ্, আমি এখানে একটা কাজ করতে এসেছি।

বাবা ভুরু কুঁচকোলেন,—মতলব কী বলো তো? গড়িয়াতেও কি আখড়া খুলতে চাও নাকি?

—না জামাইবাবু। কলকাতায় একটা ভাল বিজনেস শুরু করব ভাবছি।

—আবার বিজনেস? টুকানের বাবা-মা দুজনেই প্রায় এক সঙ্গে আঁতকে উঠলেন।

ওঠার অবশ্য কারণও আছে। গদাই গড়গড়ি বছর কয়েক আগে একবার ব্যবসা করার জন্য খুব খেপে উঠেছিলেন। কিসের ব্যবসা? না, মরা হাতি কিনে বাজারে বেচবেন। কে যেন মামাকে বুদ্ধি দিয়েছে, মরা হাতি লাখ টাকা! ফুলদাদু বোঝাচ্ছেন, ফুলদিদা কাঁদছেন, গদাইমামা কোনও দিকে তাকালেন না, সোজা চলে গেলেন জলপাইগুড়ি। জলদাপাড়ার জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মৃত হাতি খুঁজতে। লাখ টাকা রোজগার না করে গলসীতে ফিরবেন না। শেষে কুচবিহারের কুট্টিমামা নাকি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মামাকে বাড়ি ফেরাতে পেরেছিলেন। বাবা-মার মুখে বহুবার এ গল্প শুনেছে টুকান।

টুকান জিজ্ঞাসা করল,—এবার তোমার বিজনেসটা কী মামা?

গদাইমামা কি যেন বলতে গিয়েও সামলে নিলেন,—নাহ্, তোর বাবা-মা'র সামনে বলা যাবে না।

বাবা বললেন,—কেন, শুনিই না।

—না জামাইবাবু, আপনারা হলেন গিয়ে অফিসবাবু। ব্যবসার কী বোঝেন?

—তা বটে। তা বটে। বাবা চোখ টিপলেন,—তবে আগের বারের মতো...

—পুরনো কথা ভুলে যান জামাইবাবু। কবে কী একটা ছেলেমানুষি করে ফেলেছিলাম...। গদাইমামা গম্ভীর,—এবার আমি অত্যন্ত সিরিয়াস।...একটাই শুধু আর্জি আছে।

—কী?

—আপনার এখানে আমায় কটা দিন থাকতে দিতে হবে। মানে, বিজনেসের জন্য আপনার বাড়িটা একটু ব্যবহার করতে চাই।

টুকানের মা বলে উঠলেন,—তা কর্ না। যত দিন খুশি থাক। কে তোকে বারণ করেছে?

—থ্যাংক ইউ রাঙাদি। গদাইমামা আহ্লাদিত,—তাহলে টুকানবাবু, তুমি আমার সঙ্গে আছ তো?

টুকান পুট করে ঘাড় নেড়ে দিল,—যদ্দিন না স্কুল খুলছে, তদ্দিন তো আছিই।

—ওতেই হবে। বিজনেস স্টার্ট হয়ে গেলে তোকে আর লাগবে না।

পরদিন খুব ভোরে, তখনও বোধহয় প্রথম কাকটাও ডাকেনি, গদাইমামা এসে ঠেললেন টুকানকে,—কিরে, এত ঘুম নিয়ে তুই আমার সঙ্গে ব্যবসা করবি? তোকে কাল বললাম না, আজ থেকেই শুরু?

টুকান ধড়মড় উঠে বসল।

—চল্ চল্। আমার সঙ্গে ছাদে যাবি চল্।

টুকান চোখ কচলাতে কচলাতে তাকাল,—ছাদে? কেন মামা?

—আশ্চর্য! আগে ব্যায়াম করতে হবে না?

—ব্যায়াম?

—অবশ্যই। ব্যায়াম না করলে শরীর ছাড়বে কেন? শরীর না ছাড়ালে সারা দিন কাজ করবি কী করে?

গদাইমামার হাঁকাহাঁকিতে টুকানের মা জেগে গেছেন। ঘুম-জড়ানো গলায় বললেন,—কী হলো রে? রাতদুপুরে এত হট্টগোল কিসের?

গদাইমামা ভয়ানক ক্ষুণ্ণ হলেন,—এখন রাতদুপুর হলো রাঙাদি? সূয্যিবুড়ো কখন আড়মোড়া ভেঙে ফেলেছে...। এই জন্যই না তোমাদের শরীরস্বাস্থ্য এত পল্কা। কোথায় এখন উঠে নিজেকে চনমনে করে নেবে...

—থাম্ বাপু। শরীর একটু পরে এমনিই চনমনে হবে। উঠেই গোটা সংসার মাথায় তুলতে হবে...

—মাথায় তুলবে? তাহলে তো তোমার বেশি তাকত দরকার।

—ওফ, যা তো। ঘুমোতে দে। মা পাশ ফিরে শুলেন।

টুকান সুড়সুড় করে গদাইমামার পিছন পিছন ছাদে উঠে এল। বাহ্, ভোরবেলাটাকে তো ভারি সুন্দর লাগে! ধীরে ধীরে আলো ফুটছে, নরম নরম বাতাস বইছে, হঠাৎ হঠাৎ চিক চিক পাখির ডাক...রোজ এ সময়ে উঠলে তো বেশ হয়!

গদাইমামার অবশ্য প্রকৃতি-টকৃতির দিকে নজর নেই। পুট পুট শার্টের বোতাম খুলে ফেললেন। খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরে শুরু হয়ে গেছে কসরৎ। হাত ছুঁড়ছেন, পা ছুঁড়ছেন, কোমর ভাঙছেন, হাঁটু মুড়ছেন। পটাপট গোটা কয়েক ডিগবাজি খেয়ে নিলেন। দ্যাখ না দ্যাখ, মাথা নিচে পা ওপরে করে ছাদময়

গুট গুট ঘুরতে শুরু করেছেন। তড়াং করে খাড়া হয়ে বললেন,—ওহোহো রে টুকান, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। তাড়াহুড়োতে আমার মুগুর জোড়াই আনা হয়নি। এহেহে, নেশার বস্তু বলে কথা!

টুকান হেসে ফেলল,—নেশার জিনিস সঙ্গে না এনে ভালই করেছ। সারা দিন তাহলে নেশাতেই বুঁদ থাকতে। বিজনেসে মন বসত না।

গদাইমামা যেন একটু চটেই গেলেন,—শোন্। কথাটা সারা জীবন মনে রাখবি। ব্যবসা আর ব্যায়াম দুটোই ব'এ য-ফলা দিয়ে শুরু। ভাল ব্যায়ামবীর না হলে কক্ষণো ভাল ব্যবসাদার হওয়া যায় না।

সঙ্গে সঙ্গে টুকানের চোখের সামনে পাড়ার বলাইবাবুর মুখ। বলাই বল, তাদের পাড়ার সব থেকে বড় বাড়িটায় থাকেন। হাইট, চার ফুট দশ। ছাতি, চব্বিশ ইঞ্চি। বড়বাজারে বলাইবাবুর বাসনের ব্যবসা আছে, চালতাবাগানে লোহার কারবার, গড়িয়াতে তেলকল, আরও আরও কি সব যেন। বলাই বল একাই ঘুরে ঘুরে সব কটার তদারকি করেন।

কথাটা কি বলবে গদাইমামাকে? নাহ্, চুপ থাকাই ভাল। বিজনেসের নাম করে তাও যা হোক মামার সঙ্গে কটা দিন ঘুরেফিরে কাটানো যাবে। মিছিমিছি রাগিয়ে দিয়ে সুযোগটা কি হাতছাড়া করা উচিত!

গদাইমামা আবার বাইসেপ নাচাচ্ছেন। ট্রাইসেপ কাঁপাচ্ছেন। নিশ্বাস চেপে তলপেট পুরো খাদে নামিয়ে দিলেন। বুকের পেশি উথালপাথাল ঢেউ তুলছে। টুকান যে আঙুলের ডগাটুকু পর্যন্ত নাড়াচ্ছে না, সেদিকেও বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই।

ভাগ্যিস নেই!

পা টিপে টিপে ছাদ থেকে নেমে এল টুকান।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আরম্ভ হলো গদাইমামার ব্যবসা পরিক্রমা। টুকানকে বললেন,—চল্, তোদের শহরটাকে একটু সার্ভে করে আসি।

টুকানের মা দিবানিদ্রার আয়োজন করছিলেন। বললেন,—এই চৈত্র মাসের রোদ্দুরে ছেলেটাকে নিয়ে কোথায় এখন টো টো করবি গদাই?

গদাইমামা মুখ বেঁকিয়ে বললেন,—সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি! তোমার একমাত্র ছেলেটাকে তো একেবারে আলুভাতে করে রেখেছ রাঙাদি। ডিগডিগে চেহারা। শরীর খেলাতে শেখেনি! পা নাড়াতে শেখেনি!...আহা, রোদে বেরোলে যদি গলে যায়!

টুকানের আঁতে লেগে গেল। বলল,—কিচ্ছু হবে না গদাইমামা। চলো তো আমরা বেরিয়ে পড়ি।

মা গজগজ করতে করতে রাজী হয়ে গেলেন।

রাস্তায় বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই সামনে একটা ছোট গর্ত। ঠিক সামনে নয়, রাস্তার ধারে। গদাইমামা দাঁড়িয়ে পড়লেন,—এটা কে খুঁড়েছে রে?

টুকান ভাল করে দেখে নিয়ে বলল,—হবে কেউ। মাটি-টাটি তুলেছে বোধহয়।

—তুই শিওর?

—কে জানে! অন্য কোনও উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

—কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে বল্ তো?

সামান্য এক গর্ত নিয়ে গদাইমামা কেন এত চিন্তিত হয়ে পড়লেন টুকান বুঝতে পারল না। মামা কি কোনও রহস্যের গন্ধ খুঁজছেন? আলগা ভাবে বলল,—হয়তো এখন খুঁড়ে রেখে গেছে, পরে এসে গুপ্তধন-টন লুকোবে।

—উঁহু। গদাইমামা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে পড়লেন,—মনে হচ্ছে আগেই কেউ আমার বিজনেস প্ল্যানটার কথা টের পেয়ে গেছে রে।

টুকান অবাক হয়ে গেল,—গর্ত খোঁড়ার সঙ্গে তোমার প্ল্যানের কী সম্পর্ক মামা?

—আছে আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেটা বলা যাবে না। কে কোথায় শুনে ফেলে...। গদাইমামা বিচলিত মুখে টুকানকে টানলেন,—চল্ দেখি আরেকটু এগিয়ে।

কিন্তু এগোনোটা হবে কি করে! দু'পা হাঁটেন গদাইমামা, তো তিনবার দাঁড়ান। সন্দিহান চোখে শুধু গর্ত খোঁজেন এদিক-ওদিক। টুকানদের বাড়ি থেকে বাসস্ট্যান্ড মাত্র সাত মিনিটের পথ, তাই আসতে ছত্রিশ মিনিট লেগে গেল।

মোড়ের মাথায় এসে গদাইমামা হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন,—ওকি রে টুকান, ও লোকগুলো ওখানে কী করছে?

দুপুররোদে রাস্তায় পথচারী খুব বেশি নেই। তবু ব্যায়ামবীর গদাইমামাকে অমন ডুকরে উঠতে দেখে বেশ অস্বস্তি বোধ করল টুকান। গলা নামিয়ে বলল,—ওরা টেলিফোনের লোক। কাজ করছে।

—তো অমন গর্ত খুঁড়েছে কেন?

—বারে, আন্ডারগ্রাউন্ড কেব্‌লে কাজ হয় না?

—তাই বল্। আমি ভাবলাম...

—তোমার বিজনেস প্ল্যান?

কটমট করে টুকানকে একবার দেখে নিয়ে আচমকাই হাঁটার গতি বাড়ালেন গদাইমামা। কলকাতার রাস্তায় গর্ত অঢেল। খোঁড়াখুঁড়িরও শেষ নেই। কোথাও সি এম ডি এ-র কাজ চলছে। কোথাও করপোরেশনের। কোথাও বা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই-এর। একজন মেরামত করে, তো আরেকজন কোপায়। হাঁটতে হাঁটতে গদাইমামা থমকে দাঁড়াচ্ছেন বার বার। টুকানকে জেরায় জেরায় জেরবার করছেন। ওটা খোঁড়া কেন? ওখানে কী হবে?

এক সময়ে বলেই ফেললেন,—আচ্ছা টুকান, তোর কি মনে হয় আমার স্কিমটা আগেই গভর্নমেন্টের মাথায় এসে গেছে?

চড়া রোদে ঘণ্টা খানেক ঘুরপাক খেয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করছিল টুকানের। কাতর মুখে বলল,—খুলেই বলো না মামা। হেঁয়ালি করছ কেন?

গদাইমামা যেন শুনতেই পেলেন না। বিড়বিড় করছেন,—এত খনন কাজ চলছে মানে গভর্নমেন্টই আগে কাজটা শুরু করে দিল রে।

টুকান এবার রীতিমতো বিরক্ত হয়ে গেল,—কী তখন থেকে আবোল-তাবোল বকে চলেছ বলো তো? কত রকম কাজেই

তো সরকারী গর্ত খোঁড়া হয়। এই তো দমদম থেকে টালিগঞ্জ, কত বড় একটা সুড়ঙ্গ বানানো হয়েছে। কেন হয়েছে? পাতাল রেলের জন্য।

গদাইমামার তবু সংশয় যায় না,—সুড়ঙ্গটা কি টালিগঞ্জ অব্দিই শুধু কাটা হয়েছে?

—আপাতত তাই। পরে গড়িয়া অব্দি মেট্রো রেল চালানোর কথা চলছে।

গদাইমামা পুরো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন,—কাজ কি স্টার্ট হয়ে গেছে?

—এখনও হয়নি। হতে পারে।

শুনে গদাইমামা আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। টুকানের হাত ধরে হুড়মুড় ছুটেছেন বাড়ির দিকে,—আর দেরি করা যাবে না রে টুকান। আজই আমার বিজনেস স্টার্ট করে দিতে হবে।

টুকান ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল,—খুলে না বললে তোমার সঙ্গে আর এক পাও যাব না। বিজনেস-ফিজনেসেও আমি আর নেই।

সঙ্গে সঙ্গে গদাইমামার মুখটা ভীষণ করুণ হয়ে গেল। কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন,—তুই কিন্তু আমাকে সাহায্য করবি বলে কথা দিয়েছিলি টুকান।

—দিয়েছিলাম। কিন্তু গোপনীয়তারও একটা লিমিট থাকে।

এবার সত্যি সত্যি গদাইমামা কেঁদে ফেলেন আর কি,—দ্যাখ টুকান, তুই আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। সহকারী। পার্টনার তো নোস্। আগেই কী করে তোকে বিজনেস সিক্রেট জানিয়ে দিই বল্? শুধু জেনে রাখ, গদাই গড়গড়ি আজ থেকেই কাজে নামছে। এক্সপোর্ট বিজনেস। সাকসেসফুল হলে কদিনেই ফুলে ফেঁপে উঠবে।

আরও ফুলবে গদাইমামা! কী কাণ্ড!

—শোন্, এক্ষুণি রাঙাদি-জামাইবাবুকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই। রাতে আজ ঘুমোবি না। রাত একটা দশ গতে শুভযোগ শুরু। ঠিক ওই সময়ে আমরা কাজে হাত লাগাব। তোদের দরজায় গিয়ে তিন বার টক টক করলেই তুই পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসবি, বুঝলি?

রহস্য ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে। টুকাই মনে মনে ছটফট করছিল। তবে গদাইমামার মুখের দিকে তাকিয়ে সংযতও করে নিল নিজেকে। রাত অবধি অপেক্ষা করে দেখাই যাক না ব্যাপারখানা কী!

রাতে টুকান শুতে যাওয়ার আগে গদাইমামা কানে কানে আবার বললেন,—মনে আছে তো? রাত ঠিক একটা দশ! দরজায় তিন বার টক টক!

টুকান টুকুস করে ঘাড় নাড়ল।

নাড়লে কি হয়, সারা দুপুর প্রচুর হাঁটাহাঁটি হয়েছে, বিছানায় শুতেই টুকান ঘুমিয়ে কাদা। চোখ খুলল পরদিন সকালে। মার ডাকে। হায় হায়, গদাইমামা তাহলে ডেকে ডেকে ফিরে গেছেন? ঘুম ভাঙেনি তার? ইশ, গদাইমামা নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছেন!

টুকান মাকে জিজ্ঞাসা করল,—মামা কোথায়?

টুকানের মা ফিক করে হাসলেন,—ওই পাগলের কথা আর বলিস্ না। রাত্রে কী যে একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধাতে যাচ্ছিল! তোর বাবা জেগে না উঠলে...

তড়াং করে খাট থেকে নেমে টুকান সোজা গদাইমামার ঘরে,—কাল কি তোমার ব্যবসা শুরু হলো না মামা?

গদাইমামা উত্তর দিলেন না। পাথরের মতো বসে আছেন চেয়ারে।

—ও মামা, বলো না কাল কী হলো?

সামান্য নড়লেন গদাইমামা। গোমড়া মুখে বললেন,—তোর জন্যই তো সব ভেস্তে গেল।

—আমার জন্যে?

—নয়তো কি! কুম্ভকর্ণ কোথাকার।

—সরি গদাইমামা।

—থাক্। দরজায় টক টক শুনে জামাইবাবুর মতো ঘুমকাতুরে লোক জেগে গেল, আর তুই...!

ছি ছি। লজ্জায় টুকানের মাথা কেটে যাওয়ার যোগাড়। ঢোক গিলে বলল,—মা বলছিল তুমি নাকি কাল রাতে...

—খুব হয়েছে। কাটা ঘায়ে আর নুন ছেটাতে হবে না। গদাইমামা ভেংচে উঠলেন,—ওহোহোহো, আমার ব্যবসার গোড়াতেই জল ঢেলে দিলে গো! এত সুন্দর একটা লাভজনক ব্যবসা...নাহ্, তোদের বাড়িতে থেকে ও ব্যবসা করা সম্ভব নয়।

টুকান অধোবদন,—আর একটা চান্স দাও মামা। আজ রাতে ঠিক জেগে থাকব।

—তা আর হওয়ার নয়। গদাইমামা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললেন,—পথের কাঁটা মাথা ফুঁড়ে দাঁড়িয়েছে। তোদের বাড়ি ছেড়ে আমায় অন্য জায়গায় ফ্যাক্টরি খুলতে হবে।

—কেন মামা? কী সেই কাঁটা?

গদাইমামার ফোলা গাল আরও ফুলে গেল,—কাঁটা হলো স্বয়ং তোর বাবা। এমন দুর্দান্ত একটা প্ল্যান শুনে বলে, এ নাকি পাগলের কারবার।

—বাবা বলেছে?

—তাছাড়া আবার কে!

—আহা, বাবার ওপর রাগ করো কেন? বাবা তো সব সময়েই তোমার সঙ্গে মজা করে। তুমি বাবার শালাবাবু না?

—কক্ষণো না। এনিমি এনিমি। গদাইমামা খ্যাক খ্যাক করে উঠলেন,—মাঝরাত থেকে মেজাজটা এমন বিগড়ে গেল...সকালে আজ ব্যায়ামটা পর্যন্ত করা হলো না।

—সত্যি, এ বাবার ভারি অন্যায়। টুকান মাথা নাড়ল,—বাবাকে আমি বুঝিয়ে বলব'খন। প্ল্যান যদি ভাল হয়, বাবা কেন আপত্তি করবে?

—বল্ বল্। গদাইমামা যেন নতুন করে উৎসাহ পেলেন,—এরকম আইডিয়া কোটিতে তো একজনের মাথায়ই আসে?

—আইডিয়াটা কী খুলে বলো তো দেখি?

—শুনবি? শোন্। গদাইমামা সোজা হয়ে বসলেন,—ইচ্ছে ছিল তোদের বাড়ি থেকে সোজা আদিগঙ্গা অব্দি একটা খাল কাটব। সেই খাল সোজা গঙ্গায় গিয়ে পড়লেই কেল্লা ফতে। বিজনেস শুরু।

—কি ভাবে?

—বুঝলি না বুদ্ধু? গদাইমামা গোঁফ চুমরোলেন,—খাল কাটলে কী হয়? কুমীর আসে না? কথায় বলে খাল কেটে কুমীর আনা। খাল কেটে কুমীর আনতাম রে বোকা। কুমীরগুলো খাল বেয়ে তোদের দোরগোড়ায় এলেই খপ করে ধরে বিদেশে চালান করতাম। দু'দিনে রাজা হয়ে যেতাম রে।

এই তবে গদাইমামার এক্সপোর্ট বিজনেস্! টুকান কোনওক্রমে হাসি চাপল। গদাই গড়গড়ির মাথাতেই এমন পরিকল্পনা আসে বটে!

গদাইমামা বলেই চলেছেন,—কাল বেরিয়ে দেখি তোদের কলকাতায় শুধু খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। ভাবলাম, এ প্ল্যান তো যে কারুর মাথাতেই এসে যেতে পারে। যখন তখন। গভর্নমেন্টের মাথায় আসাও কিছু বিচিত্র নয়। তাই কাল রাত থেকেই...। নাহ্, তোর বাবার মতো অব্যবসায়ী মানুষ জীবনে আর একটাও দেখিনি। বলে কিনা, অনেক কষ্টে বাড়িখানা তুলেছি। খবরদার তুমি কোথাও খোঁড়াখুঁড়ি করবে না।

টুকানের হাসিও পাচ্ছে, মায়াও লাগছে। মামা বেচারা কত আশা নিয়েই না এসেছিলেন! গলায় সান্ত্বনা এনে বলল,—তোমাদের গলসী থেকেই খালটা কাটা যায় না মামা?

—যাবে না কেন? যায়। তবে তোদের কলকাতা সুন্দরবনের কাছাকাছি। খাল বেয়ে এখানে যত তাড়াতাড়ি কুমীর আসবে, গলসীতে কি অত জল্‌দি যাবে? গেলেও মাঝপথে হাইজ্যাক হয়ে যাওয়ার ভয় আছে না?

হক কথা! টুকান হাসি গিলে নিয়ে বলল,—প্ল্যানটা মাথা থেকে ছেড়ো না মামা। যত্ন করে রেখে দাও। আমি বড় হই, তখন তুমি আর আমি পার্টনারশিপে ব্যবসাটা করব। দরকার হলে দশ-বিশটা লোক লাগাব। একদিন না একদিন বাড়িতে আমরা খাল কেটে কুমীর আনবই।

এতক্ষণে গদাইমামার মুখ হাসিতে ভরে গেল,—সাবাশ, এই না হলে উপযুক্ত ভাগ্নে! চল্ তবে, আজ থেকেই ব্যায়াম করে শরীর তৈরি করবি চল্। খাল কাটতে হলে গায়ে জোর তো লাগবে।

বলেই গদাই গড়গড়ি সটান হাঁটা দিয়েছেন ছাদের দিকে। বাইসেপ-ট্রাইসেপ নাচাতে নাচাতে।

টুকানের হাসি নিবে গেল। আজ আর তার রেহাই নেই।

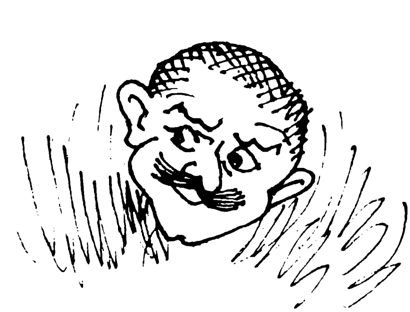

ছবিঃ দিলীপ দাস

ভূত ধরার আইন

রবিদাস সাহারায়

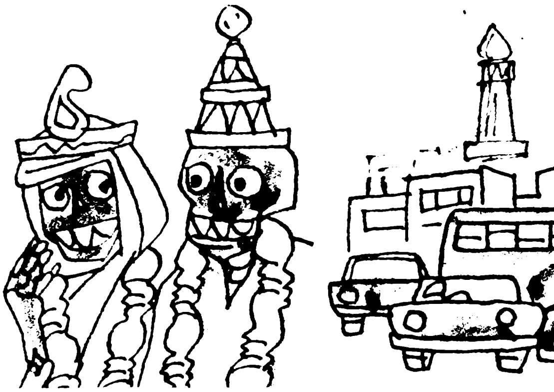

মামদো ভূতের সাথে হবে ভূতকুমারীর বিয়ে
হইহল্লা চলছে বেজায় ভোজের ব্যাপার নিয়ে।
ফর্দ শেষ করার আগেই রাত্রি হলো শেষ,
হরেক রকম ভোজ তালিকা তৈরি হলো বেশ।
উইচিংড়ের মালাইকারি, কোলাব্যাঙের ফ্রাই,
আরশোলা আর টিকটিকির বাহারী মোগলাই।
পচা ইঁদুর, কুকুরছানার চপ কাটলেট হবে,
ভূতের বিয়ের আজব খাওয়া হবেই জমাট তবে।
তেরোটা বন উজাড় করে বারো ভূতের দল
কলকাতায় গিয়ে লাগায় বিকট কোলাহল।
চারটি পথের মোড়ে তখন টেম্পো লরি ঠাসা;
বারো ভূতের বিয়ের ভোজের জায়গা ওটাই খাসা।
আট লরি বিয়ের তত্ত্ব পৌঁছে গেল যেই,
ওলট-পালট কাণ্ড শুরু হলো মুহূর্তেই।
পচা গন্ধে পথের মানুষ পড়ে কি বিপাকে,
দৌড়ে পালায়, কেউ বা ঠেসে রুমাল চাপে নাকে।
চেঁচামেচি, ছুটোছুটি, বেজায় হুলস্থূল,
ট্রাফিক চলার আইন-কানুন নিমেষে ভণ্ডুল।
লালবাজারের পুলিশ এল নোটিস পেয়ে কড়া,
ব্যাপার দেখে সব পুলিশের চক্ষু ছানাবড়া!
বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, দূষণ পরিবেশ,
মাত্রাছাড়া অপরাধের নাই তো মোটে শেষ।
হেঁকে বলেন পুলিশ সুপার বজ্রবাহন চাকি—
ভূতের দলের কাণ্ড এসব, আমার চোখে ফাঁকি!
খবর পাঠাও আমেরিকা কিংবা প্যালেস্টাইন,
কাদের সংবিধানে আছে ভূত ধরবার আইন।
সেই আইনের বলেই ধরে বেয়াড়া সব ভূত,
লক-আপে পুরে তাদের বানাবো কিম্ভূত!

ছবি : সুফি

নাট্যে কথামৃত

জ্যোতিভূষণ চাকী

[শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের গল্প তো সবাই জান। কথা নয়, অমৃত; গল্প নয়, হীরের টুকরো। এই চিরনূতন গল্পগুলোতে অল্প পরিসরে নাট্যরূপ দেওয়া হলো। তোমরা স্কুলের অনুষ্ঠানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিন-চারটে গল্পের ছোট ছোট নাটকগুলো খুব সহজেই অভিনয় করতে পার। একটু সাজসজ্জা হলে তো ভালই হয়। তার জন্য খুব ঘটা করবার দরকার নেই। তোমরা নিজেরাই বুদ্ধি করে সামান্য উপকরণে নিজেদের সাজ নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবে। বাড়িতেও ভাইবোনেরা মিলে এই অভিনয় করতে পার। কখনও বাবা-মাও তাতে যোগ দিতে পারেন। সে ভারি মজা হবে।]

চোদ্দভুবন

[দুর্গা বসে আছেন ঘর আলো করে। গণেশের প্রবেশ]

গণেশ—ডাকছিলে মা?

দুর্গা—হ্যাঁ গণেশ, ডাকছিলাম। কার্তিক কই?

[কার্তিকের প্রবেশ]

গণেশ—এই তো কার্তিক।

কার্তিক—ডাকছিলে কেন মা?

দুর্গা (হেসে)—তোরা আমার দুই নয়নের মণি। বেশিক্ষণ না দেখে থাকতে পারি না। তাই ডেকেছিলাম।

গণেশ—(মায়ের গলার হারের দিকে অবাক চোখে চেয়ে) বাঃ, তোমার গলার হারটা কী সুন্দর, মা।

কার্তিক—সত্যি তো। যেন সাত রাজার ধন মানিক দিয়ে গড়া।

গণেশ—আমার মনে হচ্ছে, সত্যিই তুমি জগজ্জননী।

দুর্গা—থাক, আমার জগজ্জননী হয়ে কাজ নেই, আমি তোদের মা, এই আমার যথেষ্ট।

কার্তিক-গণেশ—আমাদের কী ভাগ্য, তুমি আমাদের মা।

কার্তিক—বাবা কোথায় মা?

দুর্গা—কী জানি? আমাকে এই হারটা পরিয়ে দিয়ে বললেন, এই আসছি। তোদের বাবার 'এই আসছি' মানে তো জানিসই। কোথায় কে একটা বেলপাতা নিবেদন করে তাঁকে স্মরণ করেছে, অমনি ছুটেছেন তার কাছে। এমন অল্পে সন্তুষ্ট মানুষ আর নেই। এই করেই তো চোদ্দভুবন ঘুরে বেড়ান।

কার্তিক-গণেশ—সত্যি তাই।

দুর্গা—নিজে তো সন্ন্যিসি, তাঁর যত আনন্দ আমাকে সাজিয়ে।

কার্তিক-গণেশ—কিন্তু হারটা দারুণ।

দুর্গা—আমার আর হার দিয়ে কী হবে বল, তোরাই তো আমার গলার হার। এই হারটা বরং তোরা নে, কিন্তু একটা হার দুজনকে তো দিতে পারি নে।

গণেশ—তুমি যদি দিতে চাও কার্তিককেই দাও।

কার্তিক—না, না, দাদাকেই দাও বরং।

দুর্গা—এক কাজ করি বরং।

কার্তিক-গণেশ—কী, মা?

দুর্গা—একটা শর্ত দিই। সেই শর্ত যে পূরণ করতে পারবে তাকেই দেব সাত রাজার ধন মানিকের চেয়ে অনেক বেশি দামী এই হারটা।

কার্তিক-গণেশ—কিন্তু শর্তটা কী, মা?

দুর্গা—তোরা দুজনে বেরিয়ে পড়। যে আগে চোদ্দভুবন ঘুরে আসতে পারবে তাকেই দেব হারটা।

কার্তিক—ঠিক আছে। তুমি একটু আগে বাবার সম্বন্ধে বললে না 'এমনি করে চোদ্দভুবন ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি'। তুমি বাবার মতো আমাদেরও চোদ্দভুবন ঘুরিয়ে আনতে চাও, এই তো?

[দুর্গা মৃদু মৃদু হাসলেন]

কার্তিক—আমি তো আমার ময়ূরের পিঠে চড়ে এক্ষুণি হাওয়া। কিন্তু দাদার কী হবে? আমার ইঁদুর-বাহন দাদার তো সে ক্ষমতা নেই। ইঁদুরে চড়লেই তো ইঁদুর চ্যাপ্টা!

[সকলের হাসি]

গণেশ—আমার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না, ভাই। তুই তোরটা ভাব। আমি আমারটা ভাবব।

কার্তিক—এই আমি রওনা হলাম।

[কার্তিকের প্রস্থান]

দুর্গা—তোর তো কোনো তাড়াহুড়ো দেখছি না, গণেশ। আমি জানি তোর বাহনটি যেমন তেমন নয়, সে ইচ্ছে-শরীর, যত খুশি বাড়তে পারে, সে ইচ্ছেমন্ত, তার পাখাও গজাতে পারে। পারে সে ময়ূরের সঙ্গে পাল্লা দিতে।

গণেশ—আমার ওসব কোনো কিছুরই দরকার হবে না, মা। যার খুশি সে ঘুরে মরুক, আমার শুধু এক চক্কোর।

দুর্গা—তোর কথা ঠিক বুঝলাম না, গণেশ।

গণেশ—এই দেখো তবে।

[একথা বলে সে মাকে প্রদক্ষিণ করল]

গণেশ—কী, চোদ্দভুবন তো আমি ঘুরে এলাম, আমার মা যে আমার চোদ্দভুবন।

দুর্গা—(গণেশকে বুকে জড়িয়ে ধরে)—তোরই জিত, এই নে আমার গলার হার।

[এই বলে নিজের হাতে গণেশের গলায় হারটা পরিয়ে দিলেন। গণেশ হার পরে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। ইতিমধ্যে কার্তিক এসে গেছে। কার্তিকের প্রবেশ]

কার্তিক—(প্রবেশ করে)—এ কী? দাদা, তুই আগেই পৌঁছে গেছিস তাহলে? কিন্তু কী করে তুই—?

[গণেশ মার চারদিকে ঘুরে দেখাল]

গণেশ—এমনি করে। মা-ই তো আমার চোদ্দভুবন।

কার্তিক—আমি স্বীকার করছি দাদা, আমি হেরে গেছি।

গণেশ—হারজিতের কী আছে ভাই! এই হারটা তুই-ই নে।

কার্তিক—হার আমি নেব না, ওটা তোরই প্রাপ্য। আমি শুধু চোদ্দভুবনটা আর একবার ঘুরে আসি।

[এই বলে কার্তিক মাকে প্রদক্ষিণ করল। দুর্গা দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন]

[বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক—মাতৃদেবো ভব। জননীই ত্রিভুবন। ত্রিভুবন ঘুরতে হবে না, জননীকে প্রদক্ষিণ করো। যে ঠিক জায়গায় ডেরা বাঁধে ঝড়-জলে তার কিছুই করতে পারে না। তাকে যাযাবর হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় না। ঈশ্বর যার মনে বাসা বেঁধেছে, তাকে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে হয় না। চোদ্দভুবন সে হাতের মুঠোয় পায়।

[যবনিকা]

[গণেশের মুখোশ কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে মুখোশে কথা বলা মুশকিল হয়। কথা-বলা গণেশের মুখোশ অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নেওয়া যায়। সবচেয়ে ভালো হয়, নিজেরাই সে মুখোশ তৈরি করে নাও। মুখোশই বা কেন, একটা রূপকধর্মী সাজ হলেই তো হয়। যে মুখোশই বানাও শুঁড়টা উঁচিয়ে থাকবে, তাহলে কথা চাপা পড়ে যাবে না। অথবা তোমরাই বুদ্ধি করে অন্য কিছু ভাবো, তোমাদের বুদ্ধি তো কম না। গণেশ যেমন বুদ্ধি করে এক চক্কোরে পুরস্কার পেল। তোমরাও তেমনি মুখোশ না বানিয়েই বাজিমাত করে দাও।]

ছবিঃ সৌমিত্র চক্রবর্তী

শায়ে শায্যং! সুফি

পকেট তো খালি, ক্রিকেট খেলা দেখবো কি করে!
প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ
একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে।
এই রণপা চড়ে দেওয়ালের ওপর উঁকি মেরে খেলা দেখবো।
দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।
গে··ছি··রে
বিনে পয়সায় আর খেলা দেখবি!
ধুম
ছুঁচো, পাজী কোথাকার!
তবেরে···
দমাস
চোখে সরষে ফুল দেখছি!
···এর বদলা নিতে হবে।
পরে··
কইরে কোথায় লুকোলি
এখানে আমি···
এবার তোর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো
উফ্‌স
দুম
কেমন জব্দ!

শচীন সবসময়ই ম্যাচ উইনার

রাজু মুখার্জী

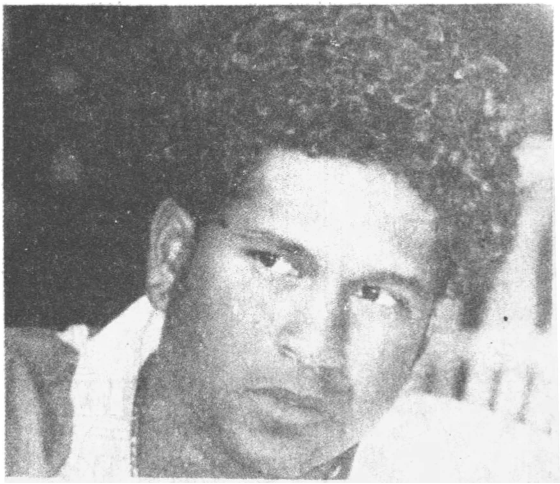

বিশ্বকাপ ফুটবল শেষ হতে না হতেই শুরু হতে চলেছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট। আগামী বছর ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে সপ্তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট। ১৯৭৫, ১৯৭৯ আর ১৯৮৩-তে পর পর তিনবার এই প্রতিযোগিতার ভার নেয় ইংল্যান্ড। তার পরবর্তী পর্ব অর্থাৎ ১৯৮৭-র বিশ্বকাপের যৌথ উদ্যোগে এগিয়ে আসে ভারত ও পাকিস্তান। ১৯৯২-র দায়িত্ব নেয় অস্ট্রেলিয়া। তবে শেষ বিশ্বকাপের আয়োজন ভাগ করে অনুষ্ঠিত হয় ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কায়।

এবারের বিশ্বকাপে টেস্ট-খেলিয়ে প্রধান দলগুলো ছাড়া অংশগ্রহণ করবে স্কটল্যান্ড, বাঙলাদেশ ও কেনিয়া। অর্থাৎ মোট বারোটা দেশ। প্রথম গ্রুপে রয়েছে গতবারের বিজয়ী শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, জিমবাবুয়ে ও কেনিয়া। দ্বিতীয় গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইনডিজের সঙ্গে থাকবে নবাগত বাঙলাদেশ ও স্কটল্যান্ড।

আজ পর্যন্ত এতগুলো দল কখনও বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেনি। এক অর্থে বলা যেতে পারে ক্রিকেট যতো ছড়িয়ে পড়ছে, ততো বেশি দেশ এখন অংশগ্রহণ করার সুযোগ আদায় করতে পারছে।

প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৪ মে। প্রথমে দুই সপ্তাহ ধরে চলবে গ্রুপ লীগ, তারপর হবে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল জুন মাসে। ওই সময় ইংল্যান্ডে বৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকে প্রবল। তাই আশা করা যেতে পারে যে বেশ কিছু ম্যাচ বৃষ্টির জন্য বিঘ্নিত হবে। আমার মনে হয় জুলাই-অগাস্ট মাসে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে হয়তো আরও ভাল হতো।

কোন দল কেমন খেলবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু এখনও তেমনভাবে হয়নি ঠিকই, তবে আমরাই যদি শুরু করি তাতে আপত্তিই বা কী?

ইংল্যান্ডের মরসুমের শুরুতে অর্থাৎ মে মাসে যে ধরনের স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া থাকে তাতে স্পিন বোলারদের বল গ্রিপ করতে খুবই অসুবিধে হয়। এই কারণে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে স্পিন বোলাররা খুব একটা সুবিধে করতে পারবেন না। আবার ওই স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া ও হিমেল বাতাসের জন্য সুইং বোলাররা পরিবেশ থেকে খুবই সুবিধে আদায় করতে পারবে।

আমার ব্যক্তিগত মত হলো, যে সব দেশের মিডিয়াম পেস ও ফাস্ট বোলার ভাল তারাই হবে এই বিশ্বকাপের সফল দল। এই কারণে আমি দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াকে ফেবারিট বলে গণ্য করব। অ্যালান ডোনাল্ড এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার, সে সম্পর্কে বোধহয় কারও দ্বিমত নেই। যেমন পেস, তেমন সুইং ও কাট করানোর দক্ষতা। যে কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি ভয়ংকর। তার ওপর যদি পরিবেশ সহায়ক হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। ডোনাল্ডকে সাহায্য করার জন্য আছেন পোলক, ক্লুজনার, ক্যালিস ও নিটিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং শক্তিও সারা বিশ্বের সমীহ আদায় করেছে। দৃঢ়তা ও গভীরতা দুই-ই আছে ওদের ব্যাটিংয়ে। ফিলডিংয়ের মানেও তারাই এখন জগৎশ্রেষ্ঠ। আক্ষরিক অর্থে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাই আমি মনে করি বিশ্বের এক নম্বর দল। দক্ষিণ আফ্রিকার আরও সুবিধে হলো কোচ বব উলমারের গঠনমূলক কাজকর্ম ও হানসি ক্রোনিয়ের ইতিবাচক নেতৃত্ব। সব দিক থেকে যাচাই করলে আগামী বিশ্বকাপ যদি দক্ষিণ আফ্রিকা না পায়, সেটাই হবে এক বিস্ময়কর কাণ্ড।

তবে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। ওদের আছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো শক্তি। ব্যাটিং-বোলিং-ফিলডিং সবেতেই টেক্কা দেবার মতো ক্ষমতা অস্ট্রেলিয়ার আছে। এমন কী স্ট্র্যাটেজি, ট্যাকটিকস্ ও দল পরিচালনাতেও কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে কোনো অংশে কম নয়। আমার মনে হয় এই দুই-এর মধ্যেই হয়তো আমরা বিজয়ী দলকে পাবো।

এবার ভারতের দিকে আসা যাক। ভারতীয় বোলিংয়ের মান কিন্তু আশানুরূপ নয়। ভারতীয় স্পিনাররা সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হয় না। পেসারদের মধ্যে শ্রীনাথ ও নবাগত আগারকারই ভারতের প্রধান ভরসা। তবে ম্যাচের পর ম্যাচ ধারাবাহিকতা রাখতে পারবে বলে মনে হয় না। ভারতের ফিলডিং সম্পর্কে যতো কম বলা যায় ততোই বোধহয় ভাল। বিশ্ব স্তরে ভারতের থেকে নিম্নমানের ফিলডিং বোধহয় আর কোনো দল করে না। তার ওপর দল নির্বাচন, দল পরিচালনার সমস্যা তো রয়েই গেছে।

অবশ্য মানতে দ্বিধা নেই ভারতীয় ব্যাটিং শক্তি যে কোনো দলকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। প্রধান কারণ অবশ্যই শচীন তেণ্ডুলকার। শচীন আজ বিশ্বের ১নং ব্যাটসম্যান সন্দেহ নেই।

যে কোনো পরিবেশে, যে কোনো পরিস্থিতিতে তিনি হলেন ম্যাচ উইনার। শচীনের সাহায্যে অবশ্য রয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি, আজাহার ও অজয় জাদেজা। ম্যাচ উইনিং ইনিংস খেলতে এঁরাও সক্ষম। তবে শুধু ব্যাট করেই তো আর ম্যাচের পর ম্যাচ জিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়া যায় না। তবে শচীন সব সময়ই ম্যাচ উইনার। তাঁর পাশে সৌরভ। দুজনে সফল হলে সে ম্যাচ যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে ভারতের জেতার সম্ভাবনা শতকরা আশি ভাগ হয়ে যায়। আমাদের সান্ত্বনা শুধু ঐটুকুই। কিন্তু ওর ওপর নির্ভর করে কী বিশ্ববিজয়ী হওয়া যায়! আমরা কিন্তু সেই স্বপ্নই দেখছি।

আমার মতে ভারতের চ্যাম্পিয়ান হবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কাগজে-কলমে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াই ফেবারিট।

সৌরভের ফুটবল খেলা

প্রসূন ব্যানার্জী

অন্য জগতের বিখ্যাত মানুষ ফুটবল খেলতে নামলেই সকলে অবাক হন। গত বছর থেকে রূপালী পর্দার নায়ক মিঠুন চক্রবর্তী ফুটবল খেলছেন। অবশ্য তাঁর ফুটবল খেলাকে একধরনের সমাজসেবা বলা যায়। মিঠুনের আগে কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলে গেছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার কপিলদেব। তিনি খেলেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জার্সি গায়ে দিয়ে। তারপরে এলেন মিঠুন চক্রবর্তী। আমরা ভেবেছিলাম, রঙিন পর্দার এই দুর্দান্ত মানুষটি ফুটবলের মাঠে একরকম দাঁড়িয়েই থাকবেন। না, তিনি সত্যিই আমাদের সবার ভ্রান্ত ধারণাকে মুছে দিয়ে গত ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৯৮-এর মে মাস পর্যন্ত সারা বাংলায় ১২টি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে হৈ- হৈ ফেলে দিয়েছেন ; এবং সবশেষে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে গত ৭ মে ক্রীড়ামন্ত্রী একাদশ দলের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত একটি গোল করে জানিয়ে দিয়েছেন—আমি ফুটবল খেললে নিশ্চয়ই অনেক তারকার ঘুম কেড়ে নিতাম।

সম্প্রতি আর একজন দেখিয়ে দিয়েছে, ফুটবল খেললে সেও কারো চেয়ে কম যেত না।

বলো তো সে কে?

তোমরা ঠিকই ধরেছো—আমাদের ঘরের ছেলে সৌরভ গাঙ্গুলি।

আমরা বেঙ্গল ফুটবল একাডেমির উদ্বোধনী খেলার দিন স্থির করি ৭ মে। ঠিক হয় এই শুভদিনে ভারতের বিখ্যাত দুই ফুটবল দল ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানকে খেলানো হবে। কিন্তু আই. এফ. এ-র অনুমতি না-পাওয়ার জন্যে আমরা একটা দল, ক্রীড়ামন্ত্রী একাদশ আরেকটা বাংলা ফুটবল একাডেমি দলের ভেতরে খেলার ব্যবস্থা করলাম। একদিকে মিঠুন চক্রবর্তী আরেকদিকে বাইচুং না বিজয়ন কে অধিনায়ক হবে এই নিয়ে যখন আমরা চিন্তিত, এমন সময় আমাদের একাডেমির সভাপতি মিঠুন চক্রবর্তী নিজের শুটিং প্যাকাপ করে ৩ মে কলকাতায় এসে হাজির। এসেই বললেন, আমাদের লক্ষ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভালো প্রদর্শনী ম্যাচের ব্যবস্থা করে আট থেকে দশ লক্ষ টাকা ঐ খেলার মাধ্যমে তুলতে হবে।

মিঠুন চক্রবর্তী কলকাতায় নামবার আগে আমরা খুবই চিন্তিত ছিলাম কারণ টিকিট বিক্রি প্রায় হচ্ছেই না। কিন্তু মুশকিল আসান করলেন মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে টিকিট কেটে খেলা দেখতে আসার জন্যে আবেদন জানালেন। মিঠুনের কথায় আশাতীত সাড়া মিলল।

আমাদের খুব ইচ্ছা ছিল ঐ ম্যাচে সৌরভকে একবার মাঠে নামাবার। তাতেই আমাদের আরো টিকিট বিক্রির পথ পরিষ্কার হবে। মিঠুন নিজেই ৪ মে সকালে সৌরভের বাড়িতে পিয়ারলেস হোটেলের ৬০৯ নং থেকে আমাদের সামনে ফোন করলেন। সৌরভকে অনুষ্ঠানে আসবার আমন্ত্রণ জানাবার সঙ্গে সঙ্গে সৌরভ রাজী। কিন্তু তার বক্তব্য, আমি শুধু অতিথি হিসেবে যেতে রাজী নই মিঠুনদা, তোমার সঙ্গে পুরো সময় খেলবো।

সৌরভকে আমরা আমাদের তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্যে সমরেশ চৌধুরীর মতন বিখ্যাত খেলোয়াড়কে পাঠালাম। আমাদের তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হলো।

দেখতে দেখতে এসে গেল খেলার দিন। ৭ মে ঠিক সময়ে সৌরভ মাঠে হাজির। দর্শকরা দুই তারকাকে দেখবার জন্যে উৎসুক। খেলার আগে কিছু অনুষ্ঠান। তারই মধ্যে আমি মিঠুন এবং সৌরভকে জানালাম তৈরি হয়ে নিতে। ওরা দু'জনে তৈরি হয়ে একসঙ্গে

মাঠে নামল। যুবভারতীতে প্রায় ৮০,০০০ দর্শক বাইচুং-বিজয়ন বা সত্যজিতকে অনেকবার দেখেছেন কিন্তু এবার তাঁরা তাঁদের ক্রিকেটের সোনার ছেলে সৌরভকে ফুটবল মাঠে দেখতে চান।

মাঠের একদিকে বাইচুং আর সৌরভ, অন্যদিকে বিজয়ন আর মিঠুন চক্রবর্তী। আমি সৌরভকে গিয়ে বললাম, তুমি মিনিট দশেক খেলে বিশ্রাম নাও। এই কথা শুনে সৌরভ খুব সিরিয়াস হয়ে আমাকে জানাল, না প্রসূনদা, যদি মাঠে নামি তাহলে পুরো সময় খেলব। নাহলে আমায় বসিয়ে দাও।

এদিকে খেলা শুরুর বাঁশি বেজে উঠল। সৌরভের পায়ে বল পড়লেই চিৎকার আর ওদিকে মিঠুনের পায়ে বল এলেই দর্শকদের উল্লাস। মনে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের লড়াই। খেলাটা দুর্দান্ত জমে উঠল। প্রথম গোল হলো যখন সৌরভ ডান প্রান্ত দিয়ে রতন সিং-এর পাশ দিয়ে বলটা বাইচুংকে দিল। বাইচুং বেঙ্গল ফুটবল একাডেমির গোলরক্ষক অতনু ভট্টাচার্যকে সহজেই পরাস্ত করল। একসময় সত্যজিতের সঙ্গে সৌরভের একটা জোর ধাক্কা লাগল। আমি চিন্তিত হয়ে মাঠের সাইড লাইনে চলে গেলাম। দেখলাম সৌরভ আবার উঠে দাঁড়িয়ে সারা মাঠ ছুটে বেড়াচ্ছে। খেলা অতিরিক্ত সময়েও (২-২) হয়ে যাওয়ায় টাই ভাঙার খেলা হবে। পাঁচ-পাঁচ করে পেনাল্টি কিক করবে দুটি দল। আমি মিঠুনকে শট নিতে বারণ করলাম। সৌরভকেও না করাতে সে বলল, না প্রসূনদা, আমি পেনাল্টি শট নেবো। সেই শট নেওয়ার সময়টা চলে এলো। সামনে ইস্টবেঙ্গল দলের গোলরক্ষক অর্পণ দে। সৌরভ শট করতে যাচ্ছে সারা স্টেডিয়াম জুড়ে গোল গোল আওয়াজ উঠল। সৌরভ শট নিল কিন্তু গোলপোস্টের বাইরে দিয়ে বল চলে গেল। খেলার শেষে বললাম, সৌরভ, অজস্র ধন্যবাদ। ও মুখ গোমড়া করে বলল, প্রসূনদা, পেনাল্টিটাই মিস করলাম। আমরা হেরে গেলাম। হারতে আমার একদম ভালো লাগে না।

ফুটবল ঃ ব্রাজিলের মতো ভারতেও জনপ্রিয়

গৌতম সরকার

গত একমাস ধরে তোমরা নিশ্চয়ই ঘুমোতে ভুলে গিয়েছিলে। ঘুমনোর কথাও নয়। মাঝরাতে বিশ্বকাপের খেলা চললে ঘুমের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। চরম উত্তেজনার মধ্যে এই শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপ ফুটবল শেষ হলো গত ১২ জুলাই। সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের চমক না দেখা গেলেও এবার আমরা পেয়েছি নতুন চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে, আর পেয়েছি ক্রোয়েশিয়াকে। যারা প্রথম আবির্ভাবেই একলাফে গিয়ে বসেছে

তৃতীয় আসনে।

বত্রিশটি দলের মধ্যে প্রথমবারেই তৃতীয় হওয়া কিন্তু প্রায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সমান। মনে রাখতে হবে ক্রোয়েশিয়া যে সব দেশকে হারিয়েছে তার মধ্যে আছে শক্তিশালী জার্মানি আর হল্যান্ড। যে ফ্রান্স গত দুটো বিশ্বকাপে মূল পর্যায়ে উঠতেই পারেনি তারা ফাইনালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের গোলে বল ঢুকিয়েছে তিন তিনবার। অর্থাৎ ফুটবল মানচিত্রে বড় জায়গা দখল করতে শুরু করেছে নতুন নতুন দল। ফুটবলে ঐতিহ্যশালী দেশগুলি এবার কেমন যেন খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। কম শক্তিশালী দলগুলির মধ্যে এবার যারা নজর কেড়েছে তার মধ্যে আছে চিলি, ডেনমার্ক এবং মেক্সিকো।

বিশ্বমানে ভারতীয় ফুটবল অতি দুর্বল হলেও এদেশে ফুটবলের জনপ্রিয়তা প্রায় ব্রাজিলের সমান। ফুটবল মানেই এখানে চরম উত্তেজনা। মাঠের বাইরে যেমন আমরা ফুটবল নিয়ে হইচই করি, রাত জাগি, পটকা ফাটাই; মাঠের মধ্যে কিন্তু ঠিক তেমনভাবে প্রাণপাত করি না। এইখানেই ফ্রান্স, ব্রাজিলের সঙ্গে আমাদের প্রধান পার্থক্য। আমার ফুটবল জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ফুটবল নৈপুণ্যে আমরা খুব একটা পিছিয়ে নেই। আমাদের ঘাটতি শক্তিতে, ঘাটতি চর্চায় এবং প্রশিক্ষণে। ফুটবল সম্রাট পেলেও একই মত পোষণ করেন ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে। একটু চেষ্টা করলে হয়তো আমরাও পারি আরও উপরে উঠতে। তোমাদের কাছে আমার তাই অনুরোধ, শুধু দর্শক হয়ে সময় কাটিও না। যে উৎসাহ নিয়ে খেলা দেখছ সেই উৎসাহ নিয়ে মাঠে নেমে পড়। ভারতকে এশীয় মানে তোলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নাও। আমরা প্রাক্তনরা সব সময়ে তোমাদের সঙ্গে কাঁধ মেলাতে প্রস্তুত। ভবিষ্যতে আমরা ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার জন্য নয়, ভারতের জন্যও যেন রাত জাগতে পারি। ক্রিকেটের মতো ফুটবলেও ভারত বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হোক।

রোনাল্ডোকে টেক্কা দিয়েছেন জিদান

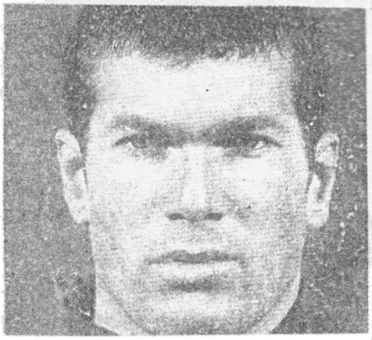

তপন দাম

ফ্রান্সে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত ব্রাজিলের রোনাল্ডোকে ঘিরে বিশ্বজুড়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত ছিল না। বিশ্বের বড় বড় ফুটবল খেলোয়াড় থেকে শুরু করে ফুটবল বিশেষজ্ঞ ও ক্রীড়া সাংবাদিকরা ধরেই নিয়েছিলেন, এবারের বিশ্বকাপটি হবে 'রোনাল্ডোর বিশ্বকাপ'। সব থেকে বেশি গোল করে তিনিই পাবেন 'সোনার বুট'।

ফুটবল উৎসাহীরা রোনাল্ডোকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন। এবারের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার মারাদোনা না থাকার জন্যই সকলের চোখ ছিল রোনাল্ডোর ওপর। সকলেরই ধারণা ছিল যে মারাদোনার শূন্য স্থানটি এবারে রোনাল্ডোই নেবেন। আর্জেন্টিনার মারাদোনার মতো ব্রাজিলের রোনাল্ডো একাই বিশ্বকাপের মুকুট ব্রাজিলের মাথায় তুলে দেবেন। তাই রোনাল্ডোর খেলা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীরা।

বিশ্বকাপ শুরু হতে সবাই কিন্তু নিজেদের চোখ কচলাতে শুরু করলেন। এ কোন রোনাল্ডোকে দেখছেন তাঁরা! ব্রাজিলের রোনাল্ডোর খেলা দেখে তাঁরা কিছুতেই অঙ্ক মেলাতে পারছিলেন না। তবুও ফুটবলপ্রেমীদের ধারণা ছিল যে এইসব খেলায় রোনাল্ডো তেমন কিছু করতে না পারলেও পরের খেলাগুলিতে নিশ্চয়ই কিছু করে দেখাবেন। দেখতে দেখতে ফাইনাল খেলা এসে গেল। কিন্তু রোনাল্ডোর কি হলো? ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তো দাঁড়াতেই পারলেন না। পুরো নব্বই মিনিট খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলেন। গোটা বিশ্ব রোনাল্ডো সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লেন।

রোনাল্ডো সকলকে হতাশ করলেও ফ্রান্সের মাঝ মাঠের খেলোয়াড় ২৬ বছরের জিনেদিন জিদান কিন্তু ৯৮'র বিশ্বকাপের 'নায়ক' হয়ে রইলেন। তাঁর কাঁধে চেপেই ফ্রান্স প্রথম বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হলো। জিদান একাই ফাইনালে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর দেশ ফ্রান্সকে। তারপর কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে দু'দুবার দুর্দান্ত হেড করে ব্রাজিলকে হারানোর পথ পরিষ্কার করে দিলেন জিদান। আর ব্রাজিলের পরাজয়ের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিলেন পেতি। তিন গোলে হারল রোনাল্ডোর ব্রাজিল। খেলার শেষে জিদান আর চোখের জল চেপে রাখতে পারেননি। এতদিনের স্বপ্ন সফল হলো। প্রথম থেকেই চ্যালেঞ্জ ছিল দেশকে ফাইনালে তুলবেন এবং দেখাবেন কী করে খেলতে হয়। ব্রাজিলের চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পেরে তিনি খুশি। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করার পরই ফ্রান্সের ফুটবলপ্রেমীরা দাবি করেছেন জিদানকে দেশের সর্বোচ্চ পদে বসানো হোক। তাঁদের দাবি 'প্রেসিডেন্ট' করা হোক জিদানকে। তাহলে যথার্থ সম্মান দেওয়া হবে জিনেদিন জিদানকে। সেদিন ফাইনালে জিদানের খেলা দেখতে দেখতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট শিরাকও কেঁদে ফেলেছিলেন। ফাইনালে ব্রাজিলের মতো দেশকে যে ফ্রান্স ৩-০ গোলে হারাবে তা কেউ ভাবতেই পারেননি। তা সম্ভব হলো জিদানের দক্ষতাতেই।

তাই এবারের বিশ্বকাপে রোনাল্ডো নয়, জিদান নামের তারকাটি একাই বেরিয়ে এলেন। ফুটবল সম্রাট পেলেও জিদানের খেলা দেখার পর জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁকে। পেলে সেদিন জিদানকে 'পারফেক্ট নাম্বার টেন' বলতে দ্বিধা করেননি। শুধু তাই নয়, পেলে জিদানকে 'ম্যাস্ট্রো' বলে সম্মান জানিয়েছেন। এটাই জিদানের কাছে বড় সার্টিফিকেট।

একজন ফুটবলার কীভাবে একটি দলের সাফল্যে প্রকৃত একজন কাণ্ডারীর ভূমিকা নিতে পারেন জিদানই তার মস্ত প্রমাণ। মনে আছে কি? সেই ৮৬'র বিশ্বকাপে একটি সাধারণ মানের আর্জেন্টিনা দলকে মারাদোনা যেভাবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেছিলেন, এবারের বিশ্বকাপে জিদানের ভূমিকা ছিল অনেকটা সেইরকমই। একটি দলকে মাঠের মধ্যে যথার্থই 'মিডফিল্ড জেনারেলের' মতো পরিচালনা করে জিদান যেভাবে ফ্রান্সকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন তা ফুটবলের ইতিহাসে বড় বড় হরফে লেখা থাকবে।

জিদানের ছোটবেলা কেটেছে কিন্তু দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে। বাবা-মা ছিলেন আলজেরিয়। অভাবের তাড়নায় ফ্রান্সের মার্সেই শহরের যেখানে থাকতেন সেখানে শহরের দুষ্কৃতীদের বাস ছিল। জিদান ফুটবল না খেললে হয়তো অন্যদের মতো গুণ্ডা-বদমায়েশ বা খুনে হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু ফুটবলই জিদানের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ছোটবেলা থেকেই জিদান কম কথা বলতেন। চুপচাপ একা একা থাকতে ভালবাসতেন। তবে পৃথিবীর যেখানেই থাকুন জিদান, তাঁর মন কাঁদে মার্সেইয়ের জন্য। মার্সেইয়ের লোকেদের জন্য কিছু করতে পারলে তিনি খুশি হন সব থেকে বেশি। তাই ওখানকার মানুষ তাঁদের প্রিয় জিদানকে কাছে পেলে কিছুতেই ছাড়তে চান না।

জিদান এখন খেলেন ইতালির জুভেন্টাস ক্লাবে। এর আগে ক্যানে ও বোর্দো ক্লাবেও খেলেছেন। ১৯৯৪ সালে জিদানের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে অভিষেক হয়েছিল। গত মরশুমে ইওরোপিয়ান সুপার কাপে জুভেন্টাসের হয়ে খেলে তাদের চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন।

চটজলদি ব্যায়াম

তুষার শীল

পুজোর সময় শরীরটা ভালো রাখা একান্তই দরকার। কিন্তু তখন সময় কোথায় তোমাদের ব্যায়াম করার! সারাটা দিন তো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে টো টো করে ঠাকুর দেখে বেড়াও। তোমাদের সুবিধার জন্য স্বল্প সময় নেবে এমন কয়েকটি চটজলদি ব্যায়াম আজ শিখিয়ে দিচ্ছি।

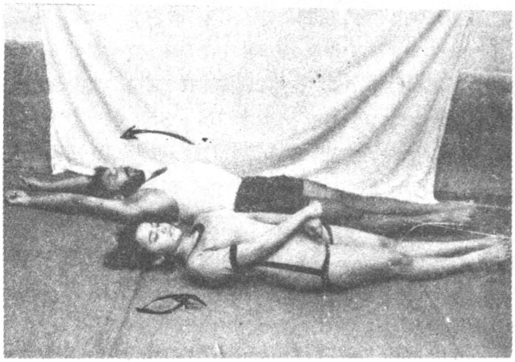

সিম্পল লাইং পুলওভার

১। সিম্পল লাইং পুলওভার : চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ো। হাত দুটির অবস্থান থাকবে ছবির মেয়েটির অবস্থায়। এখন শ্বাস নিতে নিতে দু'হাত তুলে নিয়ে যাও পিছনের পুরুষটির অবস্থায়। পরমুহূর্তেই শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দু'হাত ফেরৎ নিয়ে এস আবার মেয়েটির অবস্থানে। দশ, পনের বা কুড়ি বার করে নাও। এই ব্যায়াম ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, শ্বাসকার্যের সাহায্যকারী পেশীসমূহের ভাল ব্যায়াম।

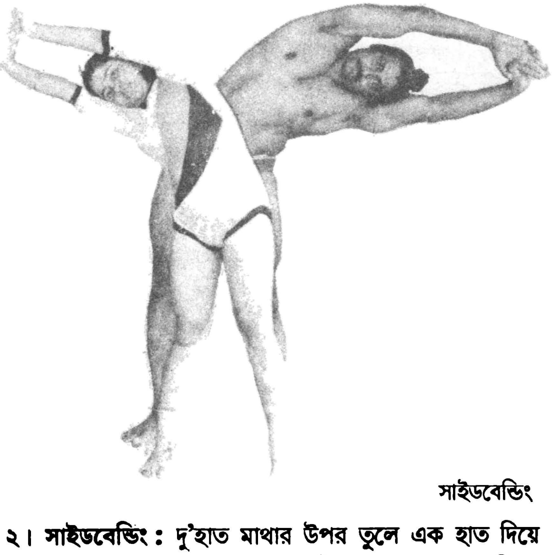

সাইডবেন্ডিং

২। সাইডবেন্ডিং : দু'হাত মাথার উপর তুলে এক হাত দিয়ে অপর হাতের তালু ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এখন শ্বাস নিতে নিতে কোমর থেকে শরীরের উপরাংশ যতটা পার পাশের দিকে হেলিয়ে দাও চিত্রের যে কোনো একজনের মতো। পরমুহূর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়াও শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে। একদিক হয়ে গেলে অপর দিকেও কর। দু'দিকে মিলে একবার হলো। প্রতি ক্ষেপে আট-দশ বা তোমার সাধ্যমতো বার কর। এই ব্যায়ামে কোমরের মেদ কমবে, দূর হবে ক্ষুধামান্দ্য, অম্বল, অজীর্ণ। লম্বা হতেও সাহায্য করবে।

৩। লাইং অলটারনেট লেগরাইজ : সামনের মেয়েটির ন্যায় শুয়ে পড়ো। এখন শ্বাস নিতে নিতে একটি পা তুলে দাও পিছনের পুরুষটির মতো। পরমুহূর্তেই নামিয়ে দাও শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে। একইভাবে কর অপর পা এবং দু'পা একসঙ্গে। ডান পা, বাঁ পা এবং দু'পা মিলে একবার হলো। এইভাবে আট-

লাইং অলটারনেট লেগরাইজ

দশ বার অভ্যাস কর প্রতি ক্ষেপে। সময় থাকলে দু'তিন ক্ষেপ অভ্যাস কর। এতে পেটের মেদ কমবে, বাড়বে ক্ষুধা আর লম্বা হতেও সাহায্য করবে।

এই আসনগুলি করতে আশা করি বেশি সময় লাগবে না। তবে ভরা পেটে অবশ্যই করবে না। হাল্কা জলখাবার খেয়ে তার কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পর করতে পার। বা প্রধান খাবারের তিন-সাড়ে তিন ঘণ্টা পর করা চলবে। পড়তে বসার আগে এই ব্যায়াম বা আসনগুলি করে নিলে লেখাপড়ায় মন বসবে, দূর হবে মনের চঞ্চলতা।

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

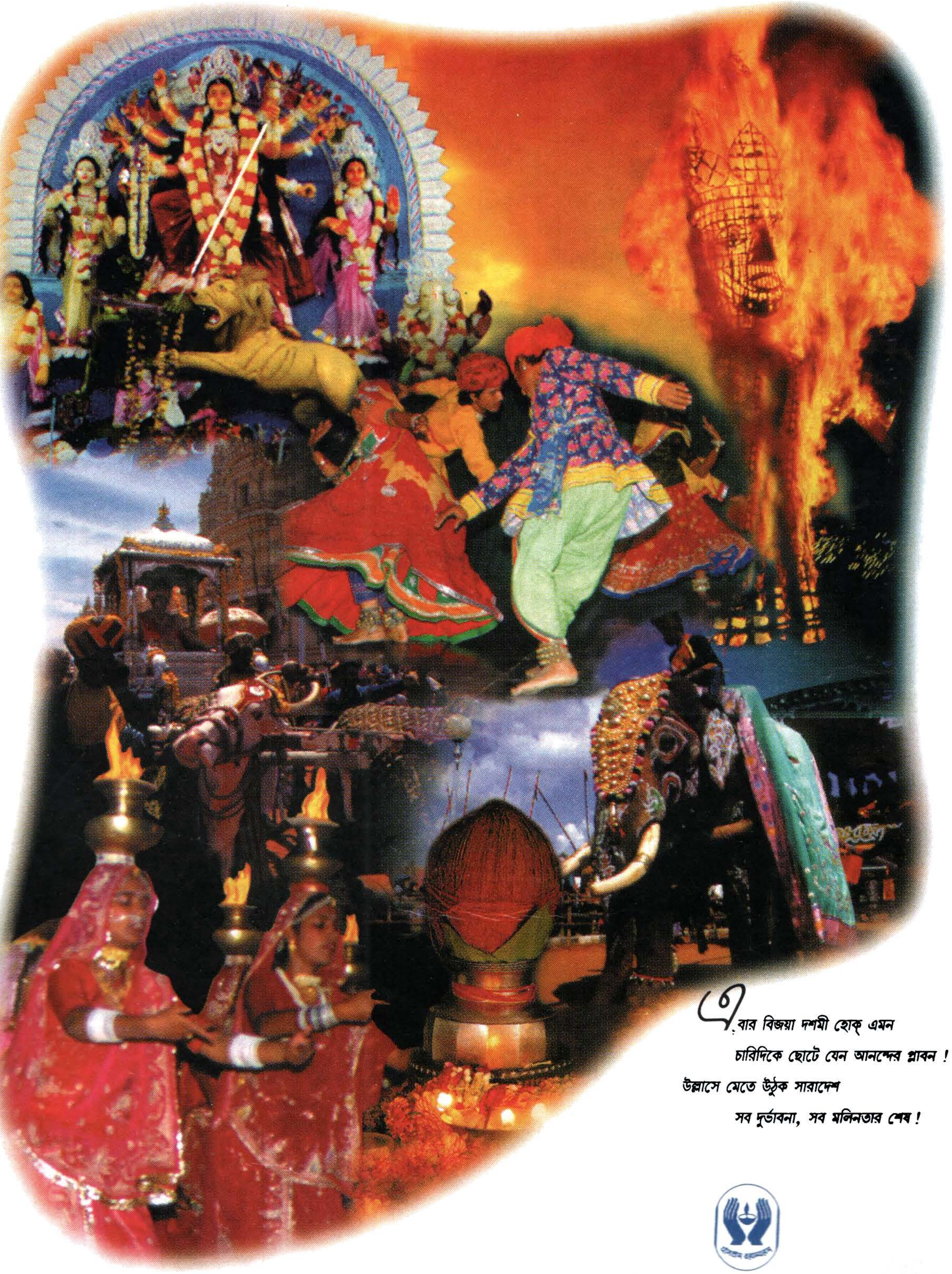
এবার বিজয়া দশমী হোক্ এমন
চারিদিকে ছোটে যেন আনন্দের প্লাবন !
উল্লাসে মেতে উঠুক সারাদেশ
সব দুর্ভাবনা, সব মলিনতার শেষ !
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
R K SWAMY/BBDO LIC 4251 BEN

Registration No. W.B./E.C.-60 September '98 "Suktara"

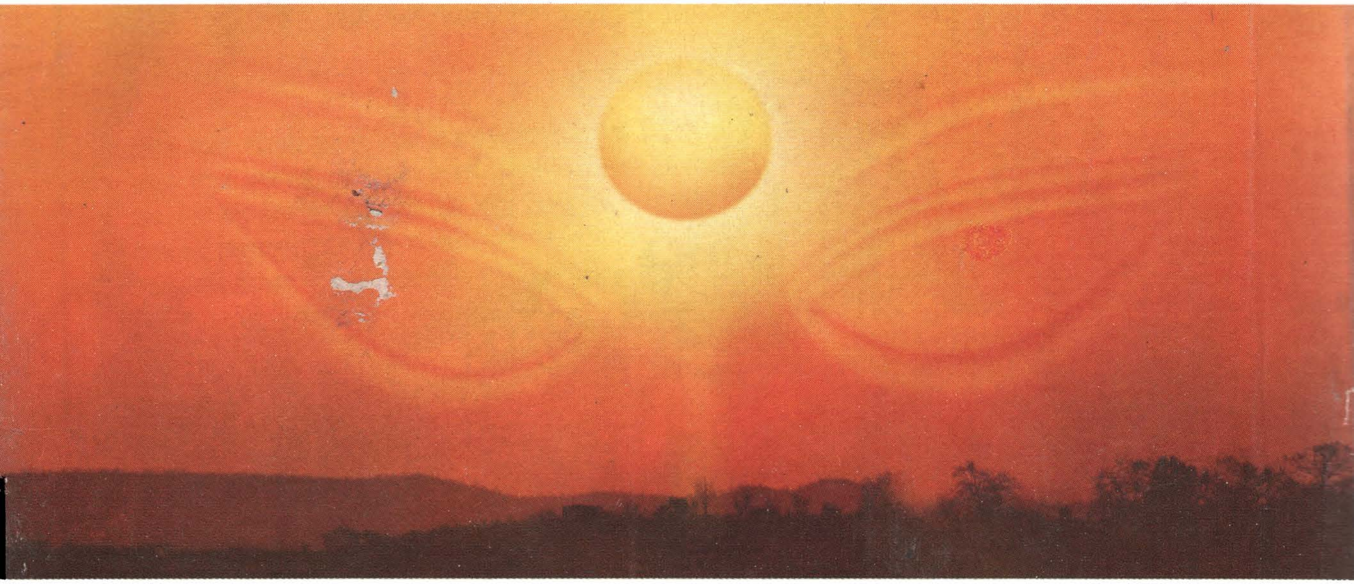

বাজলো তোমার আলোর বেণু

আঁধার বিদীর্ণ করে ধ্বনিত হোল অমৃতের সুর।

আনন্দের আলোয় স্নাত হোল ক্লান্ত ধরিত্রী।

পত্রে, পুষ্পে, আকাশে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল

তোমার আগমনের সঞ্জীবন মন্ত্র।

এসো মা। এসো আনন্দময়ী।

মহাশক্তির আলোকে

উদ্ভাসিত হোক আমাদের জীর্ণ মন।

আসুক শান্তি, আসুক আনন্দ।

জাত, পাত ও ধর্মের সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল পথ ছেড়ে

যেন আমরা এসে দাঁড়াই, মানবতার মহাকাশতলে।

বলি, আমরা সবাই এক, অবিচ্ছেদ্য।

বয়ম্ অমৃতস্য পুত্রাঃ।

শারদ শুভেচ্ছা সহ বঙ্গজীবনের অঙ্গ **বোরোলীন**

PSL uni McCann